বোখারী শরীফ

[বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা]

পঞ্চম খণ্ড

সীরাতুন-নবী সঙ্কলন

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)
প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল জামেয়া কোরআনিয়ার
ফয়েজ ও বরকতে

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব
মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা
বর্তমান শায়খুল হাদীছ, জামেয়া রহমানিয়া,
সাত মসজিদ মোহাম্মদপুর, ঢাকা কর্তৃক অনূদিত

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রথম পৃষ্ঠাগুলির সূচি

সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সঃ)-এর দরবারে মানপত্র ও সৌভাগ্য লাভের উসিলা

বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় খণ্ড অনুবাদকালে ১৯৬০ ইং সালে পবিত্র মদীনায় বিশেষভাবে নবীজীর রওজা পাকে পঠিত ঃ

التوسل بمدح خير الرسول

قِفَا نَحْظَ مِنْ ذِكْرٰى حَبِيْبٍ وَّمَنْزِلٖ ـ سَقَتْهُ السَّوَارِيْ وَالْغَوَادِيْ بِسَلْسَلٖ

বন্ধুগণ! অপেক্ষা করুন, আমরা প্রিয়পাত্র ও তাঁহার দেশের আলোচনায় আস্বাদ উপভোগ করি। সকাল-বিকালের মেঘমালাগুলি ঐ দেশকে ঠাণ্ডা রাখুক!

وَمَهْلاً عَلٰى تَذْكَارِ اٰثَارِ طَيْبَةٍ ـ مَدِيْنَةِ مَحْبُوْبٍ كَرِيْمٍ مُفَضَّلٖ

থামুন! "তায়বা" শহরের নিদর্শনগুলির স্মরণে; তাহাই সর্বাধিক মর্যাদাবান বন্ধুর শহর "মদীনা"।

بِهَا قُبَّةٌ خَضْرَاءُ فِيْ رَوْنَقِ الضُّحٰى ـ تَلَئْلَاً نُوْرًا فَوْقَ بَدْرٍ مُكَمَّلٖ

ঐ শহরে সবুজ গম্বুজ উজ্জ্বলরূপ নিয়া বিদ্যমান আছে, যাহা পূর্ণিমার চন্দ্র হইতে অধিক দীপ্ত।

بِهَا مَرْقَدُ الْمَوْلٰى الْكَرِيْمِ مُحَمَّدٍ ـ يَفُوْقُ عَلَى الْعَرْشِ الْمُعَلّٰى وَيَعْتَلِيْ

সেই গম্বুজের ভিতরই রহিয়াছে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শয্যাস্থান- তাঁহার শয্যার ভূখণ্ডের মর্যাদা আরশ অপেক্ষা অধিক।

يُذَكِّرُنَا اٰثَارَهَا وَدِيَارُهَا ـ وَتُبْدِيْ لَنَا مَالَانَرَاهُ وَنَجْتَلِيْ

ঐ শহরের ঘরবাড়ী ও নিদর্শনসমূহে এমন বস্তু স্মরণ করায় যাহা আমরা বর্তমান দেখিতেছি না।

نَشُمُّ بِهَا رَيَّا الْحَبِيْبِ كَاَنَّهٗ ـ عَلٰى ظَهْرِهَا ثَاوٍ وَلَمْ يَتَرَحَّلٖ

ঐ শহরে এখনও প্রিয়পাত্রের সুবাস এইরূপে ছড়ান রহিয়াছে যে, মনে হয়- তিনি এখনও তাহার ভূপৃষ্ঠে অবস্থানরত- কোথাও যান নাই।

حَبِيْبُ اِلٰهِ الْعٰلَمِيْنَ مُحَمَّدٌ ـ رَفِيْعُ الْعُلٰى خَيْرُ الْبَرَايَا وَاَفْضَلٖ

তিনি বিশ্ব জগত প্রভুর প্রিয়পাত্র, সর্বোচ্চ মর্তবার অধিকারী, সৃষ্টির সেরা ও সর্বাধিক মর্যাদাবান।

اِمَامُ النَّبِيِّيْنَ رَسُوْلٌ مُعَظَّمٌ ـ وَسَيِّدُ كَوْنَيْنِ عَدِيْمُ الْمُمَثَّلٖ

তিনি সমস্ত নবীর ইমাম, সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, দোজাহানের সর্দার, তাঁহার কোন তুলনা নাই।

شَفَاعَتُهٗ تُرْجٰى لَدٰى كُلِّ غُمَّةٍ ـ وَكَرْبٍ وَّهَوْلٍ وَّاقْتِحَامِ الْغَوَائِلٖ

বিপদ-আপদ, বালা-মসিবত ইত্যাদির সময় সুপারিশের আশার স্থল তিনি।

تَرٰى بِاسْمِهٖ يُشْفٰى السَّقَامُ وَاِنَّهٗ ـ لَحِرْزٌ عَظِيْمٌ مِنْ جَمِيْعِ النَّوَازِلِ

তাঁহার নামের বরকতে অনেক অনেক রোগের উপশম দেখিতে পাইবে এবং তাঁহার নাম সব রকম বিপদ হইতে অতি বড় রক্ষাকবচ।

وَلَوْ كَانَتِ الْاٰيَاتُ تَعْدِلُ قَدْرَهٗ ـ لَكَانَ اسْمُهٗ يُحْيِىْ رَمِيْمَ الْمَفَاصِلِ

তাঁহার মর্যাদানুপাতিক মোজেযা যদি তাঁহাকে প্রদান করা হইত, তবে তাঁহার নামের বরকতে ব্যক্তির ছিন্নভিন্ন অঙ্গসমূহ জীবিত হইয়া উঠিত।

هُوَ النُّوْرُ وَالْبُرْهَانُ طٰهٰ وَشَاهِدٌ ـ وَصَاحِبُ اِسْرَاءٍ عَظِيْمُ الشَّمَائِلِ

পবিত্র কোরআনে নূর (আলো), বোরহান (উজ্জ্বল প্রমাণ), শাহেদ (সাক্ষী) এবং 'তোয়া-হা' বলিয়া তাঁহাকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি সপ্ত আকাশ ভ্রমণকারী এবং সর্বোচ্চ গুণাবলীর আকর।

دَعَاهُ الْاِلٰهُ بِالْبُرَاقِ وَمِعْرَاجٍ ـ اِلَى الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى وَاَعْلَى الْمَنَازِلِ

স্বয়ং আল্লাহ বোরাক এবং উড়ন্ত সিংহাসন পাঠাইয়া ঊর্ধ্বস্থানীয় জগতের এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের প্রতি তাঁহাকে দাওয়াত করিয়া নিয়াছিলেন।

فَسَارَ اِلَى الْعَرْشِ وَمَا شَاءَ رَبُّهٗ ـ لِرُؤْيَةِ اٰيَاتٍ عِظَامِ الدَّلَائِلِ

সেমতে তিনি পরিভ্রমণ করিলেন মহান আরশ পর্যন্ত এবং যে পর্যন্ত পরওয়ারদেগারের ইচ্ছা হইয়াছিল, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন এবং তাঁহার প্রভুত্বের বড় বড় প্রমাণ পরিদর্শন করিবার জন্য।

وَزَارَ مِنَ الْاٰيَاتِ مَالَمْ يُفَسَّرُ ـ وَحَازَ الْكَرَامَاتِ وَمَا لَمْ يُفَصَّلُ

এবং তিনি পরিদর্শন করিলেন এমন এমন মহান নিদর্শনসমূহ, যাহা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব এবং তিনি এমন এমন সম্মান লাভ করিলেন যাহা বর্ণনাতীত

وَنَالَ الْعُلٰى فَوْقَ الْخَيَالِ وَخَاطِرٍ ـ وَعِزًّا وَّاِجْلَالًا وَّكُلَّ الْفَضَائِلِ

এবং উচ্চ মর্তবা, সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত এই পর্যায়ের লাভ করিলেন যাহা ভাবনা বা ধারণায়ও আসিতে পারে না।

دَنَا فَتَدَلّٰى قَابَ قَوْسَيْنِ رَبُّهٗ ـ فَاَوْحٰى اِلَيْهِ مِنْ عِظَامِ الْمَسَائِلِ

তিনি প্রভুর নৈকট্য লাভ করিলেন যতদূর সৃষ্ট ও সৃষ্টার মধ্যে সম্ভব, সঙ্গে সঙ্গে প্রভুও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, অতপর বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বহু সার্কুলার তাঁহাকে প্রদান করিলেন

وَصَارَ نَجِيًّا لِلْحَبِيْبِ حَبِيْبُهٗ ـ وَجِبْرِيْلُ نَاءٍ فِى الْوَرَاءِ بِمَعْزِلٍ

এবং বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর আলাপ হইল, তখন জিব্রাঈল পর্যন্ত তথা হইতে বহু পিছনে ছিলেন।

هَدَانَا اِلَى الْخَيْرِ وَجَنَّةِ رَبِّنَا ـ اَتَانَا مِنَ اللّٰهِ بِدِيْنٍ مُعَدَّلٍ

তিনি আমাদিগকে উন্নতি ও বেহেশতের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে পারিপাট্য-বিশিষ্ট দ্বীন বহন করিয়া আনিয়াছেন।

لَقَدْ جَاءَ وَالنَّاسُ فِيْ قَعْرِ ظُلْمَةٍ ـ ضَلَالٍ وَّاِشْرَاكٍ وَفِيْ كُلِّ بَاطِلٍ

তাঁহার আবির্ভাব হইল যখন মানুষ ভ্রষ্টতা, শেরক ও সব রকম কুসংস্কারে নিমজ্জমান ছিল।

بَشِيْرًا نَذِيْرًا لِلْاَنَامِ وَرَحْمَةً ـ رَؤُوْفًا رَحِيْمًا مِثْلَ عَذْبِ الْمَنَاهِلِ

তিনি সুসংবাদবাহক ও সতর্কবাণীবাহক হইয়া আসিলেন বিশ্ব মানবের জন্য এবং রহমত, মেহেরবান, দয়ালু ও পিপাসা নিবারক সুমিষ্ট ঝর্ণারূপী হইয়া আসিলেন।

سِرَاجًا مُنِيْرًا مِثْلَ شَمْسِ ظَهِيْرَةٍ ـ كَرِيْمًا جَوَادًا مِثْلَ غَيْثٍ مُحَفَّلِ

দ্বিপ্রহরের সূর্যের ন্যায় দীপ্ত প্রদীপ হইয়া আসিলেন এবং মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালার ন্যায় দাতা হইয়া আসিলেন।

عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ مَحَبَّةً ـ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ لَنْ تَرَوْ مِنْ مُمَاثِلِ

বিশ্ব মানবের প্রতি তাঁহার এত স্নেহ যে, তাহাদের জন্য কষ্টদায়ক বস্তু তিনি একেবারেই বরদাশত করেন নাই এবং তাহাদের জন্য এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যাহার কোন তুলনা নাই।

وَدَاعٍ اِلَى الْخَيْرِ بِوَعْظٍ وَّحِكْمَةٍ ـ وَهَادٍ اِلَى اللّٰهِ بِقَوْلٍ مَدَلَّلِ

নসীহত ও হেকমতের দ্বারা তিনি বিশ্ববাসীকে মঙ্গলের প্রতি আকুল আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং দলীল প্রমাণ মারফত আল্লাহর প্রতি পথ-প্রদর্শনকারী ছিলেন।

وَبِالْبَيِّنَاتِ مِنْ دَلَائِلِ رَبِّهٖ ـ وَبِالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ الْجَلَائِلِ

এবং স্বীয় প্রভুর পক্ষ হইতে প্রদত্ত উজ্জ্বল প্রমাণ, প্রকাশ্য বড় বড় অলৌকিক ঘটনা মারফত–

تَشَقَّقَ بَدْرٌ مِنْ اِشَارَةِ اِصْبَعٍ ـ تَكَسَّرَ صَخْرٌ مِنْ اِشَارَةِ مِعْوَلٍ

তাঁহার আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল এবং গেতীর ইশারায় বিরাট পাথর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

وَسَلَّمَ اَحْجَارٌ عَلَيْهِ تَحِيَّةً ـ عَلَيْكَ سَلَامُ اللّٰهِ دَوْمًا تَقَبَّلِ

পাথরসমূহ তাঁহাকে সালাম করিয়াছিল যে, আপনার প্রতি সর্বদা আল্লাহর তরফ হইতে শান্তি বর্ষিত হউক– এই সালাম কবুল করুন।

وَجَاءَ عِدَاهُ بِالْحِجَارَةِ قُبْضَةً ـ فَنَادَتْ نِدَاءً فِيْ شَهَادَةِ مُرْسَلِ

শত্রুদল কাঁকর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উপস্থিত হইল, ঐ কাঁকর উচ্চ স্বরে তাঁহার রেসালতের সাক্ষ্য দিল।

تَفَلَّتَ اَشْجَارٌ اِلَيْهِ مُلَبِّيَةً ـ وَقَامَتْ لَدَيْهِ مِثْلَ عَبْدٍ مُذَلَّلِ

তাঁহার আদেশ পালনে কতিপয় বৃক্ষ ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে অনুগত দাসের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল

تَجَمَّعَ اَغْصَانٌ اِلَيْهِ مُظِلَّةً ـ وَسَارَ الْغَمَامُ مِثْلَ سَقْفٍ مُظَلَّلِ

গাছের ডালা তাঁহাকে ছায়া দানের জন্য একত্রিত হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল এবং মেঘমালা ছায়া প্রদানকারী ছাদের ন্যায় হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল।

وَحَنَّتْ اِلَيْهِ نَخْلَةٌ مِنْ مُحَبَّةٍ ـ فَاَنَّتْ وَرَنَّتْ كَالْيَتِيْمِ وَاَرْمَلِ

এবং তাঁহার বিচ্ছেদে কাষ্ঠ বিচ্ছেদ-যাতনা প্রকাশ করিয়া এতীম ও বিধবার ন্যায় কাঁদিয়াছিল।

فَلَمَّا اَتَاهَا هَادِءً مُتَعَطِّفًا ـ لِغَاضَ بُكَاهَا كَالْوَلِيْدِ الْمُعَلَّلِ

অতপর যখন তিনি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আসিলেন এবং স্নেহ দেখাইলেন, তখন সান্ত্বনা প্রদত্ত শিশুর ন্যায় তাঁহার ক্রন্দন ক্ষান্ত হইয়া গেল।

تَشَكَّتْ اِلَيْهِ بِالْمَظَالِمِ نَاقَةٌ ـ وَكَلَّمَ ظَبْىٌ مِثْلَ ثَكْلٰى بِمَامَلِ

উষ্ট্রী আসিয়া তাহার উপর অত্যাচারের অভিযোগ তাঁহাকে জানাইয়াছিল এবং হরিণ তাঁহার নিকট সন্তানহারা মায়ের ন্যায় স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছিল।

اَتَتْ عَنْكَبُوْتٌ بِالْبُيُوْتِ وِقَايَةً ـ عَلَيْهِ مِنَ الْاَعْدَاءِ تَحْمِىْ بِمَقْتَلِ

মাকড়সা ঘর বানাইয়া তাঁহাকে শত্রু হইতে হেফাযত করিয়াছিল যখন তাঁহার প্রাণের ভয় ছিল।

وَجَائَتْ تَقِيْهِ مِنْ عَدُوٍّ حَمَامَةٌ ـ يَقُوْلُ لِثَانٍ لَاتَخَفْ وَتَوَكَّلِ

এবং শত্রু হইতে রক্ষা করার জন্য কবুতরও আসিয়াছিল– তিনি নিজ সঙ্গীকে বলিতেছিলেন, ভয় পাইও না– আল্লাহর উপর ভরসা কর।

وَقَدْ قَالَ يَا اَرْضُ خُذِيْهِ لِفَارِسٍ ـ فَلَمْ يَتَخَلَّصْ قَبْلَ اَمْرِ مَبَدَّلِ

একবার এক অশ্বারোহী শত্রুর প্রতি ইশারা করিয়া বলিয়াছিলেন, হে মাটি! এই ব্যক্তিকে পাকড়াও কর, অতপর সে আর ছুটিয়া যাইতে পারিল না, যাবত না তিনি ছাড়িবার নির্দেশ দিলেন।

طُيُوْرٌ وَوَحْشٌ وَالْخَلَائِقُ كُلُّهَا ـ لَتَدْرِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ دُوْنَ التَّاَمُّلِ

পশুপক্ষী এবং সমস্ত সৃষ্ট জগত আল্লাহর রসূলকে বিনা দ্বিধায় চিনিয়া থাকিত।

دَعَا قَوْمَهٗ يَوْمًا اِلَى اللّٰهِ دَعْوَةً ـ وَاَنْذَرَهُمْ هَوْلَ الْعَذَابِ الْمُعَجَّلِ

একদা তিনি স্বীয় জাতিকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাইলেন এবং তাহাদিগকে নিকটবর্তী আযাবের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করিলেন।

فَنَادٰى نِدَاءً يَا مَعَاشِرَ مَكَّةَ ـ هَلُمُّوْا اِلٰى قَوْلِ النَّذِيْرِ الْمُهَوِّلِ

সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, হে মক্কার বিভিন্ন গোত্র! তোমরা ভয়ঙ্কর সংবাদদাতা সতর্ককারীর কথার প্রতি ধাবিত হও।

فَعَمَّ قُرَيْشًا وَالْعَشِيْرَةَ كُلَّهَا ـ وَخَصَّ مِنَ الْقُرْبٰى بِقَوْلٍ مُفَصَّلِ

তিনি কোরায়েশ তথা স্বীয় বংশধরের সকলকে এবং বিশেষভাবে স্বীয় আত্মীয়বর্গকে পরিষ্কার ভাষায় এই বলিয়া সম্বোধন করিলেন–

اَلَا تَعْلَمُوْنِىْ صَادِقًا اِنْ اَخَفْتُكُمْ ـ بِجَيْشٍ اَتَاكُمْ عَنْ قَرِيْبٍ مُعَجِّلِ

"আমি যদি এইরূপে সতর্ক করি যে, অতি সত্বর নিকটবর্তী স্থান হইতে এক দল শত্রু সেনা তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে আসিতেছে– তবে কি আমাকে সত্যবাদী গণ্য করিবে"?

فَقَالُوْا بَلٰى لَمْ تَاْتِ زُوْرًا وَلَمْ نَرَ ۔ بِكَ الْكِذْبَ يَاخَيْرَ الْاَمِيْنِ الْمُعَوَّلِ

তাহারা সকলে এক বাক্যে বলিল, নিশ্চয়– কারণ আপনি কখনও মিথ্যা অবলম্বন করেন নাই এবং হে নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী! আপনার মধ্যে কখনও আমরা মিথ্যা পাই নাই।

فَقَالَ اسْمَعُوْا ثُمَّ اسْمَعُوْنِىْ فَاِنَّنِىْ ۔ نَذِيْرٌ لَّكُمْ قَبْلَ الْعَذَابِ الْمُخَجِّلِ

তখন তিনি বলিলেন, তোমরা শুন, পুনঃ বলিতেছি– তোমরা কথা শুন, অপদস্থকারী আযাব আসিবার পূর্বে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি।

اَلَا فَاعْبُدُوْا رَبًّا وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ ۔ وَلَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ اِلٰهٍ مُسَوَّلٍ

তোমরা সতর্ক হও– সৃষ্টিকর্তার এবাদত কর এবং তাঁহার সঙ্গে শরীক করিও না গর্হিত মাবুদের এবাদত করিও না।

اَلَا فَاهْجُرُوْا رِجْزًا وَاَوْثَانَ قَوْمِكُمْ ۔ وَمَا يَعْبُدُ الْاَبَاءَ اَجْلَ الْمَجَاهِلِ

তোমরা মূর্তি ও গোত্রীয় দেবদেবীর পূজা পরিত্যাগ কর এবং তোমাদের বাপ-দাদা অজ্ঞতার দরুন যাহাদের পূজা করিত ঐসবও পরিত্যাগ কর।

فَرَاغُوْا اِلَيْهِ بِالْعَدَاوَةِ كُلُّهُمْ ۔ وَهَمُّوْا بِهٖ شَرًّا بِكُلِّ الْوَسَائِلِ

তখন তাহারা সকলে তাঁহার প্রতি শক্রতার ব্যবহার আরম্ভ করিল এবং সব রকমের ব্যবস্থাবলম্বন করিয়া তাঁহার ক্ষতি সাধনে উদ্যত হইল।

سَعٰى كُلَّ سَعْيٍ فِىْ هِدَايَةِ قَوْمِهٖ ۔ وَلٰكِنْ تَلَقَّوْهُ بِشَرٍّ مُسَلْسَلٍ

তিনি স্বীয় জাতিকে হেদায়াত করার জন্য সব রকমের চেষ্টাই করিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহারই করিতে লাগিল।

فَصَارَ يَجُوْلُ فِى الْمَجَامِعِ تَارَةً ۔ وَطَوْرًا يَدُوْرُ فِىْ بُطُوْنِ الْقَبَائِلِ

তখন তিনি বিভিন্ন লোক সমাগমের স্থানে বিভিন্ন গোত্রের শাখাসমূহের নিকট সত্যের ডাক নিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন

وَيَعْرِضُ دِيْنَ اللّٰهِ فِىْ كُلِّ مَحْضَرٍ ۔ وَيَدْعُوْا عِبَادَ اللّٰهِ فِىْ كُلِّ مَحْفِلٍ

এবং তিনি প্রত্যেক সুযোগেই আল্লাহর দ্বীনকে লোক সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক সভা-সমিতিতে তিনি আল্লাহর বান্দাগণকে আহ্বান জানাইতে লাগিলেন।

اَتَا طَائِفًا يَدْعُوْ اِلٰى دِيْنِ رَبِّهٖ ۔ وَيَرْجُوْ بِاَهْلِيْهَا لِعَوْنٍ مُؤَمَّلٍ

এই পরিস্থিতিতে তিনি তায়েফ নগরে স্বীয় পরওয়ারদেগারের দ্বীনের আহ্বান নিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি তায়েফবাসী হইতে আশানুরূপ সাড়া পাইবার ভরসা করিতেছিলেন

وَلٰكِنْ اَتَوْهُ بِالْجَفَاءِ وَغَدْرَةٍ ۔ وَجَوْرٍ وَّاِيْلَامٍ وَجُرْحٍ مُقَتِّلٍ

কিন্তু তাহারা তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, অসদ্ব্যবহার, অত্যাচার, দুঃখ-যাতনা প্রদান এবং প্রাণনাশক আঘাত লইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল

وَادْمَوْهُ ضَرْبًا بِالْحِجَارَةِ صِبْغَةً ـ وَاٰذَوْهُ اِيْذَاءً بِمَا لَمْ يُمَثَّلِ

এবং তাহারা পাথর মারিয়া তাঁহাকে রক্তে রঞ্জিত করিয়া দিল এবং দৃষ্টান্তহীন কষ্ট-যাতনা দিল।

فَسَالَتْ دِمَاءٌ مِّنْ جَبِيْنٍ مُّبَارَكٍ ـ وَصَارَتْ عَلَى الرِّجْلِ كَخُفٍّ مُّنَعَّلِ

তাঁহার মোবারক মুখ-মণ্ডলের রক্ত বহিয়া পায়ের উপর মোজা ও জুতার ন্যায় হইয়া গেল।

لِيَمْسَحُ وَجْهًا مِّنْ دِمَاءٍ وَمَدْمَعٍ ـ وَيَمْشِيْ غَشِيًّا فِىْ هُجُوْمِ الْبَلَابِلِ

তিনি মুখমণ্ডলের রক্ত ও অশ্রু মুছিতে লাগিলেন এবং দিশাহারা হইয়া বিপদের তুফানের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

فَجَاءَ اِلَيْهِ مِنْ مَلَائِكِ رَبِّهِ ـ لِاِهْلَاكِ قَوْمٍ بِالْعَذَابِ الْمُنَكِّلِ

এমতাবস্থায় তাঁহার প্রভুর ফেরেশতা আসিল ঐ দেশবাসীকে আযাব দানে ধ্বংস করার জন্য।

لِاِهْلَاكِهِمْ بَيْنَ الْجِبَالِ بِطَائِفٍ ـ بِسَحْقٍ وَّرَضٍّ بَيْنَهَا مِثْلَ فِلْفِلِ

তায়েফ নগরীর পাহাড়সমূহের মধ্যে মরিচের ন্যায় পিষিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য।

وَلٰكِنْ دَعَا رَبِّىْ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ ـ اِذَا يَعْرِفُوْنِىْ لَنْ يُّصِيْبُوْا بِخَرْدَلِ

কিন্তু তিনি তাহাদের ধ্বংস চাহিলেন না বরং দোয়া করিলেন, হে প্রভু! এই জাতিকে হেদায়াত দান করুন। তাহারা চিনিতে পারিলে আমাকে সরিষার দানার আঘাতও করিবে না।

وَاِنْ كَانَ اُوْلٰى كَذَّبُوْنِىْ فَنَسْلُهُمْ ـ عَسٰى اَنْ يَكُوْنَا مُؤْمِنِيْنَ فَاَجْمِلِ

তিনি আরও বলিলেন– তাহারা যদিও আমাকে অমান্য করিতেছে; কিন্তু আশা করি তাহাদের বংশের মধ্যে ঈমানদার সৃষ্টি হইবে, অতএব তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন।

فَهٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ يَاْتِىْ بِشَفْقَةٍ ـ عَلٰى مَنْ يَجُوْرُ مِنْ عَدُوٍّ وَّقَاتِلِ

এই ছিলেন আল্লাহর রসূল– প্রাণঘাতী শত্রু অত্যাচারীর প্রতিও তিনি দয়া প্রদর্শন করিতেন।

وَيَدْعُوْلَهُمْ بِالْخَيْرِ حُبًّا وَّرَحْمَةً ـ يُسَكِّنُ غَضَبَ اللّٰهِ حِيْنَ التَّنَزُّلِ

এবং তাহাদের প্রতিও দয়াপরবশ হইয়া মঙ্গল কামনা করিয়া দোয়া করিতেন– আল্লাহর গযব নাযিল হওয়ার মুহূর্তে তাহাকে ঠান্ডা করিয়া দিতেন।

مُعِيْنٌ لِخَلْقِ اللّٰهِ فِىْ كُلِّ غُمَّةٍ ـ شَفِيْعُ الْعُصَاةِ فِىْ شَدِيْدِ الْمَازِلِ

প্রত্যেক কষ্ট-যাতনার স্থানেই তিনি আল্লাহর বান্দাদিগকে সাহায্যকারী এবং ভীষণ কঠিন স্থানে গোনাহগারদের জন্য সুপারিশকারী।

وَسَاقِىْ عِطَاشِ النَّاسِ فِىْ يَوْمِ مَحْشَرٍ ـ مِنَ الْحَوْضِ اَحْلٰى مِنْ حَلِيْبٍ مُعَسَّلِ

হাশরের দিন তিনি তৃষ্ণাতুর মানুষকে এমন হাউজ হইতে পান করাইবেন যাহার পানীয় দুগ্ধ ও মধু অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু।

شَرَابًا طَهُوْرًا مَنْ يُّصِبْ مِنْهُ جُرْعَةً ـ يَجِدْ رِيَّةً تَبْقٰى وَلَمْ تَتَزَيَّلِ

এমন পবিত্র শরবত যেব্যক্তি এক ঢোক লাভ করিবে সে চিরজীবনের জন্য তৃপ্তি লাভ করিবে।

يَجِئُ اِلَى الْعَرْشِ وَيَسْجُدُ رَبَّهٗ ـ اِذَا النَّاسُ سَكْرٰى فِىْ شَدِيْدِ التَّمَلْمُلِ

যখন (কিয়ামতের মাঠে) মানুষ ভীষণ চিন্তা-ভাবনার মধ্যে পতিত হইবে, তখন তিনি আরশের নীচে আসিয়া স্বীয় পরওয়ারদেগারের সন্নিধানে সেজদা করিতে থাকিবেন

اِذَا النَّاسُ سَكْرٰى مِنْ شَدَائِدِ مَحْشَرٍ ـ حَيَارٰى كَغَوْغَاءِ الْجَرَادِ بِمَوْجَلِ

যখন মানুষ হাশরের মাঠের বিপদের ভয়ে পতঙ্গ দলের ন্যায় বিক্ষিপ্ত ছুটাছুটি করিতে থাকিবে

يَفِرُّ قَرِيْبٌ مِنْ قَرِيْبٍ وَّاَقْرَبٍ ـ بِيَوْمِ حِسَابٍ لَمْ تَجِدْ مَنْ يُّعَوَّلِ

হিসাবের দিন সর্বাধিক নিকটস্থ আত্মীয় পরস্পর একে অন্য হইতে পলাইয়া যাইবে, কাহাকেও ভরসাস্থলরূপে পাওয়া যাইবে না

وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَبْكِىْ لِاُمَّةٍ ـ وَيَدْعُوْا لِاِلٰهٖ بِابْتِهَالِ التَّذَلُّلِ

কিন্তু রসূল (সঃ) উম্মতের জন্য কাঁদিবেন ও কাকুতি-মিনতির সহিত আল্লাহর দরবারে দোয়া করিবেন।

اِلٰهِىْ تَرَحَّمْ وَاغْفِرَنْ كُلَّ اُمَّتِىْ ـ وَادْخِلْهُمُ الْجَنَّاتِ فِىْ خَيْرِ مَنْزِلِ

হে আল্লাহ! আমার প্রত্যেক উম্মতকে ক্ষমা কর, রহমত কর, তাহাদিগকে বেহেশতে দাখিল কর।

ثِمَالٌ مَلَاذٌ فِىْ ثَلٰثِ مَوَاطِنٍ ـ صِرَاطٍ وَّمِيْزَانٍ وَنَشْرِ الرَّسَائِلِ

তিনি বিশেষরূপে তিনটি জায়গায় আশ্রয়স্থল– পুলসেরাতে, নেকী-বদী ওজনের পাল্লার স্থানে এবং আমলনামা বণ্টনের স্থানে।

عَلَيْكَ سَلَامٌ يَا حَبِيْبُ الْمُكَرَّمُ ـ تَحِيَّةُ مُشْتَاقٍ اِلَيْكَ وَاٰمِلِ

আপনার প্রতি সালাম হে (আল্লাহর) সম্মানী হাবীব! ইহা আপনার দ্বারে বহু আশা-আকাঙ্ক্ষাধারীর সম্ভাষণ।

اَتَيْتُ بِاٰمَالٍ وَّشَوْقٍ وَرَغْبَةٍ ـ رَجَاءٍ اِلَيْكُمْ وَابْتِغَاءَ التَّوَسُّلِ

আশা ও আগ্রহ নিয়া আমি আপনার দ্বারে হাযির হইয়াছি– আপনার উসিলা লাভের উদ্দেশে।

فَرَبُّكَ سَاعٍ فِىْ رِضَاكَ وَمُسْرِعٌ ـ وَيَعْطِيْكَ مَا تَرْضٰى بِدُوْنِ التَّمَثُّلِ

আপনার পরওয়ারদেগার আপনার সন্তুষ্টি সাধনে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং যথাসত্বর আপনার সন্তুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন।

وَاَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ جِئْتُكَ تَائِبًا ـ وَمُسْتَغْفِرًا رَبِّىْ لِذَنْبِىْ الْمُذَلِّلِ

আপনি আল্লাহর রসূল, আমি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট তওবা করত এবং আমার অপদস্থকারী গোনাহ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করত আপনার দ্বারে হাযির হইয়াছি।

فَلَوْ اَنَّكَ اسْتَغْفَرْتَهُ لِىْ وَجَدْتُهُ ـ رَحِيْمًا وَّتَوَّابًا فَهَلْ اَنْتَ مُجْمِلِىْ

আপনি যদি আমায় মাগফেরাতের দোয়া করেন তবে নিশ্চয় আমি পরওয়ারদেগারকে তওবা গ্রহণকারী মেহেরবানরূপে পাইব, আপনি কি সহানুভূতি করিবেন?

وَهٰذَا لَوَعْدٌ يَارَسُوْلُ مُحَقَّقٌ ـ بَوَحْيٍ اِلَيْكَ مِثْلُهُ لَمْ يُبَدَّلٖ

হে আল্লাহর রসূল! উক্ত বিষয়টি আল্লাহ তাআলার অকাট্য ওয়াদা, যাহা আপনার প্রতি ওহী দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে– তাহার বরখেলাপ হইবে না।

عَلَيْكَ سَلَامٌ يَاشَفِيْعُ الْمُشَفَّعَ ـ شَفَاعَتُكَ الْعُظْمٰى نَجَاةٌ لِنَائِلٖ

আপনার প্রতি সালাম হে গ্রহণীয় সুপারিশকারী। আপনার মহান শাফাআত যে লাভ করিবে তাহার পরিত্রাণ সুনিশ্চিত।

عَلَيْكَ سَلَامٌ يَارَؤُفُ وَمُشْفِقٌ ـ ثِمَالٌ مَلَاذٌ لِلْحَيَارٰى وَعُوَّلٖ

আপনার প্রতি সালাম হে মেহেরবান স্নেহশীল। আপনি বিপদগ্রস্ত আতঙ্কগ্রস্তের আস্থার স্থল।

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَارَسُوْلُ الْمُعَظَّمُ ـ جَزَاكَ الْاِلٰهُ بِالْمَزِيْدِ وَاَكْمَلٖ

আপনার প্রতি সালাম হে শ্রেষ্ঠ রসূল। আল্লাহ আপনাকে অধিক অধিক প্রতিদান দান করুন।

شَهَادَتُنَا اَنْ قَدْ هَدَيْتَ جَمِيْعَنَا ـ وَبَلَّغْتَ مَا اُوْتِيْتَ مِنْ كُلِّ مُنْزَلٖ

আমরা এক বাক্যে সাক্ষ্য দিতেছি– আপনি আমাদের সৎপথ দেখাইয়াছেন এবং যাহা কিছু আল্লাহর তরফ হইতে লাভ করিয়াছেন সব আপনি আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

وَاَدَّيْتَ وَاللّٰهِ اَمَانَةَ رَبِّنَا ـ فَصِرْنَا عَلٰى دِيْنٍ مَتِيْنٍ مُسَهَّلٖ

খোদার কসম– আপনি পরওয়ারদেগারের সমস্ত আমানত পূর্ণরূপে আল্লাহর বান্দাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, তাই আমরা একটি সহজ ও মজবুত দ্বীনের সন্ধান পাইয়াছি।

اَتَيْتُكَ يَا خَيْرَ الْمَلَاذِ زِيَارَةً ـ وَمُسْتَشْفِعًا كَالْعَائِذِ الْمُتَوَسِّلٖ

হে সর্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়ের স্থান! উসিলা ও আশ্রয়ের আশা নিয়া সুপারিশ প্রার্থী হইয়া আপনার দ্বারে হাযির হইয়াছি।

تَرَحَّمْ عَزِيْزَ الْحَقِّ يَابَحْرَ رَحْمَةٍ ـ وَيَا مَرْجِعِ الْعَاصِىْ وَيَا خَيْرَ مَوْئِلٖ

হে দয়ার দরিয়া– হে গোনাহগারের উপস্থিতির স্থল, হে সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল! আপনি আমি "আজিজুল হকের" প্রতি দয়া করুন।

عَلَيْكَ اُلُوْفٌ مِّنْ صَلٰوةٍ وَرَحْمَةٍ ـ وَاٰلَافُ تَسْلِيْمٍ مِنَ الْعَبْدِ فَاقْبَلٖ

আপনার প্রতি লক্ষ লক্ষ দরূদও আল্লাহর রহমত এবং লক্ষ লক্ষ সালাম এই গোলামের পক্ষ হইতে কবুল করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উপক্রমণিকা

আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মানবরূপেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি রসূল ছিলেন; এমন রসূল যে, বিশ্ব বুকে আল্লাহ প্রেরিত এক লক্ষ বা দুই লক্ষের অধিক সংখ্যক রসূলের সেরা ও সর্দার বা সর্ব উর্ধ্বের রসূল ছিলেন তিনি।

নবী-রসূলগণ মানব জাতির মধ্যে সর্ব উর্ধ্বের এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্ব উর্ধ্বের হইলেন নবীজী (সঃ)। এই উর্ধ্বের সীমা কি তাহা একমাত্র আল্লাহ তাআলাহ জানেন।

তবে হিন্দুদের ন্যায় দেবত্ববাদ তথা গায়রুল্লাহকে উপাস্য ও পূজনীয় গণ্য করা– ইসলামে ইহার স্থান নাই। উপাসনা এক আল্লাহ তাআলার জন্যই সীমাবদ্ধ– এই অতি উর্ধ্বের মর্যাদা অন্য কাহারও নাই। তাই হযরত (সঃ) সম্পর্কে সর্বক্ষেত্রে মুসলমানগণ এই পরিচয় উল্লেখ করেন, عبده ورسوله আবদুহু ওয়া রসূলুহু "আল্লাহর বান্দা– উপাসক; দাস এবং আল্লাহর রসূল"।

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উপাস্য ও পূজনীয় হওয়া অর্থে অতিমানুষ বা অলৌকিক ব্যক্তি নিশ্চয় ছিলেন না; কিন্তু সকল সৃষ্টির সর্ব উর্ধ্বের অলৌকিক ব্যক্তিত্ব নিশ্চয় তাঁহার ছিল এবং তাঁহার এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের নিদর্শন ও প্রকাশরূপে আল্লাহ তাআলা তাঁহার দ্বারা বা তাঁহার জন্য অসংখ্য অলৌকিক ঘটনাবলীর বিকাশ সাধন করিয়াছেন। এই সূত্রে তাঁহাকে মহামানুষ, এই অর্থেই তাঁহাকে অতি মানুষ বলিলে তাহা শুধু ভাষার প্রয়োগ হইবে। ভাষা হিসাবে মহামানুষ ও অতিমানুষ এই দুইয়ের মধ্যে এত বড় বিরাট ব্যবধান আছে কিনা যে, অতিমানুষ শব্দ দেবত্বের মতবাদ বুঝায়– তাহা পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিতে পারেন। জনসাধারণের আকীদা বা মৌলিক বিশ্বাস বিশুদ্ধ করা চাই যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মর্যাদা উর্ধ্বের উর্ধ্বে ছিল। কিন্তু উপাস্য ও পূজনীয় হওয়ার মর্যাদা তাঁহার ছিল না মোটেই। সেইরূপ ধারণা থাকিলে তাহা অবশ্যই শেরক অংশীবাদ গণ্য হইবে। ইহার মর্ম এই আয়াতের انما انا بشر مثلكم "আমি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ বৈ নহি।" অর্থাৎ আমি আল্লাহর বান্দা তথা উপাসক দাস– উপাস্য, পূজনীয় মোটেই নহি।

এই আয়াতের সূত্র ধরিয়া নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অতিমানুষ হওয়াকে অস্বীকার করার আড়ালে একটি ইসলাম বিরোধী মতের ফাঁক বাহির করা হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর লোক নবী-রসূলগণের মোজেযা, যাহা অলৌকিক ঘটনাবলী হইয়া থাকে, তাহার প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন। ঐ শ্রেণীর লোকেরাই এই জিগির তোলায় খুব উৎসাহী যে, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অতিমানুষ বা অলৌকিক মানুষ ছিলেন না। এই জিগিরের সঙ্গে ইহা মিশাইয়া দেওয়া তাহাদের জন্য জন্য সহজ হয় যে, তিনি যেহেতু অলৌকিক মানুষ ছিলেন না, তাই তাঁহার কোন ঘটনা বা কার্যও অলৌকিক হইবে না। এই ভাব প্রবণতায় তাহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লারে মোজেযার অস্বাভাবিক ঘটনাবলীকে স্বাভাবিকের গণ্ডিভুক্ত করিতে অস্বাভাবিক হেরফের ও গোঁজামিলের পিছনে ছুটা ছুটি করে। শুধু নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযা সম্পর্কেই নহে, নবীগণের সকলের মোজেযার ব্যাপারে, তাহাদের এই হাল। যেমন স্বভাবের ছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ মরহুম। নবীর মোজেযা সম্পর্কে উল্লিখিত প্রবণতাটা খাঁ মরহুমের বাতিক ব্যাধিরূপ ছিল। পবিত্র কোরআনের পূর্ববর্তী বিভিন্ন নবীগণের মোজেযা শ্রেণীর যেসব ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে তাঁহার তফসীর নামীয় কোরআনের অপব্যাখ্যায় তিনি ঐসবের বিকৃতি সাধনে যেসব অস্বাভাবিক

হেরফের ও গোঁজামিলের আশ্রয় লইয়াছেন তাহা নিতান্ত দুঃখজনক। তাঁহার জীবদ্দশায় আমরা ঐসবের কঠোর সমালোচনায় পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম। যাহার বিভিন্ন অংশ বাংলা বোখারী শরীফ ৪র্থ খণ্ডের বিভিন্ন পাদটীকায় বিদ্যমান আছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযাসমূহ সম্পর্কে খাঁ মরহুম ঐ পথই অবলম্বন করিয়াছেন। এমনকি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিখ্যাত বিখ্যাত মোজেযা, যেমন- মে'রাজ, বক্ষবিদারণ, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা এবং নবীজীর হিজরত সফরের বিভিন্ন মোজেযার ঘটনা ইত্যাদিকে হয় অস্বীকার করিয়াছেন, না হয় আজগবীরূপে বিকৃত করিয়াছেন। বিশেষত নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মান প্রদর্শনে এবং নবুয়তের আভাস দানে যেসব অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিয়াছিল সেসবের সহিতও তিনি ঐ ব্যবহারই করিয়াছেন। তাঁহার অপচেষ্টার কোন কোনটার সমালোচনা বিভিন্ন পাদটীকায় আমরা করিব।

খাঁ মরহুম তাঁহার এই অপচেষ্টার পথ পরিষ্কারে স্থায়ী ব্যবস্থারূপে তাঁহার মোস্তফা চরিত গ্রন্থের সুদীর্ঘ উপক্রমণিকার কয়েকটি পরিচ্ছেদ ব্যয় করিয়াছেন। তাহাতে তিনি দুইটি জঘন্য বিষ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। একটি হইল- মুসলিম জাতির গৌরব, ইসলামের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুরক্ষক, অতন্দ্রপ্রহরী কোরআন-হাদীছ বিশেষজ্ঞ পূর্ববর্তী মহান ইমামগণকে শুধু উপেক্ষা ও কটাক্ষ করাই নহে বরং তাঁহাদিগকে সমাজের নিকট পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করিবার জন্য অশালীন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। আর একটি হইল, ঐ মনীষী ইমানমগণের জীবন সাধনালব্ধ মূল্যবান জ্ঞান-গবেষণার প্রতিও সমাজের আস্থা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই অপকর্ম অপচেষ্টায় খাঁ মরহুমের মতলব সিদ্ধি হইবে বটে, কারণ মোজেযার অনেক ঘটনা অস্বীকার করিতে বা বিকৃত করিতে বিরাট বাধা প্রতিবন্ধক সম্মুখে এই আসে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনী সঙ্কলনে পূর্বাপর সাধক গবেষকগণ সকলে একবাক্যে ঐসব ঘটনাবলীর স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং তাহা গুরুত্বসহকারে লিখিয়াছেন। অতপর শত শত বৎসর হইতে তাঁহাদের সঙ্কলন মুসলিম সমাজে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং ঐ সব সঙ্কলনে প্রতি আস্থা বিনষ্ট করিতে পারিলে সহজেই ঐ বাধা অপসারিত হইল; কিন্তু ইহার পরিণাম অতি মারাত্মক। জাতীয় সাধক গবেষকগণ এবং তাঁহাদের সঙ্কলন জ্ঞানভাণ্ডার জাতির অমূল্য ধন; ইহা হইতে বঞ্চিত হইলে জাতি রিক্তহস্ত এবং এতীম হইয়া পড়িবে।

সভ্য ও প্রগতিশীল জগতের অবস্থা লক্ষ্য করুন। হাইকোর্ট সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণের রায়সমূহ সরকারীভাবে গেজেটরূপে প্রকাশিত এবং বিশেষ যত্নের সহিত সুরক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে সারা বিশ্বের বিচারপতিগণ পরস্পর ঐসব রায়ের পূর্ণ মর্যাদা দিয়া থাকেন। উকিল-মোক্তারগণ ঐসব রায়ের বরাত বা রেফারেন্স দানের ক্ষেত্রে কেহই তাহাকে উপেক্ষা করেন না।

খাঁ মরহুম ঐ বিষাক্ত বস্তুদ্বয়কে তাঁহার পাণ্ডিত্যের রং-পলিশ এবং ভাষার লালিত্যের সাজ-সজ্জায় এত সুন্দর রূপ দিয়াছেন যে, বুঝমান মানুষও তাহা বরণ করিতে দ্বিধা করিবে না। পাণ্ডিত্যে তাঁহার ন্যায় দক্ষ ও প্রতিভাবান এবং প্রকাশ ভঙ্গির ছল-চাতুরীতে তাঁহার ন্যায় পটু কোন মানুষ তাঁহার মোকাবিলায় আসিলে তিনি যেভাবে অসত্যকে সুন্দর সাজে সত্যবেশী বানাইয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহার বিপক্ষ অন্ততঃ সত্যকে সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন। আমরা শুধু সংক্ষেপে খাঁ মরহুমের মাকালরূপী কোন কোন বক্তব্যের সামান্য ইঙ্গিত এবং তাহা খণ্ডনে আলোচনা প্রদানের চেষ্টা করিব।

খাঁ মরহুম প্রথম পরিচ্ছেদে পূর্ববর্তী সীরাত সঙ্কলনসমূহের প্রতি অভিযোগ করিয়াছেন- "মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনায় প্রায়ই দেখা যায় যে, কিংবদন্তী-সঙ্কলক, ঐতিহাসিক ও অন্ধ ভক্তগণের দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃত জীবনী পর্বত পরিমাণ কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের আবর্জনা রাশির তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। উদাহরণে হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণ ও খৃষ্টানদের যীশু খৃষ্টের নাম উল্লেখ করা যায়। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্বন্ধেও অবস্থা কতেকটা ঐরূপ। (নাউযু বিল্লাহ)

কী জঘন্য দৃষ্টান্ত ও মহাপাপের উক্তি! হিন্দুদের এবং শ্রীকৃষ্ণের তুলনার ন্যায় ঈমানহীনতার বেআদবী ত দূরের কথা– হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মত হওয়ার দাবীদার খৃষ্টানদের উল্লেখও এই ক্ষেত্রে রাত্র ও দিনের ন্যায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খাতিরে আল্লাহ তাআলা একটি বিশেষ নিশ্চয়তা দিয়া দিয়াছেন– নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মত সত্যের বিপরীতের উপর একমত হইবে না। খাঁ মরহুম তাঁহার ঐ জঘন্য ভাবধারাকে উক্ত পরিচ্ছেদের শেষ লাইনগুলিতে আরও অধিক উলঙ্গ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন– "যিনি হযরতের জীবনী আলোচনায় সত্য-মিথ্যাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে ও দেখাইতে চান তাঁহার পক্ষে এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা বেশী আয়াসসাধ্য নহে। তবে বাপ-দাদার কথা, পূর্বতন আলেমগণের নজির, মক্কার মোশরেকগণের অবলম্বিত যুক্তিধারা ইত্যাদির চোখ-রাঙ্গানীকে যিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা একেবারে অসম্ভব।"

আল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমা করুন! তের শত বৎসর পরে মুসলিমগণের নজির লক্ষ্য করিলে তাহা মক্কার মোশরেকগণের অবলম্বিত যুক্তিতুল্য হইবে– এইরূপ উক্তি করা খাঁ মরহুমেরই দুঃসাহস হইতে পারে। শুধু ঐ উক্তি নহে, তিনি পূর্ববর্তী ইমামগণকে যেভাবে গালিগালাজ করিয়াছেন তাহা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক।

তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মাকালরূপী কতগুলি যুক্তি সত্যের আবরণীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই যুক্তিগুলির ভিতরেও বিষ ঢুকাইয়াছেন অনেক; যদ্দারা তিনি সীমাহীন ধৃষ্টতায় পৌছিয়াছেন যে, তৃতীয় পরিচ্ছেদে পরিষ্কার ভাষায় ইসলাম ও মুসলিম জাতির গৌরব পূর্বতন আলেম এবং ইমামগণ সম্পর্কে বলিয়াছেন– "বোজর্গানে দীন ও ছলফে-ছালেহীন' বলিয়া মুসলমান সমাজে যেসকল 'তাগুতের' সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাই হইতেছে সর্বনাশের মূল।"

পাঠক! মুসলিম সমাজের 'বুজর্গানে দ্বীন' কোন্ কোন্ শ্রেণী খাঁ মরহুম পরবর্তী পৃষ্ঠায় তাহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার উক্তি–"অমুক ইমাম বলিয়াছেন, অমুক পীর বলিয়াছেন, অমুক আলেম লিখিয়াছেন– ইহারা হইতেছেন বোজর্গানেদ্বীন।" এই উক্তিতে স্পষ্টই বুঝা গেল– ইমাম, আলেম, পীর– ইহারাই বোজর্গানে দ্বীন।

সল্ফে সালেহীন অর্থও বুঝুন! 'সলফ' অর্থ পূর্বতন, আর 'সালেহীন' অর্থ নেক্কার ব্যক্তিবর্গ; সলফে সালেহীন অর্থ পূর্বতন নেক্কার ব্যক্তিবর্গ।

এই সুধী শ্রেণীসমূহ সম্পর্কে খাঁ মরহুম একটি আরবি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, 'তাগূত'। এই শব্দটির অর্থে বাংলা শব্দ এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে মুসলিম সমাজ খাঁ মরহুমের মুখে কি দিত তাহা বলা যায় না, তবে তিনি ক্ষমা পাইতেন না নিশ্চয়। 'তাগূত' শব্দটি পবিত্র কোরআনের আয়াতুল কুরসীতে উল্লিখিত রহিয়াছে। কাফের-মোশরেক পৌত্তলিকগণের পূজনীয়দের উদ্দেশে 'শয়তান' বা দেবদেবী অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

সেমতে খাঁ মরহুমের উক্তির অর্থ দাঁড়ায়– ইমাম, আলেম, পীর ও নেককার ব্যক্তিবর্গ বলিয়া মুসলমান সমাজে যেসকল শয়তান বা দেবদেবীর সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাই হইতেছে সমস্ত সর্বনাশের মূল। এই জঘন্য উক্তির প্রতিবাদের ভাষা জগতে আছে কি?

পাঠক! আপনারা ভাবিতে পারেন এবং খাঁ মরহুম এই ধারণা সৃষ্টির অপচেষ্টা করিয়াছেনও বটে যে, তাঁহার কটাক্ষ ও আক্রোশ শুধু কল্পিত ও ভুয়া বুজুর্গদের সম্পর্কে এবং নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনী সংক্রান্ত রচিত অপ্রামাণিক উর্দু, ফার্সী ইত্যাদি চটি বই-পুস্তক সম্পর্কে সীমাবদ্ধ।

খাঁ মরহুমের পাণ্ডিত্য ও বাকপটুতার আবরণে অসংখ্য ধোঁকা-ফাঁকির ইহাও একটি । তাঁহার অসার পেঁচালো মন্তব্যসমূহে তিনি ঐরূপ হাবভাব দেখাইয়া এবং ঐ শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করিয়া সমাজের ধিক্কার ও ক্ষোভ হইতে গা-ঢাকা দেওয়ার মতলব করিয়াছেন মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার উদ্দেশ্য ঐরূপ সীমাবদ্ধ নহে।

প্রথমতঃ পূর্ব যুগে 'ইমাম' আখ্যার ভুয়া কল্পিত পাত্র ছিল বলিয়া কোন ইতিহাস আমাদের জানা নাই। তবে আলেম ও পীর নামের ভুয়া লোক থাকা স্বাভাবিক। জগতের অন্যান্য শ্রেণীতেও তাহা আছে; যেমন–

ডাক্তার, আইনজ্ঞ, বিভিন্ন প্রশাসক ইত্যাদিতেও ভুয়া ব্যক্তি আছে; সেই জন্য তাহাদিগকে শ্রেণীগতভাবে গালি দিয়া তাহাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির উক্তি কি ক্ষমার যোগ্য হইবে?

অধিকন্তু পূর্ব যুগে, মুসলমানদের সোনালী আমলে– যখন ইসলামী শাসন প্রচলিত ছিল, তখন আলেম পীর ইত্যাদি ইসলামী পরিভাষার ঊর্ধ্বতন আখ্যাসমূহ ভুয়ারূপে নিতান্ত কমই অবলম্বিত হইতে পারিত; যেমন– বর্তমান যুগে ভুয়া সামরিক অফিসার ও উচ্চস্তরের ভুয়া প্রশাসক ইত্যাদি হওয়া কি সহজ ব্যাপার? ইসলাম ও মুসলমানদের গৌরবময় শাসন আমলে সামরিক অফিসার বা প্রশাসকদের আখ্যাসমূহ অপেক্ষা 'আলেম' 'পীর' ইত্যাদি আখ্যা বহু পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইত। বিশেষতঃ ইমাম, আলেম ও পীর শ্রেণীর যেসব বিশিষ্ট মনীষীর জ্ঞান ভাণ্ডার রচনা ও সঙ্কলন আকারে জাতীয় রত্নরূপে সুরক্ষিত রহিয়াছে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ত ইসলাম ও মুসলিম জাতির গৌরব এবং অমূল্য সম্পদ।

দ্বিতীয়ত ঃ খাঁ মরহুম প্রকৃত প্রস্তাবে ভুয়া ও কল্পিত বুজুর্গ নামীয় চুনোপুঁটি আটকাইবার জন্য সুবৃহৎ উপক্রমণিকার জাল ফেলেন নাই; তিনি ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিমের ন্যায় বড় বড় মোহাদ্দেছ, ইসলাম ও মুসলমান জাতির গৌরব– রুই-কাতলা আটকাইবার উদ্দেশে ঐ জাল ফেলিয়াছেন। তিনি উর্দু-ফার্সী চটি বই মুছিবার জন্য এত পাণ্ডিত্য ব্যয় করেন নাই। তিনি ৬০০–৭০০ বৎসর হইতে প্রচলিত ৪০০০–৬০০০ পৃষ্ঠায় রচিত সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ ও মোফাসসেরগণের জ্ঞানগর্ভময় জাতীয় সম্পদ ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীকে উপেক্ষণীয় ও প্রক্ষিপ্ত সাব্যস্ত করার কুমতলব আঁটিয়াছেন। এই সত্যের মাত্র কতিপয় দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন–

(১) কাফেরদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআলার কুদরতে আঙ্গুলের ইশারায় আকাশের চন্দ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখাইয়াছেন– আমরা যথাস্থানে এই মো'জেযার প্রামাণিক সুদীর্ঘ আলোচনা পেশ করিব।

খাঁ মরহুম মোস্তফা চরিত রচনা করিয়াছেন; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযা সম্পর্কিত কোন আলোচনা তাহাতে নাই। এমনকি এই বিখ্যাত মোজেযাটিরও উল্লেখ করেন নাই। ইহাতেও আমাদের আপত্তি ছিল না, এত বড় মোজেযাও বর্ণনা না করা তাঁহার অভিরুচি মনে করিতাম। কিন্তু মোজেযা অস্বীকারের বাতিক খাঁ মরহুমকে এই এ ক্ষেত্রেও রেহাই দেয় নাই। তিনি তাঁহার উপক্রমণিকায় কৌশলের সহিত তাহা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন–

"আমাদের অধিকাংশ লেখকের যুক্তিধারা এই যে, আল্লাহ তাআলার সর্বশক্তিমানত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আজগবী ঘটনার সম্ভবপরতা প্রতিপন্ন করেন; যথা– যে আল্লাহ চাঁদ-সূর্য সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি চাঁদকে দু'টুকরা করিতে পারেন না? –আমরা এই বন্ধুদের যুক্তি স্বীকার করিয়া নিবেদন করিব, আল্লাহ করিতে পারেন সব– তোমাকে বা আমাকে পাগল করিতে পারেন। তাই তুমি আমাকে বা আমি তোমাকে পাগল গণ্য করিব? ইহা যে ঘটিয়াছে– ঐতিহাসিকভাবে তাহার প্রমাণ দাও।"

ধৃষ্টতার সীমা আছে কি? বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, মেশকাত শরীফসহ অসংখ্য কিতাবের হাদীসসমূহে প্রমাণিত এবং হাজার বৎসর হইতে প্রচলিত সীরাত শাস্ত্রের বড় বড় প্রামাণিক কিতাবে বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ মোজেযাটিকে খাঁ মরহুম আজগবী ঘটনা বলিতে সাহস করিয়াছেন। আরও আশ্চর্যজনক এই যে, বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী শরীফ কিতাবসমূহে এই মোজেযার প্রমাণে সুস্পষ্ট হাদীছ এবং অসংখ্য সীরাত গ্রন্থের বর্ণনাসমূহ থাকা সত্ত্বেও তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ দাবী করিয়াছেন। মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়া পিতার পরিচয়ে আত্মীয়-কুটুম্ব সকলের সাক্ষ্য, এমনকি মাতার রেজেস্ট্রীকৃত বিবাহের কাবিন নামাও উপেক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক প্রমাণের দাবী উত্থাপন অপেক্ষা অধিক আজগবী ও আশ্চর্যজনক দাবী তাহা নহে কি? বাকপটু চতুর খাঁ মরহুম সরলপ্রাণ পাঠকদেরকে ধোকা দেওয়ার কী অপচেষ্টা করিয়াছেন! তাঁহার বর্ণনার হাবভাবে মনে হয়– আল্লাহর কুদরতে চাঁদ দু'টুকরা হওয়া শুধু সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করিয়াই পূর্বাপর মুসলিম সমাজ উক্ত মোজেযায় বিশ্বাস করিয়া নিয়াছে। অথচ বহু সংখ্যক হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ

বিদ্যমান আছে, এমনকি বোখারী শরীফের দুই স্থানে এই মোজেযাটির আলোচনা রহিয়াছে এবং একাধিক সুস্পষ্ট সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে– যথাস্থানে আমরা তাহা পেশ করিব। খাঁ মরহুম ঐসব দলীল-প্রমাণ হইতে পাশ কাটিয়া বিভ্রান্তিকর উক্তি করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই; এতদপেক্ষা ধৃষ্টতা কি হইতে পারে!

পাঠক! আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিলেন কি, খাঁ মরহুম তাঁহার কোন কোন বক্তব্যে এই ধূম্রজাল সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও যীশু খৃস্টের জীবনী গ্রন্থের ন্যায় আজগবী গল্প-গুজবের পুস্তকাবলী এবং বীর হুনুমানের পুঁথি ও বিভিন্ন পঞ্জিকা শ্রেণীর সীরাত সঙ্কলনসমূহের খণ্ডন করিতে চাহেন। আর ভণ্ড, ভুয়া, কল্পিত আলেম ও পীরদিগকে নাজেহাল করিতে খাঁ মরহুমের এই হাব ভাব এবং এই শ্রেণীর কথা ধোকা ও ফাঁকি মাত্র। বস্তুতঃ তিনি এই সব বলিয়াছেন মানুষকে ধোকায় ফেলিয়া পানি ঘোলাটে করার জন্য এবং সেই ঘোলা পানিতে বড় বড় রুই-কাতল শিকার করার উদ্দেশে। নতুবা তিনি চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযা অস্বীকার করিলেন কেন? তাহা ত গল্প-গুজবের ও পুথি-পুস্তকের বর্ণনা নহে, তাহা ত বড় বড় হাদীছ গ্রন্থের এবং বড় বড় সীরাত-সঙ্কলনসমূহের বর্ণনা, তাহা ত অনেক সংখ্যক সহীহ-শুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

দেখুন! বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, মেশকাত শরীফ ইত্যাদি পাক-পবিত্র গ্রন্থাবলী কি শ্রীকৃষ্ণ ও যীশু খৃস্টের জীবনী গ্রন্থের ন্যায় আজগবী গল্প-গুজবের বই? ইমাম বোখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ)সহ অসংখ্য সীরাত সঙ্কলক ইমামগণ কি ভুয়া কল্পিত শ্রেণীর ইমাম ও আলেম!

হাজার বৎসরের অধিক কাল হইতে বরণীয় ঐসব পাক-পবিত্র মহাগ্রন্থাবালীতে বর্ণিত এবং ঐসব পবিত্রাত্মা ইমামগণের প্রামাণিক বর্ণনায় প্রাপ্ত চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযাকে অস্বীকার কেন করা হইল? ঐতিহাসিক প্রমাণের দাবীর ধুয়া ত এই ক্ষেত্রে নিতান্তই অবান্তর; হাদীছ গ্রন্থাবলীর মর্যাদা ও প্রামাণিকতা ইতিহাস অপেক্ষা লক্ষ-কোটি গুণ ঊর্ধ্বের। এতদ্ভিন্ন তাহা সম্পর্কে ইতিহাসের বর্ণনাও ভূরি ভূরি বিদ্যমান আছে।

খাঁ মরহুমের ধৃষ্টতা শুধু এই একটি মোজেযা সম্পর্কেই নহে; শক্কে সদর বা বক্ষ বিদারণ মোজেযা সম্পর্কেও তিনি সেই অপকর্মই করিয়াছেন। বোখারী, মুসলিম ও মেশকাতসহ বহু হাদীছ গ্রন্থে এবং সীরাত শাস্ত্রের সমস্ত প্রামাণিক কিতাবসমূহেই উক্ত মোজেযাটি বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু খাঁ মরহুম হাদীছ শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পাঠকদের সম্মুখে যুক্তি ও পরীক্ষার ভাঁওতা ধরিয়া মিথ্যার সমাবেশ করত ঐ মোজেযা অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মিথ্যা সমাজের নজরে ধরাইয়া দেওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে, কিন্তু খাঁ মরহুমের এই শ্রেণীর কুকর্ম এতই অধিক যে, ঐ সবের শুধু ফিরিস্তি লিখিতে গেলেও সীরাতও সঙ্কলনের কাজ বাদ দিয়া বসিতে হইবে।

সওর পর্বত গুহার মোজেযা এবং হিজরত সফরের অন্যান্য মোজেযাসমূহকে তিনি একই অপকৌশলে অস্বীকার করিয়াছেন। মে'রাজ শরীফের ন্যায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রখ্যাত মোজেযাকে খাঁ মরহুম স্বপ্নের ঘটনা বলিয়া স্বাভাবিকতার গণ্ডিভুক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য নবীগণের মোজেযাও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন– যাহার নমুনা বোখারী চতুর্থ খণ্ডের বিভিন্ন নোটে বর্ণিত আছে।

খাঁ মরহুম মোজেযা অস্বীকার করেন– সরাসরি এই মতবাদ তিনি কোথাও প্রকাশ করেন নাই; বরং তাহার বিপরীতই হয় ত লিখিয়া থাকিবেন; নতুবা ধোকার ধূম্রজাল ত পূর্ণ হইবে না এবং সমাজও ক্ষমা করিবে না। কিন্তু কার্যতঃ তিনি কি করিয়াছেন তাহা দেখা প্রয়োজন। পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যায় পূর্ববর্তী নবীগণের মোজেযায় বর্ণিত আয়াতসমূহের বিকৃতি সাধনে এই মোজেযাসমূহের যেভাবে খণ্ডন তিনি করিয়াছেন তাহা অতীব দুঃখজনক। আর নবী (সঃ)-এর কি কি মোজেযা তিনি স্বীকার করিয়াছেন তাহা খুঁজিয়া দেখিলেই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাইয়া যাইবে। তাঁহার মোস্তফা চরিতে মোজেযা খণ্ডন করা ছাড়া

মোজেযা বয়ানের কোন পরিচ্ছেদ নাই। খাঁ মরহুমের দৌরাত্ম্য আরও সম্প্রসারিত; এই সম্প্রসারিত দৌরাত্মে তিনি মুসলমানদের এত বড় ক্ষতি করিয়াছেন যাহা কোন অমুসলিমও করিতে সাহস পায় নাই।

মুসলমান জাতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এবং ছাহাবীগণের পরে হাজার হাজার বৎসর পর্যন্ত ইসলাম লাভ করিবে দুইটি মহাবস্তুর মাধ্যমে– একটি পবিত্র কোরআন আর একটি সুন্নাহ বা হাদীছ। মুসলিম সমাজ কোরআনও লিপিবদ্ধাকারে লাভে করিয়াছে। হাদীছও বিভিন্ন গ্রন্থরূপে লিপিবদ্ধাকারে লাভ করিয়াছে। প্রচলিত বিশিষ্ট হাদীছ গ্রন্থসমূহ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাত্র দুই-আড়াই বা তিন শত বৎসর পরেই সঙ্কলিত হইয়াছে। তখন ইসলামের সোনালী যুগ ছিল, যাহা দীর্ঘ দিন চলিয়াছে। তখন হইতে হাজার হাজার হাদীছ বিশারদ হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ চুলচেরা অনুসন্ধানে দুইখানা হাদীছ গ্রন্থকে সহীহ্– বিশুদ্ধতা ও নির্ভরশীলতায় সর্বোচ্চ স্থান দান করিয়াছেন। (১) সহীহ্ বোখারী শরীফ (২) সহীহ্ মুসলিম শরীফ– সহীহ্ বা শুদ্ধ গুণবাচক শব্দ উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের নামের অংশরূপে হাজার বৎসরের অধিককাল হইতে বিশ্ব মুসলিম কর্তৃক প্রচলিত। মুসলিম সমাজ নির্দ্ধিধায় এই গ্রন্থদ্বয় হইতে দ্বীন-ইসলামের শিক্ষা লাভ করিতেছে।

দীর্ঘ হাজার বৎসরের অধিককাল পর খাঁ মরহুম সবুজ-শ্যামল ঘাসে আচ্ছাদিত গোবর স্তূপতুল্য তাঁহার উপক্রমণিকায় বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, উক্ত মহান গ্রন্থদ্বয়ও সংশয়মুক্ত নহে; উক্ত গ্রন্থদ্বয়েও অশুদ্ধ, অপ্রকৃত ও ভুল হাদীছ রহিয়াছে।

পাঠক! খাঁ মরহুমের লেখা পড়িলে ভাবিতে পারেন– তিনি ত দলীল-প্রমাণ দিয়াই দেখাইয়াছেন, বোখারী শরীফে ভুল হাদীছ আছে। তাঁহার প্রদত্ত দলীল-প্রমাণের স্বরূপ এখনই দেখিতে পাইবেন। তবে প্রথমে একটি সরল কথা অনুধাবন করুন। হাফেজে হাদীছ ইবনে-হাজার (রঃ) লক্ষ লক্ষ হাদীছ যাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ৬০০ বৎসর পূর্বে তাঁহার জন্ম। তিনি তাঁহার সাধনাময় জীবনের বিরাট অংশ বোখারী শরীফের গবেষণায় ব্যয় করিয়া প্রায় ৭০০০ পৃষ্ঠায় তাহার ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। তদ্রূপই হাফেজে হাদীছ আঈনী (রঃ) প্রায় ২০,০০০ পৃষ্ঠা লিখিয়া গিয়াছেন, আল্লামা কাস্তালানী (রঃ) ৫,০০০ পৃষ্ঠা ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন, আল্লামা কেরমানী (রঃ)-ও ঐরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। হাদীছ শাস্ত্রের গবেষণায় জীবন ব্যয়কারী এই মহামনীষীগণ বোখারী শরীফের উপর সুদীর্ঘ গবেষণা চালাইয়া তাহার এত বড় বড় ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করিয়া গেলেন, অথচ তাঁহারা এই সব ভুল হাদীছ দেখিলেন না, যেগুলি পণ্ডিত খাঁ মরহুম দেখিতে সক্ষম হইলেন! এই সহজ-সরল সত্যের আলোতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, প্রকারান্তরে খাঁ মরহুমের সমালোচনা শুধু ইমাম বোখারী (রঃ)-কেই ঘায়েল করে নাই; ৬০০ বৎসর হইতে প্রচলিত উক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহের রচনাকারী মহামনীষীগণকেও বোকা বানাইয়াছে।

ক্ষোভ ও দুঃখের সীমা থাকিতে পারে কি? খাঁ মরহুম মাকড়সার জালের আশ্রয় লইয়া পাহাড়ের সহিত টক্কর দেওয়ার ন্যায় যেসব ছুতা তার আঁচল ধরিয়া বোখারী শরীফের হাদীছকে ভুল সাব্যস্ত করিয়াছেন, ঐসব কোনটাই তাঁহার আবিষ্কার নহে। মুসলিম জাতির ঈমানী বিশ্বাসকে শিথিল করিয়া তাহাদের দুর্বল করার সম্ভাব্য চেষ্টারূপে যেসব ছল-ছুতার জন্ম দেওয়া যাইতে পারে, উম্মতের হিতৈষীগণ পূর্ব আমলেই সেই সবের উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন এবং বোখারী শরীফের গবেষণাকারীগণ নিজ নিজ রচনায় ঐ সবের ধূম্রজাল ছিন্ন করিয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত খাঁ মরহুম কোথাও বিষজনিত ঐসব ছল-ছুতার খোঁজ পাইয়াছেন; কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান-গবেষণার দৌড় তাঁহাকে বোখারী শরীফের উল্লিখিত ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে নাই। ফলে তিনি ঐ বিষয়ে প্রতিষেধক হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গিয়াছেন এবং বাংলাভাষী ভাইদের জন্য ঐ বিষ আমদানী করিয়াছেন। বাংলাভাষী পাঠক ভাইগণ হাদীছ শাস্ত্রের কী জ্ঞান রাখেন যে, তাঁহারা এই বিষয়ে প্রতিষেধক খোঁজ করিয়া বাহির করিবেন। আরও পরিতাপের বিষয়– ভাষা সম্রাট বাকপটু পণ্ডিত খাঁ মরহুম

নিজ প্রতিভা দ্বারা উক্ত বিষকে এমন সুন্দর সাজে সাজাইয়াছেন, হাদীছ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ বাংলাভাষী পাঠক তাহা গলধঃ করিবেই। সুতরাং খাঁ মরহুম তাঁহার এই অপকর্ম দ্বারা বাংলাভাষী মুসলিম সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি করিয়াছেন; তাহাদের জন্য শুধু বিষের দোকান সাজাইয়া গিয়াছেন।

নবীগণের মো'জেযা অস্বীকারের ন্যায় খাঁ মরহুম আরও অনেক সত্যকে অস্বীকার করিতেন। যথা- জিন জাতির অস্তিত্ব, ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কীয় অনেক তথ্য; ঈসা আলাইহিস সালামের কোন কোন বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। বোখারী, মুসলিম শরীফ এবং হাদীছ ভাণ্ডারের অনেক হাদীছ ঐ সত্য অস্বীকার করার অন্তরায় হয়; সে বাধা অপসারণে খাঁ মরহুম বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের ন্যায় মহাগ্রন্থাবলীকে ঘায়েল করার এই অপচেষ্টা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন খাঁ মরহুমের তফসীর নামে পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা এবং "মোস্তফা চরিত" পাঠ করিলে মনে হয় যেন বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের ন্যায় মহাগ্রন্থসমূহের হাদীছ অস্বীকার ও ভুল সাব্যস্ত করিয়া তিনি বাহাদুরী দেখাইবার স্বাদ অনুভব করিতেন। যেমন— কেহ পিতাকে খুন করিয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করার আনন্দ উপভোগ করে।

বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে ঐরূপ কোন কোন হাদীছ অস্বীকার এবং তাহা খণ্ডনের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এস্থলে সংক্ষেপে শুধু ঐ হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা হইবে যাহা তিনি মোস্তফা চরিতের উপক্রমণিকায় তাঁহার কথিত হাদীছ "পরীক্ষার নূতন ধারা" পরিচ্ছেদে ভুল হাদীছের নমুনারূপে পেশ করিয়া বলিয়াছেন- "সনদ সহীহ হওয়া সত্ত্বেও ঐ হাদীছগুলি নির্দোষ, প্রকৃত এবং সত্য হাদীছ বলিয়া কোন মতেই গৃহীত হইতে পারে না।" বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছ সম্পর্কে এই দাবী যে, সত্য হাদীছ বলিয়া কোন মতেই গৃহীত হইতে পারে না; তাহাও নেহাত তুচ্ছ হেতুর অজুহাতে- ইহা জঘন্য ধৃষ্টতা বৈ নহে।

খাঁ মরহুমের ভাষায় "প্রথম প্রমাণ" অর্থাৎ বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে যে ভুল হাদীছ রহিয়াছে তাহার প্রথম প্রমাণ বা নমুনা "আনাছ (রাঃ) বলিতেছেন, يايها الذين امنوا لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى 'হে মোমেনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর আপনাদের স্বর ঊর্ধ্বে চড়াইও না।" এই আয়াতটি নাযিল হইলে সাবেত বিন কায়স ছাহাবীর খুব ভয় হইল; তাঁহার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ খুব উচ্চ ছিল। তাই তিনি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হন না, বাড়ীতে থাকেন। কয়েক দিন ঐভাবে অতীত হইলে হযরত (সঃ) সা'দ-বিন-মোআয নামক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাবেতকে দেখি না কেন, তাহার কি অসুখ হইয়াছে? সা'দ বিন মোআয সাবেতের বাড়ীতে গমন করিলেন ও সাবেতকে হযরতের প্রশ্নের কথা জানাইলেন। সাবেত নিজের কণ্ঠস্বর ও সদ্য অবতীর্ণ উক্ত আয়াতের কথা উল্লেখ করিয়া নিজের নরকী হওয়ার আশঙ্কা জানাইলেন। সা'দ বিন মোআয সাবেতের আশঙ্কা প্রকাশ নবীজী (সঃ)-কে জ্ঞাত করিলেন। তিনি বলিলেন, বরং সে বেহেশতী।

খাঁ মরহুমের বক্তব্য, এই হাদীছটি সত্য হইতে পারে না- কারণ, ঘটনায় উল্লিখিত আয়াতটি নবম হিজরীতে নাযিল হয়, আর সা'দ বিন মো'আযের মৃত্যু হিজরী পঞ্চম সনে।

পাঠক! হাদীছখানাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার একটি ভিত্তি হইল, হাদীছটির আলোচ্য আয়াত নবম হিজরী সনে নাযিল হইয়াছে- এই বিষয়টি বিতর্কমূলক। প্রসিদ্ধ হাফেযে হাদীছ ইবনে হাজার (রঃ) ভিন্ন মতের অবকাশ দেখাইয়াছেন।

খাঁ মরহুম বোখারী শরীফ তফসীর অধ্যায়ের যে হাদীছের বরাত দিয়াছেন, বোখারী শরীফের উক্ত পৃষ্ঠায়ই হাফেয ইবনে হাজারের অবকাশ প্রকাশের সমর্থন বিদ্যমান রহিয়াছে। বিতর্কমূলক একটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া হাদীছকে অবাস্তব-অসত্য বলা ক্ষমাহীন অপরাধ নহে কি? আরও একটি বিষয় সুস্পষ্ট হইল যে, ৬০০ শত বৎসর পূর্বে বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) যে প্রশ্নের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন সেই প্রশ্নের মৃত লাশ বাহির করিয়া হাদীছ শাস্ত্রের অভিজ্ঞতাহীন বাংলাভাষী পাঠকদিগকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে- ইহা অপরাধ নহে কি?

হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) যে ধারায় প্রশ্নের খণ্ডন করিয়াছেন তাহা হাদীছ ও তফসীরের শাস্ত্রীয় অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। আমরা অন্য একটি সরল-সহজ পয়েন্ট পেশ করিতেছি– তাহাও পূর্ব আমলের গবেষকগণই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছখানা বোখারী শরীফের দুই স্থানে ৫১০ ও ৭১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে একই সনদ তথা সাক্ষ্য সূত্রে। মুসলিম শরীফে হাদীছখানা একই জায়গায় পর পর ৬টি সনদে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব হাদীছখানার মোট সাক্ষ্য সূত্র বা সনদ হইল পাঁচটি। পাঠক! ইহা একটি মহাসত্য যে, হাদীছকে তাহার আসল জায়গায় সরাসরিভাবে গবেষণা না করিয়া শুধু ধার করা জ্ঞানে তথা উদ্ধৃতি বা অনুবাদ দেখিয়া কোন হাদীছ সম্পর্কে মুখ খোলা মহাপাপ। এই মহাপাপের পরিণাম এখানে লক্ষ্য করুন। মরহুম খাঁ সাহেব একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও স্বভাব-জ্ঞানী ছিলেন। তিনি বোখারী শরীফ মূল গ্রন্থ হইতে দূরে থাকিয়া শুধু উদ্ধৃতি দেখার ধার করা জ্ঞানে দূর হইতেই ঢিল ছুঁড়িয়াছেন। নতুবা তিনি উল্লিখিত হাদীছের সমালোচনা করিতে বোখারী শরীফের নাম মুখে বা লিখনীতে আনিতেন না। কারণ, তাঁহার সমালোচনার দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল হাদীছটির বর্ণনায় সা'দ বিন মোআযের উল্লেখ; যেহেতু তাঁহার মৃত্যু হিজরী পঞ্চম সনে। পাঠক! শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, বোখারী শরীফের দুই স্থানে হাদীছখানা বর্ণিত, কিন্তু তাহার কোন স্থানেই সা'দ বিন মোয়াযের নাম নাই। বরং আছে فقال رجل انا اعلم অর্থাৎ নবীজী (সঃ) সাবেত বিন কায়সের আলোচনা করিলে এক ব্যক্তি বলিল, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আপনার জন্য তাঁহার সংবাদ জানিয়া আসিব।"

পাঠক! লক্ষ্য করুন– সমালোচনার ভিত্তিটাই যখন বোখারী শরীফের হাদীছে বিদ্যমান নাই, তখন সমালোচনার ক্ষেত্রে এরূপ বলা যে, "বোখারী ও মুসলিমে একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে"– ইহা কতটুকু ঈমানদারী তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

তারপর আসুন! মুসলিম শরীফে হাদীছখানার অবস্থা দেখুন! পূর্বেই বলা হইয়াছে– শুধু উদ্ধৃতি দেখার ন্যায় ধার করা জ্ঞানে হাদীছ সম্পর্কে কিছু বলা নিতান্তই অবান্তর। খাঁ মরহুমের সমালোচিত হাদীছখানা মুসলিম শরীফে চারিটি সনদ তথা সাক্ষ্য সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে উল্লেখ হইয়াছে ঐ সাক্ষীর বর্ণনা যাহার বর্ণনায় খাঁ মরহুমের সমালোচনার ভিত্তি বস্তু তথা "সা'দ বিন মোআয" নাম বিদ্যমান রহিয়াছে। পাঠক আশ্চর্যান্বিত হইবেন, মুসলিম (রঃ) বিভ্রান্তি হইতে সতর্ক ও হুঁশিয়ার করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যবস্থা রাখিয়াছেন তাহা হইতে খাঁ মরহুম নিজে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া এবং পাঠককে অজ্ঞ রাখিয়া সেই বিভ্রান্তিতে নিজেও পতিত হইয়াছেন এবং অপরকেও পতিত করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কেলেঙ্কারির একমাত্র কারণ হইল মুসলিম শরীফ মূলগ্রন্থ দেখার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকা।

দেখুন! মুসলিম শরীফে বিভ্রান্তি অবসানের কী সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে। একটি সাক্ষীসূত্রে ঐ সমালোচনার বস্তু সম্বলিত বিবরণ উল্লেখের সাথে সাথেই ঐ হাদীছটির অপর তিনটি সাক্ষ্যসূত্র বর্ণিত রহিয়াছে। এই সাক্ষীগণের বর্ণনায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে–

ليس فى حديثه ذكر سعدبن معاذ - لم يذكر سعدبن معاذ

"এই সাক্ষীর বর্ণনায় সা'দ-বিন-মোআযের উল্লেখ নাই। এই সাক্ষ্য সা'দ বিন মোআযের নাম উল্লেখ করেন নাই।" ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় প্রতীয়মান হইল যে, মূল হাদীছটির তথ্য অসত্য বা অপ্রকৃত বলা যাইতে পারে না। কারণ শুধু একজন সাক্ষীর বর্ণনায় একটি নাম উল্লেখের বিভ্রাট থাকিলেও অপর তিন জন সাক্ষীর বর্ণনায় ঐ বিভ্রাটমুক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

পাঠক! একটি ঘটনা সাব্যস্ত করিতে বাদী যদি পাঁচটি সাক্ষী পেশ করে– সে ক্ষেত্রে বিবাদী একটি সাক্ষীর বর্ণনায় দোষ দেখাইতে পারিলে ঘটনাটি মিথ্যা হইয়া যাইবে? ইমাম মুসলিম বিভ্রাট খণ্ডনের জন্য প্রথমে বিভ্রাটযুক্ত সাক্ষ্যসূত্র উল্লেখ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গেই বিভ্রাটমুক্ত তিনটি সাক্ষ্য সূত্র উল্লেখ করিয়া

প্রথমটির দোষ নির্ণয় এবং তাহার খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। ইহা কি তাঁহার দোষ হইল?

মুসলিম শরীফের চারি সাক্ষ্যসূত্র এবং বোখারী শরীফের এক সাক্ষ্য সূত্র– এই পাঁচটি সাক্ষ্যসূত্রের একটি সাক্ষ্যসূত্র বিতর্কমূলক; চারিটি সাক্ষ্য সূত্র সম্পূর্ণ নির্মল নির্দোষ, এমতাবস্থায় আইনে বা বিচারে কি উক্ত ঘটনা মিথ্যা বলার অবকাশ আছে?

অতপর সুধী মহল সম্মুখে আরও একটি তথ্য বিতর্কের জন্য নহে, বিচারের জন্য পেশ করিতেছি। একটি সাক্ষীর বর্ণনায় যে সা'দ বিন মোআযের নাম উল্লেখের বিভ্রাট রহিয়াছে তাহাও অতি নগণ্য। ছাহাবীগণের নাম পর্যালোচনায় দেখা যায়, ছাহাবীগণের মধ্যে একজন ছিলেন সা'দ বিন মোআজ, আর একজন ছিলেন আদ বিন মোআয, আর একজন ছিলেন সা'দ বিন ওবাদা।

আলোচ্য হাদীছের ঘটনার ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে ছিলেন সা'দ বিন ওবাদা, যাঁহার মৃত্যু নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনেক পরে। সুতরাং তাঁহার নামের বেলায় কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই। এখন ভাবিয়া দেখুন– ছাহাবীদের যুগে নহে; ইহারও পরে তথা ঘটনার অনেক বৎসর পরে একজন বিশিষ্ট জ্ঞানবান অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি সা'দ নামও ঠিক বলিয়াছিলেন, শুধু কেবল বিন ওবাদা স্থলে বিন মোআয বলিয়া পিতার নাম ব্যতিক্রম বলিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উক্ত সাক্ষীর বর্ণনা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে তিন জন সাক্ষীর বর্ণনা উল্লেখ করিয়া ঐ ব্যতিক্রমটা ধরাইয়াও দিয়াছেন। এখন শুধু ঐ ব্যতিক্রম পুঁজি করিয়া অন্য সব রকম দোষমুক্ত একটি সুদীর্ঘ হাদীছের সর্বময় বিবরণকে অপ্রকৃত ও অসত্য বলা এবং ইমাম মুসলিম কর্তৃক ব্যতিক্রমটা ধরাইয়া দেওয়ার কথা গোপন করিয়া বোখারী মুসলিমে অসত্য হাদীছ আছে বলা কত দূর ঈমানদারী তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

খাঁ মরহুম তাঁহার বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের জন্য পথ পরিষ্কারের উদ্দেশে খেয়াল-খুশীমত হাদীছ এন্‌কার-অস্বীকার করার জন্য "পরীক্ষার নূতন ধারা" নামে একট ফাঁদ তৈয়ার করিয়াছেন। মাকড়সার জালে তৈয়ারী সেই ফাঁদে তিনি বোখারী শরীফ মুসলিম শরীফের ন্যায় শক্তিশালী গ্রন্থাবলীর হাদীছ আটকাইতে যাইয়া দশটি নমুনা প্রমাণরূপে পেশ করিয়াছেন।

তাঁহার সবগুলি প্রলাপের উত্তর দিতে গেলে অহেতুক সময় অপচয়ের যাতনা পোহাইতে হয়। এতদ্ভিন্ন হাদীছ শাস্ত্র এবং বোখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বাংলাভাষী পাঠকদের চোখে তাঁহার প্রলাপগুলি পাণ্ডিত্য ও বাকপটুতার প্রলেপে সুন্দর দেখাইবে বটে, কিন্তু যেকোন খাঁটি আলেমের নিকট হইতে ঐ সব প্রলাপের সুষ্ঠু সুরাহা প্রত্যেকেই লাভ করিতে পারেন। যেমন– নবী (সঃ)-এর বয়সের সংখ্যার তিনটি হাদীছের কোন দুইটি অসত্যই মনে হইবে। কিন্তু তাহার খণ্ডন অতি সহজ। নবীজী (সঃ)-এর বয়স আলোচনায় আমরা তাহা দেখাইব।

হাদীছ মোটেই না বুঝিয়া, এমনকি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলীতে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মূলগ্রন্থ তলাইয়া দেখার যোগ্যতার অভাবে অজ্ঞ থাকায় যেসব প্রলাপের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দেখিলে ত গাত্রদাহ এবং ক্ষোভ ও ঘৃণা জন্মে। যথা–

বোখারী শরীফের একটি হাদীছ প্রথম খন্ডে ৪ নম্বরে অনূদিত– তাহাতে সূরা কেয়ামার একটি আয়াতের শানে নযুল বর্ণিত আছে। ওহী নাযিল হওয়ার প্রথম যুগে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভ্যাস ছিল, জিব্রীল ফেরেশতা ওহী পঠনকালে নবীজী (সঃ) তাহা শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট নাড়িয়া পড়িতে থাকিতেন। নবীজী (সঃ)-কে এই ক্লেশ হইতে মুক্ত করিতে এই আয়াত নাযিল হইল لا تحرك به لسانك

لتعجل به "তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্থ করার জন্য মুখ নাড়িয়া এই ওহী (সদ্য অবতারিত কোরআনের আয়াত)সমূহকে আপনার পড়িতে হইবে না; আমার দায়িত্বে থাকিল আপনাকে তাহা কণ্ঠস্থ করানো এবং পঠনের শক্তি দেওয়া।"

হাদীছে আছে, উক্ত বিবরণটি বর্ণনা করিতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্বীয় শার্গেদকে বলিয়াছেন, আমি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যেভাবে ঠোঁট নাড়িতে দেখিয়াছি সেইভাবে আমিও তোমাকে ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইব।

খাঁ মরহুম বুঝিয়াছেন– এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে যে নবীজী (সঃ) ওহী সংরক্ষণে ঠোঁট নাড়িতেন অর্থাৎ যেই ঠোঁট নাড়া উপলক্ষ করিয়া তাহা বন্ধ করার জন্য উক্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) যেই ঠোঁট নাড়াই দেখিয়াছিলেন বলিয়াছেন। এই বুঝের বশেই খাঁ মরহুম লাফাইয়া পড়িয়াছেন উক্ত হাদীছকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে এবং বলিয়াছেন যে, "সূরা কেয়ামা (উক্ত সূরার উল্লিখিত আয়াত) যখন নাযিল হইয়াছিল তখন ইবনে আব্বাসের জন্মই হয় নাই। অতএব উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে কোরআন নাযিল হওয়ার সময় হযরতের 'ঠোঁট নাড়া' দর্শন করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, সনদের হিসাবে হাদীছ সহীহ্ হওয়া সত্ত্বেও যুক্তির হিসাবে তাহা অগ্রাহ্য হইতে পারে।"

নিজের আন্দাজ না করিয়া বড় কথা বলার পরিণামে এইভাবে মানুষ বিড়ালের মূত্রে আছাড় খায়। খাঁ মরহুম এস্থলে নিজেই ভুল বুঝিয়াছেন এবং সেই ভুল বুঝের পরিণামে বোখারী শরীফের হাদীছকে অসত্য বলার অভিশাপে পতিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ হাদীছের সঠিক তাৎপর্যে সংশয়ের অবকাশ নাই। হাদীছটির তাৎপর্য এই–

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইহধাম ত্যাগের প্রাক্কালে ইবনে আব্বাস (রাঃ) পরিণত বয়সের নিকটবর্তী ছিলেন মাত্র; তবুও পবিত্র কোরআনের জ্ঞানে তিনি এতই পারদর্শী ও দক্ষ ছিলেন যে, খলীফা ওমর (রাঃ) পর্যন্ত কোরআনের জ্ঞান সম্পর্কে তাঁহার বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি দিয়া থাকিতেন (১৭১৯ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। ইবনে আব্বাসের এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম সূত্র ছিল এই যে, তিনি নবীজী (সঃ) হইতে কোরআনের আয়াতসমূহের জ্ঞান আহরণে সদা সর্বাধিক তৎপর ছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার সেই তৎপরতা ধারায় কোন একদিন সূরা কেয়ামার আলোচ্য আয়াতটি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট বুঝিতে চাহিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহাকে উক্ত আয়াতের মর্ম ব্যাখ্যা করিতে আদ্যপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বুঝাইলেন। তখন আয়াতটির শানে নযুল বা মূল উদ্দেশ্য– জিব্রাঈলের সঙ্গে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুখ নাড়িয়া পঠনের বিষয়টিও উল্লেখ করিলেন। এমনকি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে যে মুখ নাড়িয়া জিব্রাঈলের সঙ্গে সঙ্গে পড়িতেন, তাহার দৃশ্যও তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে দেখাইয়াছিলেন। সেই দেখানো প্রসঙ্গে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ঠোঁট নাড়িতে দেখিয়াছিলেন ইবনে আব্বাস (রাঃ)। পরবর্তীকালে ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্বীয় শার্গেদকে বলিয়াছেন, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে তাঁহার ঠোঁট নাড়ার দৃশ্য দেখাইবার সময় আমি তাঁহাকে যেইরূপে ঠোঁট নাড়িতে দেখিয়াছি, তোমাকেও আমি ঐরূপে ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইব। এই বলিয়া ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজ শার্গেদক ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইলেন। এমনকি পরম্পরা প্রত্যেক ওস্তাদ নিজ নিজ শার্গেদকে এই হাদীছ পড়াইতে ঐরূপে ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইয়াছেন। সুদীর্ঘ প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর যাবত এই হাদীছ শিক্ষাদানে ঐ ঠোঁট নাড়িবার নীতি বজায় রহিয়াছে। আমাদের ওস্তাদ আমাদিগকে তাহা দেখাইয়াছেন; আমরা আমাদের শার্গেদগণকে তাহা দেখাইয়া থাকি। এইভাবে এই হাদীছটির মধ্যে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি মোবারক স্মৃতি চৌদ্দ শত বৎসর হইতে চলমান রহিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই এই হাদীছখানাকে "মোসালসাল বি-তাহ্রীকিশ শাফাতাইন" অর্থাৎ ধারাবাহিকরূপে ঠোঁট নাড়িবার স্মৃতি বহনকারী হাদীছ বলা হয়।

হাদীছটির এই ব্যাখ্য নূতন আবিষ্কার বা খাঁ মরহুমের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত নহে। ছয় শত বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল বারীতে স্বয়ং ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর উক্তির প্রমাণ দ্বারা এই ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে।

অপবাদের আশ্রয়

খাঁ মরহুমের রচনাবলীতে বহু সত্যের অস্বীকৃতি রহিয়াছে। সত্যের শক্তি এত প্রবল যে, একটি সত্য অস্বীকার করিতে অনেক রকমের মিথ্যা জোটাইতে হয়। খাঁ মরহুমের দশা তাহাই হইয়াছে। সত্য শুদ্ধ সহীহ হাদীছ অস্বীকার করার অভিনব ফাঁদ– তিনি নাম রাখিয়াছেন "পরীক্ষার নূতন ধারা"। সত্য অস্বীকারের এই ফাঁদের ভিত্তিরূপে একটি মহা মিথ্যা জোটাইয়া আনিতে হইয়াছে তাঁহাকে। তিনি পূর্বতন মোহাদ্দেসবৃন্দের প্রতি ভিত্তিহীন অপবাদ ও মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাঁহারা হাদীছকে সহীহ-শুদ্ধ সাব্যস্ত করিতে শুধু সনদের যাচাই করিতেন; হাদীছের আভ্যন্তরীণ দার্শনিক দিক যাচাই করিতেন না।

খাঁ মরহুম নিজেই এক পরিচ্ছেদে " দেরায়াত"-এর আলোচনা করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন– আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম সমালোচনা এবং পূর্বতন বহু মোহাদ্দেসগণের এই পন্থার যাচাইয়ের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। দেখুন! তিনি নিজেই স্বীকার করিলেন, মোহাদ্দেসগণ হাদীছের আভ্যন্তরীণ যাচাইও করিতেন। এই স্বীকৃতির সম্মুখে পূর্বোল্লিখিত মিথ্যা অপবাদ টিকাইয়া রাখিতে চতুর খাঁ মরহুম স্বীকৃতির মধ্যে ফাঁক রাখিয়াছেন– হাদীছের আভ্যন্তরীণ যাচাই না করার দোষটা ছাহাবীদের পরে জমাট বাঁধা অন্ধকারময় মধ্যযুগীয় মোহাদ্দেসগণের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে।

খাঁ মরহুমের কথা মানিয়া প্রশ্ন করিব, ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম– তাহারা ত ১২০০ বৎসরের অধিক পূর্বের– ছাহাবীদের যুগের দেড় শত বৎসর ব্যবধানের মোহাদ্দেস। তাঁহাদের যাচাই-বাছাই করা হাদীছে আপনি বাড়াবাড়ি কেন করিলেন?

খাঁ মরহুমের যুক্তি ইহাও যে, পূর্বতন মোহাদ্দেসগণ হাদীছের আভ্যন্তরীণ যাচাই করিয়াছেন– তাহা দেখিয়া আমিও করিলাম। এই সীমাহীন ধৃষ্টতা খণ্ডনেও অনীহা সৃষ্টি হয়। সংক্ষেপে এই বলা যায়, পাঁচ-দশ লাখ হাদীছ কণ্ঠস্থকারী, হাদীছ গবেষণায় আজীবন সাধনাকারী মনীষীগণের ভূমিকায় আপনার অবতীর্ণ হওয়ার পরিণাম তাই, যেই পরিণাম বাঁদরের হইয়াছিল অভিজ্ঞ সূতার মিস্ত্রীর অনুকরণে অবতীর্ণ হইয়া।

খাঁ মরহুম তাঁহার উপক্রমণিকায় নীতি নির্ধারণরূপে অনেকগুলি কথাই 'নিয়ম' নামে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। কথাগুলি সুন্দর-সঠিক মনে হইবে, কিন্তু তাহা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি মণ ওজনের বস্তুকে ছটাকের পাত্রে রাখিতেন। যথা– "প্রথম নিয়ম কোরআনে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, কোন ইতিহাসে বা চরিত পুস্তকে– এমনকি হাদীছের রেওয়ায়াতেও যদি তাহার বিপরীত কোন কথা বর্ণিত হয় তবে কোরআনের বিপক্ষে অন্য সকল পুস্তকের বা রাবীর বর্ণনাকে আমরা অগ্রাহ্য-অবিশ্বাস্য বলিয়া নির্ধারণ করিব।" তাঁহার এই নিয়মের কথাটা খুবই সুন্দর ও সঠিক, কিন্তু প্রশ্ন হইল এই যে, বিপরীত হওয়াটা সাব্যস্ত করিবে কে এবং কিরূপ লোকে? খাঁ মরহুমের ন্যায় ভ্রান্ত মতবাদ ও মনোবিকারগ্রস্ত স্বল্প এলেমধারী লোককেও কোরআনের বিপরীত বিষয় সাব্যস্ত করার সুযোগ দেওয়া হইলে কোন নবীর কোন মোজেযা এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত ৫৩৭৪ খানা হাদীছ কোরআনের বিপরীত সাব্যস্ত হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। এই সত্যের একটি নমুনা লক্ষ্য করুন–

খাঁ মরহুম আবু হোরায়রা (রাঃ) ছাহাবীর প্রতি অত্যন্ত ক্ষেপা; ইহার কারণ জানা নাই। তাঁহাকে ঘায়েল করিবার জন্য খাঁ মরহুম অযথা তাঁহার হাদীছকে কোরআনের বিপরীত সাব্যস্ত করিতেন। যথা– আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীছ মুসলিম শরীফে আছে। তাহার বিষয় হইল– নবী (সঃ)-এর বয়ান যে, যমীন-আসমান এবং তাহার মধ্যস্থ পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ইত্যাদি আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করিয়াছেন শনিবার হইতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত, আর আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন শুক্রবার। খাঁ মরহুম এই হাদীছকে কোরআনের বিপরীত সাব্যস্ত করিয়া আবু হোরায়রা (রাঃ) ছাহাবীকে গাল-মন্দ করিতেন। খাঁ

মিয়া বলেন, উক্ত হাদীছ মতে সৃষ্টির দিনগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় ৭। অথচ পবিত্র কোরআনে ২১ পারা সূরা সেজদার ৪র্থ আয়াতে সৃষ্টির দিনের সংখ্যা সুস্পষ্টরূপে ৬ বলা হইয়াছে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) ছাহাবীর প্রতি মনোবিকারগ্রস্ত খাঁ মিয়া তলাইয়া দেখেন নাই যে, উক্ত আয়াতে আসমান-যমীন ও মধ্যবর্তী বস্তু সৃষ্টির দিনগুলিই উল্লেখ করা হইয়াছে, আদম সৃষ্টির কথা তাহাতে নাই, ফলে দিনের সংখ্যা তথায় ৬ হয়। পক্ষান্তরে আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিতে আদম সৃষ্টির একটি দিনও উল্লেখ হইয়াছে, তাই দিনের সংখ্যা ৭ হইয়াছে।

ইহা ত হাদীছ অগ্রাহ্য করার নমুনা। নবীর সীরাত শাস্ত্রের বিবরণ অগ্রাহ্য করার কাহিনী অধিক মর্মান্তিক এবং ইসলামের উপর বাঙ্গালী পণ্ডিতদের এইরূপ অত্যাচার একা আকরম খাঁ মরহুমের নহে, আরও অনেক আছেন। মরা লোকের গ্লানি করার ইচ্ছা হয় না, তবুও প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ মরহুমের কথা বলিতে হয়। তাঁহার মতবাদ ছিল যে, পরকালের মুক্তির জন্য ইসলাম সরল পথ বটে, একমাত্র পথ নহে; অথচ এইরূপ বিশ্বাসে ঈমান নষ্ট হয়। এই দ্বিতীয় খাঁ মরহুমের মৃত্যুমুখে হাসপাতালের জীবনে তাঁহার প্রবন্ধ পত্রিকায় আসিল। তিনি "মোহরে নবুয়ত" অস্বীকার করেন এই দলীলে যে, তাহা থাকিলে নবীজীর জননী বা দাই-মা তাহা অবশ্যই দেখিতেন এবং বয়ান করিতেন; তাঁহাদের হইতে ঐরূপ বর্ণনা নাই। বোখারী শরীফসহ হাদীছের ও সীরাতের কিতাবে প্রমাণিত বস্তুটি তিনি ঐ দলীল দ্বারা মুছিয়া দিলেন। কি দুঃখজনক দলীল! প্রথমতঃ মোহরে নবুয়ত নবীজীর জন্মের অনেক পর বা নবুয়ত প্রাপ্তি লগ্নে প্রকাশ হওয়ার মতামতই প্রবল। জন্ম হইতে থাকিলেও অতি ছোট ছিল, কেহ তাহার গুরুত্ব দেয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জননী বা দাই-মাতা হইতে হযরত সম্পর্কে এক-দুইটা কথা ছাড়া কিছুই বর্ণিত নাই। সুতরাং হযরতের কি কিছুই ছিল না! হাদীছে আছে, নবী (সঃ) অতি সুশ্রী সুন্দর ছিলেন। এই খাঁ মিয়ার দলীলে বলা যায় যে, তাহা ঠিক নহে; নতুবা জননী বা দাই-মা তাহা বয়ান করিতেন। এই দলীলে ত নবীজীর শত শত প্রমাণিত গুণ মুছিয়া ফেলা যাইবে।

এই হইল বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের হাল। তাঁহারা পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের বলে ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে কিছু বলেন নাই, যেহেতু তাহার অভিজ্ঞতা নাই। একমাত্র ইসলাম ও কোরআন-হাদীছই এমন লা-ওয়ারিস বস্তু যাহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছাড়া কথা বলা দোষ নহে। বাংলাভাষী জনসাধারণ ভাইদের ঈমান আল্লাহ তাআলাই হেফাযত করুন! আমীন।

————আজিজুল হক

সূচিপত্র

সূচি সমাপ্ত

জ্ঞাতব্য ও সতর্কবাণী

মহাগ্রন্থ বোখারী শরীফের অনুবাদ তথা বাংলা বোখারী শরীফের পঞ্চম খন্ড সীরাতুন নবী সঙ্কলনরূপে প্রকাশ করা হইল। মূল বোখারী শরীফে এই শিরোনামার কোন অধ্যায় নাই, এমনকি "নবী কাহিনী" যে অধ্যায় আছে তাহার অংশরূপেও নহে। তবে এই সঙ্কলনের এক মৌলিক পরিচ্ছেদ মূল বোখারী শরীফে রহিয়াছে। যথা– ৫০০ হইতে ৫১৩, ৫৪৩ হইতে ৫৬১ এবং ৬২৬ হইতে ৬৪১ পর্যন্ত পৃষ্ঠাসমূহে তাহার বিভিন্ন পরিচ্ছেদ বিক্ষিপ্ত আকারে রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত বিষয়ে বোখারী শরীফের বিভিন্ন স্থানে আরও অনেক হাদীছ রহিয়াছে।

নবী কাহিনী অধ্যায়ের অনুবাদ চতুর্থ খণ্ড লেখার পর নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আলোচনার প্রতি মন অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। মূল গ্রন্থের উল্লিখিত পৃষ্ঠাসমূহ তাহাতে অধিক উৎসাহ যোগাইল। কারণ, ঐ পৃষ্ঠাগুলির বিক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদসমূহ অনুবাদ করিলে উল্লিখিত প্রিয় আলোচনার বিরাট অংশ তাহাতে আসে। তাই অন্তরে আবেগ জন্মিল ক্রমিকবিহীন পৃষ্ঠাগুলি হইতে প্রিয় আলোচনার পরিচ্ছেদসমূহ ভিন্ন করিয়া একত্রে বিন্যস্তরূপে অনুবাদ করার।

এর সঙ্গে আর একটি দুঃসাহসের প্রতিও মন আকৃষ্ট হইল যে, নবীজী (সঃ)-এর ধারাবাহিক সুবিন্যস্ত আলোচনা– যাহা পূর্বাপর সীরাত সঙ্কলকগণ করিয়াছেন, তাহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা। ইহা করিতে যাইয়া বহু পরিচ্ছেদ ও বিষয় এমনও আলোচিত হইয়াছে যাহার উল্লেখ মূল বোখারী শরীফে নাই, এমনকি সে সম্পর্কে কোন হাদীছও বোখারী শরীফে নাই; অন্যান্য কিতাবে তাহার আলোচনা রহিয়াছে। নবীজী (সঃ)-এর মোবারক আলোচনাকে যথাসাধ্য পূর্ণাঙ্গ রূপ দানের মানসে আমি তাহা করিয়াছি। তাই একটি বিভ্রাট সৃষ্টির অভিযোগে আমি অপরাধী।

পবিত্র কোরআনের পরে বোখারী শরীফ সর্বোচ্চ; সাধারণ গ্রন্থাবলী বা তাহাতে বর্ণিত সব হাদীছ বোখারীর মর্যাদার নহে। সুতরাং আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি–

এই সঙ্কলনে মূল বোখারী শরীফের অতিরিক্ত যেসব বিষয় বা হাদীছ রহিয়াছে, যাচাই ছাড়া তাহার প্রামাণিকতা বোখারী শরীফের তুল্য নহে। অবশ্য প্রত্যেকটির প্রমাণ সঙ্গে রহিয়াছে।

যথাসাধ্য পার্থক্যের জন্য আমি একটি নিয়মের অনুসরণ করিয়াছি। যে সমস্ত পরিচ্ছেদ মূল বোখারী শরীফে আছে তাহা পৃষ্ঠা-নম্বরসহ বড় অক্ষরে রহিয়াছে। তদ্রূপ যেসব হাদীছ মূল বোখারী শরীফ হইতে অনূদিত, তাহার উপর ক্রমিক নম্বর রহিয়াছে। ক্রমিক নম্বরবিহীন যেসব হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে তাহা বোখারী শরীফের নহে।

—আজিজুল হক

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۰ وَالصَّلٰوةُ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সারা জাহানের প্রভু পরওয়ারদেগার।

وَالسَّلَامُ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ

দরূদ এবং সালাম সমস্ত নবী ও রসূলগণের প্রতি

خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِهِمْ وَاَفْضَلِهِمْ نَبِيِّنَا

বিশেষত ঃ নবী ও রসূলগণের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি- যিনি আমাদের নবী এবং

خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ۰ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সর্বশেষ নবী – তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতি

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের যত খাঁটি ও পূর্ণ অনুসারী হইবেন তাঁহাদের প্রতি।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

আয় আল্লাহ! আমাদিগকে সেই অনুসারী দলভুক্ত বানাইবেন নিজ কৃপাবলে, হে দয়াময়, সর্বাধিক দয়ালু!

اٰمِيْن ! اٰمِيْن !! اٰمِيْن

আমীন ! আমীন!! আমীন।

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ

كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ

বালাগাল উলা বিকামালিহী
কাশাফাদ্দোজা বিজামালিহী

حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ

صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ

হাসুনাত জামীউ খেছালিহী
ছাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী

مُحَمَّدٌ بَشَرٌ لَا كَالْبَشَرِ

بَلْ هُوَ يَاقُوْتَةٌ وَالنَّاسُ كَالْحَجَرِ

মুহাম্মাদুন বাশারুন লা কালবাশার
বাল হুওয়া ইয়াকুতাতুন ওয়ান্নাসু কাল্ হাজার

لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهٗ

بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر

লা- ইউমকিনুস সানাউ কাম্মা কানা হাক্কুহু
বা'দায খোদা বুযুর্গ তুয়ী কিচ্ছা মোখতাসার
সর্বোচ্চ শিখরে তিনি নিজ মহিমায়
কাটিল তিমির রাশি তাঁর রূপের আভায়
চরিত্র মাধুরী তাঁহার অতি মনোরম
তাঁহার 'পরে ও বংশ' পরে দরূদ ও সালাম
মুহাম্মদ মানুষ তবে যেমন মানুষ নন
পাথর মাঝে পরশমণি গণ্য তিনি হন
গরিমা তাঁহার বর্ণিবে কেউ এমন সাধ্য নাই
খোদার পরেই শ্রেষ্ঠ তিনি তুলনা তাঁহার নাই

বালাগাল উলা বিকামালিহী

কাশাফাদ্দোজা বিজামালিহী

সর্বপ্রথম সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

অনাদিরূপে এক আল্লাহ তাআলাই ছিলেন– অন্য কিছু বলিতে আর কিছুই ছিল না। আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নাই– এই শূন্যতার সমাপ্তি ঘটাইতে ইচ্ছা করিলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা।

যেমন– ওলীকুল শিরোমণি শায়খ মহিউদ্দীন ইবনে আরবী শায়খে আকবর (রঃ) কর্তৃক এলহামে প্রাপ্ত এবং পূর্বাপর ওলী ও সূফী তথা আধ্যাত্মিকতায় ধৈন্য মহানগণ কর্তৃক গৃহীত আল্লাহ তাআলার একটি বাণীতে উল্লেখ আছে–

كُنْتُ كَنْزاً مَخْفِيًا فَارَدْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ ـ

"আমার সত্তা (জানিবার কেহ না থাকায়) অজানা ছিল; আমার ইচ্ছা হইল (আমার গুণাবলীর মাধ্যমে আমাকে প্রকাশ করা)– আমাকে জানান। সেমতে আমি সৃষ্টি করি জগত।" (তফসীর রুহুল মাআনী পৃঃ ১৪–২১)

এই বাণীর মর্ম কোরআনের একটি আয়াত দ্বারাও সমর্থিত। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

مَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ ـ

"জিন এবং মানুষ এই দুইটি জাতিকে আমি একমাত্র আমার এবাদত বা গোলামী করার উদ্দেশে সৃষ্টি করিয়াছি।".

আল্লাহকে জানা ব্যতিরেকে আল্লাহর গোলামী হইতে পারে না। আর আল্লাহকে জানা এবং আল্লাহর মা'রেফত তথা আল্লাহর গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করা– ইহার সাথে আল্লাহর এবাদত-গোলামী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতএব প্রথম বাণীটির এবং এই আয়াতের মর্ম নিতান্তই অভিন্ন।

নিজকে জানান, নিজের গোলামী করান– আল্লাহ তাআলার এই ইচ্ছার বাস্তবায়নে জগত সৃষ্টির শুভ প্রারম্ভেই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করিলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সৃষ্টি-মূল নূরকে। এই নূরকেই পরিভাষায় বলা হইয়া থাকে "হাকীকতে মুহাম্মদিয়া"। (যোরকানী, ১–২৭)

এই নূর বা হাকীকতে মুহাম্মদিয়া বলিতে কাহারও মতে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পবিত্র রূহ বা আত্মা উদ্দেশ্য। আর কাহারও মতে অন্য কোন বাস্তব বস্তুবিশেষ উদ্দেশ্য (যোরকানী ১–৩৭)। অথবা ঐ পবিত্র রূহ বা আত্মারই বাহন, কিন্তু পদার্থীয় দেহ নহে, বরং হয়ত এক বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব– যাহার প্রতিবিম্বের বিকাশ ছিল হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জাগতিক নশ্বর দেহ।*

এই হাকীকতে মুহাম্মদিয়াই হইল নিখিল সৃষ্টিজগতের সর্বপ্রথম সৃষ্টি। লৌহ-কলম, বেহেশত্-দোযখ, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, ফেরেশতা এবং মানব-দানব সব কিছুই ঐ হাকীকতে মুহাম্মদিয়া বা নূরে মুহাম্মদীর পরে সৃষ্টি হইয়াছে। এই তথ্য সুস্পষ্টরূপে বিশিষ্ট ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَىْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ

* প্রথম খণ্ড "কবরের আযাব" পরিচ্ছেদে জেসমে মেসালী বা জ্যোতির্দেহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষেরই ঐ দেহ আছে; ঐ শ্রেণীর কোন বাহন হওয়া বিচিত্র নহে। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) তাঁহার সীরাত সঙ্কলন 'নশ্‌রুত্তীব' কিতাবে নিজ সংযোজিত টীকায় নূরে মুহাম্মদীকে রূহে মুহাম্মদী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّىٌّ وَلَا اِنْسِىٌّ (رواه عبد الرزاق)

অথ ঃ "জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি একদা আরজ করিলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার চরণে উৎসর্গ হউক; সকল বস্তুর পূর্বে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কোন্ জিনিসটি সৃষ্টি করিয়াছেন? রসূল (সঃ) বলিলেন, হে জাবের! আল্লাহ তাআলা সকল বস্তুর পূর্বে সর্বপ্রথম তোমাদর নবীর নূর সৃষ্টি করিয়াছেন (যাহা) আল্লাহর (বিশেষ কুদরতে সৃষ্ট) নূর হইতে। অতঃপর সেই নূর আল্লাহর কুদরতে আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীনে চলমান ছিল। ঐ সময় লওহ-কলম, বেহেশত-দোযখ, আসমান- যমীন, চন্দ্র-সূর্য, মানব-দানব এবং ফেরেশতা কিছুই ছিল না।"

(যোরকানী, ১-৪৬)

সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন যোগ্যতায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সকলের ঊর্ধ্বে শীর্ষস্থানের অধিকারী ছিলেন

উপরোল্লিখিত আল্লাহ প্রদত্ত এলহামী বাণী ও তাহার সমর্থনে আয়াতের মর্ম ইহাই ছিল যে, "আল্লাহকে জানিবে, আল্লাহর গোলামী করিবে এই উদ্দেশেই সৃষ্ট জগতের সৃষ্টি।" সুতরাং সাধারণ নিয়ম মতেই আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রথম সৃষ্টি হযরত মুহামদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ঐ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের যোগ্যতায় সকলের ঊর্ধ্বে শীর্ষস্থানের অধিকারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বোখারী শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে, নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন-

اِنَّ اَتْقَاكُمْ وَاَعْلَمَكُمْ بِاللّٰهِ اَنَا ـ

"আল্লাহকে ভয় করায় এবং আল্লাহকে জানায় আমি তোমাদের তথা নিখিল সৃষ্টির সকলের ঊর্ধ্বে।" আল্লাহকে যে যত বেশী ভয় করিবে, সে তাঁহার তত বেশী গোলামী করিবে।

আল্লাহকে জানা তথা আল্লাহর মা'রেফতের আধার এবং আল্লাহর গোলামীর প্রকৃষ্ট নমুনারূপে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে তথা তাঁহার মূল সত্তা সকল সৃষ্টির আগে সৃষ্টি করিয়া মূলতঃ ইহাই প্রতীয়মান করিয়াছেন যে, আল্লাহর মা'রেফতের ধারা এই আধার হইতেই প্রবাহিত হইবে। নিখিল সৃষ্টি সেই প্রবাহের ধারা হইতেই আল্লাহর মা'রেফত লাভ করিবে। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর মা'রেফতের দ্বারা লাভে ধৈন্য হওয়া একমাত্র সেই আধারের সংযোগেই সম্ভব। সেই আধারের সংযোগ ব্যতিরেকে কোন সৃষ্টিই সৃষ্টির উদ্দেশ্য তথা আল্লাহকে সঠিকরূপে জানায় ধন্য হইতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে সঠিকরূপে জানা হইতে যাহারা বঞ্চিত, তাহারা বস্তুত সৃষ্টির উদ্দেশ্য বানচালকারী। তাহারা পরকালে জাগতিক জীবনের কর্মভোগ স্থলে সৃষ্টিকর্তার করুণাভাজন হইয়া তাঁহার পুরস্কার লাভে ধন্য হওয়ার যোগ্য হইতে পারে না, তাহাদের জন্য সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ-কেন্দ্র নরক অবধারিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাই হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সংযোগ ছাড়া পরকালের মুক্তি লাভ হইবে না।

তদ্রূপ আল্লাহর গোলামীর রূপরেখা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হইতেই প্রকাশিত হইবে। কারণ, তিনিই স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আল্লাহর গোলামীর নির্ধারিত নমুনা।

আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে (আল্লাহর গোলামী বাস্তবায়নের) সুন্দর নমুনা রাখা হইয়াছে ঐরূপ প্রত্যেকের জন্য, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালের মুক্তির আশা রাখে।" (পারা- ২১; রুকু- ১৯)

অতএব তাঁহার আদর্শে ও তাঁহার শিক্ষানুযায়ী আল্লাহর গোলামী না করা হইলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং আখেরাতে মুক্তিলাভ সম্ভব হইবে না।

প্রকাশ থাকে যে, বিশ্ব-বুকে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের পরে ত তাঁহার প্রতি ঈমান গ্রহণপূর্বক তাঁহার সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে, অবশ্য তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে অন্যান্য নবীগণের উম্মত হইয়া সেই নবীর মাধ্যমে উক্ত সংযোগ স্থাপিত হইত। সম্মুখের একটি শিরোনামে প্রতীয়মান হইবে যে, নবীগণের সকলের নবুয়তের উৎসই নবী মুহাম্মদ (সঃ)।

সৃষ্ট জগতের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্নরূপে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সৃষ্টির সূচনা করিয়া আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে সর্বাধিক প্রিয় এবং ভালবাসার ও আদরের পাত্র বানাইয়াছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র

কোন শিল্পী নিজ দক্ষতায় সুন্দর গঠনের একটি জিনিস তৈয়ার করে; তাহা এতই সুন্দর হয় যে, স্বয়ং গঠনকারী শিল্পী তাহারই হাতে গঠিত জিনিসটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, সে তাহাকে আদর করে, ভালবাসে।

তদ্রূপ মহান আল্লাহ হাকীকতে মুহাম্মদিয়াকে সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন, তাহাকে ভালবাসেন, সর্বাধিক আদরের পাত্র বানাইয়া নেন।

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنِّىْ قَائِل قَوْلاً غَيْرَ فَخْرٍ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَمُوْسٰى صَفِىُّ اللّٰهِ وَاَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "আমি একটি কথা বলিতেছি; ফখর বা গর্ব করা উদ্দেশ্য নহে। ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (অর্থাৎ তিনি আল্লাহকে দোস্ত বানাইয়াছিলেন), মূসা সফিউল্লাহ (অর্থাৎ তিনি আল্লাহ কর্তৃক বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত), আর আমি হাবীবুল্লাহ (অর্থাৎ আমাকে স্বয়ং আল্লাহ তাঁহার দোস্ত বানাইয়াছেন– ভালবাসিয়াছেন)। –(মেশকাত শরীফ)

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ মাহবুব, সর্বাধিক প্রিয়– এই সত্যের প্রকাশ ভঙ্গিমায় পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত লক্ষণীয়–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ

অর্থ ঃ "আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাকে ভালবাস– ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাও তবে আমার অনুসরণ তোমাদের করিতে হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে (শুধু ইহাই প্রতিপন্ন হইবে না যে, তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, বরং) আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তোমাদেরকে ভালবাসিবেন।" (পারা–৩, রুকু–১২)

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হাবীবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তাঁহাকে দোস্ত বানাইয়াছেন; আল্লাহ তাঁহাকে ভালবাসেন– তাঁহার প্রতি আল্লাহ তাআলার ভালবাসা এতই প্রগাঢ় যে, তাঁহার অনুসারীকেও আল্লাহ তাআলা ভালবাসিয়া থাকেন– স্বীয় হাবীব গণ্য করেন।

অন্য আয়াতে আছে مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ "যেব্যক্তি আল্লাহর রসূলের তাবেদারী করিবে সে আল্লাহর তাবেদার সাব্যস্ত হইবে।"(পারা-৫, রুকু-৮)

নিখিল সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিকাশ সাধন

শিল্পীর নিজ হাতে গড়া বস্তু তাহার দক্ষতায় এতই সুন্দর ও মনোরম হয় যে, স্বয়ং শিল্পী তাহার ভালবাসায় মুগ্ধ হয়। এমনকি শিল্পী প্রদর্শনী করিয়া তাহার গুণ-গরিমার প্রচার-প্রসার করে। আল্লাহ তাআলাও হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ক্ষেত্রে তাহাই করিয়াছেন।

আল্লাহকে চেনা ও আল্লাহর গোলামী করা- ইহার যোগ্যতা ও গুণ, বৈশিষ্ট্য দানে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে (তাঁহার মূল সত্তা হাকীকতে মুহাম্মদিয়া) সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাকে চরম ভালবাসা ও আদরের উচ্চ মর্যাদায় ধন্য করিয়া তাঁহার প্রদর্শনীর ইচ্ছা করিলেন। প্রদর্শনীর মাধ্যমেই তাঁহার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য-গুণের প্রচার ও প্রসার হইবে এবং সৃষ্ট-জগত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হইবে।

আল্লাহকে চেনা তথা তাঁহার অসীম গুণাবলীর মারফতে তথা অনুধাবনে ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বের ঊর্ধ্বে পৌঁছা এবং আল্লাহর গোলামী বা এবাদতের অসংখ্য স্তর ধীরে ধীরে আয়ত্ত করা- ইহার একমাত্র পাত্র মানুষ ও জিন জাতিদ্বয়। এই জাতিদ্বয়ের জীবন যাপনের জন্য ইহজগতের সমুদয় সৃষ্টির প্রয়োজন। এই জাতিদ্বয় তাহাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য আল্লাহকে চেনা ও আল্লাহর গোলামী করা- এই দায়িত্ব পালন করিলে পুরস্কার লাভের জন্য বেহেশত এবং পালন না করিলে শাস্তির জন্য দোযখ তথা পরজগতের সব কিছু সৃষ্টির প্রয়োজন।

সৃষ্ট জগত সৃষ্টির মূল উদ্দেশের কেন্দ্ররূপে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মূল সত্তা সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ তাআলা তাহার প্রদর্শনীর জন্য উল্লিখিত ধারা পরম্পরায় ইহজগত ও পরজগতসহ কুল-মখলুকাত তথা অসংখ্য অগণিত চিজ-বস্তু সৃষ্টি করিলেন। এই তথ্যের ইঙ্গিতই নিম্নে বর্ণিত হাদীছদ্বয়ে উল্লেখ হইয়াছে।

হাদীছ ঃ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হইতে বর্ণিত আছে-

اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى عِيْسٰى اٰمِنْ بِمُحَمَّدٍ وَمُرْ اُمَّتَكَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِهٖ فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ اٰدَمَ وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ ـ (رواه الحاكم)

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী মারফত আদেশ পাঠাইয়াছিলেন, মুহাম্মদের প্রতি আপনি ঈমান গ্রহণ করিবেন এবং স্বীয় উম্মতকে আদেশ করিবেন- তাহারা যেন (বর্তমানে আপনার মুখে শুনিয়া এবং পরবর্তীতে তাঁহার আবির্ভাব হইলে) তাঁহার প্রতি ঈমান আনে। মুহাম্মদ (-এর বিকাশ সাধন ইচ্ছা) না হইলে আদমকেই সৃষ্টি করিতাম না, বেহেশতও সৃষ্টি করিতাম না, দোযখও সৃষ্টি করিতাম না। (যোরকানী, ১-৪৪)

হাদীছ ঃ সালমান ফারেসী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন-

هَبَطَ جِبْرِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اِنْ كُنْتَ اتَّخَذْتُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً فَقَدِ اتَّخَذْتُكَ حَبِيْبًا ـ وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَكْرَمُ عَلَىَّ مِنْكَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ

الدُّنْيَا وَاَهْلَهَا لِاُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِيْ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا . (رواه عساكر)

অর্থ ঃ "একদা জিব্রাঈল (আঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনার প্রতিপালক সংবাদ পাঠাইয়াছেন– ইহা সত্য যে, ইব্রাহীম আমাকে দোস্ত বানাইয়াছিলেন, আমি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনাকে স্বয়ং আমি দোস্ত বানাইয়াছি। আমার নিকট আপনার চেয়ে সম্মানী কোন কিছু আমি সৃষ্টি করি নাই। আর আমি শপথ করিয়া বলিতেছি– বিশ্ব এবং উহার সব কিছু আমি সৃষ্টি করিয়াছি এই উদ্দেশে যে, তাহাদের নিকট প্রকাশ করিব আপনার গৌরব এবং আমার নিকট আপনার যে কত মর্যাদা। আপনার বিকাশ সাধনের ইচ্ছা না হইলে আমি বিশ্ব সৃষ্টি করিতাম না।"

(ইবনে আসাকের, ১–৬৩)

বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে উর্ধ্ব জগতে হযরতের নবুয়তপ্রাপ্তি

কাহাকেও কোন পদে নিযুক্তির তিনটি পর্যায় আছে– যেমন চাকুরীর জন্য– (১) বাছাই করা। (২) চাকুরী প্রদান করা। (৩) কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ করা। কোন সময় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়দ্বয় এক সঙ্গেই হয়, আর কোন সময় উভয়ের মধ্যে ব্যবধান হইয়া থাকে।

সকল নবীরই নবুয়তের জন্য নির্বাচন ও বাছাই করা আদিকালে আল্লাহ তাআলার নিকট সম্পন্ন করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা শুধু প্রথম পর্যায়ের ছিল। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছাড়া অন্য সকল নবীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়দ্বয় একই সঙ্গে তাঁহাদের আবির্ভাবকালে সম্পন্ন হইয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ছিলেন এবং উহা তাঁহার জন্য এক অসাধারণ গৌরব ও বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার বেলায় তৃতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান তাঁহার আবির্ভাবকালে হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান বহু বহু পূর্বে, এমনকি সারা বিশ্ব ও বিশ্বের আদি পিতা আদম আলাইহিস্ সালামেরও সৃষ্টির পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছিল।* হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর এই বিশ্ব-ভুবন এবং হযরত আদমেরও সৃষ্টির পূর্বে উর্ধ্ব জগতে নবীরূপে বিঘোষিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই একক বৈশিষ্ট্য নিম্ন হাদীছে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে।

হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ (رواه الترمذى فى سننه) .

অর্থ ঃ "ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন্ সময়ে নিশ্চিতরূপে আপনার নবুয়ত লাভ হইয়াছিল? রসূল (সঃ) বলিলেন, যে সময়ে আদম তাঁহার আত্মা ও দেহের সম্মিলনে পয়দাও হইয়াছিলেন না।" অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পূর্বে। এই তথ্যটি আরও কতিপয় হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে। যথা– এরবাজ ইবনে সারিয়া (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এবং মায়সারা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে।

এই তথ্য "যোরকানী" ১–৩৮ এবং "নশরুত্তীব" ৬ পৃষ্ঠার টীকা হইতে গৃহীত। উক্ত টীকায় এই তথ্যটি দৃষ্টান্তের দ্বারা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং উক্ত টীকাটি মূল কিতাবের সঙ্কলক মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহির নিজস্ব হওয়ার চিহ্ন রহিয়াছে।

(যোরকানী, ১-৩১, ৩২)

আরশ কুরসীতে "মুহাম্মদ (সঃ)"-এর নাম এবং তাঁহার নবুওতের প্রচার

আদম সৃষ্টিরও পূর্বে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এমনকি তাঁহার নাম এবং তিনি যে আল্লাহ তাআলার রসূল তাহা ঊর্ধ্ব জগতের সর্বত্র বিঘোষিত হইতেছিল এবং মহান আরশের গায়ে তাঁহার নাম-পরিচয় এবং "রসূলুল্লাহ" খেতাব লিখিত ছিল। এই তথ্য একাধিক হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে। যেমন-

হাদীছ ঃ ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন)-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اقْتَرَفَ اٰدَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ يَارَبِّ اَسْاَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اِلاَّ مَا غَفَرْتَ لِىْ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاٰدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ اَخْلُقْهُ قَالَ يَا رَبِّ لاَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِىْ بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِىَّ مِنْ رُّوْحِكَ رَفَعْتُ رَاْسِىْ فَرَاَيْتُ عَلٰى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَعَلِمْتُ اَنَّكَ لَمْ تَضِفْ اِلٰى اسْمِكَ اِلاَّ اَحَبَّ الْخَلْقِ اِلَيْكَ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى صَدَقْتَ يٰاٰدَمُ اِنَّهٗ لاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَىَّ وَاِذَا سَاَلْتَنِىْ بِحَقِّهٖ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ (رواه البيهقى)

অর্থ ঃ "রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আদম (আঃ) আল্লাহর নিষিদ্ধ কার্যে ভুল করার পর একদা তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে এইরূপে দোয়া করিলেন- হে পরওয়ারদেগার! মুহাম্মদের উসিলা ধরিয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করি, আপনি অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করিবেন। তখন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মদকে কিরূপে চিনিতে পারিয়াছ, অথচ এখনও আমি তাঁহার (প্রকাশ্য) দেহ তৈয়ার করি নাই? আদম (আঃ) বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! যখন আমাকে আপনার বিশেষ কুদরতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও আপনার সৃষ্ট আত্মা আমার ভিতরে প্রবেশ করাইয়াছেন তখন আমি মাথা উঠাইবা মাত্র আরশের পায়াসমূহে লেখা দেখিয়াছি- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ"। আমি তখন ভাবিয়াছি, আপনার সর্বাধিক ভালবাসার সৃষ্টি না হইলে আপনার নামের সহিত (এই নাম) জড়িত করিতেন না। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হে আদম! তুমি সত্য বিষয়ই ভাবিয়াছ। নিশ্চয় মুহাম্মদ আমার সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি। তুমি তাঁহার উসিলা ধরিয়াছ, অতএব আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। মুহাম্মদের বিকাশ সাধন করার ইচ্ছা না হইলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করিতাম না। (যোরকানী, ১-৬২)

বিশ্ব-ধরাকে মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবযোগ্য করার ব্যবস্থায় তাঁহার নূরের আভা নিয়া পূর্ববর্তী নবীগণের আগমন

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবযোগ্য বিশ্ব গঠনে জরুরী পর্যায়ে কতিপয় বিশেষ গুণ প্রতিভা প্রয়োজন- (১) সত্য গ্রহণে নির্ভীক অদম্য সাহসী হওয়া; যেন সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় সৎসাহসের মদদে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণ করায় নির্দ্ধিধায় অগ্রসর হইতে পারে। (২) সত্যের উপর দৃঢ় থাকায় পর্বত অপেক্ষা অধিক অটল-অনড়

হওয়া, যেন ঐ শিক্ষা ও আদর্শ আঁকড়াইয়া থাকায় জুলুম-অত্যাচার, ঝড়-তুফান চুল পরিমাণও বিচ্যুত করিতে না পারে। (৩) সত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে বীরত্বের সহিত ত্যাগ তিতিক্ষা এবং আত্মোৎসর্গে অগ্রসর হইতে থাকা, যেন ঐ শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার-প্রতিষ্ঠিত করায় বিরোধী শক্তির বাধায় প্রতিহত হইতে না হয়। (৪) সত্যকে স্থায়ী করার চেষ্টা ও পরিকল্পনায় সচেতন, বিজ্ঞ সুকৌশলী হওয়া, যেন ঐ শিক্ষা ও আদর্শ বিশ্ব বুকে কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখায় বিরামহীন প্রচেষ্টা ও মেহনতে ব্রতী হইতে পারে।

এই শ্রেণীর গুণাবলী ও যোগ্যতার পরিবেশেই হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব সার্থক হইতে পারে। মানব সমাজে ঐ শ্রেণীর গুণ ও যোগ্যতা আনয়ন উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার বা আরও বেশী নবী-রসূল এই ধরায় পাঠাইয়াছিলেন।

উল্লিখিত শ্রেণীর অসংখ্য গুণাবলী ও যোগ্যতার মূল আধার-আকর বানাইয়াছিলেন আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-কে এবং তাঁহার মূল সত্তা– নূর বা হাকীকতে মুহাম্মদিয়ার মধ্যে ঐ সমস্ত গুণের উৎস প্রোথিত ছিল। যেরূপে আল্লাহর কুদরতে ডিমের কুসুমে মোরগ-মুরগীর দেহের হাড়, গোশত চোখ, কান, ঠোঁট, নখ সবই প্রোথিত থাকে।

পূর্ববর্তী সকল নবী পরম্পরা বিশ্ব-বুকে আসিয়াছেন এবং বিরামহীন প্রচেষ্টা ও মেহনত চালাইয়া মানব সমাজে ঐ গুণাবলী ও যোগ্যতা আনয়ন করায় ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদেরও মূল সম্বল উক্ত নূরেরই আভা ছিল।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রশংসা ও অসাধারণ মান-মর্যাদা রচনায় ৮৫০-এর অধিক বৎসর পূর্বের একটি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কাব্য পুস্তিকা প্রচলিত আছে– "কাসীদাহ বোরদাহ"। উক্ত কবিতায় দুইটি পংক্তি এই আলোচনায় লক্ষণীয়–

وَكُلُّ اٰىٍ اَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا ـ فَاِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُّوْرِهٖ بِهِمْ ـ

"সম্মানিত রসূলগণ যত বৈশিষ্ট্যের পাত্র ছিলেন– বস্তুতঃ তাঁহাদের মধ্যে ঐসব বৈশিষ্ট্য হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নূর হইতেই আসিয়াছিল।"

পরবর্তী পংক্তিতে উল্লিখিত সত্যের সুন্দর দৃষ্টান্ত দানে বলা হইয়াছে–

فَاِنَّهٗ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا ـ يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِىْ ظُلَمٍ ـ

"হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হইলেন সকল গুণের আধার– সূর্য, আর সকল নবী ঐ সূর্যকেন্দ্রিক নক্ষত্রসমূহ। ঘোর অন্ধকারে লোকদের জন্য নক্ষত্রসমূহ সূর্যেরই আলো প্রকাশ করে। (অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিতে আলো নক্ষত্র হইতে দেখা গেলেও বস্তুতঃ ঐ আলো সূর্য হইতে।)"

পূর্ববর্তী নবীগণের প্রচেষ্টায় মানব সমাজে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয় ঐ গুণাবলী ও যোগ্যতা এবং উহার সর্বোত্তম যুগ দেখা দিলে সেই যুগে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব হয়। এই মর্মে বোখারী শরীফেরই একটি হাদীছ "সর্বোত্তম যুগে হযরতের আবির্ভাব" শিরোনামে অনূদিত হইবে।

পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর প্রতি মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে নির্দেশ

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশেই আল্লাহ তাআলা এই বিশ্ব-ভুবন সৃষ্টি করিলেন। সেমতে এই

বসুন্ধরাকে হযরত (সঃ)-এর আবির্ভাব ক্ষেত্ররূপে উপযোগী করার উদ্দেশে ধাপে ধাপে উহাকে মার্জিত করার জন্য এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এই বিশ্বে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত হন। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে কেন্দ্র করিয়াই সকল নবীর আগমন।

জাগতিক কার্য ব্যবস্থায় দেখা যায়– একটি দেশকে কেন্দ্র করিয়া তাহার প্রেসিডেন্ট, গভর্নর ও মন্ত্রী পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়; সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে ঐ দেশ ও উহার শাসন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করা হয়। তদ্রূপ যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত নবী এই ধরায় আসিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের মনোনয়ন বা নিয়োগ তথা আবির্ভাবলগ্নে তাঁহাদের প্রত্যেক হইতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছে।

ইহা পবিত্র কোরআন বর্ণিত সত্য–

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ

لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ .... قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ـ

“**স্মরণীয় ঘটনা** ঃ আল্লাহ তাআলা সমস্ত নবীগণ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, আপনাদেরকে কিতাব এবং শরীয়ত যাহাই দান করি তারপর আসিবে আপনাদের নিকট এক রসূল– যিনি আপনাদের নিকটস্থ কিতাবের বাস্তবতা প্রমাণকারী হইবেন; (যেহেতু তাঁহার আগমনের অগ্রিম সংবাদ আপনাদের কিতাবে থাকিবে, অতএব তাঁহার আগমন দ্বারা আপনাদের কিতাবের বাস্তবতা প্রমাণিত হইবে। তিনি আপনাদের বর্তমানে আসিয়া গেলে) আপনারা তাঁহার প্রতি অবশ্যই ঈমান গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার সাহায্য-সহায়তা করিবেন। (অঙ্গীকারের এই বিষয়বস্তু উল্লেখপূর্বক) আল্লাহ তাআলা নবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, আপনারা অঙ্গীকার করিলেন ত এবং উক্ত বিষয়-বস্তুর উপর আমার কঠোর আদেশ গ্রহণ করিলেন ত? নবীগণ সকলে বলিলেন, আমরা অঙ্গীকার করিলাম। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আপনারা (নিজেরাই নিজেদের উপর) সাক্ষী থাকুন; আমিও আপনাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে থাকিলাম। (এই অঙ্গীকারে উম্মতগণও শামিল হইবে) এই অঙ্গীকারের পর যে ফিরিয়া যাইবে সে অন্যায়কারী গণ্য হইবে।”

(পারা– ৩; রুকু– ৬)

- উল্লিখিত আয়াতে সমস্ত রসূলগণ হইতে ঈমান ও সাহায্যের উক্ত কঠোর অঙ্গীকার যেই রসূল সম্পর্কে লওয়া হইয়াছিল তিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। তফসীরে জালালাইন ও বিভিন্ন তফসীরে ইহা সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।
- উল্লিখিত অঙ্গীকার গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল আলমে আরওয়াহ বা আত্মার জগতে। যেখানে ইহজগতের ভাবী মানবগুষ্ঠি সকল হইতে আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বের অঙ্গীকার গ্রহণের অনুষ্ঠান হইয়াছিল– যাহার সুস্পষ্ট আলোচনা সূরা আ'রাফ ১৭ নং আয়াতে রহিয়াছে।

অথবা প্রত্যেক নবী হইতে তাঁহার আবির্ভাবকালে ওহী মারফত ঐ অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছিল।

(বয়ানুল কোরআন)

নবীগণের এই অঙ্গীকার তাঁহাদের নিজ নিজ উম্মতের উপর অবশ্যই কঠোরভাবে বর্তিবে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক নবী নিজ নিজ উম্মত হইতে এই অঙ্গীকার লইয়াছিলেনও বটে।

পূর্ববর্তী নবীগণ হইতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণের বিষয়টি আলী (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও বর্ণিত রহিয়াছে। যাহার বিবরণ এই–

لَمْ يَبْعَثِ اللّٰهُ نَبِيًّا مِّنْ اٰدَمَ فَمَنْ بَعْدَهٗ اِلَّا اَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ فِىْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ وَيَأْخُذُ الْعَهْدَ بِذٰلِكَ عَلٰى قَوْمِهِ

(رواه ابن كثير فى تفسيره وابن عساكر)

অর্থ ঃ "আদম (আঃ) এবং তাঁহার পরবর্তী যত নবীকে ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবদ্দশায় যদি ধরাপৃষ্ঠে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব হয়, তবে তিনি স্বয়ং অবশ্যই তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিবেন এবং তাহার সমর্থন সহায়তা করিয়া চলিবেন। আর প্রত্যেক নবীও স্বীয় উম্মত হইতে মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে ঐরূপ অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া যাইতেন।

(যোরকানী, ১-৪০)

এই জন্যই ত রসূলুল্লাহ (সঃ) বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছেন-

لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ اِلاَّ اِتِّبَاعِىْ -

অর্থ ঃ "এই যুগে মূসা পয়গম্বর জীবিত থাকিলে তাঁহার জন্য আমার আনুগত্য-অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকিত না।" (মেশকাত শরীফ)।

"মাওয়াহেবে লুদুনিয়্যাহ্" কিতাবে উক্ত তথ্য বর্ণনার পর উল্লেখ আছে , এই তথ্যের অনিবার্য অর্থ ইহাই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শুধু তাঁহার উম্মতের নবীই ছিলেন না, তিনি সমস্ত নবীগণেরও নবী ছিলেন। ইহারই প্রতিফলন এবং বিকাশ সাধন হইবে কেয়ামতের দিন। আদম (আঃ) এবং তৎপরবর্তী সকল নবীই ঐদিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পতাকাতলে সমবেত থাকিবেন। নিম্নবর্ণিত তিরমিযী শরীফের হাদীছে তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে-

مَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ اٰدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ اِلاَّ تَحْتَ لِوَائِىْ -

অর্থ ঃ "কেয়ামতের দিন আদম (আঃ) এবং তিনি ছাড়া আরও যত নবী আছেন সকলেই আমার পতাকাতলে থাকিবেন।"

পূর্বাপর সকল মানুষ, জিন ও ফেরেশতাগণের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

উল্লিখিত আয়াতের মর্ম এবং আলী (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বিশ্ব ভুবন সৃষ্টির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষেরই নবী। কারণ, উক্ত তথ্য অনুযায়ী আদম (আঃ) এবং তাঁহার পরবর্তী প্রত্যেক নবীই স্বয়ং আল্লাহ তাআলার দরবারে অথবা ওহীর মাধ্যমে নিজ নিজ অঙ্গীকার ঘোষণা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নিজ নিজ উম্মত হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, তাহারা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগ পাইলে তাঁহার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনিবে এবং তাঁহার সমর্থন করিবে। আমরা হযরত (সঃ)-এর যুগপ্রাপ্ত লোকগণ তাঁহার প্রতি যেরূপ আনুগত্য প্রকাশে ঈমান গ্রহণ করিয়া তাঁহার উম্মত হইয়াছি, আর তিনি আমাদের নবী হইয়াছেন; তদ্রূপ পূর্ববর্তী লোকগণও সেই প্রকার ঈমানের অঙ্গীকার গ্রহণ করায় তিনি তাহাদেরও নবী হইয়াছেন, যেরূপ তাহাদের নবীগণেরও তিনি নবী ছিলেন। কারণ, তাঁহারাও তাঁহার প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এই সূত্রে হযরতের বাক্য- بُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً "আমি সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত তথা আমি সমগ্র মানব জাতির নবী।"

এই বাক্যে সমগ্র মানব জাতি বলিতে শুধু হযরতের যুগের মানুষ উদ্দেশ করার কোনই প্রয়োজন নাই; বস্তুতঃ এই সীমাবদ্ধতা উল্লিখিত বাক্যের শব্দাবলীর অর্থের ব্যাপকতার বিপরীত। পূর্বালোচিত তথ্য অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রকৃতই পূর্বাপর সমগ্র মানব জাতির নবী।

শুধু তাহাই নহে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সমগ্র জিন জাতিরও নবী; পবিত্র কোরআনে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও এই বিষয়টি বর্ণিত রহিয়াছে। (মেশকাত, পৃষ্ঠা-৫১৫) এতদ্ভিন্ন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ফেরেশতাদেরও নবী।

এই তথ্য মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীছের বাক্য وارسلت الى الخلق كافة "আমি সমগ্র সৃষ্টির নবী"। সৃষ্টি শব্দের ব্যাপকতা উক্ত সত্যের ইঙ্গিত দানে যথার্থই বটে।

নবীগণের সর্দার হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

এই পর্যন্ত যে সকল তথ্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে, সমস্ত সৃষ্টির সেরা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ); এমনকি সকল নবীগণেরও সেরা ও প্রধান ছিলেন তিনি। হযরত (সঃ) নিজ উম্মতকে তাহাদের নবীর মর্তবা-মর্যাদা উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশে স্বীয় পরিচয় দানে এই শ্রেণীর অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। যথা–

হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۔ وَاَوَّلُ مَنْ يَّنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَاَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ ۔

অর্থ ঃ "রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি সকল আদম সন্তানের সর্দার; ইহার সুস্পষ্ট বিকাশ হইবে কেয়ামতের দিন। আমি সর্বপ্রথম কবর হইতে পুনরুজ্জীবিত হইব, আমি আল্লাহর দরবারে সর্বপ্রথম সুপারিশকারী হইব এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গৃহীত হইবে।" (মুসলিম শরীফ)

হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰتِىْ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ اَنْتَ فَاَقُوْلُ مُحَمَّدٌ فَيَقُوْلُ بِكَ اُمِرْتُ اَنْ لَّا اَفْتَحَ لِاَحَدٍ قَبْلَكَ ۔

অর্থ ঃ "রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমি বেহেশতের দ্বারে আসিয়া তাহা খুলিতে বলিব। তখন প্রহরী ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিবে, আপনি কে? আমি বলিব, মুহাম্মদ। প্রহরী বলিবে, আপনার সম্পর্কে আমি আদিষ্ট যে, আপনার পূর্বে কাহারও জন্য আমি যেন বেহেশতের দরজা না খুলি।" (মুসলিম)

হাদীছ ঃ জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَّمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ ۔

অর্থ ঃ "নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি সমস্ত রসূলগণের সর্দার; আমি গর্ব করি না। আমি সমস্ত নবীগণের সর্বশেষ নবী; আমি গর্ব করি না। আমি আল্লাহর দরবারে সর্বপ্রথম সুপারিশকারী;

আমারই সুপারিশ সর্বপ্রথম গৃহীত হইবে; আমি গর্ব করি না।” (মেশকাত শরীফ- ৬১৩)

হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ خُرُوْجًا اِذَا بُعِثُوْا وَاَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَفَدُوْا وَاَنَا خَطِيْبُهُمْ اِذَا اَنْصَتُوْا وَاَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ اِذَا حُبِسُوْا وَاَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا اَيِسُوْا اَلْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِىْ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِىْ وَاَنَا اَكْرَمُ وُلْدِ اٰدَمَ عَلٰى رَبِّىْ -

অর্থ ঃ “রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, সকল মানুষের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম পুরুজ্জীবিত হইয়া উঠিব, আমিই সকল মানুষের প্রধান ও পরিচালক হইব- যখন সকলে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হইবে। আল্লাহর মহান দরবারে যখন সকলেই নির্বাক থকিবে তখনও আমি সকলের পক্ষ হইতে কথা বলিব। সকলে যখন হাশরের ময়দানে অস্বস্তিকর অবস্থায় আবদ্ধ থাকিবে তখন তাহাদের পক্ষে আমারই সুপারিশ গৃহীত হইবে। সকলে যখন নিরাশ অবস্থায় থাকিবে তখন আমিই সকলকে আশার বাণী শুনাইব। ঐ দিন সকল সম্মান আমারই হইবে, বরং সব কিছুর চাবি আমারই হাতে হইবে। আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট সকল আদম সন্তানের মধ্যে আমিই সর্বাধিক সম্মানিত হইব।”

(মেশকাত শরীফ, ৫১৪)

হাদীছ ঃ উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন-

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ كُنْتُ اِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ -

অর্থ ঃ “নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন এই সত্যের পূর্ণ বিকাশ হইবে যে, আমি সকল নবীগণের ইমাম বা প্রধান এবং তাঁহাদের মুখপাত্র, তাঁহাদের পক্ষ হইতে সুপারিশকারী; ইহাতে আমার কোন গর্ব নাই।” (তিরমিযী শরীফ)

মে'রাজ শরীফের রাত্রে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে যখন বিশিষ্ট বিশিষ্ট নবীগণের সমাবেশ হইয়াছিল এবং নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন আল্লাহ তাআলার আদেশে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ঐ বিশিষ্ট নবীগণের নামাযের ইমাম হইয়াছিলেন। ঐ ঘটনায় এই সত্যেরই বিকাশ ছিল এবং কেয়ামতের দিন অসংখ্য ঘটনায় এই সত্যেরই বিকাশ ঘটিবে।

হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন-

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَلُوا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَسِيْلَةُ قَالَ اَعْلٰى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ لَايَنَالُهَا اِلَّا رَجُلٌ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ -

অর্থ ঃ “নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহর নিকট আমার জন্য ‘ওয়াসিলা’ লাভের দোয়া করিও। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, ‘ওয়াসিলা’ কি জিনিস? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত মহল; যাহা শুধু এক ব্যক্তির জন্যই তৈয়ার হইয়াছে; আশা করি একমাত্র আমিই সেই ব্যক্তি।”

(তিরমিযী শরীফ)

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে হযরতের বয়ান

আমাদের আসমানী কিতাব কোরআন শরীফেও পূর্ববর্তী অনেক নবীর উল্লেখ এবং বয়ান রহিয়াছে। কিন্তু সেই বয়ান হইল সাধারণ ও স্বাভাবিক; অর্থাৎ অতীতকালের ইতিহাস স্বরূপ দৃষ্টান্তমূলকভাবে, বিভিন্ন নবীর আগমন হইয়াছে তাহার প্রমাণ ও সংবাদদানে বিশিষ্ট বিশিষ্ট নবীগণের আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা ভিন্নরূপ।

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ধরাধামে আবির্ভাবের হাজার হাজার বৎসর পূর্ব হইতেই তাঁহার ভবিষ্যত আবির্ভাব আগমনের সংবাদ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে সমগ্র সৃষ্টিকে প্রদান করা হইতেছিল। নিখিল বিশ্বকে বিশ্বপতির তরফ হইতে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি তখন হইতে আকৃষ্ট করা হইতেছিল। বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর জুড়িয়া যেন কৌতূহল, অপেক্ষা ও আবেগ জাগিয়া থাকে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি; যেন নিখিলের ধ্যানের ছবি হইয়া থাকেন তিনি। তাই তওরাত, যবুর, ইঞ্জীল কেতাবে তাঁহার গুণগান ও শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিঘোষিত হইতেছিল। এইসব কিতাবে তাঁহার বর্ণনা এতই বিস্তারিত ও সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল যে, এই সব কিতাবধারীরা তাহাদের ধ্যানের ছবিকে ঠাহর করিতে মোটেই কোন বেগ পায় নাই। পবিত্র কোরআন দুই জায়গায় বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছে–

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "যাহাদিগকে আমি আসমানী কিতাব দিয়াছি তাহারা মুহাম্মদ (সঃ)-কে সর্বশেষ নবীরূপে স্পষ্টভাবে চিনিয়া থাকে– যেমন পিতা তাহার সন্তানকে চিনিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের আলেম শ্রেণী সত্যকে গোপন করিয়া রাখে জানিয়া বুঝিয়া।" (পারা–২, রুকু–১)

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمُ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "যাহাদিগকে আসমানী কিতাব দিয়াছি তাহারা মুহাম্মদ (সঃ)-কে সর্বশেষ নবীরূপে সুস্পষ্টভাবে চিনে; যেরূপে নিজ সন্তানকে চিনিয়া থাকে। যাহারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে তাহারাই তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করে না।" (পারা–৭, রুকু– ৮)

ইহুদীদের বিশিষ্ট আলেম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) এবং নাসারাদের বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি সালমান ফারেসী (রাঃ)– এই শ্রেণীর কতিপয় কিতাবধারী লোক হযরত (সঃ) সম্পর্কে তাঁহাদের কিতাবে বর্ণিত নিদর্শনসমূহ পরীক্ষা করিয়াই হযরতের হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। তদ্রূপ ইহুদী মতের বিশিষ্ট অভিজ্ঞ আলেম কা'বুল আহ্‌বার– তিনি ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে তওরাত কিতাবের অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না বিধায় হযরতের সময়ে ইসলাম হইতে দূরে ছিলেন; পরে তওরাতের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সেমতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ مَكْتُوْبٌ فِى التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থ ঃ "তিনি বলিয়াছেন, তওরাত কিতাবে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গুণাগুণ এবং বিবরণ লিখিত ছিল।" (মেশকাত শরীফ–৫১৫)

কা'বুল আহ্‌বার (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে–

يَحْكِىْ عَنِ التَّوْرٰةِ قَالَ نَجِدُ مَكْتُوْبًا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ عَبْدِى الْمُخْتَارُ لَافَظٌّ وَلَا غَلِيْظٌ .... مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ هِجْرَتُهٗ بِطَيْبَةَ -

অর্থ ঃ "কা'বুল আহবার (রঃ) তওরাত কিতাব হইতে বর্ণনা দানপূর্বক বলিয়াছেন, আমরা সেই কিতাবে লিখিত পাইয়াছি– মুহাম্মদ, যিনি আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা (তিনি কোমল স্বভাবের হইবেন)– পাষাণ হইবেন না কঠোর হইবেন না (অতিশয় শালীন ও ভদ্র হইবেন), হাট-বাজারেও চীৎকার করিয়া কথা বলিবেন না। তিনি মন্দের প্রতিশোধে মন্দ করিবেন না, ক্ষমা করায় অভ্যস্ত হইবেন। তাঁহার জন্ম হইবে মক্কায়, দেশ-ত্যাগ করতঃ "তায়বা" তথা মদীনায় বসবাসকারী হইবেন। (মেশকাত– ৫১৪)

পরবর্তীকালে ইহুদী-নাসারাগণ তওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবের বহু সত্য গোপন করিয়া ফেলিয়াছে এবং নানাভাবে বিকৃত করিয়া মৌলিকত্ব বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। এমনকি প্রকৃত তওরাত-ইঞ্জীল কিতাব বিশ্বে কোথাও নাই: আসল কিতাব এইরূপে উধাও করিয়া তাহার বিকৃতরূপের নামমাত্র অনুবাদকে খৃষ্টানরা "বাইবেল" নামে খাড়া করিয়াছে। প্রথমতঃ তাহা যে তওরাত ইঞ্জীলের অনুবাদ তাহার কোন প্রমাণ নাই এবং তাহা যাচাইয়েরও কোন উপায় নাই। আসল কিতাব একেবারেই বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই বাইবেলেরও পুরাতন প্রকাশ ও নতুন প্রকাশের মধ্যে গরমিলের ইয়ত্তা নাই।

প্রতীক্ষিত রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রদর্শনীর জন্যই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি। তাই মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতে বিশ্ব প্রকৃতিকে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ করিয়া রাখার জন্য নানা রকমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যেন তাঁহার শুভাগমন অবিদিত না থাকে, সারা বিশ্ব তাকাইয়া থাকে তাঁহার আবির্ভাব পানে; ফলে পুলকিত হইয়া উঠিবে সারা বিশ্ব তাঁহাকে পাইয়া আপন বুকে, প্রাণ ভরিয়া উঠিবে মহাতৃপ্তিতে নিখিল সৃষ্টির এবং আনন্দ ধ্বনিতে খোশ আমদেদ জানাইবে কুল্ মখলুকাত তাঁহার শুভাগমনকে।

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) এক হাদীছে বলিয়াছেন–

اَنَا دَعْوَةُ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَبِشَارَةُ عِيْسٰى -

অর্থ ঃ "আমি আমার বংশ-পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর দোয়ার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি এবং ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর ভবিষ্যত সুসংবাদের বিকাশ।"

উভয় বিষয়ই পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে। হযরতর ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দোয়া নিম্নরূপ–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمَ -

আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (রাঃ) উভয়েই পবিত্র কা'বা শরীফ পুনঃ নির্মাণ সমাপ্ত করার শুভলগ্নে সুদীর্ঘ দোয়া করিয়াছিলেন। উক্ত দোয়ায় উল্লেখ ছিল- "হে প্রভু পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে তোমার ফর্মাবরদার অনুগত দাস বানাইয়া রাখিও এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার অনুগত দাসের অন্ততঃ একটি দল সর্বদা কায়েম রাখিও। প্রভু হে! আর ঐ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই তাহাদের হেদায়াত উদ্দেশে একজন রসূল পাঠাইও, যিনি তাহাদেরকে তোমার কিতাব পড়িয়া শুনাইবেন, কিতাবের শিক্ষাদান ও পরিপক্ক জ্ঞান তথা শরীয়ত শিক্ষা দান করিবেন এবং তাহাদিগকে সর্ববিষয়ে পবিত্র ও পরিমার্জিত করিবেন।" (পারা-১, রুকু-১৫)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) সম্মিলিতভাবে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের তিন হাজার বৎসরের অধিক কাল পূর্বে এই দোয়া করিয়াছিলেন। উল্লিখিত হাদীছে রসূলুল্লাহ (সঃ) এই দোয়ার শেষ অংশটিই উদ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত দোয়ায় যে রসূল আগমনের জন্য আল্লাহর দরবারে আবেদন করা হইয়াছিল সেই রসূলই আমি। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের বহু পূর্বে আল্লাহ তাআলা তাঁহার অনুসন্ধিৎসা বিশ্ব মুরব্বী শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দেন; যেন তাঁহার প্রতি নিখিলের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

এস্থলে একটি প্রশ্নের অবকাশ থাকে যে, উক্ত দোয়াকারী হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পর হইতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে বহু নবীর আগমন হইয়াছে, এমতাবস্থায় অন্য কোন নবী উক্ত দোয়ার উদ্দেশ্য সাব্যস্ত হইলেন না, অথচ তিন হাজার বৎসরেরও অধিককাল পরে আবির্ভূত একমাত্র মুহাম্মদ (সঃ) ঐ দোয়ার উদ্দেশ্য সাব্যস্ত হইলেন- ইহার সূত্র কি? উত্তর এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দুই পুত্র (১) ইসহাক (আঃ) (২) ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হইতে তাঁহার পরবর্তী নবীগণের আগমন হইয়াছে। ইসহাক (আঃ) হইতে বংশ পরম্পরায় বহু সংখ্যক নবীর আগমন হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই বনী-ইসরাঈলের নবী ছিলেন। ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশ হইতে দীর্ঘ তিন সহস্রাধিক বৎসর পরে শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমন হইয়াছিল। উল্লিখিত দোয়ার মধ্যে আমাদের বংশধর হইতে বলা হইয়াছে। ইহাতে আমাদের বলিতে উদ্দেশ করা হইয়াছে ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাঈল (আঃ)। কেননা তাঁহারা উভয়েই কা'বা শরীফ পুনঃ নির্মাণে শরীক ছিলেন। পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে-

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ -

পবিত্র কা'বা গৃহ পুনঃ নির্মাণ করিয়াছিলেন ইব্রাহীম এবং ইসমাঈল, তাঁহারা উভয়েই সমবেতভাবে ঐ দোয়া করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ দোয়ায় উল্লিখিত রসূলের উদ্দেশ্য একমাত্র সেই রসূলই হইতে পারেন যিনি হযরত ইব্রাহীমের বংশ হইতে হযরত ইসমাঈলের সূত্রে। এইরূপ রসূল একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। পক্ষান্তরে হযরত ইব্রাহীমের বংশের অন্য সব নবী ছিলেন হযরত ইসহাকের সূত্রে।

আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় বিষয়- আমি ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর ভবিষ্যত সুসংবাদের বিকাশ- এই সম্পর্কেও পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে-

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ -

অর্থ ঃ "একটি স্মরণীয় কথা- মারইয়াম পুত্র ঈসা বলিয়াছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসূলরূপে আসিয়াছি- আমার পূর্ববর্তী কিতাব তওরাতের সমর্থনকারী হইয়া এবং এই সুসংবাদ

লইয়া যে, আমার পরে এক মহান রসূল আসিবেন যাঁহার নাম হইবে 'আহমদ'। (পারা-২৮, রুকু-৯)

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীছে সুস্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে – স্বয়ং নবী (সঃ) নিজের নাম 'মুহাম্মদ' এবং দ্বিতীয় নাম 'আহমদ' বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের ছয় শত বৎসর পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) কর্তৃক এই সুসংবাদপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হইয়াছিল।

নিখিল সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

পূর্বালোচিত যাবতীয় তথ্যসমূহ এই সত্য সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত করে যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) কুল মাখলুকাত তথা সমগ্র সৃষ্টির সেরা ছিলেন। সৃষ্টিজগতের সেরা সৃষ্টি হইল মানব জাতি; তাহাদের মধ্যে সেরা মানুষ হইলেন নবী-রসূলগণ। নবী রসূলগণের সকলের সেরা ও প্রধান হইলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)। এই বিষয়ে অনেক হাদীছও বর্ণিত রহিয়াছে।

হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে একটি সুদীর্ঘ হাদীছে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ عَلَى اللّٰهِ وَلَا فَخْرَ -

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলার নিকট পূর্বাপর সকল সৃষ্টির সেরা ও সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ আমি; ইহা বাস্তব সত্য-গর্ব নহে।" (তিরমিযী শরীফ)

হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে বলিলেন, বনী ইসরাঈলগকে জানাইয়া দিবেন, যেকোন ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইবে এই অবস্থায় যে, সে আহমদকে স্বীকার করিয়াছিল না, তাহাকে আমি দোযখে নিক্ষেপ করিব সে যে-ই হউক না কেন। মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, আহমদ কে? আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হে মূসা ! আমার মহত্ত্বের বড়ত্বের কসম করিয়া বলিতেছি– আমার এমন কোন সৃষ্টি নাই যে আমার নিকট তাঁহার অপেক্ষা মহান ও সম্মানিত হইতে পারে। আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টিরও (যাহার পরিমাণ বর্তমান হিসাব অনুসারে) বিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে আমার নামের সহিত মিশ্রিতরূপে তাঁহার নাম আরশের গায়ে লিখিয়া রাখিয়াছি। আবার আমার মহত্ত্বের বড়ত্বের কসম করিয়া বলিতেছি, মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত অন্য সকলের জন্য বেহেশতে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিবে। (নশ্রুত তীব-১৯২)

পূর্বে এক শিরোনামে পারা-৩, রুকু-১৬-এর আয়াত বর্ণিত হইয়াছে, পূর্বকালের প্রত্যেক নবী হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছে যে, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবকাল পাইলে অবশ্যই তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন ও তাঁহার সাহায্য করিবে এবং তাঁহার অনুগত-অনুসারী হওয়ার জন্য নিজ নিজ উম্মতকে আদেশ করিবে। উক্ত পারা-৩, রুকু-১৬-এর আয়াতে বর্ণিত নবীগণ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল– যেরূপ সূরা আ'রাফ ১৭২ নং আয়াতে বর্ণিত মানব জাতি হইতে গৃহীত অঙ্গীকারের ঘটনা সম্পর্কে আমাদের বিস্মৃতি ঘটিয়াছে অথবা ওহীর মাধ্যমে সেই অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্বে উল্লিখিত সতর্কবাণীর আলোচনা হইয়াছে।

মাহবুবে খোদা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু সাধারণ সৃষ্টি নহেন; মহান সৃষ্টি– অতি মহান। স্রষ্টার ছিলেন তিনি মাহবুব– প্রিয়পাত্র, একান্ত ভালবাসার বস্তু। পূর্বালোচিত

তথ্যাবলীতে এবং অনেক হাদীছে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে।

হাদীছ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন; একদা কিছু সংখ্যক ছাহাবী (হযরতের মসজিদে দ্বীনের কথাবার্তায়) বসিয়া ছিলেন। হযরত (সঃ) গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের নিকটে আসিলেন। ঐ সময় তাঁহারা বিভিন্ন নবীর আলোচনা করিতেছিলেন– একজন বলিলেন, আল্লাহ তাআলা মঞ্জুর করিয়াছেন যে, ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহাকে স্বীয় দোস্ত বানাইয়াছেন। অপরজন বলিলেন, মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কথা বলিয়াছেন। আর একজন বলিলেন, ঈসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার শুধু আদেশ বাক্যে সৃষ্ট এবং তাঁহার সরাসরি প্রেরিত আত্মা। অন্য একজন বলিলেন, আদম (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা স্বীয় মনোনীত আখ্যায়িত করিয়াছেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাদের প্রত্যেকের উক্তি সমর্থনপূর্বক নিজের সম্পর্কে বলিলেন, "সকলে শুনিয়া রাখ– আমি হাবীবুল্লাহ– আল্লাহ আমাকে আপন দোস্ত, প্রিয়পাত্র ও ভালবাসার পাত্র বানাইয়াছেন।" (মেশকাত শরীফ)

আমরা এই ক্ষেত্রে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিব; সেইটি হইল, আল্লাহ তাআলার নিকট হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠের ফযীলত ও মর্তবা। ইহাতে প্রতীয়মান হইবে, তিনি আল্লাহ তাআলার কিরূপ ভালবাসার পাত্র যে, আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রতি দরূদের এত অধিক মূল্য দিয়া থাকেন।

হযরতের প্রতি দরূদের ফযীলত

পবিত্র কোরআনের আয়াত–

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁহার ফেরেশতা সম্প্রদায় প্রিয়নবীকে দরূদের সওগাত প্রদান করিয়া থাকেন; হে মোমেনগণ! তোমরাও তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ কর।" (পারা– ২২, রুকু– ৪)

হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করিবেন, তাহার দশটি গোনাহ মাফ করিবেন এবং দশটি মর্তবা বাড়াইবেন। (নাসায়ী শরীফ)

হাদীছ ঃ আবু তাল্‌হা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা জিব্রীল (আঃ) বিশেষভাবে এই কথাটি বলিবার জন্য আসিয়াছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে, আমি তাহার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করিব। যে ব্যক্তি একবার আপনার প্রতি সালাম পাঠ করিবে আমি তাহার প্রতি দশবার সালাম (শান্তি) পাঠাইব। (নাসায়ী শরীফ)

একবার দরূদ পাঠে দশটি রহমত লাভ হওয়া ন্যূনতম প্রতিদান; ইহা অপেক্ষা বেশী রহমত লাভের সুসংবাদও রহিয়াছে।

হাদীছ ঃ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে সত্তরটি রহমত দান করিবেন এবং ফেরেশতাগণ তাহার জন্য সত্তরবার মাগফেরাতের দোয়া করিবেন। (মেশকাত শরীফ; পৃঃ–৭৮৭

হাদীছ ঃ উবাই (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার দোয়া-কালাম পড়ার নির্ধারিত সময়ের কি পরিমাণ অংশে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিব? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, তুমিই নিজ ইচ্ছায় নির্ধারিত কর। আমি আরজ করিলাম, চতুর্থাংশ? হযরত (সঃ) বলিলেন, আরও

বেশী করিলে তোমারই অধিক মঙ্গল হইবে। আমি বলিলাম, অর্ধেক? হযরত (সঃ) বলিলেন, আরও বেশী করিলে তোমার মঙ্গল হইবে। আমি বলিলাম, দুই তৃতীয়াংশ? হযরত (সঃ) বলিলেন, আরও বেশী করিলে তোমার অধিক মঙ্গল হইবে। আমি বলিলাম, দোয়া-কালামের সম্পূর্ণ সময় আপনার প্রতি দরুদ পাঠেই কাটাইব? হযরত (সঃ) বলিলেন, তাহা করিলে (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে) তোমার সকল রকম চিন্তা-ভাবনা দূর করার ব্যবস্থা করা হইবে এবং গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (তিরমিযী শরীফ)

হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, বিশেষ এক শ্রেণীর ফেরেশতা আল্লাহ তাআলা এই কাজে নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহারা সর্বদা বিশ্বব্যাপী ঘোরাফেরা করিতে থাকেন। আমার কোন উম্মত আমার প্রতি সালাম পাঠ করিলে তাঁহারা ঐ সালাম আমার নিকট তৎক্ষণাত পৌছাইয়া থাকেন। (নাসায়ী)

হাদীছ ঃ ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুলহওয়ার পর্যায়ে পৌছে না, যে যাবত দোয়ার সহিত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়া না হয় (তিরমিযী শরীফ)

এতদ্ভিন্ন হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার এরূপ আরও অসংখ্য ব্যবহার প্রমাণিত আছে– যাহা তাঁহার মাহবুবে খোদা হওয়ার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

হাদীছ ঃ মালাকুল মউত তথা জান কবজের ফেরেশতা যখন রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন প্রথমে তিনি হযরত (সঃ)-কে বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন; আপনি যদি অনুমতি দেন আপনার জান কবজ করিতে পারি; নতুবা কবজ করিব না। ঐ সময় তথায় জিব্রাঈল (আঃ)ও উপস্থিত ছিলেন, হযরত (সঃ) তাঁহার প্রতি তাকাইলেন। জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন হে মুহাম্মদ (সঃ)! আল্লাহ তাআলা আপনার সাক্ষাতের আগ্রহী। (জড় দেহের বেষ্টনী মুক্ত হইয়া পবিত্র আত্মা বরযখী জগতে চলিয়া গেলে আল্লাহর সহিত উহার সম্পর্ক অধিক নিবিড়, নিরবচ্ছিন্ন এবং সুদৃঢ় হয়– উহাকে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাত বলা হইয়াছে।) জিব্রাঈলের কথা শুনিয়া হযরত (সঃ) মালাকুল মউতকে রূহ কবজের অনুমতি দিলেন। (নশরুত তীব ১৭৪)

হাদীছ ঃ আদম (আঃ)-এর বেহেশতে অবস্থানকালে বিবি হাওয়া (আঃ) যখন তাঁহার পরিণীতা সাব্যস্ত হইলেন এবং উভয়ের শুভ মিলনলগ্ন উপস্থিত হইল, তখন বিবি হাওয়া মহর তলব করিলেন। আদম (আঃ) আল্লাহ তাআলার দরবারে নিবেদন করিলেন, কিসের দ্বারা আমি মহর আদায় করিব? হুকুম আসিল, আমার ভালবাসার পাত্র– হাবীব মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি বিশবার দরূদ পাঠ করুন। (নশরুত তীব ১০)

ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী

ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম।

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হযরত (সঃ)-কে রাজকীয় সম্মান মর্যাদা প্রদান

নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলা তাঁহার পরম প্রিয় সৃষ্টি মুহাম্মদ (সঃ)-কে যে মান-মর্যাদা ও রাজকীয় সম্মান দান করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাহা ছিল অপরিসীম, ভাষায় প্রকাশে সাধ্যের উর্ধ্বে। আল্লাহ তাআলা তাঁহার পাক কালামে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে যেসব ফরমান জারি করিয়াছেন, তাহা দ্বারা সেই অপরিসীম মান-মর্যাদার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। যেমন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ -

অর্থ ঃ "হে মোমেনগণ! নবীজীর সম্মুখে তাঁহার আওয়াজ অপেক্ষা উচ্চ আওয়াজে কথা বলিও না এবং তোমরা পরস্পর যেরূপ উচ্চকণ্ঠে কথা বল, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত ঐরূপে কথা বলিও না; নতুবা আশঙ্কা আছে– সারা জীবনের কৃত নেক আমলসমূহ বেমালুম বরবাদ হইয়া যাইবে।"

(পারা—২৬, রুকু—১৩)

উক্ত আয়াতের শানে নুযুল দৃষ্টে বিষয়টির আরও গুরুত্ব প্রকাশ পায়। একদা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মজলিসে আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) উভয়ের কোন বিতর্কে তাঁহাদের কণ্ঠধ্বনি উচ্চ হইয়া গিয়াছিল। তাহা কেন্দ্র করিয়াই এই মহাসতর্কবাণীর আয়াত নাযিল হইয়াছিল। ছাহাবীগণ বলিলেন, كاد الخيران ان يهلكا "আমাদের দুই প্রধান ধ্বংসের মুখ হইতে অল্পে বাঁচিয়া গিয়াছেন।"

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ـ

অর্থ ঃ "নবীজীকে কোন প্রয়োজনে ডাকিতে হইলে তাঁহাকে ঐরূপে ডাকিবে না যেরূপ তোমরা পরস্পর একে অন্যকে ডাকিয়া থাক।" (পারা–১৮, রুকু–১৫)

অর্থাৎ নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ডাকিতে হইলে তাঁহার মান-মর্যাদা ও যথাযোগ্য সম্মানের সম্বোধনে ডাকিবে। প্রথমোক্ত আয়াতের সংলগ্নেই আছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ـ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ـ

অর্থঃ "যাহারা আপনাকে আপনার কক্ষের বাহির হইতে ডাকে, নিঃসন্দেহে ঐ শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই নির্বোধ-আহমক। তাহারা যদি (আপনাকে না ডাকিয়া) কক্ষদ্বারে আপনার বহিরাগমনের প্রতীক্ষায় থাকিত তবে তাহাদের মঙ্গল হইত।"

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ـ

"নিশ্চয় যাহারা রসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সম্মুখে স্বীয় কণ্ঠস্বর অনুচ্চ রাখে তাহাদের অন্তরকেই আল্লাহ তাআলা খোদা ভীতির যোগ্য পাত্র সাব্যস্ত করিয়াছেন; তাহাদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।" (ঐ)

হযরতের আবির্ভাব

নিখিল সৃষ্টির সর্বাগ্রে যে আল্লাহ তাআলা "হাকীকতে মুহাম্মদিয়া"কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন– যাহার আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে; সেই হাকীকতে মুহাম্মদিয়া ছিল হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পবিত্র আত্মা বা তাহার জ্যোতির্বাহনসহ। এবং তাহা আলমে আরওয়াহ বা আল্লাহর কুদরতী ঊর্ধ্বজগতে চলমান ছিল আদম সৃষ্টির পূর্ব হইতে। সেই ঊর্ধ্বজগত হইতে এই জড়জগত ও বস্তুজগতে অবতীর্ণ হইবেন সেই "হাকীকতে মুহাম্মদিয়া" এবং তাহা জড় দেহের পোশাকে লৌকিক জগতে বিকশিত হইবেন– ইহাই হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের অর্থ।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে দেখাইবার জন্য এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি; সেই মহানেরই প্রদর্শনী রূপে এই বিশ্বজগতের ওজুদ বা অস্তিত্ব। অতএব সেই মহানের মর্যাদানুপাতিক যোগ্য প্রদর্শনীরূপে এই বসুন্ধরার সুগঠনের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সমাপ্ত হইবে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে। আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, কিন্তু তাঁহারই নীতি রহিয়াছে প্রত্যেক জিনিসকে ধাপে ধাপে উন্নত মানে উন্নীত করা; এই ক্ষেত্রেও সেই নীতি

চলিয়াছে। বিশ ভুবনকে বিধাতা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য যোগ্য প্রদর্শনী ক্ষেত্র (Exhibition ground) রূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে। সেই গঠন কার্য সম্পাদনের জন্যই ছিল বিশ্ব বুকে এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের আগমন। বিশ্ব ভুবনে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বশেষ আগমনের ইহাই ছিল রহস্য। কোন মহামূল্যবান ও মর্যাদাবান বস্তুর প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে এইরূপই হইয়া থাকে; প্রথমে উক্ত প্রদর্শনী ক্ষেত্রকে সেই মহামূল্যবান বস্ত প্রদর্শনীর যোগ্য করার প্রচেষ্টায় শত শত শিল্পীর আগমন হয়; বিভিন্ন শিল্পী প্রদর্শনী ক্ষেত্রকে গড়িয়া তোলেন মূল দর্শনীয় বস্তুর মর্যাদা অনুপাতে। সেই গড়ার কার্য সমাপ্ত হইলে উক্ত প্রদর্শনীতে উপস্থিতি হয় সেই প্রদর্শনীয় মহানের এবং প্রদর্শন শেষ হইয়া গেলে উক্ত প্রদর্শনীর বিলুপ্তির পালা আসে। হযরত (সঃ) বলিয়াছেন–

بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ -

অর্থ ঃ "বিশ ভুবনে আমার আগমন পর্ব শেষ হওয়ার পর কেয়ামত তথা এই বসুন্ধরার প্রলয় এতই নিকটবর্তী, যেরূপ নিকটবর্তী মধ্যাঙ্গুলি এবং তাহার সংলগ্ন আঙ্গুল।"

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব তথা বিশ্ব বুকে তাঁহার পদার্পণের জন্য মহান বিধাতা বাছনি করিয়াছেন সর্বোত্তম কাল বা যুগের; বাছনি করিয়াছেন সর্বোত্তম স্থান বা দেশের; বাছনি করিয়াছেন সর্বোত্তম শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের; বাছনি করিয়াছেন সর্বোত্তম বংশ ও ঘরের।

সর্বোত্তম যুগে হযরতের আবির্ভাব

যেকোন মহামানুষের মহত্ত্বের বিকাশ ও তাঁহার মান-মর্যাদার স্বীকৃতি লাভ হয় তাঁহার উচ্চ আদর্শ এবং মহৎ গুণাবলীর প্রসার, প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তাঁহার মিশনের কৃতিত্ব দ্বারা, তাঁহার সংস্কারের সাফল্যের দ্বারা। আর যে যত বড় মহান ও উত্তম সংস্কারকই হউন না কেন, তাঁহার কৃতকার্যতা নির্ভর করে তাঁহার সহকারী ও সহচর উত্তম হওয়ার উপর। সহকারী-সহচর উত্তম ও সুযোগ্য না হইলে কোন মহানের মহত্ত্বের বিকাশ এবং কোন সংস্কারকের মিশনের সাফল্য লাভ সম্ভব নহে। অতএব আল্লাহ তাআলা বিশ্ব ভুবনে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মহত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং তাঁহার মিশনের সাফল্য সংস্কারের কৃতকার্যতার দ্বারা তাঁহার পূর্ণ মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার জন্য যোগ্যতম সহকারী ও সহচরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মানব জাতি মানবীয় গুণাবলীতে বিশেষতঃ উত্তম সহচর এবং যোগ্য সহকর্মী হওয়ার উপাদানে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে যেই যুগে– ঠিক সেই যুগেই আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীবকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার বিকাশ ক্ষেত্র মানব সমাজে। ফলে সহজ সুলভ হইয়াছিল তাঁহার জন্য সুযোগ্য সহকারী ও সহচরবৃন্দ; শুধু কেবল তাঁহার সহকারী সহচরগণই সুযোগ্য ছিলেন না, বরং পরম্পরা দীর্ঘ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে তাঁহার মিশনের সুযোগ্য কর্মীদের বহর। তাঁহার সঙ্গে থাকাকালে তাঁহার ভক্ত-অনুরক্ত সহকারী সহচরগণ তাঁহার জন্য এবং তাঁহার মিশনের জন্য যেভাবে নিজেদের ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও জান-মাল কোরবান করিয়াছেন, পূর্ববর্তী কোন যুগের কোন নবীর সহকারী সহচরগণের ইতিহাসে তাহার কোন নমুনা-নজির মোটেও দেখা যায় না। এই সত্যের দৃষ্টান্ত বদর জেহাদের ইতিহাসে দেখা যায় এবং হোদায়বিয়ার ঘটনা"র বিবরণে শত্রু পক্ষের সাক্ষ্যেও পাওয়া যায় (তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। আর বদর, ওহুদ, খন্দক ইত্যাদি রণাঙ্গনে তাঁহারা কার্যতঃ যে চরম উৎসর্গ ব্যাপক আকারে দেখাইয়াছিলেন, তাহার নমুনাও ইতিহাসে নাই।

তাঁহার পরে তাঁহার সহচর খলীফাগণ তাঁহার মিশনকে জীবন্তই নহে শুধু, বরং যেভাবে উন্নতির পথে আগাইয়া নিয়াছেন, তাহার নমুনাও পূর্ব যুগের কোন নবীর খলীফাদের ইতিহাসে দৃষ্টিগোচর হয় না।

রাজনীতির পথে ইসলামের শাসন বিস্তারের দ্বারাই নহে শুধু, বরং নবীজীর মিশন তথা দ্বীন-ইসলামের জন্য নবীজীর সহচর ছাহাবীগণ যেসব গঠনমূলক কার্যাবলী সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং তাহার ভিত্তি স্থাপন

পূর্বক সম্মুখের জন্য সেলসেলা জারি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও এক অতুলনীয় সোনালী ইতিহাস। যেমন–

(১) নবীর প্রধান অবলম্বন ধর্মের মূল ভিত্তি আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী কিতাবের সংরক্ষণ। পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের লোকদের মধ্যে এইরূপ রক্ষণের গুণ ছিল না যে, তাহারা নিজেদের আসমানী কিতাবকে সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তি এই মানের ছিল না যে, তাহারা তাহাদের আসমানী কিতাবকে কণ্ঠস্থ করিয়া অক্ষরে অক্ষরে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারে। তাহাদের কিতাব শুধু কেবল পত্র-পৃষ্ঠে ছিল; ফলে তাহা শত্রু, স্বার্থান্বেষী ও ধর্মীয় মোনাফেকদের দ্বারা বৎসরে বৎসরে সংস্করণে সংস্করণে অতি সহজেই পরিবর্তিত ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের মূল কিতাব মূল ভাষায় বিশ্ব বুকে কোথাও বিদ্যমান নাই; আছে শুধু বিভিন্ন ভাষায় মনগড়া অনুবাদ। মূল কিতাব বিলুপ্ত হওয়ার পর অনুবাদের নির্ভরতা কি থাকিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। আর কোন ধর্মের মূল ভিত্তি আসমানী কিতাব বিলুপ্ত হইয়া গেলে সেই ধর্মের টিকিয়া থাকার অবস্থা কি হইবে তাহাও সহজে অনুমেয়।

পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগ তথা তাঁহার আবির্ভাবকাল হইতে (কেয়ামত পর্যন্ত) লোকগণ স্মৃতিশক্তি প্রখর হওয়ার গুণে উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছিল। ফলে পবিত্র কোরআনের ন্যায় সর্বাধিক দীর্ঘ আসমানী কিতাব এই উম্মত অক্ষরে অক্ষরে হৃদয়পটে অঙ্কিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। পূর্ববর্তী নবীগণের কিতাবের ঐরূপ সংরক্ষণকারী হাফেজ কোনকালে ছিল বলিয়া ইতিহাসে সন্ধান মিলে না। পক্ষান্তরে পবিত্র কোরআনের ঐরূপ সংরক্ষণকারী হাফেজ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সংখ্যায় পরম্পরা প্রত্যেক যুগে বিদ্যমান রহিয়াছে। দেড় হাজার বৎসর পর বর্তমান যুগেও আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকিবে; যার ফলে পবিত্র কোরআনের মুদ্রিত গ্রন্থ পরিবর্তিত হইতে পারে নাই এবং পারিবেও না। বিশ্ব বুকে কোরআন শরীফের সমুদয় ছাপা কপি বিলুপ্ত করিয়া দিলেও পবিত্র কোরআনের একটি অক্ষরও বিলুপ্ত বা বিকৃত হইতে পারিবে না; কোটি কোটি হৃদয়পট হইতে পবিত্র কোরআন মূল আকারে ধ্বনিত হইতে থাকিবে।

মানুষের স্মৃতিশক্তি ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়া হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে এত উচ্চ মানে পৌঁছিয়াছিল যে, তাঁহার যুগের মানুষের জন্য এত বড় সংরক্ষণ কার্য সম্ভব হইয়াছে। পূর্ববর্তী কোন যুগের নবীর উম্মতদের পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই; নতুবা তাহার খোঁজ ইতিহাসে থাকিত। বরং যুগ পরম্পরা এখনও তওরাত-ইঞ্জীল কিতাবের হাফেজ পাওয়া সম্ভব হইত। কারণ এই যুগেও উক্ত কিতাবদ্বয়ের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অনুসারী হওয়ার দাবীদার ভক্ত বিদ্যমান আছে এবং কোটি কোটি টাকা তাহারা ধর্ম প্রচারে ব্যয় করিতেছে। অথচ তাহাদের কিতাবের কোন একজন হাফেজ কোথাও দেখা যায় না। ইহার কারণ ইহাই যে, পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের লোকদের স্মৃতিশক্তি ও সংরক্ষণ এই মানের ছিলই না যে, তাহারা এই কার্য সমাধা করিতে পারে। অতএব প্রথম হইতে যাহা হয় নাই পরেও তাহার সেলসেলা রহে নাই। এমনকি শেষ পর্যায়ে ত তাহার মূল কিতাবই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব এখন আর তাহা কণ্ঠস্থকরণ সম্ভবই থাকে নাই। আর পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার যুগে তাহা যেরূপে সংরক্ষিত হইয়াছিল; যুগপরম্পরা তাহার সেলসেলা চলিয়াছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

(২) তদ্রূপ পবিত্র কোরআনের অগণিত আয়াতের স্বয়ং নবীজী (সঃ) কর্তৃক প্রদত্ত প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসমূহ তফসীর আকারে ছাহাবীগণ পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অতি বড় একটি গঠনমূলক কাজ ছিল। কারণ, দ্বীন-ইসলামের মূল বস্তু হইল কোরআন শরীফ যাহা মহান আল্লাহর কালাম। আল্লাহর কালামের প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যাখ্যা আল্লাহর প্রতিনিধি রসূলের দ্বারা হইলেই পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হইতে পারে এবং আল্লাহ প্রদত্ত কোরআন কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের মূল ভিত্তি হইবে ঐ ব্যাখ্যা' সুতরাং ঐ ব্যাখ্যাবলীর সংরক্ষণ দ্বীন-ইসলামের জন্য এক অপরিহার্য বস্তু ছিল। ছাহাবীগণ নিজেদের প্রয়োজনে ঐ ব্যাখ্যা সংরক্ষণের প্রতি তেমন মুখাপেক্ষী ছিলেন না। কারণ, স্বয়ং ব্যাখ্যাকার রসূল তাঁহাদের সম্মুখে বিদ্যমান ছিলেন। পরবর্তী যুগ পরম্পরা তথা কেয়ামত পর্যন্ত লোকদের সম্মুখে রসূল (সঃ) থাকিবেন না, কিন্তু ইসলাম এবং কোরআন

থাকিবে; কাজেই লোকদের জন্য উক্ত ব্যাখ্যা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। সেই যুগ-যুগান্তরের জন্য ছাহাবীগণ পবিত্র কোরআনের উক্ত ব্যাখ্যাসমূহের সুসংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন– যাহা একমাত্র তাঁহাদের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব ছিল। ছাহাবীগণ ঐ ব্যাখ্যাসমূহ সযত্নে সুরক্ষিত করিয়া না গেলে চিরতরে ইসলাম-জগত ঐ ব্যাখ্যার ন্যায় অপরিহার্য বস্তু হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া যাইত। যেমন যবুর, তওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি আসমানী কিতাবসমূহের কোন ব্যাখ্যাই উক্ত কিতাবসমূহের বাহক নবী হইতে আজ ভূ পৃষ্ঠে বিদ্যমান নাই। অথচ তওরাতের অনুসারী হওয়ার দাবীদার ইহুদী জাতি এবং ইঞ্জীলের অনুসারী হইবার দাবীদার খৃস্টান জাতি দুনিয়াতে কত জাঁকজমকের সহিত বিরাজমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ উক্ত নবীগণের সহকারী ও সহচরদের মধ্যে গঠনমূলক কাজ করার দূরদর্শিতা ছিল না, তাহাদের মধ্যে সেই গুণেরও অভাব ছিল ফলে তাহাদের দ্বারা উক্ত সংরক্ষণ কাজ হয় নাই; পরিণামে সেই নবীগণের পরবর্তী উম্মতগণ তাহা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে এবং বিশ্ব বুক হইতে তাহার চিহ্ন চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহকারী সহচরগণের মধ্যে ঐরূপ গঠনমূলক এবং সংরক্ষণ কার্যের বিশেষ গুণ বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা নবীজী হইতে প্রাপ্ত আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যাসমূহ অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। যার ফলে আজ সেই সব ব্যাখ্যা বিদ্যমান। হাদীছ ভাণ্ডারের অধিকাংশ কিতাবে 'তফসীর অধ্যায়' নামে ঐ তফসীরসমূহ বর্ণিত আছে। এতদ্ভিন্ন ঐ শ্রেণীর তফসীরের ভিত্তিতে রচিত বিশেষ বিশেষ বড় বড় বহু তফসীর গ্রন্থও বিদ্যমান আছে। যথা– তফসীর ইবনে আব্বাস, তফসীর ইবনে জরীর, তফসীর ইবনে কাসীর, তফসীর দোররে মনসুর ইত্যাদি।

(৩) পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের লোকদের তুলনায় হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগের লোকদের গঠনমূলক কাজের গুণ ও যোগ্যতার আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বীয় নবীর আদর্শ, নীতি, কার্যধারা, বক্তব্য ইত্যাদি সমুদয় বিষয় সংরক্ষণ করা। এই জিনিসটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, নবীর তিরোধানের পর তাঁহার দ্বীনের উপর চলিতে হইলে সেই পথের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় দিশারী হইবে ঐসব জিনিস। তাহা বাতিরেকে নবীর দ্বীন তাঁহার পরে সুষ্ঠুরূপে টিকিয়া থাকিতে পারে না। পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের লোকদের মধ্যে উক্ত গঠনমূলক অপরিহার্য কার্যের গুণ ও যোগ্যতা ছিল না বিধায় পূর্ববর্তী কোন নবীর হাদীছ ভাণ্ডার কোথাও বিদ্যমান নাই। 'হাদীছ' বলা হয় নবীর আদর্শ, নীতি, কার্যধারা, বক্তব্য ও তাঁহার মৌন সমর্থন ইত্যাদিকে। পূর্ববর্তী কোন নবীরই এই সমস্ত জিনিস সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয় নাই। যদি হইয়া থাকিত তবে পূর্ববর্তী যে সমস্ত নবীর অনুসারী হওয়ার দাবীদার আজও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ রহিয়াছে। অন্ততঃ তাহারা তাহাদের নবীর হাদীছকে প্রমাণরূপে পেশ করিতে সক্ষম হইত– যেরূপ দেড় হাজার বৎসর পরেও সক্ষম আছে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতগণ এবং ইন্‌শা আল্লাহু তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত সক্ষম থাকিবে।

এই গুণ ও যোগ্যতা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে লোকদের এতই অধিক ছিল যে, তাঁহারা নিজ নবীর আদর্শ, নীতি, কাজ, কথা, সমর্থন এবং প্রতিটি গুণাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুসংরক্ষিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যাহা আজ দেড় হাজার বৎসর পরেও হাজার হাজার হাদীছরূপে সাক্ষ্যসূত্র তথা সনদের সহিত শত শত কিতাব আকারে সারা বিশ্বে বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাকে হাদীছ-শাস্ত্র বা হাদীছ ভাণ্ডার বলা হয়। এই সুসংরক্ষিত হাদীছ ভাণ্ডার যাহা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতগণ সংরক্ষ করিতে সক্ষম হইয়াছে– পূর্ববর্তী কোন নবীর উম্মত ঐরূপ করিতে পারে নাই; তৎকালীন মানুষের মধ্যে এই প্রতিভা ছিলই না; মানবীয় গুণাবলীর উন্নতির ধাপে ধাপে মানুষ এই শ্রেণীর প্রতিভা লাভ করিয়াছে।

(৪) দুনিয়া পরিবর্তনশীল, নিত্যনূতন হইবার ঘটনাবলী ও প্রয়োজনাদি। ইসলামের নিয়ন্ত্রণ মানুষের জীবনের প্রতি পদক্ষেপ ও প্রতি কার্যের উপর। পবিত্র কোরআন শাসনতান্ত্রিক পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারের বস্তু;

হাদীছ তদপেক্ষা বিস্তারিত বটে, কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতের ঘটনা প্রবাহের খুঁটিনাটি সব বিষয়ের ফয়সালা হাদীছ সরাসরি পাওয়ার সম্ভাবনাও অস্বাভাবিক। হাঁ, উক্ত প্রয়োজন মিটাইবার এবং তাহার সমাধানের একটি পথ আছে যে, নিত্যনৈমিত্তি খুচরা ঘটনাবলী সম্পর্কে আদেশ-নিষেধ কোরআন ও হাদীছের আলোকে সাব্যস্ত করা; ইহাকে 'ইজ্‌তেহাদ' বলা হয়। এই ইজ্‌তীহাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতেই দেখা গিয়াছে, পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতে ঐরূপ প্রতিভা ছিল বলিয়া কোন নিদর্শন দেখা যায় না।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতে এমন এমন দূরদর্শী প্রতিভাধারী ইমাম– অসাধারণ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা শুধু নিজ নিজ সম্মুখস্থই নহে, বরং ভবিষ্যতের যত রকম ঘটনার জন্ম হইতে পারে, এইরূপ লক্ষ লক্ষ সম্ভাব্য খুচরা ঘটনাবলী গবেষণার মাধ্যমে অগ্রিম আবিষ্কার করিয়া ঐসব সম্পর্কীয় আদেশ-নিষেধ কোরআন হাদীছের আলোকে সাব্যস্ত করতঃ বিরাট গ্রন্থমালা রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহার সংখ্যা কয়েক হাজারেরও অধিক হইবে; ইহাকেই ফেকাহ শাস্ত্র বলা হয়। এইরূপ অগ্রিম আবিষ্কারের বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। কারণ, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগ সর্বোত্তম যুগ– বিভিন্ন গুণাবলীর যুগ বটে, কিন্তু ইহজগত লয়শীল; মহাপ্রলয়ের দ্বারা তাহার সমাপ্তি ঘটিবে। মহাপ্রলয় নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে ধাপে ধাপে সৎ গুণাবলী ক্ষীণ হইয়া আসিবে; সেমতে ইজ্‌তিহাদের ক্ষমতাও লোপ পাইবে। ইজতীহাদের ক্ষমতা লোপ পাওয়াকালে দ্বীনের প্রয়োজন মিটিতে পারে সেই ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা পূর্বাহ্নেই করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ববর্তী ইমামগণকে আল্লাহ তাআলা অসাধারণ ইজ্‌তেহাদ শক্তি দান করিয়াছেন। তাঁহারা অগ্রিম আবিষ্কাররূপে ইজ্‌তিহাদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ মাসআলা রচনা করিয়া গিয়াছেন, এই পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা দেখা যায় নাই যাহার ফতওয়া তাঁহাদের কিতাবের আলোকে পাওয়া যায় নাই; আশা করা যায় ভবিষ্যতেও সেইরূপ হইবে না।

(৫) নবী না হইয়া নবীর দায়িত্ব বহনের যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ার প্রতিভা মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগের লোকের মধ্যে ছিল। হযরতের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের গৌরবময় ভূমিকা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শান্তি শৃঙ্খলার শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং ইসলামের উন্নতি দ্রুততর করার ক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদীন, বরং তাঁহাদের পরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত খলীফাগণ কৃতিত্বের যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা মুসলমানদের সোনালী ইতিহাসরূপে চিরবিদ্যমান থাকিবে।

খোলাফায়ে রাশেদীন হযরতের দায়িত্ব পালনে এবং তাঁহার আদর্শ বহনে যে সাফল্য অর্জন করিবেন, তাহার স্বীকৃতি স্বয়ং নবী (সঃ) দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ ـ

অর্থ ঃ "হে আমার উম্মত! তোমরা সুদৃঢ় থাকিবে আমার আদর্শের উপর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের উপর, যাঁহারা সত্যের প্রতীক হইবেন।"

পূর্বকালের নবীগণের উম্মতের মধ্যে এই প্রতিভা ছিল না, এমনকি স্বয়ং তাঁহাদের সহকারী আছহাবদের মধ্যেও ছিল না; তাই সে যুগে এক নবীর তিরোধানের পর তাঁহার দ্বীন বাকী রাখার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে অনতিবিলম্বে অপর নবী প্রেরণের। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে খলীফাগণ ইসলামের সর্বাত্মক উন্নতি শুধু অব্যাহত রাখাই নহে, বরং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শ ও শিক্ষার বদৌলতে ইহাকে অধিক দ্রুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হাদীছে এই তথ্যের বর্ণনা রহিয়াছে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন–

كَانَتْ بَنُوا اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهٗ نَبِىٌّ وَاِنَّهٗ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ ـ

অর্থ ঃ "বনী ইস্রাঈলকে পরিচালনা করিতেন নবীগণ– যখনই এক নবীর তিরোধান হইত, তাঁহার স্থলে অপর নবী আসিতেন। আমার পরে আর কোন নবীর আগমন হইবে না; আমার পরে খলীফাগণ হইবেন।"
(মেশকাত শরীফ– ৩২০)

এতদ্ভিন্ন মানবীয় সাধারণ গুণাবলী– যেমন সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ব, পরোপকার, দানশীলতা, দয়া, সাহসিকতা, একতা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা; এমনকি প্রভু ভক্ত ইত্যাদি অসংখ্য গুণাবলী, যদ্দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে– সেইসব গুণাবলীর অধিকারীরূপে হযরতের যুগটি ছিল শীর্ষস্থানীয় যুগ। তাঁহাদের উপর কুফর বা অন্ধকারের আবরণ পড়িয়া থাকায় কোন কোন গুণের সুষ্ঠু বিকাশ হইতেছিল না বা গুণগুলি অপাত্রে অক্ষেত্রে ব্যয়িত হইতেছিল; হযরতের উসিলায় যাঁহাদের হইত সেই আবরণ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাঁহারা এমন বিশ্ব-সেরারূপে বিকশিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের তুলনা পূর্ব ইতিহাসেও নাই, পরবর্তী ইতিহাসেও নাই এবং দুনিয়ার শেষ যুগ পর্যন্ত পাওয়াও যাইবে না। হযরতের ছাহাবীগণের ইতিহাস, যাহা অমুসলিমদের নিকটও স্বীকৃত, সেই ইতিহাসই উল্লিখিত দাবীর উজ্জ্বল প্রমাণ।

তাঁহাদের এইরূপ অতুনীয় উচ্চাসনে আসীন হওয়ার পক্ষে হযরতের সাহচর্যের প্রভাব অনেক বেশী ছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিজস্ব গুণাবলীর প্রভাবও কম ছিল না। বীজ এবং বীজ বপনকারী যতই উত্তম হউক না কেন, জমি যদি উত্তম না হয় তবে ফল ভাল হইতে পারে না। ছাহাবীদের ন্যায় সুপাত্র ও সুক্ষেত্র দ্বারা হযরত (সঃ) এমন একটি সোনালী যুগ ও সোনালী জমাত এবং পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন, যাহা বিশ্ব-জীবনের সর্বোত্তম যুগ, সর্বোত্তম জমাত ও পরিবেশ ছিল এবং সারা বিশ্বের জন্য আদর্শ হওয়ার উপযুক্ত ছিল। তাই স্বয়ং হযরত (সঃ) ছাহাবীদের যুগের প্রসংশায় বলিয়াছেন– خير القرون قرني "আমার সাহচর্যে গঠিত যুগটি হইল বিশ্ব জীবনের সর্বোত্তম যুগ।" তাঁহারা এতই উত্তম ছিলেন যে, হযরতের সোনালী আদর্শে প্রস্ফুটিত মহিমাকে তাঁহারা তিন যুগ পর্যন্ত চলমান রাখার ব্যবস্থায় সফল হইয়াছিলেন।

সুতরাং পরবর্তীকালে ইসলামের আদর্শ ও জীবনধারা খুঁজিতে হযরতের যুগ তথা ছাহাবীগণের ইতিহাস উপেক্ষা করা নিতান্তই বোকামি হইবে। হযরতের আদর্শের সঠিক খোঁজ পাইতে হইলে ছাহাবীগণের আদর্শ সম্মুখে রাখিতেই হইবে। কারণ ছাহাবীগণ হযরতের শিক্ষা ও আদর্শ যতটুকু গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার নমুনা কোথাও পাওয়া সম্ভব নহে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগ সর্বোত্তম যুগ। অর্থাৎ এই যুগের মানুষ বিভিন্ন প্রতিভা ও গুণাবলীতে পূর্বেকার যুগসমূহের মানুষ অপেক্ষা উন্নত। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপরে কতিপয় গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর প্রতিভা ও গুণাবলী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতের মধ্যে ছিল। কারণ, ইসলামের দীর্ঘায়ু লাভ এবং উন্নতির পথে উক্ত গুণাবলীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাই মুসলমানগণ ঐসব গুণে অধিক যত্নবান ও অধিক তৎপর ছিলেন।*

বলাবাহুল্য, হযরতের যুগ সর্বোত্তম হওয়ার অর্থ ও তাৎপর্য মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, বরং সেই যুগের সর্বময় মানবগুষ্ঠি প্রতিভা ও গুণাবলীতে পূর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া উদ্দেশ্য। যাহাদের ভাগ্যে ইসলাম জুটে নাই, তাহারা তাহাদের প্রতিভা ও
গুণ-বৈশিষ্ট্য জাগতিক উন্নতির পথে ব্যয় করায় নিয়োজিত হইয়াছে, ফলে ধাপে ধাপে তাহারা জাগতিক বিজ্ঞান ও আবিষ্কারে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, পূর্ব যুগে ঐ সবের কল্পনারও অস্তিত্ব ছিল না। উক্ত বিজ্ঞান

* ইহজগত ধাপে ধাপে প্রলয়ের দিকে আগাইয়া যাইতে থাকিবে; তাহার জন্য ধাপে ধাপে মুসলমানদের ইসলামী গুণাবলীর শিথিলতা অবধারিত। কারণ, ইসলাম বিলুপ্ত হইলেই জগতের বিলুপ্তি আসিতে পারিবে। তাই উল্লিখিত ইসলামী গুণাবলী উচ্চমান হইতে ধাপে ধাপে শিথিল হইয়া নিম্নমানের দিকে আসিয়াছে। পক্ষান্তরে মানব জাতির বিশেষ প্রতিভা ও গুণাবলীর জাগতিক বিজ্ঞান ও আবিষ্কার বিভাগ– যাহার আলোচনা সম্মুখে আসিতেছে– তাহার মধ্যে শিথিলতা আসে নাই, বরং দিন দিন তাহার উন্নতি বাড়িয়া চলিয়াছে। কারণ, মহাপ্রলয়ের পূর্বে জগত তাহার উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়া তারপর লয়ের পালায় আসিবে।

ও আবিষ্কার ঐ প্রতিভা গুণাবলীরই অবদান যাহার বদৌলতে হযরতের যুগ তথা তাঁহার যুগের মানুষকে উত্তম বলা হইয়াছে। এই বিভাগীয় বৈশিষ্ট্য সকলেরই বিদিত, সকলেই ইহার উপর গর্ব করে।

সারকথা– সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে ধাপে ধাপে উন্নত করিয়াছেন। মানব জাতি যখন উপরোল্লিখিত শ্রেণীর প্রতিভা ও গুণের পর্যায়ে পৌছিয়াছে– যাহা মানব জাতির জন্য সৃষ্টিকর্তা সাব্যস্তকৃত চরম উন্নতির পর্যায় ছিল, তখন বিধাতা তাঁহার হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বিশ্ব ভুবনে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের জন্য সৃষ্টিকর্তা যুগের পর যুগ বিলম্ব করিতেছিলেন এই যুগটির জন্যই– যাহা মানব জাতির প্রতিভা ও গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ যুগ। এই যুগটি আসিলে পরই আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের ব্যবস্থা করিলেন। এই তথ্যই নিম্নের হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে।

১৬৫৮। হাদীছ ঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِى اٰدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتّٰى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِىْ كُنْتُ مِنْهُ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন– মানব সমাজ যে যুগে যুগে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে (মানবীয় প্রতিভা ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে) উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, সেই উন্নতির সর্বাধিক উত্তম যুগে আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়াছে; অতপর যখন আমার আবির্ভাবের (উপযুক্ত) যুগ আসিয়াছে তখনই আমার আবির্ভাব হইয়াছে।

হযরতের জন্য দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান নির্বাচন

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইহজগতে আবির্ভূত হইবেন; সৃষ্টিকর্তা তাঁহার জন্মের জন্য বিশ্ব বুকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান মক্কা নগরীকে নির্বাচিত করিলেন।

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা তাঁহার পবিত্র কালামে মক্কা নগরীকে যেসব নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে যথেষ্ট।

(১) আল্লাহ তাআলা তাহাকে ام القرى উম্মুল কোরা আখ্যা দিয়াছেন। "উম্মুল কোরা অর্থ সমস্ত নগর-নগরীর জননী। বিশ্ব বুকে যত নাগরী আছে সবের মধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই ইহাকে এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন এই নগরী তথা ইহার কা'বা শরীফকে যেরূপ আল্লাহ তাআলা সারা বিশ্ব মানবের জন্য কেন্দ্ররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্রূপ সৃষ্টির বেলায়ও মক্কা নগরী সারা ভূমণ্ডলের কেন্দ্র ছিল। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা ভূমণ্ডল সৃষ্টিকালে সর্বপ্রথম মক্কা নগরীর খণ্ডকেই সৃষ্টি করেন এবং পরে উহা কেন্দ্র করিয়াই ভূমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করা হয়। এই সূত্রেও তাহাকে "উম্মুল কোরা" বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সকল নগর-নগরীর কেন্দ্রস্থল।

(২) আল্লাহ তাআলা তাহাকে البلد الامين আল-বালাদুল আমীন বলিয়াছেন, যাহার অর্থ শান্তির নগরী। মক্কা নগরীর এই বৈশিষ্ট্য সর্বকালে সর্বযুগেই উল্লেখযোগ্য ছিল। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এই বৈশিষ্ট্যকে এত দূর সম্প্রসারিত করিয়াছেন যে, বন্য পশু-পক্ষী এবং গাছ-পালার জন্যও তাহাকে শান্তি এবং নিরাপত্তার স্থানরূপে ঘোষণা দিয়াছেন। ঐ এলাকার কোন উদ্ভিদ বা তৃণ-লতার পাতাও ছিন্ন করা নিষিদ্ধ, ঐ এলাকার কোন বন্য পশু-পক্ষীকে তাড়া করাও নিষিদ্ধ।

মক্কা এলাকার এই শান্তি ও নিরাপত্তাকে অন্ধকার যুগের বর্বররাও শ্রদ্ধা করিত, এমনকি তাহাদের কেহ নিজ পিতার হত্যাকারীকেও এই সীমার ভিতর কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করিত না।

শান্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য এই শান্তির নগরী যথোপযুক্তই ছিল। এই মক্কা নগরী আল্লাহ তাআলার নিকটও এত অধিক সম্মানী ও মর্যাদাশীল যে, ইহার হরম শরীফের মসজিদে এক রাকাত নামাযে সাধারণ মসজিদের তুলনায় এক লক্ষ রাকআতের সওয়াব হইয়া থাকে। আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রিয় নবীর জন্য এই প্রিয় নগরীকেই নির্বাচন করিয়াছেন।

ভৌগোলিক দিক দিয়াও মক্কা নগরীর বৈশিষ্ট্য বিচিত্রময় মক্কা নগরী ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায়, মক্কা নগরী যে ভূখণ্ডের বক্ষে অর্থাৎ আরব দেশে অবস্থিত, তথা হইতে যত সহজে ও অল্প সময়ে নৌ ও স্থল পথে পৃথিবীর সকল প্রান্তে গমনাগণ করা যায়, অন্য কোন দেশ হইতে তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। অতএব জগতের মুক্তিদাতার আবির্ভাবের জন্য ভূমণ্ডলের এই এলাকাই সর্বাধিক সমীচীন ছিল।

হযরতের জন্য সর্বোত্তম বংশ নির্বাচন

এই সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বর্ণনা দান করিয়াছেন–

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর ইসমাঈল (আঃ)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন; হযরত ইসমাঈলের বংশধর কেনানা' গোত্রকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন; কেনানা গোত্রে কোরায়শ শাখাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। কোরায়শ শাখার মধ্যে হাশেমের বংশকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে আমাকে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। (মেশকাত শরীফ)

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা নিখিল সৃষ্টির মধ্যে আদম জাতকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন; আদম জাতের মধ্যে আরবীদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হাশেম বংশকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং আমাকে সেই বংশভুক্ত করিয়াছেন। (যোরকানী, ১– ৬৯)

হযরতের সময়কাল

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর একমাত্র নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, তাঁহাদের মধ্যবর্তীকালে কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যবর্তী সময়কালের পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাহারও মতে ৫৬০ বৎসর, কাহারও মতে ৫৪০ বৎসর।ঃ

(ফতহুল বারী ৭–২২২)

এই সংখ্যাকে প্রচলিত কথাবার্তায় ৬০০ বৎসর বলা নিতান্তই স্বাভাবিক। অধিক শতকের সংখ্যায় অসম্পূর্ণ শতককে শতকে পরিণত করা সাধারণ ক্ষেত্রে মোটেই দূষণীয় নহে।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই সম্পর্কে (৫৪০ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করিয়াছেন–

عَنْ سُلْمَانَ قَالَ فَتْرَةُ بَيْنَ عِيْسٰى وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ ـ

অর্থঃ "ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মধ্যবর্তী সময়কাল– যে সময়ে কোন নবীর আবির্ভাব হইয়াছিল না, ছয় শত বৎসর ছিল।"

ব্যাখ্যা ঃ সালমান ফারেসী (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত ঈসার ধর্মাবলম্বী– নাসরানী হইয়াছিলেন। তিনি সেই ধর্মের একজন বিশেষ সাধক ছিলেন এবং সেই ধর্মের অনেক বিশেষজ্ঞের শিষ্যত্ব ও সাহচর্য তাঁহার লাভ হইয়াছিল। তাঁহার বয়স-মাত্রা ছিল অসাধারণ। হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লারে মদীনায় আসার পর ঈমান আনিয়াছিলেন এবং ৩৬ হিজরী সনে ওফাত

পাইয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ২৫০ বা ৩৫০ বৎসর। কাহারও মতে তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর এক শিষ্যের সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন। (হাশিয়া বোখারী- ৫৬২)

হযরতের পবিত্র নসব বা বংশ পরিচয় (পৃঃ ৫৪৩)

মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (১) পিতা আবদুল্লাহ, (২) পিতা আবদুল মোত্তালেব (৩) পিতা হাশেম, (৪) পিতা আব্‌দে মনাফ, (৫) পিতা কুসাই, (৬) পিতা কেলাব, (৭) পিতা মোর্‌রাহ, (৮) পিতা কা'ব (৯) পিতা লুআই, (১০) পিতা গালেব, (১১) পিতা ফেহ্‌র, (১২) পিতা মালেক, (১৩) পিতা নজর, (১৪) পিতা কেনানা, (১৫) পিতা খোযায়মা (১৬) পিতা মোদ্‌রেকাহ্, (১৭) পিতা ইল্‌য়াস (১৮) পিতা মোজার, (১৯) পিতা নেযার, (২০) পিতা মাআদ্দ, (২১) পিতা আ'দ্‌নান।

বোখারী (রঃ) এই ২১ পোশ্‌তই উল্লেখ করিয়াছেন। এই ২১টি পোশ্‌ত এবং তাহাদের নামগুলি সম্পর্কে মতভেদ নাই। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) স্বীয় বংশ বর্ণনায় উক্ত ২১ পোশ্‌তই উল্লেখ করিতেন। (ফতহুল বারী ৭-১৩২)

উল্লিখিত "ফেহ্‌র" নামীয় ব্যক্তির উপনাম ছিল "কোরায়শ" এবং তিনি কোরায়েশ নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার হইতেই তাঁহার বংশধরগণ কোরায়েশ আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। অভিধান মতে "কোরায়শ" এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর নাম; সেই প্রাণীটি অতিশয় শক্তিশালী, সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণীর রাজা। ঐ শ্রেণীর প্রশংসনীয় গুণের সূত্রেই ফেহ্‌রের এই উপনাম অবলম্বিত হইয়াছিল।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বংশ তালিকার তিনটি অংশ-

(১) মাথার অংশ মুহাম্মদ (সঃ) হইতে "আদ্‌নান" পর্যন্ত। (২০) গোড়ার অংশ ইসমাঈল (আঃ) হইতে আদম (আঃ) পর্যন্ত। (৩) মধ্যভাগের অংশ "আদ্‌নান" হইতে ইসমাঈল (আঃ) পর্যন্ত। প্রথম অংশটি একুশ পোশ্‌তের- সর্বসম্মত ও অকাট্যরূপে কোন প্রকার বিভিন্নতা ব্যতিরেকে প্রমাণিত রহিয়াছে, যাহা ইমাম বোখারীর (রঃ) বর্ণনায় উপরে উল্লেখ হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশটি একুশ পোশ্‌তের; তাহাও প্রায় সর্বসম্মত, অবশ্য আদিকালের নামগুলি ভাষান্তরে স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন আকার-আকৃতি ধারণ করিয়াছে। হিব্রু ভাষা হইতে যখন আরবীতে আসিয়াছে তখন নিশ্চয় কিছু বিকৃতি ঘটিয়াছে। যেমন, বাংলার 'দ' অক্ষর সম্বলিত নাম ইংরাজীতে লেখা হইলে তাহা 'ড' হইয়া যাইবে। আরবী হইতে বাংলায় আসিলেও নিশ্চয় বিভিন্নতা সৃষ্টি হইবে। কারণ, আরবী ভাষার জের, জবর, পেশ দ্বারা শব্দের আকৃতি গঠিত হয়, বাংলাভাষায় তাহা া, ি, ু দ্বারা হইয়া থাকে; কিন্তু আরবী জের, জবর, পেশ ছাড়াই সাধারণত লেখা হইয়া থাকে। পাঠকের নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহা ব্যবহার করিতে হয়। পক্ষান্তরে বাংলা শব্দ া, ি, ু ছাড়া লেখা যায় না, এতদ্ভিন্ন আরবীতে "জবর" স্থান বিশেষে "অ" এবং স্থান বিশেষে "আ" এবং "জের" "ি" ও "ে" লেখা হয়- ইত্যাদি। এইসব কারণে আদিকালের ঐ নামগুলির আবৃত্তি এবং ভাষান্তরে নানা আকারে বিভিন্নতা আসিয়াছে। নিম্নে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইল-

(১) ইসমাঈল (আঃ), (২) ইব্রাহীম (আঃ) (৩) তারেখ- অনেকে "তারেহ্" লিখিয়াছেন এবং অনেকের মতে তাঁহারই আর এক নাম "আযর" (৪) নাহ্‌র (৫) সরুগ- এই নামের উচ্চারণে বিভিন্ন মত রহিয়াছে; সারূ, শারূগ, আশরাগ, শারুখ, সরূহ (৬) রাউ (৭) ফালখ- কাহারও মতে ফালজ বা ফালগ। (৮) আইবার- কাহারও মতে আবর বা গাবর (৯) শালাখ- কাহারও মতে শালাহ (১০) আরফাখশাজ- কাহারও মতে আরফাখশাদ (১১) সাম- পুত্র নূহ (আঃ) (১২) নূহ (আঃ) (১৩) লমক- কাহারও মতে লামক (১৪) মাত্তুশালাখ (১৫) আখ্‌নুখ- তিনিই নবী ইদ্রিস (আঃ) (১৬) ইয়ার্দ (১৭) মাহলায়েল (১৮) কাইনাল- কাহারও মতে কায়েন। (১৯) ইয়ানেশ- কাহারও মতে আনূশ (২০) শীছ (আঃ) (২১) আদম (আঃ)।

মধ্য অংশ তথা ইসমাঈল (আঃ) ও "আদ্‌নান"-এর মধ্যবর্তী অংশে বিরাট মতভেদ এবং ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় বিভিন্ন অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। নামের বিভিন্নতা ত আছেই, সংখ্যার মতভেদও আশ্চর্যজনক। অনেকের মতে এই অংশের সংখ্যা মাত্র ৭ বা ৮ জনের; আর কাহারও মতে সংখ্যা আরও অনেক বেশী। সীরত রচনায় ইতিহাস মন্থনকারী বিশিষ্ট লেখক মরহুম শিবলী নোমানী তাঁহার "সীরতুন নবী" গ্রন্থে সর্বোচ্চ ৪০ সংখ্যার খোঁজ দিয়াছেন। আমরাও বিশেষ ইতিহাস গ্রন্থ "তারীখে তাবারী" এর মধ্যে ৪০ সংখ্যার মতের উদ্ধৃতি দেখিয়াছি। ৪০ সংখ্যার অধিক সম্পর্কে কোন মতামত আছে বলিয়াও আমরা খোঁজ পাই নাই। বাংলাভাষায় বিশ্বনবীর জীবনী রচয়িতাগণের একজন লেখক এই অংশে ৪০ সংখ্যাও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন; তিনি ৪৭ সংখ্যক নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যেই বরাত দিয়াছেন তাহা যাচাই করা সম্ভব হয় নাই, তবে এই উদ্ধৃতির কোন স্থানে নিশ্চয় গরমিল হইয়াছে বলিয়া ধারণা।

এত দীর্ঘ মতবিরোধ লক্ষ্য করিয়াই অধিকাংশ সীরাত লেখক বংশ তালিকার বর্ণনায় "আদ্‌নান" পর্যন্ত ক্ষান্ত হইয়াছেন; সতর্কতায় ইহাই উত্তম।

নবীজীর জীবনী রচনায় বিশেষ গ্রন্থ "সীরাতে ইবনে হেশাম"– ইহার মূল গ্রন্থ আমাদের নিকট রহিয়াছে। এই গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ে আট সংখ্যক নামই উল্লেখ হইয়াছে। "সীরাতুন নবী" লেখক ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের নিকট এই সংখ্যাই বিশেষ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কারণ, বিভিন্ন ইতিহাসবিদের সিদ্ধান্তে ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামের দুনিয়ায় আগমন হইতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) পর্যন্ত সর্বমোট সময়কাল ছয় হাজার বৎসরের উর্ধে। এবং ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পিতা ইব্রাহীম (আঃ) উক্ত সময়ের মাঝামাঝিকালে বর্তমান ছিলেন। কারণ, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হইতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত তিন হাজার বৎসরের সামান্য উপরে, আর আদম আলাইহিস সালামের দুনিয়ায় অবতরণ হইতে ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত ৩ হাজার বৎসরের উপরে।

দ্বিতীয় তিন হাজার বৎসরের তথা আদম (আঃ) হইতে ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বংশ-সূত্রের মাধ্যম হইলেন বিশ জন।

প্রথম তিন হাজার বৎসরে "আদ্‌নান" পর্যন্ত ত মধ্যের সংখ্যা ২১ জন আছেনই; তদুপরি আদ্‌নান হইতে ইসমাঈল (আঃ) পর্যন্ত ৪০ বা ৪৭ জন হইলে এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে সংখ্যা দাঁড়ায় ৬১ বা ৬৮; এই সংখ্যার অসামঞ্জস্য ২০ সংখ্যার সহিত অনেক বেশী। পক্ষান্তরে "আদ্‌নান" হইতে ইসমাঈল (আঃ) পর্যন্ত মাধ্যম সংখ্যা আট হইলে প্রথম তিন হাজার বৎসরে সর্বমোট মাধ্যম সংখ্যা ২৯, যাহা ২০ সংখ্যার নিকটবর্তী। দুনিয়ার প্রথম দিকে এবং শেষ দিকে মানুষের বয়সের যে বেশকম আছে সে অনুপাতে এইরূপ নিকটবর্তী ব্যবধানই যথেষ্ট মনে হয়; ৬১+৬৮ = এর সংখ্যার সহিত ২০ সংখ্যার যে অধিক ব্যবধান তাহা অসঙ্গত মনে হয়।

হযরতের রক্তধারায় আব্‌দিয়ত

মানুষ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি; সৃষ্টির সর্বোপরি মহত্ব হইল সৃষ্টিকর্তার দাসত্বে আত্মনিবেদন– নিজেকে উৎসর্গীকরণ। মানুষ জ্ঞান-বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টি; তাহাকে সৃষ্টিকর্তা পরীক্ষার পাত্র বানাইয়াছেন, তাই তাহাকে স্বায়ত্তশাসিত ক্ষমতার অংশও দিয়াছেন; দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ বা স্বেচ্ছাচারী– উভয় পথই তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত। মানুষ জ্ঞান-বিবেক খাটাইয়া স্বেচ্ছাচারিতা পরিহারপূর্বক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার দাসত্বে আবদ্ধ জীবন যাপন করুক; মানুবের প্রতি আল্লাহর আদেশ ও দাবী ইহাই। পবিত্র কোরআনে আছে–

"মানুষকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি একমাত্র আমার দাসত্বের জন্য– তাহাদের হইতে আমার একমাত্র দাবী ইহাই।" এই দাসত্বের চরম পর্যায়কে "আব্‌দিয়ত" বলা হয়! অতএব, আব্‌দিয়তের অর্থ হইল, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার দাসত্বে আত্মনিবেদন ও নিজকে চরম উৎসর্গীকরণ। সুতরাং এই আব্‌দিয়তই হইল মানুষের

মূল উন্নতির সোপান। আব্‌দিয়তহীন মানুষের জীবন ব্যর্থ; সে সৃষ্টিকর্তার দাবী আদায়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। পক্ষান্তরে এই আব্‌দিয়তের পরিণামেই আল্লাহ তাআলার নিকট মানুষের মর্তবা এবং নৈকট্য লাভ হইয়া থাকে।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মধ্যে এই আব্‌দিয়তের চরম পর্যায় বিদ্যমান ছিল। হযরতের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই আব্‌দিয়ত; হযরত (সঃ) তাঁহার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আব্‌দিয়তকে আঁকড়াইয়া থাকিতেন। তাঁহার প্রতিটি কার্যে আব্‌দিয়ত তথা সৃষ্টিকর্তার দাসত্বে নিবেদিতপ্রাণ থাকিতে ভালবাসিতেন।

হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা! আমি ইচ্ছা করিলে পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আমার জন্য লাভ করিতে পরিতাম। আমার নিকট এক (বিরাটকায়) ফেরেশতা আসিয়াছিলেন, যাঁহার কোমর কা'বা শরীফের গৃহের ছাদ সমান। তিনি আসিয়া বলিলেন, আপনার প্রভু-পরওয়ারদেগার আপনার নিকট সালাম পাঠাইয়াছেন এবং আপনাকে এই স্বাধীনতা দিয়াছেন যে, ইচ্ছা করিলে আপনি পূর্ণ আব্‌দিয়ত সম্বলিত নবী থাকিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে রাজ্যাধিপতি নবীও হইতে পারেন। ঐ সময় জিব্রাঈল (আঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (সৃষ্টিগতভাবেই এই পরিমাণ আব্‌দিয়তধারী ছিলেন যে, উক্ত বিষয়ের নির্বাচনও নিজ ইচ্ছায় করিলেন না– তাহার জন্যও তিনি প্রভুর স্থায়ী দূত) জিব্রাঈলের প্রতি পরামর্শ চাওয়ার দৃষ্টিতে তাকাইলেন। জিব্রাঈল (আঃ) ইশারায় পরামর্শ দিলেন যে, আপনি বিনয়– আত্মবিলীনতা অবলম্বন করুন। সেমতে হযরত নবীজী (সঃ) ঐ ফেরেশতার কথার উত্তরে বলিলেন, আমি আব্‌দিয়ত সম্বলিত নবীই থাকিব।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এই ঘটনার পর হইতে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হেলান দেওয়া বা নিতম্বে ভর করা অবস্থায় বসিয়া খানা খাইতেন না। শুধু পদদ্বয়ের ভরে বসিয়া খানা খাইতেন এবং) বলিতেন, আমি ঐরূপেই খাইতে বসিব যেরূপে গোলাম খাইতে বসে। সাধারণ বসায়ও ঐরূপ (বিনয়ী আকারে) বসিব যেরূপ গোলাম বসিয়া থাকে। (মেশকাত শরীফ, ৫২১)

আব্‌দিয়তের এই চরম উৎকর্ষ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে ত ছিলই; তাহার আরও অধিক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে হযরতের পূর্বপুরুষদের বিশেষ রক্তধারা। আব্‌দিয়ত তথা আল্লাহর জন্য উৎসর্গীত হওয়ার যে চরম ও পরমতর পর্যায় আছে– আল্লাহর জন্য নিজেকে বলিদান বা কোরবানী করা– তাহা বিশ্ব ইতিহাসে দুই জন লোকের জীবনীতেই দেখা যায়। সেই উভয় জন হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঊর্ধ্বতন পুরুষ। হযরত (সঃ) নিজেই বয়ান করিয়াছেন, انا ابن الذبيحين "আল্লাহর জন্য নিজেকে বলিদান বা কোরবানীকারী ব্যক্তিদ্বয়ের পুত্র আমি।"

উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের একজন ছিলেন হযরতের ঊর্ধ্বতন পিতা ইসমাঈল (আঃ)*। তাঁহার ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ; পবিত্র কোরআনেও সেই ইতিহাস বর্ণিত রহিয়াছে (চতুর্থ খণ্ড হযরত ইব্রাহীমের (আঃ)-এর বয়ান দ্রষ্টব্য) অপরজন হইলেন হযরতের পিতা আবদুল্লাহ।

---

* হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তাআলার আদেশ মতে যেই পুত্রকে কোরবানী করিতে গিয়াছিলেন সেই পুত্র ইসমাঈল (আঃ) বটে; ইসহাক (আঃ) নহেন। এই বিষয়ের একটি সহজ প্রমাণ এই যে; ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী যখন একদল ফেরেশতা মারফত আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে পৌঁছাইয়াছিলেন তখন ইহাও বলা হইয়াছিল যে; "ইসহাক হইতে সুদীর্ঘ বংশ চলিবে।" তওরাতেও আছে– "খোদা ইব্রাহীমকে বলিলেন; তোমার বিবি ছারা একটি ছেলে জন্ম দিবে; তুমি তাহার নাম ইসহাক রাখিবে; আমি তাহার হইতে সুদীর্ঘ বংশ চালাইব।" (সীরাতুন নবী ১, ১০২) পবিত্র কোরআনেও এই শ্রেণীর বর্ণনা রহিয়াছে। যথা– "ফেরেশতাগণ ইব্রাহীম (আঃ)-কে সুসংবাদ দিলেন ইসহাক (আঃ)-এর জন্ম লাভ করার এবং ইসহাকের উত্তরাধিকার হইবেন ইয়া'কুব (আঃ), সেই সংবাদও ফেরেশতাগণ দিলেন!" সুতরাং যখন ইসহাকের জন্মের পূর্ব হইতে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা ছিল যে, ইসহাকের বংশ ও উত্তরাধিকারী চলিবে– ইহার অর্থ এই ছিল যে, ইসহাক জীবিত থাকিবেন। তখন সেই আল্লাহর তরফ হইতে ইসহাকের কোরবানী করার আদেশ হইতে পারে না।

তওরাত ও ইঞ্জীল কিতাব ত ইহাদের বাহক নবীগণের পরে বিকৃত হইয়া গিয়াছে; ইহুদী-নাসারাগণ ঐ কিতাবদ্বয়কে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহুদীরা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বংশকে আল্লাহর নামে কোরবান হওয়ার বৈশিষ্ট্য হইতে বঞ্চিত করার জন্য তওরাত কিতাবে এই প্রসঙ্গটি বিকৃত করিয়া লিখিয়াছে যে, ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার যেই পুত্রকে কোরবানী করিতে গিয়াছিলেন তিনি ইসহাক (আঃ)। ইহা তাহাদের জঘন্য মিথ্যাসমূহের একটি অন্যতম মিথ্যা।

হযরতের পিতা আবদুল্লাহর কোরবানী হওয়া

হযরতের দাদা– আবদুল্লাহর পিতা আবদুল মোত্তালেব একটি সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বিশেষ স্মৃতি বরকত ও মঙ্গল-ভাণ্ডার যমযম-কূপ বহু দিন হইতে মাটির নীচে লুপ্ত হইয়া রহিয়াছিল; আবদুল মোত্তালেবের হাতে তাহার বিকাশ হইয়াছিল। গায়েবী সাহায্যে তিনি তাহার আবিষ্কারক হওয়ার গৌরবে ধন্য হইলেন।

যমযম কূপ বিলুপ্ত হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই যে, মক্কা নগরীর আদি অধিবাসী ছিল "জুরহুম গোত্র"– যাহারা হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও তাঁহার মাতা বিবি হাজেরার সময়েই মক্কা এলাকায় বসবাস অবলম্বন করিয়াছিল; তাহাদের মধ্যেই ইসমাঈল (আঃ) বিবাহ করিয়াছিলেন। মক্কা নগরীর কর্তৃত্ব এই গোত্রের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তাহাদের আমল-আখলাক বিনষ্ট হইলে আল্লাহ তাআলার শাস্তিস্বরূপ তাহাদিগকে তথা হইতে বিতাড়নকারী এক পরাক্রমশালী শত্রুর আক্রমণ তাহাদের উপর আসিল। তখন তাহাদের মধ্যে "আম্‌র ইবনুল হারস ইবনুল মেজমাম" নামক ব্যক্তি তাহাদের সর্দার ছিল। শত্রুর আক্রমণে তাহারা পলায়নে বাধ্য হইলেন তাহাদের সর্দার আমর ইবনুল হারস তাহার বিশেষ বিশেষ ধন-রত্ন এবং অস্ত্র শস্ত্র যমযম কূপের মধ্যে ফেলিয়া কূপ ভরাট করতঃ এমনভাবে বন্ধ করিয়া দিল, যেন তাহার কোন নিদর্শনও দেখা না যায়– এইভাবে ঐ কূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। (যোরকানী, ১– ৯২)

পুরাতন ইতিহাসরূপে যমযম কূপের চর্চা ছিল, কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন ছিল না। খাজা আবদুল মোত্তালেব যমযম কূপ আবিষ্কার করার জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন; কিন্তু সঠিক কোন নিদর্শন তাঁহার জানা ছিল না, তাই আদেশ কার্যকরী করিতে পারিতেছিলেন না; স্বপ্নও পুনঃ পুনঃ দেখিতেছিলেন। শেষবার স্বপ্নে নিদর্শনও পাইলেন যে, প্রভাতে এক স্থানে পিপীলিকার বাসা দেখিতে পাইবে এবং দেখিবে, কাক ঠোঁট দ্বারা মাটি খুঁড়িতেছে। আবদুল মোত্তালেবের তখন একটি মাত্র পুত্র ছিল– হারেস। ভোরবেলা আবদুল মোত্তালেব হারেসকে সঙ্গে লইয়া কা'বা ঘর এলাকায় আসিয়া ঐ নিদর্শন– পিপীলিকার বাসা এবং কাকের মাটি খোঁড়া দেখিতে পাইলেন; ঐ জায়গাটিতে মক্কাবাসীরা সেই আমলে তাহাদের দেব-দেবীর নামে জীব বলিদান করিত। আবদুল মোত্তালেব হারেসকে লইয়া ঐ স্থান খনন আরম্ভ করিলেন। কোরায়শের লোকেরা তাঁহাকে বাধা দিল; শেষ পর্যন্ত হারেসকে বাধার মোকাবিলায় দাঁড় করাইয়া মাটি খনন আরম্ভ করিলেন। অল্প কিছু খননের পরই কূপের বেড় বাহির হইল; আব্দুল মোত্তালেব আনন্দে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। পূর্ণরূপে আবিষ্কারের পরে তাহাতে তৈয়ারী দুইটি স্বর্ণ হরিণ এবং কতিপয় তরবারি ও লৌহবর্ম পাওয়া গেল। উক্ত এলাকার আদি নিবাসী জুরহুম গোত্র ঐসব জিনিস তথায় রাখিয়াছিল। এই সব মালামালের ব্যাপারেও কোরায়েশের লোকজনের সহিত আব্দুল মোত্তালেবের কলহ বাধিল। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী আবদুল মোত্তালেব ঐসব মালামাল সম্পর্কে তাঁহার নিজের ও কোরায়শের লোকজনের এবং কা'বা গৃহের নামের ভিন্ন ভিন্ন লটারি করার প্রস্তাব দিলেন। সকলে তাহাতে সম্মত হইয়া লটারী করিল। তখন আবদুল মোত্তালেব আল্লাহর নিকট আরাধনা করিতেছিলেন। লটারিতে স্বর্ণ হরিণদ্বয় কা'বা গৃহের নামে উঠিল এবং অস্ত্রসমূহ আবদুল মোত্তালেবের নামে আসিল; কোরায়েশগণ ফাঁকা গেল। দ্বিতীয় খণ্ড ৮৩০ নং হাদীছে যে কা'বা শরীফের পোতায় প্রোথিত স্বর্ণ-রৌপ্যের উল্লেখ আছে, সেই ধন-রত্নের মধ্যে উক্ত স্বর্ণ-হরিণদ্বয়ও রহিয়াছে। তারপর যমযম কূপের স্বত্বাধিকার নিয়াও আব্দুল মোত্তালেবের সহিত কোরায়শদের বিরোধ দেখা দিল। তাহার মীমাংসার জন্য উভয় পক্ষ এক গণক-ঠাকুরের উদ্দেশে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে পানির অভাবে পিপাসায় তাহাদের সকলের মৃত্যু আসন্ন হইয়া পড়িল। তাহারা মৃত্যু প্রহরের অপেক্ষায় এক স্থানে জড় হইয়া পতিত ছিল। আবদুল মোত্তালেব সকলকে বলিলেন, হাত-পা গুটাইয়া মৃত্যুবরণ করা কাপুরুষের লক্ষণ; শক্তি থাকা পর্যন্ত পানির তালাশে বাহির হওয়া কর্তব্য; আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে কোথাও পানির খোঁজ দিতে

পারেন। সেমতে সকলেই তথা হইতে পানির তালাশে যাত্রা করায় তৎপর হইল। আবদুল মোত্তালেবও স্বীয় বাহনের উপর আরোহণ করিলেন; বাহন উটটি তাঁহাকে লইয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পায়ের নীচ হইতে পানি উথলিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। আব্দুল মোত্তালেব আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়া উঠিলেন; সকলে ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া পানি পান করিল এবং সকলে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল। এই ঘটনায় কোরায়শের লোকজন আবদুল মোত্তালেবের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হইয়া পড়িল এবং সকলে একবাক্যে বলিল, হে আব্দুল মোত্তালেব! আপনার সহিত আমাদের আর কোন বিরোধ নাই, যেই মহান আপনাকে এই মরুভূমিতে পানি দান করিয়াছেন, তিনিই আপনাকে যমযম কূপও দান করিয়াছেন; তাহার উপর একমাত্র আপনারই অধিকার থাকিবে। সেমতে হাজীদিগকে যমযম কূপের পানি পান করাইবার সেবা সৌভাগ্য বংশ পরম্পরা আবদুল মোত্তালেবের বংশেরই নির্ধারিত থাকিল (দ্বিতীয় খণ্ড ৮৫৩ হাদীছ দ্রষ্টব্য)। এই সব ঘটনা ঘটিবার সময় আব্দুল মোত্তালেব একটি মাত্র পুত্রের পিতা ছিলেন। তিনি যমযম কূপের ব্যাপারে কোরায়শদের বিগত বিরোধে যে ব্যথা পাইয়াছিলেন তাহা ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল অধিক পুত্র লাভের; যাহাতে তিনি কোরায়শদের বিরোধ ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হইতে পারেন। সেমতে তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমার দশটি পুত্র লাভ হইলে এবং তাহারা সকলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তন্মধ্যে একটি পুত্র আমি আল্লাহর নামে কোরবানী করিব।

আল্লাহ তাআলার কুদরত– আবদুল মোত্তালেব একে একে দশটি পুত্র লাভ করিলেন; সর্বকনিষ্ঠ পুত্র হইলেন আবদুল্লাহ– যিনি মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভাবী পিতা। আবদুল মোত্তালেবের পুত্রদের মধ্যে সর্বাধিক আদর-সোহাগের পুত্র ছিলেন আবদুল্লাহ; তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির উপরই আবদুল মোত্তালেবের মান্নত বা প্রতিজ্ঞা পূরণ করা জরুরী হইয়া পড়িল। সেমতে একদিন আবদুল মোত্তালেব পুত্রদেরকে ডাকিয়া তাহাদিগকে স্বীয় মান্নতের মর্ম জ্ঞাত করিলেন এবং কোরবানীর জন্য একজনকে নির্ধারিত করার উদ্দেশে লটারি করিলেন। অদৃষ্টের পরিহাস– লটারিতে কোরবানীর জন্য আবদুল্লাহর নাম উঠিল। পিতা-পুত্র উভয়ে মান্নত পূরণে প্রস্তুত হইলেন এবং আবদুল মোত্তালেব এক হাতে ছুরি, অপর হাতে আবদুল্লাহকে লইয়া কোরবানীর স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথের মধ্যে কোরায়শদের লোকজন বিশেষতঃ আবদুল্লাহর মাতুল আবদুল মোত্তালেবকে বাধা দিয়া বলিলেন, এই ব্যাপারে সর্বশেষ প্রচেষ্টায় বাধ্য না হইয়া এই কার্য আমরা সম্পন্ন করিতে দিব না।

সেকালে মাদীনায় একজন বিশিষ্ট ঠাকুরানী ছিল; সাব্যস্ত করা হইল সেই ঠাকুরানীর নিকট হইতে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে। আবদুল মোত্তালেব কতিপয় লোকসহ সেই ঠাকুরানীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। ঠাকুরানী ঘটনা শ্রবণান্তে বলিয়া দিল, অদ্য তোমরা চলিয়া যাও; পরে পুনরায় সাক্ষাত করিও। আবদুল মোত্তালেব ঠাকুরানীর নিকট হইতে আসিয়া আল্লাহ তাআলার নিকট আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন এবং পরদিন পুনরায় ঠাকুনীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তৎকালের প্রথানুযায়ী একজন মানুষের জীবন বিনিময় দশটি উট ছিল; অতএব অদ্য ঠাকুরানী তাহাদের কাম্য বিষয়ের ফয়সালা এই শুনাইল যে, দশটি উট এবং আব্দুল্লাহ উভয়ের মধ্যে লটারি করিবে; যদি উট দলের দিকে কোরবানী করা সাব্যস্ত হইয়া যায় তবে আবদুল্লাহর বদলে দশটি উট কোরবানী করিবে, আর যদি এই লটারিতেও কোরবানীর জন্য আবদুল্লাহর নাম উঠে, তবে ঐ দশটি উটের সহিত আরও দশটি উট যোগ করিয়া বিশটি উট ও আব্দুল্লার মধ্যে পুনঃ লটারি করিবে। এইরূপে যাবৎ কোরবানীর জন্য লটারিতে উটের নাম না আসিবে প্রতিবার দশটি করিয়া উট যোগ করতঃ লটারি করিতে থাকিবে– যত সংখ্যার উপর যাইয়া লটারিতে উট কোরবানীর নাম আসিবে সেই সংখ্যক উট কোরবানী করিয়া দিলে আবদুল্লাহ কোরবানী হইতে রেহাই পাইয়া যাইবে।

আবদুল মোত্তালেব এই ফয়সালা লইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ঐরূপে লটারির ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। নয় বার পর্যন্ত লটারিতে আবদুল্লাহর নামই আসিতে লাগিল; পুনরায় দশ দশ উট বর্ধিত করিলে উটের সংখ্যা একশত পূর্ণ হইল এবং দশমবার লটারি দেওয়া হইল; এইবার উটের নামে লটারি আসিল।

কোরায়শের লোকজন সকলেই আনন্দিত হইল এবং বলিল, হে আবদুল মোত্তালেব, ধন্য হও! পরওয়ারদেগারকে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা তোমার পক্ষে সফল হইয়াছে। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, আমি আশ্বস্ত হইব না যাবত একশত উট ও আবদুল্লাহর মধ্যে তিনবার লটারি করিয়া না দেখি। এই বলিয়া আব্দুল মোত্তালেব আল্লাহর দরবারে আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং লোকেরা দ্বিতীয়বার লটারি করিল; এইবারও কোরবানীর জন্য লটারিতে উটের নামই আসিল। তৃতীয়বার আবার ঐরূপে আবদুল মোত্তালেব আরাধনায় লিপ্ত হইলেন এবং এইবারও লটারিতে উটের নামই আসিল। আব্দুল মোত্তালেব সন্তুষ্ট চিত্তে একশত উট কোরবানী করিয়া সম্পূর্ণ গোশ্ত লোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন।*

(সীরতে ইবনে হেশাম, ১৪৩-১১৫৫)

এইভাবে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভাবী পিতা খাজা আবদুল্লাহ কোরবানী হওয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)- পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহ তাআলার নামে কোরবানী হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যাওয়ায় আল্লাহর বিশেষ কুদরতে কোরবানী হওয়া হইতে রেহাই পাইয়াও আব্‌দিয়ত তথা আল্লাহর জন্য উৎসর্গ হওয়ার পূর্ণ মর্যাদার ভাগী হইয়াছিলেন. যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে। তদ্রূপ আব্দুল মোত্তালেব ও আবদুল্লাহ উভয় পিতা-পুত্র আল্লাহর নামে কোরবানীর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যাওয়ায় কোরবানী হইতে রেহাই পাইয়াও আব্‌দিয়ত তথা আল্লাহর জন্য উৎসর্গের বিকাশ সাধনে পূর্ণ সফলকাম হইয়াছিলেন। সেই আব্‌দিয়তের রক্তধারাই হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মধ্যে আসিয়াছিল- যাহার ইঙ্গিত দানে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন- انا ابن الذبيحين -অর্থাৎ আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে দুই জন এরূপ ছিলেন যাঁহারা আল্লাহর জন্য কোরবানী হইয়াছিলেন; তাঁহাদের রক্তধারা আমার মধ্যে প্রবাহমান।

হযরতের বংশের সম্পর্ক মদীনার সহিত

আল্লাহ তাআলার শান- হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য কাল কাটিবে মদীনায়, এমনকি শেষ শয়নও মদীনায়ই হইবে। সুতরাং পূর্ব হইতেই মদীনার সহিত তাঁহার সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন অতি বাঞ্ছনীয়। সেমতে কুদরতে এলাহী তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেবের পিতা হাশেম- যিনি হযরতের গোত্রশাখা বনু হাশেমের মূল, তিনি মদীনার এক সম্ভ্রান্ত গোত্র বন নাজ্জার বংশের "সালমা" নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হযরতের পিতামহ হাশেম কোন প্রয়োজনে মদীনায় আসিয়াছিলেন এবং এই বিবাহ করিয়া অনেক দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেব এই সালমার গর্ভেই জন্মলাভ করেন। তাঁহার জন্মের পর হাশেম মক্কায় চলিয়া আসেন, কিন্তু শিশু আবদুল মোত্তালেব মদীনায়ই মাতার নিকট থাকিয়া যান। আব্দুল মোত্তালেব মদীনায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, ইতিমধ্যে হাশেম মারা গেলেন। তাঁহার ভ্রাতা মোত্তালেব ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিবার জন্য মদীনায় আসিলেন; সালমা পুত্রকে দিতে রাজি হইতেছিল না, পুত্রও তাহার অনুমতি ছাড়া যাইতে রাজি নহে। মোত্তালেব প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রকে না লইয়া বাড়ী ফিরিব না। অবশেষে মোত্তালেব তাঁহার চেষ্টায় সফল হইলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। মক্কার লোকেরা হাশেমের এই পুত্রকে কেহ কোন সময় দেখে নাই, তাই প্রথমে তাহারা ছেলেটিকে মোত্তালেবের সহিত দেখিয়া ভাবিল, ছেলেটি মোত্তালেবের দাস- সেই মর্মে ছেলেটিকে "আবদুল মোত্তালেব- মোত্তালেবের দাস" আখ্যায়িত

০ উক্ত ঘটনার পর হইতে মানুষের জীবন বিনিময় একশত উট প্রদানের প্রচলন হইয়া পড়ে। এমনকি ইসলামী শরীয়তের বিধানেও যে ক্ষেত্রে "কেসাস" তথা খুনের বদলা খুন হয় না- যেমন, অনিচ্ছাকৃত খুন কিম্বা খুনের বিনিময়ে বাদী পক্ষ যদি জীবন বিনিময় গ্রহণে সম্মত হয় তবে সেই ক্ষেত্রে একশত উট দেওয়ার বিধান রহিয়াছে। ফেকাহ শাস্ত্রে ইহাকেই "দিয়াত" বলা হয়।

করিল। মোত্তালেব লোকদিগকে প্রকৃত খবর জানাইয়া বলিলেন, ছেলেটি আমার ভ্রাতা হাশেমের পুত্র– তাহার নাম "শায়বাতুল হাম্‌দ" কিন্তু, "আবদুল মোত্তালেব" আখ্যা আর মুছিল না। আজও হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেব নামেই পরিচিত।

হাশেমের এই সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই মদীনাবাসীগণ মক্কার কোরায়শ বংশীয় বনু হাশেমকে ভাগিনার গুষ্টি গণ্য করিয়া থাকিত। (তৃতীয় খণ্ড– ১৪৩১ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

হযরতের শাখা গোত্র বনু হাশেমের বৈশিষ্ট্য

কোরায়েশ বংশ সমগ্র আরবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্র হিসাবে পরিগণিত ছিল। কা'বা শরীফের উপর তাঁহাদেরই কর্তৃত্ব ছিল, হাজীদের সর্বপ্রকার সেবা বিশেষতঃ তাঁহাদের পানির যোগাড় তাঁহারাই করিতেন। আবদে মনাফের পরে এইসব বৈশিষ্ট্য হাশেমের উপর ন্যস্ত হয়। হাশেম দানশীল ছিলেন; তিনি হাজীদিগকে রুটিও খাওয়াইয়া থাকিতেন। এমনকি এক বৎসর কোরায়শদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; কাহারও সাহায্য পাওয়ার আশা ছিল না; হাশেম তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি ব্যয় করিয়া হাজীদের সেবার ব্যবস্থা একাই করিলেন। হাশেমের মৃত্যুর পর হাজীদের সেবার কাজ মোত্তালেব গ্রহণ করেন; তাঁহার মৃত্যুর পর হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেব হাজীদের পানি এবং সমুদয় সেবার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেন, কোরায়শদের উপর সর্বপ্রকারের কতত্ব-নেতৃত্বও তিনি লাভ করেন। তাঁহার জাতির ভালবাসা ও শ্রদ্ধা লাভে তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে সক্ষম হন। এই জন্যই রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় আত্মমর্যাদা প্রকাশ ক্ষেত্রে আবদুল মোত্তালেবের সম্পর্ক উল্লেখ করিয়াছেন। (তৃতীয় খণ্ড ১৩৭৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

হযরতের মাতুল

হযরতের পিতা আবদুল্লাহর কোরবানী হওয়ার ব্যাপার সম্পর্কীয় ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। খাজা আবদুল্লাহ কোরবানী হইতে রেহাই পাইলে পর তাঁহার বিবাহের জন্য আবদুল মোত্তালেব প্রস্তুত হইলেন। আব্দুল মোত্তালেব কোরায়শদের প্রধান, সুখ্যাতির আধার; খাজা আবদুল্লাও কোরবানীর ঘটনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; তাঁহাকে কন্যা দেওয়ার জন্য কোরায়শদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সকলেই প্রতিযোগী হইলেন।

কোরায়শদের শাখা গোত্র বনু যোহরা ঐ সময় তাহার সরদার ছিলেন ওয়াহ্‌ব; তাহার এক সৌভাগ্যশালিনী কন্যা ছিল "আমেনা"। আবদুল মোত্তালেব স্বয়ং ওয়াহ্‌বের নিকট যাইয়া আবদুল্লাহর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আমেনার সৌভাগ্যের চন্দ্রোদয় হইল; খাজা আবদুল্লাহর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বিবি আমেনার পিতা ওয়াহ্‌বের বংশ তালিকা এই– ওয়াহ্‌ব, পিতা আবদে মনাফ, পিতা যোহরা, পিতা কেলাব। (সীরাতে ইবনে হেশাম, ১৫৬)

হযরতের বংশ তালিকায় তাঁহার ষষ্ঠ ঊর্ধ্বতন পিতা ছিলেন "কেলাব"। অতএব হযরতের পিতা ও মাতা উভয়ের বংশধারাই কোরায়শ বংশের "কেলাব" নামীয় পিতায় মিলিত ছিল।

° ওয়াহ্‌বের পিতা আব্‌দে মনাফ এবং হযরতের চতুর্থ ঊর্ধ্বতন পিতা আব্‌দে মনাফ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। মাতার বংশের আব্‌দে মনাফ হইলেন যোহরা পুত্র আব্‌দে মনাফ আর পিতার বংশের আব্‌দেমনাফ ছিলেন উক্ত আব্‌দে মনাফের পিতা যোহরা ভ্রাতা কুসাইর পুত্র। অর্থাৎ হযরতের ষষ্ঠ ঊর্ধ্বতন পিতা "কেলাব"– তাঁহার দুই পুত্র ছিল (১) কুসাই (২) যোহরা। "কুসাইর এক পুত্রের নাম ছিল আব্‌দে মনাফ; তাহার বংশধরই হযরতের পিতা আবদুল্লাহ। তদ্রূপ যোহরার এক পুত্রের নামও আব্‌দে মনাফ ছিল; তাহার বংশধরই হযরতের নানা ওয়াহ্‌ব। (সীরাতে ইবনে হেশাম–১০৪)

হযরতের পিতৃবিয়োগ

মতভেদ থাকিলে সাধারণত ঐতিহাসিকগণের সাব্যস্ত ইহাই যে, নবীজী (সঃ) মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় তাঁহার পিতা খাজা আবদুল্লাহর মৃত্যু হইয়াছিল। এই সম্পর্কে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়- (১) আবদুল্লাহ সিরিয়ার বাণিজ্য হইতে প্রত্যাবর্তনকালে মধ্যপথে অসুস্থ হইয়া স্বীয় পিতার মাতুল দেশ মদীনায় গিয়াছিলেন। সেই অসুস্থতাতেই তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তথায়ই তিনি সমাহিত হইয়াছিলেন। (২) মক্কায় খাদ্যের অভাব দেখা দেওয়ায় আবদুল মোত্তালেব স্বীয় মাতুল দেশ খেজুরের এলাকা মদীনায় খাজা আবদুল্লাহকে পাঠাইয়াছিলেন খেজুরের জন্য । তথায় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই রোগেই তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। (তারীখে তাবারী, ২-৮)

খাজা আবদুল্লাহর মৃত্যু ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে হইয়াছিল এবং নবী (সঃ) দুই মাস কালের মাতৃগর্ভে ছিলেন; কাহারও মতে পিতার মৃত্যুকালে নবীজীর ভূমিষ্ঠ হওয়ার দুই মাস বাকী ছিল।

(যোরকানী, ১- ১০৯)

সত্যের প্রাধান্য দ্বারা হযরতের আবির্ভাবকে অভ্যর্থনা

ধরাপৃষ্ঠে হযরতের আগমন উপলক্ষে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছিল- যাহা দৃষ্টে মনে হয় যেন খোদায়ী কুদরতের পক্ষ হইতে সত্যের বিকাশ এবং তাহার প্রাধান্য মহাসত্যের বাহক তথা হযরতের শুভাগমনকে অভ্যর্থনা জানাইতেছিল।

তন্মধ্যে আস্‌হাবে ফীল বা হাতীওয়ালা রাজা আব্‌রাহার ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। সূরা "ফীল" বা আলাম তারার মধ্যে এই ঘটনার দিকেই বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

ইয়ামানের শাসনকর্তা খৃস্টান ধর্মীয় আব্‌রাহা কা'বা শরীফের দিক হইতে লোকদের আকর্ষণ ফিরাইবার জন্য ইয়ামানের রাজধানী "সানা" শহরে অতি জাঁকজমকপূর্ণ একটি গির্জা তৈয়ার করিয়াছিল। আরববাসী একজন লোকের দ্বারা তাহা কদর্য বা ভস্মীভূত হইলে আব্‌রাহা আরবীয় কা'বা শরীফের উপর ক্ষেপিয়া উঠে এবং তাহা ধ্বংস করার জন্য হস্তী সম্বলিত বাহিনী লইয়া মক্কার দিকে যাত্রা করে। পথিমধ্যে দুই স্থানে কা'বা শরীফের ভক্তগণ তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু তাহার বিরাট শক্তির মোকাবিলায় সকলেই পরাজিত হয়। আব্‌রাহা তায়েফের পথে মক্কার অনতিদূরে "মোগাম্মেস' নামক স্থানে পৌঁছিয়া তথায় অবস্থান করিল। আব্‌রাহা তথা হইতে তাহার একজন জেনারেলকে কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ মক্কায় পাঠাইল; সেই জেনারেল মক্কায় আসিয়া ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া নিয়া গেল। মক্কার সর্দার হযরতের পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের দুই শত বা ততোধিক উটও লুণ্ঠিত হইল। মক্কার লোকেরা বাধা দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সেই পরিমাণ শক্তি মোটেই ছিল না।

অতঃপর আব্‌রাহা দ্বিতীয় একজন লোক পাঠাইল এই কথা বলিয়া যে, তুমি মক্কায় যাইয়া তথাকার সর্দারকে খোঁজ করিয়া বাহির করিবে এবং তাহাকে আমার এই পয়গাম পৌঁছাইবে যে, আমি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসি নাই; আমি আসিয়াছি শুধু কা'বা গৃহ ভাঙ্গিবার জন্য। তাহারা যদি আমাকে এই কাজে বাধা না দেয় তবে রক্তারক্তির প্রয়োজন নাই এবং তাহারা যদি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না চায় তবে সেই সর্দার যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে।

আব্‌রাহার দূত মক্কায় আসিয়া তৎকালীন তথাকার সর্দার হযরতের পিতামহ আবদুল মোত্তালেবকে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং তাঁহাকে আব্‌রাহার পয়গাম পৌঁছাইল। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, আমরা

আব্‌রাহার সঙ্গে যুদ্ধ চাই না। আর কা'বা গৃহ আল্লাহর ঘর; আল্লাহ যদি তাঁহার ঘর রক্ষা করেন করিবেন। আর যদি তিনি আব্‌রাহাকে সুযোগ দেন তবে তাহাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই। আব্‌রাহার দূত বলিল, তবে আপনি আমার সঙ্গে চলুন; তিনি আপনাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বলিয়াছেন।

আব্‌রাহার সহিত আবদুল মোত্তালেবের সাক্ষাত ঘটিল। দোভাষীর মাধ্যমে আব্‌রাহা আবদুল মোত্তালেবকে তাঁহার কোন আব্‌দার থাকিলে প্রকাশ করিতে বলিল। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, আপনার লোক আমার পশুপাল নিয়া আসিয়াছে তাহা প্রত্যার্পণ করা হউক। আব্‌রাহা বলিল, প্রথম সাক্ষাতে আমি আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া আমার মন আপনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। আপনি সামান্য মালের জন্য আমার নিকট আব্‌দার করিলেন, আর আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় ঘর কা'বার জন্য কোন আব্‌দার করিলেন না। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, দেখুন! আমি পশুপালের মালিক, তাই আমি পশুপালের কথা বলিলাম। আর কা'বা গৃহের মালিক (আমি নহি, অন্য) একজন আছেন; তিনি হয়ত তাহা ভাঙ্গায় বাধা দিবেন। আব্‌রাহা দর্পের সহিত বলিয়া উঠিল, আমি কাহারও বাধা মানিব না। আবদুল মোত্তালে বলিলেন, তাহা আপনি জানেন আর তিনি জানেন। অতঃপর আব্‌রাহা আবদুল মোত্তালেবের পশুপাল ফিরাইয়া দিল।

আব্দুল মোত্তালেব মক্কায় আসিয়া লোকদিগকে একত্র করিল এবং সমবেতভাবে কা'বার দ্বারে যাইয়া পরওয়ারদেগারের নিকট আরাধনা করিল; আব্‌রাহা বাহিনীর মোকাবিলায় সাহায্য প্রার্থনা করিল। আবদুল মোত্তালেব কা'বা দ্বারের কড়া ধরিয়া আবেগপূর্ণভাবে বলিলেন, "হে আল্লাহ! একজন মানুষ তাহার মাল-সামান রক্ষা করিয়া থাকে; আপনি আপনার ঘর ও ইহার সম্মান রক্ষা করুন। আগামীকল্য শত্রু এবং তাহার শক্তি যেন আপনার শক্তির উপর জয়ী হইতে না পারে। অতঃপর আবদুল মোত্তালেব লোকদেরকে লইয়া পাহাড়ের উপর আশ্রয় নিলেন এবং কা'বার সহিত আবরাহা কি করে তাহা দেখিবার অপেক্ষায় থাকিলেন।

পরদিন প্রভাতে আবরাহা দম্ভের সহিত সৈন্যবাহিনী লইয়া মক্কায় প্রবেশের জন্য অগ্রসর হওয়ার ব্যবস্থা করিল। তাহার প্রধান হাতীটির নাম "মাহমুদ"– সেই হাতীটি সর্বাগ্রে চলিবে, কিন্তু হাতীটি মক্কার পথে কিছুতেই অগ্রসর হয় না, বসিয়া পড়ে। অন্য যেকোন দিকে চালাইলে সে চলে, কিন্তু মক্কার দিকে চলে না। এই বিভ্রাটের মধ্যেই হঠাৎ সমুদ্রের দিক হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে এক শ্রেণীর পাখী উড়িয়া আসিতে লাগিল; প্রতিটি পাখীর মুখে ও দুই পায়ে মোট তিনটি কাঁকর। পাখীগুলি আবরাহা বাহিনীর উপর সেই কাঁকরসমূহ ফেলিতে লাগিল। আল্লাহ তাআলার কুদরত– যেকোন সৈন্য বা হাতীর উপর কাঁকর পতিত হইলেই সে ধ্বংস হইয়া যাইত। এইভাবে সেই বাহিনীর বিরাট অংশ ধ্বংস হইল এবং অবশিষ্ট ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তাহাদের অবস্থা পবিত্র কোরআনে সূরা আলাম-তারায় নিম্নরূপে ব্যক্ত হইয়াছে–

"হে প্রিয়নবী! আপনি কি খবর রাখেন না কি অবস্থা করিয়াছিলেন আপনার পরওয়ারদেগার হাতীওয়ালা বাহিনীর? তাহাদের সমুদয় অপচেষ্টা কি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন না? তাহাদের উপর তিনি পাঠাইয়াছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। সেই পাখী তাহাদের উপর ফেলিতেছিল শক্ত কাঁকর। ফলে তিনি তাহাদিগকে তৃণের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন।"

ঘটনার সত্যতা প্রমাণে একটি বিষয়ই যথেষ্ট যে, উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিবার মাত্র ৪০ হইতে ৫২ বৎসরের মধ্যে পবিত্র কোরআনের সূরা "আলামতারা" নাযিল হইয়াছিল; তখন উক্ত ঘটনার সময়কালের অনেক লোকই আবরাহার দেশ ইয়ামান এবং ঘটনার শহর মক্কায় ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিদ্যমান ছিল। তাহাদের বর্তমানে পবিত্র কোরআনের উক্ত সূরা প্রচারিত হইয়াছে; তাহারা সকলেই কোরআনের বিরোধী দলভুক্ত ছিল। যদি কোরআনের বর্ণনায় বিন্দুমাত্রও অবাস্তবতা থাকিত, তবে নিশ্চয় তাহারা প্রতিবাদ করিত এবং সেইরূপ কোন প্রতিবাদ হইয়া থাকিলে তাহা মুছিয়া যাওয়ার মত ছিল না; প্রতি যুগেই কোরআনের শত্রুর আধিক্য ছিল।

আবরাহা বাহিনীর বহু সংখ্যক ধ্বংস এবং অবশিষ্ট ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বরং আবরাহার গায়েও কাঁকর পড়িয়াছিল, কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে হালাক হয় নাই। তাহার* শরীরে পচন লাগিয়া গিয়াছিল। আঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের অংশ টুকরা টুকরা হইয়া খসিয়া পড়িতেছিল এবং সেই ঘা হইতে সর্বদা পুঁজ প্রবাহিত হইত; এইরূপ ঘৃণিত ও কদর্য অবস্থায় দীর্ঘ দিন ভোগার পর অবশেষে বক্ষ ফাটিয়া কলিজা বাহির হইয়া পড়িলে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

এই ঘটনায় সমগ্র আরবে কোরায়শ বংশের প্রভাব অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ঘটনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বরকত ছিল; হযরত (সঃ) তখন দুনিয়াতে পদার্পণের প্রথম ধাপে তথা মাতৃগর্ভে ছিলেন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনার ৫০ বা ৫৫ দিন পর হযরত (সঃ) ভূমিষ্ঠ হন। ঐ বৎসর রবিউল আউয়াল মাসে হযরতের জন্ম।

বেলাদত বা শুভ জন্ম

এই সুসজ্জিত বিশ্ব বসুন্ধরা যেই মহানের প্রদর্শনী (Exhibition), নিখিল সৃষ্টি যেই মহান সৃষ্টের বিকাশ উদ্দেশে উন্মুখ, ছয় হাজার বৎসরের অধিককাল হইতে এই ধরণী যেই মহামানবের প্রতীক্ষায়, ভুবন-কাননে যেই ফুলের আকাঙ্ক্ষায় তাকাইয়াছিল সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি; আজ সেই মহানের শুভ পদার্পণ হইবে এই ধরণীতে, সেই মহাফুলের কুঁড়ি জন্ম নিবে এই উদ্যানে।

হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম শুভ সংবাদ দান করিয়াছিলেন যে মহানবী, অগণিত নবীগণের পরিক্রমা শেষ করিয়া সকল জোগাড় আয়োজন সমাপ্তে বিশ্ব সভার মহাসমাবেশকে অলঙ্কৃত করিবেন যে মহিমান্বিত মহাপুরুষ– আজ সেই মহামহিমের শুভাগমন হইবে বিশ্ব ভুবনে।

চন্দ্রে মাস রবিউল আউয়াল ১২, ১০, ৯, ৮ বা ২ তারিখ সোমবার দিন নহে, রাত্রও নহে; আলো-আঁধারে সোবহে সদেকের শান্ত-শুভ্র আলোক-রেখা গগণ-প্রান্তকে মনোরম করিয়াছে, স্নিগ্ধ বায়ুর শীত প্রবাহ ধরাপৃষ্ঠকে প্রফুল্ল আমোদিত ও পুলকিত করিয়াছে, এই অপরূপ মুহূর্তে বিবি আমেনা প্রসব অবস্থা অনুভব করিলেন; অভিনন্দন অভ্যর্থনার আয়োজন চলিল গগনে ভুবনে। আল্লাহ তাআলা আদেশ করিলেন ফেরেশতাগণকে, আজ খুলিয়া দাও আসমানসমূহের সকল দরজা; খুলিয়া দাও সমস্ত বেহেশতের সকল দরজা (যোরকানী, ১–১১১)

বিবি আমেনা দেখিলেন, তাঁহার কুটির অপূর্ব নূরে উজালা হইয়া গিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন, এক অপরূপ দৃশ্য– নিজ গোত্রীয় আব্‌দে মনাফ বংশের নারী আকৃতির দীর্ঘ কায়া-বিশিষ্ট কতিপয় স্বর্গীয় লাবণ্যময়ী মহিলা তাঁহার শিয়রে উপস্থিত; তাঁহারা বিবি আমেনাকে ঘিরিয়া বসিলেন। বিবি আমেনা অবাক! কাহাকেও কোন খবর দেই নাই, এই মুহূর্তে ইহারা কিরূপে খোঁজ পাইলেন? কোথা হইতে আসিলেন? কাহারা ইহারা? সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় দানে তাঁহার বলিয়া উঠিলেন, আমরা হইতেছি বিবি আছিয়া, বিবি মারইয়াম* এবং কতিপয় বেহেশতী হুর। এতদ্ভিন্ন বিবি আমেনা ঐ শুভ মুহূর্তে আরও অলৌকিক বহু কিছু দেখিতেছিলেন। (যোরকানী–১১১২)।

বিবি আমেনার বর্ণনা– প্রসব ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে আমি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ধরণীর বুকে দেখিতে পাইলাম; ভূমি স্পর্শকালে তিনি উভয় হাতের উপর ভর করিয়া সেজদারত ছিলেন। (যোরকানী ১–১১২)। তাঁহার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল; তাঁহার দেহ মোবারক হইতে মেশকের সুবাস ছড়াইতেছিল! (ঐ ১১৫)

---

* কাঁকরের ক্রিয়ায় মূল রোগ হাহার হইয়াছিল "বসন্ত" এবং বিশ্বে বসন্ত রোগের আরম্ভ ঐ সময় হইতেই হইয়াছিল; বসন্তের দানা তাহার শরীরে পচন লাগিয়াছিল। (যোরকানী– ৮৮)

* বিবি আছিয়া এবং বিবি মারইয়ামের আগমন অতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিবি আছিয়ার স্বামী "ফেরআউন" চিরজাহান্নামী এবং তিনি হইবেন উচ্চস্তরের বেহেশতী। আর বিবি মারইয়ামের কোন স্বামী ছিল না। তাঁহারা উভয় বেহেশতে নবীজীর চিরসঙ্গিনী হইবেন।

ঐ সময় এক অপূর্ব শুভ্র মেঘ সদৃশ আলোমালা আসিয়া তাঁহাকে আবৃত করিয়া ফেলিল; সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে ধ্বনিত হইল– "জলে-স্থলে সারা জাহানে তাঁহাকে ভ্রমণ করাইয়া নিয়া আঁস"; কিছু সময় তিনি আমার দৃষ্টির অন্তরালে রহিলেন। (ঐ ১-১১২) তিনি যখন ভূপৃষ্ঠে পদার্পণ করিলেন তাঁহার সঙ্গে এক অসাধারণ নূর বা আলো নির্গত হইল, যদ্দ্বারা পূর্ব-পশ্চিম সমগ্র জগত যেন আলোকিত হইয়া গিয়াছিল, সেই আলোতে সুদূর সিরিয়ার ইমারতসমূহ উদ্ভাসিত হইয়াছিল।* হযরত (সঃ) মাতৃগর্ভ হইতে সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাক-পবিত্র অবস্থায় আগমন করিয়াছিলেন। (ঐ ১১৭)

নবীজীর নূরে সারা বিশ্ব আলোকিত হইবে, তাই তাঁহার শুভাগমন লগ্নে এই নূরের বিকাশ ছিল। নবীজী (সঃ) নিজেই সেই নূরের সত্তা ছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ - يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ -

অর্থ ঃ "আসিয়া গিয়াছে আল্লাহর তরফ হইতে তোমাদের নিকট এক মহান নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব; এই নূর ও কিতাব দ্বারা আল্লাহ তাআলা শান্তির পথে অগ্রগামী করিবেন ঐ লোকদেরকে যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টির অভিলাষী এবং তাহাদেরকে সকল প্রকার অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া নিবেন আলোর দিকে নিজ দয়ায়।" (পারা–৬, রুকু–৭)

আলোচ্য আয়াতে যে নূরের উল্লেখ আছে সে নূর হইলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। সুতরাং তাঁহার শুভাগমনের সঙ্গে নূর বা আলোর বিকাশ চমৎকার সামঞ্জস্যময় বটে। উক্ত আলোতে সিরিয়া উদ্ভাসিত হওয়াও সুন্দর অর্থই রাখে। বহির্বিশ্বে এই আলোর বিকাশ সর্বপ্রথম সিরিয়ায়ই হইয়াছিল। মুসলমানগণ সর্বপ্রথম সিরিয়া দেশই জয় করিয়াছিলেন।

সৃষ্টির প্রাণ পেয়ারা রসূল মোস্তফা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবে আনন্দের হিল্লোল উঠিল সমগ্র ধরণীতে। যাঁহার খাতিরে আরশ-কুরসী, লৌহ-কলম, আসমান-যমীন, মানুষ-ফেরেতা সৃষ্টি; আজ তিনি আসিয়াছেন শত ঊর্ধ্বের ঊর্ধ্ব হইতে এই ধূলির ধরণীতে। তাই হর্ষে আনন্দে সমাদৃত করিয়াছে তাঁহাকে

* সমালোচনা ঃ মোস্তফা চরিতে বিবি আমেনার এই নূর বা জ্যোতি দর্শনকে স্বপ্নের দেখা বলা হইয়াছে– ইহা নিছক ভুল। বলা হইয়াছে– "বিবি আমেনা স্বপ্নযোগে ঐ সকল ঘটনা সন্দর্শন করিয়াছেন বলিয়া সকলে সমস্বরে স্বীকার করিতেছেন।" এই উক্তি ডাহা মিথ্যা; পূর্বাপর কেহই এই ঘটনাকে স্বপ্ন বলেন নাই। সীরাত শাস্ত্রে পাঁচশত বৎসরের অধিক পূর্বে বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা কাসতালানী কর্তৃক সঙ্কলিত "মাওআহেবে লুদুনিয়্যাহ" কিতাবে (পৃষ্ঠা–২২) একাধিক ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা এই জ্যোতির বিকাশ বাস্তব বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। "যোরকানী" নামক কিতাবে (পৃষ্ঠা–১১৬) ঐ জ্যোতি দর্শন স্বপ্ন নহে, বরং বাস্তব বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) তাহার "নশরুত্ তীবে" (পৃষ্ঠা–১৬) এবং মুফতী শফী সাহেব তাঁহার "সীরাতে খাতেমুল আম্বিয়ায়" (পৃষ্ঠা–২৫) ঐ জ্যোতি দর্শনকে বাস্তব বলিয়াছেন। বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাদীছ শাস্ত্রের হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ) বাস্তবরূপে উক্ত জ্যোতি দর্শনের বর্ণনাকে সহীহ-শুদ্ধ-সঠিক বলিয়াছেন এবং ইহার সমর্থনে মোহাদ্দেসগণের অনেকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (যোরকানী পৃষ্ঠা–১১৬)।

এমতাবস্থায় মোস্তফা চরিতের উল্লিখিত উক্তি অলীক ও অমূলক হওয়ায় সন্দেহ থাকে কি? পরিতাপের বিষয়, এই অলীক ও অমূলক মতটাকে প্রমাণিত করার জন্য দুইটি আরবি বাক্যের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হইয়াছে– উভয়টিই নিছক প্রবঞ্চনা মাত্র। একটি বাক্যে বিবি আমেনার স্বপ্নের কথা উল্লেখ আছে। এই স্বপ্ন ত বিবি আমেনার গর্ভধারণ সময়ের ছিল বলিয়া সীরাতে ইবনে হেশামে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রসবের সময়ও ঐরূপ নূর দেখা সম্পর্কে। অপর বাক্যটি একটি হাদীছ; তাহাতে --- "রুয়া" শব্দ আছে, তাহার অনুবাদ "স্বপ্ন দর্শন" প্রবঞ্চনা ও সত্যের অপলাপ বৈ নহে। এই শব্দটি চাক্ষুষ এবং প্রত্যক্ষরূপে দেখার অর্থেও ব্যবহৃত হয় বলিয়া ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। (বোখারী, পৃষ্ঠা–৬৮৬)

পাঠক! একটি আশ্চর্যজনক উক্তির কৌতুক উপভোগ করুন। মরহুম খাঁ সাহেব বিবি আমেনার উক্ত জ্যোতি দর্শন স্বপ্নযোগের ছিল বলিয়া সাব্যস্ত করিতে উল্লিখিত "রুয়া" শব্দের অর্থ স্বপ্নে দর্শন সূত্রে নবীজীর উক্তিরূপে হাদীছটির অনুবাদ করিয়াছেন– "এবং আমার মাতা আমাকে প্রসব করার সময় যে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন..."। সন্তান প্রসবের কঠিন অবস্থায় প্রসূতির এরূপ গভীর ও মধুর নিদ্রা আসিবে যে, সে তাহাতে রঙ্গিন স্বপ্ন দেখিবে– এই শ্রেণীর হাস্যকর কথা বলা মরহুম খাঁ সাহেবের ন্যায় হাতুড়ে লোকের পক্ষেই সম্ভব। "মিথ্যার বেসাতিধারীদের স্মরণশক্তি হয় না।"

নিখিল সৃষ্টি, অভিনন্দন জানাইয়াছে তাঁহাকে সমস্ত প্রকৃতি, বহিয়াছে সকলের উপর আনন্দের বন্যাধারা।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা	আল্লাহর নবী তুমি; তোমাকে সালাম!
ইয়া রসূল সালামু আলাইকা	আল্লাহর রসূল তুমি; তোমাকে সালাম!!
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা	আল্লাহর হাবীব তুমি; তোমাকে সালাম!
ছালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা	তোমার স্মরণে সদা সালাম সালাম!!!

হযরতের শুভ জন্মোপলক্ষে অলৌকিক ঘটনাবলী

হযরতের ভূমিষ্ঠ হওয়া উপলক্ষে অনেক অলৌকিক ঐতিহাসিক ঘটনাই ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কতিপয় ঘটনা এই–

পারস্যের অগ্নিপূজকগণ তাহাদের একটি কেন্দ্রীয় অগ্নিকুণ্ডলী এক হাজার বৎসর হইতে প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিল। হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভূমিষ্ঠ হওয়ার রাত্রে হঠাৎ সেই হাজার বৎসরের অগ্নিকুণ্ডলী নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন দেব-দেবীর বহু মূর্তি ঐ রাত্রে অধঃমুখে পতিত হইয়াছিল, কা'বা গৃহের দেবমূর্তিগুলি ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইঙ্গিত ছিল যে, এক আল্লাহর এবাদত-উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে এবং অন্যান্য বস্তুনিচয়ের পূজার অবসান অত্যাসন্ন। এতদ্ভিন্ন তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহত রাজশক্তি পারস্য সম্রাটের শাহী মহলে ঐ রাত্রে ভূমিকম্প হয় এবং তাহাতে রাজ প্রাসাদের চৌদ্দটি স্বর্ণচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে ইঙ্গিত ছিল যে, কাফেরী শক্তির উপর ভূকম্পন ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং তাহার পতন আসন্ন। আরও অলৌকিক ঘটনা এইরূপ ঘটে যে, পারস্যের এক বৃহৎ হ্রদ ঐ রাত্রে হঠাৎ সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া যায়। তাহাতে আর পানি আসে নাই। তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সিরিয়া এলাকার ঐরূপ একটি জলাশয়েও হঠাৎ আশ্চর্যজনকভাবে বিরাট পরিবর্তন আসে, তাহার পানি অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যায়। ইঙ্গিত ছিল যে, পারস্য ও রোমর তৎকালীন বৃহৎ কাফেরী শক্তিসমূহের শৌর্য-বীর্যে ভাঁটা আসিয়া গেল; ঐসব আর টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।* (যোরকানী, পৃষ্ঠা–১২১)

গগন-ভুবনের স্বাগত ধ্বনি, নিখিলের অভিনন্দন-অভ্যর্থনা এবং অলৌকিকের মহাসমারোহ-শোভাযাত্রার মাঝে শুভাগমন হইল মহান অতিথির– যাঁহার আগমনপানে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আশার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিল সারা প্রকৃতি, অধীর আগ্রহে প্রহর গুনিতেছিল সারা সৃষ্টি। ধরণীপৃষ্ঠে শুভজন্ম তথা রূহানী দুনিয়া হইতে বস্তু জগতে পদার্পণ এবং নূরানী আত্মার নূরানী দেহসহ জড় দেহের আবরণে আবির্ভাব হইল পেয়ারা

সমালোচনা ঃ মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, মোস্তফা চরিতের সঙ্কলক মরহুম আকরম খাঁ সাহেবের মস্ত বড় বাতিক তিনি নবীগণের মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনাবলীর প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিলেন। এই বাতিকেই তিনি কোরআন-হাদীছে হাতুড়ে হইয়াও বহু ঐতিহাসিক সত্যকে এবং সহীহ হাদীছকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার ঐ ব্যাধিবশে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শুভ জন্মোপলক্ষের উল্লিখিত ঘটনাবলী নগ্ন ও অভদ্র ভাষায় অবাস্তব সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার রুগ্ন রুচি এইসব ঐতিহাসিক বর্ণনাকে ভালবাসে না বিধায় এইসব ঘটনার উল্লেখ এমন বিকৃত ও অতিরঞ্জিত আকারে করিয়াছেন যে, পাঠক ঐসব সত্য যেন আপনা হইতেই বিশ্রী, ঘৃণিত ও হাস্যাস্পদ গণ্য করিয়া নেয়। সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কত জঘন্য অপকৌশল ইহা!

আরও অতি দুঃখের বিষয়– তিনি এইসব ঘটনা উল্লেখের সহিত নিজ হইতে দুই-একটা আজগবী অলীক কথা মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। যেমন – "সমস্ত রাজসিংহাসন উল্টাইয়া পড়িয়াছিল, পশু মাত্রই মানুষের মত কথা বলিতেছিল" ইত্যাদি (পৃষ্ঠা–১৮৮)।

এতদ্ভিন্ন ১৮৭ পৃষ্ঠায় "বলিতে লজ্জা হয়" বলিয়া এমন একটা বিশ্রী অশালীন অশ্লীল কুরুচিময় বিবরণের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা একমাত্র তাঁহারই গড়ানো কথা হইবে। আমরা সীরাতের কোন গ্রন্থে এই শ্রেণীর বিবরণ দেখি নাই।

চতুর খাঁ সাহেব এইসব অলীক ও লজ্জাকর গর্হিত কথাগুলিকে সত্য ইতিহাসের সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন অতি এক জঘন্য কুমতলবে। যেন সাধারণ পাঠক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্য ইতিহাসগুলিকেও বিনা দ্বিধায় অস্বীকার করে। আমরা যেসব অলৌকিক ঘটন আলোচনা করিয়াছি তাহা পূর্ববর্তী নোটে উল্লিখিত সমুদয় নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

রসূল মহানবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের!!

মারহাবা ইয়া হাবীবাল্লাহ!

মারহাবা ইয়া রসূলাল্লাহ!!

মারহাবা, ইয়া মারহাবা, ইয়া মারহাবা।

"ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি অসাল্লাম।"

হযরতের আবির্ভাবে বিশ্বজোড়া প্রতিক্রিয়া

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব সারা বিশ্বে অতি বড় এক বিরাট ঘটনা ছিল এবং তাহার প্রতিক্রিয়াও ছিল বিশ্বজোড়া। প্রথম খণ্ডে ৬নং হাদীছে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের বিস্তারিত ঘটনায় উল্লেখ হইয়াছে যে, এই প্রতিক্রিয়া নক্ষত্ররাজির উপরও পড়িয়াছিল।* তৃতীয় খণ্ডে জিন সম্পর্কে আলোচনায় উল্লেখ হইয়াছে যে, ঊর্ধ্ব জগতের উপর বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়াছিল; যদ্দরুন সমগ্র জিন জাতির মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। জিনদের মধ্যে যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৬৫৯। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা-৫৪৫) ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পুত্র ছাহাবী আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় পিতার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ওমর (রাঃ) অতিশয় সঠিক অনুমান ও শুদ্ধ ধারণাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন; যেকোন বিষয়ে তিনি কোন ধারণা অনুমান করিলে আমরা কখনও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখি নাই।

একদা ওমর (রাঃ) বসিয়া ছিলেন, তাঁহার নিকট দিয়া একজন সুশ্রী মানুষ পথ অতিক্রম করিল। ওমর (রাঃ) তাহার সম্পর্কে বলিলেন, আমার ধারণা অবাস্তব না হইলে এই ব্যক্তি অমুসলিম হইবে; আর যদি সে এখন মুসলমান হইয়া থাকে তবে সে পূর্বে নিশ্চয় গণক-ঠাকুর (জিন-ভূতের দ্বারা গোপন খবর সংগ্রহকারী) ছিল। এই মন্তব্য করত তিনি লোকটিকে ডাকিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল, ওমর (রাঃ) তাহার সম্মুখেও ঐ মন্তব্য করিলেন। সেই ব্যক্তি বলিল, একজন মুসলমানকে এইরূপে অমুসলিম সন্দেহ করা সঙ্গত কি? অর্থাৎ আমি ত মুসলমান। তখন ওমর (রাঃ) তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বল ত তুমি পূর্বে কি ছিলে? সে বলিল, আমি পূর্বে গণক-ঠাকুর ছিলাম। ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যেই জিনটির সম্পর্ক তোমার সঙ্গে ছিল সে সর্বাধিক আশ্চর্যজনক বিষয় তোমাকে কি জানাইয়াছিল?

ঐ ব্যক্তি বলিল, একদা আমি বাজারে ছিলাম, অকস্মাৎ সেই জিনটি ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল, তুমি জান কি? জিনগণ এক ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। (তাহারা দীর্ঘকাল মানুষ জাতিকে নানা প্রকার গর্হিত কার্যে লিপ্ত রাখিয়া স্বৈরাচারিতা চালাইয়া যাইতেছিল, সেই অবস্থা আর তাহারা বিরাজমান রাখিতে পারিবে না বলিয়া) তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের দুর্দিনের সূচনা হইয়াছে, ফলে তাহারা নিজেদের সব কিছু গুটাইয়া (সাধারণ লোকালয় হইতে অনাবাদ এলাকার দিকে) দ্রুত পালাইবার চেষ্টায় লাগিয়া গিয়াছে।

ওমর (রাঃ) ঘটনা শ্রবণান্তে বলিলেন, তোমার জিনটি তোমাকে যে নূতন পরিস্থিতির খবর দিয়াছিল তাহা সত্যই ছিল। আমারও (ইসলাম পূর্বের) তদ্রূপ একটি ঘটনা আছে। একদা আমি মূর্তি ঘরে শুইয়া ছিলাম। এক ব্যক্তি আসিয়া মূর্তিগুলির সম্মুখে একটি গোশাবক বলিদান করিল, তখন বিকট আওয়াজে একটি

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবে ঊর্ধ্ব জগতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ আছে। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে জিন সম্পর্কীয় আলোচনায় দ্রষ্টব্য। নক্ষত্ররাজির উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে প্রথম খণ্ডে ৬ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য। এই ক্ষেত্রে গণক-ঠাকুরের কার্যকলাপ সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম টানিয়া আনা- যাহা খাঁ সাহেব করিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা বোখারী শরীফের সহীহ হাদীছকে এনকার করা হইয়াছে- ইহা শুধুমাত্র প্রবঞ্চনার উদ্দেশেই হইতে পারে- যাহা খাঁ সাহেব করিয়াছেন।

ঘোষণা শুনিতে পাইলাম– তদপেক্ষা বিকট আওয়াজ আমি জীবনে কখনও শুনি নাই। সেই ঘোষণাটি ছিল এই– হে জালীহ্ (কাহারও নাম)! একটি সাফল্য অর্জনকারী কর্মের সূচনা হইয়া গিয়াছে, এক সুপণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে– যাঁহার ঘোষণা হইবে, لا اله الا الله লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্– "আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই।" উক্ত আওয়াজে উপস্থিত লোকজন সকলেই ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। (ওমর (রাঃ) বলেন,) তখন আমি মনে মনে এই পণ করিলাম, এই ঘোষণাটির তথ্য সঠিকরূপে জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত আমি ইহার পিছনে লাগিয়া থাকিব। কিছু সময় আমি তথায়ই অপেক্ষা করিলাম এবং পুনরায় ঐরূপ বিকট আওয়াজের সেই ঘোষণাই শুনিলাম– "হে জালীহ! সাফল্য অর্জনকারী কর্মের সূচনা হইয়া গিয়াছে, সুপণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহার ঘোষণা হইবে–لااله الا الله অতপর আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই খবর ছড়াইয়া পড়িল যে, [হযরত মুহাম্মদ (সঃ)] নবীর আবির্ভাব হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধরনের ঘটনা ইতিহাসে আরও অনেক বর্ণিত আছে। "সীরাতে হালাবিয়াহ" নামক কিতাবে অনেক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে–

সাওয়াদ ইবনে কারেব (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন; তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও এইরূপই। তিনি পূর্বে গণক-ঠাকুর ছিলেন, একটি জিন তাঁহার সংস্রবে ছিল। একদা তিনি রাত্রিবেলা তন্দ্রাবস্থায় ছিলেন, তখন ঐ জিনটি আসিয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিল এবং কয়েকটি আরবি বয়াত পড়িল, যাহার মধ্যে বনী হাশেম গোত্রে এক মহামানবের আবির্ভাবের উল্লেখও ছিল।

প্রথম দিন তিনি ঘটনার কোন গুরুত্ব দিলেন না, কিন্তু পর পর তিন দিন একই রূপ ঘটনা ঘটিলে তিনি মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং মক্কায় উপস্থিত হইয়া হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কতিপয় লোকের মধ্যে দেখিতে পাইলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) সাওয়াদ ইবনে কারেবকে দেখিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন এবং বলিলেন, তোমার আগমনের মূল ঘটনা আমি জানি। অতপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণায় কয়েকটি আরবি বয়াত পড়িলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন।

আব্বাস ইবনে মের্‌দাস (রাঃ) ছাহাবীর ইসলাম গ্রহণে এই ধরনের ঘটনাই বর্ণিত আছে। মাযেন (রাঃ) ছাহাবীর ইসলাম গ্রহণেও এরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে।

খাতামে নবুয়ত– নবুয়তের মোহর বা ছাপ (পৃষ্ঠা-৫০১)

মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্য যেরূপ তাহার Visible sign বা Distinctive marks তথা বিশেষ চিহ্ন থাকে এবং আবশ্যক স্থলে তাহার দ্বারা তাহার পরিচয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নবুয়তের পরিচয়ের একটি Visible sign বা Distinctive marks তথা বিশেষ চিহ্ন ছিল, তাহাকে খাতামে নবুয়ত বা নবুয়তের মোহর বলা হয়। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যেখানে হযরতের পরিচয়ের উল্লেখ ছিল, তথায় এই মোহরে নবুয়তের উল্লেখ বিশেষরূপে বিদ্যমান ছিল এবং পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের আলেমগণ তাহা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। ("প্রথম বহির্দেশ গমন" আলোচনায় বোহায়রা পাদ্রীর ঘটনা এবং "সিরিয়া সফরে হযরত" আলোচনায় নাস্তুরা পাদ্রীর ঘটনা দ্রষ্টব্য।) ঐ শ্রেণীর অনেককে ইসলাম গ্রহণের পূর্বক্ষণেও এই মোহরে নবুয়তের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে দেখা যাইত।

ঈসায়ী বা খৃষ্টান ধর্মীয় ব্যক্তি সাল্‌মান ফারেসী (রাঃ)– যাঁহার উল্লেখ ইতিপূর্বেও হইয়াছে, তিনি শেষ নবীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ঐতিহাসিক সাধনা করিয়া শেষ পর্যন্ত মদীনায় পৌছিয়াছিলেন। তিনি হযরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঠিক পরিচয় লাভের উদ্দেশে হযরতের পিছন দিকে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

হযরত (সঃ) উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, সালমান তাঁহার মোহরে নবুয়ত দেখিতে চাহিতেছে, তাই হযরত (সঃ) গায়ের চাদর কাঁধের উপর হইতে একটু ছাড়িয়া দিয়া মোহরে নবুয়তের স্থান উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। সালমান তাহা দেখামাত্র চুম্বন করত বলিয়া উঠিলেন اشهد انك رسول الله "আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি বাস্তবিকই আল্লাহর রসূল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" (যোরকানী, ১-১৫৪)

মোহরে নবুয়তের বিস্তারিত বিবরণ পূর্ণরূপে বিভিন্ন হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। তাহা হযরতের পৃষ্ঠে কাঁধদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল, ঠিক মধস্থলে নহে, বরং একটু বাম দিকে, বাম কাঁধের চৌড়া হাড়ের মাথা বরাবর স্থানে ছিল। চামড়ার নীচে ঊর্ধ্বমুখী একটি গুটলির ন্যায় ছিল, পরিমাণে কবুতরের ডিমের ন্যায় কতিপয় লোমে বেষ্টিত ছিল। তাহা হইতে মেশকের সুগন্ধি অনুভূত হইত। তাহার উপর নূর পরিদৃষ্ট হইত।

প্রথম খণ্ডে ১৪২ নং হাদীছ- সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমার খালা আমাকে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার এই ভাগিনাটি রুগ্ন। তৎক্ষণাৎ হযরত (সঃ) আমার মাথার উপর হাত বুলাইলেন আমার জন্য মঙ্গলের দোয়া করিলেন এবং অযূ করিলেন; আমি তাঁহার অযূর অবশিষ্ট বা অঙ্গ-ধৌত পানি পান করিলাম। অতপর আমি হযরতের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন আমি তাঁহার মোহরে নবুয়ত দেখিয়াছি; তাহা তাঁহার কাঁধদ্বয়ের মধ্যভাগে ছিল। পরিমাণে নববধূর জন্য নির্মিত সুসজ্জিত তাঁবুরূপী সামিয়ানার ঘুন্টির ন্যায়।

মোহরে নবুয়তের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য আলোচ্য হাদীছে যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা আরব দেশে সচরাচর ব্যবহৃত বস্তু ছিল। আমাদের পক্ষে সহজ দৃষ্টান্ত মুসলিম শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে- "কবুতরের ডিমের ন্যায়"।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মোহরে নবুয়ত হযরতের জন্মগত ছিল না পরে সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। পরে সৃষ্টি হওয়ার সিদ্ধান্তেও কাহারও মতে দুধমাতার নিকট থাকাকালে বক্ষ বিদীর্ণ করার সময়, কাহারও মতে নবুয়তের বিকাশকালে, কাহারও মতে মে'রাজ উপলক্ষে। (যোরকানী, -১৬০)

হযরতের নাম (পৃষ্ঠা-৫০০)

নবীজীর নামকরণ সম্পর্কে দুইটি বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা বিবি আমেনা হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমার গর্ভকাল ছয় মাস অতিক্রম হইলে একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম, এক আগন্তুক আমাকে বলিতেছে, বিশ্বের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছ। ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার নাম রাখিবে "মুহাম্মদ"। * আর তুমি এই স্বপ্ন গোপন রাখিও। (যোরকানী, ১-১১১)

দ্বিতীয় বর্ণনা- নবীজীর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিন তাঁহার দাদা খাজা আবদুল মোত্তালেব মক্কার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দিলেন। সেই উৎসবের দিন আব্দুল মোত্তালেব নবীজীর খাত্না সামাজিক উৎসব উপলক্ষে তাঁহার নাম রাখিলেন "মুহাম্মদ"। অনেকের মতে হযরত (সঃ) জন্মগতভাবেই খত্নাকৃত ছিলেন। (যাদুল মাআদ)

নামকরণ সম্পর্কে উক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। "মুহাম্মদ" নামকরণের আসল উৎস বিবি আমেনার স্বপ্ন। নবীজী ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই বিবি আমেনা খাজা আবদুল মোত্তালেবকে সংবাদ পাঠাইলেন, আপনার বংশের চেরাগ একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; আপনি আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যান। আবদুল

---

* **সমালোচনা ঃ** "মোস্তফা চরিত" এবং "বিশ্বনবী" প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের পণ্ডিত লেখকগণ আলোচ্য স্বপ্নের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই স্বপ্নে প্রাপ্ত নাম "আহমদ" লিখিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তির কোন সূত্র আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। আমরা সীরাত শাস্ত্রের বিভিন্ন মূল গ্রন্থ দেখিয়াছি; বিশেষতঃ মোস্তফা চরিতের ফুট নোটে যে, "কামেল" কিতাবের নাম উল্লেখ আছে, তাহারও মূল কিতাব দেখিয়াছি। সর্বত্রই বিবি আমেনার স্বপ্নের আলোচনায় "মুহাম্মদ" নাম উল্লেখ রহিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যের প্রাধান্য চলিতে পারে না।

মোত্তালেব ছুটিয়া আসিলেন এবং আদর-সোহাগের সহিত নবজাতক শিশুকে দেখিলেন। তখন বিবি আমেনা গর্ভাবস্থায় যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং নাম সম্পর্কে যে আদেশ পাইয়াছিলেন সব কিছু খুলিয়া বলিলেন। আবদুল মোত্তালেব নবাগত শিশুকে কোলে লইয়া আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফে গেলেন এবং দাঁড়াইয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করিলেন, শোকরগুজারী করিলেন। (সীরাতে ইবনে হেশাম-১৬০)

সুতরাং আবদুল মোত্তালেব ঐ স্বপ্নের আদেশ নিশ্চয়ই মনে রাখিয়াছেন এবং চিরাচরিত নিয়মানুসারে সপ্তম দিন আনন্দ উৎসরেব মাঝে সে স্বপ্নাদিষ্ট "মুহাম্মদ" নাম আনুষ্ঠানিকরূপেই নির্ধারিত করিয়াছেন। "ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি অসাল্লাম।"

১৬০। হাদীছ ঃ عن جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِىْ خَمْسَةُ اَسْمَاءٍ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِىْ الَّذِىْ يَمْحُوْا اللّٰهُ بِى الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمَىَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ ـ

অর্থ ঃ জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার বিশিষ্ট নাম পাঁচটি; যথা- আমার নাম "মুহাম্মদ", আমার নাম "আহমদ" এবং আমার নাম "মাহী" তথা মূলোচ্ছেদকারী; আমার দ্বারা আল্লাহ তাআলা কুফরীর মূলোচ্ছেদ করিবেন এবং আমার নাম "হাশের"- সর্বপ্রথম ময়দানে হাশরের দিকে অগ্রগামী; ময়দানে হাশরের দিকে অগ্রসর হওয়া কালীন সমস্ত লোক আমার পদাঙ্কে অগ্রসর হইবে এবং আমার নাম "আকেব"-সর্বশেষে আগমনকারী, (আমার পর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না)।

ব্যাখ্যা ঃ "মুহাম্মদ" অর্থ অধিক প্রশংসিত; সৃষ্টিকর্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টনিচয় পর্যন্ত সকলের প্রসংসার পাত্র তিনি; তাই তাঁহার জন্য এই নাম পূর্ব হইতেই বিধাতা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছিল।" "আহমদ" অর্থ সর্বাধিক প্রশংসাকারী, আল্লাহ তাআলার প্রসংশাকারীদের মধ্যে হযরত (সঃ) অন্যতম একজন হইবেন, তাই তাঁহাকে পূর্ব হইতেই এই নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এবং নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীতে তিনি উক্ত দুই নামে বিশেষত "আহমদ" নামে পরিচিত ছিলেন। অন্যান্য নাম সমূহের তাৎপর্য মূল হাদীছেই ব্যক্ত হইয়াছে।

১৬৬১। হাদীছ ঃ

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ تَعْجَبُوْنَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللّٰهُ عَنِّىْ شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتَمُوْنَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُوْنَ مُذَمَّمًا وَاَنَا مُحَمَّدٌ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি! আমার শত্রু কাফের কোরায়শরা আমার প্রতি যেসব গালি ও ভৎর্সনা প্রয়োগ করিয়া থাকে ঐ সবকে আল্লাহ তাআলা কিরূপে আমা হইতে সরাইয়া রাখিতেছেন!

তাহারা "মোজাম্মাম" নাম বলিয়া গালি ও ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিয়া থাকে, অথচ আমি ত "মুহাম্মদ" নামের।

ব্যাখ্যা ঃ "মুহাম্মদ" শব্দের অর্থ অত্যধিক প্রশংসিত। কাফের শত্রুরা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গ্লানি করাকালে তাঁহাকে ঐ নামে ব্যক্ত করিত না যেই নামের মূলে প্রশংসিত হওয়ার অর্থ রহিয়াছে, "মুহাম্মদ" নামের পরিবর্তে "মোজাম্মাম" শব্দ ব্যবহার করিত, যাহার অর্থ "জঘন্য কলুষিত"।

হযরত (সঃ) এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ছাহাবীদের সম্মুখে করুণাময় আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন যে, কি আশ্চর্যজনকভাবে আল্লাহ তাআলা আমাকে শত্রুর গ্লানি হইতে বাঁচাইয়াছেন। শত্রুর মুখের বাক্য আমার জন্য রক্ষাকবচ হইয়াছে। তাহারা "মোজাম্মাম" নামের ব্যক্তিকে গালি দেয়, আমার ত ঐ নাম নহে, আমার নাম "মুহাম্মদ"।

হযরতের "মুহাম্মদ" নাম আরশের গায়েও লেখা ছিল এবং হযরত মূসার উপর যে তওরাত কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছিল– সেই তওরাত কিতাবেও যেখানে হযরতের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে এবং পরিচয় ও গুণাগুণ উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানেও "মুহাম্মদ" নাম উল্লেখ হইয়াছে।

কা'বে আহ্বার ও যিনি তওরাত কিতাবের বিশিষ্ট অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন এবং তিনি তওরাতের অভিজ্ঞতার প্রভাবেই ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতের যুগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কা'ব আহ্বার হইতে "মোসনাদে দারেমী" কিতাবের প্রথম পৃষ্ঠায় তিনটি রেওয়ায়াত উল্লেখ হইয়াছে– কা'বে আহ্বার বলিয়াছেন, তওরাত কিতাবে স্পষ্ট ভাষায় লেখা ছিল, "মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল হইবেন, তাঁহার গুণাবলী ও পরিচয় এই এই হইবে।"

বিশেষতঃ তৃতীয় রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কা'বে আহ্বারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন–

كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة ـ

অর্থ ঃ "তওরাত কিতাবে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিচয় ও গুণাবলীর বিবরণ কিরূপ পাইয়াছেন?" কা'বে আহ্বার তদুত্তরে বলিয়াছেন–

نجده محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر الى طيبة ـ

অর্থ ঃ "আমরা তওরাতে তাঁহার সম্পর্কে এই পাইয়াছি যে, তাঁহার নাম হইবে "মুহাম্মদ," আবদুল্লাহর পুত্র, মক্কায় জন্মগ্রহণ করিবেন, তায়বা তথা মদীনায় হিজরত করিবেন।"

"মুহাম্মদ" অর্থ চরম প্রশংসিত। সারা বিশ্ব এবং বিশ্বাধিপতি রাব্বুল আলামীন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রশংসামুখর এবং তিনি সর্বজনীন প্রশংসিত গুণাবলীতে পরিপূর্ণ হইবেন, তাই সৃষ্টিকর্তা তাঁহার জন্য আদিকাল হইতেই এই মহান নাম নির্বাচিন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নবীজীর প্রশংসা পবিত্র কোরআনে অনেক রহিয়াছে। যথা–

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ـ يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

অর্থ ঃ "হে বিশ্ববাসী! তোমাদের নিকট আল্লাহর তরফ হইতে বিশেষ নূর-আলো বা সত্যের দিশারী তথা রসূল মুহাম্মদ (সঃ) আসিয়াছেন এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব আসিয়াছে। সেই দিশারী এবং কিতাবের সাহায্যে আল্লাহ তাঁহার সন্তুষ্টির আসক্ত ব্যক্তিকে শান্তির পথে পরিচালিত করিবেন এবং সকল প্রকার অন্ধকার মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে আলোর দিকে নিয়া আসিবেন নিজ কৃপায় এবং তাহাদিগকে সত্য-সরল পথের দিকে পারিচালিত করিবেন।" (পারা–৬, রুকু–৭)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের নিকট আসিয়াছেন এই রসূল তোমাদেরই শ্রেণীভুক্ত। তোমাদের ক্লেশ তাঁহার পক্ষে অসহনীয়, তোমাদের মঙ্গল ও কল্যাণের লালায়িত, ঈমানদারদের প্রতি অতিশয় মেহেরবান দয়ালু, (পারা-১১, রুকু-৪)।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْأٰخِرَ۔

অর্থ ঃ "যাহারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী ও তাহার প্রতি অনুরক্ত, তাহাদের জন্য রসূলুল্লাহ উত্তম আদর্শ।"(পারা-২১; রুকু- ১৯)

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۔

অর্থ ঃ "সারা জাহানের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলের বাহকরূপে এবং আমার আশীর্বাদরূপে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি। -(পারা-১৭, রুকু-৭)।

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۔ وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۔

অর্থ ঃ "হে নবী! আমি আপনাকে পাঠাইয়াছি সত্যের মাপকাঠিরূপে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে, আল্লাহরই আদেশ মতে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল আলোরূপে।" (পারা-২২, রুকু-৩)।

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ ۔

অর্থ ঃ "আমি আপনাকে সত্যের বাহক বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছি।"(পারা-২২, রুকু-১৫)

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আপনি আমার রসূলগণের একজন এবং আপনি সত্য-সরল পথের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।" (পারা-২২, রুকু-১৮)

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى ۔

অর্থ ঃ "শপথ করিয়া বলি, তোমাদের নবী সঠিক-সত্য পথ হইতে চুল মাত্রও বিচ্যুৎ নহেন, ভ্রান্তির লেশমাত্র তাঁহার মধ্যে নাই! তিনি প্রবৃত্তির বশে কোন কথা বলেন না; একমাত্র ওহীপ্রাপ্ত কথাই বলেন" (পারা-২৭, রুকু-৫)

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۔

অর্থ ঃ "নিশ্চয় নিশ্চয় আপনি চরিত্রের চরম উৎকর্ষের অধিকারী।" (পারা-২৯, রুকু-৩)

এতদ্ভিন্ন পূর্বের আসমানী কিতাবেও আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নবীজীর অনেক প্রশংসা বর্ণিত রহিয়াছে। যথা- প্রতিশ্রুত নবীর জন্য আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে যে ঘোষণা হইবে তাহার উদ্ধৃতি তওরাতে নিম্নরূপ ছিল-

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّحِرْزًا لِّلْاُمِّيِّيْنَ اَنْتَ عَبْدِىْ وَرَسُوْلِىْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيْظٍ وَلاَ سَخَّابٍ فِى الْاَسْوَاقِ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلٰكِنْ يَّعْفُوْ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَّقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِاَنْ يَّقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيَفْتَحَ بِهَا اَعْيُنًا عُمْيًا وَّاٰذَانًا صُمًّا وَّقُلُوْبًا غُلْفًا ۔

অর্থ ঃ "হে নবী! আমি আপনাকে সত্য-মিথ্যার, হক-বাতিলের মীমাংসাকারীরূপে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে শিক্ষা-দীক্ষাহীন লোকদের জন্য মুক্তির দিশারীরূপে পাঠাইয়াছি। আপনি আমার বিশিষ্ট বান্দা ও প্রেরিত রসূল। আপনার একটি বিশেষ গুণ আমার প্রতি ভরসা স্থাপন; তাহার প্রতীকস্বরূপ আপনার এক নাম 'মোতাওয়াক্কেল' রাখিলাম ('মোতাওয়াক্কেল' অর্থ আল্লাহর উপর ভরসাকারী)।

আমার এই নবী কোমল হৃদয়, বিনীত, ভদ্র-সভ্য ও সৎ সাধু হইবেন– রুষ্ট প্রকৃতির হইবেন না। বাজারে যাইয়াও শালীনতার সহিত কথা বলিবেন– চেঁচাইয়া কথা বলিবেন না। খারাপ ব্যবহারের উত্তর খারাপ ব্যবহার দ্বারা দিবেন না– ক্ষমা করিবেন।

আল্লাহ তাআলা দুনিয়া হইতে তাঁহার বিদায় মঞ্জুর করিবেন না যাবত না তাঁহার দ্বারা বক্র সম্প্রদায়কে সোজা করেন যে, তাহারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকারোক্তি করে এবং যাবত না এই কালেমার দ্বারা অন্ধ চোখে জ্যোতি সৃষ্টি করেন, বন্ধ কানকে খুলিয়া দেন, আবদ্ধ অন্তকরণ উন্মুক্ত করেন।

(মেশকাত শরীফ, ৫১৬)

১৬৬২। হাদীছ ঃ আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ইহুদী আলেম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট কয়েকটি দীনার স্বর্ণমুদ্রা পাইত; সে তাহার তাগাদায় আসিল। নবী (সঃ) বলিলেন, এখন আমার নিকট তোমার ঋণ পরিশোধের কিছু নাই। ইহুদী বলিল, আমার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে বসিব; সেমতে হযরত (সঃ) ঐ ইহুদীর সঙ্গেই বসিয়া থাকিলেন, এমনকি জোহর, আছর, মাগরিব ও এশার নামায ঐ অবস্থায় পড়িলেন। ছাহাবীগণ চুপি চুপি ঐ ইহুদীকে ভয় দেখাইতেছিলেন এবং ধমকাইতে ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহা অনুভব করিতে পারিলেন; ছাহাবীগণ (ভাবিলেন, হযরত তাঁহাদের প্রতি রাগ হইবেন, তাই তাঁহারা) বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এক ইহুদী আপনাকে আটকাইয়া রাখিবে? হযরত (সঃ) বলিলেন, অমুসলিম প্রজার প্রতিও অন্যায় করিতে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে নিষেধ করিয়াছেন।

পর দিন এই অবস্থায় অনেক বেলা হইলে ইহুদী ব্যক্তি কালেমা শাহাদাত পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেল এবং বলিল, আমার অর্ধেক ধন-সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করিলাম। সে আরও বলিল, আমি আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছি তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তাআলা আপনার যে প্রশংসা তওরাত কিতাবে করিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ করা যে– "তিনি মুহাম্মদ– পিতা আবদুল্লাহ, তাঁহার জন্মস্থান মক্কায়, হিজরতের দেশ "তায়বা" তাঁহার রাজ্য অচিরেই সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছিবে, তিনি কঠোর প্রকৃতির রুক্ষ মেজাজের হইবেন না। (ভদ্র ও সভ্য-শালীন হইবেন যে,) বাজারেও চেঁচাইয়া কথা বলিবেন না। অশ্লীল আচার-ব্যবহার ও অশ্লীল কথা হইতে পাক-পবিত্র হইবেন।" এই বলিয়া সে পুনরায় স্বীকৃতি ঘোষণা করিল, আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই এবং নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল। ঐ ইহুদী বড় ধনাঢ্য ছিল; তাহার সমুদয় মাল হযরতের অধীনে দিয়া দিল যে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করুন। (মেশকাত শরীফ, ৫২১)

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রশংসার চূড়ান্ত করিয়া দিয়াছেন যখন তিনি স্বয়ং তাঁহারই সৃষ্টি মুহাম্মদ (সঃ)-কে স্বীয় "হাবীব" বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শিল্পী যখন কোন একটি বিশেষ বস্তুকে তাঁহার পছন্দনীয় সমুদয় গুণ-গরিমা মাধুরী-সুষমা মিশাইয়া নিখুঁতভাবে গড়েন এবং তাহা তাঁহার মনমত ও মনপূত হয় তখনই তিনি তাঁহার হাতে গড়া বস্তুটিকে ভালবাসেন, তাহার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ আসক্তি জন্মে। সুতরাং কোন শিল্প বস্তুর প্রতি স্বয়ং শিল্পীর ভালবাসা আকর্ষণ শিল্পী কর্তৃক উক্ত বস্তুর চরম প্রশংসা এবং সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দানের মহা সনদই বটে।

বিশ্ব শিল্পী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-কে এমন এবং এতই ভালবাসিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে "হাবীবুল্লাহ"– আল্লাহ তাআলার বন্ধু বা দোস্ত আখ্যা দিয়াছেন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنِّىْ قَائِلٌ قَوْلاً غَيْرَ فَخْرٍ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ ...... وَاَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "আমি একটি তথ্য প্রকাশ করিতেছি– গর্ব করার উদ্দেশে নহে, ইব্রাহীম (আঃ) "খলীলুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে দোস্তী করিয়াছেন, আর আমি "হাবীবুল্লাহ" অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ আমার সঙ্গে দোস্তী করিয়াছেন– আমাকে দোস্ত বানাইয়াছেন।"

মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-কে আল্লাহ তাআলা ভালবাসিয়াছেন– চরম ভালবাসা দিয়াছেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার আকার-আকৃতি তথা অনুসরণ-অনুকরণ অবলম্বন করিলে আল্লাহ তাআলা তাহাকেও ভালবাসিবেন। এই তথ্য স্বয়ং আল্লাহ কোরআনে ঘোষণা দিয়াছেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ

অর্থ ঃ "হে আমার প্রিয়নবী! আপনি বিশ্ববাসীকে বলিয়া দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ-অনুকরণ কর, তাহা হইলে স্বয়ং আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন। (পারা–৩, রুকু–১২) এই আয়াতের মর্ম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ তাআলার চরম ভালবাসার পাত্র হওয়ার এক উজ্জ্বল প্রমাপ; আর ইহাই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রশংসিত হওয়ার মহা সনদ।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুসরণ-অনুকরণ অবলম্বনে যে কেহ ধন্য হইতে পারিবে সে-ই আল্লাহ তাআলার ভালবাসার পাত্র হইবে, অতএব স্বয়ং মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) যে আল্লাহ তাআলার কিরূপ ভালবাসার পাত্র তাহা পরিমাণ করা যাইতে পারিবে কি? আর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কর্তৃক এইরূপ ভালবাসা দান তাঁহার চরম প্রশংসা।

আল্লাহ তাআলা আদর-সাহাগ করিয়া নিজের 'মাহমুদ' নামের ধাতু হইতে 'মোহাম্মদ' নাম বাহির করিয়াছেন। এস্থলে আদর-সোহাগের কি বিচিত্র এবং সীমাহীন বিকাশ যে, 'মাহমুদ' অর্থ প্রশংসিত এবং 'মুহাম্মদ' অর্থ চরম প্রশংসিত।

এই তথ্যটি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ছাহাবী– বিশিষ্ট কবি হাস্‌সান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন–

وَشَقَّ لَهُ مِنْ اِسْمِهٖ لِيُجِلَّهٗ ـ فَذُوْ الْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ وَهٰذَا مُحَمَّدٌ ـ

অর্থঃ আল্লাহ (আদর-সোহাগ করিয়া) নিজের নাম হইতে তাঁহার নাম বাহির করিয়াছেন, অধিকন্তু মহান আরশের অধিপতি (আল্লাহ) হইয়াছেন 'মাহমুদ' নামের (যাহার অর্থ প্রশংসিত) এবং হযরতের নাম হইল 'মুহাম্মদ' (যাহার অর্থ চরম প্রশংসিত)।*

হযরতের দ্বিতীয় অন্যতম নাম 'আহমদ'। ইঞ্জীল কিতাবে এবং ঈসা আলাইহিস সালামের মুখে তিনি এই নামেই অধিক ব্যক্ত হইয়াছেন, যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ঘোষণা দিয়া থাকিতেন, "আমার পরে এক নবী আসিতেছেন, তাঁহার নাম হইবে আহমদ।"

'আহমদ' অর্থ সর্বাধিক প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী তিনি হইবেন, তাই আদি হইতেই তাঁহাকে 'আহমদ' নামে ভূষিত করা হইয়াছিল।

এই দুইটি প্রসিদ্ধ নাম ছাড়া হযরতের আরও গুণবাচক অনেক নাম আছে, তন্মধ্যে আলোচ্য হাদীছে তিনটি নামের উল্লেখ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার তাৎপর্যও বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন হযরতের আরও অনেক নাম প্রচলিত আছে, যথা– 'মোতাওয়াক্কেল', অর্থ আল্লাহর প্রতি ভরসা স্থাপনকারী। আল্লাহ তাআলার প্রতি ভরসা স্থাপনের গুণটি নবীজী (সঃ)-এর

* আদর-সোহাগভরা 'মুহাম্মদ' নামের বিশ্লেষণে কবি হাস্‌সান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উল্লিখিত উক্তিও আল্লাহ তাআলার নিকট অতি মকবুল ও পছন্দনীয় হইয়াছে। এমনকি এক বিশিষ্ট বুযুর্গ বলিয়াছেন, উল্লিখিত বয়াতটির নিম্নের আঙ্গিক নক্‌শা একটি কাগজ খণ্ডে লিখিয়া সন্তান প্রসবকালীন বিপদগ্রস্ত প্রসূতির গলায় লটকাইয়া দিলে তাহার উপর আল্লাহর রহমত নামিয়া আসিবে এবং সহজ-সরলভাবে সন্তান প্রসব করিবে।

নক্‌শাটি এই –
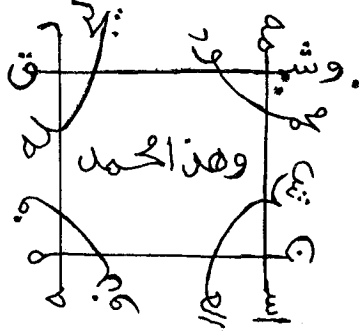
মধ্যে যে পরিমাণ ছিল তাহার পরিমাপও অন্যের জন্য সম্ভব নহে। একটি ঘটনাদৃষ্টে সামান্য অনুমান করা যায় মাত্র। মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের সফরে নবীজী (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-সহ 'সওর' পর্বত গুহায় লুক্কায়িত আছেন; মক্কার রক্ত-পিপাসু শত্রু দল তাঁহাদেরকে খোঁজ করিতে করিতে ঠিক সেই গুহার কিনারায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এমনকি গুহার ভিতরস্থ আবু বকরের দৃষ্টিতে ঐ শত্রু দলের পা পরিদৃষ্ট হইতেছে। আবু বকর (রাঃ) বিচলিত হইয়াছেন; তিনি বলিতেছেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! শত্রুরা নিজ পায়ের দিকে তাকাইলেই আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে। সেই মুহূর্তেও নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, لا تحزن ان الله معنا- ""বিচলিত হইও না; আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" (কোরআন শরীফ)

নবীজী (সঃ)-এর এই নামটি (অর্থাৎ মোতাওয়াক্কেল) পূর্বের আসমানী কিতাব তওরাতেও উল্লেখ ছিল।

"আমীন" অর্থ শান্তিকামী, বিশ্বস্ত। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট সকলের নিকটই তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল ছিলেন। 'বশীর' অর্থ মুমিনদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দানকারী, 'নাজীর' আল্লাহর আযাব হইতে সতর্ককারী। 'আবদুল্লাহ'– আল্লাহ তাআলার বিশিষ্ট বান্দা, পবিত্র কোরআনে সূরা জিন-এর মধ্যে এই নামটি স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে। আবৃদিয়ত তথা আল্লাহর দরবারে আত্মনিবেদিত হওয়া নবীজীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। 'সাইয়্যেদ' অর্থ সর্দার বা প্রধান, নবীজী নিখিল সৃষ্টির প্রধান, নবী ও রসূলগণের প্রধান। 'মোকাফ্‌ফা' অর্থ সর্বশেষে প্রেরিত। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ পয়গম্বর ছিলেন। 'নবীউত্‌ তওবা' অর্থ তওবার নবী; নবীজী (সঃ) গোনাহমুক্ত হইয়াও তওবা করা অতি ভালবাসিতেন। হযরত (সঃ) বলিতেন, হে লোকসকল! তোমরা প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে তওবা করিও; আমিও প্রতিদিন একশত বার তওবা করিয়া থাকি। নবীজী (সঃ)-এর সম্মানে তাঁহার উম্মতের তওবা পূর্ববর্তী উম্মতগণের তুলনায় অধিক শীঘ্র ও সহজে কবুল হইয়া থাকে। 'নবীউল মাল্‌হামাহ' অর্থ জেহাদী নবী। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার উম্মতের ন্যায় এত অধিক জেহাদ আর কোন নবী এবং তাঁহার উম্মতের দ্বারা হয় নাই। 'সিরাজুম মুনীর' অর্থ দীপ্ত সূর্য; কুফরী, শেরেকী ও গোমরাহীর অন্ধকার দূরীকরণে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দীপ্ত সূর্য অপেক্ষা অধিক ভাস্কর ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন আল্লাহর গুণবাচক নাম হইতে কোন কোন নাম নবীজীর জন্য পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হইয়াছে। যথা--- 'রউফ' অর্থ অতিশয় স্নেহশীল, 'রহীম' অর্থ অতিশয় দয়ালু।

হযরতের উপনাম (পৃষ্ঠা-৫১০)

১৬৬৩। হাদীছ ঃ عَنْ اَنَس رضى الله تعالى عنه قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِىْ السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْه النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ (لَمْ اَعْنِكَ) اِنَّمَا دَعَوْتُ هٰذَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سَمُّوْا بِاِسْمِىْ وَلَا تَكَنُّوْا بِكُنْيَتِىْ -

অর্থ ঃ আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বাজারে ছিলেন। তথায় এক ব্যক্তি 'হে আবুল কাসেম'! বলিয়া (কোন ব্যক্তিকে) ডাকিল। হযরত নবী (সঃ) (যেহেতু আবুল কাসেম নামে পরিচিত ছিলেন, তাই তিনি) পেছন দিকে তাকাইলেন। ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, আমি ত (আবুল কাসেম বলিয়া) আপনাকে উদ্দেশ করি নাই; আমি ঐ (অপর) ব্যক্তিকে ডাকিয়াছি! তখন হযরত নবী (সঃ) বলিলেন, তোমরা আমার আসল নামের অনুকরণে নাম রাখিতে পারিবে, কিন্তু আমার যে উপনাম আছে অন্য কেহ সেই উপনাম অবলম্বন করিতে পারিবে না।

১৬৬৪। হাদীছ ঃ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله تعالى عنه قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلاَ تَكْنُوْا بِكُنْيَتِىْ فَانَّمَا اَنَا قَاسِمُ اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ -

অর্থ ঃ জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার আসল নামের অনুকরণে তোমরা নাম রাখিতে পার, কিন্তু আমার উপনামের অনুকরণে উপনাম অবলম্বন করিও না। কারণ, (আমার উপনাম 'আবুল কাসেম'– যাহার অর্থ অতি বেশী বন্টনকারী– আল্লাহ তাআলার কল্যাণ ও মঙ্গল ভাণ্ডার) আমি তোমাদের মধ্যে সদা বন্টন করিয়া থাকি। (পৃষ্ঠা–৯১৫)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি প্রসিদ্ধ উপনাম ছিল 'আবুল কাসেম' যাহার শব্দার্থ– বন্টনকারীর পিতা। এই উপনামের একটি সাধারণ সূত্র এই ছিল যে, হযরতের বড় ছেলের নাম 'কাসেম' ছিল, অতএব তিনি আবুল কাসেম– কাসেমের পিতা ছিলেন। এই সূত্রেই ইহুদী-নাসারারা হযরত (সঃ) কে আবুল কাসেম বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকিত।

কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বর্ণনায় দেখা যায়, তাঁহার এই উপনাম শুধু শাব্দিক অর্থ– কাসেমের পিতা হওয়া সূত্রেই ছিল না বরং এই উপনামের মধ্যে হযরতের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ গুণের প্রকাশও ছিল। 'আবুল কাসেম' অর্থ সদা বিতরণকারী; দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ ও মঙ্গলের যে ভাণ্ডার আল্লাহ তাআলা হযরতকে দান করিয়াছিলেন তাহা তিনি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সদা বন্টন করিয়া থাকিতেন, যদ্বারা তিনি رحمة للعلمين রাহ্‌মাতুল-লিল আ'লামীন তথা সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত বা কল্যাণ মঙ্গলের উৎস ছিলেন। এমনকি এই গুণ তাঁহার একটি বিশেষ নামরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই রাহ্‌মাতুল-লিল আলামীন গুণ বা নামের একটি বিশেষ অধ্যায় 'আবুল কাসেম' উপনামে ব্যক্ত হইয়াছে।

হযরত (সঃ) তাঁহার নামের অনুকরণে নাম রাখার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপনাম অবলম্বনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছে, যাহার আসল কারণ এই যে, অনেকে বিশেষতঃ ইহুদী-নাসারাগণ এবং তাহাদের দেখাদেখি নবাগত লোকগণ সাধারণতঃ হযরত (সঃ)-কে আবুল কাসেম বলিয়া সম্বোধন করিত। এমতাবস্থায় যদি অন্য কাহারও এই নাম থাকে, তবে যখন তাহাকে সম্বোধন করা হইবে তখন স্থানবিশেষে অযথা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লক্ষ্য আকৃষ্ট হইবে এবং তিনি বিব্রত হইবেন; তাই উক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হইয়াছিল, কিন্তু মদীনায় ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় হযরতকে সাধারণতঃ তাঁহার আসল নামে কেহ সম্বোধন করিত না, তাই ঐ নামে সম্বোধনের বেলায় বিব্রত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। সুতরাং ঐ নামের অনুকরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় নাই। এই সূত্রেই অধিকাংশ আলেমের মতে 'আবুল কাসেম' নাম অবলম্বনের নিষেধাজ্ঞা হযরতের জীবৎকাল পর্যন্ত বলবত ছিল, তাঁহার পরে সেই নিষেধাজ্ঞা রহিত হইয়া গিয়াছে।

হযরতের দুগ্ধপান

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হযরত (সঃ) সাত বা নয় দিন স্বীয় মাতা বিবি আমেনার দুগ্ধপান করিয়াছেন। অতঃপর আবু লাহাবের ক্রীতদাসী 'সুওয়াইবা' মাত্র কতিপয় দিন দুগ্ধপান করাইয়াছিলেন; স্থায়ী ধাত্রীর অপেক্ষায় ইহা

অস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল মাত্র। ইতিমধ্যে আরবের প্রথানুযায়ী সা'দ গোত্রীয় ধাত্রী রমণীদের একটি দল মক্কায় পৌঁছিল; তাহাদের মধ্যে ভাগ্যবতী হালিমাও ছিলেন। বিবি হালিমার নিজ বর্ণনা–

আমি আমার সা'দ গোত্রীয় ধাত্রী মহিলাদের সহিত দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে মক্কাপানে যাত্রা করিলাম। এই বৎসর আমাদের অঞ্চলে অভাব ছিল; অনাহারে আমার দুগ্ধ খুবই কম হইয়া গিয়াছিল। আমার নিজের যে একটি পুত্র সন্তান ছিল তাহার জন্যই আমার দুধ যথেষ্ট হইত না; ক্ষুধায় সে কাঁদিত; তাহার কান্নায় আমাদের নিদ্রাও পূর্ণ হইত না। আমাদের একটি উট ছিল, ঘাসের অভাবে তাহার দুধ ছিল না। এতদসত্ত্বেও অভাবের তাড়নায় আমাকে ধাত্রী ব্যবসায় নামিতে হইল। আমি একটি গাধার উপর আরোহণ করিয়াছিলাম, গাধাটিও ক্ষীণ ও দুর্বল ছিল; সঙ্গীদের সহিত চলিতে পারিত না; বহু কষ্টে মক্কায় পৌঁছিতে সক্ষম হইলাম।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এতীম শুনিয়াধাত্রী মহিলারা কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। এদিকে বিবি হালিমার দুধ কম দেখিয়া কেহই তাঁহাকে শিশু দিল না। হালিমার দুগ্ধ কম হওয়াই তাঁহার সৌভাগ্য নক্ষত্র উদিত হওয়ার কারণ হইল।

হালিমার বর্ণনা– আমি আমার স্বামীকে বলিলাম, খালি হাতে বাড়ী যাওয়া অপেক্ষা ঐ এতীম শিশুটিকে নিয়া যাওয়া উত্তম। স্বামীর মতামতও তাহাই হইল; সেমতে আমি এতীম মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-কে আমার অবস্থানে নিয়া আসিলাম। তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইতে বসিয়া বরকত-মঙ্গল ও কল্যাণের আগমন দেখিতে পাইলাম। আমার বুকে দুধের জোয়ার আসিয়া গেল। তিনি এবং আমার ছেলে উভয়েই পূর্ণ তৃপ্ত হইয়া দুধ পান করিল। আমাদের সঙ্গে যে শুষ্ক দুর্বল উটটি ছিল উহাকেও দেখিলাম, উহার কুচ দুধে ভরিয়া বড় হইয়া গিয়াছে। আমার স্বামী দুধ দোহাইয়া আনিলেন; আমরা সকলে তাহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। আজ আমরা দীর্ঘ দিন পর রাত্রে শান্তির নিদ্রা উপভোগ করিলাম। এখন আমার স্বামীও বলিতে লাগিলেন, শিশুটি ত অত্যন্ত কল্যাণ ও মঙ্গলময় দেখা যাইতেছে!

আমরা শিশুকে লইয়া মক্কা হইতে যাত্রা করিলাম; এইবার আমার বাহন গাধাটি এত দ্রুতগামী হইয়া গেল যে, সঙ্গীদের কাহারও বাহন তাহার সঙ্গে চলিতে সক্ষম নহে। এমনকি এই অবস্থা দৃষ্টে সঙ্গীগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ইহা কি তোমার পূর্বের বাহনটি?

আমরা ঐ শিশুকে লইয়া গৃহে পৌঁছিলাম; দেশে তখন ভয়াবহ অনাবৃষ্টি এবং অভাব ছিল; পশুর দুগ্ধ পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু আমি বাড়ী আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বকরীগুলি দুধে পূর্ণ হইয়া গেল; প্রতিদিন আমার বকরী দল মাঠ হইতে দুধে পরিপূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়া আসে; অন্যদের বকরীতে মোটেই দুধ হয় না। দেশীয় লোকগণ তাহাদের রাখালদেরকে বলিয়া দিত, হালিমার বকরী দল যথায় চরে, আমাদের পশুপালও তথায়ই চরাইও। কিন্তু একই স্থানে চরা সত্ত্বেও অবস্থা এইরূপই হইত। দুগ্ধ পানের দু'টি বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আমরা এইরূপ বরকত, মঙ্গল ও কল্যাণ সর্বদাই উপভোগ করিয়াছি। (সীরাতে খাতেমুল আম্বিয়া– ২৭)

দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর সাধারণ নিয়মানুসারে বালক মুহাম্মদ (সঃ)-কে লইয়া আমি তাঁহার মাতার নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু শিশুর বরকত, মঙ্গল ও কল্যাণদৃষ্টে আমার মন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজি ছিল না। ঘটনাক্রমে ঐ সময় মক্কায় প্লেগের মহামারী ছিল; আমার একটু সুযোগ হইল; আমি বিবি আমেনাকে বুঝাইলাম, এখন শিশুকে মক্কায় রাখা ভাল হইবে না; তিনি শিশুকে আমার নিকট রাখিতে সম্মত হইলে পুনরায় তাঁহাকে লইয়া আমার দেশে পৌঁছিলাম।

একদা বালক মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার দুধ ভাইয়ের সঙ্গে গৃহের নিকটেই পশুপালের রাখালীতে ছিলেন; হঠাৎ দুধভ্রাতা দৌড়িয়া আসিল এবং আমার ও তাহার পিতার নিকট বলিল, আমার কোরায়শী ভাইকে সাদা পোশাকে পরিহিত দুই ব্যক্তি ধরাশায়ী করিয়া তাহার পেট ফাঁড়িয়া ফেলিয়াছে; আমি তাহাকে এই অবস্থায়ই রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছি।

এই সংবাদে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দৌড়াইয়া ছুটিলাম; আমরা যাইয়া দেখি বালক মুহাম্মদ (সঃ) ভীত অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা কি ঘটনা? তিনি বলিলেন, সাদা পোশাকের দুই ব্যক্তি আমাকে শায়িত করিয়া আমার বক্ষ চিরিয়াছে এবং কি যেন তালাশ করিয়া বাহির করিয়াছে– আমি তাহা পূর্ণ জ্ঞাত নহি। আমরা তাঁহাকে বাড়ী নিয়া আসিলাম। স্বামী আমাকে বলিলেন, হালিমা! মনে হয় বালকটির উপর জিনের আছর হইয়াছে; খবর প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই তাঁহাকে তাঁহার মাতার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আস। সেমতে আমি বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে লইয়া তাঁহার মাতার নিকট পৌঁছিলাম।

বিবি আমেনা জিজ্ঞাসা করিলেন, এত অনুরোধ করিয়া পুনঃ নেওয়ার পর নিজেই ফিরাইয়া আনিলে কেন? আমি বলিলাম, এখন বুঝ-জ্ঞানের হইয়াছে, আমারও যাহা করার করিয়াছি, তাই এখন নিয়া আসিয়াছি। বিবি আমেনা বলিলেন, ব্যাপার ইহা নহে; সত্য বল। তখন আমি সব ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। বিবি আমেনা বলিলেন, তোমার আশঙ্কা– তাঁহার উপর ভূতের আছর হইয়াছে! খোদার কসম– এই ছেলের উপর কস্মিনকালেও তাহা হইতে পারে না। আমার ছেলের অনেক অবস্থাই অসাধারণ, এই বলিয়া বিবি আমেনা গর্ভাবস্থায় এবং ভূমিষ্ঠ হওয়াকালের অনেক ঘটনা শুনাইলেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ছিল "শাক্কে সদর" বা বক্ষ বিদারণ; যাহার বিস্তারিত বিবরণ এক বিশেষ শিরোনামায় বর্ণিত হইবে। ইহা হযরতের এক বিশেষ মোজেযা। এইবারের বক্ষ বিদারণই হযরতের সর্বপ্রথম 'শাক্কে সদর' ছিল; এই সময় হযরতের বয়স কত ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইহা ঘটিয়াছিল কাহারও মতে তৃতীয় বৎসরে, কাহারও মতে চতুর্থ বৎসরে, কাহারও মতে পঞ্চম বৎসরে। তবে ইহা সর্বসম্মত যে, এই ঘটনা বিবি হালিমার নিকট থাকাবস্থায় ঘটিয়াছিল এবং এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়াই বিবি হালিমা হযরত (সঃ)-কে তাঁহার মাতার নিকট প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন– (যোরকানী, ১–১৫০)।

এই সম্পর্কে হাদীছও আছে ঃ

হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) বাল্যাবস্থায় বালকদের সহিত খেলায় ছিলেন; এমতাবস্থায় জিব্রাঈল (আঃ) আসিয়া তাঁহাকে শায়িত করিলেন এবং তাঁহার বুক চিরিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিলেন। অতপর হৃৎপিণ্ড (কাটিয়া তাহা) হইতে জমাট রক্তখণ্ড বাহির করিলেন এবং বলিলেন, আপনার দেহের মধ্যে যে শয়তানের অংশ ছিল তাহা ইহা। অতপর জিব্রাঈল (আঃ) ঐ হৃৎপিণ্ডকে স্বর্ণের তশতরিতে রাখিয়া যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন। তারপর কাটা হৃৎপিণ্ডটি জোড়া লাগাইয়া দিলেন এবং যথাস্থানে তাহা পুনঃ স্থাপন করিয়া দিলেন।

এই সময় বালকগণ দৌড়াইয়া নবীজীর দুধ মাতার নিকট আসিয়া বলিল মুহাম্মদকে হত্যা করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহারা সকলে বালক নবীজীর নিকট পৌঁছিল; তখন নবীজীর চেহারা বিবর্ণ ছিল। "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।"

আনাছ (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজীর বক্ষে আমি সিলাইয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া থাকিতাম। (মুসলিম শরীফ, মেরাজ বর্ণার সংলগ্নে)

উক্ত ঘটনা যে বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে নবীজীর বাল্যাবস্থা ছিল, দ্বিতীয় প্যারায় তাহা স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে।*

---

* **সমালোচনা ঃ** সীরাত সঙ্কলনে কলম ধরিলেই অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর আলোচনা আসে। কারণ, নবীগণের ব্যক্তিত্ব ছিল অতি অসাধারণ; নবীগণের নবী নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কথা ত আরও একধাপ উর্ধ্বে। আর আল্লাহ তাআলার কুদরত ত অসীম। কিন্তু কোন অস্বাভাবিক ঘটনার আলোচনা আসিলেই নিশেষ বাতিক-ব্যাধিগ্রস্ত মরহুম আকরম খাঁ সাহেবের কথা মনে আসে যে, মোস্তফা চরিতে এই সম্পর্কে নিশ্চয় গোলমাল করা হইয়া থাকিবে।

ইসলামের দুই ভিত্তি কোরআন ও সুন্নাহ; সুন্নাহ তথা হাদীছের সর্বশ্রেষ্ঠ দুই কিতাব– বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর 'শাক্কে সদর' বা বক্ষ বিদারণ মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা ত বোখারী শরীফেও রহিয়াছে, আর আলোচ্য ঘটনার বর্ণনা মুসলিম শরীফে রহিয়াছে– যাহার বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের সম্মুখে রাখা হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরতের প্রথম দুধমাতা সুওয়াইবা হযরতের চাচা আবু লাহাবের ক্রীতদাসী ছিলেন। হযরত (সঃ) ভূমিষ্ঠ হইলে সুওয়াইবা দৌড়িয়া যাইয়া আবু লাহাবকে ভাতিজা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ শুনাইয়াছিলেন। আবু লাহাব আনন্দিত হইয়া এই সুসংবাদ দানের পুরস্কার স্বরূপ তৎক্ষণাত সুওয়াইবাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আবু লাহাব তখন হযরতের বাস্তব পরিচয়ের কোন খোঁজ রাখিত না এবং সে ছিল কাফের, তবুও হযরতের ভূমিষ্ঠ হওয়ায় আনন্দিত হইয়া যে শ্রদ্ধা দেখাইল তাহার অতি বড় সুফলের অধিকারী সে চিরকালের জন্য হইয়া রহিয়াছে।

বর্ণিত আছে, আবু লাহাবের মৃত্যুর এক বৎসর পর হযরতের অপর চাচা আব্বাস তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু লাহাব বলিল, দোযখের শাস্তি ভোগ করিতেছি, অবশ্য প্রতি সোমবার রাত্রে আমার দুইটি আঙ্গুলের মধ্য হইতে একটু পানীয় পাইয়া থাকি যাহাতে আমার কষ্টের অনেক লাঘব ঘটে। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্মের সুসংবাদ দানের উপর সুওয়াইবাকে এই আঙ্গুলদ্বয়ের ইশারায় মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম; তাহারই সুফল ও প্রতিদানে আমি ইহা লাভ করিয়া থাকি (যোরকানী, ১-১৩৮)। মূল ঘটনাটির বর্ণনা বোখারী শরীফ ৭৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

মোস্তফা চরিতে এই বিবরণটার উদ্ধৃতি দেওয়ার পর বলা হইয়াছে-"যাহা হউক, বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে ফেরেশতাগণ হযরতের বক্ষ বিদারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগকে কথকগণ যে গল্পটি বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত সত্যের কোন সম্বন্ধ নাই।" (পৃষ্ঠ-২০৩)

পাঠক! মুসলিম শরীফের উল্লিখিত হাদীছটির মূল বর্ণনাকারী হইলেন "ছাহাবী আনাছ (রাঃ)।" যিনি দীর্ঘ দশ বৎসরকাল দিবা-রাত্র, ভ্রমণে-অবস্থানে সর্বদা নবীজী মোস্তফার সেকবরূপে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়াছেন। তাঁহার হইতে বর্ণনাকারী হইলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী "সাবেত বুনানী (রাঃ)", যিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ছাহাবী আনাছ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাহচর্যে থাকিয়াছেন। বসরা এলাকার সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস ও নির্ভরশীল ব্যক্তি ছিলেন তিনি। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাত্র ২৭ বৎসর পর তাঁহার জন্ম। তাঁহার হইতে বর্ণনাকারী হইলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী 'হাম্মাদ ইবনে সালামা (রঃ)" তিনি বসরা এলাকার বিশিষ্ট আলেম দেশ-বরেণ্য মোহাদ্দেস ছিলেন, অত্যধিক এবাদত-বন্দেগী ও সুন্নতের তাবেদারীতে তিনি অদ্বিতীয়রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন, নবীজীর শতাব্দীতেই তাঁহার জন্ম। তাঁহার হইতে বর্ণনাকারী হইলে ইমাম বোখারী (রঃ) ইমাম মুসলিম (রঃ) ইত্যাদি বড় বড় মোহাদ্দেছগণের ওস্তাদ 'শায়বান (রঃ)'; আর তাঁহার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন,ইমাম মুসলিম (রঃ)।

দেখা গেল- আলোচ্য হাদীছখানা প্রসিদ্ধ সহীহ মুসলিম শরীফে স্থান লাভ করিয়াছে চারি জন অতি মহান লোকের সাক্ষ্য সূত্রে এবং পঞ্চম জনই হইলেন ইমাম মুসলিম (রঃ)। আনাছ (রাঃ) সাবেত বুনানী (রঃ), হাম্মাদ (রঃ) শায়বান (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ)- এই পবিত্রাত্মা মহান লোকগণকে "আমাদের কথকগণ" বলিয়া কটাক্ষ ও হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তাহাদের বর্ণিত হাদীছকে "তাহার সহিত সত্যের কোনই সম্বন্ধ নাই" বলা, সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীছকে 'গল্প' বলা, "তাহার সহিত সত্যের কোন সম্বন্ধ নাই" বলা- এইসব ধৃষ্ঠতার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশে "মোস্তফা-চরিত" বিপরীত নামীয় সঙ্কলনের প্রতি ক্ষুব্ধ হইলে এবং এই শ্রেণীর কটূক্তিকারকের মুখে থুথু দিলে তাহা অসঙ্গত হইবে কি?

আলোচ্য ঐতিহাসিক সত্যটি অস্বীকার করার জন্য মোস্তফা চরিত গ্রন্থে যেসব প্রলাপ করা হইয়াছে এবং যেসব মিথ্যার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে তাহা আরও আশ্চর্যজনক এবং জঘন্য। যথা- বোখারী শরীফসহ সমস্ত হাদীছের কিতাবে বর্ণিত মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে নবীজীর ৫১ বৎসর বয়সে বক্ষ বিদারণ ঘটনার বর্ণনা এবং বিবি হালিমার গৃহে ৪ বৎসর বয়সের ঐরূপ ঘটনার বর্ণনা এত অধিক ব্যবধানের ভিন্ন ভিন্ন দুইটি ঘটনাকে আকার-আকৃতির সামঞ্জস্যের কারণে এক ঘটনা গণ্য করিয়া শুধু বর্ণনার গরমিল ঠাওরানো- যেরূপ মোস্তফা-চরিত গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "অসতর্ক রাবীদিগের কল্যাণে মে'রাজ সংক্রান্ত বিবরণটি নানা অত্যাচারের পর বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র।" (পৃষ্ঠা-২০৩)- এই উক্তিকে পাগলের প্রলাপ বৈ কি বলা যায়!

অপর দিকে গরমিলের কাহিনী ত আরও হাস্যকর। তিনটি ঘটনা- (১) বিবি হালিমার গৃহে বাল্যকালে ৪ বৎসর বয়সে বক্ষ বিদারণ, (২) নবুয়তপ্রাপ্তির পর মে'রাজ উপলক্ষে ৫১ বৎসর বয়সে বক্ষ বিদারণ (উভয় ঘটনা জাগ্রত অবস্থায়), আর (৩) অনুমান ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে বাস্তব ও মূল মে'রাজ ঘটনার অনুরূপ স্বপ্ন দর্শন, যাহার বিস্তারিত বিবরণ মে'রাজ আলোচনায় আসিবে । এই ঘটনাটি স্বপ্নযোগের এবং মুল মে'রাজের ঘটনার অবিকল প্রদর্শনী ছিল, সুতরাং মূল মেরাজ উপলক্ষে বাস্তব বক্ষ বিদারণের আকৃতিতে স্বপ্নে তাহার প্রদর্শনী ছিল। এই ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ঘটনা বিভিন্ন ছাহাবীর সহিত আনাছ (রাঃ)ও বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই জন্য তিনটি ঘটনা একসঙ্গে গোঁজামিল দিয়া একটির বর্ণনা দ্বারা অপরটির বর্ণনা মিথা বলা- যেমন মোস্তফা চরিতে দ্বিতীয় বর্ণনা দেখাইয়া প্রথম বিবরণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে- "আবু জর গেফারীর বর্ণনা অনুসারে আনাছের এই বিবরণ অসত্য বলিয়া প্রমাণ হইতেছে।" (পৃষ্ঠা-২০১) তদ্রূপ বর্ণনাটি সম্পর্কে বলা হইয়াছে- "তাহা হইলে বিবি হালিমার গৃহে

হযরত (সঃ) পরবর্তীকালে মাত্র অল্প দিনের এই দুধমাতা সুওয়াইবার প্রতিও অতিশয় শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। এত শ্রদ্ধা করিতেন যে, পঁচিশ বৎসর বয়সে হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহ করার পরও হযরত (সঃ) স্বয়ং সুওয়াইবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া থাকিতেন। মদীনায় হযরত (সঃ) হিজরত করিয়া চলিয়া আসার পরও তিনি সুওয়াইবার জন্য মদীনা হইতে নানা প্রকার উপঢৌকন পাঠাইয়া থাকিতেন। মক্কা জয় করিয়া হযরত (সঃ) তথাকার সর্বেসর্বা হইয়া 'সুওয়াইবা' এবং তাঁহার পুত্র 'মসরূহ্' সম্পর্কে খোঁজ নিয়া জানিতে পারিলেন, তাহারা বাঁচিয়া নাই। তখন হযরত (সঃ) সুওয়াইবার অন্য আত্মীয়বর্গের খোঁজ করিলেন তাহাদের প্রতি বিশেষ সৌজন্য দেখাইবার জন্য, কিন্তু তাহাদেরও কেহ বাঁচিয়া ছিল না।

কোন কোন আলেমের মত এই যে, সুওয়াইবা শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(সীরাতে মোস্তফা, ১-৫৩)

হযরতের স্থায়ী দাই মাতা ছিলেন বিবি হালিমা; তিনি ছিলেন 'বনু সা'দ' গোত্রের। বনু সা'দ গোত্র সমগ্র আরবের মধ্যে আরবী ভাষার লালিত্যে প্রসিদ্ধ ছিল। তাহাদের ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল সুললিত এবং মার্জিত ছিল। আল্লাহ্ তাআলার কুদরতে নবীজীর শৈশব সেই বনু-সা'দ গোত্রেই কাটিল; হযরতের ভাষা উন্নত মানের

অবস্থানকালে জাগ্রত অবস্থায় বক্ষ বিদারণ ব্যাপারটি.... একেবারে মাঠে মারা যাইবে।" (পৃষ্ঠ-১৯৮) এইসব প্রলাপোক্তিকারীকে কি বলা যায়?

আর একটি অজ্ঞতার কথা এই বলা হইয়াছে যে, "আনাছ যে সময়কার ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন তখন তাঁহার জন্মই হয় নাই।" (পৃষ্ঠা-২০১) এই কথাটা সত্য হইলেও হাদীছ শাস্ত্রে ইহার কোন মূল্য নাই। মূল্য হইত যদি আনাছ (রাঃ) ছাহাবী না হইতেন। কোন ছাহাবী এই শ্রেণীর কোন কথা বর্ণনা করিলে তাহা সর্বসম্মতরূপে গৃহীত। কারণ, ছাহাবী নিশ্চয় স্বয়ং হযরতের বর্ণনা বা কোন বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াই তাহা বর্ণনা করিয়াছেন মানিতে হইবে। অন্যথায় ছাহাবীকে মিথ্যাবাদী বলিতে হয়। ইহা হাদীছ শাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ বিধান, কিন্তু অজ্ঞতার কোন ঔষধ নাই।

আলোচ্য হাদীছের মধ্যে একটি বিষয় এই আছে যে, জিব্রাঈল (আঃ) নবীজীর হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া তাহা হইতে জমাট রক্তখণ্ড বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আপনার দেহে যে শয়তানের অংশ ছিল তাহা ইহা।" এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া যুক্তিরূপে কতকগুলি কথা বলা হইয়াছে যাহা শুধু প্রবঞ্চনাই প্রবঞ্চনা।

একটি মানবীয় দেহে সকল প্রকার অংশই থাকিবে। ইহাতে নখ থাকিবে; চুল থাকিবে, এমনকি অবাঞ্ছিত লোমও থাকিবে ,যাহা কটিয়া ফেলিতে হয়; মল-মূত্রের উদ্রেককারী নাড়ি-ভূঁড়িও থাকিবে। তদ্রূপ মানব যেহেতু আল্লাহ তাআলার পরীক্ষার সম্মুখীন জীব এবং পরীক্ষা হইবে শয়তান দ্বারা। ইচ্ছা করিলে শয়তানের কুমন্ত্রণা গ্রহণ করিতে পারে, এই ক্ষমতার উৎসও মানবীয় দেহে থাকিবে, নতুবা পরীক্ষা হইতে পারে না; ফেরেশতা পরীক্ষার সম্মুখীন জীব নহে, তাই তাহার দেহে এই উৎস নাই।

নবীজীর এই নশ্বর দেহ মানবীয় দেহই বটে। সুতরাং মানবীয় দেহের নিয়মিত সমুদয় অংশই ইহাতে থাকিবে; যাহা অপসারণের তাহা অপসারিত হইবে। যেমন, মল-মূত্র, নখ, অবাঞ্ছিত লোম ইত্যাদি। এইসব অবশ্যই অপসারণের বস্তু, তাই বলিয়া এইসব মানবীয় দেহে থাকিবে না– আল্লাহর সৃষ্টির বিধান এরূপ নহে। তদ্রূপ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতার উৎস, যাহাকে এই হাদীছে "শয়তানের অংশ" বলা হইয়াছে, তাহাও অন্যান্য মানব দেহের ন্যায় নিয়মিতরূপে নবীজীর এই নশ্বর দেহেও নিশ্চয়ই থাকিবে। অবশ্য নবীজীর বৈশেষ্ট্য এই যে, তাঁহাকে মা'সুম বে-গোনাহ রাখার জন্য অবাঞ্ছিত বস্তুর ন্যায় ঐ অংশকে তাঁহার দেহ হইতে বাল্যকালেই অপসারণ করার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করিয়া দিয়াছেন। এই তথ্য দ্বারা নবীজীর মান-মর্যাদা বাড়ে বৈ কমে না বা ক্ষুণ্ন হয় না।

সুতরাং "উক্ত তথ্য মতে স্বীকার করিতে হইবে যে, শয়তানের অংশ তাঁহার (নবীজীর দেহের) মধ্যে বলবত ছিল"– এই ভয় দেখাইয়া তারপর নবীজীর (সঃ) প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার দোহাই দিয়া আলোচ্য হাদীছকে এনকার করার ফাঁদ তৈয়ার করা প্রবঞ্চনা বৈ নহে।

চারি বৎসর বয়সে– বাল্য অবস্থায় নবীজীর (সঃ) নশ্বর দেহের মধ্যে অবাঞ্ছিত অংশের ন্যায় শয়তানের অংশ বিদ্যমান ছিল বলিয়া স্বীকার করিলে নবীজীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব দেখা দিবে– এই মায়াকান্না আর একটা অজ্ঞতা। এক হাদীছে আছে, একদা রসূল (সঃ) বলিলেন, প্রত্যেক মানুষের জন্য একজন ফেরেশতা সাথী এবং এক জন জীন জাতিয় (শয়তান) সাথী থাকে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার জন্যও আছে? হযরত (সঃ) বলিলেন, আমার জন্যও আছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে ঐ জিন জাতীয় সাথী শয়তানের ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন; ফলে সে আমার বাধ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার অনিষ্ট হইতে আমি বাঁচিয়া আছি, সে আমাকে ভাল ছাড়া মন্দের প্রতি আকৃষ্ট করে না। (মেশকাত শরীফ ১৮)। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হওয়ার মধ্যে বাহ্যিক কারণ ইহাও একটি ছিল। স্বয়ং হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, আমি আরবী ভাষায় তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুদক্ষ ও লালিত্যের অধিকারী; এর (বাহ্যিক) কারণ এই যে, আমার জন্ম কোরায়েশ বংশে এবং প্রতিপালন হইয়াছ বনু সা'দ গোত্রে। (সীরাত ইবনে হেশাম-১৬৭)

বিবি হালিমার স্বামী, হযরতের দুধ-পিতার নাম ছিল "হারেস"। বিবি হালিমার এক পুত্র ছিল, যে হযরতের সঙ্গে দুগ্ধপান করিয়াছে; নাম ছিল আবদুল্লাহ। দুই মেয়ে ছিল- এক মেয়ের নাম "ওনায়সা" অপর মেয়ের আসল নাম হোযায়ফা (উচ্চারণে মতভেদ আছে); তাঁহারই ডাকনাম ছিল "শায়মা" এবং এই নামেই তিনি পরিচিতা ছিলেন। তিনি সকলের বড় ছিলেন। (আসাহ্হুস সিয়ার- ৫১) নবীজীর লালন-পালনে তাঁহার বহু দান ছিল; তিনি হযরতের অনেক সেবা করিতেন এবং হযরতকে অত্যধিক ভালবাসিতেন। শায়মা শিশু নবীজীকে দোলা দিত এবং কোলে নিয়া নাচনা ও গীত গাহিত-

هٰذَا اَخٌ لَمْ تَلِدْهُ اُمِّىْ ـ وَلَيْسَ مِنْ نَسْلِ اَبِىْ وَعَمِّىْ

فَدَيْتُهُ مِنْ مِخْوَلٍ مُعِمِّىْ ـ فَانْمِهِ اَللّٰهُمَّ فِيْمَا تُنْمِىْ ـ

"এইটি আমার ভাই- আমার মাতার নয়
আমি তাকে ভালবাসি- আমার পিতার নয়
কোরবান করি মামা-চাচা সবই তাঁহার শানে
খোদা! তাঁহায় বাড়াও তুমি সর্ব গুণে-মানে।"

নাচনার তালে শায়মা আরও বলিত-

يَارَبَّنَا اَبْقِ اَخِىْ مُحَمَّدًا ـ حَتّٰى اَرَاهُ يَافِعًا وَّاَمْرَدًا

ثُمَّ اَرَاهُ سَيِّدًا مُّسَوَّدًا ـ وَاكْبِتْ اَعَادِيَهُ مَعًا وَالْحُسَّدَا

وَاَعْطِهِ عِزًّا يَّدُوْمُ اَبَدًا

এই হাদীছের তথ্য অনুযায়ী বক্ষ বিদারণ হাদীছের তথ্যকে নবীজীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার বিরোধী বলা প্রবঞ্চনা ছাড়া কি বলা যায়? আরও অধিক প্রবঞ্চনা করা হইয়াছে এই বলিয়া যে, বক্ষ বিদারণ হাদীছকে সত্য বলিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, "হযরত জন্মতঃ বা আদৌ মা'সূম ছিলেন না। (পৃষ্ঠা-১৯৯) কত বড় অজ্ঞতা! "মা'সুম" অর্থ গোনাহ হইতে সুরক্ষিত, অর্থাৎ নবীজীর দ্বারা গোনাহের অনুষ্ঠান হইবে না। ইহার জন্য গোনাহের উৎস সৃষ্টিগতভাবে, তাহাও অতি বাল্যকালে শুধু দেহে বিদ্যমান থাকা ক্ষতিকর নহে, বরং বাল্যকালেই ঐ উৎসের অপসারণের দ্বারা মা'সুম হওয়ার গুণ সপ্রমাণিত হইল। সুতরাং ঐ তথ্য হযরতের মা'সুম হওয়ার পরিপন্থী নহে, বরং ইহা প্রমাণকারী। যেরূপ শয়তান সঙ্গী হওয়ার হাদীছ মা'সুম হওয়ার পরিন্থী নহে, বরং আল্লাহ তাআলার সাহায্যে ঐ শয়তান বাধ্যগত হইয়া গিয়াছে বলায় ঐ হাদীছ মা'সুম হওয়ার প্রমাণ গণ্য হইবে।

একাধিকবার বক্ষ বিদারণ, বিশেষতঃ বোখারী শরীফসহ সমুদয় হাদীছ গ্রন্থে প্রমাণিত মে'রাজ উপলক্ষে বক্ষ বিদারণের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে যে, "হযরত নবুয়ত পাওয়ার পরেও তাঁহার শয়তানী ভাব ও কুপ্রবৃত্তি দমিত না হওয়ায় মে'রাজের রাত্রিতেও তাঁহার হৃৎপিণ্ডে অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক হইয়াছিল। (পৃষ্ঠা-১৯৯) নাউযুবিল্লাহ! কিরূপ শয়তানী কথা! এই শ্রেণীর অপদার্থ মার্কা বেআদবের বে-ঈমানী উক্তির আলোচনা করিতেও ভয় হয়। কি আশ্চর্য প্রবঞ্চনা করায় বেঈমানীর উক্তি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

বিভিন্ন হাদীছে হযরতের একাধিকবার বক্ষ বিদারণের বর্ণনা রহিয়াছে, কিন্তু শয়তানের অংশ অপসারণ করার তথ্য শুধুমাত্র বাল্যকালের বক্ষ বিদারণের বেলায় উল্লেখ রহিয়াছে; অন্য কোন উপলক্ষের বক্ষ বিদারণে তাহার উল্লেখ নাই। পূর্বাপর সকল ইমামও এক এক বারের বক্ষ বিদারণের হেকমত ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করিয়াছেন। যথা- বাল্যকালের বক্ষবিদারণে নশ্বর দেহ হইতে শয়তানের অংশ অপসারণ করা হইয়াছে, আর হেরা গুহাও নবুয়তপ্রাপ্তি উপলক্ষে বক্ষ বিদারণ ওহীর গুরুভার সামলাইবার সামর্থ্যের জন্য ছিল (প্রথম খণ্ড ২ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য) এবং মে'রাজ উপলক্ষে বক্ষ বিদারণ ঊর্ধ্বজগতের ভ্রমণে সামর্থ্যবান হওয়ার জন্য ছিল। (মেরাজের বয়ান দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজে অজ্ঞ হইয়া বিজ্ঞগণের ধার না ধারিলে গোমরাহ-ভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি?

আর একটা প্রবঞ্চনায় বলা হইয়াছে, "নবুয়তের পরও হযরতের হৃদয় ঈমান শূন্য ছিল।" (পৃষ্ঠা-১৯৯) এই প্রবঞ্চনার উৎস বাক্যটি মে'রাজের হাদীছে রহিয়াছে, অতএব তাহার আলোচনা তথায় হইবে।

"আমার ভ্রাতা মোহাম্মদকে বাঁচাও প্রভু তুমি
কিশোর-তরুণ দীর্ঘজীবী দেখব তাঁকে আমি
দেখব তাঁকে সাহেব-সর্দার সবার চেয়ে বড়
তাঁহার শত্রু তাঁহার হিংসুক সবকে ধ্বংস কর
চির গৌরব, চির সম্মান, সদা দৃষ্টি তোমার
তাঁহার জন্য অটুট রাখ এই কামনা আমার।"

(যোরকানী-১-১৪৬)

হালিমা পরিবারের সকলেই মুসলমান হইয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত রহিয়াছে, শুধু ওনায়সা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বিবি হালিমার স্বামী হারেসের ইসলাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) নবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার পর একদা হারেস মক্কায় আসিলেন। মক্কার লোকেরা তাঁহার নিকট বলিল, তোমার দুগ্ধপোষ্য ছেলে কি বলে তাহা জান কি? হারেস জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলে? তাহারা বলিল, সে বলিয়া থাকে, আল্লাহ মানুষকে পুনর্জীবিত করিবেন এবং আল্লাহর দুই রকম ঘর আছে; নাফরমানদেরকে এক প্রকার ঘরে শাস্তি দিবেন এবং ফরমাবরদারদিগকে অপর এক প্রকার ঘরে শান্তি ও পুরস্কার দিবেন- এই শ্রেণীর আরও বহু রকম কথার দ্বারা সে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, আমাদের ঐক্য নষ্ট করিয়াছে।

হারেস নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, লোকেরা অভিযোগ করে আপনি নাকি বলেন, মানুষ মৃত্যুর পর পুনঃ জীবিত হইবে এবং বেহেশত বা দোযখে যাইবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, সত্যই আমি ইহা বলিয়া থাকি; ঐদিন আসিলে আমি আপনাকে হাতে ধরিয়া আজিকার এই আলোচনার সত্যাসত্য দেখাইয়া দিব। হারেস তৎক্ষণাৎ মুসলমান হইয়া গেলেন। তিনি বলিতেন, আমার এই ছেলে কেয়ামতের দিন যদি আমার হাত ধরে তবে আমাকে বেহেশতে না পৌঁছাইয়া কি আমার হাত ছাড়িবে? (হাশিয়া সীরাতে ইবনে হেশাম- ১৬১)

নবীজী (সঃ) আপন পিতা-মাতার সেবা করিবার সুযোগ পান নাই; জন্মের পূর্বে পিতাকে এবং অতি শৈশবেই মাতাকে হারাইয়াছিলেন। পিতা-মাতার সেবা সম্পর্কে নবীজীর অতুলনীয় শিক্ষা রহিয়াছে। হযরত (সঃ) বলিয়াছেন-

হাদীছ ঃ পিতা-মাতার ভক্ত সুসন্তান স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি মায়া-মমতার দৃষ্টি করিলে প্রতি দৃষ্টিতে আল্লাহর দরবারে এক একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব লাভ করিয়া থাকে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এক দিনে একশতবার দৃষ্টি করিলেও (ঐরূপ একশত হজ্জের সওযাব পাইবে?)। হযরত (সঃ) বলিলেন, হাঁ- আল্লাহ তাআলা অতি মহান অতি পবিত্র (দানে তিনি কুণ্ঠিত নহেন)।

হাদীছ ঃ পিতা-মাতার সেবা শ্রদ্ধায় যেব্যক্তি আল্লাহর অনুগত হইবে, তাহার জন্য বেহেশতের দুইটি দরজা খোলা থাকিবে; তাঁহাদের একজনের ব্যাপারে ঐরূপ হইলে বেহেশতের একটি দরজা খোলা থাকিবে।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি অন্যায়-অত্যাচারকারী হয়। হযরত (সঃ) তিন বার বলিলেন, যদিও তাহার প্রতি অন্যায়-অত্যাচারকারী হয়।

হাদীছ ঃ এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক কি পরিমাণ? হযরত (সঃ) বলিলেন, পিতা-মাতাই তোমার বেহেশত-দোযখ।

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে প্রভু-পরওয়ারদেগারের সন্তুষ্টি; পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে প্রভু-পরওয়ারদেগারের অসন্তুষ্টি।

হাদীছ ঃ এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি জেহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি; আপনার পরামর্শের জন্য আসিয়াছি। হযরত (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন,

তোমার মা আছেন? ঐ ব্যক্তি বলিল, হাঁ আছেন। হযরত (সঃ) বলিলেন, মাতার সেবায় লাগিয়া থাক; বেহেশত জননীর চরণতলে। (সমুদয় হাদীছ মেশকাত শরীফ হইতে সংগৃহীত।)

এতদ্ভিন্ন হাদীছে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, মাতার হক পিতার হক অপেক্ষা তিন গুণ বেশী। পিতা-মাতাহারা নবীজীকে পিতা-মাতার সেবায় পুত্ররূপে দেখিবার সুযোগ থাকে নাই, কিন্তু শুধু স্তন্যদায়িনী মাতা হালিমার প্রতি হযরত (সঃ) যে ব্যবহার এবং ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন তাহা হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, নবীজীর আপন পিতা-মাতার সেবার সুযোগ পাইলে তিনি কি আদর্শ স্থাপন করিতেন।

হালিমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার প্রতি হযরত (সঃ) অতিশয় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। হোনায়নের যুদ্ধ বন্দীগণকে যে হযরত (সঃ) মুক্তি দান করিয়াছিলেন– যাহার বিবরণ ৩য় খণ্ডে উল্লেখ হইয়াছে, সেই ঐতিহাসিক উদারতা প্রদর্শনের মধ্যে একটি বিশেষ কারণ ইহাও ছিল যে, যুদ্ধ-বন্দীগণের মধ্যে হযরতের দুধ-মা হালিমার বংশীয় নারীগণও ছিল এবং মুক্তির আরজি পেশকারীগণ হযরতের সম্মুখে সেই বিষয়টিকে বিশেষরূপে তুলিয়া ধরিয়াছিল। তাহাদের বিশিষ্ট সুবক্তা যোহায়র বলিয়াছেন–

يارسول الله انما فى الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتى كن يكفلنك

অর্থ ঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ! বন্দিশালায় বন্দীদের মধ্যে আপনার খালা রহিয়াছেন এবং ঐ রমণীগণ রহিয়াছেন যাহারা শিশুকালে আপনার লালন-পালন করিয়াছেন।"

যোহায়র এই সম্পর্কে একটি কবিতাও আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিল–

أُمْنُنْ عَلٰى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا ۔ اِذْ فُوْكَ تَمْلَؤُهٗ مِنْ مَخْضِهَا الدُّرَرُ

اِذْ كُنْتَ طِفْلاً صَغِيْراً كُنْتَ تَرْضَعُهَا ۔ وَاِذْ يُرَنِّيْكَ مَا تَاْتِىْ وَمَا تَذَرُ

অর্থ ঃ "দয়া করুন ঐসব রমণীর প্রতি যাহাদের (আপন জনের) স্তনের দুগ্ধ আপনি পান করিয়াছেন– যাহাদের দুগ্ধের মুক্তাগুলি (ফোঁটাসমূহ) আপনার মুখকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকিত।

আপনি যখন ছোট শিশু ছিলেন তখন আপনি তাহাদের দুগ্ধপান করিয়া থাকিতেন–

যখন আপনি কোন কাজ করিতে বা কিছু হইতে উদ্ধার পাইতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন– একমাত্র কাঁদা ব্যতীত আপনার কোন উপায় থাকিত না।" (আল্-বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া ৪–৩৫২)

এইসব উক্তি হযরতের দুধ মা হালিমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জ্ঞাতিবর্গের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিল। অবশেষে হযরত (সঃ) ঐসব যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দানের ঘোষণা প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং মুসলমানগণকে অনুরোধ করিয়া তাহাদিগকে ঐ ব্যাপারে রাজি করিলেন।

আবু দাউদ শরীফে একটি হাদীছ আছে, আবুত্ তোফায়েল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হোনায়েন এলাকায় জেহাদকালে) হযরত নবী (সঃ) (মক্কা হইতে ১২/১৩ মাইল দূরে) জেয়ে'ররানা নামক স্থানে একদা গোশত বণ্টন করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় এক গ্রাম্য রমণী হযরতের প্রতি অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিলেন। হযরত (সঃ) তাঁহার জন্য নিজের চাদরখানা বিছাইয়া দিলেন। রমণী আসিয়া সেই চাদরের উপর বসিলেন। ঘটনা বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই রমণী কে? তখন উপস্থিত সকলে উত্তর করিলেন, তিনি হইলেন হযরতের দুধ মা। (এসাবা ৪–২৬৬)

ইহার পূর্বে আরও একবার বিবি হালিমা হযরতের নিকট আসিয়াছিলেন, তখনও হযরত (সঃ) তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সহিত হযরতের বিবাহের পরের ঘটনা– একবার হালিমার অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; বিবি হালিমা মক্কায় হযরতের নিকট আসিয়া সাহায্য

কামনা করিলেন। হযরত (সঃ) খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট বিবি হালিমাকে সাহায্য করার বিষয় আলাপ করিলেন; খাদিজা (রাঃ) বিবি হালিমাকে বিশটি মেষ এবং কতিপয় উট দিয়া দিলেন।
(যোরকানী, ১-১৫০)

হযরত (সঃ) তাঁহার সেবাকারিণী দুধভগ্নী শায়মার প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। হোনায়ন যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য হযরতের নিকট যে প্রতিনিধি দল আসিয়াছিল, সেই উপলক্ষে হযরতের সেই ভগ্নী শায়মাও হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়াছিলেন। হযরত (সঃ) তাঁহার জন্যও স্বীয় চাদর বিছাইয়া দিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া ছিলেন। -(যাদুল-মাআদ)

হযরতের শৈশব

নবীজী (সঃ) শিশু অবস্থায়ই সব সময় ডান স্তনের দুধ পান করিতেন; উভয় স্তন একা পান করিতেন না, দুধ ভ্রাতার জন্য এক স্তন অবশ্যই ছাড়িয়া রাখিতেন; শিশুকালেই তিনি এতদূর ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।
(নশরুত তীব-২৩)

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দৈহিক উঠতি সাধারণ শিশুদের অপেক্ষা অসাধারণ ছিল; দুই বৎসর বয়সেই তিনি বেশ বড় দেখাইতেন। (সীরাতে খাতম-২৮)

দুধ ছাড়াইবার পর সর্বপ্রথম তাঁহার মুখে এই কথা ফুটিয়াছিল

الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا -

"আল্লাহ মহান- সর্ব মহান। আল্লাহ তাআলার অংসখ্য প্রশংসা। সকাল-বিকাল সর্বদা আমরা আল্লাহর পবিত্রতা বয়ান করি।" (ঐ- ২১)

নবীজী (সঃ) এই বয়সে বাহিরে যাইতেন, কিন্তু তিনি খেলা-ধুলায় লিপ্ত হইতেন না; অন্য ছেলেদেরকে খেলিতে দেখিয়াও খেলায় অংশগ্রহণ করিতেন না। (ঐ)

বিবি হালিমা হযরত (সঃ)-কে কোথাও দূরে যাইতে দিতেন না। একদা বিবি হালিমার অজ্ঞাতে হযরত তাঁহার দুধভগ্নী শায়মার সাথে দ্বিপ্রহরের সময় পশুপালের চারণ ক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন। বিবি হালিমা হযরতের খোঁজে বাহির হইলেন এবং শায়মার সহিত তাঁহাকে পাইলেন। বিবি হালিমা শায়মার উপর রাগ করিয়া বলিলেন, তুমি এই প্রখর রোদ্রে এবং উত্তাপের সময়ে কেন তাঁহাকে বাহিরে নিয়া আসিয়াছ? শায়মা বলিল, আমার ভাই উত্তাপ ভোগ করে নাই; আমি দেখিয়াছি, একটি মেঘখণ্ড সর্বদা তাঁহাকে ছায়া দিয়া চলিয়াছে। ভাই যখন চলিত তখন মেঘখণ্ডও চলিত, ভাই যখন থামিয়া থাকিত তখন মেঘখণ্ডও থামিয়া থাকিত। (নশরুত তীব-২১)

শৈশবে নবীজীর উসিলায় আল্লাহ তাআলার রহমত লাভের অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল; বিবি হালিমার বর্ণনায় সেইরূপ অনেক বিবরণ রহিয়াছে। ঐ শ্রেণীর ঘটনা মক্কায়ও ঘটিয়াছে।

মক্কায় ভয়াবহ অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কোরায়েশ সর্দারগণ খাজা আবু তালেবের নিকট আসিয়া বলিল, হে আবু তালেব! সমগ্র মক্কা উপত্যকায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ; বৃষ্টির জন্য প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করুন। আবু তালেব বালক নবীজীকে সঙ্গে করিয়া ক'বা শরীফের নিকট আসিলেন। নবীজী (সঃ) তখন নিতান্তই বালক; তিনি স্বীয় শাহাদাত আঙ্গুল আকাশপানে উত্তোলনপূর্বক নিবেদনকারীর ন্যায় অবস্থা অবলম্বন করিলেন। তৎক্ষণাত মেঘবিহীন পরিষ্কার আকাশে অসাধারণ মেঘমালার সঞ্চার হইল এবং প্রবল বারিপাত হইল।

এক সময় মক্কাবাসীরা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি শত্রুতায় মাতিয়া উঠিল। নবীজীর

প্রশংসায় খাজা আবু তালেব স্বীয় কবিতায় এই বিষয়টিও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন এবং তাহা বোখারী শরীফেও উল্লেখ আছে। (পৃষ্ঠা-১৩৭)

وَاَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهٖ - ثِمَالُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِّلْاَرَامِلِ

মেঘের বৃষ্টি আসে তাঁহার নূরানী চেহারায়!
এতীমগণের পালক তিনি, বিধবার আশ্রয়!!

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনায় একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিয়া বলিল, অনাবৃষ্টির দরুন এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে যে, দুধের অভাবে শিশুদের শব্দ করার পর্যন্ত শক্তি নাই। তৎক্ষণাত রসূল (সঃ) মিম্বরে দাঁড়ানো অবস্থায়ই হাত উত্তোলনপূর্বক দোয়া আরম্ভ করিলেন। দোয়ার হাত নামাইবার পূর্বে আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়া প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল; লোকগণ পানিতে ভিজিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। নবীজী (সঃ) হাসিমুখে বলিলেন, আজ আবু তালেব জীবিত থাকিলে এই ঘটনা দৃষ্টে তিনি আনন্দিত হইতেন; তাঁহার কাব্যের বাস্তবায়ন এই ঘটনায়ও রহিয়াছে। এই বলিয়া নবীজী (সঃ) বলিলেন, কেহ আছে কি যে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া শুনায়? আলী (রাঃ) উল্লিখিত পংক্তিটি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। (যোরকানী, ১-১৯১)

হযরতের মাতৃবিয়োগ

নবীজীর জীবনী পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহার জন্ম, শৈশব ও বাল্যকাল শোক-ব্যথা এবং দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করিলে তাঁহার হাবীবের জন্য সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থাও করিতে পারিতেন। কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে বিশ্বনবীর জন্য তাহারই প্রয়োজন ছিল। বিশ্বের সংখ্যাগুরু মানুষ দুঃখী-দরদী, তাহাদের দুঃখে-দরদে বিশ্বনবীকে অংশীদার হইতে হইবে; সুতরাং বাল্যকালের এ অবস্থার মধ্য দিয়াই তিনি দুঃখ-দরদের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হইবেন এবং প্রতিকারের ব্যবস্থায় অভিজ্ঞের ভূমিকা গ্রহণে কৃতকার্য হইতে পারিবেন।

চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?

এই তথ্য আল্লাহ তাআলাও কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন- الم يجدك يتيما فاوى "আপনি এতীম ছিলেন; পরে আল্লাহ আপনার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

ইতিহাসের বিভিন্ন মতামত দৃষ্টে বলিতে হয়, নবীজীর বয়স চারি হইতে নয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার মাতা ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

দুগ্ধপানের বয়স এবং তাহারও পর কিছুকাল নবীজী (সঃ) দুধ মায়ের প্রতিপালনে থাকিয়া দীর্ঘ দিন পর আপন মা বিবি আমেনার স্নেহ ছায়ায় ফিরিয়া আসিলেন; বিবি আমেনার অন্তরে কতই না আনন্দ। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল, প্রাণের দুলাল শিশু নবীজী (সঃ)-কে লইয়া মদীনায় যাইবেন। নবীজীর পিতামহের মাতুলকুল মদীনায়, নবীজীর পিতার কবর মদীনায়। স্বামীহারা আমেনার সাধ জাগিল শ্বশুরের মাতৃকুলের সকলকে দেখাইবে- মৃত আবদুল্লাহর ঘরে আল্লাহ কি সোনার চাঁদ দান করিয়াছেন! সঙ্গে সঙ্গে শত আবেগপূর্ণ হৃদয় নিয়া যেয়ারত করিবেন স্বামী আবদুল্লাহর কবর। বিবি আমেনা গর্ভ অবস্থা হইতে এই সময় পর্যন্ত নবীজী (সঃ) সম্পর্কে বহু কিছুই দেখিয়াছিলেন, উপলব্ধি করিয়াছিলেন- কী রত্ন তিনি প্রসব করিয়াছেন তাহা

বুঝিবার তাঁহার বাকী ছিল না। অথচ এহেন পুত্ররত্ন লাভের আনন্দ হইতে স্বামী তাঁহার চির বঞ্চিত; এই চাঁদের মুখ দেখিবার পূর্বেই তিনি মদীনায় ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। বিবি আমেনা সোনার পুত্র লাভের যে আনন্দ পাইয়াছেন সেই আনন্দের পার্শ্বে তাঁহার মনোবেদনা সমধিকই ছিল নিশ্চয়। তাই অন্ততঃ স্বামীর মাজারে পুত্রধনকে লইয়া না গিয়া তিনি শান্ত হইতে পারেন কি?

আনন্দ ও আবেগভরা অন্তর লইয়া বিবি আমেনা প্রাণের দুলাল বালক নবীজী (সঃ)-সহ মদীনাপানে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রহিয়াছে পরিচারিকা উম্মে আয়মান। শিশু পুত্র আর দাসী- শুধু এই দুই সঙ্গী লইয়া বিবি আমেনা একাই প্রায় তিন শত মাইলের দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করিয়া মদীনায় পৌছিবেন; কী দুঃসাহসিক কার্য! ভাঙ্গা বুকের আবেগ তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছে সাহসে বুক বাঁধিতে, প্রেরণা যোগাইয়াছে সুদীর্ঘ মরুপ্রান্তর জয় করিতে। শেষ পর্যন্ত তিনি মদীনায় উপস্থিত হইতে কৃতকার্য হইলেন।

বিবি আমেনা বালক নবীজী (সঃ) সহ মদীনায় এক মাস অবস্থান করিলেন; তৎকালীন মদীনার কোন কোন স্মৃতি নবীজীর স্মরণও রহিয়াছে। হিজরত করিয়া রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায় আসিয়াছেন তখন তিনি ছাহাবীগণের সঙ্গে আলোচনায় বলিয়াছেন, এই গৃহে আমি আমার আম্মার সহিত অবস্থান করিয়াছিলাম। এমনকি ঐ সময় নবীজী (সঃ) তথায় এক বাড়ীর একটি জলাশয়ে ভালরূপে সাঁতার কাটাও শিখিয়া ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (যোরকানী, ১-১৬৪)

পরিচারিকা উম্মে আয়মানের বর্ণনা- ইহুদীদের কিছু লোক বালক নবীজীকে উদ্দেশ করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল এবং তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষণীয় দৃষ্টি করিতে লাগিল। একদা আমি তাহাদের একজনের উক্তি শুনিতে পাইলাম, সে সঙ্গীগণকে বলিতেছে, এই বালক এই যুগের নবী হইবেন এবং এই মদীনা তাঁহার হিজরত স্থান হইবে। তাঁহার উক্তিগুলি আমি সুরক্ষিত রাখিলাম।

নবীজীর মাতা বিবি আমেনাও ঐ শ্রেণীর উক্তির সংবাদ জানিতে পারিলেন এবং বালক নবীজী (সঃ) সম্পর্কে ইহুদীদের তরফ হইতে আশঙ্কা বোধ করিলেন। সেমতে কালবিলম্ব না করিয়া বিবি আমেনা বালক নবীজী (সঃ) ও পরিচারিকা উম্মে আয়মানসহ মদীনা হইতে মক্কা ফিরিয়া আসার জন্য যাত্রা করিলেন। মক্কা-মদীনার মধ্যে অর্ধ পথ পূর্বে 'আবওয়া' নামক স্থানে পৌছিয়া বিবি আমেনা অকস্মাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং নিতান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

কী করুণ দৃশ্য! মরুভূমির বুকে উন্মুক্ত আকাশতলে পাহাড়-পর্বতের মাঝে পিতা নাই, মাতা নাই, আত্মীয়-স্বজন কেহ কাছে নাই, এক দাসীর সহিত একা এই বালক! ইহা অপেক্ষ ভীষণ আর কি হইতে পারে? এই অবস্থায় দাসী উম্মে আয়মান বিবি আমেনাকে কবর দিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে লইয়া মক্কায় পৌছিলেন।

নবীজীর দুঃখ-বেদনার কি সীমা থাকিল! পিতার ত মুখই দেখেন নাই; দুনিয়ায় আসিবার পূর্বেই পিতাকে হারাইয়াছেন, এখন আবার শিশু বয়সেই এক হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য মাঝে মাতাকে হারাইলেন। মক্কা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন মায়ের সাথে; মাত্র একমাস পরেই আজ মক্কায় ফিরিলেন একা- মাকে পথিমধ্যে দূর প্রান্তরে রাখিয়া আসিলেন কবরে।

এত ব্যথা! কিন্তু এখনও নবীজীর দুঃখের পেয়ালা পূর্ণ হয় নাই; পিতাহারা নবীজী মাকে হারাইয়া যাঁহার আশ্রয়ে আসিলেন, মাত্র দুই বৎসরেই আবার তাঁহাকে হারাইবার শোকে আক্রান্ত হইলেন। মাকে চির বিদায় দিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মক্কায় পৌছিলেন; দাদা আবদুল মোত্তালেব তাঁহার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। দাসী উম্মে আয়মানও সেই দায়িত্বে অংশীদার।

উম্মে আয়মান

নবীজীর পিতার মুক্ত দাসী ছিলেন উম্মে আয়মান। (যোরকানী-১৬৩) তিনি হাবশী তথা আবিসিনিয়ার ছিলেন; নবীজীর বাল্য বয়সের বিশিষ্ট সেবাকারিণী ছিলেন তিনি। নবীজী (সঃ) তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগী

ছিলেন। নবীজী (সঃ) তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বলিয়া থাকিতেন, আমার (গর্ভধারিণী) জননীর পরে আপনিই আমার জননী। (যোরকানী, ১-১৮৮) তিনি বহু পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিঃস্ব অবস্থায় হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। নবীজী (সঃ)-এর নিজের অবস্থাও তদ্রূপই ছিল। মদীনার কোন কোন ছাহাবী নবীজীকে কতিপয় খেজুর গাছ প্রদান করিয়াছিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেই খেজুর গাছ হইতে উম্মে আয়মান (রাঃ)-কে কয়েকটি দান করিয়াছিলেন। নবীজীর বিশেষ ভালবাসার পাত্র পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার সহিত নিজ প্রচেষ্টায় উম্মে আয়মানকে বিবাহ দিয়াছেন এবং তাঁহাদের পুত্র ওসামা (রাঃ)-কে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অত্যধিক ভালবাসিতেন। এমনকি ছাহাবীদের মধ্যে তিনি "হেব্বু রসূলিল্লাহ"- রসূলুল্লাহর প্রিয়পাত্র আখ্যায় ভূষিত ছিলেন।

উম্মে আয়মান (রাঃ) নবীজীর সেবা করিয়া ইহ-পরকালে পরম সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। লোকমুখে তিনি "বরকত" নামে পরিচিতা ছিলেন। বর্ণিত আছে- একদা "রওহা" নামক মরু প্রান্তরে তিনি পিপাসাতুর হইয়া পড়িলেন। কোথাও পানির ব্যবস্থা নাই। ঐ সময় রেশমী দড়িতে ঝুলানো পানিভরা ডোল আকাশ হইতে তাঁহার সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িল; তিনি সেই পানি পান করিয়া এরূপ তৃপ্তি লাভ করিলেন যে, পরবর্তী জীবনে কখনও পিপাসার যাতনা ভোগ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ঐ ঘটনার পর উত্তপ্ত দিনের রোযায় দ্বিপ্রহরকালেও আমি পিপাসা অনুভব করি না। (যোরকানী, ১-১৮৮)

নবীজীর ইন্তেকালে তিনি অতিশয় শোকাতুর হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহার ক্রন্দনে আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দুনিয়া ত্যাগের ৫/৬ মাস পরই তিনি ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন।

দাদাকেও হারাইলেন নবীজী (সঃ)

পিতা-মাতাহারা নবীজী (সঃ) দাদা আবদুল মোত্তালেবের আশ্রয়ে থাকিতেন। আবদুল মোত্তালেব নবীজী (সঃ)-কে সন্তান অপেক্ষা অধিক স্নেহ-মমতা করিতেন। আবদুল মোত্তালেব মক্কার সর্বপ্রধান সর্দার ছিলেন। তাঁহার জন্য প্রত্যহ কা'বা গৃহের সন্নিকটে বিশেষ বিছানা করা হইত; অন্য কেহ এমনকি আব্দুল মোত্তালেবের সন্তানরাও ঐ বিছানার উপর যাইতে পারিত না। বালক নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বিনা বাধায় ঐ বিছানার উপর বিচরণ করিতেন; স্নেহ-মমতায় আবেগপূর্ণ আবদুল মোত্তালেব আদর ও ভালবাসার দৃষ্টিতে স্বীয় পৌত্র নবীজীর এই আচরণ উপভোগ করিতেন। চাচাগণ নবীজীকে বিছানা হইতে হটাইতে চাহিলে আবদুল মোত্তালেব বাধা দিয়া বলিতেন, বাছাধনকে বিরক্ত করিও না। আমার এই বাছাধনের ভবিষ্যত অতি উজ্জ্বল। (যোরকানী, ১-১৮৯)

আপদ-বিপদের ঝড়-ঝঞ্ঝায় মানুষের ধৈর্য, সাহস এবং উদ্যম বলিষ্ঠ হয়, তাই যেন বিধাতা নবীজীকে আঘাতের পর আঘাত, দুঃখের পর দুঃখ, ব্যথার পর ব্যথায় ফেলিয়া তাঁহার জীবন বুনিয়াদ মজবুতরূপে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। পিতা-মাতাকে হারাইবার পর দাদা আবদুল মোত্তালেবের ছায়া নবীজীর জন্য সুদীর্ঘ হইল না। নবীজীর মাতৃবিয়োগের মাত্র দুই বৎসর পরেই দাদা আবদুল মোত্তালেব বালক নবীজীকে ছাড়িয়া দুনিয়া হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। আবদুল মোত্তালেব মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র আবু তালেবকে অসিয়ত করিয়া গেলেন নবীজীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। তিনি নবীজীর পিতা খাজা আবদুল্লাহর এক মায়ের গর্ভজাত ভ্রাতা ছিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দীর্ঘ দিন আবু তালেবের ছায়ায় ছিলেন; হযরত (সঃ) নবী হওয়ারও সাত বৎসর পর আবু তালেবের মৃত্যু হইয়াছিল। আবু তালেব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহায্য-সহায়তায় সাধ্যের সর্বশেষ বিন্দু ব্যয় করিয়া যাইতেছিলেন।

নবীজীর মাতা-পিতা সম্পর্কে

নবীজী (সঃ) পিতাকে দেখেন নাই, মাতাকে বাল্যাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তিনি সারা জীবনই মৃত পিতা-মাতার প্রতি অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। মক্কা বিজয় বা ষষ্ঠ হিজরী সনে হোদায়বিয়ার ঘটনার সফরে

মক্কা হইতে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে "আবওয়া" নামক স্থানে নবীজী (সঃ) স্বীয় মাতার কবর যেয়ারত করিয়াছিলেন। নবীজীর অন্তরে যে কি আবেগ ছিল! মায়ের কবর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নবীজী (সঃ) কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। মুসলিম শরীফের হাদীছে আছে, আবূ হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন নিজ মাতার কবর যেয়ারত করিয়াছেন; তখন তিনি এইরূপ কাঁদিয়াছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গীগণকে পর্যন্ত কাঁদাইয়া ফেলিয়াছেন। মায়ের মমতাই মাতৃহারা নবীজীকে এইরূপ অভিভূত করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি আজ নবী, কিন্ত মা তাঁহাকে নবীরূপে পান নাই– সেই ব্যথাও কম নহে। এত দুঃখ– এত ব্যথা! এই অবস্থায় নবীজী (সঃ) আল্লাহ্ তাআলার দরবারে মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাহিয়া ব্যর্থ হইলেন। মুসলিম শরীফের উক্ত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে– নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, "পরওয়ারদেগারের নিকট মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাহিয়াছিলাম; অনুমতি দেওয়া হয় নাই। তাঁহার কবর যেয়ারতের অনুমতি চাহিয়াছি; সেই অনুমতি পাইয়াছি।" ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি না পাইয়া নবীজীর মনের আবেগ ও ব্যথা কি চরম আকার ধারণ করিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বিধান– ঈমান ব্যতিরেকে ক্ষমা হইবে না; আল্লাহ তাআলার এই বিধান সকলের জন্য। অবশ্য আল্লাহ তাআলা কি স্বীয় হাবীবের এই ব্যথার লাঘব করিবেন না? এই আবেগের মূল্য দিবেন না? ইহা ত আল্লাহর হুজুরে বড় কথা যে, তাঁহার হাবীবের অন্তরে ব্যথা ও অশান্তি। নবীজী (সঃ)-এর জন্য আল্লাহ তাআলার ওয়াদা-অঙ্গীকার বিঘোষিত রহিয়াছে– ولسوف يعطيك ربك فترضى "নিশ্চয় আপনার প্রভু আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণপূর্বক আপনার মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া চলিবেন।"

এই প্রভু-পরওয়ারদেগার কি স্বীয় হাবীবের অন্তরকে সারা জীবন কাঁদাইবেন? তাঁহার পিতা-মাতার মুক্তি সম্পর্কে কি তাঁহার মনোবেদনা দূর করার ব্যবস্থা করিবেন না?

পূর্বাপর বহু ইমাম ও আলেমগণের সিদ্ধান্ত এই যে, নবীজী (সঃ)-এর পিতা-মাতা পরকালে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদের মুক্তির সূত্র সম্পর্কে অধিকাংশের মত এই যে, নবীজীর সন্তুষ্টি ও সম্মান উদ্দেশে তাঁহার বৈশিষ্ট্যরূপে আল্লাহ তাআলা বিশেষ ব্যবস্থা এই করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা-মাতাকে মুহূর্তের জন্য জীবিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাঁহারা জীবিত হইয়া ঈমান গ্রহণ করতঃ পুনঃ মৃত হইয়া গিয়াছেন। এই সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে। (যোরকানী, ১– ১৬৬-১৮৮ দ্রষ্টব্য) এমনকি বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবন হাজার (রঃ)ও তাঁহার এক কিতাবে এই বিষয়টির পূর্ণ সমর্থন উল্লেখ করিয়াছেন। (ফতহুল মোলহেম, ১–৩৭৩ দ্রষ্টব্য)।

বাল্যকালে নবীজীর বিদেশ সফর

এক-দুই জন ব্যতীত সকল পয়গম্বরই চল্লিশ বৎসর বয়সে পয়গম্বরী লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের এই সুদীর্ঘ সময়টা ব্যর্থ হইত না; পয়গম্বরীর গুরুদায়িত্ব বহনে তাঁহাদেরকে যোগ্য করা হইত। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বেলায়ও তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি ত হইবেন বিশ্বনবী; তাঁহার দায়িত্ব হইবে বিশ্বজোড়া, তাই তাঁহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে বিশেষরূপে; তাঁহার পয়গম্বরী জীবনের বুনিয়াদ মজবুত করিতে হইবে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া। এই বিশেষ প্রস্তুতি এবং বিশেষরূপে গড়াইবার যোগাড়-আয়োজনেই অতিবাহিত হইয়াছে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চল্লিশ বৎসরের সুদীর্ঘ সময়।

নবীজী (সঃ) শৈশব হইতে কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স কম-বেশী বার বৎসর। বিধাতা তাঁহাকে দেশের বাহিরে পাঠাইবেন। বহির্দেশের বিশাল জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক রচনা এবং পরিচয় ঘটান প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সমাধার সুন্দর মুহূর্ত নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরেও আবেগের ঢেউ খেলিয়া উঠিল।

নবীজী (সঃ)-এর মুরব্বী চাচা আবু তালেব সিরিয়ায় বাণিজ্যে যাইবেন; তিনি সফরের যোগাড়-আয়োজন করিতেছেন, যাত্রার সময় আসিল. তিনি যাত্রা করিবেন। সেই মুহূর্তে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চাচা আবু তালেবকে ধরিয়া বসিলেন, তিনিও তাহার সঙ্গে যাইবেন। আবু তালেবের স্নেহ-মমতা তাহাকে নবীজী (সঃ)-এর আবদার রক্ষা করায় বাধ্য করিল; তিনি নবীজী (সঃ)-কে সঙ্গে নিয়াই সিরিয়ার পথে যাত্রা করিলেন।

নবীজীর জীবনের এক নূতন অধ্যায় আজ সূচিত হইল– ভাবী বিশ্বনবী বহির্বিশ্বের ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, বহিঃপ্রকৃতি তাই আজ উল্লসিত আনন্দিত। রাজপুত্রের ভ্রমণে পথের উভয় পার্শ্বে যেমন করিয়া সাড়া পড়িয়া যায়, তদ্রূপ নবীজীর চলার পথের দুই ধারেও সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তাঁহার গমনপথের নিকস্থ পর্বতমালা ও বৃক্ষরাজি সকলেই নিজ নিজ কায়দায় নবীজী (সঃ)-কে অভিবাদন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ধন্য হইতে লাগিল। নীল আকাশও নবীজীর সেবায় ব্রতী হইল– ঘন মেঘখণ্ড নবীজী (সঃ)-কে ছায়া দিয়া চলিল। প্রকৃতিরাজির এই সব লীলা সকলে লক্ষ্য না করিলেও যাহারা দেখিয়াছে তাহারা ভাবী বিশ্বনবীকে চিনিতে পারিয়াছে– যাহার সাক্ষ্য সম্মুখে আসিতেছে।

আবু তালেবের বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়ার এক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র "বস্‌রা" নগরে পৌঁছিল। তথায় "জিরজীস্" ওরফে "বহিরা" নামীয় এক খাঁটি অভিজ্ঞ পাদ্রী ছিলেন। তিনি তওরাত ও ইঞ্জীল কিতাব মারফত শেষ যমানার নবীর নিদর্শন ও পরিচয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছিলেন যীশুখৃষ্ট তথা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতিশ্রুত রসূল। ঈসা (আঃ) নবী মোস্তফা (সঃ) সম্পর্কে অনেক প্রচার ও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং খৃষ্টান পাদ্রী বহিরা নবীজীর বহু কিছু লক্ষণ অবগত ছিলেন, তাই নবীজী (সঃ)-কে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

আবু তালেবের সওদাগরী কাফেলা ঐ পাদ্রীর ঘরের নিকট অবতরণ করিল। পাদ্রী কাফেলার মধ্যে বালক রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চেহারা দেখামাত্রই চিনিয়া ফেলিলেন যে, এই বালকই প্রতিশ্রুত শেষ যমানার নবী। সঙ্গে সঙ্গে কাফেলার মধ্যে আসিয়া হযরতের হাত ধরিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, এই ত সকল পয়গম্বরগণের শিরোমণি, এই ত নিখিলের শ্রেষ্ঠ মানব। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে বিশ্বজগতের জন্য আশীর্বাদ ও মঙ্গলরূপে দাঁড় করাইবেন। কাফের লোকগণ সেই পাদ্রীকে প্রশ্ন করিল, আপনি কিরূপে এই বিষয় জ্ঞাত হইলেন? পাদ্রী বলিলেন, আপনারা রাস্তার মোড় ফিরিয়া এই অঞ্চলে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের সমুদয় গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত তাঁহার সম্মান প্রদর্শনে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি আমি তাঁহার পৃষ্ঠে মোহরে নবুয়ত দেখিতে পাইতেছি; তাহার দ্বারাও তিনি আমাদের নিকট পরিচিত। অতপর সেই পাদ্রী বস্তুতঃ হযরতের খাতিরে সম্পূর্ণ কাফেলাকে দাওয়াত করিলেন। সকলে খাওয়ার জন্য উপস্থিত হইল, কিন্তু হযরত (সঃ) তাহাদের সঙ্গে ছিলেন না। পাদ্রী তাহাদের নিকট হযরতের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সকলে বলিল, তিনি উট চরাইতে গিয়াছেন। পাদ্রী তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া হযরতকে সংবাদ দিয়া আনিলেন। যখন হযরত ময়দান হইতে আসিতেছিলেন তখন পাদ্রী লক্ষ্য করিতেছিলেন যে, তাঁহার মাথার উপর একটি মেঘখণ্ড ছায়া প্রদান করিয়া আসিতেছে। যখন হযরত খাওয়ার স্থলে পৌঁছিলেন– যাহা একটি বৃক্ষের ছায়াতলে ছিল; তিনি বৃক্ষের ছায়ায় স্থান না পাইয়া ছায়াহীন জায়গায় বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের ডালাগুলি হযরতের মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছায়া দান করিল। পাদ্রী উপস্থিত কাফেলার লোকদিগকে বৃক্ষের এই অস্বাভাবিক ঘটনা দেখাইয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি, তোমরা এই বালককে লইয়া তোমাদের গন্তব্যস্থল সিরিয়ায় যাইবে না। তথাকার ইহুদীরা এই বালকের নিদর্শন দেখিয়া চিনিয়া ফেলিবে এবং তাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলার চেষ্টা করিবে।

ইতিমধ্যে পাদ্রী দেখিতে পাইলেন, সাত জন রোমীয় লোক ঐ স্থানের দিকে আসিতেছে। পাদ্রী অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি খোঁজ করিতেছ? তাহারা বলিল, তওরাত-ইঞ্জীলের বর্ণনা

মারফত আমরা জানি, শেষ যামানার নবী জন্মলাভ করিয়াছে, এই মাসে তিনি এই পথে সফর করিবেন; আমরা তাঁহার তালাশে আসিয়াছি। পাদ্রী তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, খোদার ইচ্ছা কি কেহ ঠেকাইতে পারে? তাহারা পাদ্রীর এই কথায় তাহাদের চেষ্টা ত্যাগ করিল। অতপর পাদ্রী হযরতের চাচা আবু তালেবকে কসম দিয়া বলিলেন, আপনি অবশ্যই এই বালককে সতর্কতার সহিত যথাসত্বর দেশে পৌঁছাইতে যত্নবান হইবেন। সেমতে আবু তালেব (সযত্নে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও) সিরিয়ার বাণিজ্য সফর সংক্ষিপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

(সীরাতে ইবনে হেশাম)

এই পাদ্রীর সহিত হযরতের সামান্য কথাবার্তাও হইয়াছিল– তাহার বিবরণও বর্ণিত রহিয়াছে। পাদ্রী বলিলেন, আপনাকে লাত ও ওজ্জা দেবীদ্বয়ের কসম দিতেছি– আমার কতিপয় প্রশ্নের উত্তর আপনি অবশ্যই দিবেন। হযরত (সঃ) বলিলেন, আমাকে লাত-ওজ্জার কসম দিবেন না, তাহাদেরকে আমি অতিশয় ঘৃণা করি। তখন পাদ্রী বলিলেন, আল্লাহর কসম....। এইবার হযরত (সঃ) বলিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। পাদ্রী তাঁহাকে অনেক বিষয়েই প্রশ্ন করিলেন– হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিদ্রা, বিভিন্ন হাল-অবস্থা এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সর্বশেষ পয়গম্বরের গুণাগুণ সম্পর্কে ঐ পাদ্রীর যাহা কিছু জানা ছিল তাহার পরীক্ষার জন্যই তিনি হযরত (সঃ)-কে এইসব জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে লাত ও ওজ্জা দেবীর কসমও এই উদ্দেশেই করিয়াছিলেন যে, তিনি ভাবী সর্বশেষ নবী হইয়া থাকিলে কখনও তিনি এই কসম গ্রহণ করিবেন না, বস্তুতঃ হইলও তাহাই। (যোরকানী, ২– ৯৬)*

সামাজিক ও জনকল্যাণ কাজে হযরতের প্রথম যোগদান

তখনকার আরব দেশ অন্ধকার দেশ, তাহার পরিবেশ অন্ধকার এবং তখনকার যুগ অন্ধকার যুগ– মারামারি, রক্তারক্তি প্রায় সর্বদা লাগিয়াই আছে। অন্যায়-অবিচার, জুলুম-অত্যাচারই সেই দেশ ও সেই যুগের ইতিহাস।

*** সমালোচনাঃ** এক শ্রেণীর খৃষ্টান লেখক মাকড়সার জালের উপর ঘর তৈয়ার করার ন্যায় বহিরা পাদ্রীর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এক আজগবী তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নাকি এই বহিরা পাদ্রীর সাক্ষাত হইতে জ্ঞান-বিদ্যা আহরণ করিয়াছিলেন। কি আজগবী আবিষ্কার! কি আজগবী কথা!

অচিরেই যাঁহার জ্ঞান-দর্শনে সারা জগত স্তম্ভিত মুগ্ধ হইল; যাঁহার আদর্শ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ ও পরিবেশকে এবং কুসংস্কার জর্জরিত জাতিকে আদর্শের রাজমুকুট পরাইল, যাঁহার শিক্ষা ও দান বিশ্ব বুকে শান্তি, নিরাপত্তা ও সোনালী আদর্শের বন্যা বহাইয়া দিল, তিনি তাঁহার এই অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র ও অমৃতাদর্শের মহাসাগর লাভ করিলেন এক বিন্দুবৎ হইতে। ১২ বৎসর বয়সে মূহুর্তের সাক্ষাত ও দুই-চারি কথার আলাপে। এইরূপ পচা গল্পবাজির উত্তর না দেওয়াই ভাল উত্তর।

আশ্চর্যের বিষয়, "মোস্তফা-চরিত" খৃষ্টানদের ঐ পচা গল্পবাজিতে মস্তক হেঁট করিয়া লজ্জা ঢাকিবার জন্য পেরেশান হইয়া পড়িয়াছে। অবশেষে কোন পথ না দেখিয়া বহিরা পাদ্রীর ঘটনার ইতিহাসকেই অস্বীকার করতঃ হাঁপ ছাড়িতে চাহিয়াছে। মোস্তফা চরিতের ভাষায়– "এই গল্পটিই একেবারে ভিত্তিহীন উপকথা।" (পৃষ্ঠা–২২০) মোস্তফা চরিত সঙ্কলকের স্বভাবগত কুঅভ্যাসই ইহা যে, যাহা তাহার মনঃপূত না হইবে তাহাকে "গল্প" বলিয়া আখ্যা দিবে, যদিও তাহা জগতভরা ইতিহাসের পাতায়, এমনকি হাদীছ গ্রন্থেও বিদ্যমান থাকে।

বহিরা পাদ্রীর উল্লিখিত ঘটনার বয়ান সীরাতশাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থেই বর্ণিত আছে, এমনকি সেহাহ সেত্তা হাদীছ গ্রন্থসমূহের তিরমিযী শরীফেও উল্লেখ আছে। মরহুম খাঁ সাহেব তাঁহার মোস্তফা চরিতে উল্লিখিত ঘটনার প্রতি বিষোদাগারে প্রবঞ্চনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন রেফারেন্স বা বরাতের মারপ্যাঁচে দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেনঃ

প্রথমতঃ তিনি ঘটনা বর্ণনার সনদ সম্পর্কে নানারূপ গোঁজামিলের দ্বারা তাহার দুর্বলতা দেখাইতে চাহিয়াছেন। এই সম্পর্কে ভূমিকায় বর্ণিত এই বিষয়টি লক্ষ্য করাই যথেষ্ট যে, এই ঘটনার বর্ণনা হইল ইতিহাস। ইতিহাস ভিন্ন জিনিস এবং হাদীছ তদপেক্ষা বহু উর্ধ্বের ভিন্ন জিনিস। হাদীছ বলা হয় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কথা, কাজ এবং সমর্থনকে। আলোচ্য

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বয়স তখন ১৫-১৬। (আসাহহুস সিয়ার) কায়স গোত্রীয় লোকেরা কোরায়শদের সঙ্গে অন্যায়রূপে এক ভয়াবহ যুদ্ধ বাধাইয়া দিল; সেই যুদ্ধই ইতিহাসে "ফেজার যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ। আত্মরক্ষা, অন্যায়ের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণে কোরায়শগণও যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কোরায়শদের শাখা গোত্রসমূহ নিজ নিজ সর্দারের নেতৃত্বে ভিন্ন ভিন্ন বাহিনীরূপে সেই যুদ্ধে যোগদান করিল। বনী হাশেম গোত্রের নেতৃত্ব তাহাদের সর্দার হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেবের উপর ছিল। হযরতের জীবনের সর্বপ্রথম তিনি সেই যুদ্ধে দাদার সাহায্যকারীরূপে রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন।

ঘন ঘন যুদ্ধবিগ্রহের কারণে মক্কায় এতীম-বিধবা, অনাথ-দুর্বলদের সংখ্যা অনেক ছিল। এই দুর্বলদের উপর দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য চলিত নির্বিবাদে।

মক্কার সুমতিসম্পন্ন কতিপয় সর্দার একটি কল্যাণমূলক সমাজ-সেবা সমিতি গঠনে সচেষ্ট হইলেন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেই সমাজ সেবা সমিতির সাংগঠনিক তৎপরতায় অংশগ্রহণপূর্বক বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। উক্ত সমিতির উদ্দেশ্যাবলী ছিল নিম্নরূপ-

(১) অসহায় দুর্গতদিগের সাহায্য সেবা করা।

(২) এতীম-বিধবা ও দুবর্লদেরকে সকল অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করা।

(৩) কোন বিদেশী বা পথিকের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করা হইলে তাহার আশু প্রতিকার করা।

(৪) সর্বপ্রকার অত্যাচার প্রতিরোধে অত্যাচারীকে দৃঢ়তার সহিত বাধা দেওয়া এবং অত্যাচারিতকে সাহায্য করা।

(৫) দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

(৬) সকলের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ও রক্ষার চেষ্টা করা।

সমিতির সদস্যগণ এই উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন- ইহারই ঐতিহাসিক নাম 'হেলফুল ফজুল'। অন্ধকার যুগে ইহাই ছিল কিঞ্চিৎ আলোর সর্বপ্রথম উদ্ভাসন। বিশ্ব ভূমণ্ডলের এপার হইতে ওপার পর্যন্ত সকলের জন্য এক নবী- এই ব্যতিক্রম রূপের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। তাঁহার দ্বারা প্রকৃত শান্তি এবং কল্যাণ মঙ্গল প্রতিষ্ঠার সূচনায় যুগ-যুগান্তের অন্ধকার কাটিয়া

বিবরণটি ত নবীজীর পয়গম্বরী জীবনের বহু পূর্বেকার ঘটনা, যাহা ইতিহাসরূপে অন্য লোকদের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছ গৃহীত হওয়ার জন্য তাহার সনদে যেসব কড়াকড়ি আরোপ করা হয় তাহা ইতিহাসের বেলায় প্রয়োগ করিলে ইতিহাস ভান্ডার সম্পূর্ণ শূন্য হইয়া যাইবে; গ্রহণযোগ্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

সুধী সমাজ! ইতিহাস ভাণ্ডার তলাইয়া দেখুন, শতকরা ৫০ ভাগ সনদহীন বর্ণনাই তাহাতে পাইবেন, তাহাও ইতিহাসের আরবী গ্রন্থাবলীতে। অন্যান্য ভাষার ইতিহাস বই-পুস্তকে ত সনদের কোন বালাই-ই নাই। পূর্বাপর যেসব ইতিহাস গ্রন্থ গৃহীতরূপে প্রচলিত রহিয়াছে তাহার অধিকাংশ গন্থে এবং সীরাত গ্রন্থাবলীতে আলোচ্য বহীরা পাদ্রীর ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে। সুতরাং সনদের দুর্বলতার দোহাই দিয়া তাহা উপেক্ষা করা প্রতারণার শামিল হইবে। অধিকন্তু মোস্তফা চরিত পুস্তকে দুই-এক জন আলেমের ভিন্ন মত পোষণের উদ্ধৃতিও রহিয়াছে। এইরূপ সামান্য দ্বিমতের দরুন ইতিহাসের বর্ণনা উপেক্ষা করিলে কোন ঐতিহাসিক বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য মিলিবে না।

অসংখ্য ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণিত হওয়া এবং হাদীছ শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ ছয় ইমামের এক ইমাম তিরমিযী (রঃ) কর্তৃক গ্রহণীয় সাব্যস্ত হওয়া এই ঘটনার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সীরাত সঙ্কলনে কলিযুগের লিখক মরহুম মাওলানা শিবলী নোমানী এবং মরহুম মাওলানা আকরম খাঁর লেখায়ই এই ঘটনার প্রতি অস্বীকৃতি দেখা যায়, নতুবা পূর্বাপর সকলেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। খৃস্টান লেখকদের অযৌক্তিক পচা গল্পবাজির ভয়ে ঐতিহাসিক সত্য অস্বীকার করা চরম দুর্বলতার পরিচয়ই বটে।

মোস্তফা-চরিতে এই বর্ণনার আর একটি দুর্বল দিক দেখান হইয়াছে যে, ঘটনাটির বর্ণনায় আছে, বহিরা পাদ্রীর উপদেশ মতে হযরতের মক্কায় প্রত্যাবর্তনে আবু বকর (রাঃ) বেলালকে সঙ্গে দিলেন। এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে; ঐ সময় আবু বকরের বয়স ১০ বৎসর ছিল। কারণ আবু বকর (রাঃ) হযরতের দুই বৎসরের ছোট ছিলেন, আর ঐ সময় হযরতের বয়স ১২ বৎসর ছিল।

উত্তর এই যে, এরূপ কোন প্রমাণ নাই যে, আবু বকর ঐ সফরে ছিলেন না। তাঁহার থাকা অসম্ভব নহে। নবী (সঃ) যদি ১২

ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি, ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব শান্তির দীপ্ত সূর্যের উদয়াভাসে এই শ্রেণীর রশ্মির বিকাশ অতি স্বাভাবিকই ছিল।

দেশের বরেণ্যরূপে হযরতের খেতাব লাভ

ইতিমধ্যেই হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতিভার খ্যাতি সমগ্র মক্কায় ছড়াইয়া পড়িল। সকলের দৃষ্টিতেই তিনি অতুলনীয়রূপে দেখা যাইতে লাগিলেন। মানব-সেবা, মানব-প্রেম, নিঃস্বার্থ মঙ্গল কামনা, সত্যিকার কল্যাণ প্রচেষ্টা এবং সততা ও বিশ্বস্ততা তাঁহার ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর মাধুর্যে সমগ্র দেশ ও জাতির দৃষ্টি তাঁহার প্রতি দিনে দিনে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ফলে কাহারও প্রস্তাব-প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে স্বতঃস্ফূর্তরূপে সকলের মুখে তাঁহার জন্য এমন একটি খেতাব বা উপাধি আবিষ্কৃত হইল যাহা মহৎ গুণাবলীর চরম উৎকর্ষের প্রতীক। সারা দেশ তাঁহাকে 'আল-আমীন' আখ্যায় ভূষিত করিল। আরবী ভাষায় এই শব্দটি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মানবীয় মহত্ত্বের অসংখ্য উপাদান এই অক্ষর কয়টির মধ্যে পরিবেষ্টিত। শান্তিপ্রিয়, সম্প্রীতির আধার, চরম সত্যবাদী ও পরম বিশ্বস্ত– এইসব মাহাত্মের আকরকে আরবী ভাষায় বলা হয়, 'আমীন' এবং তাহারই সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্যধারীকে বলা হয় 'আল-আমীন'। গুণ-মাধুর্যের কত উচ্চ মূল্য জাতির পক্ষ হইতে নবী (সঃ) পাইলেন? 'আল-আমীন' উপাধি তাঁহার পরিচয়ের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইল; নামের পরিবর্তে সকলে তাঁহাকে 'আল-আমীন' বলিয়া ডাকিত। অন্ধকার যুগ, অন্ধকার দেশ, অন্ধকার পরিবেশ– এই দুর্ধর্ষ জাতির চিত্তে এতখানি স্থান লাভ করা তখকার দিনে সহজসাধ্য ছিল কি? কিরূপ চারিত্রিক মাধুর্য এবং সততা গুণের সুষমা ও মানব সেবার অকৃত্রিম প্রেরণা থাকিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার জন্য আল্লাহর দেওয়া সাধারণ গুণের প্রভাবেই এত বড় গৌরব অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হযরতকে শিক্ষা ও ট্রেনিং দান

শৈশবকালই মানুষের শিক্ষার সময়, কিন্তু নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর দেশ যুগ অন্ধকার দেশ ও যুগ; সেই পরিবেশে পিতা-মাতাহীন নবীজীর শিক্ষার ব্যবস্থা না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সেই জন্য কি তিনি শিক্ষাহীন ছিলেন, তাঁহার শিক্ষার কি কোন ব্যবস্থাই হয় নাই? 'উম্মী নবী'-র কি অর্থ ইহাই যে, তিনি নিরক্ষর

বৎসর বয়সে ঐ সফরে থাকিতে পারেন তবে ১০ বৎসর বয়সের আবু বকরও থাকিতে পারেন। আর ইতিহাসে ইহাও প্রমাণিত যে, আবু বকর হযরতের বাল্যবন্ধু ছিলেন। আর একটি কথা বলা হইয়াছে যে, বেলাল ঐ সময় তথায় থাকিতেই পারেন না। কিন্তু এই সম্পর্কেও দুইটি বক্তব্যের অবকাশ রহিয়াছে– (১) কাহারও মতে বেলাল আবু বকরের সমবয়স্ক ছিলেন– (যোরকানী, ১–১৯৬)। সুতরাং আবু বকরের শুধু সঙ্গী হিসাবে বেলালের তথায় থাকা অসম্ভব নহে। (২) এই বেলাল প্রসিদ্ধ বেলাল হাবশী (রাঃ) না বেলাল নামের অন্য কোন ব্যক্তি তাহা নির্ধারণেরও কোন প্রমাণ নাই। (কাওকাবুদ্দুরি ২–৩১২) বেলাল হাবশী (রাঃ) ভিন্ন অন্য কেহ হইলে কোন প্রশ্নই থাকে না।

সারকথা, এইসব ছুতানাতা দুর্বল অজুহাত খণ্ডন করা সহজ, অতএব তাহার দরুন ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না। ইহাছাড়া আরও কয়েকটি ছুতা উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা শুধু বাহুল্যই বটে। যেমন– বর্ণনায় উল্লেখ আছে, বহিরা পাদ্রী নবীজীর পরিচয় লাভ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আগমনে এতদঞ্চলের সমুদয় পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা সেজদারত হইয়াছিল। মরহুম খাঁ সাহেব এই বিবরণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, "ঐ অঞ্চলের পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা উল্টিয়া পড়িল– আবু তালেব বা দুনিয়ার আর একটি প্রাণীও তাহা দেখিল না; তাহা দেখিলেন বহু দূরে অবস্থিত বহিরা পাদ্রী তাঁহার মাঠের কোণে বসিয়া– ইহা অপেক্ষা আজগবী কথা আর কি হইতে পারে।" (পৃষ্ঠা–২৪৪)

প্রশ্নটির মূল হেতু খাঁ সাহেবের গর্ভেই জন্ম নিয়াছে। মূল ঘটনায় ত রহিয়াছে সেজদারত হইয়াছে; আর খাঁ সাহেব বুঝিয়াছেন, "হযরতকে সেজদা করার জন্য পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালাগুলি ভূপাতিত হইয়াছে।" মানুষের সেজদা এবং পাহাড় ইত্যাদির সেজদাকে খাঁ সাহেব এক আকারে বুঝিয়াছেন– এই বোকামির ফলেই ঐ প্রশ্ন জন্মিয়াছে। কোরআনে উল্লিখিত স্পষ্ট উদাহরণ লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন– . وان من شئ الا يسبح بحمده

"দুনিয়ায় যত জিনিসই আছে তাহার প্রত্যেকটিই আল্লাহর প্রশংসায় তাঁহার তসবীহ পাঠ করিয়া থাকে।"

খাঁ সাহেব শ্রেণীর লোকেরা বলিবেন, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বতের মুখ নাই, প্রশংসা ও তসবীহ কিরূপে করে?

অশিক্ষিত ছিলেন? কখনও নহে– ইহা 'উম্মী নবী' শব্দের ভুল ব্যাখ্যা। 'উম্ম' অর্থ মা; তাঁহার সহিত সম্পৃক্ত 'ইয়া–ী' সন্নিবেশিত হইয়াছে। অর্থাৎ মায়ের সম্পৃক্তি ও সান্নিধ্যে প্রকৃতির শিক্ষা যেভাবে মানুষ লাভ করে, যদিও তাহা সীমাবদ্ধ এবং অপর্যাপ্ত। কিন্তু তাহাও এক সুদীর্ঘ শিক্ষা হয়, সেই শিক্ষা কোন গুরু বা শিক্ষক, কিতাব বা বই-পুস্তক, শিক্ষাগার বা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে হয় না। তদ্রূপ নবীজী মোস্তফার অপরিসীম শিক্ষা ও পরিধিহীন জ্ঞানার্জন ঐসব মাধ্যম ব্যতিরেকে সকল জ্ঞানের আকর সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার সরাসরি ব্যবস্থাপনায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুপ্রশস্ত, সুগভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য সারা বিশ্ব বহন করে– এই অসাধারণ জ্ঞান তিনি জাগতিক গুরু ও শিক্ষক ব্যতিরেকে মায়ের নিকটে থাকাবস্থায় উপার্জিত প্রাকৃতিক জ্ঞানের ন্যায় জাগতিক ও বাহ্যিক মাধ্যম ব্যতিরেকে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'নবী উম্মী' বলা হয়।

আল্লাহ তাআলা পূর্ব হইতেই হযরত (সঃ)-কে হাতে-কলমে শিক্ষা ও ট্রেনিং দিয়া বিশেষ গুণে গুণান্বিত এবং বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ বানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিধাতা অতি যত্নের সহিত নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর পয়গম্বরী জীবনের গঠন কার্য চালাইয়াছেন। সূরা ওয়াযযোহার মধ্যে এই শ্রেণীর কতিপয় বিষয়ের উল্লেখও রহিয়াছে। যথা– (১) আল্লাহ তাআলা হযরত (সঃ)-কে প্রথম হইতে পিতা-মাতাহীন এতীম বানাইয়াছিলেন, যেন তিনি প্রত্যক্ষরূপে এতীম নিরাশ্রয়ের দুঃখ-দরদ বুঝিতে সক্ষম হন এবং তাহাদের মন রক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাহাই আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন– اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى

"আল্লাহ আপনাকে প্রথমে এতীম বানাইয়া পরে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন।

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَاتَقْهَرْ" সুতরাং আপনি এতীমকে ধমক দিয়া কথা বলিবেন না– তাহার প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিবেন না।

(২) আল্লাহ তাআলা প্রথমে হযরত (সঃ)-কে কপর্দকশূন্য, রিক্তহস্ত ও দরিদ্র বানাইয়াছিলেন, যেন তিনি দরিদ্রের দুঃখ-দরদ প্রত্যক্ষরূপে অনুধাবন করিতে সক্ষম হন এবং সেই দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি উদারতার ব্যবহার করিতে ত্রুটি না করেন। তাই আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاَغْنٰى আল্লাহ আপনাকে প্রথমে রিক্তহস্ত দরিদ্র বানাইয়া পরে সচ্ছলতার ব্যবস্থা দান করিয়াছেন। وَاَمَّ السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ সুতরাং আপনি দারিদ্র্যের আঘাতে যাঞ্ছায় লিপ্ত মানুষকে ধিক্কার দিবেন না।"

আরও শুনুন– ولله يسجد ما فى السموت وما فى الارض

"আল্লাহর জন্য সেজদা করিয়া থাকে যাহা কিছু আসমানসমূহে এবং ভূপৃষ্ঠে আছে।" (পারা–১৪ রুকু–১২)

হে খাঁ সাহেব শ্রেণীর লোকগণ! পারা–১৭, রুকু–৯ -এ আরও একটি আয়াত শুনুন–

الم تر ان الله يسجد له من فى السموات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب .

"তুমি কি দেখ না! আল্লাহর জন্য সেজদা করে যাহারা আসমানসমূহে আছে এবং যাহারা ভূপৃষ্ঠে আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ও বিভিন্ন প্রাণী।"

চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্ররাজি, পবর্তমালা, বৃক্ষরাজি এবং প্রাণীসমূহকে ত সেজদার জন্য ভূপাতিত হইতে দেখা যায় না, সেই জন্য কি কোরআনও অস্বীকার করিতে হইবে?

পাঠক! সেজদা করা একটি ক্রিয়াপদ, তাহার আকার-আকৃতি সাব্যস্ত হইবে তাহার কর্তা পদের সামঞ্জস্যে; ঘোড়াকে গাধার সহিত জুড়িলে ত খচ্চর পয়দা হইবেই।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালার সেজদারত হওয়ার বর্ণনা যেখানে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে ছিল, সেখানে ঐ সেজদার কোন আকার নিদর্শন নিশ্চয় বর্ণিত ছিল। সেই কিতাবের অভিজ্ঞ আলেম তৎকালীন খাঁটি দ্বীনদার বহিরা পাদ্রী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আবু তালেব এবং অন্যান্যরা ত সেই কিতাবের আলেম-বিদ্বান ছিলেন না, তাঁহারা তাহা কিরূপে দেখিবেন?

(৩) আল্লাহ তাআলা হযরতকে প্রথমে শিক্ষা-দীক্ষায় নিঃসম্বল বানাইয়া পরে নিজ ব্যবস্থাপনায় পরিপক্ব জ্ঞানভাণ্ডার দান করিয়াছিলেন, জ্ঞানের আকর বানাইয়াছিলেন যেমন পবিত্র কোরআনে অনত্র আছে–

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَاالْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا ـ

"কোরআন কি জিনিস, ঈমান কি জিনিস তাহা পূর্বে আপনি কিছুই জাতিতেন না; হাঁ, পরে আমি আপনাকে কোরআন দান করিয়াছি এবং আমি তাহাকে নূর বা আলোর রূপ দিয়াছি।" (আপনাকে সকল জ্ঞানের আকর ও আলো কোরআন দান করিয়া পরিপ জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী করিয়াছি)

আল্লাহ তাআলা হযরত (সঃ)-কে প্রথমে শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিঃসম্বল বানাইয়াছিলেন যেন তিনি শিক্ষা-দীক্ষাহীন পথহারা মানবের অভাবটা প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং সেই অনুপাতে তাহাদের অভাব মোচনে সচেষ্ট হন।

সূরা ওয়াযযোহার মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাহাই বলিতেছেন–

وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدٰى আল্লাহ আপনাকে প্রথমে এইরূপে বানাইয়াছিলেন যে, আপনি কিছু জানিতেন না, পরে আপনাকে (পরিপক্ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের) পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।" وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ- সুতরাং (বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের) যেসব অমূল্য নেয়ামতসমূহ আপনাকে আপনার প্রভু দান করিয়াছেন তাহা অযাচিতভাবে সকলের মধ্যে ব্যক্ত করতঃ বিতরণ করুন।

এই ট্রেনিং দান প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত হাদীছের মর্ম এবং সেই সূত্রেই হযরত নবীজী (সঃ) বিশেষরূপে এই হাদীছের বিষয়বস্তু সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছেন। (হাদীছ- ১৬৬৫)

اخبرنى جابربن عبد الله رضى الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِى الْكِبَاثَ فَقَالَ بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ فَاِنَّهُ اَطْيَبُ فَقِيْلَ اَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ اِلاَّ رَعَاهَا ـ

অর্থ ঃ বিশিষ্ট ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা "মাররুজ্‌জাহ্‌রান" নামক স্থানে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তথায় আমরা "পীলু" নামক (এক প্রকার জংলী) গাছের গোটা চয়ন করিতেছিলাম। হযরত (সঃ) আমাদিগকে বলিলেন, যেগুলি (পাকিয়া) কাল হইয়া গিয়াছে ঐগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিও; ঐগুলি অধিক সুস্বাদু।

তখন এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ছাগলের রাখালী করিয়াছেন? হযরত (সঃ) উত্তর করিলেন, হাঁ– কোন নবী এই রকম হন নাই যিনি ছাগলের রাখালী না করিয়াছেন।

ব্যাখ্যাঃ "পীলু" গাছ শহরে-বন্দরে হয় না, তাহা সাধারণত বস্তিবিহীন এলাকায় আগাছার ন্যায় জন্মিয়া থাকে। তাহার গোটা বা ফল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা একমাত্র রাখাল শ্রেণীর লোকদেরই হইতে পারে, যাহারা ঐ ধরনের এলাকায় পশুপাল লইয়া ঘুরাফিরা করিয়া থাকে। হযরত (সঃ) শহরবাসী ছিলেন, কিন্তু পীলু গাছের ফল সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা দৃষ্টেই প্রশ্নকারী হযরত (সঃ)-কে ছাগলের রাখালী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। কারণ, আরব দেশে উট এবং ছাগল বা মেষ শ্রেণীর পশুপালই অধিক, কিন্তু উট অতিশয় শক্তিশালী বড় জানোয়ার হওয়ায় তাহার জন্য রাখালের আবশ্যক হয় না এবং সাধারণত তাহার রাখাল সব সময় রাখাও হয় না।

প্রশ্নকারীর উত্তরে হযরত (সঃ) নিজের সম্পর্কে ত 'হাঁ' বলিলেন; তদুপরি ইহাও বলিলেন যে, প্রত্যেক

নবীর দ্বারাই ছাগলের রাখালী করান হইয়াছে। হযরত মূসা (আঃ) দীর্ঘ দশ বৎসরকাল এই রাখালী করিয়াছিলেন, যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) রাখালীর কাজ কিছুদিন ত কচি বয়সে করিয়াছেন; যখন তিনি দুধ-মা বিবি হালিমার গৃহে ছিলেন। এতদ্ভিন্ন মক্কায় থাকিয়াও কোন কোন মক্কাবাসীর ছাগলের রাখালী করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য একটু বয়স্ক অবস্থায় হইয়াছিল, কারণ ইহা তিনি আজুরার বিনিময়ে করিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৬৬৬। হাদীছঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا راعى غنم فقال اصحابه وانت فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة.

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা যত নবীই পাঠাইয়াছেন প্রত্যেক নবীকেই ছাগলের রাখালী করিতে হইয়াছিল। এতদ শ্রবণে ছাহাবীগণ হযরত (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিও কি রাখালী করিয়াছেন? হযরত (সঃ) বলিলেন, হাঁ- আমি কোন কোন মক্কাবাসীর ছাগল চরাইয়া থাকিতাম কয়েক 'কীরাত' (অতি কম মূল্যমানের মুদ্রা)-এর বিনিময়ে।

ব্যাখ্যা ঃ রাখালী জীবনের সহিত পয়গম্বরী জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রথমতঃ স্বচ্ছ ধ্যান, গভীর চিন্তা ও নির্মল তপস্যার নীরব সুযোগ লাভ হয় এই জীবনে। অন্তর- সমুদ্রে ভাবের ঢেউ সৃষ্টির জন্য এই জীবনের এই পরিবেশের মুক্ত বাতাস এক বিশেষ অবলম্বন। উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ, নীচে শ্যামল ভূপৃষ্ঠ বা মরূদ্যান, চতুষ্পার্শ্বে পর্বতমালা বা সবুজ গাছ, সঙ্গী আছে সর্বপ্রকার সৃষ্টি-রহস্যের বাহক পশুপাল। কি দৃশ্য! কি মনোহর! ভাবুকের জন্য ভাব সৃষ্টির সব উপাদানই একত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার চোখের সামনে। এই পরিবেশের সুযোগের প্রতিই ইঙ্গিত দিয়াছেন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে-

اَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.

অর্থ ঃ "লক্ষ্য কর না কেন উটগুলির সৃষ্টি নৈপুণ্যের প্রতি, ঊর্ধ্ব আকাশের ধারণ কৌশলের প্রতি, পর্বতমালার গ্রথন বিধির প্রতি, ভূপৃষ্ঠের সুসমতল বিন্যাসের প্রতি?" প্রকৃতির এই নিবিড় নীরব প্রশান্তি ভাবুকের জন্য কতই না উপভোগ্য।

রাখাল এই মানচিত্রে মনোনিবেশ করিলে সে সৃষ্টিকর্তার মারেফাতের বিরাট ভূমিকায় পৌঁছাইতে সক্ষম হইবে। এই রাখালী জীবনে যদি পদার্পণ করেন কোন নবী, তবে তিনি যে এই বিশাল প্রান্তর হইতে কত হীরা-মাণিক্য আহরণ করিতে সক্ষম হইবেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

রাখালী জীবনের সহিত পয়গম্বরী জীবনের আরও গভীর সম্বন্ধ এই যে, একজন রাখালের কর্তব্য এই বিষয়গুলির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা- পশুপাল বিপথগামী না হয়, অপরের শস্যক্ষেত্র নষ্ট না করে, কোনটা হারাইয়া না যায়, কোনটাকে বাঘে না ধরিতে পারে; অথচ প্রতিটি পশু উপযুক্ত আহার পাইয়া সন্ধ্যায় প্রভুর গৃহে নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসে। এই কর্তব্যের সহিত পয়গম্বরী জীবনের কত নিকটতম সম্বন্ধ! পয়গম্বর গোটা একটা জাতির পরিচালক। রাখাল পশুচালক, আর পয়গম্বর মানুষ চালক; আল্লাহর বান্দাদেরকে সুপথে চালনা করা এবং কুপ্রবৃত্তি, কুপরিবেশ ও শয়তানের আক্রমণ হইতে হেফাযত করতঃ ইহ-পরকালের খোরাক জোগাইয়া সকলকে প্রভুর দ্বারে পৌঁছাইয়া দেওয়াই পয়গম্বরের কর্তব্য। এই কর্তব্যের দায়িত্ব বহন বাস্তবরূপে উপলব্ধি করিবার এবং তাহার কর্মগত অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশেই পয়গম্বরগণের জন্য রাখালীর অনুশীলন।

রাখালীর অনুশীলনের মধ্যে ছাগল চরানোর অধ্যায় পয়গাম্বরী জীবনের প্রয়োজন পূরণের পক্ষে নিকটতম সহায়ক। কারণ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণ অপরিসীমভাবে নবীর মধ্যে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। বিভিন্ন খেয়াল, বিভিন্ন মেযাজ, বিভিন্ন অভ্যাস ও বিভিন্ন মতবাদের লোকদের সম্মুখীন হইতে হয় নবীকে, তাই তাঁহাকে বিনয়ী, বিনম্র, কোমল এবং সহিষ্ণু হইতে হইবে, ক্রোধের বান ডাকার ঘটনায়ও তাঁহাকে পর্বত সমতুল্য হইয়া ধীরস্থির থাকিতে হইবে।

ছাগলের রাখালী করার মধ্যে এই গুণগুলি বাস্তবরূপে হাসিল হইয়া থাকে। ছাগলের স্বভাব- হাঁটাইলে হাঁটিবে না, ধাক্কাইলে আগে বাড়িবে না, হেঁচড়াইলে শুইয়া পড়িবে। এমতাবস্থায় রাখালের ক্রোধের আগুন লেলিহান হইয়া উঠে, কিন্তু পিটাইলে চেঁচায় এবং লোকদের গালি শুনিতে হয়। অবশেষে তাহাকে রাখাল আপন কাঁধে চড়াইতে বাধ্য হয়। এই পর্যায়ে ধৈর্য-সহিষ্ণুতার যে অনুশীলন হইয়া থাকে, তাহার নজির কোথাও পাওয়া যাইবে কি? সুধীগণ বলিয়াছেন, কচি-কাঁচার শিক্ষকতা করিতে হইলে পূর্বে ছাগলের রাখালী করার ট্রেনিং দেওয়া অতিশয় লাভজনক হইয়া থাকে।

এই ট্রেনিংয়ের উদ্দেশেই প্রত্যেক নবীকে ছাগলের রাখালী করিতে হইয়াছে, এমনকি বিশ্বনবী সাইয়্যেদুল-মোরসালীন তাঁহার শান মর্যাদার সম্পূর্ণ অযোগ্য- অতি কম মূল্যমানের মাত্র কতিপয় মুদ্রার বিনিময়ে রাখালীর মজদুরীও করিয়াছেন। ট্রেনিং দানে যাইয়া মানুষ কত কিছু করিতে বাধ্য হয়!

সিরিয়া সফরে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

মক্কার এক ধনাঢ্য মহিলা "খাদীজা" তিনি লভ্যাংশ প্রদানের ভিত্তিতে লোকদের দ্বারা ব্যবসা চালাইয়া থাকিতেন। হযরতের বয়স তখন ২৪ বৎসর শেষ প্রায়। তখন একদা হযরতের চাচা আবু তালেব তাঁহাকে বলিলেন, এই বৎসর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সঙ্কটাপূর্ণ; সিরিয়ার বাণিজ্যের মৌসুম উপস্থিত হইয়াছে; বহু লোকই বিবি খাদীজার নিকট হইতে পুঁজি লইয়া সিরিয়ায় ব্যবসা করিতে যাইবে; তুমিও যদি সেই পন্থা অবলম্বন করিতে তবে ভাল হইত; তোমাকে সিরিয়ায় প্রেরণ করা যদিও আমার ইচ্ছার বিপরীত, কিন্তু উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষের দরুন অর্থনৈতিক চাপে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছি।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চাচাকে উত্তর দিলেন, হযরত খাদীজা নিজেই আমার নিকট এই ব্যাপারে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবে। তাই আমি স্বয়ং অগ্রসর না হইয়া অপেক্ষা করি। আবু তালেব বলিলেন, ভয় হয় যে, অন্য সকলকে দেওয়া হইয়া গেলে হয়ত তোমাকে দেওয়ার মত কিছু থাকিবে না।

অতপর হযরতের উল্লিখিত ধারণাই বাস্তবায়িত হইল। খাদীজা স্বয়ং হযরতের নিকট এই বলিয়া লোক পাঠাইলেন যে, আপনার সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও মহানুভবতা এবং চরিত্র মহিমা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে; আমি আপনাকে অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ পুঁজি এবং অধিক লভ্যাংশ প্রদান করিয়া ব্যবসায় নিয়োগ করিতে চাই। হযরত (সঃ) চাচাকে এই সংবাদ অবগত করিলেন। চাচা বলিলেন, এই অর্থনৈতিক সুযোগ আল্লাহ তাআলা তোমাকে বিশেষরূপে প্রদান করিয়াছেন।

অতপর হযরত (সঃ) সিরিয়া গমনের প্রস্তুতি নিলেন। বিবি খাদীজার বিশিষ্ট ক্রীতদাস মায়সারাও হযরতের সঙ্গে গেল। হযরত (সঃ) প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র বোসরায় পৌছিলেন। বোসরা শহরে একটি বৃক্ষের ছায়ায় তিনি বসিলেন। নিকটবর্তী স্থানেই "নাসতুরা" নামক বিশিষ্ট পাদ্রীর অবস্থান ছিল। তিনি হযরতকে ঐ বৃক্ষের ছায়ায় দেখিয়া তৎক্ষণাত হযরতের সঙ্গী মায়সারাকে ডাকিয়া নিলেন এবং বলিলেন, এই লোকটি পয়গম্বর হইবেন। অতপর পাদ্রী স্বয়ং হযরতের নিকট আসিয়া তাঁহার কদমবুসী করিলেন, হযরতের মোহ্‌রে নবুয়তের প্রতি লক্ষ্য করত চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি আল্লাহর রসূল হইবেন, যাঁহার সম্পর্কে হযরত ঈসা (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। ঐ পাদ্রী মায়সারার নিকট এই আক্ষেপও প্রকাশ করিলেন যে, কতই না সৌভাগ্য হইবে, যদি আমি তাঁহার আবির্ভাবকাল পাই।

ঐ বোসরা শহরেই আর একটি লোক– যাহার সঙ্গে হযরতের ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা হইয়াছিল, সেই লোকটিও মায়সারাকে জ্ঞাত করিয়াছিল যে, ইনি পয়গম্বর হইবেন, যাঁহার সম্পর্কে আসমানী কিতাবসমূহে উল্লেখ রহিয়াছে এবং পাদ্রিগণও তাহা অবগত আছেন।

এতদ্ভিন্ন মায়সারা এই সফরের মধ্যে সর্বদাই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রৌদ্রের মধ্যে চলাকালে দুই জন ফেরেশতা হযরতের মাথার উপর ছায়া করিয়া থাকিত।* এমনকি হযরত (সঃ) যখন এই সুদীর্ঘ সফর হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন দুপুর বেলা মক্কা নগরীতে পৌছিলেন। ঐ সময় বিবি খাদীজা স্বীয় বাসভবনের দ্বিতলের বারান্দা হইতে তাঁহাকে দেখিতেছিলেন, তখনও ঐ দুই ফেরেশতা হযরতের মাথার উপর ছায়া করিয়া ছিলেন এবং বিবি খাদীজা তাহা অবলোকন করিয়াছিলেন। যখন মায়সারা বিবি খাদীজার নিকট

উপস্থিত হইল তখন তিনি তাহাকে উক্ত ঘটনা বলিলেন। মায়সারা তাঁহাকে বলিলেন, আমি ত আগাগোড়া সম্পূর্ণ সফরেই এই অবস্থা বিরাজমান দেখিয়াছি। এতদ্ভিন্ন মায়সারা বোসরা শহরের পাদ্রীর এবং অপর লোকটির উপরোল্লিখিত ঘটনাও বিবি খাদীজার নিকট ব্যক্ত করিলেন।*

বিবি খাদীজার সহিত হযরতের শাদী মোবারক (পৃষ্ঠা– ৫৩৮)

কোরায়শ বংশেরই এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে 'খাদীজা' অতি সুপ্রসিদ্ধ রমণী ছিলেন। তিনি সারা মক্কায় সতীত্বে ও পাক-পবিত্রতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

এই মহিয়সী মহিলা পবিত্র জীবন যাপনে অতুলনীয় ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অন্তরের শুচিতা শুভ্রতায় এবং চরিত্রের পবিত্রতায় তিনি এতই সুনাম অর্জন করিয়া ছিলেন যে, লোকেরা তাঁহাকে খাদীজা না

---

* প্রাক ইসলাম যুগেও ফেরেশতা সম্পর্কে মানুষের ধারণা-বিশ্বাস ছিল। এমনকি মোশরেক পৌত্তলিক মক্কাবাসীদেরও ঐ বিশ্বাস ছিল। তাহারাও ফেরেশতাকে দেবদূত পবিত্রাত্মা ধারণা করিত। নবীজীর উপর ছায়াদানকারী বস্তু ত মেঘখণ্ডের আকৃতির ছিল, কিন্তু সৎ-সাধু ব্যক্তি নবীজীর উপর বোধমান প্রাণীর ন্যায় ছায়া দিয়া আসিতেছে দেখিয়া দর্শক মায়সারা উহাকে পবিত্রাত্মা ফেরেশতা গণ্য করিয়াছে এবং তাহা ব্যক্তও করিয়াছে।

* **সমালোচনা ঃ** মোস্তফা চরিত গ্রন্থের সঙ্কলক মরহুম আকরম খাঁ সাহেবের দুর্ভাগ্য– যখনই নবীগণ সম্পর্কে কোন অসাধারণ অস্বাভাবিক (অসম্ভব নয়) ঘটনার উল্লেখ আসিয়াছে তখনই তাঁহার পেটে ব্যথা সৃষ্টি হইয়াছে এবং উদরাময়গ্রস্তের ন্যায় বেসামালরূপে নানা পচা-গলা, মল-ময়লার উদ্গিরণ আরম্ভ করিয়াছেন। কতিপয় নমুনা পূর্বেও আলোচনা করা হইয়াছে– যেমন, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ১২ বৎসর বয়সে প্রথম বহির্দেশে গমন আলোচনায় এই বোসরা শহরেই পাদ্রীর ঘটনা বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য নাস্তুরা পাদ্রীর ঘটনায় এবং মায়সারার বর্ণনার ব্যাপারে ত খাঁ সাহেবের লেখনী পুরাদস্তুর কুৎসিত নর্দমার ন্যায় পূতি-গন্ধের উদগার করিয়াছে।

তিনি ক্ষেপিয়াছেন এই বলিয়া যে, "এই গল্পগুলির দ্বারা প্রকারতঃ ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বস্তুতঃ কোন প্রকৃতিগত মহিমা ও স্বাভাবিক গুণ-গরিমার জন্য বিবি খাদীজা (রাঃ) হযরতের অনুরাগিনী হন নাই। নাস্তুরার উক্তি, ইহুদীর উপদেশ বা ফেরেশতার ছায়া না হইলে এই অনুরাগ সৃষ্টির কোন কারণ ছিল না।" (পৃষ্ঠা–২৩৯) মনে হয় মস্তিষ্কের শুষ্কতার দরুন খাঁ সাহেবের কর্ণকুহরে এরূপ একটা প্রলাপ ধ্বনিত হইয়াছে যে, একমাত্র এইসব ঘটনায়ই বিবি খাদীজা হযরতের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ প্রলাপ ধ্বনি যে, তাঁহারই শুষ্ক মস্তিষ্কের জন্ম দেওয়া তাহা তিনি ঠাহর করিতে না পারিয়া পূর্বাপর সীরাত সঙ্কলকগণের প্রতি অযথা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। আলোচ্য ঘটনাবলী আরবী-উর্দু ভাষায় লিখিত সমস্ত সীরাত সঙ্কলনেই বিদ্যমান রহিয়াছে। বড় বড় ইমাম ও আলেমগণ সকলেই এইসব বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কেহ এইরূপ দাবী ত দূরের কথা ঘুর্ণক্ষরেও এইরূপ লেখেন নাই যে, হযরতের প্রতি বিবি খাদীজার অনুরক্তির কারণ একমাত্র এই ঘটনাবলী ছিল।

আমাদের ন্যায় সকলেই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রকৃতিগত মহিমা এবং উদীয়মান গুণ-গরিমাকে হযরতের প্রতি বিবি খাদীজার অনুরাগিণী হওয়ার মূল কারণ সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবশ্য মায়সারা কর্তৃক আলোচ্য ঘটনাবলীর বর্ণনা বিবি খাদীজাকে অধিক আকৃষ্ট করিয়াছে। নবীজীর প্রকৃতিগত মহিমা ও গুণ-গরিমা খাদীজার হৃদয়ে রেখা না কাটিলে হযরত খাদীজাও আকরম খাঁ মরহুমের ন্যায় মায়সারার বর্ণনাগুলিকে বাহুল্য বলিয়া উড়াইয়া দিতেন।

বিবি খাদীজা সারা মক্কায় বড় বড় লোকদের শত শত বিবাহ প্রস্তাব ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায় উপেক্ষা করিয়া চল্লিশ বৎসর বয়সে পঁচিশ বৎসর বয়স্ক নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চরণে যে অগাধ ধন-দৌলতসহ এইরূপে লুটাইয়া পড়িলেন– ইহা নিশ্চয় এক বিরাট বড় অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইহার পিছনে নিশ্চয় অন্য অস্বাভাবিক ঘটনাবলীও শক্তি যোগাইয়াছে।

ডাকিয়া 'তাহেরা' (সতী-সাধ্বী পবিত্রা) বলিয়া ডাকিত। (যোরকানী, ১)

প্রথমে একজনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয় এবং তিনি সেই স্বামীর ঔরসে দুই পুত্র জন্ম দান করেন। সেই প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য আর একজনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয় এবং তাহার ঔরসেও এক কন্যা জন্মদান করেন। এই দ্বিতীয় স্বামীরও মৃত্যু ঘটে; অতপর তিনি বৈধব্য জীবন যাপন করিতে থাকেন। তাঁহার অগাধ ধন-দৌলত ছিল। তাঁহার পবিত্রতা ও ধনাঢ্যতার দরুন অনেকেই তাঁহার পরিণয় লাভের অভিলাষী ছিল, কিন্তু তিনি কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। অবশ্য হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যদিও তখন নবী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি চরিত্রগুণের প্রসিদ্ধি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার অন্তরে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই আকর্ষণেই খাদীজা (রাঃ) নিজে প্রস্তাব দিয়া হযরত (সঃ)-কে টাকা প্রদানে বাণিজ্যে পাঠাইয়াছিলেন। বাণিজ্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হযরতের সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্তার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় অধিক মুগ্ধ হইলেন। তদুপরি হযরতের প্রত্যাবর্তন মুহূর্তে বিবি খাদীজার স্বচক্ষে অবলোকিত অলৌকিক ঘটনাদৃষ্টে তিনি আরও অভিভূত ছিলেন; তৎসঙ্গে তাঁহারই গোলাম মায়সারার সাক্ষ্য ও বিবৃতি বিবি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিল।

খাদীজা (রাঃ) দীপ্ত সূর্যের প্রভাতী আলোর ইঙ্গিতে হযরতের ভবিষ্যত অনুধাবন করিতে পারিলেন। এতদ্ব্যতীত খাদীজা (রাঃ)-এর এক দূর সম্পর্কীয় মুরুব্বী চাচা ছিলেন "ওয়ারাকা ইবনে নওফল"। তিনি খাঁটি খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী ও আসমানী কিতাব তওরাত ইঞ্জীলের পারদর্শী ছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাঁহার নিকট গমন করিয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন; নাসতুরা পাদ্রীর উক্তি এবং মায়সারার দেখা ও শুনা ঘটনাবলী এবং নিজের দেখা ঘটনা সবই বর্ণনা করিলেন। সকল বিবরণ শ্রবণান্তে ওয়ারাকা বলিলেন, হে খাদীজা! যদি এইসব ঘটিয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সঃ) এই যুগের নবী হইবেন; আমি আসমানী কিতাবের আলোকে এই নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রহিয়াছি; তাঁহার আবির্ভাবকাল নিকটবর্তী, আমরা তাঁহার প্রতীক্ষায় আছি। (সীরাতে মোস্তফা, ১-৮৩)

বিবি খাদীজার বয়স তখন চল্লিশের ঊর্ধ্বে। একে একে দুই বিবাহের পর তিনি বিধবা হইয়াছিলেন, তাঁহার কয়েকটি পুত্র-কন্যা জন্মিয়াছিল। এই অবেলায় তাঁহার অন্তর-তলে এক নূতন স্বপ্ন উঁকি দিল, এক নূতন ভাব জাগিয়া উঠিল। যে ভাবের প্রতি তিনি দীর্ঘ দিন হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, অনুরক্ত ছিলেন, ভুলেও এতদিন অন্তর তৎ প্রতি বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই– সেই স্বপ্ন সেই সাধ আজ তাঁহার অন্তরকে নূতন করিয়া দোলা দিল– কেন? নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর গুণ-গরিমা এবং তাঁহার অসাধারণ দীপ্ত ভবিষ্যতের কিরণমালায় সৃষ্ট আকর্ষণের দরুনই খাদীজা (রাঃ) এই অবেলায় তাঁহার জীবনতরী এক ভিন্ন স্রোতে ভাসাইতে উদ্যতই নহেন শুধু, বরং উদগ্রীব হইয়া পড়িলেন।

এই নূতন প্রেরণা খাদীজা (রাঃ)-কে এমন চঞ্চল করিয়া তুলিল যে, তাঁহার অন্তরকে যেন টানিয়া বাহিরে লইয়া ছুটিল। তিনি নিজকে নিজের মধ্যে সামলাইয়া রাখিতে পারিলেন না, উদিত ভাবকে নিজ অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন না। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চরণতলে আশ্রয় লাভের সন্ধানে পাগলপারা হইয়া পড়িলেন। এই ব্যতিব্যস্ততা ব্যাকুলতা তাঁহার চরম বুদ্ধিমত্তার এবং পরম সৌভাগ্যের পরিচায়কই ছিল– যাহা লাভে তিনি চির ধন্যও হইতে পারিয়াছিলেন।

নবীজী মোস্তফার (সঃ) সহিত বিবি খাদীজার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিল; নবীজীর পঞ্চম উর্ধ্বতন পিতার মধ্যে বিবি খাদীজার বংশ মিলিত। অতএব তাঁহার আবেগ প্রকাশে তিনি কিছুটা সাহস বোধ করিলেন। প্রথমে তিনি তাঁহার এক বিশেষ সহচরী, 'নাফিসা'কে নিয়োগ করিলেন নবীজীর মনোভাব আঁচ করার জন্য।* প্রতিকূলতার আশঙ্কা না দেখিয়া দ্বিগুণ সাহসে খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার বুক ভরিয়া উঠিল। এইবার তিনি নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট বিবাহের সুস্পষ্ট প্রস্তাব পাঠাইতে সাহস করিলেন।

* বিশ্বনবীর জীবনী লেখক একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নাফিসার ভূমিকাকে নাটকের ললিত ভাষায় নাটকীয় রসিকতার ভাব-ভঙ্গিতে যে সাজ গোজ দিয়াছেন আমরা উহা নবীজীর জীবনী আলোচনার কোন ইতিহাসে পাই নাই। ঐরূপ না লেখাই বাঞ্ছনীয়; লালিত্য ও রসিকতার মাধুর্য সুন্দর বটে; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নয়। নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর জীবনী বর্ণনায় অতিশয় সতর্কতা আবশ্যক।

খাদীজা (রাঃ) শুধু প্রভূত ধন-সম্পত্তির অধিকারিণীই ছিলেন না; ধন অপেক্ষা তাঁহার অন্তরের ঐশ্বর্য ছিল অনেক বেশী। তিনি পরিণত বয়স্কা বিধবা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে শান্ত শ্রী, স্বর্গীয় পবিত্রতা এবং আত্ম-সৌন্দর্যের গুণাবলী যাহা ছিল তাহা ত অন্ধকার যুগের সমাজ চোখেও লুক্কায়িত ছিল না; যদ্দরুন স্বতঃস্ফূর্তরূপে সমাজ তাঁহাকে 'তাহেরা' পবিত্রা বলিয়া সম্বোধন করিত। তাঁহার সেই গুণাবলী এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য মাধুরী কি নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর চোখে ধরা পড়ে নাই? নিশ্চয় ধরা পড়িয়া থাকিবে। কারণ নবীজী (সঃ) নিজে পবিত্র; তিনি পবিত্রতার মূল্য না দিয়া পারেন কি?

قدر گل بلبل بداند یا بداند شاه پری

قدر گوهر شاه بداند یا بداند جوهری

ফুলের সৌরভ ভালবাসে বুলবুলি আর রাজপরী
মণি-মুক্তার কদর করে রাজ-রাজড়া আর জওহরী

আল্লাহ তাআলাও বলিয়াছেন- اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ

"পবিত্র পুরুষদের জন্য পবিত্রা নারীগণ, পবিত্রা নারীদের জন্য পবিত্র পুরুষগণ (ইহাই স্বভাব, প্রকৃতি)।" (পারা-১৮ রুকু-৯) অতএব স্বভাব প্রকৃতির ধর্ম মতেই নবীজী (সঃ) খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার আবেগের প্রতি সাড়া দিতে বাধ্য ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন বিধাতার নির্ধারণেও নবী মোস্তফা (সঃ)-এর জন্য খাদীজা তাহেরার ন্যায় একজন পবিত্রা, পারদর্শী, অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণ শান্ত স্বভাব শান্তবুদ্ধিসম্পন্না জীবন সঙ্গীনীর প্রয়োজন ছিল; যিনি তাঁহার ঘরে -বাহিরে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করিবেন। নবীজী (সঃ)-এর সম্মুখ জীবনে নানা প্রয়োজন দেখা দিবে; বিভিন্নমুখী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সমাধান প্রদানের জন্য আবশ্যক বিরাট প্রতিভার। সে প্রতিভা খাদীজা (রাঃ)-এর মধ্যে কি পরিমাণের ছিল তাহা নবীজীর সহিত তাঁহার দাম্পত্য জীবনের পরম ও চরম সাফল্যই প্রমাণ করিবে। افتاب امد دليل افتاب "সূর্য নিজেই নিজের জন্য উজ্জ্বল প্রমাণ।"

কুদরতের খেলা- দেশে ও সমাজে সর্বত্র নবীজীর সদগুণরাজি এমনভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে যে, সারা মক্কায় 'আল-আমীন' (সৎ-সাধু বিশ্বস্ত) নাম হযরতের জন্য অন্য সব নামকে ঢাকিয়া ফেলে। অপর দিকে খাদীজা (রাঃ)ও তাঁহার অপরিসীম মহত্ত্বের প্রভাবে 'তাহেরা' (সতী-সাধ্বী) নামেই পরিচিতা হইয়া পড়েন। এই দুইটি নামের পরিবর্তন-রহস্য বাস্তবিকই এক অভূতপূর্ব ব্যাপাররূপে স্বর্গের মঙ্গলধারা প্রবাহের ইঙ্গিত বহন করিতেছিল। কুদরত যেন নিজ হস্তে জগত জননী সতী-সাধ্বী তাহেরা (রাঃ)-কে বিশ্বনবী আল-আমীনের জন্য সহধর্মিনীর যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রথম খণ্ড ৩ নং হাদীছের ঘটনায় জিব্রাঈল ফেরেশতার প্রথম সাক্ষাত এবং সর্বপ্রথম ওহীর অবতরণ চাপে নবীজী (সঃ) হেরা গুহা হইতে কাতর হইয়া গৃহে ফিরিলেন। ঐ সময় খাদীজা (রাঃ) সান্ত্বনা ও বুঝ প্রবোধ দানে তাঁহার কাতরতা লাঘবে যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চির বিদ্যমান থাকিবে। খাদীজা (রাঃ)-এর অসাধারণ প্রতিভার সুফল নবীজী (সঃ) খাদীজার সহিত দাম্পত্য জীবনে সর্বদাই উপভোগ করিয়াছেন। এই সুখ, এই শান্তি, এই মাধুরী খাদীজা (রাঃ)-এর সান্নিধ্যে নবীজী (সঃ) সর্বদাই লাভ করিতেন। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের দাম্পত্য জীবনে খাদীজা (রাঃ) নবীজীর (সঃ) সুখ-শান্তি যোগাইয়া চির ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাঁহার এই বিরাট সাফল্যের দ্বারাই নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর অন্তরে বিশেষ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উভয়ের পরম তৃপ্তি এবং চরম সন্তুষ্টির মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রীতির সহিত খাদীজা (রাঃ) নিজকে নবীজীর চরণে বিলাইয়া দিয়া তাহার মনকে এতই মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, খাদীজা (রাঃ) দুনিয়া হইতে বিদায়

নিয়াও নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর অন্তর হইতে বিদায় নিতে পারেন নাই। খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুতে হযরত (সঃ) গভীর মর্ম বেদনায় শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমনকি বিবি খাদীজার মৃত্যু বৎসরকে নবী (সঃ) 'আমুল হোয্‌ন'– শোকের বৎসর আখ্যা দিয়াছেন। খাদীজা (রাঃ) জীবিত থাকা পর্যন্ত নবীজী (সঃ) দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেন নাই। বিবি খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরও সকল স্ত্রীর ঊর্ধ্বে ছিল তাঁহার আসন; তাঁহার আসন কেহই দখল করিতে পারেন নাই।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরবর্তী জীবনের তরুণ বয়স্কা সর্বাধিক ভালবাসার স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) এই বিষয়ে ইঙ্গিতবহ একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

১৬৬৭। হাদীছ ঃ বিবি খাদীজার প্রতি আমি যেরূপ গায়রত (নিজকে তাঁহার সমকক্ষ না দেখায় আত্ম-যাতনা) অনুভব করিতাম' নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কোন স্ত্রীর প্রতি সেইরূপ অনুভব করিতাম না, অথচ আমি (খাদীজার সময় পাই নাই–) তাঁহাকে দেখিও নাই। কিন্তু নবী (সঃ) তাঁহার স্মরণ, তাঁহার আলোচনা অত্যধিক করিয়া থাকিতেন (আমার মন তাঁহার প্রতি ঐরূপ ছিল)।

নবী (সঃ) অনেক সময় বকরী জবাই করিতেন এবং সম্পূর্ণ গোশ্‌ত বণ্টন করিয়া খাদীজার বান্ধবীদের বাড়ী বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। কোন কোন সময় আমি কটাক্ষ করিয়া বলিতাম, মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ভিন্ন আর কোন মহিলা জন্মে নাই! উত্তরে নবী (সঃ) আবার খাদীজার প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিতেন– খাদীজা এরূপ ছিল, ঐরূপ ছিল; তাঁহার হইতে আমার সন্তান-সন্ততি ছিল। (পৃষ্ঠা–৫৩৯)

খাদীজা (রাঃ) নবীজীর সেবা কিরূপ অন্তরে করিতেন তাহা অন্তর্যামী আল্লাহই জানেন। তাই আল্লাহ তাআলা খাদীজা (রাঃ)-কে নবীজী (সঃ)-এর সেবা এক বিশেষ ভূমিকায় এমন এক সৌভাগ্য উপহার দিয়াছেন যাহা পয়গম্বর ভিন্ন কাহারও লাভ হয় নাই।

১৬৬৮। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) (নবী (সঃ) হইতে শ্রবণপূর্বক ঘটনা) বর্ণনা করিয়াছেন– একদা হঠাৎ জিব্রাঈল (আঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এখনই বিবি খাদীজা আপনার খাদ্য সামগ্রী পাত্রে করিয়া নিয়া আসিতেছেন। তিনি আসিয়া পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে তাঁহার প্রভু-পরওয়ারদেগারের সালাম বলিবেন এবং আমারও সালাম বলিবেন; আর তাঁহাকে বেহেশতের একটি বিশেষ (শান্তি-নিকেতন) মতি-মহলের সুসংবাদ দিবেন যেখানে শান্তি ভঙ্গকারী কোন শব্দও হইবে না, কোন বিষন্নতাও থাকিবে না। (পৃষ্ঠা–৫৩৯)

খাদীজা (রাঃ) গুণ-গরিমা ও মহত্ত্বের এত উচ্চ শিখার জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহার নিকটবর্তী হওয়াও জগতের অন্য কোন মহিলার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

১৬৬৯। হাদীছ ঃ আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি– বনী-ইসরাঈলের মধ্যে সর্বোত্তম মহিলা ছিলেন মারইয়াম। আর আসমান-যমীনের মধ্যে সর্বোত্তম মহিলা খাদীজা। (৫৩৮– পৃষ্ঠা)

মহীয়সী মহিলা বিবি খাদীজার মহত্ত্ব নবীজীর চরণ ছায়ায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মূলের অধিকারিণী তিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়ই ছিলেন এবং উহার উন্নতির যোগ্য পাত্রীও তিনি ছিলেন। অন্ধকার যুগে তাঁহার ন্যায় পবিত্রা মহীয়সীকে ধুলার ধরণীতে বেহেশতী সওগাত বলিলে অত্যুক্তি হইত না। মক্কার গণ্যমান্য বড় বড় সর্দার কত জনেরই না আকাঙ্ক্ষা ছিল বিবি খাদীজার প্রতি, অথচ তিনি আবার বিবাহ হইতে এতই নির্লিপ্ত ছিলেন যে, সেইরূপ প্রস্তাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। কিন্ত সৌভাগ্য তাঁহাকে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি আকৃষ্ট করিল এবং তাঁহার মহত্ত্ব তাঁহার প্রস্তাবের প্রতি নবীজী (সঃ)-কে আহ্বান করিল। যেরূপ–

"জওহরী জওহর চিনে, ভোমরায় চিনে মধু
ভোমরা কি বসে কভু রং দেখিয়া শুধু?"

নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর আদর্শ ও সুন্নত হইবে সংসারী জীবন। ইসলাম স্বভাব ধর্ম। সুষ্ঠু ও পবিত্র স্বভাবে যাহা আছে ইসলামেও তাহাও আছে। নর-মাদী মিশ্রিত জীবন যাপনই জীবনের স্বভাব। "মানুষ" আরবী "মানুস" শব্দের ভাষান্তর, যাহার ধাতুগত অর্থ প্রেম ও ভালবাসার মিলন শান্তির প্রত্যাশী। অতএব নর-নারীর মিলিত জীবনই মানুষের স্বভাব। এই মিলনের পবিত্রতা সংরক্ষণই করা হয় বিবাহের মাধ্যমে। তাই নবী (সঃ) বলিয়াছেন–

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِى فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى -

অর্থ ঃ "বিবাহ আমার আদর্শ, যেব্যক্তি আমার আদর্শ হইতে বিরাগী হইবে সে আমার জামাতভুক্ত পরিগণিত নহে।"

নবী (সঃ) আরও বলিয়াছেন لاسياحة فى الاسلام "সন্যাস জীবন ইসলামের আদর্শ ও নীতি নহে।" বিশ্ববাসীর জন্য যে আদর্শ ভাবী জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইবেন নবীজী (সঃ), আজ তিনি স্বীয় জীবনে তাহা বাস্তবায়নে অগ্রসর হইলেন।

নবীজী (সঃ)-এর সহিত খাদীজা (রাঃ)-এর সহচরী নাফিসার আলোচনা আশাব্যঞ্জক পাওয়া মাত্র খাদীজা (রাঃ) স্বয়ং বিবাহের প্রস্তাব দিয়া নবীজীর (সঃ) খেদমতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। খাদীজা (রাঃ)-এর আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাইয়া নবীজী (সঃ) স্বীয় মুরুব্বী চাচাগণের নিকট তাহা পাঠাইয়া দিলেন। সকলেই আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন এবং বিবাহের তারিখ নির্ধারিত হইয়া গেল। নির্ধারিত তারিখে হযরতের চাচা আবু তালেব এবং হামযাসহ আরও কোরায়শ বংশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বর যাত্রায় যোগদান করিলেন। বিবি খাদীজা (রাঃ)-এর পক্ষে তাঁহার পিতা; কাহারও মতে পিতা তখন জীবিত ছিলেন না, তাই তাঁহার অভিভাবক চাচা আমর ইবনে আসাদ এবং দূর সম্পর্কীয় চাচা বিশিষ্ট সৎ সাধু ওয়ারাকা ইবনে নওফল বিবাহ সম্পাদনে উপস্থিত ছিলেন।

বিবাহ মজলিসে খাজা আবু তালেব হযরতের পক্ষে অভিভাষণ বা খোতবা পাঠে বলিলেন, প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদিগকে ইব্রাহীমের কুলে ইসমাঈলের বংশে জন্ম দিয়াছেন। আমাদের তাঁহার ঘরের সেবক এবং জনসাধারণের নেতা– নায়করূপে মনোনীত করিয়াছেন। অতপর আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ তনয় মুহাম্মদ সমগ্র কোরায়শ গোত্রে জ্ঞানে গুণে অতুলনীয়; সকলেই মুহাম্মদের নিকট হার মানিতে বাধ্য; যদিও ধন তাহার কম। কিন্তু ধন ক্ষণস্থায়ী ছায়া এবং হাত-বদলের সাময়িক বস্তু মাত্র। মুহাম্মদের আত্মীয়-স্বজনের গৌরব সর্ববিদিত। মুহাম্মদ খোওয়ায়লেদ তনয়া খাদীজার বিবাহ পয়গাম বরণ করিয়াছেন। নগদ ও দেন-মহরানার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিলাম।" (যোরকানী, ১–২০২) "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।"

বিবি খাদীজার পক্ষে তাঁহার আত্মীয় বিশিষ্ট আলেম সৎ-সাধু ওয়ারাকা ইবনে নওফল অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসার পর কোরায়শ গোত্রের গৌরব এবং আবু তালেব বংশের (বনী হাশেম) প্রাধান্যের স্বীকৃতি উল্লেখপূর্বক বলিলেন, আমরা আপনাদের সহিত মিলন লাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি এবং তাহাতে আনন্দ বোধ করি। সকলে সাক্ষী থাকুন– খোওয়ায়লেদ তনয়া খাদীজাকে আবদুল্লাহ তনয় মুহাম্মদের বিবাহে প্রদান করিলাম। ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, রাযিয়াল্লাহু আনহা।

মহরানা চারি শত দেরহাম পরিমাণ স্বর্ণ ছিল। এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। নবীজী (সঃ)-এর বয়স তখন পঁচিশ বৎসর ছিল; আরও বিভিন্ন মতামত আছে। বিবি খাদীজা (রাঃ)-এর বয়স ছিল চল্লিশ; এ সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে। ইহা নবীজী (সঃ)-এর প্রথম বিবাহ এবং খাদীজা (রাঃ)-এর তৃতীয় বিবাহ ছিল। বিবি খাদীজার প্রথম বিবাহ আবু হালাহ নামক ব্যক্তির সহিত হইয়াছিল, সেই পক্ষে তাঁহার দুই ছেলে ছিল– "হিন্দ" এবং "হালাহ", তাঁহারা উভয়ই ইসলাম গ্রহণপূর্বক ছাহাবী হইয়াছিলেন। একবার "হালাহ" নবী

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসিলেন, নবী (সঃ) তখন নিদ্রিত ছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া "হালাহকে" বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। খাদীজা (রাঃ)-এর প্রথম স্বামী আবু হালার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ হইয়াছিল "আতীক" নামক ব্যক্তির সহিত। এই পক্ষে তাঁহার এক কন্যা ছিল, নাম "হিন্দ", তিনিও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (যোরকানী- ১-২০০)

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এবং খাদীজা (রাঃ)-এর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। কি অপূর্ব শাদী ছিল ইহা! যাঁহার গুণ-গরিমার তুলনা নাই, সুখ্যাতি সুনাম এবং গৌরব যশের অভাব নাই- ইচ্ছা করিলে তিনি অনায়াসেই কোন কুমারী তরুণীকে বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু যৌবনের স্বভাব ধর্ম সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এই তরুণ যুবক বিবাহ করিলেন চল্লিশ বৎসর বয়স্কা, বহু দিনের যৌবনহারা দুই বারের বিধবা এক মহিলাকে। কারণ, দেহের ক্ষুধা, যৌবনের স্বপ্ন বিলাস, কামরিপু চরিতার্থের জন্য তদ্রূপ কোন লালসা বা মোহবশেও এই বিবাহ ছিল না। ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ হইল- মোস্তফা (সঃ) ও তাহেরার (রাঃ) সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের পরিচ্ছন্ন মধুর জীবন যাপন। এক দিনের জন্য নহে, এক মাস বা এক বৎসরের জন্য নহে- দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকার এই জীবনসঙ্গিনীর সহিত হাসিমুখে অনাবিল অন্তরের প্রীতি ভালবাসায় কাল কাটাইয়াছেন নবীজী মোস্তফা (সঃ)। খাদীজা (রাঃ) জীবিত থাকা পর্যন্ত নবীজী (সঃ) অন্য বিবাহের চিন্তাও কোন দিন করেন নাই। পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ তথা যৌবনের প্রারম্ভ হইতে বার্ধক্যের সূচনা পর্যন্ত গোটা জীবনই নবীজী (সঃ) অতিবাহিত করিয়াছেন এই স্ত্রীর সহিত।* এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে এক দিনের তরেও বিরাগী হন নাই, বিরক্ত হন নাই। নবীজী (সঃ) খাদীজা (রাঃ)-এর প্রতি কোন অভাব অপূরণের অভিযোগ আনেন নাই, অনুযোগ করেন নাই কোন দিন। এই পরম তৃপ্তি ও চরম সন্তুষ্টির দাম্পত্য জীবন কি সম্ভব হইত যদি স্বার্থসিদ্ধির মানসে বা হীন উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে এই বিবাহ হইত? গভীর ভালবাসা ও অকৃত্রিম প্রীতির বন্ধনে সমভাবে আবদ্ধরূপে কাটিয়াছে উভয়ের দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর। বরং খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুতে দৈহিক বিচ্ছিন্নতার পরেও ছিন্ন হয় নাই নবীজী (সঃ)-এর হৃদয়ের বন্ধন। খাদীজার স্মরণে নবীজী (সঃ) কত সৌহার্দ্য দেখাইয়াছেন খাদীজার বান্ধবীদের প্রতি! খাদীজার ভগ্নীর কণ্ঠস্বরে শিহরিয়া উঠিয়াছেন নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খাদীজার কণ্ঠস্বর স্মরণে।

২৬৭০। হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মৃত্যুর বহু দিনের পরের ঘটনা-) একদা বিবি খাদীজার ভগ্নী হালাহ বিনতে

খোয়াওয়ায়লেদ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গৃহদ্বারে আসিয়া প্রবেশের অনুমতি প্রার্থী হইলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণে হযরত (সঃ) বিবি খাদীজার কণ্ঠস্বর স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, আয় আল্লাহ! ইহা যেন হালাহর কণ্ঠস্বর হয় (যাহা আমি ভাবিয়াছি)।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই অবস্থাদৃষ্টে আমার মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হইল! আমি বলিলাম, আপনি এক দাঁত-পড়া বুড়ীকে কি স্মরণ করিয়া থাকেন? কোন্ যমানায় মরিয়া গিয়াছে! অথচ তাহার অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী আল্লাহ তাআলা আপনাকে দান করিয়াছেন। হযরত (সঃ) আমার প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হইলন; যাহাতে আমি এ বলিতে বাধ্য হইলাম যে খোদা আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, আর কোন সময় আমি বিবি খাদীজার সমালোচনা করিব না। (পৃষ্ঠা-৫৩৯)

বিবি খাদীজার কত উচ্চ আসন ছিল নবীজীর অন্তরে, কিরূপ আবিষ্ট ছিল নবীজীর অন্তর তাঁহার প্রতি! ক্ষণস্থায়ী লালসায় হৃদয়ের এরূপ চির বন্ধন কি সৃষ্টি হইতে পারে?

---

* পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর নবীজী (সঃ) অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই বহু বিবাহকে মূলধন বানাইয়া নবীজীর গ্লানি ব্যবসায়ীরা তাহাদের ব্যবসা গরম করিতে প্রয়াস পায়। এই শ্রেণীর পিশাচমনা লোকদের লক্ষ্য করা উচিত, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যৌবন-জীবনের প্রতি। বহু বিবাহের যে তাৎপর্য তাহারা দেখাইতে চায় তাহা কি মানুষের বার্ধক্যকালে দেখা দেয় না যৌবনকালে। নবীজী (সঃ) সারা যৌবনকাল যেরূপ স্ত্রীর দাম্পত্যে যেভাবে কাটাইয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিলে কোন সুধী সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ বিভ্রান্ত হইতে পারে কি?

নবীজীর (সঃ) বিবাহ ছিল এই উদ্দেশে যে, তিনি তাঁহার আসল উদ্দেশ্য সাধনে মিশিয়া যাইবেন মাটির মানুষের সহিত। স্বাভাবিক অধিবাসী হইবেন মাটির জগতে এবং প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাঁহার সুন্নতী জীবনের আদর্শ ও নীতি। পাত্রী নির্বাচনে মানুষ সাধারণতঃ বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য ও স্থূল লাবণ্যের পিয়াসী হয়, কিন্তু নবীজী (সঃ) ছিলেন গুণের সৌন্দর্য ও দেহের অন্তরালে লুক্কায়িত সুষমা পিয়াসী। এই সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ ছিলেন খাদীজা তাহেরা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। তাই তিনি নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নির্বাচন লাভে চির ধন্য চির সৌভাগ্যবতী হইতে পারিয়াছিলেন।

খাদীজা (রাঃ) তাহার সমুদয় ধন-সম্পদ হযরতের অধিকারে দিয়া দিলেন। হযরতের জন্য এই সচ্ছলতার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলারই বিশেষ দান ও রহমত ছিল। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা এই ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই হযরতকে সম্বোধন করিয়াছেন, وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنٰى "আপনি ছিলেন নিঃস্ব রিক্তহস্ত, অতপর আপনার প্রভুই আপনাকে সচ্ছল ধনাঢ্য করিয়াছেন।"

শাদী মোবারকের পর

নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর ভাবী সুন্নত হইবে মানবীয় আবেষ্টনে থাকিয়াও সর্বদা আল্লাহর পানে নিয়োজিত থাকা। সাংসারিক ও পারিবারিক জীবন গড়িলেও ভোগ-বিলাসে পড়িবে না, কোন আকর্ষণেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না। এই মনোবল ও আত্মসংযম লইয়া সব রকম বেড়াজাল এবং কোলাহলে থাকিয়াও মাওলার সঙ্গে মুক্ত নিরালা থাকিবে। কামিনী-কাঞ্চনের ভয়ে সংসার ত্যাগী হইয়া সন্যাসী হওয়ার প্রয়োজন নাই। বাসনা-কামনার উপাদানের মধ্যে সংযম-সাধনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়া জীবন প্রান্তর অতিক্রম করিবেন– ইহাই হইবে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নত।

এখন হইতে সেই সুন্নতের জীবন আরম্ভ হইল নবীজী মোস্তফার (সঃ)। বিবাহের পর নবুয়তপ্রাপ্তি পর্যন্ত পনরটি বৎসর নবীজী মোস্তফার জীবন আদর্শমূলকই ছিল। নবীজী (সঃ) পূর্ব হইতেই ব্যবসায় অভিজ্ঞ ছিলেন; বিবি খাদীজারই ধন নিয়া তিনি কৃতিত্বের সহিত ব্যবসায় করিয়াছেন; এখন ত বিবি খাদীজার সমুদয় ধন-দৌলত তাঁহার চরণে নিবেদিত। একদিন বিবি খাদীজা (রাঃ) তাঁহার বিরাট ব্যবসা নিজেই পরিচালনা করিতেন; এখন ত তিনি গৃহবধূ– নবীজী মোস্তফাই তাঁহার হর্তাকর্তা।

ব্যবসা বা তেজারত নবীজীর একটি বিশেষ ভাবী আদর্শ। নবীজী (সঃ)-এর হাদীছ–

التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء ـ

অর্থ ঃ "সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী কেয়ামত দিবসে নবীগণ, সিদ্দিকগণ ও শহীদগণের সহিত একত্রে থাকিবে।" (মেশকাত শরীফ) ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়, নানা দেশের নানা বৈচিত্রের মধ্যে তাহার গমনাগমন ঘটে, ধৈর্য-সহিষ্ণুতার গুণ লাভ হয়– নানা মনের নানা স্বভাবের মানুষের সহিত সর্বদা পালা পড়িতে থাকে। এতদ্ভিন্ন মানুষের কঠিন পরীক্ষাও হইতে হয়; একদিকে ধনের সমাগম, অপর দিকে সততা, সাধুতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন; অতএব বাণিজ্যের ভিতর দিয়া মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ এবং ক্রমোন্নতি লাভ হইতে থাকে।

সুযোগপ্রাপ্তিতে নবীজী মোস্তফা (সঃ) বাণিজ্যানুরাগী ছিলেন; বিভিন্ন দেশে তাঁহার বাণিজ্য সফরের আভাস ইতিহাসে পাওয়া যায়। বোসরা ও সিরিয়ায় তাঁহার বাণিজ্যের বর্ণনা ত আছেই, এতদ্ভিন্ন ইয়ামান বাহরাইনের বাণিজ্য সম্পর্কেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (সীরাতুন নবী দ্রষ্টব্য)

এই পনর বৎসরে নবীজী মোস্তফার পাঁচ সন্তান জন্মলাভ করেন– এক পুত্র "কাসেম", যিনি সকলের বড় ছিলেন, বাল্য অবস্থায়ই ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন। চার কন্যা– (১) যয়নব (রাঃ), বিবি খাদীজার ভাগিনা আবুল আছের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল; শেষ পর্যন্ত তিনি মুসলমান হইয়া হিজরত করিয়াছিলেন; বিবি

যয়নব তাঁহার বিবাহেই ছিলেন (২) রোকাইয়া (রাঃ) (৩) উম্মে-কুলসুম (রাঃ); প্রথমে তাঁহাদের বিবাহ হযরতের চাচা আবু লাহাবের দুই পুত্রের সহিত হইয়াছিল। নবীজী (সঃ) ইসলাম প্রচার আরম্ভ করিলে আবু লাহাব দম্পতি তাঁহার সহিত শত্রুতা সৃষ্টি করে; ফলে তাহার এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিরুদ্ধে কোরআন শরীফে সূরা "লাহাব" অবতীর্ণ হইল; সেই আক্রোশে আবু লাহাবের পুত্রদ্বয় ক্ষুব্ধ হইয়া নবীজী (সঃ)-এর কন্যাদেরকে ত্যাগ করে।

রোকাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার দ্বিতীয় বিবাহ ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিত হয়; হিজরী দ্বিতীয় সনে বিবি রোকাইয়্যার ইন্তেকাল হইলে উম্মে কুলসুম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার দ্বিতীয় বিবাহ তাঁহারই সহিত হয়। হযরতের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা হইলেন খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতেমা (রাঃ)। হিজরী দ্বিতীয় সনে আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সহিত তাঁহার শাদী হইয়াছিল।

নবীজীর কন্যাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কন্যার কোন সন্তান জীবিত ছিল না। যয়নব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার শুধু এক কন্যা– উমামা (রাঃ) জীবিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সন্তান ছিল না। ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার দুই পুত্র জীবিত ছিলেন; ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসাইন (রাঃ)। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বংশ ধারা এই দুইজন হইতেই চলিয়া আসিতেছে; প্রকৃত সৈয়দগণ তাঁহাদেরই বংশধর। বিবি ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এক কন্যাও ছিলেন– উম্মে কুলসুম; তাঁহার বংশ চলে নাই।

নবী হওয়ার পর বিবি খাদীজার পক্ষে হযরতের আরও তিন বা দুই পুত্র জন্মলাভ করিয়াছিলেন; আবদুল্লাহ, তৈয়্যব ও তাহের। কাহারও মতে একই ছেলে– নাম আবদুল্লাহ, ডাক নাম তৈয়্যব ও তাহের ছিল; তিনি বা তাঁহারা কেহই বাঁচিয়া থাকেন নাই। হিজরতের পরেও হযরতের এক পুত্র সন্তান হইয়াছিল– নাম "ইব্রাহীম" তিনি মারিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গর্ভজাত ছিলেন; শৈশবেই ইন্তেকাল করিয়াছিলেন।

হযরতের পোষ্যপুত্র

নবী হওয়ার পরবর্তীকালের একটি বিশেষ গুণ হযরতের এই বর্ণিত আছে–

"নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি প্রথম দৃষ্টি তাঁহার রাজসিক প্রভাব দর্শকের অন্তরকে কাঁপাইয়া তুলিত; আর অকপটতার সহিত তাঁহার সাথে মেলামেশা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রিয় করিয়া তুলিত।"

প্রথম বাক্যের মর্ম ত আল্লাহর দান নবুয়তের প্রভাব ছিল, আর দ্বিতীয় বাক্যের মর্ম হযরতের স্বাভাবিক চরিত্র মাধুর্যের ফসল এবং এই বৈশিষ্ট্য প্রথম জীবন হইতেই ছিল। হযরতের দাস ও পোষ্যপুত্র যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইতিহাস এই সম্পর্কে বিশেষ আকর্ষণীয়।

হারেসা পুত্র যায়েদ হযরতের দাস ছিল, তাহার দাসত্বের কাহিনী অতি হৃদয়গ্রাহী। আট বৎসর বয়সের শিশু যায়েদকে সঙ্গে করিয়া তাহার মাতা মামা বাড়ী যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাদের উপর লুটেরাদের আক্রমণ হয়, শিশু যায়েদকে তাহার মায়ের কোল হইতে লুটেরা দল ছিনাইয়া লইয়া যায় এবং তৎকালীন রীতি অনুযায়ী তাহারা যায়েদকে দাস বানাইয়া লয়। এভাবেই যায়েদ পিতা-মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাসে পরিণত হয় এবং এক সময়ে সিরিয়ার কোন বাজারে বিক্রীত হয়।

বিবি খাদীজার ভ্রাতুষ্পত্র হাকীম ইবনে হেযাম সিরিয়া হইতে কতিপয় দাস ক্রয় করিয়া আনেন; তন্মধ্যে যায়েদও ছিলেন। বিবি খাদীজা (রাঃ) ঐ দাসগুলি দেখিতে গেলে হাকীম বলিলেন, ফুফু আম্মা! আপনি একটি দাস পছন্দ করিয়া নিন। খাদীজা (রাঃ) যায়েদকে নিয়া আসিলেন; হযরত (সঃ) বিবি খাদীজার নিকট যায়েদকে হেবা চাহিলেন। খাদীজা (রাঃ) হযরতের হস্তে যায়েদকে হেবা করিয়া দিলেন। যায়েদ হযরতের গৃহে যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে যায়েদের পিতা-মাতা পুত্রকে হারাইয়া পাগল প্রায় হইয়া গিয়াছে। তাহার বিচ্ছেদে পিতা-মাতার মনোবেদনার সীমা থাকে নাই। এই বিচ্ছেদ যাতনায় যায়েদের পিতা একটি হৃদয়বিদারক কবিতা রচনা করে। কবিতাটি এতই হৃদয়স্পর্শী ছিল যে, অচিরেই তাহা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল; এমনকি ঐ কবিতা মক্কায় পৌঁছিল এবং যায়েদের গোচরেও আসিল। এইভাবে যায়েদের পিতা-মাতার নিকট যায়েদের খোঁজ পৌঁছিবার ব্যবস্থা হইল। খোঁজ পাইয়া যায়েদের পিতা যায়েদের চাচাকে সঙ্গে নিয়া মক্কায় পৌঁছিল এবং হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করিল। তাঁহারা হযরতের বংশের সুখ্যাতি, বদান্যতা ও দেশজোড়া প্রশংসার উল্লেখপূর্বক মুক্তিপণের বিনিময়ে যায়েদের মুক্তি প্রার্থনা করিল। হযরত (সঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, যায়েদ যদি আপনাদের সহিত চলিয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে কোন প্রকার পণ ব্যতিরেকেই আমি তাহাকে মুক্তি দানে আপনাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিব। আর যদি সে আমার নিকটই থাকিতে চায় তবে যেব্যক্তি আমাকে ছাড়িতে রাজি না হইবে আমিও তাহাকে কোন বিনিময়েই ছাড়িতে রাজি হইব না। তাহারা বলিল, আপনি ত ন্যায়ের ঊর্ধ্বে উদারতার প্রস্তাব করিলেন। হযরত (সঃ) যায়েদকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যায়েদ ঠিকরূপেই পরিচয় বলিল– তিনি আমার পিতা হারেসা, আর তিনি আমার চাচা কা'ব।

হযরত (সঃ) এইবার বলিলেন, যায়েদ! আমি তোমাকে পূর্ণ সুযোগ দিলাম– তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার পিতা ও চাচার সহিত চলিয়া যাইতে পার, আর ইচ্ছা করিলে আমার নিকটও থাকিতে পার। যায়েদ তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীনরূপে বলিয়া দিল, আমি আপনার নিকটই থাকিব। তখন যায়েদের পিতা তাহাকে বলিল, হে যায়েদ! তুমি তোমার মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও দেশ-খেশ ছাড়িয়া গোলামী অবলম্বন করিতেছ? যায়েদ উত্তর করিল, আমি এই মহানের যে ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলী দেখিয়াছি, আমি তাঁহাকে কখনও ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। তৎক্ষণাৎ হযরত (সঃ) যায়েদের হাত ধরিয়া কোরায়শদের সমাবেশে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং যায়েদের মুক্তি নহে শুধু, বরং তিনি ঘোষণা করিলেন, তোমরা সকলে সাক্ষী থাকিও– এই যায়েদ আমার পুত্র । এই ঘোষণায় যায়েদের পিতা অত্যধিক সন্তুষ্ট হইল– আরবের শ্রেষ্ঠ কোরায়শ বংশের বনী হাশেম গোত্রের আবদুল মোত্তালেবের গৃহে আল-আমীনের পুত্র হইয়াছে যায়েদ– এই সৌভাগ্যের আনন্দ যায়েদের পিতাকে কিরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা একমাত্র তাহার অন্তরই অনুভবই করিতে পারিয়াছে। তখন হইতে "মুহাম্মদের পুত্র যায়েদ" পরিচয়ই প্রবল হইয়া গেল। (ইবনে হেশাম, ১-২৪৭)। "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।"

এই যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনার বয়ান পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। লক্ষাধিক ছাহাবীর মধ্যে একমাত্র যায়েদেরই এই সৌভাগ্য যে, তাঁহার নাম পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হইয়াছে।

যায়েদ (রাঃ) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি, তাঁহার পূর্বে শুধুমাত্র খাদীজা (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমনকি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুরও পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যায়েদ (রাঃ) প্রথম জীবনে হযরতের গৃহভৃত্য ছিলেন। মানুষের সর্বময় অবস্থার অভিজ্ঞতা গৃহসঙ্গিনীর পরে গৃহভৃত্যের সর্বাধিক বেশী থাকে। মানুষ কৃত্রিমরূপে বাহিরে সব কিছুই সাজিতে পারে, কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে তাহার কোন কৃত্রিমতা টিকিয়া থাকিতে পারে না। গৃহসঙ্গিনী বা গৃহভৃত্যের নিকট তাহার কৃত্রিমতা অবশ্যই ধরা পড়িয়া যাইবে। অতএব হযরতের প্রতি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সর্বাগ্রে ঈমান গ্রহণ যেরূপ হযরতের সত্য ও খাঁটি নবী হওয়ার বিশেষ প্রমাণ ছিল, তদ্রূপ গৃহভৃত্য যায়েদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঈমান গ্রহণও তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই হইল নবীজীর সাংসারিক জীবনের কিঞ্চিত বর্ণনা। আলোচ্য ১৫ বৎসর সময়ে নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর আর একটি বিশেষ তৎপরতা এবং মহতী প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য।

শেরেক বর্জন ও তওহীদ অন্বেষণে নবীজী (সঃ)

তওহীদ বা একত্ববাদের বিপরীত শেরেকী কাজ হইতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যেরূপ ঘৃণা হওয়া এবং পবিত্র থাকার প্রয়োজন ছিল, নবী হওয়ার পূর্ব হইতেই তিনি বাস্তবে তাহাই ছিলেন। ছোট বড় কোন শেরেকী কাজের সহিত তাঁহার বিন্দুমাত্র সম্পর্কও হইত না। অধিকন্তু তিনি মক্কা এলাকায় একত্ববাদী লোকদের অন্বেষণে থাকিতেন। ঐ শ্রেণীর লোকদের সহিত যোগাযোগ সৃষ্টি এবং সমাজে শেরেকীর যে অভিশাপ প্রচলিত আছে তাহার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা আরম্ভের সূত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেন। এই তৎপরতায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) মক্কা এলাকার প্রসিদ্ধ একত্ববাদী যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নোফায়লের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং উক্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথাবার্তাও বলেন। এই যায়েদ ইবনে আমর মূর্তিপূজার প্রতি অত্যধিক ঘৃণা পোষণ করিতেন। সত্য ধর্মের তালাশে তিনি সিরিয়া এবং ইরাক পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাবের চাচাত ভাই ছিলেন; ওমরের পিতা তাঁহাকে তাঁহার মতবাদের জন্য ভীষণ উৎপীড়ন করিত; তাঁহাকে মক্কায় আসিতে দিত না। কিন্তু তিনি একত্ববাদে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। তিনি নবীজীর পাঁচ বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করিয়াছিলেন। ইন্তেকালের পূর্বে কা'বা শরীফের গেলাফ ধরিয়া কাঁদিয়াছে এবং বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও, আমি সত্য ধর্ম না পাইয়া একত্ববাদের উপরই মৃত্যুবরণ করিতেছি। তাঁহার ছেলে সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) ইসলামের যমানা পাইয়াছিলেন এবং মুসলমান হইয়া অতি বড় মর্তবা লাভ করিয়াছিলেন। আশারা মোবাশ্‌শারাহ অর্থৎ দশ জন ছাহাবী আনুষ্ঠানিকরূপে রসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক বেহেশতী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন; সায়ীদ (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে একজন।

হযরতের পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা– একদা আমি নবীজীর (সঃ) সহিত মক্কার পার্বত্য এলাকায় পৌঁছিলাম; তথায় যায়েদ ইবনে আমরের সহিত নবীজীর (সঃ) সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা উভয়ে অতি সৌজন্যের সহিত পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। নবীজী (সঃ) তাঁহাকে বলিলেন, হে যায়েদ! আপনার জাতি যেসব অপকর্মে লিপ্ত রহিয়াছে আপনি তাহা অবগত আছেন; তাহার প্রতিকারের কোন চিন্তা করেন কি? যায়েদ ইবনে আমর বলিলেন, সত্য ধর্মের খোঁজে আমি সিরিয়া ও ইরাক গিয়াছিলাম। তথায় তওরাত-ইঞ্জীলেরএকজন বিশিষ্ট আলেমের নিকট জ্ঞাত হইলাম, সত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পতাকাবাহী অচিরেই মক্কাতে আত্মপ্রকাশ করিবেন, তাঁহার আবির্ভাবের শুভ নক্ষত্র উদিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়াই আমি মক্কায় ফিরিয়া আসিয়াছি এবং অপেক্ষায় আছি।

অদৃষ্টের পরিহাস– নবীজীর (সঃ) সঙ্গেই নবীজী সম্পর্কে তাঁহার কথাবার্তা হইল, কিন্তু নবীজীর আবির্ভাবকাল তাঁহার ভাগ্যে জুটে নাই। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে খাঁটি তওহীদই মুক্তির ভিত্তি ছিল; অতএব তিনি মুক্তির পাত্র। নবীজী (সঃ) তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে উপস্থিত হইবেন। (আসাহহুস সিয়ার–৫৮)

এই যায়েদ ইবনে আমরের আলোচনায় ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন। (৫৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

১৬৭১। হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মক্কার নিকটস্থ) 'বালদাহ' এলাকার শেষ প্রান্তে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নোফায়লের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তথায় কোরায়শ বংশীয় কাহারও পক্ষ হইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে দওয়াতের খানা পরিবেশন করা হইল (তাহাতে গোশ্‌ত ছিল)। নবী (সঃ) তাহা খাইতে অস্বীকার করত যায়েদ ইবনে আমরের সম্মুখে দিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, হে কোরায়শগণ; তোমারা দেব-দেবীর নামে পশু জবাই করিয়া থাক– আমি তাহা খাই না। আল্লাহর নামে জবাইকৃত হইলে খাইয়া

থাকি। যায়েদ ইবনে আমর সর্বদা কোরায়শদের জবাই করার রীতির প্রতি ভর্ৎসনা করিতেন। তিনি বলিতেন, ভেড়া-বকরী সৃষ্টি করিয়াছেন আল্লাহ, উহার আহার যমীন হইতে উৎপাদনের জন্য আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন আল্লাহ; আর সেই ভেড়া-বকরী তোমরা জবাই কর আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামের উপর। এই রীতির প্রতি তিনি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন এবং ইহাকে অতি বড় অন্যায় বলিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যাযেদ ইবনে আমর সিরিয়ায় গিয়াছিলেন সত্য ধর্মের খোঁজ করিতে। তথায় এক ইহুদী আলেমের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া তাঁহাদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, হয়ত আমি আপনাদের ধর্ম অবলম্বন করিব। ঐ আলেম বলিলেন, আমাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়া আল্লাহর গজব নিজের উপর টানিয়া নিও না। যায়েদ বলিলেন, আমি ত আল্লাহর গজব হইতেই রক্ষা পাইতে চাই; সাধ্য থাকিতে আমি আল্লাহর গজব লইব না। আপনি আমাকে অন্য কোন ধর্মের সন্ধান দিবেন কি? তিনি বলিলেন, আমার জানা মতে আপনি একমাত্র হানীফ ধর্ম গ্রহণ করিতে পারেন। যায়েদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হানীফ ধর্ম কি? তিনি বলিলেন, ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের ধর্ম– তিনি ইহুদীও ছিলেন না, নাসরানীও ছিলেন না। (তাঁহার ধর্মের অনুশাসন ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন শুধু এতটুকুর খোঁজ আছে,) তিনি একত্ববাদী ছিলেন– এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর উপাসনা তিনি করিতেন না।

অতপর যায়েদ এক খৃস্টান আলেমের সহিত সাক্ষাত করিলেন; তাঁহার নিকটও ঐরূপ বলিলেন যেরূপ ইহুদী আলেমের নিকট বলিয়াছিলেন। খৃস্টান আলেম তাঁহাকে বলিলেন, আমাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়া আল্লাহর অভিশাপ কখনও নিজের উপর টানিয়া লইবেন না। যায়েদ বলিলেন, আমি ত আল্লাহর অভিশাপ হইতে রক্ষা পাইতে চাই; সাধ্য থাকিতে আমি আল্লাহর অভিশাপের কিঞ্চিতও লইব না, আপনি আমাকে অন্য কোন ধর্মের অনুসন্ধান দিবেন কি? তিনিও হানীফ ধর্ম তথা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ধর্মমত সম্পর্কে বলিলেন।

যায়েদ যখন সকলের কথায়ই ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ধর্ম– একত্ববাদের খোঁজ পাইলেন তখন সিরিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্বক বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে সাক্ষী বানাইতেছি, আমি ইব্রাহীমের ধর্মমতের উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। আবু বকর (রাঃ) তনয়া আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন; আমি যায়েদ ইবনে আমরকে দেখিয়াছি, তিনি কা'বা ঘরের সহিত হেলান দেওয়া অবস্থায় দাঁড়াইয়া বলিতেন, হে কোরায়শগণ! আমি ভিন্ন তোমাদের কেহই ইব্রাহীমের ধর্মমতের উপর নহে (অর্থাৎ তোমরা হযরত ইব্রাহীমের ধর্মের মিথ্যা দাবীদার। কারণ, তোমরা মোশরেক, আর ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন নিরেট একত্ববাদী)।

যায়েদ ইবনে আমর অন্ধার যুগের সব অপকর্ম হইতে পবিত্র ছিলেন। মেয়ে সন্তানকে জীবিত মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া হইতে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। কোন পিতা স্বীয় কন্যাকে ঐরূপে হত্যা করিতে চাহিলে যায়েদ তাহাকে বলিতেন, (তাহার খোরপোষের জন্য তাহাকে হত্যা করিতে চাও!) আমি তাহাকে প্রতিপালন করিব, ব্যয়ভার আমি বহন করিব; তাহাকে হত্যা করিও না। এই বলিয়া তিনি ঐ হতভাগীকে নিজ আশ্রয়ে নিয়া যাইতেন এবং প্রতিপালন করিতেন। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার পিতাকে ডাকিয়া বলিতেন, ইচ্ছা করিলে এখন তোমার কন্যাকে তুমি নিয়া যাইতে পার, নতুবা আমিই তাহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়া চলিব। (পৃষ্ঠা–৫৪০)

মক্কাতে এই শ্রেণীর আরও কয়েকজন একত্ববাদী ছিলেন, যথা–ওয়ারাকা ইবনে নওফল, যাঁহার উল্লেখ প্রথম খণ্ড ৩ নং হাদীছে রহিয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ, ওসমান ইবনুল হোয়াইরেস এবং কোস্ ইবনে সায়দা।

শেষোক্ত ব্যক্তি ত সুপ্রসিদ্ধও ছিলেন; তাঁহার নামে আদর্শমূলক অনেক ভাষণও বর্ণিত আছে। এমনকি এরূপ বর্ণনাও রহিয়াছে যে, আরবের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ "ওকাজ" মেলায় তিনি এক ভাষণে নবীজী মোস্তফা

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের আলোচনাও করিয়াছিলেন যে– একজন পয়গম্বরের আবির্ভাবকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে। ধন্য হইবে তাহারা যাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং তিনি তাহাদের জন্য সত্যের দিশারী হইবেন। যাহারা তাঁহার বিরোধিতা করিবে তাহাদের জন্য ধ্বংস ! এই ভাষণে নবীজী (সঃ)ও উপস্থিত ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

এতদ্ভিন্ন এই সময়ে নবীজী মোস্তফা (সঃ) স্বীয় জাতি ও দেশবাসীর সহিত পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইতেও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এমনকি তাহাদের বড় বড় বিরোধ নিষ্পত্তি ও সালিসীতে নবীজী (সঃ)-কে পাইলে তাহারা সকলেই আনন্দ বোধ করিত, সালিসীতে তাঁহার ভূমিকাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত বরণ করা হইত।

সামাজিক সালিসীতে হযরত (সঃ)

আমরা যেই সময়ের আলোচনা করিতেছি তখনকার একটি ঘটনা– ঐ সময় কোরায়শরা কা'বা শরীফের পুনঃ নির্মাণ আরম্ভ করিল। কা'বা গৃহের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের বহির্দেশে মানুষের বক্ষ পরিমাণ উপরে "হাজরে আসওয়াদ" নামীয় অতি মর্তবা ও মর্যাদাশীল বিশেষ পাথর খণ্ড স্থাপিত আছে। (বর্তমানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় টুকরা আকারে আছে– যাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড হজ্জের অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন লেখক যাঁহারা তাহা দেখার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত; এই ক্ষেত্রে তাঁহারা এমন বিবরণ লিখিয়াছেন যাহা বাস্তব অবস্থার হিসাবে হাস্যাস্পদ।)

কা'বা গৃহের উক্ত পুনঃ নির্মাণে উহার দেওয়াল যখন এই পরিমাণ উঁচু হইল, যেখানে উক্ত বিশেষ পাথর মোবারক বসাইতে হইবে, তখন বিভিন্ন গোত্রীয় সর্দারদের পরস্পর বিরোধ বাধিয়া গেল– কে এই মহা বরকতের পাথর খণ্ড যথাস্থানে স্থাপিত করার সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে । প্রত্যেকে সেই সৌভাগ্য লাভের প্রয়াসী, এমনকি এই কোন্দলে একটা বিরাট যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার উপক্রম।

হযরতের বয়স তখন মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর তিনি একজন যুবক; কিন্তু সমগ্র দেশে তাঁহার গুণ মাধুর্যের এতই প্রভাব ছিল যে, যে ক্ষেত্রে বড় বড় সর্দারদের কাহারও উপর ঐকমত্য স্থাপন সম্ভব হইতেছিল না, সে ক্ষেত্রে হযরত (সঃ) সালিস নিয়োজিত হওয়ার উপর সকল গোত্র, সকল দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের সহিত ঐকমত্য স্থাপন করিয়া নিল। হযরত (সঃ)ও এমন মীমাংসা করিলেন যাহা বিরোধমান সকলকে সমানভাবে সন্তুষ্ট করিল। বিধাতাই যেন নবীজী (সঃ)-কে এই বিরোধে সালিসী করার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

মক্কাবাসীদের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে তাহাদের এক বয়ঃবৃদ্ধ আবু উমাইয়া সকলকে পরামর্শ দিলেন, তোমরা রক্তপাতে লিপ্ত হইও না; আগামী প্রভাতে সর্বাগ্রে যেব্যক্তি হরম শরীফে মসজিদে প্রবেশ করিবে তাহাকে সালিস নিযুক্ত করিয়া এই বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবে। এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইল। পর দিন অনেকেই এই সৌভাগ্যের প্রয়াসী হইয়া হরম শরীফে আসিল, কিন্তু দেখা দেল, সর্বাগ্রে একমাত্র মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) হরম শরীফের মসজিদে প্রবেশ করিয়াছেন। নবী মোস্তফা (সঃ)-কে পাইয়া সকলে উল্লাস-ধ্বনি দিয় উঠিল– هذا محمد الامين رضينا هذا محمدا "এই যে মুহাম্মদ আল-আমীন; আমরা তাঁহাকে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।" ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি অসাল্লাম (সীরাতে-মোস্তফা, ১–৬৮)

হযরত (সঃ) মীমাংসা করিলেন যে, সকলের প্রতিনিধিরূপে তিনি পাথর খণ্ড একটি বড় চাদরের উপর রাখিবেন; প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধি সর্দার সেই চাদর বহনে অংশগ্রহণ করিবে। এইরূপে সেই বরকতের পাথর বহনে সকলেই সমভাবে অংশীদার হইবে। অতপর হযরত (সঃ) সকলের প্রতিনিধিরূপে চাদর হইতে পাথরখানা যথাস্থানে স্থাপন করিবেন। হযরতের এই বিচক্ষণতাপূর্ণ মীমাংসায় সকলে মুগ্ধ-সন্তুষ্ট হইল এবং সেই অনুযায়ী কার্য সমাধা করা হইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ অন্ধকার যুগে কা'বা গৃহে ছাদ ছিল না; শুধু কেবল চারি দিকের দেওয়াল ছিল। উপরোল্লিখিত নির্মাণে কোরায়শগণ ছাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল। জিদ্দা বন্দরে দুর্ঘটনায় একটি নৌযান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কোরায়শগণ উহার কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া কা'বা গৃহের ছাদ নির্মাণ করিয়াছিল। তখন কা'বা শরীফ পূর্ণাঙ্গ গৃহরূপ হইয়াছিল, কিন্তু উহাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকের জায়গা, যাহা হরম শরীফের মসজিদ, তাহা উন্মুক্তই ছিল।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগেও হরম শরীফ উন্মুক্তই ছিল, এমনকি উহার চতুর্দিকের দেওয়ালও ছিল না; বাড়ী-ঘরের আবেষ্টনেই আবদ্ধ ছিল।

১৬৭২। হাদীছ ঃ হাম্মাদ (রঃ) এবং ওবায়দুল্লাহ (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ীদ্বয় বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আমলে বাতুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকে (মসজিদে হরমের) কোন দেওয়াল ছিল না। (শুধু বাড়ী-ঘরে আবেষ্টিত ছিল এবং) ঐ চতুষ্পার্শ্বস্থ জায়গায়ই নামায পড়া হইত। খলীফা ওমর (রাঃ)-এর আমলে (মসজিদে হরমের) চতুর্দিকে দেওয়াল তৈয়ার হয়, কিন্তু তাহা অনুচ্চ ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) (মসজিদে হরমকে) অধিক প্রশস্ত পূর্ণাঙ্গ গৃহরূপে তৈয়ার করিয়াছিলেন। (পৃষ্ঠা-৫৪০)

সময় নিকটবর্তী ঃ মাটির জগতে মাটির মানুষের নিকট পয়গম্বরী দায়িত্ব পৌঁছাইবেন নবীজী (সঃ)- সেই উদ্দেশেই তাঁহার আবির্ভাব এই জগতে। সেই দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার সময় ঘনাইয়া আসিতেছে, সমুদয় প্রস্তুতি ও যোগাড়-আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে। সেই নির্ধারিত সময়ের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে নবীজীর জীবন, আর মাত্র দুই বৎসর বাকী- নবীজী মোস্তফার (সঃ) বয়স এখন আটত্রিশ বৎসর।

মাটির দেহে আবেষ্টিত নবীজীর উপর পয়গম্বরী সূর্যের উদয়ন-পূর্ব আলোক-রশ্মির বিচ্ছুরণ আরম্ভ হইল। হঠাৎ হঠাৎ তাঁহার নেত্রগোচরে স্বর্গীয় আলোর কিরণমালা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে- তিনি অপূর্ব জ্যোতি দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার পয়গম্বরীর সাক্ষ্য-সম্মান পাহাড়-পর্বত বৃক্ষ-লতার প্রাকৃতিক কণ্ঠ হইতে শ্রবণ করিয়া থাকিতেন। এক এক সময় স্পষ্ট শুনিতে পাইতেন, السلام عليك يارسول الله "আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ- আপনার প্রতি সালাম হে আল্লাহর রসূল।" এই সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি কৌতূহল ও বিস্ময়ে চতুর্দিকে তাকাইতেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খোঁজ করিতেন- ইহা কাহার কণ্ঠ, কাহার সাক্ষ্য, ইহা কাহার সালাম? কিন্তু পর্বতমালার পাথর ও বৃক্ষরাজি ছাড়া তথায় তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেন না। (যোরকানী-১-২১৯)

পয়গম্বরী প্রাপ্তির পরেও তাঁহার এই অবস্থা চলমান ছিল। পয়গম্বরী প্রাপ্তির সূচনায় প্রথমবার তিনি 'ওহী' লাভ করিয়াছিলেন, তারপর দীর্ঘ দিন তাহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিল (যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিবে)। তারপরেও হয়ত কিছু দিন ওহীর আগমন অপেক্ষাকৃত শিথিল ছিল- এই সময়েও তিনি ঐ আলোকরশ্মির প্রতিভাত হওয়ার বিষয় অবলোকন করিয়া থাকিতেন এবং অদৃশ্য স্বর তাঁহার শ্রবণে আসিত। পয়গম্বরী প্রাপ্তির দুই বৎসর পূর্ব হইতে সাত বৎসর পর্যন্ত নবীজীর এই অবস্থা চলিয়াছিল। মুসলিম শরীফের হাদীছে আছে يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولايرى شيئا "অদৃশ্য কণ্ঠের স্বর তিনি শুনিতেন, কিন্তু কিছু দেখিতেন না এবং আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ তিনি অবলোকন করিতেন- এই অবস্থা দীর্ঘ সাত বৎসর বিরাজমান ছিল।

মুসলিম শরীফের আর এক হাদীছে বর্ণিত আছে-

انى لاعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل ان ابعث انى لاعرفه الان -

অর্থ ঃ "মক্কার একটি পাথর আমি চিনি– ঐ পাথরটি আমাকে সালাম করিয়া থাকিত আমার পয়গম্বরী প্রাপ্তির পূর্বে; এখনও ঐ পাথরটি আমার স্মরণে রহিয়াছে।"

তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে আছে– আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কায় থাকাকালে একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে এক দিকে যাইতেছিলাম। যত পাহাড় বৃক্ষ নবীজীর (সঃ) সম্মুখে পড়িতেছিল প্রত্যেকটি তাঁহাকে السلام عليك يارسول الله "আপনার প্রতি সালাম হে রসূলুল্লাহ!" এই বলিয়া সম্ভাষণ জানাইতেছিল।

আর মাত্র ছয় মাস বাকী– নবীজীর বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইয়া নবুয়তপ্রাপ্তির দ্বারে পৌছিতেছে, এই সময় ঊর্ধ্বজগতের আর এক আলিঙ্গন নবীজী (সঃ)-কে অভিভূত করিল। নবীজী (সঃ) যাহা কিছু স্বপ্নে দেখেন প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের আলোর ন্যায় তাহার বাস্তবতা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

স্বাভাবিকভাবে নবীজী মোস্তফা (সঃ) অতিশয় চিন্তাশীল ভাবগম্ভীর স্বভাবের ছিলেন। হাদীছ শরীফে আছে– كان النبى صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة متواصل الاحزان

অর্থ ঃ "নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সদা চিন্তামগ্নও ভাবগাম্ভীর্যে নিমজ্জমান থাকিতেন।"

উল্লিখিত অসাধারণ অবস্থাসমূহ এবং অতিন্দ্রিয় লোকের হাতছানি তাঁহার ঐ স্বভাবকে তীব্রতর করিয়া তুলিল। ভাবের আবেশ তাঁহার ভিতরে-বাহিরে আরও সুগভীর হইয়া উঠিল। এখন তিনি নির্জন নিরিবিলি স্তব্ধ পরিবেশে থাকার প্রতি অতিশয় ঝুঁকিয়া পড়িলেন। জনহীন শব্দহীন লুক্কায়িত স্থানে সর্বেন্দ্রিয় আবদ্ধ অবস্থায় একাগ্র চিত্তে মন ও ধ্যানকে এক প্রভু এক পরওয়ারদেগার এক সৃষ্টিকর্তার প্রতি রুজু রাখিতে ভালবাসিতে লাগিলেন। লোকালয়ের এবং সংসারের কর্মকোলাহল তাঁহার আধ্যাত্মিক চেতনা দুর্বল করিয়া দেয় না কি? সমাজ-জীবনের পঙ্কিলতা তাঁহার প্রতি ধাবমান নূর জ্যোতির স্রোতকে বাধাগ্রস্ত করে না কি?– তিনি যেন এই শঙ্কা, এই ভীতি, এই ভাবনায় অস্বস্তি উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাই নিভৃত নিস্তব্ধ স্থানে জনবসতি হইতে দূরে সরিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকা তাঁহার নিকট প্রিয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তিনি গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন, এমনকি রাত্রেও বাড়ী ফিরিতেন না, কোন পর্বত গুহায় থাকিয়া যাইতেন। অনেক সময় এরূপ হইত যে, বিবি খাদীজা (রাঃ) তাঁহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া রুটি-পানি পৌছাইয়া আসিতেন। (আসাহ্হুস সিয়ার–৫৮)

ধীরে ধীরে তাঁহার ধ্যান-চিন্তায় শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিলেও নিরালা-নির্জন বাসের স্পৃহা তাঁহার বাড়িয়াই চলিয়াছে। এখন তিনি মক্কা হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত হেরা পর্বতে দেড় মাইল উচ্চ শৃঙ্গের নিভৃত গুহায় একাধারে কতক দিবারাত্র কাটাইবার নিয়ম বাঁধিয়া নিলেন। বিবি খাদীজা (রাঃ) প্রকৃত সহধর্মিনীর ন্যায় স্বামীর এই কার্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তিনি দুই চারি দিনের মত খাদ্য-পানীয় প্রস্তুত করিয়া দিতেন, নবীজী (সঃ) তাহা লইয়া সেই নিভৃত সাধনা গুহায় পৌছিতেন। সেই খোরাকী ফুরাইয়া গেলে গৃহে আসিয়া পুনরায় খাদ্য-পানীয় লইয়া তথায় ফিরিয়া যাইতেন। এইভাবে নবীজী (সঃ) এক বিরাট পরিবর্তনের দিকে আগাইয়া চলিলেন এবং সেই পরিবর্তনটা যেন ক্রমশই সাফল্যময় পরিণতির দিকে দ্রুত অগ্রসর বলিয়া তাঁহার মনে হইত। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে চিরবাঞ্ছিতকে পাইবার প্রাক্কালে মানুষের যেরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয়, নবীজীর উপর যেন সেই ভাব পরিলক্ষিত! তিনি শান্ত শিষ্ট চিত্তে দিবানিশি আল্লাহ তাআলার যিকির-ফিকিরে মগ্ন থাকেন; এইভাবে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার বয়স চল্লিশ পূর্ণ হইয়াছে; এই সময়ে তাঁহার ভিতরে-বাহিরে কেবল নূর– কেবল জ্যোতি।

সত্যের প্রথম প্রকাশ– নবুয়তের প্রারম্ভ (পৃষ্ঠা-৫৪৩)

রমযান মাস,* অমাবস্যা-পূর্ব অন্ধকার, রজনী গভীর, লোকালয় হইতে বহু দূরে হেরা পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গে নিভৃত প্রকোষ্ঠে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ধ্যানমগ্ন। এমন সময় হঠাৎ মহাসত্যের আগমন হইল– ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) ঐ প্রকোষ্ঠে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং সালাম করিলেন। ফেরেশতা নূরের তৈয়ারী; বহন করিয়া আনিয়াছেন আল্লাহ তাআলার কালাম– তাহাও নূর; এইসব নূরের আকর্ষণে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জড় দেহের আবেষ্টনে লুক্কায়িত মহানূরও প্রতিভাত হইয়াছে অসাধারণভাবে। অতএব হেরা গুহায় এখন নূর! নূর!! সবই নূর। নবীজী মোস্তফার (সঃ) ভিতর বাহির নূরের জৌলুসে নূরই নূর হইয়া গিয়াছে। এই মহা মুহূর্তে তাঁহার দেহ-মনের অবস্থা একমাত্র তাঁহারই অনুভব করিবার কথা– ব্যক্ত বা বর্ণনা করার আয়ত্ত বহির্ভূত। নিভৃত গিরিগহ্বরের এই অভূতপূর্ব মুহূর্তটি মোস্তফা হৃদয়ে কি রেখাপাত করিয়াছিল তাহা কি কোন মানুষ নির্ণয় করিতে পারে? "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ।"

সব কিছুই সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে, এইসব অবস্থার মাঝে নবীজী মোস্তফার (সঃ) জ্ঞান, উপলব্ধি চেতনা সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও প্রখর ছিল, তাহাতে কোনই ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

এই পরিস্থিতি অপেক্ষা লক্ষ-কোটি গুণ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জ্ঞান-উপলব্ধির কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই; এমনকি চর্মচোখ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র ঝলসায় নাই বলিয়া স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে নবীজীর প্রশংসা করিয়াছেন। মে'রাজ ভ্রমণে নবীজী (সঃ) মহান আরশ-কুরসী, সেদরাতুল মোন্তাহা ইত্যাদিসহ যাহা কিছু পরিদর্শন করিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى মোস্তফা (সঃ) তাঁহার প্রভু পরওয়ারদেগারের অপেক্ষাকৃত অনেক বড় বড় কুদরতের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই অস্বাভাবিক অবস্থার ভিড়ের মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থা বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন– مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى "ঐসব পরিদর্শনে নবীজীর চোখ মোটেই ঝলসায় নাই এবং কোন প্রকার ব্যতিক্রমেও পতিত হয় নাই।"

হেরা প্রকোষ্ঠে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তাহার মাঝে নবীজী মোস্তফা (সঃ) স্বীয় জ্ঞান, উপলব্ধি ও সুষ্ঠু চেতনার মাধ্যমে ফেরেশতা জিব্রাঈলকে সম্যকরূপে চিনিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিলেন– ইহাও আল্লাহ তাআলার এক কুদরতই ছিল।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ পরিচয় ও গুণের উল্লেখ রহিয়াছে এই– اَلَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى "আল্লাহ তাআলা সেই মহান যিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উহার আকৃতি প্রকৃতি দান করিয়াছেন; অতপর তিনিই তাহাকে স্বাভাবিক ধর্মের প্রতি স্বয়ংক্রিয়রূপে পরিচালিত করিয়াছেন। (১৬–১১) আরও আছে– اَلَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى "আল্লাহ তাআলাই (প্রত্যেক সৃষ্টির স্বভাব ও প্রয়োজন) নির্ধারিত করিয়াছেন এবং তাহাকে সেই স্বভাব প্রয়োজনের প্রতি পরিচালিত করিয়াছেন।" যথা– কাহার খাদ্য কি? প্রত্যেক সৃষ্টি শিক্ষা ও পরিচয় করানো ছাড়াই তাহার সহিত পরিচিত হয় এবং নিজ নিজ আহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সদ্য প্রসূত শিশু কাহারও শিক্ষা দান ছাড়াই মাতার বক্ষ হইতে দুগ্ধ আহরণের কৌশল-প্রণালী

---

* নবুয়ত ও কোরআন অবতরণ আরম্ভের সময়কাল সম্পর্কে অনেক মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ সীরাত সঙ্কলকগণের সিদ্ধান্ত এবং বিশিষ্ট ইমামগণের মত ইহাই যে, তাহা রমযান মাসে ছিল। পবিত্র কোরআনের আয়াতও এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে সুস্পষ্ট– যদি তাহাতে কোন প্রকার হেরফের করা না হয়। (যোরকানী ১–২০৭) এই হিসাবে নবুয়তপ্রাপ্তি চল্লিশ বৎসর ছয় মাসেরও বেশ কিছু দিন উর্ধ্বের বয়সে ছিল।

বুঝিয়া উঠে; এমনকি পরিচয় প্রদান এবং কাহারও হইতে পরিচয় গ্রহণ ব্যতিরেকেই তাহার অন্তর তাহার সহিত এত গভীরভাবে পরিচিত হয় যে, সেই পরিচয়ের কোন তুলনা হয় না। এই শ্রেণীর হাজার পরিচয় ও উপলব্ধি কোথা হইতে আসে? এই সবের প্রবাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার তরফ হইতেই পৌঁছিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার এই মহাদানই উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শিশুর জন্য মায়ের পরিচয় যে প্রয়োজন তাহা মিটাইয়া থাকেন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা; নবীর জন্য জিব্রাঈলের পরিচয় তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন এবং হেরা গুহার সেই প্রয়োজন সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণরূপে মিটাইয়াছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলাই। যোরকানী, ১-২১৮)

ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) প্রকাশের পর রসূল হওয়ার সুসংবাদ দানে নবীজীকে অভিনন্দিত করিলেন। সুস্পষ্ট সুসংবাদপ্রাপ্তিতে নবীজী (সঃ) সংশয়মুক্তরূপে রসূল হওয়ার একীন লাভ করিলেন। অতপর জিব্রাঈল (আঃ) নবীজী (সঃ)-কে বলিলেন, পড়ুন; নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমি পড়ায় সামর্থ্যবান নহি।

কাহারও মতে ঐ সময় জিব্রাঈল (রাঃ) রেশমীপত্রে নূরানী মণি-মুক্তা খচিত একখানা লিপি নবীজীর হস্তে অর্পণ করিয়া তাই পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। লেখাপড়া না শেখা ব্যক্তি লিপি পাঠে সক্ষম হয় না– তাহাই নবীজী (সঃ) বলিয়াছিলেন, আমি পড়ায় সামর্থ্যবান নহি। অনেকের মতে জিব্রাঈল (আঃ) মৌখিক পড়ার কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু পঠনীয় কোন বস্তু শুধু শুনিয়া আবৃত্তি করাও লেখাপড়া না শেখা ব্যক্তির পক্ষে কঠিন হয়, এতদ্ভিন্ন পূর্বালোচিত ভয়াল দৃশ্যাবলীর চাপে ঐ সময় নবীজীর উপর সৃষ্ট শিহরণ ও কম্পন কোন কিছু পাঠ বা আবৃত্তি করিতে প্রতিবন্ধক হইতেছিল– তাই নবীজী (সঃ) বলিয়াছিলেন, আমি পড়ায় সমর্থ নহি। (সীরাতে মোস্তফা, পৃষ্ঠা–১-১০০)

যাহাই হউক, জিব্রাঈল (আঃ) নবীজীর সাহস ভাঙ্গা দেখিয়া তাঁহার মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশে স্বীয় দৈবশক্তি প্রয়োগে নবীজীর আধ্যাত্মিক শক্তিকে উচ্ছলিত করার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি স্বীয় বক্ষে নিবেশনপূর্বক আলিঙ্গনের মাধ্যমে সজোরে চাপ দিলেন; এমনকি চাপের দরুন নবীজী (সঃ) ক্লেশ অনুভব করিলেন। প্রথমবার আলিঙ্গনে নবীজীর সাহস সতেজ হইল না, তাই পর পর তিনবার আলিঙ্গন করিলেন; তৃতীয় বার আলিঙ্গনের পর জিব্রাঈলের পঠিত পাঁচটি আয়াত নবীজী (সঃ) অনায়াসে পড়িতে পারিলেন।

হেরা গুহার ঘটনায় সব কিছু চেনা, বুঝা ও উপলব্ধি করার মধ্যে নবীজীর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু এই দুনিয়াতে তিনি মানবীয় মাটির দেহে আবির্ভূত; আত্মা তাঁহার বহু ঊর্ধ্বের, কিন্তু তাঁহার দেহ ও দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি মাটির জগতের। অতএব তাঁহার দেহের উপর কোন বিশেষ ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না– এই দৃষ্টিতে হেরা গুহার ঘটনার কতিপয় খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ্য করুন ঃ

(১) নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ!
(২) অন্ধকারময় গভীর রজনী!
(৩) লোকালয় হইতে বহু দূরে!
(৪) পর্বত শৃঙ্গের নিভৃত গুহায়!
(৫) পরে পরিচয় হইলেও আগন্তুকের অকস্মাৎ আগমন!

এতগুলি ভীতির কারণ সমাবেশে মানবীয় দেহের উপর সাময়িক শিহরণ কম্পন সৃষ্টি হওয়া কতই না স্বাভাবিক।

সর্বোপরি কথা– নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঘটনার মর্ম সবই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; পারিবেন না কেন? তিনি ত পাহাড়-পর্বত বৃক্ষ-লতার সাক্ষ্য শুনিয়া আসিতেছিলেন, انك لرسول الله "নিশ্চয় আপনি মহাপুরুষ, আল্লাহর রসূল"। লুক্কায়িত সাক্ষ্যের আজ চূড়ান্ত বিকাশ, তাই গুরুদায়িত্বের চেতনাও আজ পূর্ণমাত্রায় উপনীত। তাঁহার নিকট যে সত্য আসিয়াছিল, যে কর্তব্য পালনের জন্য তাঁহাকে

প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহা সহজ কাজ নহে। তাঁহাকে মুক্তির পতাকা দিয়া পাঠান হইয়াছিল বিশ্বের বিশাল কর্মক্ষেত্রে। কর্ম ও সাধনা যুগপৎভাবে উভয় লইয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে এই বিশাল ধরাপৃষ্ঠে।

এতদ্ভিন্ন আরও একটি ভীষণ চাপের বস্তু ছিল "ওহী"। ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ) নিজ অবস্থায় থাকিয়া ওহী পৌঁছাইলেন। সেই ওহীর গুরুচাপ সম্পর্কে হাদীছেই উল্লেখ আছে যে, অত্যধিক শীতের সময়ও নবীজী (সঃ) ঘর্মাক্ত হইয়া যাইতেন; ঘর্মের ধারা তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে বহিয়া পড়িত, গলগণ্ড হইতে গোঙ্গানির শব্দ নির্গত হইত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া যাইত। (প্রথম খণ্ড ২ নং হাদীছ) ওহীর আভ্যন্তরীণ গুরুচাপ সম্পর্কে যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) ছাহাবীর বর্ণনা রহিয়াছে– একদা মাত্র একটি শব্দের ওহী অবতীর্ণ হইল; ঐ সময় আমি নবীজীর পাশে বসা ছিলাম; তাঁহার ঊরু আমার ঊরুর উপরে ছিল। ওহীর ভীষণ চাপে আমার ঊরু চূর্ণ হইয়া যাইবে মনে হইতেছিল। হেরা গুহার ঘটনায় বাহ্যিক চাপ ততটা না হইলেও আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক চাপ ত অবশ্যই ছিল। তদুপরি এক দুই বার নহে, তিন বার জিব্রাঈল ফেরেশতার আলিঙ্গন চাপও ছিল। বিদ্যুৎ স্পর্শের চাপ বাহ্যিকরূপে দৃশ্য না হইলেও আভ্যন্তরীণ চাপ কতই না বিরাট হইয়া থাকে এবং সেই চাপে বিদ্যুৎ শলাকায় কম্পনও সৃষ্টি হইতে পারে। এস্থলে নির্মল জ্যোতির ফেরেশতা জিব্রাঈল চির জ্যোতির্ময় বস্তু "ওহী" নিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার স্পর্শে নবীজীর প্রাণে শিহরণ জাগিয়া উঠা মোটেই বিচিত্র ছিল না, বরং এই ক্ষেত্রে শিহরণ সৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। হাদীছে ও ইতিহাসে যদি শিহরণের উল্লেখ না থাকিত তবে তাহা অস্বাভাবিক পরিগণিত হইত।

ভয়াল দৃশ্য, ওহীর চাপ ও ফেরেশতা জিব্রাঈলের আলিঙ্গন ক্রিয়ার সৃষ্ট শিহরণ এবং বিশাল দায়িত্বের গুরুভার বোধে সৃষ্ট শঙ্কা ও ভীতিসহ হেরা গুহায় সর্বপ্রথম অবতারিত اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ পবিত্র কোরআনের পাঁচটি আয়াত লইয়া নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং গৃহের লোকজনসহ খাদীজা (রাঃ)-কে কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আমাকে আবৃত কর– আমাকে আবৃত কর। গৃহের সকলে নবীজী (সঃ)-কে কম্বল আবৃত করিয়া নিলেন; ক্ষণিকের মধ্যে তাঁহার শিহরণ কম্পন দূরীভূত হইল। তিনি স্বাভাবিক শান্ত অবস্থায় প্রকৃতিস্থ হইয়া

বলিলেন, হে খাদীজা! অসাধারণ আশ্চর্যজনক অবস্থা আমার উপর অর্পিত হইয়াছে– এই বলিয়া সকল বৃত্তান্ত তিনি খুলিয়া বলিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বিবি খাদীজা (রাঃ)-কে আরও বলিলেন, আমার কিন্তু প্রাণের ভয় হয়।

নবীজী (সঃ) স্বীয় দায়িত্ব এবং কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা-চেতনা হেরাগুহা হইতেই নিয়া আসিয়া ছিলেন; এখন থাকিয়া থাকিয়া এই কর্তব্যের কঠোরতা বিশেষতঃ কর্মস্থলের ভয়াবহতা তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিতেছিল। বিশ্বজোড়া আল্লাহ ভোলা মানব শেরেক ও মূর্তিপূজায় পরিবেষ্টিত, আর সেই কাজে সকলের গুরু হইল মক্কাবাসী– সেই মক্কায়ই নবীজীকে প্রথম দাঁড়াইতে হইবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ধ্বনি লইয়া, আঘাত হানিতে হইবে শেরেক ও মূর্তিপূজার প্রতি। এই পরিস্থিতিতে দেশজোড়া, বিশ্বজোড়া শত্রুর হাতে প্রাণ হারাইবার শঙ্কা ও ভীতি কি অমূলক? কত নবীই ত এই পরিস্থিতিতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। নবীজীর নিকটতম নবী ঈসা (আঃ), ইহুদীদের দ্বারা তাঁহার কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরে নবীজী (সঃ) তাহার কোন খোঁজই কি পান নাই?

বিবি খাদীজা (রাঃ) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা ও অভয় দিতে লাগিলেন। তিনি নবীজীর জনসেবামূলক উন্নত চরিত্রের মহিমা ও গুণাবলী উল্লেখপূর্বক দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিলেন, কস্মিনকালেও আল্লাহ আপনার প্রতি বিমুখ হইবেন না। তিনি নিজেই আপনাকে দায়িত্ব কর্তব্য অর্পণ করিয়াছেন; তাহা যথাযথ পালন করিয়া যাওয়ার সুযোগ শক্তি প্রদান না করার অর্থ আপনাকে অপমান করা; আল্লাহ তাআলা আপনাকে অপদস্থ-অপমান নিশ্চয়ই করিবেন না। এই সময়ে বিবি খাদীজা নবীজীর যে কয়টি চারিত্রিক গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন– আপনি

স্বজনবর্গের চির শুভাকাঙ্ক্ষী, মঙ্গলকামী বন্ধু, আপনি পরের দুঃখ বহনকারী মহাজন, আপনি গরীব কাঙ্গাল দুঃখীজনের সেবক, যাহার কেহ নাই, কিছু নাই, আপনি তাহার আপনজন এবং সব কিছু। নবুয়তের পূর্ব হইতেই এই প্রেম ও সেবাবৃত্তি হযরতের জীবনের বিশেষত্ব ছিল। এইসব ছিল হযরতের আজন্ম প্রতিপালিত সুন্নত। এরূপ পুণ্যবান মহামতি মহাত্মাকে কি আল্লাহ তাআলা বিপর্যস্ত ও অপদস্থ-অপমান করিবেন? কস্মিনকালেও নহে। এই পরিস্থিতিতে বিবি খাদীজা (রাঃ) উপযুক্ত সহধর্মিনীর দায়িত্বই পালন করিয়াছিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই কঠিন মুহূর্তে যেভাবে তিনি তাঁহার জন্য সান্ত্বনা যোগাইয়াছিলেন– তাহা তাঁহার চির সৌভাগ্যের প্রতীক এবং প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ হইয়া থাকিবে; খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এই মহৎ চরিত্রের তুলনা নাই। বিবি খাদীজা (রাঃ) কিন্তু ধীরস্থির, শান্ত অচঞ্চল; এইরূপ হইবেন না কেন? তিনি ত নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদীয়মান সূর্যের প্রভাতী আলো পূর্ব হইতে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন এবং সদা তাকাইয়া ছিলেন সেই সূর্য দৃষ্ট হওয়ার শুভলগ্নের প্রতি। সেই চির আকাঙ্ক্ষিত সূর্য আজ উঁকি দিয়াছে; মনে কি আনন্দের ঠাঁই হয়? প্রাণে কি উল্লাসের সঙ্কুলান হয় বিবি খাদীজার? "রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা।"

বিবি খাদীজার চাচা সম্পর্কীয় মুরব্বী জ্ঞানবৃদ্ধ তাপস সৎ-সাধু ওয়ারাকা ইবনে নওফল– যাঁহার সহিত খাদীজা (রাঃ) পূর্ব হইতেই নবীজী (সঃ) সম্পর্কে যোগাযোগ রাখিয়াছিলেন, দাম্পত্য প্রণয়নে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন; ঐ সময় তাঁহার নিকট মায়সারার বর্ণিত ঘটনা ইত্যাদি বর্ণনা করিলে এই ওয়ারাকাই নবীজীর উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং নবী হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বিবি খাদীজা (রাঃ) সেই আশায় বুক বাঁধিয়াই অসময়ে বিবাহে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আজ যখন সেই আশার সূর্যোদয়ের সুস্পষ্ট ঘটনাবলীর খোঁজ পাইলেন এবং সেই ঘটনাবলীর নিদর্শন চোখে দেখিলেন তখন কি আর খাদীজা (রাঃ) এই মুহূর্তেই ওয়ারাকার নিকট না যাইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন? স্বাভাবিকভাবেই বিবি খাদীজা (রাঃ) এই নূতন ঘটনাবলীর বর্ণনা ওয়ারাকাকে শুনাইয়া তাঁহার পূর্ব ধারণার বাস্তবতা জ্ঞাত করিতে এবং নিজের আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্য ও গৌরবের উদয় খবর প্রদানে ব্যাগ্র হইয়া পড়িলেন। অন্যের মুখে ও সাক্ষ্যে নহে, বরং স্বয়ং যাঁহার ঘটনা তাঁহার মুখেই ওয়ারাকাকে বিস্তারিত শুনাইবার আগ্রহে বিবি খাদীজা (রাঃ) নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাহকেও সঙ্গে লইলেন। বিবি খাদীজার ন্যায় সর্বোৎসর্গকারিণী জীবনসঙ্গিনীর আগ্রহ -আকাঙ্ক্ষা নবীজী (সঃ) কি উপেক্ষা করিবেন? তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য নবীজী (সঃ) সঙ্গে গেলেন। নবীজী (সঃ) নিজের ঘটনা সম্পর্কে ওরাকার সিদ্ধান্ত শুনিয়া কোন সংশয় দূর করার জন্য নিজ আগ্রহে ওয়ারাকার নিকট গিয়াছিলেন– এইরূপ বিবৃতি কোন ইতিহাসেও নাই, হাদীছেও নাই; শত্রুরা প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডারূপে এই শ্রেণীর কথা গড়িয়া থাকে।

আসমানী কিতাবের অভিজ্ঞ সৎ-সাধু ওয়ারাকা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে সেই মুহূর্তেই সত্য ধরিয়া ফেলিলেন এবং অকাতরে তাহার স্বীকৃতিদানে দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিলেন, এই ত সেই চির মঙ্গলময় বার্তাবাহক দূত ফেরেশতা যিনি মূসা ও ঈসা পয়গম্বরদ্বয়ের নিকট আল্লাহর বাণী ওহী বহন করিয়া আনিতেন। নবীজী (সঃ)-এর পয়গম্বরী প্রসার লাভের সময় পর্যন্ত জীবিত থকার আকাঙ্ক্ষাও তিনি প্রকাশ করিলেন। আসমানী কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি দেশময় নবীজীর (সঃ) শত্রুতা সৃষ্টির সংবাদ দানে বলিলেন, মক্কাবাসীরা আপনাকে দেশত্যাগে বাধ্য করিবে; নবীজী (সঃ) স্তম্ভিত স্বরে বলিলেন, মক্কাবাসীরা আমাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবে! ওয়ারাকা বলিলেন, হাঁ– আপনার শ্রেণীর প্রত্যেকের সহিতই এইরূপ শত্রুতা করা হইয়াছে। ওয়ারাকা ইহাও বলিলেন, ঐ সময় যদি জীবিত থাকি তবে আমার শক্তি সাধ্যের সর্বশেষ বিন্দু ব্যয়ে আপনার সাহায্য-সহায়তা করিয়া যাইব। সেই মুহূর্তে ওরাকার ন্যায় ব্যক্তির এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বীকৃতি পাইয়া বিবি খাদীজা (রাঃ) নিজ বিশ্বাস ও সৌভাগ্যের গৌরবে কিরূপ পুলকিত হইয়াছিলেন তাহা অনুভব উপব্ধি করার বস্তু; ব্যক্ত করার নহে।

ওয়ারাকা বিবি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট চির স্মরণীয় হইয়া থাকিলেন। তিনি কি

তাঁহাকে ভুলিতে পারেন? নবীজীর (সঃ) চরণতলে ছায়ালাভে তিনিই প্রথম উৎসাহ যোগাইয়াছিলেন এবং আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্যের উদয় মুহূর্তেও তিনি সত্যের সঠিক স্বীকৃতি ও উপযুক্ত মূল্যদানে বিবি খাদীজার অন্তরকে গৌরবে আনন্দে ভরিয়া দিলেন। ওয়ারাকার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না; অল্প দিনের মধ্যে তিনি ইন্তেকাল করিয়া গেলেন– নবীজীর পয়গম্বরীর প্রসারকাল তিনি পাইলেন না। একদা খাদীজা (রাঃ) নবী (সঃ)-কে বলিলেন, ওয়ারাকা ত আপনার পয়গম্বরীতে পূর্ণ বিশ্বাস ও স্বীকৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবী (সঃ) বলিলেন, আমি ওয়ারাকাকে স্বপ্নে সাদা পোশাকে দেখিয়াছি; সে নরকী হইলে (আমার স্বপ্নে) তাহার এই পোশাক হইত না। আরও বর্ণিত আছে– নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ওয়ারাকাকে মন্দ বলিও না; আমি বেহেশতে তাহার জন্য তৈয়ারি বাগান দেখিয়াছি। (সীরাতে মোস্তফা, ১-১০৭)।

সর্বপ্রথম ওহী

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ -

অর্থ ঃ "তোমার প্রভু পরওয়ারদেগারের নামের সাহায্য লইয়া পড়– যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন রক্তপিণ্ড হইতে। পড়; তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগার মহামহিম। তিনি জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন কলমের দ্বারা। তিনি মানুষকে অজ্ঞাতপূর্ব জ্ঞান দান করিয়াছেন।"

যেই মহাসত্যের প্রতীক্ষায় ছিল সারা জাহান; যুগ-যুগান্তর হইতে ধরণীপৃষ্ঠে কত নবী-রসূল আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুত শুনাইয়া গিয়াছেন সেই মহাবাণী সম্পর্কে। সেই মহাসত্য বাণীই হইল আল্লাহর পাক কালাম; আজ তাহার প্রথম অবতরণ। তাহার প্রথম প্রকাশ কত সুন্দর! মানুষের ধ্যান-ধারণায় বিপ্লব সৃষ্টি করিতে কত সুগভীর ক্রিয়াশীল!

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে অন্যের মুখাপেক্ষী ও প্রত্যাশী, অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল অক্ষম। আল্লাহ ভোলা মানুষ তাহার মুখাপেক্ষিতা অক্ষমতা দূরীকরণে সৃষ্টিকর্তাকে ছাড়িয়া শত দুয়ারে ছুটাছুটি করে– ইহা হইতেই আল্লাহ ভিন্ন অন্যের পূজার সূচনা হইয়াছে; যাহার উচ্ছেদের জন্য ইসলামের আবির্ভাব, কোরআনের অবতরণ। তাই কোরআনের সর্বপ্রথম শিক্ষা– যেকোন প্রত্যাশা পূরণে এবং শক্তি সামর্থ্যের কামনায় প্রত্যেকে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হইবে। প্রথম আয়াতের মর্ম ও মূল তাৎপর্য ইহাই; নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সম্বোধন করা এবং পড়ার উল্লেখ করা আয়াতটির অবতরণ ক্ষেত্রের সামঞ্জস্যে উদাহরণ মাত্র। উদ্দেশ এই যে, প্রত্যেকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক কার্যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার সাহায্য কামনা করিবে। তাহা করিলে শক্তি-সাহসের অভাব থাকিলেও সাফল্য লাভ হইবে। আল্লাহ অতি মহান, অতি মহান– ইহজগতে বান্দা আল্লাহর সাহায্য চাহিবার জন্য আল্লাহকে পাইবে কোথায়? এই জটিলতার সহজ সমাধানেই বলা হইয়াছে, আল্লাহর নামে সাহায্য সম্বল করিয়া কার্যে অবতীর্ণ হইয়া পড়; এতটুকুই তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে।

বিশ্বজোড়া ভুল ধ্যান-ধারণা, আল্লাহর দুয়ার ছাড়িয়া অন্যের দুয়ারে যাওয়া, ইহার আমূল পরিবর্তন পূর্বক সাহায্য-সহায়তার প্রত্যাশী একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট প্রত্যাশী হওয়ার আদর্শ ও নীতি শিক্ষা দেওয়াই প্রথম আয়াতের মূল তাৎপর্য। এই আদর্শ ও নীতি হইতে বিচ্যুত হওয়াই তওহীদের বিপরীত শেরকের সূত্র; তাই সর্বপ্রথম ওহী এই আদর্শ ও নীতি প্রবর্তনের অতি সুন্দর প্রারম্ভই বটে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই নীতির যৌক্তিকতায় আল্লাহ তাআলা স্বীয় পরিচয় দানে বলিতেছেন, তিনিই বিশ্ব-নিখিলের "রব" তথা সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা– সকল সৃষ্টিকে তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি সম্পর্কে কত না গর্হিত মতবাদ ছিল– সেসব মতবাদ মানুষকে আল্লাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শেরকে লিপ্ত

করিয়াছে। পবিত্র কোরআন তাহার প্রথম প্রকাশেই সৃষ্টি সম্পর্কে সমস্ত গর্হিত মতবাদ ও ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করিয়া স্পষ্ট ঘোষণা দিয়াছে– একমাত্র আল্লাহ তাআলাই খালেক স্রষ্টা। পৃথিবীতে ধর্মের নামে যত অনাচার অবিচার ও গর্হিত মতবাদের ছড়াছড়ি হইয়াছে সবের মূলেই একটি মহাদোষ দৃষ্ট হয় যে, মানব সৃষ্টিকর্তার যথাযথ মর্যাদাদানে ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত হইয়াছে। মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে তঁহার আসন হইতে নামাইয়া সৃষ্টিকে সেই আসনে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছে। অধুনা খোদা নাই মতবাদের ধ্বজাধারীরাও ন্যাচার বা স্বভাবকে সেই আসনেই আসীন করিতেছে। অথচ ন্যাচার বা স্বভাব প্রকৃতিও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার আসনে টানিয়া আনার এই মূল রোগের বিনাশ সাধনে কোরআন তাহার প্রথম কথায় বলিয়া দিতেছে– বিশ্ব চরাচরের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, বিশ্বের যাহা কিছু সমস্ত একমাত্র তাঁহারই সৃষ্টি।

এস্থলে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার অসংখ্য গুণবাচক নাম হইতে "রব" নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। সৃষ্টির বিবর্তনের সহিত এই নামের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ অতি চমৎকার। "রব" শব্দের অর্থ বস্তুকে তাহার নগণ্য ও ছোট পর্যায় হইতে উন্নত ও বড় হওয়ার জন্য ধাপে ধাপে ক্রমে ক্রমে পূর্ণতায় উপনীতকারী। বিশ্ব চরাচরে সৃষ্টিসমূহের যে ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তন তাহা ন্যাচার বা স্বভাবের ক্রিয়া নহে; তাহা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি, তাঁহারই নিয়ম পদ্ধতি। "রব" শব্দের দ্বারা তাহা বুঝানই উদ্দেশ্য এবং তাহারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে করা হইয়াছে। সৃষ্টির সেরা মানব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে– "যিনি মানবকে "আলাক"– রক্তপিণ্ড হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। কি বিচিত্র ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তন মানব সৃষ্টির মধ্যে। পবিত্র কোরআনেই বর্ণিত রহিয়াছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ـ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ـ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ـ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ـ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ـ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ـ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ـ

অর্থাৎ আমি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার মূল হইল– মাটি হইতে নিষ্কাশিত বস্তু (খাদ্য, যাহা মাটির রসে উৎপন্ন)। অতপর সেই বস্তুকে বীর্য বানাইয়াছি (খাদ্য হইতে রক্ত, রক্ত হইতে বীর্য)– যাহাকে জরায়ু প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রাখিয়াছি। অতপর বীর্যকে রক্তপিণ্ড বানাইয়াছি। তারপর রক্তপিণ্ডকে মাংসখণ্ড বানাইয়াছি। তারপর ঐ মাংস খণ্ডের কিছু অংশকে হাড় বানাইয়া তাহাকে মাংস আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছি। তারপর (আত্মার সংযোজনে) তাহাকে ঐ বস্তুসমূহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক (বহুমুখী গুণাধার, অসাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক-বাহক এবং বিচিত্র রূপ-লাবণ্য ও সুন্দর নকশা-আকৃতির) সৃষ্টিরূপে দাঁড় করিয়াছি। কত বড় মহান সেই আল্লাহ তাআলা যিনি সুন্দর রূপদানে অতুলনীয়। তারপর হে মানব! তোমাকে মরিতে হইবে, অতঃপর কেয়ামত দিবসে তোমাকে পুনর্জীবিত হইতে হইবে (–সেই জীবনের আর শেষ নাই)। (পারা–১৮;রুকু–১)

ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবিবর্তনের কি সুন্দর বিবরণ! প্রত্যেক ক্রম ও ধাপের বর্ণনার সহিত আল্লাহ তাআলা "খালাকনা" উল্লেখ করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, এক ধাপ হইতে অপর ধাপে যাওয়া একমাত্র আমার সৃষ্টি কার্যেই হইয়াছে; স্বয়ংকৃত স্বয়ম্ভূরূপে বা অন্য কোন কর্তার ক্রিয়ায় নহে। মানবের আদি হইতে অন্ত এবং অনন্ত পর্যন্তের সর্বময় ক্রমবিকাশের কি সুন্দর বর্ণনা ইহা। সর্বপ্রথম ওহীর মধ্যে এই দৃষ্টান্তেরই সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দানপূর্বক আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি কর্তৃত্ব ব্যাপক আকারে দেখাইয়া শিরকের মূলোচ্ছেদ করা হইয়াছে।

আল্লাহ তাআলা স্রষ্টা, ইহার বিকাশ-পাত্রের নমুনারূপে মানব সৃষ্টির আদিকথা উল্লেখ করিয়াছেন– এখানেই আসিয়া গেল মানুষের পরিচয়। মানুষ কোথা হইতে আসিল? কে পয়দা করিল? এক্ষেত্রেও কোরআন

যাবতীয় মতবাদকে বাতিল করিয়া দিয়া স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছে যে, মানুষকে আল্লাহ তাআলাই পয়দা করিয়াছেন অতি নিকৃষ্ট ঘৃণার বস্তু বীর্য এবং রক্তপিণ্ড হইতে।

মহান আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তার কি সুস্পষ্ট বিকাশ! একটা নিকৃষ্ট বস্তু রক্তপিণ্ডের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষের অসাধারণ শক্তি সম্ভাবনা পুঁতিয়া রাখিয়াছেন, তারপর ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া সেই রক্তপিণ্ডকে জ্ঞান বিবেকসম্পন্ন অসংখ্য অসাধারণ গুণাবলীর আকররূপে শক্তিশালী সুশ্রী মানুষে পরিণত করিয়াছেন।

মানুষের মহারত্ন জ্ঞান সম্পর্কেও কোরআন সুস্পষ্ট ধারণা ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছে যে, আল্লাহ তাআলাই মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন। এই ব্যাপারেও আল্লাহর মহাশক্তিমত্তার উল্লেখপূর্বক বলা হইয়াছে– এই মহারত্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান আল্লাহ তাআলা মানুষকে দিয়াছেন নির্জীব লেখনীর মাধ্যমে। জগতের দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় লেখনীর মাধ্যমেই জন্মলাভ করিয়া প্রসারিত হয় এবং মানুষ তাহা আহরণ করে। তারপর আরও বলা হইয়াছে, বহু অজানা জ্ঞান আল্লাহ তাআলা মানবকে বিভিন্ন উপায়ে দান করিয়াছেন।

জ্ঞান দুই প্রকার ঃ (১) জাহেরী অর্থাৎ যেই জ্ঞানলব্ধ বিষয়বস্তু বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; যেমন জাগতিক দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ইত্যাদি। (২) বাতেনী অর্থাৎ যেই জ্ঞানলব্ধ বিষয়বস্তু বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; যেমন "হাকায়েক" তথা তত্ত্বজ্ঞান এবং "মাআরেফ" তথা আধ্যাত্মজ্ঞান। জাহেরী জ্ঞান সাধারণতঃ লেখনীলব্ধ, আর বাতেনী জ্ঞান মূলতঃ প্রত্যক্ষ সত্য দর্শন বা সত্যের সাক্ষাতলব্ধ কিন্তু বাহ্যিক উপকরণ বা বাহ্যিক চর্চার মাধ্যমে ইহার অধিক উন্মেষ হইতে পারে। এই উভয় প্রকার জ্ঞান মানুষের দুই পথে লাভ হইতে পারে– (১) লেখনী চর্চা, শিক্ষা ইত্যাদি কোন উপকরণ বা বাহনের মাধ্যমে; ইহাকে "এল্‌মে কসবী" বলা হয়। (২) কোন উপকরণ বা বাহনের মাধ্যম ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহর দান ও অনুগ্রহে; ইহাকে "ইল্‌মে লাদুন্নী" বলা হয়।

এখানে প্রথমে কলমের সাহায্যে জ্ঞান দানের উল্লেখপূর্বক এল্‌মে কসবীর ইঙ্গিত করিয়া বলা হইয়াছে, মানুষকে আল্লাহ তাআলা বহু অজানা জ্ঞান দান করিয়াছেন। অর্থাৎ উভয় পথের জ্ঞান তাহাকে দেওয়া হইয়াছে।

লক্ষ্য করুন! ওহী ও পবিত্র কোরআনের আরম্ভ উদ্বোধন (Opening) এবং প্রথম প্রকাশ (Beginning) কত মধুর! কত গুরুত্বপূর্ণ। কত সুন্দর! সব রকম উৎকর্ষ সাধন প্রণালী শিক্ষা দানে তাহা আরম্ভ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে– প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে আল্লাহর নামের সাহায্য সম্বল গ্রহণ করিবে; অর্থাৎ "বিসমিল্লাহ" বলিয়া আরম্ভ করিবে; যাহার অর্থ হইবে– হে আল্লাহ! আমি তোমারই সাহায্য কামনা করি, তোমারই প্রত্যাশা রাখি; তুমি সর্বশক্তিমান ভিন্ন অন্য কোন শক্তির প্রতি আমার প্রত্যাশা নাই– তুমি ত ধরা-ছোঁয়া এমনকি বর্তমান চোখে দেখারও ঊর্ধ্বে, তাই তোমার নামের উসিলায় তোমার সাহায্য কামনা করি।

এই আদর্শের ইঙ্গিতের পর সম্পূর্ণ কোরআন এই আদর্শের উপরই অবতীর্ণ হইয়াছে– কোরআনের প্রতিটি সূরার প্রারম্ভেই "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রারম্ভের আদর্শ সর্বাগ্রে ব্যক্ত হইতে হইবে, অতএব সর্বাগ্রে এই আয়াত নাযিল হওয়াই অতি সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে।*

এই আদর্শ অতি গুরুত্বপূর্ণ; ইহাতেই শেরকের ছিদ্রপথ বন্ধ হইবে, যাহা তওহীদ– একত্ববাদের প্রথম সোপান; যেই তওহীদের জন্যই ইসলাম, কোরআন ও রসূল। ইহারই সঙ্গে সঠিক ধারণা ও সত্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে সর্ব ঊর্ধ্বের দর্শন সম্পর্কে– (১) আল্লাহর পরিচয়, (২) নিখিল সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? (৩)

---

* "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম" পবিত্র কোরআনের একটি বিচ্ছিন্ন আয়াত, সূরার অংশবিশেষ নহে। প্রত্যেক সূরার আরম্ভেই তাহা বার বার শুভ আরম্ভরূপে অবতীর্ণ হইত। সূরা "ইকরা"–র প্রারম্ভে ইহা অবতীর্ণ হয় নাই বটে, কারণ তাহার দ্বারা প্রারম্ভের আদর্শ ত এই সূরায়ই ব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য পরে ঐ আদর্শের সামঞ্জস্যে এই সূরার শুভ প্রারম্ভেও "বিসমিল্লাহ" সংযোজিত হইয়াছে; ছাহাবীগণের যুগ হইতেই ইহা করা হইয়াছে। (যোরকানী, ১–২১২)

বিশেষতঃ মানুষের সৃষ্টি বৃত্তান্ত কি? (৪) মানুষের মূল বৈশিষ্ট্য জ্ঞান– যাহার দ্বারা মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরারূপে যাবতীয় জীব হইতে পৃথক উর্ধ্বের স্থান লাভ করিয়াছে; সেই জ্ঞানরত্ন কোথা হইতে লাভ হইয়াছে? এইসব তত্ত্বের রহস্য উদঘাটনই সকল দর্শনের সেরা দর্শন।

পবিত্র কোরআন তাহার প্রথম প্রকাশেই এই গুরুত্বপূর্ণ জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধান ঘোষণা করিয়াছে যে– এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে একজন সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা আছেন; তিনিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার ইঙ্গিতেই ইহা পরিচালিত হইতেছে। সমস্ত সৃষ্টি তাঁহার সৃষ্টিকর্ম হইতেই আসিয়াছে; মানুষকে তিনিই পয়দা করিয়াছেন; মানুষের বৈশিষ্ট্য জ্ঞানরত্ন তিনিই তাহাকে দান করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিকগণ এইসব প্রশ্নের উত্তর হাতড়াইয়া বিভিন্ন মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছে– তাহা সবই শুধু কল্পনা ও ধারণা তথা ধরিয়া নেওয়া; তাই ঐসব মতবাদে ভাঙ্গা গড়া হইয়াছে এবং হইবে। বিজ্ঞান আবিষ্কারের বহু পূর্বেই পবিত্র কোরআন এইসব প্রশ্নের সমাধানে সত্যের সন্ধান দান করিয়াছে– তাহাই পবিত্র কোরআনের প্রারম্ভ।

১৬৭৩। হাদীছ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে (তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন) যখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। নবুয়তপ্রাপ্তির পর তিনি তের বৎসর মক্কায় অবস্থান করিয়াছেল। অতপর আল্লাহর আদেশে মদীনায় হিজরত করিয়া আসেন এবং তথায় দশ বৎসরকাল অতিবাহিত করার পর ইহজগত ত্যাগ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ সপ্তাহের যেদিনে হযরত নবুয়তপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ছিল সোমবার দিন। ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। (একমাল ১–৩০)

এই সম্পর্কে মুসলিম শরীফে একখানা হাদীছও উল্লেখ আছে– হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সোমবারে নফল রোযা রাখিয়া থাকিতেন; সেই সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন, ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل على فيه - অর্থাৎ এই সোমবার দিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি এবং এই সোমবার দিন আমি নবুয়তপ্রাপ্ত হইয়াছি বা আমার উপর ওহী অবতরণ আরম্ভ হইয়াছে।

এই দিনটি কোন্ মাসের কোন্ তারিখ ছিল সে সম্পর্কে নবুয়তের ইতিহাস বর্ণনাকারীদের মতভেদ আছে। কাহারও মতে রবিউল আউয়াল মাসের ঐ তারিখে যেই তারিখে তাঁহার জন্ম ছিল। এই সূত্রে হযরতের নবুয়তপ্রাপ্তি সঠিকরূপে তাঁহার বয়সের চল্লিশ বৎসরের সময়েই ছিল; যেরূপ উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে নবুয়তপ্রাপ্তি নবীজীর বয়স চল্লিশ বৎসর পার হইয়া যাওয়ার পর রমযান মাসে ছিল। অনেকের মতে রমযান মাসের শেষ দশকের কোন রাত্রে ছিল যেই রাত্র "লাইলাতুল কদর"। এই সূত্রে নবুয়ত প্রাপ্তিকালে হযরতের বয়স চল্লিশ বৎসর ছয় মাস আরও কিছু বেশী দিন ছিল। পবিত্র কোরআনে ইহার ইঙ্গিত ও সমর্থন পাওয়া যায়– شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ "রমযান মাসে কোরআন অবতারিত হইয়াছে।" আর কোরআন অবতরণ হইতেই নবুয়তের আরম্ভ ছিল। এতদ্ভিন্ন এই সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের আরও মতামত বর্ণিত আছে।

প্রথম প্রকাশের পর

হেরা গুহায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) আল্লাহ তাআলার সদ্য অবতারিত কালাম প্রাপ্ত হইলেন; আল্লাহর প্রেরিত দূত নূরে পয়দা ফেরেশতা জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামের সাক্ষাত লাভ করিলেন। তারপর আর ওহী আসে না; জিব্রাঈল ফেরেশতার আনুষ্ঠানিক আগমন হয় না। ওহী বন্ধের এই বিরহ যাতনা নবীজীর জন্য কিরূপ হইয়া দাঁড়াইল তাহা ব্যক্ত করা ত সম্ভব নহে, তবে লক্ষ-কোটি ভাগের এক ভাগরূপে আংশিক

উপলব্ধি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে লাভ হইতে পারে।

রাজত্বের মোহে মুহ্যমান ব্যক্তি ইহা রাজত্ব লাভ করার পর রাজ্যহারা হইলে বা ধনের মায়া ও আকর্ষণে নিমজ্জমান ধনী ধনহারা হইয়া পড়িলে, সন্তানের মায়া মহব্বতে ব্যাকুল একটি মাত্র সন্তানের মা সন্তানহারা হইলে– এইসব ক্ষেত্রে প্রিয়হারা ব্যক্তি তাহার ক্ষণস্থায়ী প্রিয় বস্তু হারাইয়া যেরূপ মানসিক পীড়া ও যাতনায় পতিত হয়, আধ্যাত্মিক জগতে সাফল্য ও উন্নতিকামীগণ আল্লাহর নৈকট্য, আল্লাহর মারেফাত, আল্লাহর দেওয়া ঐ জগতের যত সম্পদ, তাহাতে বিন্দুমাত্র লাঘব দেখিলে তাঁহারা ঐ ক্ষণস্থায়ী প্রিয়হারাদের অপেক্ষা লক্ষ কোটি গুণ অধিক পীড়া ও যাতনায় পতিত থাকেন। দার্শনিক রুমী (রঃ) বলেন–

گر زباغ دل خلالے کم بود - بر دل سالك هزاران غم بود

অর্থ ঃ "সালেকের অন্তর বাগানে একটি তৃণেরও যদি লাঘব ঘটে তবে তাঁহার অন্তরে হাজার হাজার ব্যাকুলতার ঢেউ খেলিতে থাকে।"

আধ্যাত্মিক জগতের ছোট্ট শিশু, যে সবেমাত্র ঐ পথে হাঁটা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকে সূফীবাদের পরিভাষায় "সালেক" বলা হয়। আধ্যাত্মিক জগতে এই শিশু সালেকের তুলনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শ্রেণী ও স্থান কত ঊর্ধ্বে তাহা সহজেই অনুমেয় এবং সেই পরিমাণেই ঐরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যাকুলতার পরিমাপ হইবে।

তদুপরি আলোচ্য ক্ষেত্রে নবীজী মোস্তফা (সঃ) আধ্যাত্মিক জগতের তৃণহারা হইয়াছিলেন না, বরং মহা রত্নহারা হইয়াছিলেন; চির বাঞ্ছিত বস্তু পাইয়া তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত মনে করিতেছিলেন। ওহী তথা আল্লাহর বাণী প্রাপ্তির সময় আল্লাহর সঙ্গে যেই দৃঢ় নিকটবর্তী যোগ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য সান্নিধ্যের যে স্বাদ লাভ হয় তাহা অতুলনীয়। অতএব তাঁহার ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ছিল বর্ণনাতীত। ওহীর বিরহ যাতনা নবীজীর জন্য কোন কোন সময় অসহনীয় হইয়া উঠিত; পর্বতশৃঙ্গ হইতে নিজেকে ফেলিয়া দিয়া ইহলোক ত্যাগ করার ন্যায় উত্তেজনা পর্যন্ত তাঁহার মধ্যে সৃষ্টি হইতে চাহিত।* এইরূপ মুহূর্তে জিব্রাঈল (আঃ) আত্মপ্রকাশ করিতেন এবং আশার ইঙ্গিতদানে সান্ত্বনা বাণী শুনাইতেন–

يا محمد انك رسول الله حقا -

"হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় আপনি আল্লাহ তাআলার বরহক রসূল।" অর্থাৎ আপনি বিচলিত হইবেন না, আপনার হারানিধি আপনার নিকট আসিবেই। জিব্রাঈলকে দেখিলে এবং ঐ বাণী শুনিলে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তর অগ্নিতে কিছুটা পানির ছিটা পড়িত। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দৌলত আল্লাহ তাআলার বাণী পুনঃ না পাওয়ায় যে ব্যাকুলতা ছিল তাহা বিদূরিত হইত না।

এতদ্ভিন্ন রত্নহারা মানুষের অন্তরে কতই না সংশয়ের সৃষ্টি হয়। কত ধারণারই না জন্ম হয়! সত্য প্রবাদ–

---

* **সমালোচনাঃ** ওহীর বিচ্ছেদে নবীজী (সঃ)-এর বিরহ যাতনায় সৃষ্ট এই শ্রেণীর ত্রাস ও উত্তেজনাকে "মোস্তফা-চরিত" গ্রন্থে অস্বীকার করা হইয়াছে, অথচ তথায়ই এই বর্ণনার প্রমাণও উল্লেখ রহিয়াছে। সনদের মারপেঁচে ফেলিয়া প্রমাণটাকে খণ্ডন করা হইয়াছে। জানি না এই বর্ণনায় খাঁ সাহেবের গাত্রদাহ কেন জন্মিল? তবে তাঁহার ত চিরাচরিত স্বভাব– পাণ্ডিত্য ত তাঁহার আছেই; তিনি কোন বর্ণনাকে এন্‌কার করার ইচ্ছা করিলে অতি বক্র ভাষায় ব্যক্ত করেন, যেন পাঠক নিজেই তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে; যেমন আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনায় তিনি বলেন– "তিনি (নবীজী) মধ্যে মধ্যে পর্বত শিখর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন? (পৃষ্ঠা–২৬৫) বিবরণ, উদ্ধৃতির কি জঘন্য ভঙ্গি! খাঁ সাহেবের এই বিবরণ ভঙ্গিতে মনে হয় তিনি বলিতে চাহেন– আত্মহত্যা মহাপাপ, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসছল্লাম তাহার সংকল্প কিরূপে করিতে পারেন?

এই প্রশ্ন নিতান্তই দুর্বল। কারণ, ইহা ত আভ্যন্তরীণ মনোবেদনা ও বিরহ জ্বালায় মনের ক্ষোভ প্রকাশ করা মাত্র; কার্যে বাস্তবায়িত করার দৃঢ় সংকল্প করিয়া নেওয়া মোটেই উদ্দেশ্য নহে। যেমন হাদীছে আছে– নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, "যাহারা নামাযের জামাতে উপস্থিত হয় না, আমার ইচ্ছা হয় তাহাদেরকে গৃহে রাখিয়া আগুন লাগাইয়া দেই।" অথচ এইরূপ করা কি মহাপাপ নহে? এরূপ ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্যের মাসআলার অবতারণা নিছক বোকামি। ক্রোধে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি বলে– "মন চায়, তোকে কাঁচা মরিচের ন্যায় চিবাইয়া খাইয়া ফেলি।" এক্ষেত্রে কি প্রশ্ন হইবে যে, মানুষের গোশত হারাম, পেটে মল-মূত্র; কিরূপে চিবাইয়া খাইবেন?

عشق است هزار بد گمانی "ভালবাসা হাজার হাজার দ্বিধা সংশয়ের কারণ।" প্রাণপ্রিয় ওহী হারাইয়া নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর অন্তরে কত শত সংশয় ও আতঙ্কেরই না সৃষ্টি হইতেছিল! এমনকি এইরূপ আতঙ্কের ভাব সৃষ্টিও বিচিত্র ছিল না যে, প্রভু কি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন? আমার প্রতি তিনি কি বিরাগী হইয়া গেলেন?

শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ (রঃ) ফাওয়ায়েদে কোরআনে তফসীর ইবনে কাসীরের বরাত দানে লিখিয়াছেন– নবীজীর নবুয়ত প্রাপ্তির সংবাদ যাহারা শত্রুতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল, ঐ শ্রেণীর শত্রুরা এই সুযোগে নবীজীর কাঁটা ঘায়ে লেবুর রস দেওয়ার ন্যায় কটাক্ষ করিয়া থাকিত, উপহাস করিত– "মুহাম্মদের প্রভু তাহার প্রতি রাগ করিয়াছেন, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।" মনো ব্যথার প্রতিক্রিয়ায় নবীজীর দেহেও অবসাদ ছিল, তাই রাত্রের এবাদতে তিনি কতেক দিন জাগ্রত হন নাই; ইহা লক্ষ্য করিয়া এক হতভাগিনী শত্রুও ঐরূপ কটাক্ষপাত ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উক্তি করিয়া বেড়াইত।

এরই মধ্যে আর কেটি ছোট্ট সূরা নাযিল হইয়া নবীজীর ব্যথিত হৃদয়ে মহাপ্রলেপের ক্রিয়া করিল এবং তাঁহার ভাঙ্গা বুককে শক্তিশালী করিয়া তুলিল।

وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى - وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى - وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى - اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى - وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى - وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنٰى -

দীপ্ত প্রভাত ও গভীর রজনীর শপথ– আপনার প্রভু আপনাকে ত্যাগ করেন নাই, আপনার প্রতি বিরাগীও হন নাই। আপনার ভবিষ্যত অতীত অপেক্ষা নিশ্চয় অনেক উজ্জ্বল। আপনার প্রভু আপনার প্রতি মহাদানে অবশ্যই আপনাকে সন্তুষ্ট করিবেন। আপনি কি ছিলেন না এতীম; সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়াছেন? মহাজ্ঞান ও মহাসত্যের অবগতি আপনার ছিল না– তাহার সন্ধানে আপনি ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছিলেন, তিনি আপনাকে মহাজ্ঞান মহাসত্যের পথ দান করিয়াছেন। আপনি ছিলেন নিঃস্ব তিনি আপনাকে ধনাঢ্য করিয়াছেন।

দীপ্ত প্রভাত গভীর রজনীর উল্লেখ এই ক্ষেত্রে কতই না সুসামঞ্জস্যপূর্ণ! আলোর পরে অন্ধকার, দিনের পরে রাত্রি, ইহা স্বভাব– সৃষ্টির ধারা ও নীতি; ইহা দ্বারা সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির বিচার ও সিদ্ধান্ত নেওয়া ভুল। রাত্রির অন্ধকার আসিলে কি বলা হইবে, প্রভু বিশ্ববাসীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন? শান্তির অবলম্বন নিদ্রার জন্য কি রাত্রি ও অন্ধকার বড় নেয়ামত নহে? জোয়ারের পরে কি ভাঁটা আসে না? ভাটার পরে কি জোয়ার আসে না? আপনার এই ভাঁটা মহাজোয়ারের পূর্বাভাস। বর্তমানে সাময়িক অন্ধকারদৃষ্টে আপনি মোটেই মন ভাঙ্গিবেন না; অতীতে আপনার জীবনের কত অন্ধকারে প্রভু আপনাকে আলো দান করিয়াছেন! এতিমীর অন্ধকারে আশ্রয়ের আলো দিয়াছেন, উর্দ্ধ জ্ঞানর ও সত্যের পিপাসায় ব্যাকুলতার অন্ধকারে মহাসত্যের আলো দান করিয়াছেন, দারিদ্র্যের অন্ধকারে অভাব মুক্তির আলো দিয়াছেন। তদ্রূপই বর্তমানের প্রিয় হারার অতি সাময়িক অন্ধকারের পরেই দীপ্ত প্রভাতের আশা লইয়া অগ্রসর হউন– ভয় নাই, আশঙ্কা নাই; আপনার সাফল্য সুনিশ্চিত।*

এরপর আর ভীতি কি? কুণ্ঠা কী? নবীজী মোস্তফা (সঃ) উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎস পাইয়াছেন; আর কোন বাধা-বিঘ্ন, অত্যাচার-উৎপীড়ন তাঁহাকে দমাইতে পারে কি? এই সূরার বিবরণধারাই পাঠককে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেয়।

সত্য প্রচারের আদেশ

দীর্ঘ চল্লিশ দিন বা ছয় মাস, কাহারও মতে আরও অধিক দিন অতিবাহিত হইল; নূতন কোন বাণী আসে

* সূরা ওয়ায্যোহার অবতরণ যে"ফাত্‌রাত" তথা সাময়িক ওহী বন্ধের উপলক্ষে ও সংলগ্নে ছিল– ইহা মাওলানা শাব্বীর আহমদ (রঃ)-ও তাঁহার ফাওয়ায়েদে কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন।

না, জিব্রাঈল ফেরেশতার আনুষ্ঠানিক আগমন এবং সাক্ষাত হয় না। তাই নবীজী (সঃ) ব্যাকুলতার মধ্যে কালাতিপাত করিতেছেন। অবশেষে তিনি সেই হেরা গুহায় যাইয়া দিবা-নিশি অবস্থান করিতে লাগিলেন; হযরত ভাবিলেন, যেস্থানে একবার প্রাণপ্রিয় বিষয় লাভ হইয়াছিল, তথায়ই ধরণা পাতিয়া থাকি। সেমতে দীর্ঘ এক মাসের এতেকাফের নিয়তে তিনি তথায় থাকিলেন। এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর গৃহাভিমুখে আসিতেছেন। স্বয়ং নবীজীর বর্ণনা– হেরা পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া তাহার পদস্থ নিম্নভূমি অতিক্রম কালে মধ্যবর্তী স্থানে আসিলে পর আমি একটা আহ্বান শুনিতে পাইলাম। ডানে-বামে, সম্মুখে-পিছনে তাকাইলাম, কোন কিছু দেখিলাম না। অতপর উপর দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, পূর্ব পরিচিত সেই ফেরেশতা জিব্রাঈল, যিনি হেরা গুহায় প্রথম বার আল্লাহর বাণী নিয়া আসিয়াছিলেন– তিনি আমার দৃষ্টিগোচরে উদ্ভাসিত। অবশ্য সেই আকৃতিতে নহেন; তাঁহার ব্যক্তিগত আসল আকৃতিতে বিরাট অপেক্ষা বিরাট তাঁহার আকৃতি, সবুজ রং ভেলবেট বা মখমলরূপে ছয় শত ডানাবিশিষ্ট– তিনি কুর্সির উপর আকাশ প্রান্তে এক আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার আকৃতি এত বিরাট যে, আসমান যমীনের মধবর্তী সমগ্র প্রান্তকে পরিপূর্ণ করিয়া আছেন।

হযরত নবী (সঃ) জিব্রাঈল (আঃ)-কে এই আকৃতিতে সারা জীবনে দুই বার দেখিয়াছেন, দ্বিতীয় বার মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে সপ্তম আসমানের উপর সেদ্‌রাতুল মোন্তাহার নিকট– যাহার আলোচনা পবিত্র কোরআন সূরা নাজমে রহিয়াছে। ঐ সময় নবীজী মোস্তফা (সঃ) স্বীয় শক্তি সামর্থ্যে পাকা-পোক্ত হইয়াছিলেন। তদুপরি মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে বক্ষ বিদীর্ণের দ্বারা বেহেশতী পরিপুষ্টিকর বস্তুতে তাঁহাকে অধিক শক্তিমান করিয়া তোলা হইয়াছিল। আলোচ্য ঘটনায় নবুয়তের প্রারম্ভ, দীর্ঘ দিন হইতে বিরহ যাতনার বিহ্বলতায় ভুগিতেছেন, দীর্ঘ এক মাস পর্বত গুহায় কাটাইয়া সবেমাত্র বাহিরে আসিয়াছেন; এমতাবস্থায় মানবীয় দেহের উপর চর্ম চোখের দৃষ্টিতে অতি অস্বাভাবিক বস্তু দর্শনের প্রতিক্রিয়া তিনি সামলাইতে পারিলেন না। নবীজী (সঃ) ঐ দৈব দেহীকে চিনিতে পারেন নাই তাহা নহে; তিনি নিজেই বর্ণনা দিয়াছেন, ঊর্ধ্ব দিকে দৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে হেরা গুহার সেই পূর্ব পরিচিত ফেরেশতাকে দেখিতে পাইলাম। (প্রথম খণ্ড ৪ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য) এতদসত্ত্বেও হযরত (সঃ) বলেন, আমি চমকিত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। ঐ অবস্থায় জিব্রাঈল মানুষবেশে নিকটে আসিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। তথা হইতে উঠিয়া বাড়ী আসিলাম, তখনও সেই চমকের শিহরণ আমার উপর ছিল, তাই গৃহবাসীদেরকে আমি বলিলাম– دثرونى دثرونى وصبوا على ماء باردا "আমাকে চাদর মুড়িয়া দাও, আমাকে চাদর মুড়িয়া দাও এবং আমার উপর ঠাণ্ডা পানি ঢাল।" তাহারা আমাকে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করাইয়া দিল এবং চাদর মুড়িয়া দিল। সেই অবস্থাতেই জিব্রাঈল ফেরেশতা ওহী নিয়া আসিলেন–

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَاَنْذِرْ ـ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ـ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ـ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ـ وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ ـ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ـ

অর্থ ঃ "হে চাদর মুড়ি দেওয়া! উঠ; (চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকার সময় নহে; এখন উঠ) এবং বিশ্ববাসীকে সতর্ক কর, নিজ প্রভু-পরওয়ারদেগারের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা কর, নিজের বাহির-ভিতরকে পবিত্র রাখ, ভিতর-বাহিরের সমস্ত দেবদেবীকে পরিহার করার উপর দৃঢ় থাক। উপকার করিয়া অধিকতর প্রত্যুপকার প্রাপ্তির ইচ্ছা ও আশা পোষণ করিও না। (নবীজীর দায়িত্বের পথে ইহা মহা উপদেশ। কোরআনের বয়ান– সকল নবীগণই বলিতেন, দায়িত্ববোধেই দায়িত্ব পালন; তোমাদের হইতে কিছু পাইতে চাই না। দায়িত্বের বোঝা উঠাইবার প্রারম্ভেই এই উপদেশ।) স্বীয় প্রভুর কৃতজ্ঞতায় (তাঁহার পথে) ধৈর্যাবলম্বন করিও।"

সমস্ত যোগাড়-আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে, জ্ঞান সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছে; আজ হইতে মহাপুরুষের কর্ম সাধনা আরম্ভ হইবে। মৌন ভাবুক, ধ্যানগম্ভীর মহাত্মাকে কর্তব্য পালনে দৃঢ়তার সহিত কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের আদেশ আসিল। ইহা পবিত্র কোরআনের দ্বিতীয় প্রকাশ– কত সুন্দর! কত আবেগময়ী! কিরূপ মধুর স্বরে বিপ্লবে ঝাঁপাইয়া পড়ার আহ্বান!

প্রথমে জড়তা পরিহারে সংগ্রামী পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হইল; সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য কর্মের প্রকৃত স্বরূপ এবং মূল বিষয়বস্তু স্পষ্টতঃ বলিয়া দেওয়া হইল– বিশ্ব বুকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহই শ্রেষ্ঠ, আল্লাহই বড়, সর্বক্ষেত্রে ইহার বিকাশ সাধন করিতে হইবে, ইহাই হইল ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম জাতীয়তার একমাত্র স্মারক– "আল্লাহু আকবার" আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম মহত্তম বিরাটতম। প্রতিটি মুসলমান জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এই আল্লাহু আকবারেই আবেষ্টিত। জন্মঘরে শিশুর কর্ণকুহরে সর্বপ্রথম এই ধ্বনিই প্রবেশ করে, প্রতিদিন দিবারাত্রে পাঁচবার মুসলিম জাতির সর্বত্রই এই ধ্বনি বারংবার গর্জিত হয় এবং ঈদে, আনন্দ-উৎসবে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। সর্বশেষে প্রতিটি মুসলমানকে এই ধরণী হইতে চিরবিদায় দানকালে জানাযার নামাযে তাহার প্রতি আল্লাহু আকবারের চারিটি ধ্বনি দিয়া সমাহিত করা হয়। মুসলিম জীবনের সহিত আল্লাহু আকবার– আল্লাহর মহত্ত্ব বড়ত্বের ধ্বনি এমনিভাবে ওতপ্রোতরূপে বিজড়িত। আলোচ্য আয়াতে সেই আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়ত্বই প্রতিষ্ঠার আদেশ করা হইয়াছে।

নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে বিশ্ব নেতৃত্বের পটভূমিতে দাঁড় করান হইতেছে, তাই নেতৃত্ব পদের জন্য যাহা বিশেষ প্রয়োজন তাহারও আদেশ এস্থলে করা হইয়াছে। নেতৃত্বের পদে যিনি ব্রতী হইবেন সর্বপ্রথমে সকল প্রকার কলুষ হইতে তাঁহাকে আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে, দৈহিক এবং মানসিক সর্বপ্রকার বিকার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইবে এবং সাধনার পথে পর্বতের ন্যায় অটল, আকাশের ন্যায় বিশাল হৃদয় লইয়া দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। এইসব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে এই ছোট ছোট আয়াত কয়টিতে। নবীজীর জন্য ইসলামের কর্ম ময়দানে যাত্রার প্রাক্কালে এই নির্দেশসমূহ কতই না সুন্দর! কতই না শ্রেয়!!

তারপর ঘন ঘন ওহীর আগমন হইতে থাকিল, কোরআন শরীফের আয়াতও নাযিল হইত এবং শরীয়তের হুকুম-আহকামও নাযিল হইত। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ত নবুয়ত প্রাপ্তির দশ বৎসর পর মে'রাজ শরীফে ফরয হইয়াছে। তাহার পূর্বে এই প্রথম অবস্থায় সকাল-বিকালের দুই ওয়াক্ত নামায ফরয হইয়াছিল।

সর্বপ্রথম ফরয– নামায

একদা জিব্রাঈল (আঃ) নবী (সঃ)-কে এক পাহাড়ের আড়ালে নিয়া গেলেন এবং পায়ের গোড়ালি দ্বারা যমীনে আঘাত করিলেন, তাহাতে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হইল। জিব্রাঈল (আঃ) স্বয়ং অযূ করিয়া নবী (সঃ)-কে অযূ শিক্ষা দিলেন। অতপর জিব্রাঈল (আঃ) ইমাম হইয়া দুই রাকআাত নামায পড়াইলেন। নবী (সঃ) মোক্তাদী হইয়া নামাযে শরীক হইলেন এবং নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা করিলেন। তথা হইতে নবীজী (সঃ) বাড়ী আসিয়া বিবি খাদীজা (রাঃ)-কে এবং যে কতিপয় লোক মুসলমান হইয়াছিলেন সকলকে অযূ এবং নামায শিক্ষা দিলেন। সকলেই পাহাড়-পর্বতের আড়ালে গোপনে লুকাইয়া লুকাইয়া নামায পড়িতেন। প্রথমে শুধু সকাল-বিকাল দুই ওয়াক্ত দুই দুই রাকাতের নামাযই ফরয ছিল, তারপর সূরা মোযযাম্মেল নাযিল হইয়া তাহাজ্জুদ নামাযেরও আদেশ হয়– اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ "দিনের দুই দিকে এবং রাত্রের অংশে নামায আদায় করিবে।" (সীরাতে মোস্তফা, ১-১১৪)

একদা নবী (সঃ) আলী (রাঃ)-সহ গোপনে এক জায়গায় নামায পড়িতেছিলেন। হযরতের চাচা– আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা আবু তালেব হঠাৎ তথায় পৌঁছিলেন। নামায শেষে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি করিলে? নবীজী (সঃ) বলিলেন, আল্লাহ পাক আমাকে তাঁহার রসূল বানাইয়াছেন, মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার এক বিশেষ এবাদত ফরয করিয়াছেন– ইহা সেই এবাদত চাচাজান! আপনিও এই ধর্ম গ্রহণ করুন। আবু তালেব বলিলেন, বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করা ত সম্ভব নহে তবে তোমরা তোমাদের কাজ চালাইয়া যাও; সর্বদা আমার সাহায্য তোমাদের পক্ষে থাকিবে। আলী (রাঃ)-কেও অভয় দিলেন। (আসাহ্হুস সিয়ার–৭১)

পবিত্র কোরআনে এই বিশেষ ওহীতে যে আদেশ ছিল, قُمْ فَأَنْذِرْ "উঠুন! সতর্ক করুন।" এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নবীজী (সঃ) ইসলামের প্রচার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অতি গোপনে। নবীজী (সঃ) তাঁহার কর্তব্য লইয়া প্রথম দাঁড়াইলেন; যে পয়গাম তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে মানুষের প্রাণের দুয়ারে তাহা পৌঁছাইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। এই শুভ যাত্রায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) আপন সহধর্মিণী বিবি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার পূর্ণ সমর্থন-সহায়তা লাভ করিলেন।

সর্বপ্রথম মুসলমান বিবি খাদীজা (রাঃ)

বিবি খাদীজা (রাঃ) ইসলামের সূর্যোদয়ের প্রথম প্রভাতেই নবীজীর প্রতি ঈমান আনিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল। খাদীজা (রাঃ) অপেক্ষা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বেশী চিনিতে পারে কে? কে তাঁহার ভিতর-বাহির এমন সুন্দরভাবে দেখিতে পারিয়াছে। তিনি ত তাঁহার জীবন সঙ্গিনী।

১। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রথম জীবনের সুনাম-সুখ্যাতিতে বিবি খাদীজা (রাঃ) পূর্ব হইতেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

২। সিরিয়ার বাণিজ্য সফরে বিবি খাদীজার ক্রীতদাস মায়সারা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনেক অলৌকিক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করিয়াছিল।

৩। দীর্ঘ পনর বৎসরকাল নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবন সঙ্গিনী থাকিয়া খাদীজা (রাঃ) তাঁহার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

৪। হেরা গুহার সমস্ত ঘটনা নবীজী (সঃ) বিবি খাদীজাকে খুলিয়া বলিয়াছিলেন।

৫। অবশেষে বিবি খাদীজার মুরব্বী সৎ-সাধু অভিজ্ঞ আলেম ওয়ারাকার স্পষ্ট সাক্ষ্য ও উক্তি বিবি খাদীজার সম্মুখেই ছিল।

এইসব কারণে অতি সহজেই বিবি খাদীজা (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া নিলেন; ইহাতে স্বাভাবিকভাবেই নবীজীর মনোবল বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাই ইসলামের জয়যাত্রার পথে বিবি খাদীজার দান ও নৈতিক সহযোগিতার মূল্য ছিল অনেক বেশী। চারিপার্শ্বে সংশয়, ভয়-ভীতি ও নিরাশার অন্ধকার– কোথাও কোন বন্ধু নাই, সহায় নাই; এই সময় সত্যের অভিযানের প্রথম পদক্ষেপেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) নিজ স্ত্রীকে আপন দোসররূপে পাইলেন– ইহা নবীজীর জন্য এক বিরাট সাফল্য ছিল।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) যে সত্য পয়গম্বর, তিনি যে তাঁহার বর্ণনা ও দাবীতে অকপট সত্যবাদী মিথ্যাবাদী নন, কৃত্রিম নন ইহারও সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে বিবি খাদীজার ইসলাম গ্রহণে। স্বামীর মধ্যে কোন শঠতা বা ভণ্ডামি থাকিলে স্বীয় গৃহিণীর কাছে তাহা গোপন থাকিতে পারে না; তাই কোন মানুষের সততার পক্ষে তাহার স্ত্রীর সাক্ষ্য সর্বপ্রকার সাক্ষ্যের ঊর্ধ্বে বিবেচিত হয়। ইসলামের কঠিন দিনে বিবি খাদীজার এই ভূমিকা নারী জাতির জন্য বিশেষ গৌরবই বটে।

দ্বিতীয় মুসলমান আলী (রাঃ)

নবীজীর চাচা ছিলেন আবু তালেব। আবু তালেবের আয় অপেক্ষা ব্যয় ছিল বেশী। তাঁহার পরিবারে লোক সংখ্যা বেশী। নবীজী (সঃ) খাদীজা (রাঃ)-কে শাদী করার পর দৈন্যমুক্ত হইয়াছিলেন, আবু তালেবের সাহায্যার্থে তাঁহার পুত্র আলীকে নবীজী (সঃ) নিজ প্রতিপালনে নিয়া আসিলেন, আলী (রাঃ) নবীজীর ব্যয় বহনে এবং তাঁহার গৃহেই থাকিতেন।

একদা নবীজী (সঃ) বিবি খাদীজা (রাঃ)-সহ নামায পড়িতেছেন, তখন আলীর বয়স দশ-বার বৎসর; আলী (রাঃ) নবীজী (সঃ)-কে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, ইহা আল্লাহর দ্বীনের কাজ; পয়গম্বরগণ সকলেই আল্লাহর দ্বীন লইয়া দুনিয়াতে আগমন করিয়াছিলেন। আমি তোমাকে এই

দ্বীন গ্রহণের আহ্বান জানাই; তুমি লাত ওজ্জা দেব-দেবীকে বর্জন কর। আলী (রাঃ) বলিলেন, ইহাতে সম্পূর্ণ নূতন কথা। আব্বাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি কিছু বলিতে পারি না। এই কথায় নবীজী (সঃ) বিব্রত হইলেন যে, সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ফাস হইয়া যাইবে, তাই তিনি আলী (রাঃ)-কে বলিলেন, হে আলী! তুমি যদি গ্রহণ নাও কর তবুও তুমি কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করিও না। আলী (রাঃ) তখন চুপ থাকিলেন; রাত্র অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলীর অন্তরের পরিবর্তন ঘটিল; প্রভাত হইতেই আলী (রাঃ) নবীজীর সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কিসের আহ্বান করিয়া থাকেন? নবীজী (সঃ) বলিলেন, এই স্বীকৃতি করিতে হইবে যে, আল্লাহ এক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং লাত-ওজ্জা ইত্যাদি দেব-দেবীকে বর্জন করিতে হইবে, মূর্তিপূজাকে চিরতরে ঘৃণা ও পরিহার করিতে হইবে। আলী (রাঃ) তৎক্ষণাত ইসলাম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত তিনি তাঁহার ইসলাম গোপন রাখিলেন।

তৃতীয় মুসলমান যায়েদ (রাঃ)

নবীজীর গৃহ খাদেম যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)– নবীজী (সঃ) তাঁহাকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সদা নবীজীর নিকটেই থাকিতেন। আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণও নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সত্যতার বিশেষ প্রমাণ ছিল। কারণ স্ত্রীর ন্যায় গৃহভৃত্যের নিকটও আসল রূপ লুক্কায়িত থাকে না।

চতুর্থ মুসলমান আবু বকর (রাঃ)

নবীজীর গৃহবাসী সকলে ঈমান গ্রহণ করিলে পর নবীজী (সঃ) নিজ বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও ইসলামের প্রচার চালাইলেন, কিন্তু গোপনে গোপনে। এই প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

আবু বকরের ইসলাম গ্রহণ নবীজীর (সঃ) সাফল্যের এক বিরাট অধ্যায় ছিল। কারণ ইতিপূর্বে যাঁহারা মুসলমান হইয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন নবীজীরই করতলগত লোকগণ; তদুপরি তাঁহাদের ইসলামের বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। একজন মহিলা, অপরজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, আর একজন ত ক্রীতদাস গৃহভৃত্য। এতদ্ভিন্ন মহিলা ও গৃহভৃত্যের ত বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক কম ছিল, আর আলী (রাঃ) ত তখনও ইসলাম প্রকাশ করিয়াছিলেন না।

এইসব দিক দিয়া আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবু বকর (রাঃ) বেশী বয়সের ছিলেন, এমনকি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রায় সমবয়স্ক– মাত্র দুই বৎসরের ছোটছিলেন। ধন-জন মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়া গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একজন পরিগণিত ছিলেন এবং সৎ-সাধু সুচরিত্রে স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন।

বিবি খাদীজার ভাইপো হাকীম ইবনে হেযামের নিকট একদা আবু বকর বসিয়াছিলেন; ঐ সময় হাকীমের ক্রীতদাসী আসিয়া বলিল, আপনার ফুফু আম্মা খাদীজা বলেন, তাঁহার স্বামী মূসা (আঃ) পয়গম্বরের ন্যায় পয়গম্বরী লাভ করিয়াছেন। এতদশ্রবণে আবু বকর (রাঃ) তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন এবং দৌড়িয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। নবী (সঃ) তাঁহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলে তিনি তৎক্ষণাত ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এইরূপে শুনিবামাত্র বিনাদ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া নেওয়া ঐ সময় অতি বিরল ও বিচিত্র ছিল; তাই তিনি "সিদ্দীক" –অতিশয় বিশ্বাসী আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলিয়াছিলেন, আমি যেকোন ব্যক্তিকে ইসলামের আহ্বান জানাইয়াছি প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দ্বিধা প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু আবু বকর ইসলামের আহ্বান শুনামাত্রই বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সম্মুখে তাঁহার ইসলাম প্রকাশ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং নবী (সঃ) হইতে শত্রুদের অত্যাচারও যথাসাধ্য নিবারণ করার চেষ্টায় ব্রতী থাকিতেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণে মক্কায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তাই তিনি সাধারণ্যে সর্বপ্রথম মুসলমানরূপে প্রসিদ্ধ; তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কাহারও ইসলাম সম্পর্কে কেহ কোন খোঁজ রাখিত না।

১৬৭৪। হাদীছ ঃ হাম্মাম (রঃ) বলিয়াছেন, আম্মার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে প্রথম এরূপ অবস্থায় দেখিয়াছি যে, তাঁহার সঙ্গে মাত্র পাঁচ জন ক্রীতদাস, দুই জন মহিলা আর আবু বকর (রাঃ) ছিলেন। (পৃষ্ঠা-৫১৬)

ব্যাখ্যা ঃ পাঁচ জন ক্রীতদাস হইলেন, যায়েদ, বেলাল, আমের ইবনে ফোহায়রা, আবু ফোকায়হা এবং আম্মার রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম। আর মহিলাদ্বয় হইলেন খাদীজা এবং আম্মারের মাতা- সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা।

যায়েদ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ক্রীতদাস ছিলেন; তাঁহাকে মুক্ত করিয়া নবী (সঃ) স্বীয় পোষ্যপুত্র বানাইয়া ছিলেন। বেলাল (রাঃ) মক্কার এক সর্দার উমাইয়া ইবনে খলফের ক্রীতদাস ছিলেন; ইসলাম গ্রহণের কারণে বেলাল (রাঃ) ভীষণ অত্যাচারিত হইতে ছিলেন, তাই আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিয়া ছিলেন। আমের (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ক্রীতদাস ছিলেন। উক্ত সাত জনের দুই জন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পূর্বে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আলী (রাঃ)ও মুসলমান হইয়াছিলেন, কিন্তু গোপনে।

আবু বকর (রাঃ) মুসলমান হইয়া গোপনে গোপনে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আহ্বানে ওসমান, যোবায়ের, আবদুর রহমান, ইবনে আওফ, তাল্‌হা এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইলেন; সকলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এই পাঁচ জন সকলেই মক্কার বিশিষ্ট শ্রেণীর লোক ছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ১-১১৯)

এইরূপে ধীরে ধীরে অতি মন্থর গতিতে হইলেও ইসলামের কাজ সম্মুখপানে অগ্রসর হইতে লাগিল। নবীজীর কার্যকলাপ নিতান্তই বিক্ষিপ্ত আকারে চলিতেছিল; যথায় তথায় সুযোগপ্রাপ্তে তিনি গোপনে ইসলাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। এই সময়ের মধ্যেই অষ্টম বা দশম সংখ্যায় আরকাম (রাঃ) মুসলমান হইলেন; তাঁহার বাড়ী ছিল সাফা পর্বতের পাদদেশে। মুসলমানগণের পরামর্শে স্থির হইল যে, নবী (সঃ) আরকাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে বসিবেন; মুসলমানগণ লুকাইয়া লুকাইয়া তথায় একত্রিত হইবেন; নবী (সঃ) হইতে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করিবেন, আর সকলে পরামর্শ করিয়া পরিকল্পিতভাবে কাজ চালাইবেন। তখন হইতে নবী (সঃ) "দারে আরকাম" আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে* নিয়মিত বসিতেন এবং মুসলমানগণ গোপনে তথায় একত্রিত হইতেন; ইসলামের শিক্ষা লাভ করিতেন এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেন।

নবুয়তের তৃতীয় বৎসর- প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

দীর্ঘ তিন বৎসরকাল ইসলামের কার্যকলাপ মক্কা নগরীর সীমার মধ্যে গোপনে গোপনে চলিল। নবুয়তের তৃতীয় বৎসরের শেষের দিকে পবিত্র কোরআনের দুই সূরার দুইটি আয়াত নাযিল হইল- যাহাতে আল্লাহ

* ১৯৫০ ইং সনের হজ্জে এই গৃহ যেয়ারতের সৌভাগ্য হইয়াছি; এখন গৃহটির স্থান হরম শরীফের আওতায় আসিয়া গিয়াছে- গৃহের চিহ্নও নাই!

তাআলা হযরত (সঃ)-কে প্রকাশ্যে সুস্পষ্টরূপে ইসলামের আহ্বান ব্যাপকভাবে প্রচার করার নির্দেশ দান করিলেন।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ - اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ -

অর্থ ঃ "বিশ্ববাসীকে যাহা পৌঁছাইবার জন্য আপনাকে আদেশ করা হইয়াছে আপনি তাহা সর্বসমক্ষে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ্যে প্রচার করুন; মোশরেকদের কোন পরোয়া করিবেন না। উপহাসকারীদের মোকাবিলায় আপনার পক্ষে আমিই যথেষ্ট হইব।" (পারা-১৪; রুকু-৬)

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ -

"আপনি (ইসলামের প্রকাশ্য প্রচার আরম্ভ করিতে যাইয়া প্রথমতঃ) আপনার নিকটতম জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে (আল্লাহর আযাব হইতে)। সতর্ক করুন।" (পারা-১৯, রুকু-১৫)

এই নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বিশেষ ব্যবস্থাপনার সহিত স্বীয় আত্মীয় স্বজনসহ মক্কার সকল প্রধানগণকে তওহীদ ও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইবার চেষ্টায় লাগিয়া গেলেন।

এই উদ্দেশে নিকট আত্মীয়গণকে একত্র করার জন্য একদিন নবীজী (সঃ) নিজ গৃহে দাওয়াতের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি আলী (রাঃ)কে বলিলেন, এক ছা'- প্রায় চারি সের আটা, বকরীর একটি সম্মুখ রান এবং সাধারণ এক পেয়ালা দুধ যোগাড় কর। অতপর আত্মীয় স্বজনসহ কোরায়শদলপতিদিগকে দাওয়াত প্রদান করিলেন। আবু তালেব, হামযা, আব্বাস, আবু লাহাব- হযরতের চাচাগণসহ প্রায় চল্লিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত দাওয়াতে আসিলেন।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অলৌকিক বরকত ছিল যে, ১০/১২ জনের খাদ্য পরিমাণ ঐ খানা চল্লিশ জন তৃপ্ত হইয়া খাওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকিল। অতপর হযরত (সঃ) দুধের পেয়ালা উপস্থিত করিতে বলিলেন; ইহাও তদ্রূপই- সাধারণ এক পেয়ালা দুধ চল্লিশ জনে পরিতৃপ্তির সহিত পান করিলেন। পানাহার শেষে নবীজী (সঃ) নিজের কথা প্রকাশ করিলেন; তাহার পূর্বেই আবু লাহাব বলিয়া উঠিল, হে লোকসকল! মুহাম্মদ ত আজ তোমাদের খাদ্যেও জাদু চালাইয়াছে- এইরূপ জাদু আর দেখি নাই। ইহা বলিতেই সকলে ছুটাছুটি করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল; সেই দিন নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোন কথাই বলিবার সুযোগ পাইলেন না।

এই দিনের অকৃতকার্যতা নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে দমাইতে পারিল না, তিনি চেষ্টার পর চেষ্টা বারংবার চেষ্টার নীতি অবলম্বন করিলেন।

আর একদিন ঐরূপ দাওয়াতের ব্যবস্থা করিয়া লোকজনকে একত্র করিলেন। আজ পানাহার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) তওহীদ ও ইসলামের আহ্বান জানাইয়া বলিলেন, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দ! আমি আপনাদের জন্য এমন কল্যাণ ও মঙ্গল লইয়া আসিয়াছি যাহা কোন মানুষ তাহার জাতির জন্য আনয়ন করিতে পারে নাই। আমি আপনাদের জন্য ইহ পরকাল উভয়ের কল্যাণ মঙ্গল লইয়া আসিয়াছি।

(সীরাতে মোস্তফা, ১-১২৮)

কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ ছাড়াই দাওয়াতী সম্মেলন সমাপ্ত হইয়া গেল, সকলে নিজ নিজ পথে চলিয়া গেল। এইরূপে গৃহাভ্যন্তরে সত্যের ডাক শুনাইবার পর নবীজী মোস্তফা (সঃ) নিজ সাধনায় আর এক ধাপ অগ্রসর হইলেন- দেশ ও জাতিকে চরম আহ্বান জানাইবার আরও এক বিশেষ ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করিলেন।

আরবের প্রথা ছিল, সমাগত কোন ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে দেশ ও জাতিকে সতর্ক করিতে হইলে পর্বত শিখরে উঠিয়া চিৎকার করিতে হইত। সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মঙ্গলবাহক বিপদ নিবারক নবীজী মোস্তফা (সঃ) সেই কায়দায় দেশ ও জাতিকে চিরস্থায়ী জীবনের চিরস্থায়ী আযাব হইতে সতর্কীকরণপূর্বক তওহীদ ও

ইসলামের আহ্বান জানাইলেন। সেমতে একদিন নবীজী (সঃ) প্রভাতে কা'বা শরীফের সম্মুখস্থ সাফা পর্বত শিখরে আরোহণ করিলেন এবং সমগ্র কোরায়শকে বিশেষভাবে নিজ আত্মীয়-স্বজনকে বিপদ সঙ্কেতের ধ্বনি দ্বারা আহ্বান করিলেন। সকলে ছুটিয়া আসিয়া সাফা পর্বত প্রান্তে সমবেত হইল; এমনকি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যে উপস্থিত হইতে সক্ষম হয় নাই সে নিজ প্রতিনিধি পাঠাইল। পর্বত শৃঙ্গ হইতে নবীজী মোস্তফা (সঃ) সকলকে সম্বোধনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যদি সংবাদ দেই যে, এই পর্বতের পিছন হইতে একদা শত্রু সৈন্য তোমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিবার জন্য আসিতেছে-- তোমরা আমার এই কথা বিশ্বাস করিবে কি? সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় করিব; আমরা কখনই তোমাকে কোন মিথ্যার সংস্পর্শে আসিতে দেখি নাই। নবীজী (সঃ) তখন জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, যদি তাহাই হয় তবে শুন! আমি তোমাদিগকে কঠিন আযাব হইতে সতর্ক করিতেছি! অর্থাৎ আমার আহ্বানে সাড়া না দিলে ঐ আযাব তোমাদের উপর আসিবে।

নিম্নে বর্ণিত হাদীছদ্বয়ে এই বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে।

১৬৭৫। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা-৭০২) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ صَعِدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِىْ يَا بَنِىْ فِهْرٍ يَابَنِىْ عَدِيٍّ لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ حَتّٰى اجْتَمَعُوْا فَجَعَلَ الرَّجُلُ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَّخْرُجَ اَرْسَلَ رَسُوْلاً لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ اَبُوْ لَهَبٍ وَقُرَيْشٍ فَقَالَ اَرَئَيْتُكُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِىْ تُرِيْدُ اَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْكُمْ كُنْتُمْ مُصَدِّقِىَّ قَالُوْا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ اِلاَّ صِدْقًا قَالَ فَاِنِّى نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىَّ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ـ

(فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ـ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন পবিত্র কোরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, **وانذر عشيرتك الاقربين** "আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করুন"- তখন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একদা সাফা পর্বতে আরোহণ করিলেন এবং (হে জনমণ্ডলী। সতর্ক হও, সতর্ক হও বলিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ করিলেন এবং *) হে বনী ফেহ্র গোত্রীয় লোকগণ! হে বনী আদী গোত্রীয় লোকগণ! এইরূপে কোরায়শ বংশীয় গোত্রসমূহকে ডাকিলেন। তাহারা সকলে তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এমনকি কোন কোন গোত্রের সর্দার উপস্থিত হইতে সক্ষম না হওয়ায় তাহার পক্ষের পর্যবেক্ষককে ব্যাপারটা দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। তথায় আবু লাহাবসহ কোরায়শ সর্দারগণ উপস্থিত হইল।

হযরত নবী (সঃ) তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা বল ত! যদি আমি তোমাদিগকে এই ভয়ঙ্কর সংবাদ প্রদান করি যে, একদল শত্রুসেনা নিকটবর্তী উপত্যকা বা গিরিপথ বাহিয়া (আজই সকাল বেলা বা বিকাল বেলা *) তোমাদের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশে (এই পাহাড়ের পিছন হইতে)* আসিয়া পড়িতেছে, তবে তোমরা আমাকে সত্য সংবাদদাতা মনে করিবে কি? সর্দারগণ সকলেই একবাক্যে বলিল, হাঁ- কারণ আমরা কখনও আপনার মধ্যে সত্য ছাড়া মিথ্যার লেশমাত্র দেখি নাই। তখন হযরত (সঃ) বলিলেন, (তোমরা যে শেরেক ও বুৎপরস্তির মধ্যে আছ যদি ইহা ত্যাগ না কর তবে কেয়ামত বা পরজীবনে তোমাদের উপর ভীষণ আযাব আসিবে; সেই) ভীষণ আযাব আসিবার পূর্বে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি। (সেই আযাব হইতে পরিত্রাণ পাইবার ব্যবস্থা তোমাদিগকে বাতাইবার জন্য আমি আসিয়াছি।)

---

* চিহ্নিত তিনটি বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয় ৭৪৩ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।

তখন আবু লাহাব (ক্রোধ স্বরে) বলিল, সর্বদার জন্য তোমার সর্বনাশ হউক– তুমি আমাদিগকে (তোমার ধর্মের) এই কথা শুনাইবার জন্য একত্র করিয়াছ?

আবু লাহাবের উক্তির প্রতিবাদেই এই সূরা নাযিল হয়–

تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ـ

অর্থ ঃ "আবু লাহাবের সমুদয় চেষ্টা-তদবীর ধ্বংস হইয়াছে এবং সে নিজেও ধ্বংস হইয়াছে । তাহার ধন-সম্পদ এবং স্বীয় অর্জিত প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনই কাজে আসে নাই। (আল্লাহর আযাব হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই।)

১৬৭৬। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা–৭০২১) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ لاَ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَاُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ اُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ لاَ اُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِيْنِىْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِىْ لاَاُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ـ

অর্থঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তাআলা وانذر عشيرتك الاقربين আয়াত নাযিল করিলেন তখন রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (উক্ত আয়াতের নির্দেশানুসারে স্বীয় আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করার উদ্দেশে) দণ্ডায়মান হইলেন এবং আত্মীয়বর্গকে সমবেতভাবে আর কতেক জনকে বিশেষরূপে আহ্বান করিলেন– হে (আমার বংশধর) কোরায়েশ বংশীয় লোকগণ! তোমরা নিজদিগকে আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাইতে সচেষ্ট হও; (আযাব হইতে পরিত্রাণের মূল ব্যবস্থা তোমরা গ্রহণ না করিলে) আমি তোমাদিগকে আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাইবার জন্য কোন সাহায্যই করিতে পারিব না।

হে (নিকটতম আত্মীয়বর্গ–) আব্‌দে মনাফ গোত্রীয় লোকগণ! (তোমরাও আযাব হইতে পরিত্রাণের মূল ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে) আমি তোমাদিগকে আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাই কোন সাহায্যই করিতে পারিব না।

হে আমার চাচা! আব্দুল মোত্তালেবের পুত্র আব্বাস! (আপনিও যদি আযাব হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তবে) আমি আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাইবার জন্য আপনাকেও কোন সাহায্য করিতে পারিব না।

হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সূফিয়্যা"! (আযাব হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে) আপনাকেও আমি কোন সাহায্য পৌঁছাইতে পারিব না।

হে মুহাম্মদের (সঃ) কন্যা ফাতেমা! তুমি আমার ধন-সম্পদের যতটুকু ইচ্ছা দাবী করিতে পার, কিন্তু (আযাব হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা স্বয়ং গ্রহণ না করিলে) আমি তোমাকেও আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচাইবার জন্য কোন রকম সাহায্য করিতে পারিব না। (অর্থাৎ নাজাত পরিত্রাণের মূল বস্তু ঈমান ও ইসলাম ব্যতিরেকে কাহারও কোন সম্পর্ক, এমনকি নবীর সম্পর্কও কোন কাজে আসিবে না।)

এই হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা এবং আহ্বানও উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন ফলদায়ক হইল না। আবু লাহাব এই ক্ষেত্রেও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদ্দেশ্য বানচাল করার হট্টগোল সৃষ্টি করিয়া দিল সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া গেল।

নবীজী মোস্তফার (সঃ) উৎসাহ-উদ্যমের সীমা নাই। ভন্ড ধোকাবাজ লোক আত্মবিশ্বাসহীন দুর্বলচেতা হয়; প্রাথমিক অকৃতকার্যতায় তাহারা বিহ্বল হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে অনাবিল সত্য ও অকৃত্রিম উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা কর্তব্যের কারণেই কর্তব্য পালনে অগ্রসর হন তাঁহাদের আত্মবিশ্বাস আত্মবল পর্বত সমতুল্য এবং অকৃতকার্যতার উপর তাঁহারা সাফল্যের কল্যাণ সৌধ নির্মাণে সাধনা করেন। আত্মবিশ্বাসহীন ভণ্ড লোকেরা যেই পরিস্থিতিতে অকৃতকার্যতার প্রথম আঘাতেই মুহ্যমান হইয়া পড়ে, সত্যের সেবকগণ সেই পরিস্থিতে অধিকতর উৎসাহ, অধিকতর সাহস এবং বজ্র কঠিন দৃঢ়তা লইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকেন। সত্যের মহাসেবক কর্তব্যের মহাসাধক হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহার পূর্ণতম বাস্তব আদর্শ। দেশ ও জাতির এই উপেক্ষা উদাসীনতায়, আত্মীয়-স্বজনের দুর্ব্যবহারে তিনি একটুও বিচলিত বা ক্ষুব্ধ হইলেন না, বরং তাঁহার উদ্যম-উৎসাহ এবং সাধনার গতি আরও বাড়িয়া গেল। "হয় উদ্দেশের সাধন না হয় জীবনের পাতন" এই আদর্শের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন নবীজী মোস্তফা (সঃ) এই কঠিন ময়দানে।

দাওয়াত-ব্যবস্থার করুণ আহ্বানে বিফল হইলেন, পর্বতশৃঙ্গের গাম্ভীর্যপূর্ণ সতর্ক বাণীতে অকৃতকার্য হইলেন, কিন্তু নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মনোবল অক্ষুণ্ন, মর্মস্পৃহা অদম্য। এখন তিনি তওহীদ ও ইসলামের বাণী– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" ঘরে ঘরে পৌঁছাইবার জন্য পথে-প্রান্তরে নামিয়া পড়িলেন।

عن ربيعة بن عباد قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس فى منازلهم يقول ان الله يامركم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وابولهب ورائه يقول يايها الناس ان هذا يامركم ان تتركوا دين ابائكم ـ

অর্থ ঃ "রবিয়া ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি– রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লোকদের ঘরে ঘরে ছুটাছুটি করিতেছেন এবং বলিতেছেন, আল্লাহ তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন– তোমরা একমাত্র তাঁহার এবাদত-উপাসনা কর, অন্য কোন কিছুকে তাঁহার সঙ্গী, শরীক, অংশীদার সাব্যস্ত করিও না। নবীজী (সঃ) এই আহ্বান লইয়া বেড়াইতেন আর আবু লাহাব তাঁহার পিছনে পিছনে বলিতে থাকিত– হে লোকসকল! এই লোকটা তোমাদিগকে পরামর্শ দেয় তোমাদের ভাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করিতে; তোমরা সতর্ক থাকিও।"

ইহার উপরও ক্ষান্ত নহে– আবু লাহাব, আবু জহল-গোষ্ঠী তাঁহাকে জাদুকর, গণক-ঠাকুর, মিথ্যাবাদী, পাগল বলিয়া লোকদের নিকট হেয় ও উপেক্ষণীয় সাব্যস্ত করিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিত। কিন্তু তাহাদের কোন প্রচেষ্টাই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দৃঢ় মনোবল, অদম্য কর্মস্পৃহাকে তিলমাত্র ক্ষুন্ন করিতে পারিত না। তিনি পথে-প্রান্তে, হাটে-মাঠে, মেলা-উৎসবে সর্বত্র ইসলাম প্রচারে আমদমনীয় হইয়া উঠিল।

মুনীব গামেদী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন, হে লোকসকল! তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লা গ্রহণ কর; তোমাদের মঙ্গল হইবে। ঐ সময় হতভাগাদের কেহ তাঁহাকে গালি দিতেছিল, কেহ তাঁহার উপর থুথু ফেলিতেছিল, কেহ তাঁহার উপর ধুলা-বালু ছিঁড়িতেছিল। এমন অবস্থায় একটি মেয়ে পানি নিয়া আসিয়া নবীজী (সঃ)-এর মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, মেয়েটি নবীজী তনয়া যয়নব (রাঃ)। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মেয়েটিকে বলিলেন, হে বৎস! পিতার দুঃখে ও মানহানিতে ভীত হইও না।

(সীরাতে মোস্তফা, ১–১৪৭)

তারেক ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "জুল মাজায" মেলায় আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি– তিনি বলিয়া যাইতে ছিলেন, হে লোক সকল! তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লা গ্রহণ কর তোমাদের মঙ্গল হইবে! এক হতভাগা তাঁহার পিছনে পিছনে তাঁহার উপর পাথর মারিতে ছিল এবং বলিতে ছিল, এই মিথ্যাবাদীর কথা কেহ শুনিও না। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দেহ মোবারক রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। (ঐ)

আর একজন ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন– জুল মাজায মেলায় আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি– তিনি বলিয়া যাইতেছিলেন, হে লোকসকল! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু গ্রহণ কর; তোমাদের মঙ্গল হইব। আবু জাহল তাঁহার প্রতি ধুলা-বালু ছুঁড়িতেছিল এবং লোকদিগকে বলিতেছিল, তোমরা তাহার ধোঁকায় পড়িও না; সে তোমাদিগকে তোমাদের দেবদেবী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চায়। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিতেছিলেন না। (ঐ)

রবিয়া ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "ওকাজ" এবং 'জুল-মাজায" মেলায় আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি– তিনি বলিতেছিলেন, হে লোকসকল! তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু গ্রহণ কর। তোমাদের মঙ্গল হইবে। আর একটা টেরা মানুষ তাঁহার পিছনে পিছনে বলিতেছিল, এই লোকটা বেদ্বীন-মিথ্যাবাদী। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, ঐ টেরা মানুষটা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চাচা আবু লাহাব। (সীরাতে মোস্তফা, ১–১৩১)

নবুয়তের চতুর্থ বৎসর মোশরেকদের শত্রুতার ঝড়

দীর্ঘ তিন বৎসর ইসলাম প্রচার গোপনে চলিয়া প্রকাশ্যে প্রচার আরম্ভ হইলে পর আবু লাহাব শ্রেণীর কেহ কেহ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিরোধী হইল এবং মক্কার জনসাধারণ পথে-ঘাটে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ঠেস মারিতে লাগিল বটে, কিন্তু হযরতের আত্মঘাতী শত্রুতায় লিপ্ত হয় নাই।

চতুর্থ বৎসরের শেষ দিকে হযরত (সঃ) মোশরেকদের গর্হিত মাবুদ দেবদেবী ও ঠাকুর প্রতিমাগুলির নিষ্কর্মণ্যতা, অপদার্থতা ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া ঐ সবের প্রতি ঘৃণা ও উপেক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং এই মর্মে অবতারিত পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতও প্রচার করিতে লাগিলেন। যথা–

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ ـ لَوْ كَانَ هٰؤُلَاءِ اٰلِهَةً مَا وَرَدُوْهَا ـ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "হে মোশরেকগণ! নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ভিন্ন তোমাদের গর্তিত পূজ্য দেবদেবীসমূহ সবই জাহান্নামের জ্বালানিতে পরিণত হইবে; তোমরা পূজারী ও পূজ্য উভয়েই নরকে প্রবেশ করিবে। (এখন ভাবিয়া দেখ!) যদি এই গর্হিত পূজ্য দেবদেবীগুলি বাস্তবিকই মাবুদ হইত তবে এইগুলি কখনও জাহান্নামে দগ্ধ হইত না, অথচ ঐ পূজ্য দেবদেবীগুলিসহ তোমাদের সকলেরই জাহান্নামে চিরকাল পতিত থাকিতে হইবে। (পারা–১৭, রুকু–১৭)

এইরূপ আয়াত পবিত্র কোরআনে আরও রহিয়াছে। যথা–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ـ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ـ

অর্থ ঃ "হে লোকসকল! একটি কৌতূহলজনক কথা বর্ণনা করা হইতেছে, তোমরা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর! আল্লাহ ভিন্ন অন্য যেসব দেবদেবী-মূর্তির পূজা-উপাসনা তোমরা করিয়া থাক তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া একযোগে চেষ্টা করিলেও কিছুতেই একটি মাত্র মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না। আরও শুন- মাছি যদি তাহাদের (ভোগ-ভেট) হইতে কোন বস্তু ছিনাইয়া নিয়া যায় তবে সেই বস্তুটি মাছি হইতে ছাড়াইয়া রাখিবার শক্তিও তাহাদের নাই। উপাসক (মানুষ) ত অক্ষম দুর্বল আছেই, উপাস্য মূর্তিগুলি ত আরও অধিক অক্ষম দুর্বল। এই শ্রেণীর লোকেরা বস্তুতঃ আল্লাহ তথা প্রকৃত উপাস্যের পূর্ণ মর্যাদা বুঝেও নাই, দেয়ও নাই। আল্লাহ ত নিশ্চয় সর্বশক্তিমান সর্বোপরি প্রাধান্যের অধিকারী আছেন। (পারা- ১৭, রুকু-১৭)

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন-

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ـ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ـ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "যাহারা আল্লাহ ভিন্ন পূজ্য সাহায্যকারী অবলম্বন করে তাহাদের অবস্থা মাকড়সার ন্যায়। মাকড়সা নিজের রক্ষার জন্য ঘর তৈয়ার করে, অথচ দুনিয়ার সমস্ত গৃহের মধ্যে সর্বাধিক দুর্বল মাকড়সার গৃহ। (তদ্রূপ যাহারা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ছাড়িয়া সাহায্যের আশায় দুর্বলদের পূজা করিয়া থাকে! কতই না অযৌক্তিক তাহাদের এই আশা।) যদি তাহাদের জ্ঞান থাকিত! (পারা-২০; রুকু-১৬)

মোশরেকদের ধর্ম এবং তাহাদের ধর্মীয় দেব-দেবীদের এইরূপ নিন্দা-মন্দ বেইজ্জতী অপমানের বহু আয়াত কোরআন শরীফে নাযিল হইতে লাগিল। নবীজী (সঃ) সেইসব আয়াত নির্ভীকভাবে যথারীতি প্রচার করিয়া চলিলেন।

এতদিন কাফেররা নবীজীর প্রতি বেশীর ভাগ বিদ্রূপ, উপহাস, উপেক্ষা, করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছিল। এখন যখন তিনি তাহাদের পূজ্য দেব-দেবীর নিন্দা-মন্দ ও পৌত্তিলিকতার অসারতা প্রচার করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের পূজ্য মহাপুরুষগণসহ তাহাদেরকে নরকী বলিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন তখন কোরায়েশ দলপতিগণ সমবেতভাবে নবীজীকে বাধাদানে ইসলাম প্রচার বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইল। এই পর্যায়ে তাহাদের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হইল- নবীজীর আশ্রয়দাতা বনী হাশেমের সর্দার আবু তালেব দ্বারা এই কাজ সমাধা করা। তাহারা ভাবিল, আবু তালেবের আশ্রয়ে থাকিয়াই মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাহাদের আন্দোলন চাইতে সক্ষম হইতেছে; আবু তালেব আমাদের সর্দার আমাদেরই ধর্মমতের। সুতরাং তিনি তাহাকে বাধা দিলে সহজেই সে ঐসব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। কোরায়শ দলপতিগণ এই উদ্দেশ্য লইয়া আবু তালেবের সহিত পর পর তিন বার বৈঠকে বসিল।

আবু তালেবের সহিত প্রথম বৈঠক

কোরায়েশ দলপতিগণ আবু তালেবের নিকট নবীজী (সঃ) সম্পর্কে অভিযোগ করিল, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের পূজ্য দেব-দেবীর নিন্দা-মন্দ প্রচার করে, আমাদের ধর্মমতকে ভ্রষ্টতা বলে, আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণকে নাদান-আহমক পথভ্রষ্ট নরকী সাব্যস্ত করে। আপনি হয় তাহাকে এইসব কথা ও কাজ না করিতে বাধ্য করুন, না হয় তাহাকে আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিন; আমরাই তাহার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করিব- আপনি মধ্যে পড়িবেন না।

এই দিন আবু তালেব কোরায়শ দলপতিগণকে মোলায়েমভাবে পাঁচ রকম নরম কথায় ঠাণ্ডা করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। (বেদায়া ৩-৪৭)

আবু তালেবের সহিত দ্বিতীয় বৈঠক

প্রথম বৈঠকে আবু তালেব নরম কথায় কোরায়শ দলপতিগণকেই ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন, নবীজীকে কোন কিছু বলেন নাই। নবীজী (সঃ) যথারীতি তাঁহার কার্য চালাইয়া যাইতেছেন। এই অবস্থায় কোরায়শ দলপতিদের উত্তেজনা বাড়িয়া চলিল; তাহারা পুনরায় আবু তালেবের সহিত বৈঠকে মিলিত হইল। তাহারা আবু তালেবকে বলিল, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদিগকে যাতনা দিয়া থাকে– আমাদের সভা-সমাবেশে আমাদের পূজালয়ে মন্দিরে। আপনি তাহাকে আমাদের যাতনা দেওয়া হইতে বারণ করুন। আবু তালেব তৎক্ষণাত তাহার পুত্র আকীলকে বলিলেন, যাও, মুহাম্মদকে ডাকিয়া নিয়া আস। আকীল যাইয়া তাঁহাকে কাহারও কুঁড়ে ঘর হইতে ডাকিয়া আনিল। কোরায়শ দলপতিগণ আবু তালেবের সম্মুখে বসিয়া আছে, দ্বিপ্রহর বেলা, নবীজী (সঃ) ঐ সময়ই তথায় উপস্থিত হইলেন। আবু তালেব নবীজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনার এইসব লোকেরা বলিতেছে, আপনি তাহাদের সভা-সমাবেশে, পূজালয়ে-মন্দিরে তাহাদের যাতনা দিয়া থাকেন; আপনি এইরূপ কাজ হইতে বিরত থাকুন। নবী (সঃ) আকাশপানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা সূর্য দেখেন কি? তাহারা বলিল, হাঁ। নবী (সঃ) বলিলেন, আপনারা এই সূর্য হইতে কিছু অংশ নিয়া আসিতে যে পরিমাণ সক্ষম, আমি আমার কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করিতে তদপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম অক্ষম নহি। আবু তালেব নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এরূপ দৃঢ়তাদৃষ্টে তাহাদিগকে বলিলেন, আমার ভ্রাতুষ্পত্র কখনও মিথ্যা বলে না; বাস্তবিকই সে অক্ষম না হইলে কখনও এইরূপ বলিত না; অতএব আপনারা চলিয়া যান। (বেদায়া ১–৪২)

ইতিমধ্যে নবীজী (সঃ) তথা হইতে চলিয়া গেলেন; কোরায়শ দলপতিগণ আবু তালেবের প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হইল। তাহারা আবু তালেবকে বলিল, বয়সে, বংশে ও মান-সম্মানে আপনি আমাদের অনেক ঊর্ধ্বে, আমরা চাহিয়াছিলাম। আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পত্রকে বারণ করিবেন; আপনি তাহা করিলেন না– এই বলিয়া তাহারা কঠোর মনোভাব প্রকাশে বলিল, আমাদের পূজ্য দেব-দেবীদের নিন্দা-মন্দ, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের বেইজ্জতী–অপমান আমরা কিছুতেই বরদাশত করিব না। আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বারণ করুন, নতুবা তাহার এবং আপনার মোকাবিলায় রক্তারক্তির মাধ্যমে এক পক্ষ নিপাত হইয়া ঝগড়ার অবসান হইবে। এই কথা বলিয়াই কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেল।

কোরায়শ দলপতিদের ভীতি প্রদর্শনে আবু তালেব বিচলিত হইলেন; সমগ্র দেশ ও জাতির শত্রুতার প্রতিক্রিয়া তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিল। আবু তালেব নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহ অসাল্লামকে ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, দেশের ও বংশের লোকজন আমার নিকট আসিয়াছিল, যাহা তুমিও দেখিয়াছ– তাহারা এই এই বলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তুমি নিজের উপরও রহম কর, আমার উপরও রহম কর; তুমি সংযত হও– আমার সাধ্যের অধিক বোঝা আমার উপর চাপাইও না।

আবু তালেবের এই আলাপে নবীজী (সঃ) ধারণা করিলেন, চাচা আবু তালেব বোধহয় আমার সাহায্য-সহায়তা হইতে অব্যাহতি পাইতে চান। তাই নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার দৃঢ়তার আসল রূপ প্রকাশে স্পষ্ট ভাষায় দ্বিধাহীনভাবে বলিলেন– "হে চাচা! মহান আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহারা যদি আমার দক্ষিণ হস্তে সূর্য এবং বাম হস্তে চাঁদ আনিয়া দেয় আর বলে যেন আমি আমার এই কর্তব্য কাজ ত্যাগ করি, আমি আমার কাজ– সত্যের সেবা এক মুহূর্তের জন্যও ক্ষান্ত করিব না। হয় আল্লাহ আমার সাধনাকে জয়যুক্ত করিবেন, না হয় আমি ধ্বংস হইয়া যাইব।" এই কথা বলিয়া নবীজী মোস্তফা (সঃ) কাঁদিয়া দিলেন– তাঁহার অশ্রু বহিতে লাগিল এবং আবু তালেবের সম্মুখ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যখন তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন তখন আবু তালেব তাঁহাকে ডাকিয়া নিকটে আনিলেন এবং বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! যাও,

তোমার যাহা ইচ্ছা কর এবং যাহা ইচ্ছা বল। আল্লাহর কসম আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে শত্রুর হাতে ছাড়িয়া দিব না। এই প্রসঙ্গে আবু তালেব একটি পদ্যও রচনা করিয়া সর্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন।

وَاللّٰهِ لَنْ يَّصِلُوْا اِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ - حَتّٰى اُوَسَّدَ فِى التُّرَابِ دَفِيْنًا -

আল্লাহর শপথ, বিরুদ্ধবাদীরা সর্বশক্তি ব্যয় করিয়াও আপনার নিকট পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না; যাবৎ না আমি মাটির নীচে দাফন হইয়া যাই।

فَامْضِ لِاَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ - اَبْشِرْ وَقَرَّ بِذَاكَ مِنْكَ عُيُوْنًا -

অতএব নির্ভীক চিত্তে আপনি আপনার কর্তব্যে অগ্রসর হইতে থাকুন; (আমার এই প্রতিশ্রুতির) সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং চক্ষু শীতল করুন– কোন বাধাই আপনাকে কিছু করিতে পারিবে না।

وَدَعَوْتَنِىْ وَعَلِمْتُ اَنَّكَ نَاصِحِىْ - فَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ اَمِيْنًا -

আপনি আমাকেও আহ্বান জানাইয়াছেন এবং আমি জানি, আপনি আমার মঙ্গলকামী। নিশ্চয় আপনি সত্য এবং পূর্ব হইতেই আপনি "আমীন" –সত্যবাদী।

وَعَرَضْتَ دِيْنًا قَدْ عَرَفْتُ بِاَنَّهٗ - مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًا -

আপনি এক সুন্দর ধর্ম পরিবেশন করিয়াছেন; আমি উপলব্ধি করি, ঐ ধর্ম সকল জাতির ধর্মমত অপেক্ষা উত্তম।

لَوْلَا الْمَلَامَةُ اَوْحِذَارُ مَسَبَّةٍ - لَوَجَدْتَنِىْ سَمْحًا بِذَاكَ مُبِيْنًا -

লোকের লানতান ও গালাগালির ভয় যদি আমার না হইত, তবে নিশ্চয় আমাকে দেখিতেন, আমি সরল সুষ্ঠুরূপে এই ধর্মমত গ্রহণ করিয়া নিতাম। (বেদায়া ৩–৪২)

আবু তালেবের সহিত তৃতীয় বৈঠক

মক্কায় আবু তালেবের অসাধারণ প্রভাব ছিল, তাই কোরায়শ দলপতিরা রাগের বশীভূত হইয়া হুমকি-ধমকির কথা বলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু উহা শুধু তাহাদের অধৈর্য প্রকাশের কথা ছিল, বাস্তবায়িত হওয়ার মত কথা ছিল না। গরমের পর এইবার তাহারা ঠাণ্ডাভাবে আবু তালেবের সহিত তৃতীয় বৈঠকে মিলিত হইল।

এইবার তাহারা ওমারা ইবনে অলীদ নামক এক অতি সুশ্রী সুদর্শন যুবককে সঙ্গে আনিয়া আবু তালেবের নিকট উপস্থিত করতঃ বলিল, এই যুবকটি আপনাকে নিদাবীরূপে দিয়া দিতেছি; তাহার পরিবর্তে আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিন। সে ত আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মমত বিরোধী আপনার দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে এবং আমাদের সকলকে বুদ্ধি-বিবেকহীন বলিয়া প্রচার করিতেছে। আমরা তাহাকে হত্যা করিয়া দেই; আপনার কোন ক্ষতি হইল না– একজনের পরিবর্তে একজনকে আপনি পাইয়া গেলেন।

আবু তালেব বিস্ময়ের সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতঃ বলিলেন, কি অযৌক্তিক বিনিময়! আমার পুত্র তোমাদের হস্তে অর্পণ করিব হত্যার জন্য, আর তোমাদের পুত্রের ব্যয়ভার আমি বহন করিয়া যাইব! খোদার কসম! কস্মিনকালেও ইহা হইবে না। এইবারও কোরায়শ দলপতিগণ উত্তেজনার সহিত নৈরাশ্য নিয়া চলিয়া গেল। (বেদায়া ৩–৪৮)

নবীজীর (সঃ) সহিত কোরায়শদের সরাসরি কথাবার্তা ও প্রলোভন দান

বার বার আবু তালেবের সহিত মিলিত হইয়া ব্যর্থ হওয়ার পর কোরায়শগণ স্বয়ং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে সরাসরি প্রস্তাব পেশ করার উদ্যোগ নিল।

একদা কোরায়েশ দলপতিগণ সন্ধ্যার পর কা'বা শরীফের নিকটে একত্রিত হইয়া স্থির করিল, মুহাম্মদকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ডাকিয়া আন এবং সরাসরি তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া যুক্তি-তর্কে তাহাকে নিরুত্তর কর, যেন ওজর-আপত্তির কোন অবকাশ তাহার জন্য না থাকে। সেমতে তাহারা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট লোক পাঠাইয়া এই সংবাদ দিল যে, আপনার বংশীয় মুরব্বীগণ আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য একত্রিত হইয়াছেন।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহাদের হেদায়াতের প্রতি অত্যধিক লালায়িত ছিলেন; তিনি ভাবিলেন, হয়ত তাহাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। এই ভাবিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দ্রুত তাহাদের বৈঠকে আগমন করিলেন। তাহারা বলিল, আমরা আপনাকে সংবাদ দিয়াছি শেষ কথা শুনিবার জন্য– যাহাতে কোন ওজর-আপত্তির অবকাশ না থাকে। সমগ্র আরবে আপনার ন্যায় কোন মানুষ তাহার জাতির জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয় নাই। আপনি নিজের পূর্বপুরুষদের মন্দ বলেন, তাহাদের ধর্মমতের নিন্দা করেন, তাহাদেরকে বিবেক-বুদ্ধিহীন বলেন, তাহাদের পূজ্য দেবদেবীকে গালি দেন– এই করিয়া আপনি আমাদের একতায় ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়াছেন, যত রকম অনাচার এবং বিবাদ-বিরোধ আছে, আপনি আমাদের ও আপনার মধ্যে সেই সবের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আপনি যদি এইসব ধন লাভের আশায় করিয়া থাকেন তবে আপনাকে এই পরিমাণ ধন যোগাড় করিয়া দেই যাহাতে আপনি আমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ধনবান হইয়া যান। আর যদি প্রাধান্যের আশায় এইসব করেন তবে আমরা আপনাকে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্দাররূপে বরণ করিয়া নেই। যদি রাজত্বের আশায় করেন তবে আমরা আপনাকে আমাদের রাজা বানাইয়া নেই। আর যদি জিন-ভুতের তাছিরে আপনার বিকৃতি ঘটিয়া থাকে তবে আমরা সর্বপ্রকার ব্যয় বহনে আপনার চিকিৎসা করি; চিকিৎসা বিফল হইলে আমরা আপনাকে ক্ষমার্হ গণ্য করিব।

রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমার সম্পর্কে আপনাদের একটি কথাও সত্য নহে। ধনের বা প্রাধান্যের আশায় রাজত্বের আশায় আ মি কাজ করিতেছি না। আমাকে আল্লাহ তাআলা আপনাদের প্রতি রসূলরূপে পাঠাইয়াছেন এবং কিতাব দান করিতেছেন। তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন, আমি আপনাদের বেহেশতের পথ দেখাইয়া সুসংবাদ দেই এবং দোযখ হইতে সতর্ক করি। সেমতে প্রভুর দেওয়া দায়িত্ব আমি পৌঁছাইতেছি এবং আপনাদের মঙ্গল কামনা করিতেছি। যদি আপনারা আমার কথা, আমার জিনিস গ্রহণ করেন তবে আপনাদের ইহ-পরকালের সৌভাগ্য লাভ হইবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন তবে আমি আল্লাহর আদেশ পালনে দৃঢ় ও ধৈর্যধারী হইয়া থাকিব– যাবত না আল্লাহই আপনাদের ও আমার মধ্যে শেষ ফয়সালা করিয়া দেন।

এরপর কোরায়শ দলপতিরা কতগুলি বাহুল্য প্রস্তাব অবতারণা করিল। তাহারা বলিল, আপনি জানেন, আমাদের এই শহরটি অতি সঙ্কীর্ণ, আমাদের জীবনমানও অতি নিম্নের; আমরা গরীব। যেই প্রভু আপনাকে রসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার নিকট আবেদন করুন, তিনি যেন আমাদের দেশের পাহাড়গুলি হটাইয়া দিয়া আমাদের দেশকে সুপ্রশস্ত করিয়া দেন এবং আমাদের দেশে নদ-নদী প্রবাহের ব্যবস্থা করিয়া দেন যেরূপ সিরিয়া ও ইরাকে রহিয়াছে। আর আমাদের বাপ-দাদা মৃত পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত করিয়া দেন– তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিব, আপনার দাবী সত্য কি মিথ্যা।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উত্তরে এতটুকুই বলিলেন, এইসব উদ্দেশে আমি প্রেরিত হই নাই। যে ধর্মমত প্রদানে আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাহা নিয়াই আসিয়াছি; আপনারা তাহা গ্রহণ করিলে দুনিয়া-আখেরাতের মঙ্গল হইবে, আর গ্রহণ না করিলে আমি আল্লাহর আদেশের উপর অটল ধৈর্যশীল হইয়া থাকিব– যাবত না আল্লাহ শেষ ফয়সালা করিয়া দেন।

অতপর তাহারা বলিল, যদি আমাদের জন্য ইহা না করেন তবে আপনি নিজের জন্য এই আবেদন করুন, আপনার প্রভু যেন ফেরেশতা পাঠাইয়া দেন যে আপনার সমর্থন করিবে। আর আপনার জন্য বাগ-বাগিচা, স্বর্ণ-রৌপ্যের অট্টালিকা এবং ধন-দৌলতের ভাণ্ডার দান করেন যেন আপনাকে আমাদের ন্যায় জীবিকা উপার্জনে যাইতে না হয়। আপনার এইসব বৈশিষ্ট্য দেখিলে আমরা বিশ্বাস করিতে পারিব যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, আমি প্রভুর নিকট এই আবেদন করিতে পারিব না; প্রভু আমাকে এই জন্য পাঠান নাই। এই সঙ্গে নবীজী (সঃ) আবু তালেবের সহিত দ্বিতীয় বৈঠকে তাঁহার বিঘোষিত পূর্ব উক্তিরও পুনরাবৃত্তি করিলেন।

অতপর তাহারা বলিল, আমরা ত আপনার প্রতি ঈমান আনিব না; আপনি আমাদের উপর আসমান ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করুন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, এইরূপ কাজ ত আল্লাহ তাআলার; তিনি যদি ইচ্ছা করেন করিতে পারেন।

এই ধরনের কথাবার্তার পর নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার আশার বিপরীত পরিস্থিতিদৃষ্টে আত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন (বেদায়া ৩-৫০)।

এই শ্রেণীর কথোপকথনের আলোচনা পবিত্র কোরআনেও আছে–

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا ـ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ـ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِىَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلًا ـ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِى السَّمَاءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ـ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ـ

অর্থ ঃ "কাফেররা বলিল, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব না, যাবত না আপনি আমাদের জন্য প্রবাহিত করেন আমাদের দেশে নদ-নদী। অথবা আপনার জন্য আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান হয়, যাহার মধ্যে নদী-নালা প্রবাহিত থাকে। কিম্বা আপনি আসমান ভাঙ্গিয়া আমাদের উপর ফেলিবার ব্যবস্থা করেন বা আল্লাহ এবং ফেরেশতা আপনার জামিনরূপে নিয়া আসেন, অথবা সোনা-চান্দির ঘর-বাড়ী আপনার হয়, কিম্বা আপনি আসমানে চড়িতে পারেন। অবশ্য আমরা আপনার আসমানে আরোহণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব না যাবত না আপনি তথা হইতে কোন লিপি নিয়া আসেন; যাহা আমরা পড়িতে পারি। আপনি বলুন, সোবহানাল্লাহ; কি সব আশ্চর্যের কথা! আমি ত মানুষ শ্রেণীর রসূল বৈ নহি!" (পারা-১৫, রুকু-১০)

আর এই শ্রেণীর ফরমায়েশ পূরণ না করা সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলার বক্তব্য পবিত্র কোরআনে নিম্নের আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে–

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ـ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً

فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ۔

অর্থ ঃ “ফরমায়েশী মোজেযা প্রদানে একমাত্র বাধা ইহাই যে, পূর্ববর্তী লোকেরাও এইরূপ ফরমায়েশ করিয়াছিল এবং তাহা পূরণ করার পরও তাহারা সত্য অস্বীকার করিয়াছিল। (ফলে তাহারা ধ্বংস হইয়াছে। যেমন-) সামুদ জাতিকে তাহাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী উষ্ট্রী দিয়াছিলাম, সত্যকে তাহাদের চোখে প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা তাহার সঙ্গেও অন্যায় করিয়াছিল (এবং ধ্বংস হইয়াছিল)। মোজেযা ত আমি শুধু সতর্ক করার উদ্দেশে প্রকাশ করি। (সত্য বুঝিয়া নেওয়া এবং গ্রহণ করা ত জ্ঞান-বিবেকের দ্বারা হইবে।) (পারা- ১৫, রুকু- ৬)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়ম এই যে, তাঁহার রসূলকে যদি কোন নির্ধারিত মোজেযা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ বা ফরমায়েশ করা হয় এবং আল্লাহ তাআলা রসূলকে সেই মোযেজা প্রদান করেন- এইরূপ ক্ষেত্রে মোজেযা প্রকাশের পরও সত্য অস্বীকার করা হইলে আল্লাহ তাআলার গজব সেই ক্ষেত্রে বিলম্ব করে না; অস্বীকারকারীদেরকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। যেরূপ সামুদ জাতি তাহাদের নবী সালেহ আলাইহিস সালামকে বলিয়াছিল, এই পাহাড় বা বড় পাথরটি হইতে একটি উট বাহির করিয়া দেখাইতে পারিলে আমরা ঈমান গ্রহণ করিব। আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করিয়া সালেহ (আঃ) তাহা করিলেন; তাহাদের চোখের সম্মুখে ঐ পাহাড় বা পাথরটি কম্পমান হইয়া ফাটিয়া গেল এবং তৎক্ষণাত তাহা ইহতে একটি বিরাটাকার উষ্ট্রী বাহির হইয়া আসিল। কাফেররা তাহা জাদু বলিয়া উড়াইয়া দিল; সত্য গ্রহণ করিল না, ফলে সমগ্র জাতি ধ্বংস হইয়া গেল। পবিত্র কোরআনে এই ঘটনা এবং এই শ্রেণীর আরও বহু ঘটনা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

উল্লিখিত আয়াতে এই ইঙ্গিতই দেওয়া হইয়াছে যে, মক্কাবাসীদের ফরমায়েশ পূর্ণ করা হইলে তাহারা এই মুহূর্তে সত্য গ্রহণ করিবে না, সে ক্ষেত্রে তাহারা অবিলম্বে ধ্বংস হইয়া যাইবে। অথচ আল্লাহ তাআলা তাহাদের সময়-সুযোগ দেওয়ার ইচ্ছা রাখেন, তাই তাহাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করা হয় নাই; রসূলুল্লাহ (সঃ)ও উদ্যোগ নেন নাই।

হাদীছ শরীফে আছে- মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলিয়াছিলেন, আপনি সাফা পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করুন কিম্বা মক্কার পাহাড়গুলিকে হটাইয়া দিন। (যাহাতে আমরা ক্ষেত-খামার করিতে প্রয়াস পাই। তখন আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলা হইল, ইচ্ছা করিলে আপনি তাহাদের সুযোগ দেওয়ার পথ অবলম্বন করিতে পারেন। আর ইচ্ছা করিলে তাহাদের ফরমায়েশ পূর্ণও করিতে পারেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাহারা সত্য অস্বীকার করিলে ধ্বংস হইবে; যেরূপ তাহাদের পূর্বে অনেক জাতি এই কারণে ধ্বংস হইয়াছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছিলেন- না, আমি তাহাদের সুযোগ দেওয়ার পথই চাই। এই প্রসঙ্গেই আয়াত নাযিল হয় وما منعنا (নাসায়ী শরীফ, বেদায়া ৩-৫২)

সরাসরি নবী (সঃ)-কে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস

কোরায়শ দলপতিদের উল্লিখিত আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর তাহারা আর একটি উদ্যোগ নিল যে, নবীজীর (সঃ) বাড়ী যাইয়া সরাসরি প্রলোভনমূলক প্রস্তাব দানে তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করা হউক। সেমতে একদা তাহারা সকলে পরামর্শে বসিল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, আমাদের মধ্যে সর্বাধিক বাকপটু, চতুর, পন্ডিত শ্রেণীর এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হউক, সে যাইয়া ঐ লোকটার সহিত কথা বলিবে যে, সে আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করিয়াছে আর আমাদের ধর্মকে মন্দ বলে! সেমতে রবিয়ার পুত্র ওতবাকে তাহারা এই কাজের

জন্য নির্বাচন করিল। ওতবা নবীজীর নিকট যাইয়া বলিল, আপনি একটি কথার উত্তর দিন– আপনি উত্তম, না আপনার পিতা আবদুল্লাহ উত্তম ছিলেন? আপনি উত্তম, না আপনার দাদা আবদুল মোত্তালেব উত্তম ছিলেন? নবীজী (সঃ) এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। ওতবা বলিল, যদি তাঁহারা উত্তম ছিলেন তবে তাঁহারা ত এইসব দেব-দেবীরই সেবাইত ছিলেন, যাহাদের নিন্দা-মন্দ আপনি করিয়া থাকেন। আর যদি আপনি নিজেকে উত্তম মনে করেন তবে সেই কথা স্পষ্ট বলুন। আপনার ন্যায় এমন পুত্র দেখি নাই, যে নিজ বংশের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়; আপনি আমাদের ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের পূজনীয়দের নিন্দা-মন্দ করেন। আপনি সমগ্র আরবে আমাদেরকে লজ্জিত করিয়াছেন; সর্বত্র বলা হয়, কোরায়শদের মধ্যে একজন যাদুকর হইয়াছে, কেহ বলে পাগল হইয়াছে ইত্যাদি।

অতপর ওতবা তাহার আসল কথা প্রকাশ করিল– সে নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে লোভ-লালসার ফাঁদে ফেলিবার অপচেষ্টা করিল। ধন, প্রাধান্য ও রাজত্ব– এই সর্বোচ্চ লোভের বস্তু যাহার প্রস্তাব কোরায়শ দলপতিগণ নবীজীর সম্মুখে প্রকাশ্য বৈঠকে দিয়া দিল– ওতবা সেই প্রস্তাবই (private pushing) সরাসরি পেশ করিল এবং তদুপরি একটি চতুর্থ বস্তুরও লোভ দেখাইল।

প্রবাদে বলা হয়, كل اناء يترشح بما فيه "প্রত্যেক পাত্র হইতে ঐ বস্তুরই ফোঁটা নির্গত হয় যাহা তাহার মধ্যে থাকে।" ওতবা তাহার নিজ শ্রেণীর লোকদের প্রলোভন দেখাইবার ন্যায় অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ইহাও বলিল যে, আপনার যদি কামিনী-কাঞ্চনের মোহ থাকিয়া থাকে তবে বলুন, কোরায়শদের মধ্যে যেকোন রূপসী আপনি পছন্দ করিবেন, দশ জন চাহিলে তাহাও সংগ্রহ করিয়া আপনার সাথে বিবাহ দিয়া দেওয়া হইবে।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) গম্ভীর স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার বক্তব্য শেষ হইয়াছে? ওতবা বলিল, হাঁ। নবীজী (সঃ) জ্ঞাত ছিলেন, ওতবা আরবের একজন সুপণ্ডিত ও কবি ব্যক্তি; সে কোরআনের মাধুর্য লালিত্য অনুধাবন করিতে পারিবে। তাই নবী (সঃ) তাহার অশোভনীয় প্রলোভন প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ না হইয়া পবিত্র কোরআনের সুদীর্ঘ অংশ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। ২৪ পারা সূরা হা-মীম-সাজদার প্রথম ১৩টি আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। উক্ত আয়াতসমূহে পবিত্র কোরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাহার প্রতি লোকদের বিরোধিতার বিবরণ দানে নবীজীর কর্তব্য-কর্মের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে যে– বলিয়া দিন, আমি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ শ্রেণীর, কিন্তু আমার নিকট আল্লাহর ওহী আসে। তোমাদের উপাস্য ও পূজ্য শুধুমাত্র এক আল্লাহ; অতএব তোমরা সকলে একরোখাভাবে তাঁহারই প্রতি নিজ নিজ লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। ভীষণ দুর্ভাগ্য ও আযাব ঐ লোকদের জন্য, যাহারা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে, যাহারা আত্মশুদ্ধি করে না এবং পরকাল অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান গ্রহণ পূর্বক নেক আমল করিবে তাহাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান ও সুফল রহিয়াছে। অতপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতের বর্ণনা রহিয়াছে যে, তিনি আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্ররাজি পয়দা করিয়াছেন– সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহর সঙ্গে কুফুরী-শেরেকী করার উপর বিস্ময় প্রকাশ করা হইয়াছে। অতপর সতর্ক করণে বলা হইয়াছে– যদি তাহারা আপনার কথা গ্রহণ না করে তবে বলিয়া দিন, আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি ঐরূপ আসমানী আযাব হইতে, যে আযাব "আ'দ" ও "সামুদ" জাতিকে ধ্বংস করিয়াছিল।

নবীজীর ধারণা সত্য হইল– পবিত্র কোরআনের মাধুরী মাদকের ন্যায় ওতবাকে মত্ত করিয়া ফেলিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, একমাত্র এই মহাতত্ত্বই আপনার উদ্দেশ্য, অন্য আর কোন উদ্দেশ্য নাই? নবীজী (সঃ) বলিলেন, না। তখন সে সোজা কোরায়শ দলপতিদের নিকট চলিয়া গেল। ওতবার উপর পবিত্র কোরআনের প্রতিক্রিয়া এরূপ পড়িয়াছিল যে, তাহারা তাহাকে দেখামাত্র বলিয়া উঠিল হায়! ওতবা ত পূর্বের ওতবা নাই;

সে ত ধর্মত্যাগী (মুসলিম) হইয়া গিয়াছে! ওতবা তাহাদের নিকট বর্ণনা দিল, আমি তাঁহার সুমধুর কালাম শুনিয়াছি, খোদার কসম আমি ঐরূপ বস্তু আর শুনি নাই। তাহা কবিতাও নহে, জাদু নহে, মন্ত্রও নহে– তাহা এক অতুলনীয় জিনিস। হে আমার জাতি! তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর; তোমরা মুহাম্মদকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁহার অবস্থার উপর স্বাধীন ছাড়িয়া দাও। খোদার কসম তাঁহার মুখে যে কালাম বা বাণী শুনিয়াছি, অচিরেই তাহা বিশ্বব্যাপী মহাআলোড়ন সৃষ্টিকারী হইবে। তোমরা তাঁহাকে তাঁহার কাজে স্বাধীন ছাড়িয়া দেওয়ার পর যদি আরবের অন্য লোকেরা তাঁহার দফা-রফা করিয়া দেয় তবে তোমরা নিস্তার পাইলে, আর যদি তিনি সমগ্র আরবের উপর জয়ী হন তবে তাঁহার সম্মান তোমার সম্মান, তাঁহাদের বিজয় তোমাদের বিজয়; কারণ, তিনি তোমাদের বংশীয়। কোরায়েশরা ওতবার এই উক্তি শুনিয়া বলিতে লাগিল, হায় ওতবা! তোমার উপর ত মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) জাদু ক্রিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। ওতবা বলিল, আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি; তোমাদের যাহা করার ইচ্ছা হয় করিতে পার।

(সীরাতে মোস্তফা, ১--১৩৭)।

ইহুদীদের সহিত কোরায়শদের যোগাযোগ

সব দিকে ব্যর্থতায় কোরায়শরা বিচলিত হইয়া পড়িল; এইবার তাহারা সত্য-অসত্যের খোঁজ লাগাইবার উদ্যোগ গ্রহণ করিল। তাঁহাদের দুই ব্যক্তিকে ইহুদী আলেমদের নিকট মদীনায় পাঠাইয়া দিল; তাহাদের নিকট নবীগণের অনেক ইতিহাস রহিয়াছে। তাহারা ইহুদী আলেমদের নিকট নবীজীর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাঁহার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে বলিল, তাহার নিকট তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, যদি তিনি ঐসবের উত্তর দিতে সক্ষম হন তবে বাস্তবিকই তিনি রসূল। নতুবা মিথ্যা দাবীদার। চিন্তা করিয়া তোমরা তাহার সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে– (১) অতীত যুগের কতিপয় যুবক যাহারা তাহাদের দেশ ও রাজশক্তির বিরুদ্ধে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান লইয়া আত্মগোপন করিয়াছিল (যাহাদের আসহাবে কাহফ বলা হয়), তাহাদের বাস্তব ও মূল্যবান ইতিহাস আছে; সেই ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিবে। (২) অতীতে এমন একজন বাদশাহ ছিলেন যিনি দুনিয়ার সমগ্র বসতি এলাকা পর্যটন করিয়াছিলেন, (যাহাকে জুলকারনাইন বলা হয়), তাহারও ইতিহাস আছে– সেই ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিবে।

(৩) রূহ বা আত্মা কি জিনিস তাহাও জিজ্ঞাসা করিবে। এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইলে প্রমাণ হইবে, বাস্তবিকই তিনি আল্লাহর রসূল; তোমরা তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে। আর উত্তর দানে সক্ষম না হইলে মিথ্যা দাবীদার প্রমাণিত হইবে; তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় তাহার সঙ্গে তাহাই করিবে।

ব্যক্তিদ্বয় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া কোরায়শদের নিকট বলিল, সত্য-মিথ্যার বিচারের বিষয়বস্তু নিয়া আসিয়াছি– এই বলিয়া বিস্তারিত বিবরণ তাহাদের সম্মুখে প্রদান করিল। কোরায়শ দলপতিগণ ছুটাছুটি করিয়া নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং উক্ত তিন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল।

নবীজী (সঃ) একটু বেখেয়ালীর সহিত বলিয়া ফেলিলেন, আগামীকল্য তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিব। এইরূপ ক্ষেত্রে "ইনশাআল্লাহ– যদি আল্লাহ তওফীক দেন" বলা প্রয়োজন, সেই ব্যাপারে নবীজীর ত্রুটি হইয়া গেল। আল্লাহ তাআলা তাহার পরিণতি হইতে নবীজী (সঃ)-কে রেহাই দিলেন না; ওহীর আগমন বন্ধ রহিল। নবীজীর আশা ছিল জিব্রীল (আঃ) আসিলেই কাফেরদের প্রশ্ন জ্ঞাত করিবেন বা এমনিতেই সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে ওহী আসিয়া যাইবে এবং সব অবগত হইয়া তাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিবেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন, আগামীকল্য তোমাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া দিব। কিন্তু "ইনশাআল্লাহ" না বলার কারণে দীর্ঘ পনর বা আঠার দিন জিব্রীলের আগমন স্থগিত রহিল। আগামীকল্যের স্থলে যতই দিন কাটিতে লাগিল কাফেরদের জয়ঢাক পিটানো ততই বাড়িয়া চলিল যে, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লাম) বলিয়াছিলেন, আগামীকল্যই আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন; অথচ দীর্ঘ দিন চলিল তিনি উত্তর দানে সক্ষম হইলেন না। নবীজীও অত্যন্ত বিচলিত ও চিন্তিত হইলেন; এক দিকে ওহীর আগমন বন্ধ হওয়া অপর দিকে কাফেরদের ঢাক-ঢোল পিটাইয়া দুর্নাম ছাড়ানো। পনর বা আঠার দিনের ভোর বেলা হইতে ঐ অবস্থা চরম আকার ধারণ করিল; ঠিক ঐ দিনই সূরা কাহফের সুদীর্ঘ বর্ণনা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের ঘটনাদ্বয়ের বিবরণে নাযিল হইল। তাহার মধ্যে নবীজী (সঃ)-কে সর্বদার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল–

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ ـ

অর্থ ঃ "কস্মিনকালেও কোন বিষয় সম্পর্কে এই কথা "ইনশাআল্লাহ" ব্যতীত বলিবেন না যে, আমি আগামীকল্য এই কাজ করিব; যদি ভুল হইয়া যায় তবে যথাসত্বর স্মরণ করিয়া নিবেন আপনার প্রভুকে।"

এই সূরার মধ্যে বর্ণিত আসহাবে কাহফের ঘটনা এবং বাদশাহ জুলকারনাইনের ঘটনা সুদীর্ঘরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে ১৫ পারা ১০ রুকুর প্রথম আয়াতটি নাযিল হইল–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ـ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ـ

অর্থ ঃ "তাহারা আপনাকে রূহ বা আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে * আপনি উত্তরে বলুন, রূহ আমার প্রভুর আদেশে সৃষ্ট একটি বস্তু। অর্থাৎ material উপাদান ছাড়া শুধু আল্লাহ্ তাআলার "কুন হইয়া যাও" আদেশে সৃষ্টি। (যেহেতু রূহ উপাদান ছাড়া সৃষ্ট বস্তু, তাই উহা তোমাদের অথবা কোন মানুষের বোধগম্য হইবে না) তোমাদিগকে অতি ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ জ্ঞান দান করা হইয়াছে।" (ঐ শ্রেণীর বস্তুর বুঝ তাহার নাগালের বাহিরে।)

প্রশ্নত্রয়ের উত্তর পাইয়া সত্য উপলব্ধি করার সুযোগ তাহাদের হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের পলীদ– অপবিত্র অন্তর সেই পথে অগ্রসর হইল না; তাহারা বিকল্প পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করিল।

আপোস প্রচেষ্টা

কোরায়শ দলপতিগণ এই পর্যায়ে একটা আপোস মিমাংসার প্রস্তাবও নবী (সঃ)-এর নিকট পেশ করিল। তাহাদের প্রস্তাব ছিল এই যে, আমাদের উভয় পক্ষ একে অন্যের ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে। সেমতে আমরা এক বৎসর আপনার খোদার উপাসনা করিয়া নিব; বিনিময়ে আপনি আমাদের দেব-দেবীদের উপাসনা এক বৎসর করিবেন– এইভাবে বৎসরের পর বৎসর চলিতে থাকিবে। এই প্রস্তাব বাতিল ও প্রত্যাখ্যান করার জন্য কোরআনের সূরা "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন" নাযিল হয়; যাহার মর্ম এই –

আপনি বলিয়া দিন, হে কাফেরের দল! আমি উপাসনা করি না যাহাদের উপাসনা তোমরা কর; তোমরাও বন্দেগী কর না যাহার বন্দেগী আমি করি। (আমার ও তোমাদের মধ্যকার এই ব্যবধান চিরস্থায়ী; সংমিশ্রণের আপোস সুদূরপরাহতই নহে শুধু, অসম্ভবও বটে) তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা আমি করিব আমার উপাস্যের উপাসনা তোমরা করিবে– এই পরিকল্পনা কখনও বাস্তবতার মুখ দেখিবে না। (হাঁ এখনকার মত আপোস এই হইতে পারে যে) তোমরা ত তোমাদের ধর্মে স্বাধীন আছ; আমিও আমার ধর্মে স্বাধীন থাকিব। (আমি তোমাদের বাধা দিব না, তোমরাও আমাকে বাধা দিবে না।)

নির্যাতনের তুফান আরম্ভ হইয়া গেল

মক্কাবাসীরা নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে দমাইবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইল; এই ব্যর্থতা তাহাদের

* মদীনাতে স্বয়ং ইহুদীরাও নবী (সঃ)-কে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহাদের উত্তর দানেও নবী (সঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছিলেন। (বেদায়া ৩–৫৬)

বেসামাল করিয়া তুলিল। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গোত্রীয় প্রভাব এবং আবু তালেবের ন্যায় ব্যক্তির আশ্রয় বাহ্যিকরূপে এক সুকঠিন বাধা ছিল তাঁহার জীবন সংহার ব্যবস্থা গ্রহণে। তাই অগ্নিমূর্তি দস্যুদল লেলিহান হইয়া উঠিল নবীজীর শিষ্য ও ভক্তদের প্রতি; বিশেষতঃ যাহারা ছিলেন দুর্বল। দস্যুরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, মুসলমানদিগকে নানা অত্যাচারে জর্জরিত করিয়া ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না; পুরাদমে চলিল অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্যাতন– যাহাতে অনেকে জীবন হারাইলেন। কোরায়শরা মুসলেমদের প্রতি কিরূপ অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্তে তাহা উপলব্ধি করা পাঠকের জন্য সহজ হইবে।

সাইয়্যেদুনা বেলাল রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

তিনি ছিলেন আফ্রিকার কালা মানুষ; মক্কার সর্দার এবং ইসলামের অন্যতম শত্রু উমাইয়ার ক্রীতদাস। সাইয়্যেদুনা বেলাল (রাঃ) ইসলামের জন্য অমানুষিক অত্যাচার ভোগে এবং সর্বপ্রকার উৎপীড়নের মধ্যে দৃঢ় পদ থাকায় যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা নজিরবিহীন। বেলালের মালিক নরাধম উমাইয়া যখন শুনিতে পাইল, তাহারই গৃহে তাহার দাস মুসলমান হইয়াছে তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। বেলালকে ডাকিয়া সম্মুখে আনিল এবং চাবুক লইয়া ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। চাবুকের আঘাতে আঘাতে বেলাল রক্তাক্ত হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে 'আহাদ আহাদ– মাবুদ এক, মাবুদ এক' এই শব্দ ছাড়া আর কিছু নহে। বেলালের অনমনীয় ভাব দেখিয়া উমাইয়ার আরও ক্রোধ হইল– এত বড় স্পর্ধা! অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল। দুপুর বেলা আরবের অগ্নিময় উত্তপ্ত প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত পাথরের উপর উন্মুক্ত আকাশতলে বেলালকে চিতভাবে শোয়াইয়া দেওয়া হইত এবং বুকের উপর ভারী পাথর চাপা দিয়া দেওয়া হইত যেন পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে না পারে।

কোন সময় তাপদগ্ধ মরু-বালুকার উপর ঐরূপ অবস্থা করা হইত। এই অবস্থায় বেলালকে বলা হইত, বাঁচিতে চাহিলে মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ধর্ম ত্যাগ কর, কিন্তু বেলালের মুখে একই শব্দ আহাদ আহাদ।

কোন সময় গরুর কাঁচা চামড়ায় লেপটাইয়া, কোন সময় লৌহবর্ম পরাইয়া অগ্নিবৎ রোদ্রে ফেলিয়া রাখা হইত; সর্বাবস্থায় বেলালের একই জপনা– আহাদ, আহাদ। এই শ্রেণীর লোমহর্ষক অত্যাচারেও যখন বেলালের জপে পরিবর্তন আসিল না তখন পাষণ্ড উমাইয়া এক অদ্ভুত শাস্তির ব্যবস্থা করিল। নিকৃষ্ট পশুর ন্যায় বেলালের গলায় দড়ি বাঁধিয়া বা নাকের ভিতর ছিদ্র করতঃ তাহাতে রজ্জু দিয়া তাঁহাকে দুষ্ট ছেলেদের হাতে অর্পণ করিত। ঐ নিষ্ঠুরেরা বেলালের রজ্জু ধরিয়া টানিতে টানিতে মক্কার পথে হৈ হৈ রবে তামাশা করিয়া বেড়াইত এবং টানিয়া হেঁচড়াইয়া মারিয়া পিটিয়া আধমরা অবস্থায় সন্ধ্যাবেলা বেলালকে উমাইয়ার বাড়ী দিয়া আসিত। রাত্রি বেলায় বেলাল যখন সারা দিনের ক্ষুধার যন্ত্রণায় অবসন্ন, তখন তাঁহকে এক সঙ্কীর্ণ নির্জন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া চাবুক মারা হইত এবং বলা হইত, এখনও ইসলাম ত্যাগ কর, কিন্তু বেলাল অনড় অটল।

কি দৃশ্য! ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ বাহির হইতে উদ্যত, বেত্রাঘাতে দেহ জর্জরিত, রক্তঝরায় সর্বাঙ্গ সিক্ত কিন্তু নরাধম উমাইয়ার কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় না; বেলাল তাঁহার ধৈর্য, দৃঢ়তা ও বিশ্বাসে পর্বত সদৃশ্য, তাঁহার মুখে একই ঘোষণা– আহাদ, আহাদ, আহাদ।

সাইয়্যেদুনা বেলাল (রাঃ) অগ্নি পরীক্ষায় চরম সাফল্য লাভ করিলেন; আল্লাহ তাআলার করুণা তাঁহার জন্য নামিয়া আসিল। একদা আবু বকর (রাঃ) চলার পথে বেলালের মর্মান্তিক দুদর্শা দেখিয়া দারুণ মর্মাহত হইলেন। তিনি পাষণ্ড উমাইয়াকে বলিলেন, এই গরীবকে আর কত অত্যাচার করিবে? তোর কি খোদার ভয়

হয় না? উমাইয়া বলিল, তোমরাই ত তাহাকে খারাপ করিয়াছ; এখন তোমরাই তাহাকে ছাড়াইয়া নাও। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ভাল কথা– আমার একটি ক্রীতদাস আছে তোমাদের ধর্মমতের এবং খুব শক্তিশালী; তাহার সঙ্গে বিনিময় করিয়া নাও। উমাইয়া সম্মত হইল, আবু বকর (রাঃ) এইরূপে সাইয়্যেদুনা বেলাল (রাঃ)-কে ছাড়াইয়া আনিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। সাইয়্যেদুনা বেলাল (রাঃ) মুসলমানদের নিকট এতই সম্মানিত ছিলেন যে, খলীফা ওমর (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, আবু বকর (রাঃ) আমাদের সর্দার ও মহান– তিনি আমাদের আর এক সর্দার ও মহানকে মুক্ত করিয়াছেন। (সীরাতে মোস্তফা ১-১৬০)

খাব্বার (রাঃ)

ইসলামের জন্য অগ্নি পরীক্ষার আর এক শিকার হযরত খাব্বাব (রাঃ)। উম্মে আনমার নামক এক দুরাত্মা নারীর ক্রীতদাস ছিলেন তিনি। সেই হতভাগিনী তাঁহাকে সর্বদা অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট করিত। একদা জ্বলন্ত অঙ্গার বিছাইয়া তাহার উপর তাঁহাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইল, আর এক পাষণ্ড তাঁহার বুকের উপর পা দিয়া চাপিয়া রাখিল। খাব্বাবের গায়ের চর্বি বিগলিত হইয়া সেই অগ্নি অঙ্গার নির্বাপিত হইল। খাব্বাব (রাঃ) বাঁচিয়া থাকিলেন, কিন্তু তাঁহার পিঠে ধবন কুষ্ঠের ন্যায় ঐ দাহের চিহ্ন বসিয়া ছিল।

অনেক সময় তাঁহাকে লৌহবর্ম পরাইয়া অগ্নিবৎ উত্তাপে ফেলিয়া রাখা হইত। কোন সময় উলঙ্গ শরীরে উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়াইয়া রাখা হইত; চামড়ার নীচের চর্বি বিগলিত হইয়া চামড়া বিদীর্ণ হইত এবং বিগলিত চর্বি বাহিয়া পড়িত। তাঁহার কোমরে ঐরূপ জখমের বহু চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। খলীফা ওমর (রাঃ) একদা তাঁহার অত্যাচারিত হওয়ার চিহ্ন দেখিতে চাহিলেন, তিনি তাঁহাকে নিজ কোমরের ঐ চিহ্নসমূহ দেখাইয়া ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার মালিক পাষণ্ডনীর অন্তরও হয়ত নরম হইতে বাধ্য হইল, সে তাঁহাকে মুক্তি দিয়া দিল।

আম্মার পরিবার

ইসলামের জন্য অকথ্য অত্যাচার ভোগের আর এক শিকার আম্মার (রাঃ) এবং তাঁহার মাতা-পিতা। তাঁহার পিতার নাম "ইয়াসির", অন্য দেশের বাসিন্দা; ইয়াসির মক্কায় আসিয়া আবু হোযায়ফা নামক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করেন এবং তথায় বসবাস করেন। আবু হোযায়ফার একটি দাসী ছিল "সুমাইয়া"। ঐ দাসীকে সে ইয়াসিরের নিকট বিবাহ দিয়া দেয়; তাঁহার গর্ভে আম্মার জন্ম লাভ করেন; এই সূত্রে আম্মার (রাঃ) আবু হোযায়ফার দাস পরিগণিত হন, কিন্তু সে তাহাকে মুক্তি দিয়া দেয়।

আম্মার (রাঃ) এবং তাঁহার মাতা-পিতা সকলেই মক্কায় অতিশয় দুর্বল ও নিম্নশ্রেণীর পরিগণিত ছিলেন। তাঁহারা তিন জনই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেকেই ভীষণভাবে অত্যাচারিত হন; এমনকি সেই অত্যাচারেই প্রথমতঃ ইয়াসির (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। অতপর একদা মাতা সুমাইয়্যা (রাঃ)-কে অগ্নিবৎ রৌদ্রে দাঁড় করিয়া শাস্তি দেওয়া হইতেছিল, নর পিশাচ আবু জাহল ঐ পথে যাইতেছিল; সেই পাষণ্ড পিশাচ সুমাইয়্যা (রাঃ)-কে তাঁহার লজ্জাস্থানে বর্ষাঘাত করে; তথায় তিনি শাহাদত বরণ করেন। অনেকের মতে ইসলামের পথে সর্বপ্রথম যাঁহার রক্তে যমীন রঞ্জিত হয় তিনি ছিলেন সুমাইয়া (রাঃ)। ইসলামের পথে পিতা এবং মাতা উভয়েই দুনিয়া ত্যাগ করিলেন। আম্মার (রাঃ) বাঁচিয়া আছেন; তাঁহার উপর অস্বাভাবিক অত্যাচার চলিল। তাঁহাকেও উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়াইয়া রাখা হইত; কোন সময় জ্বলন্ত অঙ্গার বিছাইয়া তাহার উপর শোয়ানো হইত। একদা এই অবস্থায় নবী (সঃ) তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ) স্বীয় মোবারক হস্ত তাঁহার মাথায় বুলাইলেন এবং দোয়া করিলেন– "হে আগুন! আম্মারের জন্য শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হইয়া যাও; যেরূপ ইব্রাহীমের জন্য হইয়াছিলে।" (আলাইহিস সালাম।)।

আম্মার (রাঃ)-কে তাঁহার পিতা-মাতাসহ একত্রে শাস্তি ভোগরত অবস্থায় কোন কোন সময় নবীজী (সঃ) নিচ চোখে দেখিতেন। নবীজী (সঃ) ঐ অবস্থায় তাঁহাদিগকে বলিতেন, হে ইয়াসির পরিবার! সবর কর, ধৈর্য ধর। কোন সময় দোয়া করিতেন– হে আল্লাহ! ইয়াসির-পরিবারের মাগফেরাত করিয়া দাও। কোন সময় নবীজী (সঃ) তাঁহাদের সৌভাগ্য চরমে পৌছাইয়া বলিতেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর; বেহেশত তোমাদের আকাঙ্ক্ষায় রহিয়াছে। (সীরাতে মোস্তফা, ১–১৬২)

আবু ফোকায়হাই ইয়াসার (রাঃ)

সাইয়্যেদুনা বেলালের অত্যাচারী মনিব পাষণ্ড উমাইয়ারই পুত্র সাফওয়ানের ক্রীতদাস ছিলেন আবু ফোকায়হা (রাঃ)। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে পাষণ্ড উমাইয়া তাঁহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া-হেঁচড়াইয়া নির্যাতন করিত। কোন সময় পায়ে লোহার বেড়ী লাগাইয়া উত্তপ্ত বালুর উপর অধঃমুখী শোয়াইয়া রাখিত। একদিন দুরাত্মা উমাইয়া তাঁহাকে ঊর্ধ্বমুখী শোয়াইয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল; ঐ সময় পাপিষ্ঠ উমাইয়ার ভ্রাতা আর এক নরাধম উবাই আসিয়া বলিল, আরও শক্ত ও কঠিনভাবে তাহার গলা টিপিয়া ধর। পাপিষ্ঠ উমাইয়া তাহাই করিল । এমনকি সকলেই ভাবিল, আবু ফোকায়হার জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া পাপিষ্ঠরা তথা হইতে চলিয়া গেল; তিনি সচেতন হইলেন এবং সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

আবু বকর (রাঃ) একদা তাঁহার চরম দুদর্শা দেখিয়া মর্মাহত হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রয় করিয়া নিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ১–১৬৪)

যনীরাহ রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহা

তিনি ক্রীতদাসী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁহার উপরও অমানুষিক অত্যাচার হইতে লাগিল। অসহনীয় অত্যাচারের ফলে তাঁহার চক্ষুদ্বয় বিনষ্ট হইয়া গেল; পাষণ্ডরা বলিতে লাগিলে, আমাদের দেবী "লাত" ও "ওজ্জা" তাহাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে। তিনি বলিলেন, লাত ও ওজ্জা ত এরূপ অপদার্থ যে, তাহাদের পূজারী সম্পর্কেও তাহাদের কোন খবর নাই। আমার যাহা হইয়াছে আল্লাহর আদেশে হইয়াছে; আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করিলে আমার চক্ষু ভালও হইয়া যাতে পারে। সত্য সত্যই ঐদিন ভোর বেলা নিদ্রা হইতে উঠিলে তাঁহার চক্ষুদ্বয় সম্পূর্ণ ভাল ছিল। তাঁহাকেও আবু বকর (রাঃ) ক্রয় করিয়া মুক্তি দান করিয়াছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা ১–১৬৫)

এতদ্ভিন্ন নাহ্‌দিয়াহ এবং তাঁহার কন্যা লবীনা, মুআম্মেলিয়াহ উম্মে আব্‌স– তাঁহারা সকলেই ক্রীতদাসী ছিলেন এবং মুসলমান হওয়ার অপরাধে অত্যাচারের যাঁতাকলে পিষ্ট হইতেছিলেন। আবু বকর (রাঃ) একে একে প্রত্যেককেই ক্রয় করিয়া মুক্তি দান করতঃ নির্যাতন হইতে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পুরুষদের মধ্যে বেলাল, আবু ফোকায়হা এবং আমের ইবনে ফোহায়রা– তাঁহারাও ক্রীতদাস ছিলেন; মুসলমান হওয়ার অপরাধে অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইতেছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেককে আবু বকর (রাঃ) ক্রয় করিয়া মুক্তিদানে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা,–১৬৬)

দুনিয়ার কোন লাভ বা স্বার্থ ছাড়া শুধু নিপীড়িত মুসলমানকে উদ্ধারকরণে আবু বকর (রাঃ) তাঁহার ধন এইরূপ অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন। নবী (সঃ) তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, "আমার উপর জান-মালের সর্বাধিক উপকার যাঁহার রহিয়াছে, তিনি হইলেন আবু বকর।" (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

১৬৭৭। হাদীছ ঃ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابًا يَقُوْلُ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شِدَّةً فَقُلْتُ اَلاَ تَدْعُوْا اللّٰهَ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمَشَاطِ الْحَدِيْدِ مَادُوْنَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ اَوْعَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِيْنِهِ وَيُوْضَعُ الْمِيْشَارُ عَلٰى مَفْرَقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَلَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ اِلاَّ اللّٰهَ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ۔ (وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ)*

অর্থ ঃ খাব্বাব (রাঃ)* বর্ণনা করিয়াছেন, (যখন আমরা মুষ্টিমেয় ইসলাম গ্রহণকারী দুর্বল লোক মোশরেকদের জুলুম-অত্যাচারের স্টীম-রোলারে নিষ্পেষিত হইতেছিলাম তখনকার ঘটনা-) একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কা'বা গৃহের ছায়ার স্বীয় চাদরখানা মাথার নীচে দিয়া শোয়া অবস্থায় ছিলেন, তখন আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম (আমরা ত কাফেরদের অত্যাচারে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছি), আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, সাহায্য তলব করুন। এতদশ্রবণে হযরত (সঃ) শোয়াবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং (রাগের দরুন) তাঁহার চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হইয়া গেল। অতপর তিনি বলিলেন, তোমাদের পূর্বেও ঈমান ও ইসলামের জন্য মানুষকে বহু কষ্ট-যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে- এক একজন মানুষকে দ্বীন ও ঈমান হইতে ফিরাইবার জন্য লোহার চিরুনি দ্বারা শরীরের মাংস ও হাড়ের উপরের মাংসপেশী পর্যন্ত আঁচড়াইয়া ফেলা হইত; এত কষ্ট-যাতনাও তাহাকে দ্বীন-ঈমান হইতে ফিরাইতে পারিত না এবং (যমীনের মধ্যে পা গাড়িয়া) করাত দ্বারা মাথা হইতে চিরিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলা হইত, তাহাও তাহাকে দ্বীন-ঈমান হইতে ফিরাইতে পরিত না- সব কিছু সহ্য করত দ্বীন-ঈমান আঁকড়াইয়া থাকিত।

(তোমরা ধৈর্য ধর, দ্বীন-ইসলামের এই অবস্থা থাকিবে না,) নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা দ্বীন-ইসলামকে অতিশয় শক্তিশালী করিবেন, সারা বিশ্বে ইহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এমনকি একা একজন মুসলমান ইয়ামান দেশের সানা এলাকা হইতে সুদূর হাজ্‌রামাউত পর্যন্ত একা একা সফর করিতে পারিবে; এক আল্লাহ ভিন্ন বন-জঙ্গলের বাঘ-ভল্লুক ছাড়া কোন মানুষের ভয় তাহাকে করিতে হইবে না। (দ্বীন ইসলামের এইরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি ও শান্তির দিন নিশ্চয় আসিবে, অবশ্য তাহা একটু সময়সাপেক্ষ।) কিন্তু তোমরা ঐ অবস্থা অতি তাড়াতাড়ি চাহিতেছ (যাহা বাঞ্ছনীয় নহে- তোমাদিগকে সময়ের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ করিতে হইবে)

পরীক্ষার ফল

হেনা বা মেহেদি পাতা দুলালীর হাতকে কত সুন্দর রং দেয়; পিষিত না হইয়া কি সেই পাতা ঐ রং দিতে পারে? رنگ لاتی هے حنا پس جانے کے بعد "পিষিত হওয়ার পরেই হেনার রং বিকশিত হয়।" ইসলামের অপূর্ব প্রাণশক্তিও ঠিক তদ্রূপই। ইসলামের জন্য নিষ্পেষণের মাত্রা যতই বাড়িতে থাকে, ভিতর হইতে খাঁটি ইসলামের শক্তি ততই প্রকাশ পাইতে থাকে। ইতিহাসে এইরূপ একটি নজিরও পেশ করিতে

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বাক্যটি ৫১০ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।

* খাব্বাব (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম একজন ছিলেন। তিনিও বেলাল রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ন্যায় কাফেরদের অমানুষিক অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইয়াও দ্বীন-ইসলামকে আঁকড়াইয়া ছিলেন। পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

পারিবে না যে, ঐ সকল অমানুষিক উৎপীড়ন-নির্যাতনে মুসলমান একটি প্রাণীও ইসলাম হইতে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হইয়াছিল। দুরাচার বিধর্মীরা তাহাদের পাশবিকতা প্রকাশে শক্তির সর্বশেষ বিন্দু ব্যয় করিত; আর ইসলামের অনুরক্ত ভক্তগণ আত্মত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত ইসলামের গৌরব ও মহিমা অকাতরে প্রকাশ করিয়া যাইতেন। كذالك الايمان اذا خالط بشاشته القلوب "ঈমান ও ইসলামের আভা যখন অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যায় তখন তাহার স্থিরতা, দৃঢ়তা ও অটলতা এইরূপ পর্বত সদৃশই হইয়া থাকে।" (৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।)

সম্ভ্রান্তগণের উপরও অত্যাচার

বলাবাহুল্য, শুধু নিঃস্ব দরিদ্র দুর্বল মুসলমানদের উপরই অত্যাচার-উৎপীড়ন সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশজোড়া যখন মুসলমানদের উপর অত্যাচারের ঝড় সৃষ্টি হইল এবং অত্যাচারীরা উগ্র হইয়া পড়িল, তখন উত্তেজনার মুখে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও কোন কোন ঘটনায় অমানুষিক অত্যাচারের কবলে পতিত হইলেন।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটি ঘটনা– মুসলমানদের সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছিতেছে– এই সময় আবু বকর (রাঃ) অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, ইসলামের আহ্বান প্রকাশ্যে চালাইবার। নবী (সঃ) প্রথমে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু আবু বকরের পীড়-পীড়িতে পরে তাহা মঞ্জুর করিলেন। এমনকি সকল মুসলমানসহ হরম শরীফের মসজিদে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রকাশ্য ভাষণ দানে আবু বকর (রাঃ) দণ্ডয়মান হইলেন। একজন মুসলমানের পক্ষ হইতে ইসলামের সাধারণ বক্তৃতা সর্বপ্রথম উহাই। বক্তৃতা শুধু আরম্ভই হইয়া ছিল, তৎক্ষণাত কাফের-মোশরেক দল চতুর্দিক হইতে মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আবু বকর (রাঃ) বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু উত্তেজনার মুখে তিনিও রেহাই পাইলেন না– তাঁহার উপরও ভীষণ প্রহার পড়িল। বেদম প্রহারে তাঁহার মুখমণ্ডল পর্যন্ত এরূপ জখম ও রক্তাক্ত হইল যে, তাঁহাকে চেনা যাইত না, তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার বংশের লোকেরা সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিল এবং অচৈতন্য অবস্থায় তাঁহাকে উঠাইয়া বাড়ী নিয়া যাওয়া হইল। কাহারও আশা ছিল না যে, তিনি এত আঘাতে বাঁচিতে পারিবেন; তাই তাঁহার বংশের লোকেরা ঘোষণা দিল, যদি আবু বকরের মৃত্যু হইয়া যায় তবে প্রতিশোধে আমরা রবিয়া পুত্র ওতবাকে খুন করিব, কারণ আবু বকর (রাঃ)-কে প্রহারে সেই সর্বাগ্রে ছিল।

আবু বকর (রাঃ) সারা দিন অচেতন অবস্থায় রহিলেন, এমনকি শত ডাকিলেও উত্তর পাওয়া যাইত না। সন্ধ্যার দিকে ডাক দেওয়া হইলে তিনি কথা বলিলেন; চেতনা লাভের পর তাঁহার সর্বপ্রথম কথা ছিল, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কি অবস্থা?

এই কথায় বংশের লোকেরা ভীষণ দুঃখিত ও বিরক্ত হইল যে, যাহার সঙ্গে থাকায় এত বিপদ, এই মুহূর্তে আবার তাহার নাম! বিরক্ত হইয়া সকলে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল; তাঁহার মাতাকে বলিয়া গেল যে, তাঁহাকে কিছু খাওয়াইবার ব্যবস্থা করুন। তাঁহার মাতা কিছু খাদ্য তৈয়ার করিয়া আনিলে তিনি মাতাকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থা কি? বিরক্তির সহিত মাতা বলিল, আমি তাহা কি জানি?

উম্মে জমীল নাম্নী এক মুসলমান মহিলা ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা সাধারণভাবে গোপন রাখিয়াছিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁহার ইসলাম জ্ঞাত ছিলেন, তাই তিনি আশা করিলেন, ঐ মহিলা নবীজীর (সঃ) সংবাদ নিশ্চয় জ্ঞাত থাকিবেন। সেমতে আবু বকর (রাঃ) তাঁহার মাতাকে বলিলেন, আপনি উম্মে জমীলের নিকট যাইয়া নবীজীর অবস্থা জ্ঞাত হইয়া আসুন, তারপরে আমি খানা খাইব। মা তাহাই করিলেন, কিন্তু তিনি উম্মে জমীলের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নবীজীকে চিনেন বলিয়াও স্বীকার

করিলেন না। তবে তিনি বলিলেন, তোমার পুত্রের সংবাদে মনে খুব ব্যথা লাগিয়াছে; চল আমি তাহাকে দেখিয়া আসিব। উম্মে জমীল (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে দেখিয়া কাঁদিয়া দিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে নবীজীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গোপনে আবু বকরের মাতার ভয় প্রকাশ করিলেন। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তাঁহার কোন ভয় করিও না, তখন উম্মে জমীল বলিলেন, নবীজী (সঃ) অক্ষত ও সুস্থ আছেন। আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এখন কোথায় আছেন? উম্মে জমীল বলিলেন, তিনি এখন আরকামের গৃহে আছেন। তখন আবু বকর (রাঃ) কসম করিয়া বলিলেন– যাবত নবীজী (সঃ)-কে দুই নয়নে না দেখিব তাবত কোন পানাহার গ্রহণ করিব না।

এই অবস্থায় আবু বকর (রাঃ) পানাহার গ্রহণ করিবেন না– ইহা কি মায়ের প্রাণ মানিয়া লইতে পারে? রজনী যখন গভীর হইয়া আসিল; লোকজনের চলাচল বন্ধ হইয়া গেল, তখন মা আবু বকর (রাঃ)কে গোপনে আরকামের গৃহে পৌঁছাইলেন। নবীজী (সঃ)-কে পাইয়া আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন; নবীজী (সঃ)ও আবু বকর (রাঃ)-কে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিলেন। উপস্থিত মুসলমানগণও আবু বকর (রাঃ)-কে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; কারণ তাঁহার অবস্থা দেখাও অসহনীয় ছিল।

আবু বকর (রাঃ) ঐ সময় স্বীয় মাতার ইসলামের জন্য নবীজীর (সঃ) নিকট দোয়ার দরখাস্ত করিলেন। নবীজী (সঃ) দোয়া করিলেন এবং তাঁহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন; তৎক্ষণাত তিনি মুসলমান হইয়া গেলেন। (হেকায়াতে ছাহাবা–৩০৩)

এতদ্ভিন্ন অভিজাত সম্ভ্রান্তদের কেহ মুসলমান হইলে তিনি দুর্বলদের ন্যায় যত্রতত্র সকলের যথেচ্ছ দুর্ব্যবহারের শিকার না হইলেও নিজ বংশীয় লোকদের এবং আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা অবশ্যই উৎপীড়িত হইতেন।

ওসমান (রাঃ) মক্কার একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী লোক ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলে তাঁহার বংশীয় লোকেরা তাঁহার উপর ক্ষেপিয়া উঠিল; তাঁহার পিতৃব্য হস্তপদ বাঁধিয়া তাঁহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিত। তাহাদের অত্যাচারে তিনি বাধ্য হইয়া সস্ত্রীক দেশত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

নরাধম নরপিশাচরা মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার করিতে করিতে এতই উগ্র ও উন্মাদ হইয়া পড়িল যে, স্বয়ং নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনেও নানারূপ কষ্ট-যাতনার সৃষ্টি করিতে লাগিল। হযরতের ঘরে-দুয়ারে মরা-পচা, গান্ধা-গলিজ বস্তু ফেলিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিত। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১–২০১)।

পথে-ঘাটে হযরতের মাথার উপর ধুলা-বালু ছুঁড়িয়া মারিত, তাঁহার উপর আঘাত করিত উৎপীড়ন-উত্ত্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

প্রথম খণ্ডের ১৭০ নং হাদীছে তাহাদের ঐরূপ একটি জঘন্য ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে। নিম্নের হাদীছটিও তাহার নমুনা

১৬৭৮। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা–৫১৯) عـن عـروة بـن الـزبـيـر قـال سَـأَلْـتُ ابْـنَ عَـمْـرِو بْـنِ الْـعَـاصِ أَخْـبِـرْنِـى بِـاَشَـدِّ شَـىْءٍ صَـنَـعَـه الْـمُـشْـرِكُـوْنَ بِـالـنَّـبِـىِّ صَـلَّـى الـلّٰـهُ عَـلَـيْـهِ وَسَـلَّـمَ قَـالَ بَـيْـنَـا الـنَّـبِـىُّ صَـلَّـى الـلّٰـهُ عَـلَـيْـهِ وَسَـلَّـمَ يُـصَـلِّـىْ فِـىْ حِـجْـرِ الْـكَـعْـبَـةِ اِذْ اَقْـبَـلَ عُـقْـبَـةُ بْـنُ اَبِـىْ مُـعَـيْـطٍ فَـوَضَـعَ ثَـوْبَـهٗ فِـىْ عُـنُـقِـهٖ فَـخَـنَـقَـهٗ خَـنْـقًـا شَـدِيْـدًا فَـاَقْـبَـلَ اَبُـوْ بَـكْـرٍ حَـتّٰـى اَخَـذَ بِـمَـنْـكِـبَـيْـهِ وَدَفَـعَـهٗ عَـنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَّبِّكُمْ -

অর্থ ঃ ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছাহাবী) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-কে আমি বলিলাম, মক্কার মোশরেকেরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর যে অমানুষিক জুলুম-অত্যাচার করিয়াছে তাহা হইতে একটা জঘন্যতম ঘটনা শুনান ত।

তিনি বলিলেন, একদা নবী (সঃ) বায়তুল্লাহ শরীফের হাতীমে নামায পড়িতে ছিলেন। হঠাৎ ওকবা ইবনে আবী মো'আইত তথায় আসিয়া তাহার কাপড় হযরতের গলায় জড়াইয়া ভীষণভাবে চিপা দিল।

আবু বকর (রাঃ) দৌড়াইয়া আসিলেন এবং ওকবার কাঁধে ধাক্কা দিয়া নবী (সঃ) হইতে হটাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমরা একটি লোককে এই জন্য মারিয়া ফেলিতে চাও যে, তিনি বলেন, আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ; অথচ তিনি তাঁহার দাবীর পক্ষে তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে কত কত উজ্জ্বল প্রমাণ পেশ করিয়াছেন?

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ছাহাবীদের উপর মোশকেরদের তরফ হইতে যেসব লোমহর্ষক জুলুম-অত্যাচার হইয়াছিল তাহা ইসলামের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। এ স্থলে ঐ সবের নমুনা উল্লেখ করিলেও তাহাতেই বড় বই হইয়া যাইবে। মোটকথা নবুয়তের চতুর্থ বৎসর হইতে ঐ সব জুলুম-অত্যাচার আরম্ভ হয় এবং ক্রমান্বয়ে বিভীষিকাময় আকার ধারণ করিতে থাকে।

আবু তালেব কর্তৃক হযরত (সঃ)-কে
রক্ষা করার ভার গ্রহণ

মুসলমানদের ঐতিহাসিক দুর্দিনে কয়েকজন মুসলমান ছিলেন বেলাল (রাঃ) ও সোহায়েব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ন্যায় ক্রীতদাস শ্রেণীর। তাঁহাদের উপর ত জুলুম-অত্যাচারের কোন সীমাই ছিল না, যাহারা মুক্ত কিন্তু কাফেরদের বৃহৎ শক্তির সম্মুখে দুর্বল তাঁহাদের উপরও অত্যাচার হইত, কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি গোত্রীয় রক্ষাব্যূহ কিছুটা সহায়কের কাজ করিত। বিশেষতঃ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পক্ষে ঐরূপ সহায়তার উসিলা আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরতই ছিল।

হযরতের পিতার স্থলে তাঁহার লালন-পালনের ভার বহনকারী দাদা আবদুল মোত্তালেবের মৃত্যুও হযরতের শৈশবকালে হইয়া যায়। তৎপর হযরতের চাচা আবু তালেব তাঁহার লালন-পালনের ভার লইয়াছিলেন। আট বৎসর বয়স হইতে হযরতের ন্যায় চরিত্রবান ছেলের লালন-পালনকারী আবু তালেবের অন্তর হযরতের মায়া-মহব্বত, স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ ছিল এবং দীর্ঘ দিনের এই স্নেহ-মমতার চাপ তাঁহার অন্তরে এমনভাবে পাকা-পোক্তা হইয়া গিয়াছিল যে, কোন পরিস্থিতিতেই তিনি তাহাতে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই দুর্দিনে আবু তালেবের সেই অকৃত্রিম স্নেহ মমতাকে আল্লাহ তাআলা হযরতের জন্য বাহ্যিক রক্ষাব্যূহ বানাইয়া দিলেন। তখন আবু তালেব মক্কার মধ্যে একজন অন্যতম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী সর্দার পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার ইশারার উপর কোরায়শ বংশীয় বৃহত্তম দুইটি গোত্র বনু হাশেম ও বনু মোত্তালেবের প্রতিটি মানুষ জীবন দানে দাঁড়াইয়া যাইত। সেই আবু তালেব হযরতের রক্ষণাবেক্ষণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। এই বিষয়টি মক্কার মোশরেকদের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা ব্যক্তিগতভাবে এবং একাধিকবার প্রতিনিধিত্বমূলকরূপে আবু তালেবের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে বারণ করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল।

মোশরেকরা হযরতের বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্র আঁটিল, আবু তালেব ততই হযরতের সাহায্যে দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন; এমনকি শেষ পর্যন্ত আবু তালেব মক্কাবাসীদের মোকাবিলায় স্বীয় শক্তি দৃঢ়তর করার জন্য বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের সকলকে একত্রিত করিয়া হযরতের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিতে উদ্বুদ্ধ করিলেন। সকলেই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল এবং সমবেতভাবে সর্বাবস্থায় হযরতকে সাহায্য করার ঘোষণা জারি করিয়া দিল।

নবুয়তের পঞ্চম বৎসর আবিসিনিয়া বা হাবশায় হিজরত (পৃষ্ঠা-৫৪৬)

মক্কার প্রভাবশালী দুইটি গ্রোত্র বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের শক্তি ও সমর্থনে পুষ্ট আবু তালেবের সাহায্য-সহায়তার দরুন হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মোশরেকগণ ইচ্ছানুরূপ জুলুম-অত্যাচার করিতে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হইয়া ছাহাবীগণের উপর তাহাদের সমুদয় ঝাল মিটাইবার উন্মাদনায় মত্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের উপর এমনভাবে অত্যাচার বহাইয়া দিল যে, ইহা সহ্য করিয়া নেওয়া কোন প্রাণীর পক্ষেই সাধ্যকর ছিল না।

তদুপরি বড় কষ্ট মুসলমানদের এই ছিল যে, তাঁহারা সকলে এবাদত-বন্দেগী আদায় করার সুযোগ পাইতেন না, কোরআন পাঠ করিতে পারিতেন না! দৈহিক নির্যাতন অপেক্ষা এই নির্যাতন মুসলমানদের পক্ষে অধিক বেদনাদায়ক ছিল।

এতদ্দৃষ্টে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছাহাবীগণকে বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয় জীবন বাঁচাইয়া স্বীয় দ্বীন-ঈমান রক্ষার জন্য আবিসিনিয়ায় চলিয়া যাইতে পার। তথাকার শাসনকর্তা একজন সুপ্রকৃতির লোক, সে কাহারও উপর কোন জুলুম-অত্যাচার করে না। নবুয়তের পঞ্চম বৎসর রজব মাসে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এই অনুমতি প্রদান করেন, সেমতে ছাহাবীগণের মধ্য হইতে ১২ জন আবিসিনিয়ায় হিজরত করিলেন। তন্মধ্যে মাত্র ৪ জন নিজের সঙ্গে স্ত্রীকেও লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ৮ জন স্ত্রী-পুত্র সর্বস্ব ত্যাগ করতঃ নিসঙ্গরূপেই হিজরত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ মত অনুসারে মোট ১৬ জনের একটি দল মক্কা ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়ার দিকে রওয়ানা হন। তাঁহারা হইলেন- (১) ওসমান গনী (রাঃ), (২) এবং তাঁহার স্ত্রী হযরতের কন্যা রুকাইয়্যাহ্ (রাঃ), (৩) আবু হোযায়ফা (রাঃ), (৪) এবং তাঁহার স্ত্রী সাহ্‌লা বিনতে সোহায়ল (রাঃ), (৫) আবু সালামা (রাঃ), (৬) এবং তাঁহার স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ), (৭) আমের ইবনে রবিয়া (রাঃ), (৮) এবং তাঁহার স্ত্রী লায়লা (রাঃ), (৯) সোহায়ল (রাঃ), (১) আবু সোবরা (রাঃ), হাতেব ইবনে আমর (রাঃ), (১২) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ), (১৩) আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), (১৪) যোবায়ের (রাঃ), (১৫) মোসআ'ব ইবনে ওমায়ের (১৬) এবং দলপতি ওসমান ইবনে মযউ'ন (রাঃ)।

এই দলটিই ছিল এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহর জন্য এবং দ্বীন ও ঈমানের জন্য স্বীয় দেশ-খেশ সর্বস্ব ত্যাগকারী। দ্বীন ইসলামের জন্য তাঁহারা জন্মভূমি, ঘর-বাড়ী আত্মীয়-স্বরণের মায়া ত্যাগে দেশান্তরিত হইতে বাধ্য হইলেন। নরপিশাচরা জানিতে পারিলে এই কাজেও বাধার সৃষ্টি করিবে, তাই তাঁহারা গোপনে মক্কা হইতে পদব্রজে বাহির হইয়া পড়েন এবং (লোহিত সাগরের কিনারায় পৌঁছিয়া) বাণিজ্যিক নৌকায় আরোহণ করেন। মক্কার কাফেররা সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে পাকড়াও করিবার জন্য পিছনে ধাওয়া করে; কিন্তু তাহাদের পৌঁছিবার পূর্বেই নৌকা ছাড়িয়া যায়। (যোরকানী, ১-২৭১)

মক্কাবাসীদের মুসলমান হইয়া যাওয়ার গুজব

মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় পৌঁছিলেন, হযরতের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হইল- তাঁহারা তথায় পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিলেন। ইতিমধ্যে মক্কায় একটি ঘটনা ঘটিল- "একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি অসাল্লাম সূরা 'নজ্‌ম' তেলাওয়াত করিলেন, তাহাতে সেজদার আয়াত আছে; তিনি এবং তাঁহার সঙ্গে উপস্থিত মুসলমানগণ সেজদা করিলেন, তথায় উপস্থিত মোশরেকরাও সেজদায় পড়িয়া গেল।" ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ ১ম খণ্ড ৫৬৯ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

মুসলমানদের সঙ্গে মোশরেকরাও সেজদা করার এই সংবাদটি চতুর্দিকে এই আকারে ছড়াইয়া পড়িল যে, মক্কাবাসী মোশরেকগণ মুসলমান হইয়া গিয়াছে, এমনকি এই খবর আবিসিনিয়ায়ও পৌঁছিয়া গেল। মুসলমানগণ তথায় রজব মাসে পৌঁছিয়াছিলেন। রমযান মাসে সেজদার ঘটনা ঘটিয়াছিল। (তব্‌কাতে ইবনে সা'দ ১-২০৬) শওয়াল মাসেই কিছু সংখ্যক মুসলমান আবিসিনিয়া হইতে মক্কাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মক্কার নিকটে পৌঁছিলে পর তাঁহারা মূল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং ইহাও জানিতে পারিলেন যে, বর্তমানে মক্কায় জুলুম-অত্যাচারের ঝড় অধিক বেগে বহিতেছে। তখন কয়েকজন ত পুনঃ আবিসিনিয়ায় চলিয়া আসিলেন এবং কয়েকজন মক্কায় আসিয়া কাহারও আশ্রয়ে রহিলেন। (আসাহ্‌হুস্ সিয়ার-৮৮)

মক্কায় মুসলমানদের উপর বিশেষতঃ যাহারা আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেন তাঁহাদের উপর ভয়াবহ জুলুম-অত্যাচার চলিতে লাগিল। অবস্থাদৃষ্টে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পুনরায় ছাহাবীগণকে আবিসিনিয়ায় চলিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। ছাহাবীগণ দ্বিতীয় বার গোপনে গোপনে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাইতে লাগিলেন। এই বার দলবদ্ধভাবে না যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন গেলেন। সর্বপ্রথম আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভ্রাতা জা'ফর (রাঃ) গিয়াছিলেন।

নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসর- মুসলমানদের পক্ষে কতিপয় শুভ লক্ষণ

"কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট লাভ" ইহা নির্ধারিত সাধারণ নিয়ম। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট আছে, দুঃখের সঙ্গে সুখ আছে, দুর্ভোগের সঙ্গে মঙ্গল আছে। নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট আছে.......।

মুসলমানদের পক্ষেও এই নীতির উদয় হইল। মক্কার দুরাচাররা মুসলমানদের দমাইবার ও ধর্মান্তর করার জন্য অত্যাচারের শেষ সীমা ছাড়াইয়া গেল, কিন্তু মুসলমানগণ বিন্দুমাত্র দমিলেন না। দ্বীন-ঈমানের জন্য যথাসর্বস্ব ত্যাগে দেশান্তরিত হইতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইলেন না। ভীষণতম দুর্ভোগও তাঁহাদের সত্য সাধনার অগ্রাভিযানে বাধার সৃষ্টি করিতে পারিল না। প্রতি মুহূর্তে তাঁহারা নূতন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিয়া দ্বীন-ঈমানে পর্বত অপেক্ষা অধিক অটল হইয়া রহিলেন। এই শঙ্কা, উদ্বেগ, অগ্নি পরীক্ষা ও কঠোর নির্যাতনের অন্ধকার মাঝে মঙ্গলের বিজলী চমকিতে আরম্ভ করিল।

নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসর মুসলমাদের মঙ্গল ও শুভ লক্ষণের তিনটি নক্ষত্র উদিত হইল। প্রথমটি হইল এক নব ইতিহাসের সূচনা- মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম ষড়যন্ত্র করিতে গিয়া মক্কার কাফেরদের জঘন্যরূপে পরাজয় বরণ। ঘটনার বিবরণ এই- মুসলমানগণ পর পর মক্কা ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়ায় যাইতে লাগিলেন, কেহ একা আর কেহ পরিবারবর্গসহ। এইরূপে সর্বমোট ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ জন মহিলা তথায় পৌঁছিলেন।

তথাকার শাসনকর্তা ছিলেন অতিশয় ভাল লোক, তাঁহার নাম ছিল 'আসহামা'। তিনি ঈসায়ী বা খৃষ্টান ধর্মের অনুসুরী ছিলেন; কিন্তু তিনি মুলমানদিগকে অতি আদর যত্নের সহিত তথায় বসবাসের সুযোগ প্রদান করিলেন।

মক্কার মোশরেকদের নিকট আবিসিনিয়ায়মুসলমানদের সুখ-শান্তি ও সুযোগ-সুবিধার খবর পৌঁছিতে লাগিল, ইহাতে তাহারা খুবই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা মুসলমানদের তথাকার সুখ-শান্তি নষ্ট করার

চেষ্টা-তদবীরে লাগিয়া গেল। এমনকি, নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসরের শেষ দিকে আবিসিনিয়ার বাদশাকে প্রভাবান্বিত করা এবং তথা হইতে প্রবাসী মুসলমানদিগকে বাহির করিয়া দিতে সম্মত করার জন্য তাহারা একটি প্রতিনিধি দল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল। তাহারা আরবের প্রসিদ্ধ কূটনীতিবিদ আম্‌র ইবনুল আছ্* এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবী রবীয়া'কে বহু রকম উপঢৌকন সঙ্গে দিয়া তথায় পাঠাইল। তাহারা দু' জনই আবিসিনিয়ায় যাইয়া প্রথমতঃ তথাকার সর্দারগণকে অনেক রকম উপঢৌকন পেশ করিয়া বুঝাইল যে, মক্কার কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক স্বীয় বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করিয়া দেশে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছিল। মক্কাবাসীগণ তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়াছে; তাহারা তথা হইতে পলায়ন করিয়া আপনাদের দেশে আসিয়া স্থান লইয়াছে। আমরা তাহাদিগকে ধরিয়া দেশে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। আপনারা এই দেশের সর্দার, আপনারা বাদশাহকে এই ব্যাপারে সম্মত করাইবার জন্য আমাদের সাহায্য করিবেন। বাদশাহ যেন তাহাদিগকে কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়া আমাদের হাতে সোপর্দ করেন। কারণ, আমরা তাহাদের সম্পর্কে সব কিছু জানি।

অতপর তাহারা সর্দারগণকে লইয়া বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইল এবং অনেক কিছু উপঢৌকন পেশ করতঃ মুসলমানদের সম্পর্কে ঐরূপ মন্তব্যই করিল এবং তাহাদিগকে দেশে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব পেশ করিল। সর্দারগণও বাদশাহকে অনুরোধ করিল যে, তাহাদিগকে ইহাদের হাতে সোপর্দ করিয়া দেওয়া হউক। ইহাতে বাদশাহ রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, তাহারা আমার আশ্রয় লইয়াছে; অতএব আমি তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিতে পারি না। অবশ্য তাহাদিগকে সম্মুখেই ডাকিয়া আনিতেছি। উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে সকলেরই বক্তব্য শুনা হইবে। যদি তোমাদের বক্তব্য সত্য হয় তবে তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করা হইবে, নতুবা তাহাদিগকে অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে।

অতপর মুসলমানগণকে ডাকা হইল; তাঁহারা অবিলম্বে কর্তব্য স্থির করার জন্য তাড়াহুড়ার মধ্যে একত্রে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা জা'ফর (রাঃ)-কে বক্তব্য পেশকারী মনোনীত করিলেন এবং এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আমাদিগকে ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে আমরা ইসলাম ও ঈমানের খাঁটি বক্তব্যই পেশ করিব; নবীজী (সঃ) আমাদিগকে যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছেন সবই প্রকাশ করিয়া দিব, কিছুই গোপন করিব না; তাহাতে আমাদের পরিণাম যাহাই হয় হইবে।

মুসলমান দল বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহর দরবারে তাঁহার সকল পারিষদবর্গ তাহাদের ধর্মীয় পুস্তক লইয়া উপস্থিত আছে এবং মক্কা হইতে আগত প্রতিনিধিদ্বয় বাদশাহর দুই দিকে উপবিষ্ট হইয়াছে। তখনকার রীতি ছিল– বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রথমে সেজদা করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইত। মুসলমান দল বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শুধু সালাম করিলেন, সেজদা মোটেই করিলেন না। উপস্থিত সকলেই আপত্তি জানাইল যে, তোমরা বাদশাহকে সেজদা কেন করিলে না? মুসলমানদের পক্ষে জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, আমরা একমাত্র সর্বশক্তিমান সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেজদা করি না। তাহারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি তাঁহার রসূল প্রেরণ করিয়াছেন, সেই রসূল আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন, আমরা যেন এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহাকেও সেজদা না করি। (যোরকানী, ১–২৮৮)

অতপর স্বয়ং বাদশাহর তরফ হইতে মুসলমানগণকে প্রশ্ন করা হইল যে, তোমরা আমার ধর্মেও নও, বর্তমান যুগের কোন ধর্মেও নও– সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া যে ধর্ম তোমরা লইয়াছ তাহা কি ধর্ম? তদুত্তরে জা'ফর (রাঃ) সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন–

হে বাদশাহ! আমরা অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত বর্বর জাতি ছিলাম, আমরা গর্হিত দেব-দেবীর পূজা করিয়া থাকিতাম। মরা খাইতে এবং ব্যভিচার করিতে দ্বিধাবোধ করিতাম না, আত্মীয়তা ছেদন করিতাম,

* তাঁহারা উভয়ে পরে মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাড়া-প্রতিবেশীর উপর জুলুম-অত্যাচার করিতাম, আমাদের মধ্যে সবল দুর্বলকে গ্রাস করিয়া ফেলিত; আমাদের গোটা জাতির অবস্থাই এইরূপ ছিল। এমতাবস্থায় আমাদের প্রতি আল্লাহর রসূল প্রেরিত হইয়াছেন, যিনি আমাদের মধ্যকারই একজন লোক, আমরা তাঁহার বংশ পরিচয় পূর্ণরূপে অবগত আছি এবং তাঁহার সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও পবিত্রতা সম্পর্কেও পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি। তিনি আমাদিগকে আহ্বান জানাইয়াছেন আমরা যেন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনি, আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করি এবং একমাত্র তাঁহারই উপাসনা—এবাদত করি। আর আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে পাথর ইত্যাদি দ্বারা তৈয়ারী মূর্তির পূজা করিয়া থাকিতাম আমরা যেন ঐসব ত্যগ করি। তিনি আমাদিগকে সত্যবাদিতা, আমানতদারী, আত্মীয়তা রক্ষা, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং হারামকারী ও নরহত্যা হইতে বাঁচিয়া থাকার আদেশ করিয়াছেন। ব্যভিচার, মিথ্যা, এতীমের মাল হরণ এবং কাহারও প্রতি মিথ্যা তোহ্মত লাগাইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে বিশেষ রূপে আদেশ করিয়াছেন, আমরা যেন আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক না করি। এতদ্ভিন্ন তিনি আমাদিগকে নামায, যাকাত ও রোযার আদেশ করিয়াছেন। জা'ফর (রাঃ) এইরূপে ইসলামের আহ্কামসমূহে বাদশাহর সম্মুখে ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, আমরা সেই রসূলকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তিনি আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আমাদের জন্য যে জীবন বিধান আনিয়াছেন, আমরা তাহার অনুসারী হইয়াছি। ফলে আমরা এক আল্লাহর এবাদত করি, আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক বা সাথী সাব্যস্ত করি না। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন তাহা বৈধরূপে গ্রহণ করিয়াছি এবং যাহা অবৈধ করিয়াছেন তাহা বর্জন করিয়াছি।

আমাদের উক্ত কার্যধারার উপরই মক্কাবাসীরা আমাদের উপর অমানুষিক জুলুম-অত্যাচার করিয়াছে, ভয়াবহ কষ্ট-যাতনা দিয়াছে এবং আমাদিগকে আমাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, যেন আমরা আল্লাহর এবাদত ছাড়িয়া মূর্তিপূজায় লিপ্ত হই, অবৈধসমূহকে বৈধরূপে গ্রহণ করি। যখন তাহারা জুলুম-অত্যাচার করিয়া আমাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়াছে এবং আমাদের ধর্ম পালনে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আমরা বাধ্য হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়াছি। আপনার ন্যায়নিষ্ঠার সুখ্যাতি থাকায় অন্য কোন বাদশাহর প্রতি খেয়াল না করিয়া আপনার রাজ্যে আসিয়াছি; আমরা আপনার আশ্রয়ের আশা করিয়াছিলাম। হে বাদশাহ! আমরা আশা রাখি, আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া কাহারও দ্বারা অত্যাচারিত হইব না।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের রসূল আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে যাহা লাভ করিয়াছেন তাহার কোন অংশ কি এখন আপনার স্মরণে আছে?

অতি বিচক্ষণ আল্লাহ ভক্ত ছাহাবী জা'ফর (রাঃ) স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া পবিত্র কোরআনের সূরা মারইয়ামের প্রথম অংশ সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। তাহাতে মনোমুগ্ধকর, সুমধুর ও সুগভীর ভাষায় হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁহারই একান্ত ঘনিষ্ঠ হযরত ইয়াহ্ইয়ার জন্মবৃত্তান্ত ও মহত্ত্ব বর্ণিত ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে সরল সুবোধগম্য যুক্তির মাধ্যমে ইহুদী ও খৃস্টান চরমপন্থীদের বিভিন্ন গর্হিত মতবাদ ও বিশ্বাসের প্রতিবাদ ছিল। উল্লিখিত বিষয়বস্তু এবং ইসলামের উদার সত্যপ্রিয়তা— এইসব এক সঙ্গে সভাস্থলে একটা নূতন ভাবের তরঙ্গ বহাইয়া দিল। ঐ বাদশাহ ঈসায়ী বা খৃস্টান ছিলেন এবং অতিশয় ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন; হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত সত্যের আলো পাইয়া তিনি মুগ্ধ, স্তম্ভিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমনকি তিনি আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; তাঁহার অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

ঘটনার বর্ণনাকারী শপথ করিয়া বলেন, সমুদয় বৃত্তান্ত ও পবিত্র কোরআন শুনিয়া বাদশাহ কাঁদিতে কাঁদিতে দাড়ি ভিজাইয়া ফেলিলেন এবং উপস্থিত তাঁহার পারিষদবর্গও কাঁদিয়া সম্মুখস্থ পুস্তক ভিজাইয়া ফেলিল। বাদশাহ পবিত্র কোরআন সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন, ইহা এবং হযরত ঈসা (আঃ) যেই বাণী নিয়া আসিয়াছিলেন (ইঞ্জীল কিতাব) উভয় এক জ্যোতিঃকেন্দ্র হইতে আবির্ভূত।

বাদশাহ মক্কা হইতে আগত ব্যক্তিদ্বয়কে দরবার হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং পরিষ্কার বলিয়া দিলেন, খোদার কসম! তোমাদের হস্তে এই লোকগণকে কখনও সোপর্দ করিব না এবং তাঁহাদিগকে কোন প্রকার বিব্রতও করা হইবে না, তাঁহারা আমার দেশে শান্তিতে বসবাস করিবেন।

মক্কা হইতে আগত লোকদ্বয় বাদশাহর দরবার হইতে বহিষ্কৃত হইয়াও চেষ্টা পরিত্যাগ করিল না। আমর ইবনুল আ'ছ স্বীয় সঙ্গীকে বলিল, আগামীকল্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন একটি অভিযোগ খাড়া করিব যদ্দ্বারা তাহারা অবশ্যই সুযোগ-সুবিধা হারাইবে। বাদশাহ নাসরানী– তাহাদের আকীদা এই যে, হযরত ঈসা খোদার বেটা। আমি আগামীকল্য বাদশাহকে বলিয়া দিব যে, মুসলমানগণ হযরত ঈসাকে খোদার বান্দা বলিয়া থাকে– খোদার বেটা স্বীকার করে না।

সত্য সত্যই পরদিন তাহারা বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইল এবং বলিল, হে বাদশাহ! মুসলমানগণ হযরত ঈসা সম্পর্কে সাংঘাতিক কথা বলিয়া থাকে। তাহাদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা হযরত ঈসা সম্পর্কে কি বলে?

বাদশাহ মুসলমানগণকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। মুসলমানগণ প্রথমে নিজেরা একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, হযরত ঈসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দেওয়া হইবে। নাসরানী বাদশাহর সম্মুখে এই বিষয়টির আলোচনা মুসলমানদের পক্ষে সর্বাধিক বড় বিপদ ছিল; কিন্তু সকলে এই সিদ্ধান্তই করিল যে, আমাদের পরিণাম যাহাই হউক, আমরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তাহাই বলিব, যাহা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। মুসলমানগণ বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হইলে বাদশাহ তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, হযরত ঈসা সম্পর্কে আপনারা কি বলিয়া থাকেন? তাঁহার সম্পর্কে আপনাদের মতবাদ কি?

জা'ফর (রাঃ) উত্তর করিলেন, আমরা তাহাই বলি যাহা আমাদের নবী (সঃ) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। । তিনি আমাদিগকে শিক্ষ দিয়াছেন যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল ছিলেন; তাঁহার আত্মা আল্লাহর বিশেষ আদেশবলে পাক-পবিত্র কুমারী মারইয়ামের গর্ভে পৌঁছিয়াছিল।

এই বক্তব্য শুনিয়া বাদশাহ মাটি হইতে একটি খড় বা কুটা উঠাইয়া তাহার প্রতি ইশারা করতঃ মন্তব্য করিলেন, হযরত ঈসার মর্তবা উক্ত বর্ণনা হইতে এই খড় পরিমাণও অধিক নহে। বাদশাহর এই মন্তব্যে তাঁহার পারিষদবর্গ নাক সিট্‌কাইয়া উঠিল, তাই বাদশাহ ইহাও বলিলেন যে, যদিও তোমরা নাক সিট্‌কাও।

অতপর বাদশাহ মুসলমানগণকে বলিয়া দিলেন, আপনারা আমার দেশে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ভোগ করিবেন এবং তিন বার ইহাও বলিলেন, কেহ আপনাদিগকে মন্দ বলিবে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আমাকে যদি স্বর্ণের পাহাড়ও দেওয়া হয় তবুও আমি আপনাদের কোন ব্যক্তিকে একটু মাত্র কষ্ট দিব না। বাদশাহ মক্কা হইতে আগত সমুদয় উপঢৌকন ফেরত দেওয়ার নির্দেশও দিলেন। ফলে মক্কা হইতে প্রেরিত লোকদ্বয় ব্যর্থ অপদস্থ হইয়া তথা হইতে বিতাড়িত হইল এবং মুসলমানগণ সুখ-শান্তির সহিত নিরাপদে বসবাস করার অধিক সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। (সীরাতে ইবনে হেশাম– ১)

বাদশাহ আবিসিনিয়াবাসী জনসাধারণ এবং তথাকার পাদ্রীগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি বিশ্বাস করি, (মুসলমানগণ যাঁহার কথা বলিতেছেন) তিনি আল্লাহর রসূল এবং তিনি ঐ রসূল যাঁহার সম্পর্কে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ইঞ্জীল কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। আমি যদি রাষ্ট্রীয় কার্যে আবদ্ধ না থাকিতাম তবে তাঁহার নিকট অবশ্যই উপস্থিত হইতাম।

এই বাদশাহর অন্তরে তখন হইতে ইসলাম স্থান লাভ করে। অতপর চৌদ্দ বৎসর পর হিজরী সপ্তম সনে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সারা বিশ্বের প্রধান ব্যক্তিদের নিকট যখন ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, তখন সর্বপ্রথম এই বাদশাহর প্রতি বিশেষ দূত ছাহাবী আমর ইবনে

উমাইয়া জামরী (রাঃ) মারফত দুইটি পত্র লিখিয়াছিলেন। একটি ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়া, দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত একটি বিষয়ে এবং মক্কা হইতে আবিসিনিয়ায় আগত সকল মুসলমানকে মদীনায় প্রেরণ করার জন্য।

হযরতের লিপি তাঁহার দরবারে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিপির সম্মানার্থ স্বীয় সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন এবং লিপিখানা মাথার উপর বরণ করিয়া লইলেন। আর জা'ফর (রাঃ)-কে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে আনুষ্ঠানিকরূপে ইসলাম গ্রহণপূর্বক পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ করিয়া হযরতের লিপির উত্তর প্রদান করিলেন এবং দ্বিতীয় পত্রের মর্মানুযায়ী দুইটি বড় বড় সামুদ্রিক নৌকায় তথাকার মক্কাবাসী মুসলমাগণকে মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন।

অষ্টম বা নবম হিজরী সনে আবিসিনিয়ায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। (তবাকাতে ইবনে সা'দ ১- ২৫)। মদীনায় থাকিয়া নবী (সঃ) ওহী মারফত তাঁহার মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া মদীনার ছাহাবীগণসহ তাঁহার গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করেন * এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ সৌভাগ্যসূচক মন্তব্য করেন যাহা হাদীছে আছে-

১৬৭৯। হাদীছ ঃ عن جابر رضى الله تعالى عنه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ مَاتَ النَّجَاشِىْ مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُوْمُوْا عَلٰى اَخِيْكُمْ اَصْحَمَةَ ـ

অর্থ ঃ জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেদিন নাজাশী- আবিসিনিয়ার বাদশাহর মৃত্যু হইল, ঐদিনই হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, অদ্য একজন নেককার লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তোমরা সকলে চল, তোমাদেরই ভ্রাতা (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) আস্‌হামার জানাযার নামায আদায় কর।

(রসূলের মুখে "নেককার" আখ্যা কতই না সৌভাগ্যজনক।)

১৬৮০। হাদীছ ঃ عن جابر رضى الله تعالى عنه اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلَى النَّجَاشِىْ فَصَفَّنَا وَرَائَهُ فَكُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِىْ اَوِ الثَّالِثِ ـ

অর্থ ঃ জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মদীনায় থাকিয়া) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবিসিনিয়ার বাদশাহর জন্য জানাযার নামায পড়িয়াছেন। আমাদিগকে নিয়মিতভাবে তাঁহার পিছনে সারিবদ্ধরূপে দাঁড় করাইলেন; আমি দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারিতে উপস্থিত ছিলাম।

১৬৮১। হাদীছ ঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعٰى لَهُمُ النَّجَاشِىْ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ ـ صَفَّ بِهِمْ فِى الْمُصَلّٰى فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا ـ

---

* সম্রাট আস্‌হামা শাহে আবিসিনিয়া, যিনি মুসলমানগণকে তাঁহার দেশে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সপ্তম হিজরী সনে তাঁহারই নিকট হযরতের লিপি প্রেরিত হইয়াছিল এবং তিনি পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য রাষ্ট্রীয় কার্যে আবদ্ধতার দরুন তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অবশেষে অষ্টম হিজরীতে বা নবম হিজরীর প্রারম্ভে আবিসিনিয়ায় তাঁহার মৃত্যু হইলে পর মদীনায় থাকিয়া হযরত নবী (সঃ) তাঁহার জানাযার নামায আদায় করিয়াছিলেন।

তাঁহার পর আবিসিনিয়ায় সিংহাসনের অধিকারী যে ব্যক্তি হইয়াছিলেন হযরত নবী (সঃ) তাঁহার নিকট নবম হিজরী সনে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম এবং ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় নাই, বরং অনেকে তাহাকে কাফের বলিয়াছেন।

মুসলিম শরীফের এক হাদীছে এই দ্বিতীয় বাদশাহ এবং তাহার প্রতি লিপি যাহা নবম হিজরীতে লেখা হইয়াছিল তাহারই উল্লেখ রহিয়াছে। (ফাতহুল বারী ৮-১০৫)

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেদিন আবিসিনিয়ার বাদশাহর মৃত্যু হইল ঐদিনই হযরত রসূলুল্লা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মদীনায়) ছাহাবীগণকে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ জানাইলেন এবং সকলকে বলিলেন, তোমরা তোমাদের ভ্রাতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া কর এবং জানাযার নামায পড়ার নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া সকলকে সারিবদ্ধরূপে দাঁড় করাইলেন। অতপর তাঁহার প্রতি জানাযার নামায পড়িলেন এবং চারি তকবীরে নামায আদায় করিলেন।

আবু বকরের আবিসিনিয়ায় হিজরতের প্রস্তুতি

দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন ছাহাবী পর পর হাব্‌শা বা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাইতেছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও নিজ গোষ্ঠী-জ্ঞাতি মোশরেকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। মন ভরিয়া নামায পড়ার, প্রাণ খুলিয়া পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার অভাব ও বাধা তাঁহাকে এতই ব্যথিত করিল যে, এই ব্যথা-বেদনা তিনি কোন মতেই সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট তিনিও আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি চাহিলেন। হযরত (সঃ) তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। আবু বকর (রাঃ) মক্কা হইতে যাত্রা করিলেন; দুই দিনের পথ অতিক্রমের পর মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রসিদ্ধ "কারাহ্" গোত্রের সর্দার ইবনে দাগেনার সহিত সাক্ষাত হইলে তিনি তাঁহাকে মক্কা ত্যাগে বাধা দিলেন এবং যাত্রা ভঙ্গ করিয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করিলেন। (বেদায়া ৩-৯৩)। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের হাদীছে রহিয়াছে।

১৬৮২। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা- ৫৫১) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মাতা-পিতাকে চিনিবার বয়স হইতেই আমি তাঁহাদের উভয়কে দ্বীন ইসলামের উপর দেখিতে পাইয়াছি এবং আমাদের সঙ্গে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এত অধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল যে, একটি দিনও ফাঁক যাইত না যে দিন হযরত (সঃ) সকালে বা বিকালে আমাদের বাড়ীতে তশরীফ না আনিতেন।

সেই সময় মক্কার কাফেরদের তরফ হইতে মুসলমানদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার-নির্যাতন চলিতেছিল (মুসলমানগণ মক্কা ত্যাগ করত আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাইতেছিলেন)। তখন (আমার পিতা) আবু বকর (রাঃ) আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করতঃ মক্কা ত্যাগ করিলেন। (মক্কা হইতে দুই দিনের পথে) 'বরকুল গেমাদ' নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁহার সঙ্গে আরবের প্রসিদ্ধ 'কারাহ্' গোত্রের সর্দার ইবনে দাগেনার সাক্ষাত হইল। তিনি আবু বকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন? আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার বংশীয়গণ আমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিয়াছে, সুতরাং স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের গোলামী বন্দেগী যাহাতে সুষ্ঠুরূপে করিয়া যাইতে পারি এই উদ্দেশে দেশ ভ্রমণ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি (আবিসিনিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্য গোপন রাখিলেন)।

ইবনে দাগেনা বলিলেন, হে আবু বকর! আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তি দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারে না এবং আপনার ন্যায় ব্যক্তিকে দেশত্যাগ করিতেও দেওয়া যায় না। (আপনি হইলেন মহৎ গুণাবলীর আকর, যথা-) বেকার রোজগারহীনের রুজির ব্যবস্থাকারী, আত্মীয়তার পূর্ণ হক্ আদায়কারী, নিরুপায়ের উপায়, অতিথি সেবায় আত্মনিয়োগকারী এবং সত্যের জন্য আগত আপদ-বিপদে সাহায্য দানকারী। আমি আপনার নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের ভার গ্রহণ করিলাম, আপনি নিজ দেশে থাকিয়াই আপনার প্রভু-পরওয়ারদেগারের এবাদত-বন্দেগী করিতে থাকুন।

সেমতে আবু বকর (রাঃ) মক্কার দিকে ফিরিয়া আসিলেন এবং ইবনে দাগেনাও তাঁহার সঙ্গে মক্কায় আসিলেন। ইবনে দাগেনা কোরায়শ প্রধানদের সকলের নিকট ঐ দাবীই জানাইলেন যে, আবু বকরের ন্যায় মহান ব্যক্তিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা যায় না এবং তাঁহাকে দেশ ত্যাগ করিতেও দেওয়া যায় না। সঙ্গে

সঙ্গে তাঁহার মহৎ গুণাবলীর উল্লেখ করিলেন। কোরায়শ প্রধানগণ আবু বকরের জন্য ইবনে দাগেনার নিরাপত্তাদান সমর্থন করিল, বিরোধিতা করিল না। অবশ্য তাহারা ইবনে দাগেনাক বলিল, আপনি আবু বকরকে বলিয়া দিন, তিনি যেন স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের এবাদত-বন্দেগী নিজের ঘরের ভিতরে থাকিয়াই করেন। ঘরের ভিতরে থাকিয়াই যেন নামায আদায় করেন এবং তথায় যত ইচ্ছা কোরআন পাঠ করেন। তিনি যেন খোলাখুলি প্রকাশ্যে কোরআন পাঠ করিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা সৃষ্টি না করেন; তাঁহার কোরআন পাঠ শ্রবণে আমাদের স্ত্রী-পুত্রগণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হয়।

ইবনে দাগেনা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট তাহাদের এই কথাগুলি পেশ করিলেন, সেমতে আবু বকর (রাঃ) কিছু দিন ঐভাবেই এবাদত-বন্দেগী করিয়া যাইতে লাগিলেন– প্রকাশ্যে নামাযও পড়িতেন না এবং ঘরের ভিতর ছাড়া কোরআন পাঠও করিতেন না। কিন্তু তিনি বেশী দিন এই বাধ্য-বাধ্যকতার মধ্যে থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় বাড়ীর বহির্ভাগে একখানা মসজিদ তৈয়ার করিলেন এবং তথায় নামায আদায় ও কোরআন পাঠ আরম্ভ করিলেন। আবু বকর (রাঃ) অতিশয় কান্নাকাটির সহিত কোরআন পাঠ করিয়া থাকিতেন, কোরআন পাঠকালে তিনি নয়নযুগলের অশ্রুধারা সামলাইয়া রাখিতে পারিতেন না। কাফেরদের স্ত্রী-পুত্রগণ তাঁহার কোরআন পাঠের দৃশ্য দেখিবার জন্য ভিড় জমাইয়া বসিত এবং তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইত।

কোরায়শ প্রধানগণ এই অবস্থাদৃষ্টে ভীত হইয়া পড়িল; তাহারা ইবনে দাগেনাকে সংবাদ দিল। ইবনে দাগেনা আসিলে পর তাহারা বলিল, আমরা আবু বকরের জন্য আপনার নিরাপত্তা দান এই শর্তে গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, তিনি প্রকাশ্যে নামায আদায় এবং কোরআন পাঠ হইতে বিরত থাকিবেন। এখন তিনি প্রকাশ্যেই নামায পড়েন এবং কোরআন পাঠ করিয়া থাকেন, যাহাতে আমাদের স্ত্রী-পুত্রগণের ব্যাপারে আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। আবু বকরকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া দিন। তিনি যদি ঘরের ভিতরে থাকিয়া এবাদত-বন্দেগী করিতে রাজি হন তবে ভাল, অন্যথায় তাঁহাকে বলুন– তিনি যেন আপনার নিরাপত্তা দান ফেরত দিয়া দেন; আমরা আপনার নিরাপত্তাদান ভঙ্গ করা ভাল মনে করি না। অপর দিকে আবু বকর তাঁহার কার্যকলাপ প্রকাশ্যেই করিয়া যাইবেন, আমরা কিছুতেই বরদাশত করিতে পারিব না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তাহাদের কথা মতে ইবনে দাগেনা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট আসিলেন এবং কোরায়শ প্রধানদের অভিপ্রায় তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়া বলিলেন, আপনি জানেন আমি আপনাকে কি বলিয়াছিলাম। এখন আপনি হয়ত তাহাদের কথা রক্ষা করিয়া চলুন, না হয় আমার প্রদত্ত নিরাপত্তা ফিরাইয়া দিন। আমি ইহাতে বড়ই মর্মাহত হইব যে, আরবের লোকগণ শুনিতে পাইবে একটি লোকের পক্ষে আমার প্রদত্ত নিরাপত্তা ভঙ্গ করা হইয়াছে।

এতশ্রবণে আবু বকর (রাঃ) স্পষ্ট ভাষায় ইবনে দাগেনাকে বলিয়া দিলেন, আপনার প্রদত্ত নিরাপত্তা আপনাকে ফেরত দিয়া দিলাম। আমি একমাত্র আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ের উপর সন্তুষ্ট রহিলাম। এই সময় হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন (আবু বকর (রাঃ) ঐ অবস্থায় মক্কায় থাকিয়া গেলেন, পরে মদীনায় হিজরত করিলেন)।

আবিসিনিয়ায় প্রবাসী মুসলমানদের দ্বারা ইসলামের প্রভাব

মৌখিক তবলীগ অপেক্ষা আদর্শ ও চরিত্রের তবলীগ অধিক শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। আবিসিনিয়ায় প্রবাসী মুসলিম নর-নারীগণ তথায় নিয়মিত ধর্ম প্রচারের তেমন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চয় পান নাই। বাদশাহর উদারতায় তাঁহারা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শান্তির সুবিধা পাইয়া থাকিলেও পরদেশ, চতুর্দিক হইতে শত্রুতার পরিবেশ, যেখানে প্রাণ বাঁচানোই দুষ্কর হইয়া পড়িতেছিল, সেক্ষেত্রে আবার ধর্ম প্রচারের

অবকাশ কোথায়? কিন্তু তাঁহাদের জীবন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শে এমনভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে দেখিলেই লোকের মনে তাঁহাদের ধর্ম ও আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিত; প্রকৃত মুসলমানের লক্ষণই ইহা। সেমতে প্রবাসী মুসলমানদের দ্বারা আবিসিনিয়ায় মৌখিক ইসলাম প্রচার না চলিলেও আদর্শ ও চরিত্রে নির্বাক প্রচার অবশ্যই চলিত। এমনকি তথাকার খৃস্টানদের অনেকের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হইল– ইহারা যেই নবীর উম্মত সেই নবীকে দেখা দরকার। এই আকর্ষণের ফলে আবিসিনিয়ার কুড়ি জন খৃস্টান মক্কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবীজী (সঃ) একা একা হরম শরীফের মসজিদে বসিয়া ছিলেন। আর নিকটেই দারে-নোদওয়া তথা মক্কার বিশেষ মিলনায়তনে আবু জাহল গোষ্ঠী বসিয়াছিল।

ঐ খৃস্টানগণ নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাতে আসিয়া কতিপয় তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। নবীজী (সঃ) উত্তর দিলেন এবং তাঁহাদিগকে পাক কালাম কোরআন তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। তাহাতে তাঁহারা এতই অভিভূত হইলেন যে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া ফেলিলেন এবং তৎক্ষণাত ইসলাম গ্রহণে ধন্য হইলেন। তাঁহাদের কাঁদা ও অশ্রু বর্ষণের দৃশ্য এবং তাঁহাদের হৃদয়পটে পবিত্র কোরআনের সুগভীর রেখাপাত এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, সেই দৃশ্য উল্লেখপূর্বক তাঁহাদের এবং তাঁহাদের শ্রেণীর ঈসায়ী সম্প্রদায়ের প্রশংসা করিয়া পবিত্র কোরআনে সুদীর্ঘ বর্ণনা অবতীর্ণ হইল। সেই বর্ণনায় তাঁহাদের অশ্রুপাত এবং পবিত্র কোরআন দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের ভাবাবিষ্টতা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে–

وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ـ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ـ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ـ فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ـ وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "তাঁহারা যখন শুনিলেন ঐ মহাবাণী যাহা রসূলের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তখন তুমি দেখিতেছ, তাঁহাদের নয়নযুগলে অশ্রু প্রবাহমান; সত্য অনুধাবন করার দরুন তাঁহারা বলিতেছিলেন, হে প্রভু! আমরা ঈমান গ্রহণ করিয়াছি। অতএব ঈমান ঘোষণাকারীদের দলে আমাদের নাম লিখিয়া নিন। আল্লাহর প্রতি এবং তাঁহার তরফ হইতে যে সত্য আমাদের নিকট আসিয়া গিয়াছে তাহার প্রতি ঈমান স্থাপন না করিয়া আমরা আশা রাখিব, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৎ লোকদের দলভুক্ত করিয়া দিবেন– এইরূপ আশা রাখা আমাদের জন্য কি ফলদায়ক ও সঙ্গত হইবে? এই হৃদ্যতাপূর্ণ উক্তির ফলে আল্লাহ তাঁহাদের মহাপ্রতিদান বেহেশত দিবেন, যাহার বাগ-বাগিচায় প্রবাহমান রহিয়াছে নদী-নালা। তাঁহারা তথায় চিরস্থায়ীরূপে থাকিবেন। সৎ-সুধীগণের প্রতিদান ইহাই।" (পারা–৭ আরম্ভ)

ঐ আগন্তুকগণ ইসলাম বরণ করিয়া নবীজী (সঃ) হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক নিজ দেশে যাত্রা করিলেন। সেই মুহূর্তেই আবু জাহল এবং তাহার দলীয় কতিপয় দুষ্কৃতকারী আসিয়া তাঁহাদেরকে ভর্ৎসনাপূর্বক বলিল, তোমাদের ন্যায় বেকুফের দল আর দেখি নাই! তোমরা এইরূপ হঠাৎ নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করিয়া ফেলিলে? তাঁহারা বলিলেন, তোমাদের সঙ্গে কথা বলা হইতে সালাম– তোমাদের সঙ্গে কোন কিছু বলিতে চাই না, তোমাদের মতে তোমরা থাক; আমাদেরকে আমাদের মতে থাকিতে দাও। (আসাহহুস সিয়ার– ৯৮)

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীগণের ফযীলত

১৬৮৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬০৭) আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় হিজরতের সংবাদ আমরা অবগত হইলাম– তখন আমরা (আমাদের দেশ) ইয়ামানেই (মুসলমান

হইয়া) অবস্থান করিতেছিলাম। নবীজীর হিজরত সংবাদে আমি এবং আমার বড় দুই সহোদরসহ তিপ্পান্ন জন জ্ঞাতি-গোষ্ঠী লোকের সহিত মদীনায় হিজরত উদ্দেশে আমরা ইয়ামান হইতে যাত্রা করিলাম। আমরা একটি সমুদ্রযানে আরোহণ করিলাম; প্রতিকূল ঝড়ো বাতাস আমাদের যানটি নাজাশী বাদশাহর দেশ হাবশা তথা আবিসিনিয়ায় পৌঁছাইয়া দিল।

তথায় জাফর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সহিত আমাদের সাক্ষাত হইল। আমরা কিছুকাল তথায় অবস্থান করিলাম। (৭ম হিজরী সনে) যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খায়বর দেশ জয় করিয়াছেন তখন আমরা আবিসিনিয়া হইতে সকল প্রবাসী মুসলমান একটি সামুদ্রিক নৌকায় চড়িয়া মদীনায় পৌঁছিলাম। যাঁহারা আমাদের পূর্বে মদীনায় পৌঁছিয়াছিলেন তাঁহারা আমাদিগকে (কৌতুক করিয়া) বলিতেন, আমরা আপনাদের অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী। কারণ, আমরা আপনাদের পূর্বে হিজরত করিয়া নবীজীর নিকটে পৌঁছিয়াছি।

আমাদের নৌকায় আগতদের মধ্যে "আসমা" নাম্নী এক মহিলা ছিলেন। তিনি নবী গৃহিণী হাফসা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার গৃহে আসিলেন। তিনি পূর্বে হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহাদের উভয়ের পরিচয় ছিল। আসমা (রাঃ) ঐ গৃহে উপস্থিত। এমন সময় (হাফসার পিতা) ওমর (রাঃ) তথায় আসিলেন এবং আসমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হাফসা (রাঃ) বলিলেন, তিনি ওমায়স তনয়া আসমা। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আবিসিনিয়া হইতে সমুদ্রযানে আগত? আসমা বলিলেন, হাঁ। তখন ওমর (রাঃ) সেই কথাটিই বলিলেন– আমরা মদীনায় তোমাদের পূর্বে হিজরত করিয়া আসিয়াছি; আমরা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অধিক নৈকট্যলাভকারী। এতদশ্রবণে আসমা ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, (আমাদের অপেক্ষা আপনারা অধিক নৈকট্যের অধিকারী) ইহা কখনও নহে; কসম খোদার! আপনারা (আরামে) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন; তিনি আপনাদের অনাহারীর আহার যোগাইয়াছেন, অশিক্ষিতকে শিক্ষা ও উপদেশ দান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) হইতে দূরে, শত্রুর দেশে ছিলাম, (আমরা কত কষ্ট করিয়াছি! এবং আমাদের এইসব কষ্ট ভোগ একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশে ছিল)।

আমি শপথ করিলাম– আপনার এই কথার অভিযোগ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট পেশ না করিয়া পানাহার করিব না। আমরা কত প্রকারে উৎপীড়িত হইয়াছি! কত রকম ভয়-ভীতির মধ্যে কালাতিপাত করিয়াছি; সব কিছু আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে ব্যক্ত করিব এবং (প্রতিফল সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করিব। খোদার কসম! আমি একটুও মিথ্যা বা গর্হিত অতিরঞ্জিত কথা বলিব না।

ইতিমধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গৃহে আসিলেন। তখন আসমা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! ওমর এইরূপ বলিয়াছেন। নবী (সঃ) আসমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহাকে কি উত্তর দিয়াছ? আসমা বলিলেন, উত্তরে আমি এই এই বলিয়াছি। নবী (সঃ) বলিলেন, ওমর শ্রেণীর লোকেরা তোমাদের অপেক্ষা অধিক নৈকট্যের অধিকারী কখনও নহে। ওমর ও তাহার শ্রেণীর লোকদের একটি মাত্র হিজরত হইয়াছে (মক্কা হইতে মদীনায়)। আর নৌকাযোগে আগত তোমাদের দুইটি হিজরত হইয়াছে (একটি নিজ দেশ হইতে আবিসিনিয়ায় এবং অপরটি আবিসিনিয়া হইতে মদীনায়)।

আসমা (রাঃ) বলিলেন, আবু মূসা (রাঃ) এবং নৌকায় আগত ছাহাবীগণ দলে দলে আমার নিকট আসিতেন এবং এই হাদীছ শুনিয়া যাইতেন। দুনিয়ার কোন বস্তু তাঁহাদের নিকট অধিক আনন্দদায়ক ও অধিক বড় ছিল না তাহা অপেক্ষা, যাহা নবী ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহি অসাল্লাম তাঁহাদের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন। ছাহাবী আবু মূসা (রাঃ) ত এই হাদীছখানা পুনঃ পুনঃ আমার নিকট খোঁজ করিয়া শুনিয়া থাকিতেন।

নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসর মুসলমানদের পক্ষে শুভ লক্ষণের উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় ঘটনা হইল শেরে খোদা

হাম্‌যা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ।*

মুসলমানদের বিরুদ্ধে মোশরেকগণ কর্তৃক আবিসিনিয়ায় প্রতিনিধি প্রেরিত হওয়ার সময়ই হামযা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

হামযা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

একদা নবী (সঃ) সাফা পর্বতের নিবটবর্তী পথে যাইতেছিলেন; ঐ সময় আবু জাহলের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত হইল। দুরাচার আবু জাহল নবীজী (সঃ)-কে পথে পাইয়া অশ্লীল অশোভনীয় কথাবার্তা ও গালিগালাজ শুনাইল। সে দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধেও জঘন্য কথা বলিল। নবীজী (সঃ) তাহার কথার কোন প্রতিউত্তর করিলেন না; অসভ্যের কথার উত্তরই চুপ থাকা– নবীজী (সঃ) তাহাই করিলেন। মক্কারই এক ব্যক্তির দাসী ঘটনা দেখিয়াছিল; ইতিমধ্যেই বীরবর হামযা শিকার করিয়া তীর-ধনুকসহ বাড়ী যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ঐ দাসীর সাক্ষাত হইল; সে তাঁহাকে বলিল, আপনি যদি দেখিতেন! কিভাবে আবু জাহল আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে গালিগালাজ করিয়াছে! ইহা শুনামাত্র বীর হামযা অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাত আবু জহলের তালাশে ছুটিলেন। হরম শরীফে যাইয়া তাহাকে লোকদের সহিত বসা পাইলেন; ঐ অবস্থায় বীর হামযা স্বীয় ধনুক দ্বারা আবু জাহলের মাথায় আঘাত করিলেন; তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। হামযা (রাঃ) উত্তেজিতভাবে তাহাকে বলিলেন, তুমি না-কি মুহাম্মদ (সঃ)-কে গালাগালি করিয়াছ? শুনিয়া রাখ! আমি তাঁহার ধর্মে রহিয়াছি। উপস্থিত কেহ কেহ আবু জাহলের পক্ষে উত্তেজিত হইতেছিল; কিন্তু আবু জাহল তাহাদের বারণ করিয়া বলিল, হামযাকে কিছু বলিও না; সত্যই আমি আজ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে শক্ত কথা বলিয়াছি। আমি অন্যায়ভাবে তাহাকে জলুম করিয়াছি। পাষণ্ড আবু জাহল সাংঘাতিকরূপে অপমানিত হইয়াও সাধু সাজিল! কারণটা সহজেই অনুমেয়, বীর হামযার অবস্থা সে বুঝিতে পারিয়াছিল, সর্বনাশ উপিস্থিত। এখন সদ্ব্যবহার ও সাধুতার দ্বারা হামযাকে শান্ত না করিলে আরবের একজন প্রধানতম বীর তাহাদের দল ছাড়া হইয়া যাইবে এবং কোরায়শরা এই সর্বনাশের জন্য তাহাকে দায়ী করিবে। আবু জাহল কূটবুদ্ধি খাটাইল, কিন্তু বীর হামযাকে স্বর্গীয় মঙ্গলের আলিঙ্গন হইতে বারণ করিতে পারিল না।

উপস্থিত এক ব্যক্তি চমকিত হইয়া বীরবর হামযাকে জিজ্ঞাসা করিল, সত্যই কি আপনি ধর্মমত পরিবর্তন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যে সত্য তাহা আমার হৃদয়পটে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; আমি ঘোষণা দিতেছি, তিনি আল্লাহর রসূল; তাঁহার সব কথা সত্য। তথা হইতে বাড়ী আসিলে পর শয়তান তাঁহার পিছনে লাগিল, কুমন্ত্রণা দিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, এমনকি রাত্রেও তাঁহার নিদ্রা আসিল না। তিনি এই বলিয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে আরাধনা করিলেন, আয় আল্লাহ! যদি ইহা (ইসলাম) সত্য হইয়া তাঁকে তবে আমার অন্তরকে তৎপ্রতি স্থির করিয়া দাও; আর যদি অসত্য হয় তবে ইহা হইতে বাহির হওয়ার ব্যবস্থা আমার জন্য করিয়া দাও। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, এই আরধনা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরের সকল দ্বিধা দূর হইয়া ইসলামের বিশ্বাসে অন্তর ভরিয়া গেল। ভোরবেলা নবীজী (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম এবং সব ঘটনা ব্যক্ত করিলাম; তিনি আমার দ্বীন-ইসলামের মজবুতীর জন্য দোয়া করিলেন। আমি আনুষ্ঠানিকরূপে ঘোষণা দিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি সত্য,আপনার সব কিছু সত্য এবং আপনি সত্যের দিশারী।

ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পরেই তদপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা– ইসলামের ষষ্ঠ বৎসরের তৃতীয় শুভ লক্ষণ ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ।

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ নবুয়তের দ্বিতীয় বৎসর ছিল।

ধীরে ধীরে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমনকি বহু সংখ্যক মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাওয়ার পরও মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদের সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছিল এবং বীরবর হামযা (রাঃ) ইসলামের দলে আসিলেন। কোরায়শরা নিজেদের প্রমাদ গনিতে লাগিল। তাহারা পরামর্শে বসিল এবং নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে প্রাণে বধ করা সাব্যস্ত করিল। অতপর তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইল হত্যাকারী সাহসী বীর পুরুষের তালাশে। ওমর তাহার জন্য প্রস্তুত হইল এবং তরবারি লইয়া নবীজীর খোঁজে বাহির হইল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বলিল, প্রথমে নিজের ঘর সামলাও; তোমার ভগ্নী ফাতেমা এবং ভগ্নীপতি সায়ীদ মুসলমান হইয়া গিয়াছেন। এই সংবাদে ওমর অগ্নিমূর্তি ধারণ করিল এবং সোজা ভগ্নীর বাড়ী রওয়ানা হইল। ঐ সময় ভগ্নী ও ভগ্নীপতি উভয়ই তাঁহাদের গৃহে ছিলেন। (পূর্বালোচিত) খাব্বাব (রাঃ) তাঁহাদিগকে পত্রে লিখিত পবিত্র কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেছিলেন; গৃহদ্বার বন্ধ ছিল।

ওমর আসিয়া গৃহদ্বারে করাঘাত করিলে খাব্বাব (রাঃ) লুকাইয়া গেলেন; ভগ্নি আসিয়া দরজা খুলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ওমর তাঁহার শিরে আঘাত করিয়া রক্তস্রোত বহাইয়া দিলেন এবং শাসাইয়া বলিলেন, তুই ধর্মত্যাগী হইয়া গিয়াছিস্? ঘরে আসিয়া ভগ্নীপতিকেও ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, যদি অন্য ধর্মটি সত্য হয়? এই উত্তর শুনার সঙ্গে সঙ্গে ওমর তাঁহার উপরও ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং মাটিতে ফেলিয়া বেদম প্রহার করিলেন। ভগ্নী তাঁহাকে ছাড়াইতে আসিলে পুনরায় ভগ্নীকেও প্রহারে রক্তাক্ত করিয়া ফেলিলেন। এইবার ভগী ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, মুসলমান হওয়ার করাণে আমাদের মারা হইতেছে! নিশ্চয় আমরা মুসলমান হইয়াছি; যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

মারপিট করিয়া ওমর ক্ষান্ত হইয়াছেন। এখন তাঁহার দৃষ্টি পড়িল ঐ পত্রের প্রতি, যে পত্রে কোরআন শরীফের আয়াত লিখা ছিল। তিনি বলিলেন, তাহা কি? আমার হাতে দাও ত! ভগ্নী বলিলেন, আপনি অপবিত্র; অপবিত্র হাতে তাহা স্পর্শ করিতে পারেন না! ওমর বিনাবাক্য ব্যয়ে অযূগোসল করিয়া আসিলেন এবং ঐ পত্র পাঠ করিলেন; তাহাতে সূরা ত্বা-হার এই আয়াত লিখা ছিল–

اِنَّنِیْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِیَةٌ اَكَادُ اُخْفِیْهَا لِتُجْزٰی كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰی - فَلَا یَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا یُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ فَتَرْدٰی -

অর্থ ঃ "একমাত্র আমিই আল্লাহ– মাবুদ, আমি ভিন্ন আর কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই, অতএব আমারই বন্দেগী কর এবং আমাকে স্মরণ করিতে নামায আদায় কর। নিশ্চয় কেয়ামত আসিবে; যেন প্রতিটি মানুষ কৃত কর্মের ফল পায়– অবশ্য তাহার তারিখ আমি গোপন রাখিয়াছি। যাহারা সেই কেয়ামতে বিশ্বাস করে না এবং প্রবৃত্তির দাস হইয়া চলে তাহারা যেন তাহার প্রতি আস্থা স্থাপনে তোমাকে বিরত রাখিতে না পারে; অন্যথায় তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে।" এই আয়াত কয়টির বিষয়বস্তু ওমরের অন্তরকে কাঁপাইয়া তুলিল।

ইতিপূর্বে আরও একবার পবিত্র কোরআন লৌহমানব ওমরকে সত্যের প্রতি ধাক্কা দিয়াছিল। ঘটনা এই– একদা গভীর রাত্রে ওমর কা'বা ঘরের নিকট গেলেন; তখন নবীজী (সঃ) তথায় নামায পড়িতেছিলেন। ওমর বলেন, আমি লুকাইয়া তাঁহার পড়া শুনিবার ইচ্ছা করিলাম। সেমতে আমি কা'বার গেলাফের ভিতরে আত্মগোপন করিয়া তাঁহার সম্মুখ বরাবর দাঁড়াইলাম। নবীজী (সঃ) সূরা "আল্-হাক্কাহ্ (পারা–২৯) পাঠ করিতেছিলেন। আমি তাহা শুনিতেছিলাম; আমার মনে তখন নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল। এই সময় আমার মনে হইতেছিল, কোরায়েশগণ যাহা বলিয়া থাকে তাহাই ঠিক– ইনি একজন বিশিষ্ট কবি। সেই মুহূর্তে নবীজী (সঃ) উক্ত সূরার এই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন–

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ - وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ - اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِیْمٍ - وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ

قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ -

অর্থ ঃ "তোমাদের দৃশ্য-অদৃশ্য সমুদয় বস্তুর শপথ- এই কোরআন আল্লাহর কালাম, আল্লাহর (অদৃশ্য) বিশিষ্ট দূতের মারফত তাঁহার (দৃশ্য) রসূলের নিকট প্রেরিত। ইহা কোন কবির রচনা নহে। পরিতাপের বিষয় তোমরা তাহার প্রতি কমই বিশ্বাস স্থাপন কর।"

ওমর (রাঃ) বলেন- ইহা শ্রবণে আমি ভাবিলাম, এ ত আমারই মনের কথার উত্তর। অতএব নিশ্চয় মুহাম্মদ (সঃ) বড় গণৎকার। আমার মনে এই ভাবের উদয় হইতেছিল আর নবী (সঃ) উক্ত সূরার এই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন-

وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ -

অর্থ ঃ "এবং তাহা কোন গণৎকারের উক্তিও নহে; তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণমূলক তাহা গভীর চিন্তার সহিত শুনিয়া থাক।"

ওমর বলেন, এই আয়াতসমূহ আমার অন্তরে যথেষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

এই আয়াতগুলি ওমরের অন্তরকে ধাক্কা দিল বটে, কিন্তু তাঁহাকে দীর্ঘ দিনের বদ্ধমূল কুফর ও শেরেক ত্যাগে নত করিতে পারিল না। অতপর পুনরায় উপরোল্লিখিত ঘটনায় সূরা ত্বা-হার আয়াতসমূহ দ্বারা যে ধাক্কা ওমরের অন্তরে লাগিল তাহা তিনি সামলাইয়া উঠিতে পারিলেন না। এইবার তিনি সম্পূর্ণরূপে সত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

সূরা ত্বা-হার আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করা মাত্র ওমরের অন্তরে পরিবর্তন আসিয়া গেল। উপস্থিত খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট জানিতে পারিলেন, নবীজী (সঃ) আরকাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে আছেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চরণে নিজকে উৎসর্গ করিয়া ইসলাম গ্রহণ উদ্দেশে সেই দিকে ছুটিলেন। এই বিরাট পরিবর্তনের সংবাদ কাহারও গোচরে আসে নাই, ধারণায়ও আসিতে পারে না।

আরকামের গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া ওমর দরজায় করাঘাত করিলেন; তাঁহার হস্তে তরবারি ছিল। ভিতরে অবস্থিত ছাহাবীগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন; হামযা (রাঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, ভাল উদ্দেশে আসিয়া থাকিলে ভাল হইবে, নতুবা তাহার তরবারি দ্বারাই তাহার শিরশ্ছেদ করা হইবে। দরজা খোলা হইলে ওমর ভিতরে পা রাখিতেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং গায়ে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশে আসিয়াছ ওমর? অতি মোলায়েম সুরে উত্তর করিলেন, ঈমান লাভের উদ্দেশে।

এই উত্তর শুনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেগে নবীজীর মুখে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি আসিয়া গেল। উপস্থিত ছাহাবীগণও সজোরে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিয়া উঠিলেন; এলাকাস্থ পর্বতমালা গুঞ্জরিয়া উঠিল। এখন তিনি ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু; তখন তাঁহার বয়স ছিল ত্রিশের উর্ধ্বে। (সীরাতুন নবী)

ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভগ্নীপতি সায়ীদ (রাঃ) আশারা মোবাশ্শারাহ তথা রসূল্লাহ (সঃ) কর্তৃক বেহেশতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপ্রাপ্ত দশ জন ছাহাবীর একজন। তিনি ইসলাম পূর্ব একত্ববাদী যায়েদের পুত্র (যায়েদের একত্ববাদ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হইয়াছে), তিনি ওমরের চাচাত ভাইও ছিলেন। তিনি নিজের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন-

১৬৮৪। হাদীছ ঃ সায়ীদ (রাঃ) একদা কুফার মসজিদে বলিতেছিলেন, আমার এই অবস্থাও আমি দেখিয়াছি যে, ইসলাম গ্রহণের অপরাধে ওমর আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন; তখনও ওমর মুসলমান হন নাই। (পৃষ্ঠা- ৫৪৫)

ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণে ইসলাম ও মুসলমানদের নবশক্তির সূচনা হইল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী (সঃ) দোয়া করিয়াছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِاَبِىْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ اَوْ بِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! ইসলামকে শক্তিশালী কর আবু জাহল বা ওমর দ্বারা।" পরবর্তী দিনের প্রথম দিকেই ওমর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তখন হইতে মুসলমানগণ হরম শরীফের মসজিদে প্রকাশ্যে নামায পড়িতে পারিলেন। (মেশকাত শরীফ– ৫৫৭)

নবী (সঃ) প্রথমে দুই জনের মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে কোন একজনের ইসলাম প্রার্থনা করিয়াছিলেন; পরে বিশেষভাবে ওমরের নাম নির্দিষ্ট করিয়া পুনঃ দোয়া করিলেন–

اَللّٰهُمَّ اَيِّدِ الْاِسْلَامَ بِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! খাত্তাব পুত্র ওমর দ্বারাই ইসলামের সাহায্য কর।" (সীরাতে মোস্তফা)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দোয়া বাস্তবায়িত হইল; ওমর (রাঃ) মুসলমান হইলেন এবং তাঁহার ইসলাম গ্রহণে মুসলমানদের নবযুগের সূচনা হইল!

১৬৮৫। হাদীছ ঃ (ষষ্ঠ নম্বরের মুসলমান) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, ওমর (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর হইতে আমরা শক্তিলাভ করিয়াছিলাম। (পৃষ্ঠা– ৫৪৫)

ব্যাখ্যা ঃ কাফেরদের বাধাদানে মুসলমানগণ হরম শরীফের মসজিদে নামায পড়িতে পারিতেন না; পাহাড়-পর্বতের আড়ালে লুকাইয়া নামায পড়া হইত। ওমর (রাঃ) মুসলমান হইয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কাফেরগণ গর্হিত মূর্তিপূজা প্রকাশ্যে করিবে আর আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার এবাদত পলাইয়া পলাইয়া করিব? এরূপ হইতে পারে না। আল্লাহ তাআলার এবাদত প্রকাশ্যে আদায় হওয়া চাই। তখন হইতে হরম শরীফের মসজিদে মুসলমানগণ প্রকাশ্যে নামায আদায় আরম্ভ করিয়া ছিলেন। (আসাহ্হুস সিয়ার– ৯২)

প্রথমে ওমর (রাঃ) এবং হামযা (রাঃ) নবীজী (সঃ)-কে সঙ্গে নিয়া কা'বা শরীফের দিকে অগ্রসর হইলেন; তাঁহারা দুইজন নবীজীর দেহরক্ষীরূপে অগ্রভাগে চলিলেন। কা'বা শরীফের তওয়াফ এবং দুপুর বেলার নামায নির্বিঘ্নে আদায় করিয়া আসিলেন। (বেদায়া ৩/৩১)

তারপর ওমর (রাঃ) সংগ্রামের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য কা'বা শরীফর সম্মুখে হরম শরীফে নামায পড়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং মক্কাস্থিত সমস্ত মুসলমান সমভিব্যাহারে তথায় নামায আদায় করিয়া যাইতে লাগিলেন। কাফেররা ইহাতে বাধা দিবে সেই সাহস আর তাহাদের হইল না। (বেদায়া ৩–৭৯)

এতদ্ভিন্ন এতদিন ত আরকাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রুদ্ধগৃহে লুকাইয়া নবী (সঃ) এবং মুসলমানগণ একত্রিত হইতেন; ওমর (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর যেকোন স্থানে ইচ্ছা করিলে নবী (সঃ) এবং মুসলমানগণ একত্রিত হইতে পারিতেন। (সীরাতে মোস্তফা, ১–১২৬)

ইতিপূর্বে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিলে সে যথাসাধ্য ইসলাম লুকাইয়া রাখায় সচেষ্ট হইত, কিন্তু ওমর (রাঃ) মুসলমান হইয়া সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র তাঁহার ইসলাম প্রকাশ করিয়া বেড়াইলেন। এমনকি ইসলাম পূর্বে তিনি যথায় তথায় উঠা-বসা করিতেন, যাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতেন ঐরূপ সকল স্থানে এবং সকলের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রচার করিলেন। (বেদায়া ৩–৩১)

ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিলাম, মক্কায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বাধিক কঠিন শত্রু কে আছে– তাহাকেই আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রথমে পৌঁছাইব। তখন আবু জাহলের নাম আমার মনে পড়িল। আমি ভোর বেলা তাহার বাড়ী উপস্থিত হইলাম।

সে আমাকে অতিশয় সমাদর দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই সময় তোমার আগমন কি উদ্দেশে? আমি বলিলাম, তোমাকে এই সংবাদ পৌঁছাইবার জন্য যে, আমি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। ইহা শুনিতেই সে গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

(ইবনে হেশাম)

মোশরেকদের তরফ হইতে প্রথম প্রথম আক্রোশের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সম্মুখীন তিনি হইতেছিলেন বটে, কিন্তু আল্লাহর রহমতে সাহস এবং সংগ্রাম ও স্থিতিশীলতার দ্বারা সর্বত্র প্রাবল্য প্রতিষ্ঠায় তিনি কৃতকার্য হইতে পারিলেন।

১৬৮৬। হাদীছ ঃ ওমর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) মুসলমান হইয়াছেন এই সংবাদে মক্কায় বিশেষ চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। অসংখ্য মানুষ আসিয়া ওমরের বাড়ী ঘেরাও করিল; আমি আমাদের গৃহছাদে উঠিয়া সব ঘটনা দেখিতেছিলাম। ওমর (রাঃ) উত্তেজনার মুখে সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে বসিয়া ছিলেন; এমন সময় রেশমের জুব্বা পরিহিত একজন লোক ঘরের ভিতরে আসিয়া ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? তিনি বলিলেন, তোমার জাতির লোকেরা বলিতেছে, আমি মুসলমান হওয়ার অপরাধে আমাকে মারিয়া ফেলিবে। ঐ লোকটি বলিলেন, একটি মানুষও আপনার নিকট আসিতে পারিবে না। ঐ লোকটি ছিলেন আমাদের মিত্র গোত্র বনু সাহমের সর্দার। তৎকালীন প্রথানুযায়ী এই শ্রেণীর সর্দারের এইরূপ কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইত; সুতরাং উপস্থিত উত্তেজনার মুখে তাঁহার এই কথায় আমরা আশ্বস্ত হইলাম।

অতপর ঐ সর্দার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সমগ্র প্রান্তর জুড়িয়া দলে দলে মানুষ ভিড় করিয়া আসিতেছে। তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় যাইতেছ? তাহারা বলিল, ওমরের বাড়ির দিকে যাইতেছি; সে নাকি ধর্মত্যাগী হইয়া গিয়াছে। ঐ সর্দার ব্যক্তি বলিলেন, তাহাতে কি হইয়াছে। আমি তাঁহার আশ্রয়দাতা সহায়ক। তখন আমি গৃহ ছাদ হইতে দেখিলাম, সমস্ত লোক তথা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া গেল। (পৃষ্ঠা- ৫৪৫)

নবুয়তের সপ্তম বৎসর– হযরতের বিরুদ্ধে মোশরেকদের বয়কট আন্দোলন (পৃষ্ঠা–৫৪৮)

নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসরের শেষাংশে পর পর তিনটি ঘটনার দ্বারা মুসলমানদের শুভ লক্ষণের সূচনা হইল, মুসলমানদের সুদিনের সূর্য যেন উদয়ের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল– (১) আবিসিনিয়া হইতে মোশরেকদের প্রতিনিধি দলের সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অপদস্থরূপে ফিরিয়া আসা এবং তথায় মুসলমানদের অধিক সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-শান্তি লাভ। (২) শেরে খোদা হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ। (৩) সারা মক্কার সুপ্রসিদ্ধ লৌহ মানব ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ; যাঁহার প্রভাবে মুসলমানগণ প্রকাশ্যে ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, হরম শরীফে নামায পড়িতে সাহসী হইয়াছেন। এইসব কারণে সাধারণভাবে মুসলমানদের অন্তরে শক্তি-সাহসের সঞ্চার হইল এবং বিভিন্ন গোত্রে ইসলামের প্রসার আরম্ভ হইল।

এইসব দেখিয়া মক্কার মোশরেকদের গাত্রদাহ চরমে পৌঁছিয়া গেল, তাহাদের চোখে যেন বর্শাঘাত লাগিল। এই অবস্থা বরদাশত করিতে না পারিয়া এই বার তাহারা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রাণে বধ করিয়া সর্বদার জন্য নিশ্চিন্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত অধিক দৃঢ়তা ও তৎপরতার সহিত গ্রহণ করিল।

আবু তালেব এই সংবাদ জানিতে পারিয়া বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব গোত্রীয় সকলকে একত্র করিয়া এই পরিস্থিতিতে হযরত (সঃ)-কে হেফাযত করার আহ্বান জানাইলেন। তাহারা সকলে আবু তালেবের

আহ্বানে সাড়া দিল; যদিও তাহারা কাফের ছিল; কিন্তু "স্বজনকে রক্ষা করার" আরবের রীতি অনুযায়ী এবং আবু তালেবের প্রতি তাহাদের পূর্ণ সমর্থন বিদ্যমান থাকায় তাহারা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত তাঁহার আহ্বানে সম্মতি প্রদান করিল। এমনকি তাহারা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে "শেবে আবু তালেব" নামক স্থানে (মক্কা নগরীর পর্বত বেষ্টিত একটি ভূখণ্ড, যে স্থানের মহল্লায় আবু তালেবের বসবাস এবং আধিপত্য ছিল, সেই মহল্লায়) নিয়া আসিল এবং বনু হাশেম ও বনু মোত্তালেব অমুসলমান মুসলমান সকলেই তথায় একত্রিতভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া নিল। যেন সর্বদা হযরত (সঃ)-কে তাহারা চোখের উপর রাখিয়া হেফাযত করিতে পারে এবং সকলে একতাবদ্ধরূপে সম্ভাব্য সব রকম আপদ-বিপদের প্রতিরোধ করিতে পারে।

মক্কার মোশরেকগণ অবস্থা দৃষ্টে যখন বুঝিতে পারিল যে, হযরত (সঃ)-কে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব গোত্রদ্বয়ের কারণে কোন কিছু করা সম্ভব হইবে না, তখন হযরত (সঃ)-সহ বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে বয়কট চালাইয়া যাওয়ার এবং একঘরে করিয়া রাখার উপর মক্কা নগরী ও তাহার আশে-পাশের কোরায়শ বংশীয় সমুদয় গোত্র এবং অন্যান্য যেসব গোত্র তাহাদের মিত্র ছিল সকলে শপথ বা হলফ করিল। তৎকালে মক্কা নগরীতে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব ছাড়া কোরায়শ বংশীয় অন্ততঃ নয়টি গোত্র ছিল– (১) বনী আবদে শাম্‌স বা বনী উমাইয়া (২) বনী নওফেল, (৩) বনী আবদিদ দার, (৪) বনী আসাদ, (৫) বনী তাইম, (৬) বনী আ'দী, (৭) বনী জুমাহ, (৯) বনী সাহম।

(আরজুল কোরআন, ২–৯৮)

এতদ্ভিন্ন কোরায়শ বংশ ছাড়া তাহাদের দুই পুরুষ পূর্বের "কেনানা" হইতেও কতিপয় গোত্র তথায় ছিল। কোরায়েশ ও কেনানা বংশের সকল গোত্রের লোকগণ "খায়ফে বনী কেনানা বা "মোহাস্‌সাব" নামক স্থানে একত্রিত হইয়া আনুষ্ঠানিকরূপে শপথ করিল যে, বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের সঙ্গে লেন-দেন আদান-প্রদান, কেনা-বেচা, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি কোন প্রকার আচার-অনুষ্ঠান করা চলিবে না যাবত না তাহারা মুহাম্মদ (সঃ)-কে আমাদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। এই সম্পর্কে ২য় খণ্ডে ৯০৫ নং হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

এই শপথ লিপিবদ্ধ করতঃ তাহারা কা'বা ঘরে লটকাইয়া দিল। মনে হয় যেন কা'বা গৃহে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর-দেবতাকে তাহারা এই শপথের সাক্ষী বানাইতেছিল এবং শপথনামা তাহাদেরই তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিল। অবস্থাদৃষ্টে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবগণ তাহাদের সর্দার আবু তালেবের নিকট একত্রিত হইল সমবেতভাবে এই বিপদ মোকাবিলা এবং সম্ভাব্য সকল প্রকার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সর্বদা প্রস্তুতরূপে সকলে শেবে আবু তালেবের গিরি প্রান্তরে একত্র বসবাসের ব্যবস্থা করিল। তাহাদের প্রতিজ্ঞা ও বজ্র কঠিন শপথ ইহাই ছিল যে, হযরত (সঃ)-কে কোন মূল্যেই শত্রুর হস্তে অর্পণ করিবে না। বরং হযরত (সঃ)-কে চোখের উপর রাখার উদ্দেশে তাঁহাকেও ঐ গিরি-প্রান্তরে নিয়া আসিল। নবুয়তের সপ্তম বৎসর মহররম মাসে এই ঘটনা ঘটিল।*

হঠাৎ এই ঘটনা ঘটিবে তাহা কাহারও জানা ছিল না। কাজেই খাদ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু-সামগ্রী তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করার সময় পান নাই। যাহার নিকট যাহা কিছু ছিল তাহাই লইয়া তাঁহারা ঐ গিরি-প্রান্তরে প্রস্থান করিলেন। এই অবস্থায় বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব নিদারুণ খাদ্যাভাবসহ অনেক রকম সঙ্কটেরই সম্মুখীন হইলেন। গাছের পাতা ভক্ষণ এবং শুষ্ক চামড়া সিদ্ধ পানি পান করত এই নিদারুণ কষ্টের মোকাবিলা তাঁহারা করিতে লাগিলেন, তবুও কিন্তু তাঁহারা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে শত্রুদের হস্তে অর্পণ করতঃ তাহাদের দাবী পূরণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে মীমাংসা করিতে রাজি হইলেন না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এইভাবে তাঁহাদের অতিবাহিত হইতে লাগিল। মক্কাবাসীরা তাঁহাদের উপর হাট ঘাট এমনভাবে বন্ধ করিয়াছে যে, বাহির হইতে কোন কিছু সংগ্রহ করাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব

* তাবাকাতে ইবনে সা'দ ১–২০৯ এবং যোরকানী ১–২৭৮।

ছিল। আবদ্ধ পরিবারবর্গের কচি-কাচা শিশু সন্তানগুলি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া চিৎকার করিত। তাহাদের ক্রন্দন ধ্বনিও মক্কাবাসীদের পাষাণ হৃদয়ে কোন তাছির করিত না। এই সঙ্কটাপূর্ণ অবস্থায় হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামসহ সকল বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব দীর্ঘ তিন বৎসরকাল সেই গিরি প্রান্তরে আবদ্ধ জীবন যাপন করিলেন।*

মুসলমানদের শুভ যুগের সূর্য উদিত হওয়ার পর মক্কা জয় করিয়া মক্কার আশ পাশ জয় করাকালে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অতীতের ইতিহাস স্মরণ করতঃ অন্তরের অন্তস্থল হইতে সর্বশক্তিমান রহমানুর রাহীম প্রভু পরওয়ারদেগারের

শোকর আদায় করার উদ্দেশে দশ হাজার সাহাবীসহ ঐ খায়ফে বনী কেনানা বা মোহাস্‌সাব নামক স্থানে একদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৬৮৭। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা-৫৪৮) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰه تَعَالى عَنْه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حِيْنَ اَرَادَ حُنَيْنًا مَنْزِلُنَا غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ -

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মক্কা জয় করার পর মক্কা হইতে) যখন "হোনায়ন" এলাকা জয় করার জন্য যাওয়ার প্রস্তুতি করিতেছিলেন তখন বলিয়াছিলেন, আগামীকল্য আমাদের অবস্থান খায়ফে বনী কেনানা নামক স্থানে হইবে- যেস্থানে মোশরেকরা কুফরী তথা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের বিদ্রোহীতার উপর সকলে শপথ করিয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতির চরম বিকাশকাল তথা বিদায় হজ্জকালে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লক্ষাধিক ছাহাবীসহ মিনা হইতে প্রত্যাবর্তনকালেও ঐ খায়ফে বনী কেনানা বা মোহাস্‌সাবে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং এই অবস্থান শুধু কোন সুযোগ-সুবিধাজনিতই ছিল না, বরং পূর্বাহ্নে মিনায় থাকাবস্থায়ই আলোচ্য হাদীছের বিবৃতির ন্যায় উক্ত অবস্থানের ঘোষণা জারি করিয়া দিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডে ৯০৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় দেখুন।

নবুয়তের এই সপ্তম বৎসরের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল "শাক্কুল কামার" বা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযা, যাহার বিস্তারিত বিবরণ "মো'জেযার বয়ানে" দেওয়া হইবে।

নবুয়তের দশম বৎসর- বয়কট ভঙ্গের এবং হযরতের "শোকের বৎসর"

নবুয়তের সপ্তম, অষ্টম, নবম বৎসর হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের সঙ্গে সঙ্কটপূর্ণ জীবন যাপন করিলেন। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামসহ সমস্ত বনী মোত্তালেব এবং বনী হাশেমের প্রতি মক্কাবাসীদের এই নির্মম ও অন্যায় ব্যবহারের পরিণতি চরমে পৌঁছিল। ঐ পাষণ্ডদের মধ্যে দুই-চারি জন সহৃদয় ব্যক্তিও ছিলেন; বিভীষিকার চরম অবস্থাদৃষ্টে তাঁহাদের মন বিগলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা এই বয়কট ব্যর্থ করার প্রচেষ্টায় লাগিয়া গেলেন। সর্বপ্রথমে "হেশাম" নামক এক ব্যক্তি এই কার্যে অগ্রসর হইলেন; বনী হাশেমের সহিত তাঁহার কিছুটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। বনী হাশেমের মূল ব্যক্তি হাশেমের পরিত্যক্তা স্ত্রী উক্ত হেশামের দাদী ছিল। হেশামের প্রচেষ্টা হইল, কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তিকে

* কাহারও মতে আবদ্ধ জীবন যাপনের কাল দুই বৎসর এবং তাহাদের মতে অসহযোগিতা আরম্ভ নবুয়তের অষ্টম বৎসর হইতে ছিল। (যোরকানী ১-২৭৮)

এই কার্যে উদ্বুদ্ধ করা। সেমতে তিনি যোহায়র নামক এক ব্যক্তির নিকট গেলেন; তিনি আবদুল মোত্তালেবের দৌহিত্র– আবু তালেবের ভাগিনেয়। তিনি তাঁহার মাতুলকুল বনী মোত্তালেবগণের দুর্দশায় পূর্ব হইতেই ব্যথিত চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু নিজেকে একা ভাবিয়া কিছু করার সাহস করিতে ছিলেন না। হেশাম যোহায়রের নিকট যাইয়া বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবগণের চরম দুর্দমা দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন, আপনি কি ইহাতে সন্তুষ্ট যে, খাইয়া পরিয়া বিবি বাচ্চার সহিত আনন্দ ভোগে আছেন আর আপনারই মাতুলগোষ্ঠী দুঃখে-কষ্টে মৃত্যুর মুহূর্ত গুণিতেছে? যোহায়রের ব্যথিত স্বরে উত্তর করিলেন– কথা ত সবই ঠিক, কিন্তু একা আমি কি করিতে পারি? তখন হেশাম বলিলেন, এই লক্ষ্যে আপনি একা নন; আমি আপনার সঙ্গে আছি। অতপর তাঁহারা উভয়ে মোতয়েম ইবনে আদী নামক সর্দারের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, কোরায়শদের দুইটি বংশ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে আর আপনি তাহা দেখিয়া থাকিবেন? তিনি বলিলেন, আমি একা কি করিব? তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। তারপর আবুল বোখতারী এবং যম্‌আ ইবনে আসওয়াদকেও ঐরূপে সম্মত করা হইল। এখন বয়কট ব্যর্থ করার ব্যাপারে পাঁচ জন একমত হইলেন। যোরকানী, ১–২১০)

তাহারা পাঁচ জন পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, দারে নোদওয়া তথা মক্কার বিশেষ মিলনায়তনে যোহায়র এই আলোচনা প্রথমে উত্থাপন করিবেন এবং সুযোগ দেখিয়া অপর চারি জন পর পর সমর্থন জ্ঞাপন করিবেন। সেমতে পরদিন প্রাতে সেই মিলনায়তনের মজলিসে হেশাম এই ব্যাপারে বক্তৃতাদানে বলিলেন, "হে মক্কাবাসী! আমরা উদর পুরিয়া খাইব, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিব আর বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব ধ্বংস হইয়া যাইবে– ইহা কি সমীচীন? এই নৃশংসতার প্রতিজ্ঞাপত্র বা শপথনামা ছিন্নভিন্ন না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না।" তথায় আবু জাহল উপস্থিত ছিল, সেই পাষণ্ড ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং বলিল, তুমি মিথ্যা বুলির অবতারণা করিতেছ! আমাদের শপথনামা কখনও বিনষ্ট করা যাইবে না। আবু জাহলের দম্ভোক্তি শেষ হইতে না হাইতে যমআ বলিয়া উঠিলেন, আসল মিথ্যাবাদী তুমি। এই অন্যায় প্রতিজ্ঞাপত্রের উপর আমরা পূর্বেও সম্মত ছিলাম না। যমআর সুরে সুর মিলাইয়া আবুল বোখতারী বলিলেন, যম'আ ঠিক বলিয়াছেন; এই প্রতিজ্ঞার বিষয়বস্তুতে আমরা পূর্বেও সম্মত ছিলাম না, এখনও তাহার প্রতি আমাদের সমর্থন মোটেই নাই। মোতয়েম এবং হেশামও একই মন্তব্য করিলেন। এই বিতর্ক চলাকালে তথায় আবু তালেবও উপস্থিত হইলেন; তিনি এই পরিস্থিতির মধ্যে আর একটি বিষয় উত্থাপন করিলেন। মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) একটি অদৃশ্য ও সাধারণ সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের শপথনামার লেখাগুলি পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে; তোমাদের অন্যায় অত্যাচার অবিচারের কথাগুলি আল্লাহর নামের সহিত বিজড়িত থাকে নাই। (শপথনামার দুইটি প্রতিলিপি ছিল; একটি সুরক্ষিত এবং অপরটি কা'বায় লটকানো ছিল। এক কপির মধ্যে পোকা অন্যায়-অত্যাচারের কথাগুলি খাইয়া ফেলিয়াছিল, শুধু আল্লাহর নামের শব্দগুলি অবশিষ্ট ছিল। অপর কপির মধ্যে ইহার বিপরীত শুধু অন্যায়-অত্যাচারের কথাগুলি অবশিষ্ট ছিল, আল্লাহর নামের শব্দগুলি খাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহাতে সুস্পষ্ট। ইঙ্গিত এই বুঝা যায় যে, এইরূপ অন্যায়-অত্যাচারের কথার সহিত আল্লাহর নাম বিজড়িত থাকিবে না।) (যোরকানী, ১–২৯০)

কোন কিছু না দেখিয়া মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই সংবাদ দিয়াছেন। যদি এই সংবাদ সঠিক হয় তবে ইহা তাঁহার সত্যবাদিতার অলৌকিক প্রমাণ হইবে এবং প্রমাণ হইবে যে, এই প্রতিজ্ঞা শপথের বিষয়বস্তুর প্রতি আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট; তোমাদের অন্যায় এবং আত্মীয়তা ছেদনের প্রতিজ্ঞা হইতে আল্লাহ তাআলা তাঁহার নামের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। অতএব তোমরা শুভবুদ্ধির পরিচয় দানে তোমাদের এই অন্যায়ের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিন্ন করিয়া ফেল। আমাদের একটি প্রাণী বাঁচিয়া থাকিতে আমরা কস্মিনকালেও মুহাম্মদকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিব না। আর যদি মুহাম্মদের এই সংবাদ বেঠিক হয়, তবে আমি নিশ্চয় তাঁহাকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিব।

উপস্থিত সকলের উপর এই কথার একটা বিশেষ প্রভাব পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে মোতয়েম ইবনে আ'দী কা'বায় লটকানো প্রতিজ্ঞাপত্রটা নামাইয়া নিয়া আসিলেন। সত্য সত্যই দেখা গেল, সমস্ত লেখাই পোকায় খাইয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে, শুধু কেবল আল্লাহর নামই অবশিষ্ট রহিয়াছে (অপর কপির অবস্থা তাহা বিপরীত ছিল)। এদিকে আর একটি অসাধারণ ঘটনাও ঘটিয়া গিয়াছিল, এই প্রতিজ্ঞাপত্রের লেখক মনসুর ইবনে একরেমার হাত অবশ হইয়া গিয়াছিল (আসাহ্হুস সিয়ার ৯৫)। অবশেষে প্রতিজ্ঞাপত্র ছিঁড়িয়া ফেলা হইল এবং অন্যায় প্রতিজ্ঞার অবসান হইয়া গেল। এমনকি এই কাজে অগ্রগামী উল্লিখিত পাঁচ ব্যক্তি সকলে অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গিরি-প্রান্তরে গেলেন এবং তথা হইতে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবগণকে নবীজী (সঃ)-সহ বাহির করিয়া নগরে নিয়া আসিলেন।

দীর্ঘ দুই বা তিন বৎসর নবীজীর উপর কি বিপদই না গেল। তদুপরি মানসিক যাতনাও তাঁহার জন্য কম কষ্টের কারণ ছিল না যে, একমাত্র তাঁহার দরুন বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের সমস্ত লোক এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। তবে আদর্শবান মহামানবগণ বিপদকেও আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ও বিশেষ দানে পরিণত করিয়া নেন, তাঁহারা বিপদকেও সুযোগরূপে গ্রহণ করেন, নিজ কর্তব্য কর্মের এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের বিশেষ অবলম্বন বানাইয়া নেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাহাই করিয়াছিলেন এই দুই তিন বৎসরের বিপদকালে। এই সময়ে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেব এবং তাঁহাদের বন্ধুদের সঙ্গে নবীজী মোস্তফার অনাবিল মেলা-মেশার সুযোগ হইল। তাঁহারা শান্ত ধীরস্থির এবং দীর্ঘ দৃষ্টিতে নবীজী মোস্তফার প্রকৃত স্বরূপ দর্শনের সুযোগ পাইলেন। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, চরিত্রের মধুরতা ও শিক্ষার সৌন্দর্য তাঁহাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল। এতদ্ভিন্ন শত্রুদের মোকাবিলায়, আত্মক্রোধের উত্তেজনায় বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবগণ নবীজী মোস্তফার রক্ষণাবেক্ষণে পূর্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ় ও একতাবদ্ধ হইলেন। এই সুযোগে নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার কর্তব্য কর্ম ইসলামের প্রচার এবং দাওয়াত দানে দুর্বার গতিতে কর্মচঞ্চল থাকিলেন, এই সোনালী সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করিলেন। ইহার ফলে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইসলামের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং অনেক অভিজাত শ্রেণীর মানুষ তাঁহাদের সময় সুযোগে মুসলমান হইতে লাগিলেন। বয়কট ব্যর্থ করার ব্যাপারে যাঁহারা অগ্রগামী হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রথম ব্যক্তি হেশাম এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি যোহায়র উভয়ে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন (যোরকানী, ১-২৯০) এতদ্ভিন্ন কোরায়শ বংশীয় বিশিষ্ট পালোয়ান রোকানাও ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

রোকানা পালোয়ানের ইসলাম গ্রহণ

কোরায়শদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর পালোয়ান ছিলেন রোকানা। তিনি বনী হাশেম তথা নবীজী মোস্তফার বংশীয় ছিলেন। একদা গিরিপথে রোকানার সহিত নবীজী মোস্তফার সাক্ষাত হইল। নবী (সঃ) তাঁহাকে বলিলেন, খোদার ভয় তোমার অন্তরে আসে নাকি? আমার আহ্বানে সাড়া দিবে না-কি? রোকানা বলিলেন, আপনার ধর্ম সত্য প্রমাণিত হইলে আমি আপনার অনুসরণ করিব। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমি যদি কুস্তিতে তোমাকে পরাজিত করিয়া দিতে পারি তবে (অস্বাভাবিক ক্ষমতাদৃষ্টে) আমাকে সত্যবাদী বিশ্বাস করিবে কি? রোকানা বলিলেন, নিশ্চয়। নবীজী বলিলেন তবে দাঁড়াও। তিনি দাঁড়াইয়া নবীজীকে কুস্তির কায়দায় কাবু করিতে চাহিলেন, নবীজী তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিলেন। রোকানা দ্বিতীয় বার লড়িবার অনুরোধ করিলে নবী (সঃ) পুনরায় তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। তৃতীয় বারও নবীজী (সঃ) তাঁহাকে ধরাশায়ী করিলেন। রোকানা বলিলেন, আপনি আমাকে কুস্তিতে পরাজিত করিলেন, ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়! নবীজী (সঃ) বলিলেন, আল্লাহকে ভয় করার এবং আমার অনুসারী হওয়ার ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখাইতে পারি। রোকানা বলিলেন, তাহা কি? নবীজী (সঃ) দূরবর্তী একটি বৃক্ষের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, আমি ঐ বৃক্ষটিকে ডাকিলে সে আমার নিকটে আসিয়া যাইবে।

সত্য সত্য তাহাই হইল, অতপর নবীজী (সঃ) ঐ বৃক্ষটিকে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে বলিলে বৃক্ষটি পূর্ব স্থানে চলিয়া গেল। রোকানা বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনার পূর্বে কোন ব্যক্তি আমার পৃষ্ঠ মাটিতে ঠেকাইতে পারে নাই। ইতিপূর্বে আমার নিকট আপনি অপেক্ষা বিরাগভাজন আর কেউ ছিল না। কিন্তু এখন আমি আন্তরিক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি لا اله الا الله وانك رسول الله "আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই এবং আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রসূল।* (বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া ৩-১০৩)

সত্যের গতি অপ্রতিহত

সত্য নিজেই আপন স্থান করিয়া লয়, আলো তাহার প্রবেশ পথ নিজেই বাহির করে। এই সব চিরন্তন প্রবাদ নবীজীর সাফল্যে ও ইসলামের আত্মপ্রকাশে প্রথম হইতে ধীরে ধীরে হইলেও দিনের পর দিন বাস্তবায়িত হইতে লাগিল।

আবু জাহল, আবু লাহাব, উমাইয়া গোষ্ঠী নবীজী এবং তাঁহার ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সবাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়া ব্যর্থ হইল। অবশেষে বয়কট অভিযানেও পর্যদুস্ত হইল; এখন তাহারা হতভম্ব দিশাহারা। তাহারা কেমন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। কোন চেষ্টাই তাহাদের ফলবতী হইতেছে না। একটা বাধা আসিয়া তাহাদের অনেক রকম আয়োজন পন্ড করিয়া দিয়াছে– ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহারা বিমর্ষ হইল নিশ্চয়। কিন্তু অভিমান, গোঁড়ামি ও বদ্ধমূল কুসংস্কারের মোহে কিছুতেই তাহারা সত্য বরণ করিয়া লইতে পারিল না। বরং চরম ব্যর্থতার মুখেও তাহারা দুর্বলচেতা সংগ্রামের আশ্রয় নিল। তাহারা নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে পাগল, জাদুকর, গণকঠাকুর, মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ ইত্যাদি বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল এবং হজ্জ-ওমরা ইত্যাদি উপলক্ষে মক্কায় আগত লোকদেরকে নবীজী (সঃ) হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বহিরাগত লোককে কোরায়শরা ঘিরিয়া ধরিত, তাহার নিকট নবীজীর কুৎসা, নিন্দা ও গ্লানি করিত কিন্তু তাহাদের এই অপপ্রচার ও অপচেষ্টাই আগন্তুকদের মনে নবীজী (সঃ)-এর প্রতি আকর্ষণ জন্মাইত বিশেষ ক্রিয়াশীল প্রতিপন্ন হইত।

তদ্রূপ কোরায়শ শত্রুরা নবীজী (সঃ)-এর বিরুদ্ধে এমন ব্যাপক প্রচারণা চালাইল যে, তাহাদের প্রচারণা দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের সেই প্রচারই নবীজীর প্রসিদ্ধির জন্য মহা প্রচারের কাজ করিল। দূর দেশের লোক নিজ নিজ দেশে থাকিয়াই নবীজী (সঃ)-এর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ইহা শুধু ভাবাবেগ বা কল্পনা নহে বাস্তব সত্য– ইতিহাসে যাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

তোফায়েল দৌসীর ইসলাম গ্রহণ

আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র দৌসের প্রধান সর্দার ছিলেন তোফায়েল ইবনে আমর। অতিশয় প্রভাবশালী এবং বিশেষ অভিজাত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। তিনি একবার মক্কায় আসিলেন; তখন নবীজী (সঃ) গিরিসঙ্কট হইতে মুক্ত। তোফায়েল মক্কায় আসিলে মক্কার সর্দারবৃন্দ সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করিল– তিনি যেন রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট না যান, তাঁহার সহিত মোটেই সাক্ষাত না করেন, তাঁহার কোন কথাও যেন না শুনেন।

তোফায়েল নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা আমাকে এতই কঠোরভাবে সতর্ক করিয়াছে যে, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি– আমি তাঁহার কোন কথা শুনিব না। এমনকি হরম শরীফের মসজিদে যেহেতু নবীজী (সঃ) প্রায়শ ইসলামের আহ্বানে বক্তৃতা করিতেন, তাই আমি মসজিদে যাইতে কর্ণকুহরে তুলা ঠাসিয়া যাইতাম; যেন অনিচ্ছায়ও তাঁহার কথা আমার কর্ণে প্রবেশ না করে।

* কোন কোন ঐতিহাসিক রোকার মুসলমান হওয়া অস্বীকার করিয়াছে।

একদা আমি সকাল বেলা মসজিদে গেলাম; দেখিলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বা শরীফের সম্মুখে নামায পড়িতেছেন। আমি তাঁহার নিকটে গেলাম; আমার শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার কিছু কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি একটু লক্ষ্য করিলাম, এই সব কথা কতই না সুন্দর! কতইনা মধুর!! অতপর আমি মনে মনে ভাবিলাম, আমি ত একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী এবং পণ্ডিত– কবি। ভাল-মন্দ পার্থক্য করা আমার জন্য কঠিন নহে; তবে কেন আমি এই লোকটির (নবীজীর) কথা শুনিব না? তাঁহার কথার ভালটি গ্রহণ এবং মন্দটি বর্জন করিব। সেমতে আমি তাঁহার কথাবার্তা শুনিলাম এবং তাঁহার সান্নিধ্যেই বসিয়া থাকিলাম। এমনকি তিনি মসজিদ হইতে উঠিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার গৃহে যাইয়া সাক্ষাত করিলাম এবং বলিলাম, আপনার জাতি আপনার সম্পর্কে আমার নিকট এই এই বলিয়াছে। এমনকি আপনার কথা না শুনিবার জন্য আমি আমার কর্ণে তুলা ঠাসিয়া রাখিতাম। কিন্তু আল্লাহ আমাকে আপনার কথা না শুনাইয়া ছাড়েন নাই এবং আপনার কথা যাহা আমি শুনিয়াছি তাহা অতি সুন্দর, অতি মধুর। আপনি আপনার ধর্ম আমার নিকট ভালরূপে ব্যক্ত করুন ত। তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার সম্মুখে ইসলাম ব্যক্ত করিলেন এবং পবিত্র কোরআনও তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। খোদার কসম– এত সুন্দর বাণী আর জীবনেও আমি শুনি নাই, এত সুন্দর উত্তম ধর্ম জীবনেও আমি পাই নাই। আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিলাম। সত্য ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দিয়া দিলাম।

অতপর আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী! আমি আমার গোত্রের প্রধান, সকলে আমাকে মান্য করিয়া চলে। আমি এখন তাহাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব এবং তাহাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিব। আমার বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন নিদর্শন আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করুন; সেই নিদর্শন যেন তাহাদের নিকট আমার প্রচারকার্যের জন্য সাহায্যকারী হয়। সেমতে নবী (সঃ) দোয়া করিলেন, "হে আল্লাহ! তাকে কোন নিদর্শন দান করুন"। অতপর আমি আমার দেশের দিকে যাত্রা করিলাম; রাস্তার যেই মোড় অতিক্রম করিলে আমি দেশবাসীর দৃষ্টিগোচর হইব– সেই মোড়ে পৌঁছিলে আমার ললাটে চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে একটি আলোকরশ্মি প্রদীপের ন্যায় বিকশিত হইল। আমি দোয়া করিলাম, ইয়া আল্লাহ! আমার চেহারা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে আমার এই নিদর্শন দান কর। আমার ভয় হয়– লোকেরা ভাবিবে, তাহাদের ধর্ম ত্যাগের কারণে আমার চেহারা বিকৃত হইয়াছে। তৎক্ষণাত ঐ আলোকরশ্মি আমার চাবুকের মাথায় পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। লোকেরা ঐ আলো সুস্পষ্টরূপে প্রদীপের ন্যায় দেখিল।

আমি বাড়ী পৌঁছিলে আমার বৃদ্ধ পিতা আমার নিকট আসিলেন; আমি তাঁহাকে বলিলাম, আজ হইতে আপনি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন, আমি আপনার হইতে বিচ্ছিন্ন; আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। পিতা বলিলেন কেন হে বৎস! আমি বলিলাম, আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি; মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ধর্ম গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। পিতা বলিলেন, হে বৎস! তোমার ধর্মই আমারও ধর্ম। আমি বলিলাম, তবে গোসল করিয়া পাক-পবিত্র পোশাক লইয়া আসুন, তিনি তাহাই করিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে ইসলাম পেশ করিলাম; তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন। আমার স্ত্রী আমার নিকট আসিলে তাহার সহিতও ঐরূপ কথোপকথন হইল এবং সেও ইসলাম গ্রহণ করিল।

আমি আমার দৌস গোত্রেও ইসলাম প্রচার করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহারা সাড়া দিল না। আমি পুন মক্কায় আসিয়া নবীজীর (সঃ) নিকট দৌস গোত্র সম্পর্কে অভিযোগ করিলাম এবং তাহাদের প্রতি বদ দোয়ার জন্য বলিলাম। নবীজী (সঃ) তাহাদের জন্য দোয়া করিলে– "হে আল্লাহ! দৌস গোত্রকে হেদায়েত দান কর।" নবীজী (সঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি তোমার গোত্রে ফিরিয়া যাও; তাহাদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর এবং তাহাদের প্রতি উদার থাকিও। আমি তাহাই করিতে থাকিলাম, এমনকি নবীজী (সঃ) মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিয়া গেলেন। হিজরতেরও ছয় বৎসর পর আমি আমার সঙ্গী মুসলমানগণ লইয়া মদীনায় চলিয়া আসিলাম; আমরা সত্তর বা আশিটি পরিবার ছিলাম।

আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফত আমলে মিথ্যা নবী মোসায়লামার বিরুদ্ধে ইয়ামামার জেহাদে তোফায়েল (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। (বেদায়া ৩-৯৮)

গুণীন জেমাদের ইসলাম গ্রহণ

মক্কা হইতে বহু দূরে অবস্থিত "আয্দ" গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন জেমাদ। তিনি আরবের প্রসিদ্ধ গুণী ছিলেন; খুব বড় ওঝা ও মন্ত্রতন্ত্রবিদরূপে তাঁহার বিরাট খ্যাতি ছিল। একবার জেমাদ মক্কায় আসিলেন এবং মক্কার বেকুফদেরকে বলিতে শুনিলেন যে, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) পাগল বা তাঁহাকে ভূতে পাইয়াছে । সেমতে ঐ গুণীন সাহেব হযরতের নিকটে আসিয়া বলিলেন, আমি ভূত ছাড়ানোর মন্ত্র জানি; আল্লাহ অনেক মানুষকে আমার হাতে আরোগ্য দান করেন।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) সাধারণত কোন ভাষণ দান ক্ষেত্রে প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও সাহায্য কামনায় যাহা পাঠ করিতেন তাহা পাঠ করিলেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهٗ

- اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ -

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, আমরা তাঁহার প্রশংসা করি এবং তাঁহারই সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ যাহাকে সৎ পথ দান করিবেন; পারিবে না কেহ তাহাকে ভ্রষ্ট করিতে এবং আল্লাহ যাহাকে থাকিতে দিবেন ভ্রষ্টতায়, পারিবে না কেহ তাহাকে সৎ পথে আনিতে। আমি মনে-প্রাণে ঘোষণা দিতেছি, আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ, উপাস্য বা পূজনীয় নাই- তিনি এক, তাঁহার কোন সঙ্গী-সাথী অংশীদার নাই।"

জেমাদ এই ভূমিকা শুনিতেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তিন বার নবীজী (সঃ)-এর এই বাণী শ্রবণ করিলেন। অতপর বলিলেন, আমি মন্ত্রতন্ত্রবাদী অনেক গুণীনের কথা শুনিয়াছি, অনেক জাদুকরের জাদুমন্ত্র শুনিয়াছি, বড় বড় কবিদের রচনা শুনিয়াছি। কিন্তু আপনার বাণীর ন্যায় এমনটি আর কখনও শুনি নাই। এই বাণী ত সমুদ্রের ন্যায় সুগভীর, সুপ্রশস্ত, যাহার গভীরতায় অসংখ্য মণিমুক্তা লুক্কায়িত। আপনার হস্ত প্রদান করুন তাহা ধারণ করিয়া আমি ইসলাম গ্রহণ করি। সেমতে তিনি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্ত ধারণ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় গোত্রে ইসলাম প্রচারের অঙ্গীকার করিলেন। (বেদায়া ৩-৩৬)

আবু যর গেফারীর ইসলাম গ্রহণ

"গেফার" গোত্র মক্কা হইতে বহু দূরে অবস্থান করে, আবু যর গেফারী তথায় বসবাস করেন। কোরায়শদের বিরূপ প্রচারণার ফলে নবীজী মোস্তফার (সঃ) চর্চা আরবের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সুদূর গেফার গোত্রেও এই চর্চা প্রসারিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় আবু যর তাঁহার সহোদর ওনায়সকে নবীজীর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। ওনায়স মক্কায় আসিয়া কয়েক দিন অবস্থান করত নবীজীর সন্ধানলাভে প্রত্যাগমন করিল এবং ভ্রাতা আবু যরকে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিল। এই বর্ণনায় আবু যরের তৃপ্তি হইল না; তাঁহার পিপাসা আরও বাড়িয়া গেল; তিনি অবিলম্বে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহু সাধনায় তিনি নবীজী (সঃ)-এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হওয়ার সুযোগ পাইলেন। প্রথম সাক্ষাতেই আবু যর নবীজী (সঃ)-এর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিলেন। তাঁহার ইসলাম

গ্রহণের ঘটনা বর্ণনায় ইমাম বোখারী (রঃ) ৫৪৪ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়া এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন–

১৬৮৮। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা– ৪৯৯ ও ৫৪৪) আবু জমরাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আবু যরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা তোমাদেরকে শুনাইব কি? আমরা বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, আবু যর (রাঃ) নিজেই বর্ণনা দিয়াছেন যে, আমি গেফার গোত্রের লোক। আমাদের নিকট সংবাদ পৌছিল, মক্কায় একজন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে– তিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করেন,। আমি আমার সহোদর (ওনায়স)-কে বলিলাম, তুমি মক্কায় ঐ লোকটির নিকটে যাও, যে দাবী করে– তাঁহার নিকট ঊর্ধ্বজগতের সংবাদ সরবরাহ হয়। তাঁহার কথাবার্তাও সরাসরি তাঁহার মুখে শুনিবে এবং সব তথ্য লইয়া আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

সেমতে ভ্রাতা যাত্রা করিল এবং মক্কায় আসিয়া নবীজীর সাক্ষাতে আসিল, তাঁহার কথাবার্তা শুনিল অতপর মক্কা হইতে প্রত্যাগমন করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি সংবাদ? সে বলিল, আমি ঐ মহান ব্যক্তিকে দেখিয়াছি; তিনি সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রের উপদেশ দিয়া থাকেন, অসৎ কর্ম হইতে নিষেধ করিয়া থাকেন। আর তাঁহার বাণীও শুনিয়াছি, তাহা কবির রচনা মোটেই নহে (ওনায়স উত্তম কবি ছিলেন)। আমি ভ্রাতাকে বলিলাম, আমার যে পিপাসা রহিয়াছে তোমার বর্ণনায় তাহা মিটিল না। সেমতে অনতিবিলম্বে আমি পাথেয় এবং ছোট এক মশক পানি সঙ্গে লইয়া মক্কা পানে যাত্রা করিলাম। (ভ্রাতা আমাকে বলিয়া দিল, মক্কায় বিশেষ সতর্কতা অলম্বন করিবেন। তথাকার লোক ঐ মহানের বড় শত্রু এবং সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ। বেদায়া ৩–৩৫)

মক্কায় পৌঁছিয়া আমি হরম শরীফের মসজিদে অবস্থান করিলাম; যমযমের পানি পান করিতাম এবং নিজে নিজে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে খোঁজ করিতাম, কিন্তু তাঁহার খোঁজ পাইলাম না। তাঁহার খোঁজ সম্পর্কে কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিব তাহাও আমি সমীচীন মনে করিলাম না। এই অবস্থায় আমি সারা দিন মসজিদে পড়িয়া রহিলাম; এমনকি রাত্র আসিয়া গেল। এই অবস্থায় আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়া গমন করিলেন; তিনি বলিলেন. বোধ হইতেছে লোকটি বিদেশী। আমি উত্তর করিলাম, হ্যাঁ– আমি বিদেশী। আলী (রাঃ) বলিলেন, তবে আপনি আমার অতিথি; আমার বাড়ী চলুন। সেমতে আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম; আমিও তাঁহাকে আমার মূল উদ্দেশ্যের কিছু বলি না, তিনিও আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। আমি তাঁহার গৃহে রাত্রি যাপন করিলাম এবং ভোর হইলে আবার মসজিদে চলিয়া আসিলাম। আজও নবীজীর কোন খোঁজ লাভ করিতে পারিলাম না; কাহাকেও জিজ্ঞাসাও করিলাম না এবং এমন কোন মানুষ পাইলাম না যাহার কাছ হইতে খোঁজ লইতে পারি। দিনের শেষে আজও আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়া গমন করিলেন এবং বলিলেন, নিশ্চয় লোকটি এখনও উদ্দেশ্যস্থলের খোঁজ লাভে সক্ষম হই নাই। আমি বলিলাম, ঠিকই সক্ষম হয় নাই। আজও তিনি বলিলেন, আমার সঙ্গে আমার গৃহে চলুন। আজও পূর্ব দিনের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে যাইয়া রাত্রি যাপন করিলাম এবং ভোর হইলে মসজিদে চলিয়া আসিলাম। এইভাবেই তিন দিন অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিন আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন; আপনার ব্যাপার কি? উদ্দেশ্য কি? কেনই বা আপনি এই শহরে আসিয়াছেন? আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি যদি আমার কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখেন, কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন, আর প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমার উদ্দেশ্যের সাফল্যে আপনি আমার সাহায্য করিবেন, আমাকে পথ দেখাইবেন, তবে আমি বলিতে পারি। আলী (রাঃ) আমার উভয় শর্তে সম্মতি দান করিলেন– বলিলেন, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমি করিব।

আমি বলিলাম, আমাদের নিকট সংবাদ পৌছিয়াছে যে, এই নগরে একজন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি দাবী করিয়া থাকেন তিনি নবী। তাহার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হওয়ার জন্য পূর্বে আমার সহোদরকে এখানে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার তৃপ্তি যোগাইতে পারে নাই, তাই আমি স্বয়ং তাঁহার সাক্ষাত লাভের

আশায় এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আলী (রাঃ) বলিলেন, ঠিক জায়গায়ই আপনি আপনার কথা রাখিয়াছেন-- আপনার উদ্দেশ্য সাফল্যের পথে। যাঁহার বিষয় আপনি বলিতেছেন তিনি সত্য; তিনি আল্লাহর রসূলই বটেন। এই রাত্রে আপনি আমার গৃহেই অবস্থান করুন। প্রভাতে আমি আপনাকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিব।

ভোর হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, সেই মহানের পথ এই দিকে; আমি এই পথে যাইতে থাকিব, আপনি দূরে দূরে থাকিয়া আমার অনুসরণ করিবেন। আমি যদি আপনার জন্য কোন বিপদের আশঙ্কা দেখি তবে প্রস্রাব করার ন্যায় ভান করিয়া থামিয়া যাইব বা জুতা ঠিকভাবে পায়ে দেওয়ার ন্যায় পথের কিনারায় দাঁড়াইব। আপনি অন্য দিকে পথ ধরিয়া চলিয়া যাইবেন (যেন কেহ আপনার মূল উদ্দেশ্য আঁচ করিতে না পারে)। আর যদি আমি সরাসরি চলিয়া যাই তবে আপনিও আমার অনুসরণে চলিতে থাকিবেন এবং আমি যেই গৃহে প্রবেশ করি আপনিও সেই গৃহে ঢুকিয়া পড়িবেন।

সেমতে তিনি চলিতে লাগিলেন; আমি তাঁহার অনুসরণে চলিতে লাগিলাম। পথে কোন বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই তিনি সরাসরি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকটে পৌঁছিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছিলাম। আমি নবীজী (সঃ)-এর সমীপে আরজ করিলাম, আমাকে ইসলাম বুঝাইয়া দিন; তিনি ইসলামের ব্যাখ্যা দান করিলেন। তাঁহার মুখ নিঃসৃত অমিয় বাণী শ্রবণে আমি মুহূর্তে সে স্থানেই ইসলাম গ্রহণ করিলাম।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্নেহভরে বলিলেন, আবুযর! এই এলাকায় তুমি তোমার অবস্থা গোপন রাখিও– প্রকাশ করিও না। এখন তুমি দেশে যাইয়া তোমার দেশের লোককে এই ধর্মের খোঁজ দিতে থাক। আমাদের পূর্ণ বিকাশ এবং জয়যুক্ত হওয়ার সংবাদ অবগত হইলে আমার কাছে চলিয়া আসিও।

আমি আরজ করিলাম, যেই মহাশক্তিমান প্রভু আপনাকে সত্য ধর্ম দানে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ, আমি যে সত্য কালেমা পাইয়াছি তাহা মক্কার লোকদের কর্ণকুহরে না ঢুকাইয়া ক্ষান্ত হইব না।

ঠিকই, তৎক্ষণাত আবু যর (রাঃ) হরম শরীফের মসজিদে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় কোরায়শর অনেক লোক সমবেত ছিল। আবু যর (রাঃ) তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, হে কোরায়শ গণ!

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

"আমি অন্তর হইতে ঘোষণা দিতেছি, একমাত্র আল্লাহই মাবুদ! আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। আরও ঘোষণা দিতেছি, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা এবং তাঁহার রসূল।"

এই ধ্বনি দিতেই কোরায়শ দুর্বৃত্তরা মারমার করিয়া ছুটিয়া আসিল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, এই ধর্মত্যাগী বেদ্বীনকে ধর। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক হইতে আমার উপর বেদম প্রহার আরম্ভ হইয়া গেল। আমাকে প্রাণে শেষ করিয়া ফেলিবে সেইরূপ প্রহার তাহারা করিতে লাগিল। এই সময় (নবীজীর পিতৃব্য) আব্বাস (রাঃ) ছুটিয়া আসিয়া আমাকে তাঁহার দেহের আশ্রয়ে নিলেন এবং মারমুখী দুর্বৃত্তদের বলিলেন, তোমরা কি সর্বনাশ করিতেছ! এ যে গেফার গোত্রের লোক। সিরিয়ার বাণিজ্যযাত্রা এবং সাধারণভাবেও তোমাদের চলাচলের পথ গেফার গোত্রের পল্লী দিয়াই। আব্বাসের এই সতর্কবাণী শুনিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইল এবং আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

পর দিন ভোর হইতে না হইতেই আমার সেই অভিযান পুনঃ চলিল– আমি মসজিদে আসিলাম এবং পূর্ব দিনের ন্যায় আমার সেই ঘোষণার ধ্বনিই দিতে লাগিলাম। তাহাদেরও প্রহার অভিযান পূর্ব দিনের ন্যায় আমার উপর চলিল। আজও আব্বাস (রাঃ) ছুটিয়া আসিয়া নিজের দেহ দ্বারা আমাকে আশ্রয় দিলেন এবং পূর্বের ন্যায় দুর্বৃত্তদেরকে সতর্কবাণী শুনাইলেন; তাহাতে তাহারা ক্ষান্ত হইল।

পাঠক! লক্ষ্য করিলেন, ঈমানের বল-বিক্রম কত অধিক। সাহস, শক্তি ও উদ্যম কত প্রখর! ক্ষণেক পূর্বে যেই আবু যর কোন ব্যক্তির নিকট নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খোঁজ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী ছিলেন না, ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন; ঈমান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে আবু যর আর সেই আবু যর নাই। ভীত সন্ত্রস্ত আবু যর (রাঃ) এখন তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে নূতন বল-শক্তি, অসীমসাহস ও উৎসাহ-উদ্যমের স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিলেন। এমনকি সেই বল-বিক্রম, সাহস-উদ্যমের বাণীক চাপিয়া রাখা তাঁহার জন্য সম্ভব হইল না। সকল প্রকার ভয়-ভীতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রাণের মায়াঁর বাঁধন ছিন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন কালেমা শাহাদাতের বিজয় ধ্বনি তুলিতে, তওহীদ এবং নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্বীকৃতি ঘোষণা মক্কার পাষণ্ডদের ঘাড়ে চাপিয়া ধরিতে। এই মহাশক্তি ও অদম্য সাহস একমাত্র ঈমানেরই ক্রিয়া ছিল। আবু যর (রাঃ) এখনও পেয়াজ বা গরুর গোশ্‌ত খাইয়াছিলেন না। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাত হইতে আবু যর (রাঃ) তওহীদ ও ঈমানের এমন মদিরাই পান করিয়াছিলেন যে, তাহার তেজস্ক্রিয়ায় নবীজীর স্নেহসুলভ পরামর্শও তখন লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

বিগত তিন বৎসর কাল গিরিসঙ্কটে সঙ্কটপূর্ণ জীবন যাপনের পর নবুয়তের দশম বৎসরে বয়কট বা অসহযোগিতা প্রত্যাহৃত হইয়াছিল।

দীর্ঘ তিন বৎসর কষ্ট-যাতনা হইতে খালাস পাওয়া হযরতের পক্ষে অবশ্যই একটি সুখের বিষয় ছিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে সেই সুখ অপেক্ষা শত গুণ অধিক পর পর দুইটি দুঃখজনক শোকের ছায়া হযরতের উপর নামিয়া আসিল।

আবু তালেবের মৃত্যু

অসহযোগিতা হইতে খালাস পাওয়ার মাত্র ছয় মাস বা আট মাস বিশ দিন পর ঐ বৎসরই হযরতের বাহ্যিক সাহায্য সহায়তার সর্বপ্রধান উসিলা চাচা আবু তালেবের মৃত্যু হয়; যাহা হযরতের পক্ষে অপূরণীয় শূন্যতা ছিল। এত দিন সারা মক্কাবাসীর মোকাবিলায় হযরতের পক্ষে আবু তালেবই ছিলেন একমাত্র প্রতিরোধ ও প্রতিবাদকারী। আজ সেই উসিলা চির দিনের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল। বাহ্যিকরূপে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িলেন।

আবু তালেবের সর্বশেষ অবস্থা (পৃষ্ঠা– ৫৪৮)

পূর্বে বলা হইয়াছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লালন-পালন হইতে আরম্ভ করিয়া নবুয়তের পরও সারা মক্কার শত্রুদের মোকাবিলায় সাহায্য সহায়তার যে ভূমিকা আবু তালেব গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন তাহার নজীর ইতিহাসে নাই। নবীজী মোস্তফার পয়গম্বরী জীবনে সফলতার ব্যাপারে বাহ্যিক উসিলারূপে আবু তালেবের দান ছিল অপরিসীম। তিনি নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে তাঁহার অন্তরে যে স্থান দান করিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্তও অতি বিরল। কিন্তু এত ভালবাসা সত্ত্বেও আবু তালেব হযরতের আনীত ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষদের শেরেকী ধর্মের উপরই ছিলেন। হায়! সারা বিশ্ব যেই প্রদীপের আলোতে উজ্জ্বল, সেই প্রদীপের সর্বাধিক নিকটবর্তী আবু তালেব তাহার আলো হইতে বঞ্চিত। এ যেন প্রদীপের নীচে অন্ধকার।

এ বিষয়টি যে হযরতের পক্ষে পীড়াদায়ক ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। যখন আবু তালেবের অন্তিমকাল উপস্থিত হইল তখন হযরত (সঃ) সর্বশেষ চেষ্টার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মানুষবেশী শয়তান আবু জাহল ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গরা পূর্ব হইতেই আবু তালেবের শয্যা পার্শ্বে ভিড় জমাইয়া রহিয়াছিল। হযরত (সঃ) আবু তালেবকে ইসলামের কালেমা পাঠ করিবার জন্য অত্যধিক অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি

করিতেছিলেন, এমনকি তিনি অন্তরের অন্তস্তল হইতে আদর ও সোহাগের ডাক দিয়া বলিলেন, হে আমার চাচা! আপনি একটি বাক্যের (ইসলামের কালেমা) স্বীকারোক্তি করিয়া আমার পক্ষে কেয়ামতের দিন আপনার জন্য শাফায়া'ত করার পথ সুগম করিয়া দিন;, আমি এই বাক্যটি নিয়াই আপনার পক্ষ সমর্থনে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াইব। এইভাবে হযরত (সঃ) তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। অপর দিকে আবু জাহল ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গরা তাঁহাকে বলিতেছিল, হে আবু তালেব! জীবনের মেষ মুহূর্তে স্বীয় পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করিয়া আরবের নারীদেরকে তিরস্কারের সুযোগ দিও না যে, আবু তালেব কাপুরুষ ছিল– ভাতিজার কথায় আযাবের ভয়ে ভীত হইয়া বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে।

অবশেষে আবু তালেব এই দুর্ভাগ্যজনক উক্তির উপরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন যে, পিতা আবদুল মোত্তালেবের ধর্মের উপরই রহিলাম!

হযরত (সঃ) স্বীয় আশ্রয়স্থল চাচাকে হারাইয়া যতদূর শোক পাইয়াছিলেন তাহার হাজার গুণ অধিক শোক পাইলেন চাচার মৃত্যু বে-দ্বীনীর উপর হওয়ায়। হযরত (সঃ) এই শোকে দুঃখে বেহাল হইয়া ইসলাম না থাকা সত্ত্বেও চাচার মাগফেরাতের দোয়া করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু কোরআনের আয়াত নাযিল হইয়া তাঁহাকে তাহা হইতে বারণ করিল এবং আরও আয়াত নাযিল করিয়া আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন যাহার বিবরণ নিম্নের হাদীছে আছে ।

১৬৮৯। হাদীছঃ عن ابن المسيب عن ابيه رضى الله تعالى عنه انَّ اَبَاطَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ اَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ اَىْ عَمِّ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِى اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَاهُ حَتّٰى قَالَ اٰخِرُ شَىٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اُنْهَ عَنْهُ ـ فَنَزَلَتْ (مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ) وَنَزَلَتْ (اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ)

অর্থঃ সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী' সায়ীদ ইবনে মোসাইয়াব (রাঃ) তাঁহার পিতা ছাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু তালেবের যখন মৃত্যু অতি নিকটবর্তী হইল তখন নবী (সঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। আবু জাহল পূর্বাহ্নেই তথায় পৌছিয়াছিল।

হযরত (সঃ) আবু তালেবকে বলিলেন, হে আমার চাচা! আপনি ইসলামের কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর স্বীকারোক্তি করুন। ইহা লইয়াই আমি আপনার পক্ষ সমর্থন করিয়া আল্লাহর দরবারে দাঁড়াইব। তখন আবু জাহল এবং তাহার আর এক সাথী বলিল, হে আবু তালেব! তুমি তোমার পিতা আবদুল মোত্তালেবের ধর্ম ছাড়িয়া দিবে কি? এই ধরনের বহু রকমের কথা তাহারা দুই জনে আবু তালেবকে বলিতে লাগিল, এমনকি আবু তালেবের সর্বশেষ উক্তি এই হইল যে, আবদুল মোত্তালেবের ধর্মের উপরই...।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আমি আবু তালেবের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিয়া যাইব যাবত আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আমাকে নিষেধ না করা হয়। তখনই পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হইল–

مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ....

অর্থাৎ নবীর জন্য এবং মোমেনদের জন্য এই অনুমতি নাই যে, তাহারা কোন মোশরেকের পক্ষে

মাগফেরাতের দোয়া করে– ইহা প্রতীয়মান হইয়া যাওয়ার পর যে, ঐ মোশরেক শেরকের উপর মৃত্যুবরণ করিয়া জাহান্নামী সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে; যদিও সেই মোশরেক কোন ঘনিষ্ঠতর আত্মীয় হয়।

এতদ্ভিন্ন এই আয়াতও নাযিল হইল– اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ

অর্থাৎ হেদায়েত দান করার ক্ষমতা আপনার হাতে ন্যস্ত নহে যে, আপনি আপনার প্রিয়পাত্রকে (জোর করিয়া) হেদায়েত দিয়া দিবেন। অবশ্য আল্লাহ তাআলা (মানুষের ইচ্ছাশক্তি কর্মশক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ দেখিয়া) যাহাকে ইচ্ছা করেন হেদায়েত পাওয়ার তওফীক দান করিয়া থাকেন। হেদায়েত পাওয়ার উপযুক্ত কাহারা তাহা আল্লাহ তাআলা ভালরূপেই অবগত আছেন।

১৬৯০। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা– ৫৪৮) عن العباس بن عبد المطلب انه قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ فَانَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِىْ ضَحْضَاحٍ مِّنْ نَارٍ وَلَوْلَا اَنَا لَكَانَ فِىْ الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ـ

অর্থ ঃ হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (কেয়ামতের দিন) আপনার চাচা আবু তালেবকে কি সাহায্য করিতে পারিবেন? তিনি ত আপনার অত্যধিক সাহায্য সহায়তা করিতেন এবং আপনার পক্ষ সমর্থন করিয়া সংগ্রাম চালাইয়া থাকিতেন। নবী (সঃ) তদুত্তরে বলিলেন, তিনি অল্প তথা পায়ের গিঁট পর্যন্ত দোযখের আগুনে থাকিবেন। (তাঁহার শাস্তির এই লাঘব আমারাই বদৌলতে হইবে।) যদি আমার সম্পর্কীয় ব্যাপার না থাকিত তবে তিনি দোযখের সর্বশেষ তবকার নিম্নস্তরে থাকিতেন।

১৬৯১। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা– ৫৪৮) عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَجْعَلُ فِىْ ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ تَبْلُغَ كَعْبَيْهِ يَغْلِىْ مِنْهُ دِمَاغُهُ ـ

অর্থ ঃ আবু সায়ী'দ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে তাঁহার চাচা আবু তালেবের বিষয় উল্লেখ করা হইল। হযরত (সঃ) বলিলেন, আশা করি তাহার শাস্তি লাঘব করিতে কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ সাহায্য করিবে। তাহাকে অল্প পরিমাণ দোযখের আগুনে রাখা হইবে; দোযখের আগুন তাহার পায়ের গিঁট পর্যন্ত থাকিবে, কিন্তু তাহা দ্বারাই তাহার মাথার মগজ পর্যন্ত টগবগ করিতে থাকিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এস্থলে একটু চিন্তা করিলে ঈমান যে কি অমূল্য ধন এবং দোযখ হইতে নাজাত পাইবার জন্য ঈমান যে অপরিহার্য তাহা পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহর রসূলের সাহায্য সহায়তা করা সর্বশ্রেষ্ঠ নেক কাজ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ছাহাবীগণ এই নেকের দ্বারাই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আবু তালেবের মধ্যে সেই নেক কাজটি অত্যধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহায্য সহায়তায় সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই সব কোন কিছুই দোযখ হইতে তাহাকে নাজাত দিতে পারিবে না। তাহার একমাত্র কারণ হইল ঈমান রত্ন হইতে আবু তালেবের বঞ্চিত থাকা; এই জন্যই তাহার জীবনের শেষ মুহূর্তে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহার ঈমানের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইয়াছিলেন।

আর একটি বিষয় এস্থলে পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করা যায়, তাহা এই যে, আল্লাহর রসূলকে মমতা করা, তাঁহাকে রসূল জানা, সত্যবাদী জানা– শুধু জানার পর্যায়কে ঈমান বলা হইবে না। শুধু জানার পর্যায়ে আবু

তালেব কাহারও পশ্চাতে ছিলেন না। তাহার কাব্যের এক বিরাট অংশ এইসব বিষয়ে আজও ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে। কাব্যে তাহার পরিষ্কার উক্তি ছিল–

ودعوتنى وزعمت انك ناصحى ـ ولقد صدقت وكنت ثم امينا ـ

আপনি আমাকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়া দাবী করিয়াছেন; বাস্তবিকই আপনি সত্যবাদী এবং পূর্ব হইতেই আপনি অকৃত্রিম।

وعرضت دينا لامحالة ـ انه ـ من خير اديان البرية دينا ـ

আর আপনি বিশ্ববাসীর সম্মুখে এমন এক ধর্ম পেশ করিয়াছেন যাহা অবশ্যই সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বোত্তম ধর্ম।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এবং ইসলাম সম্পর্কে এই ধরনের উক্তি আবু তালেবের কাব্যে ভূরি ভূরি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু এই ধরনের উক্তিকে ঈমান গণ্য করা হয় নাই। কারণ, শুধু জানার পর্যায়কে ঈমান বলা হয় না, বরং রসূলকে এবং ইসলামকে মানা ও গ্রহণ করার উপরই ঈমানের ভিত্তি। আবু তালেবের মধ্যে ইহার অভাব ছিল। ইহার অভাব আজ আমাদের সমাজে মুসলিম নামধারী অনেকের মধ্যেই দেখা যায়।

আবু তালেবের মৃত্যু শয্যায় আবু জাহলসহ কোরায়শ সর্দারগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনার প্রতি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আপনার অবিদিত নহে। আপনার শেষ সময় নিকটবর্তী, যাহা আপনিও বুঝিতেছেন। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত আমাদের যে বিরোধ রহিয়াছে তাহাও আপনি অবগত আছেন। আমাদের অনুরোধ– আপনি তাহাকে ডাকিয়া আনুন এবং তাহার হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করুন, যেন আমাদের প্রতি অন্যায় না করে; আমাদের হইতেও অঙ্গীকার গ্রহণ করুন, আমরাও তাহার প্রতি কোন অন্যায় করিব না।

সেমতে আবু তালেব নবীজীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র তোমার বংশীয় সর্দারগণ সমবেত হইয়াছে। তাহারা তোমার সহিত আপস-মীমাংসার প্রস্তাব করিতেছে; তুমিও অঙ্গীকার করিবে, তাহারও অঙ্গীকার করিবে।

নবীজী (সঃ) বলিলেন, ভাল কথা! আপনারা আমাকে একটি মাত্র উক্তি প্রদান করিবেন; তাহা দ্বারা আপনারা সমগ্র আরবে প্রাধান্য লাভ করিবেন এবং ঐ উক্তির বদৌলতে সারা বহির্জগত আপনাদের পদানত হইবে!

আবু জাহল বলিল, এইরূপ একটি কেন! দশটি উক্তির অঙ্গীকার আপনি আমাদের হইতে আদায় করুন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আপনারা অঙ্গীকার করিবেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"– আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই। আর আপনাদের বর্তমান পূজনীয় দেব-দেবী ঠাকুর-মূর্তিগুলিকে চিরতরে পরিত্যাগ করিবেন।

এই কথা শুনিয়া কোরায়শ দলপতিগণ বলাবলি করিল, তোমরা যাহা চাও সেইরূপ একটি অক্ষরও এই ব্যক্তি হইতে আদায় করিতে পারিবে না, অতএব নিজেদের পূর্বপুরুষগণের ধর্মমতের উপর অবিচল থাক; এই ব্যক্তির সহিত আল্লাহই যদি ফয়সালা করিয়া দেন। (ইবনে হেশাম)

সর্বশেষ পর্যায়ে আবু তালেব কোরায়শ দলপতিগণকে কতকগুলি অমূল্য উপদেশ দিয়া গেলেন যাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি তাহাদের বলিলেন–

হে কোরায়শগণ! তোমরা মানব জাতির শ্রেষ্ঠ এবং আরবীয়দের হৃৎপিণ্ড তুল্য। তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ রহিয়াছে– সকলেই যাহাদের অনুগত। তোমাদের মধ্যে বাহাদুর এবং ধনে-জনে শক্তিশালী ব্যক্তিগণও রহিয়াছে। তোমাদের মধ্যে আরব জাতির সর্বময় মহিমা বিদ্যমান রহিয়াছে, যদ্দরুন তোমাদের

প্রাধান তোমরা কা'বা শরীফের যথাযথ সম্মান করিবে; ইহাতে তোমাদের প্রতি প্রভু-পরওয়ারদেগার সন্তুষ্ট হইবেন, তোমাদের জীবিকার অবলম্বন হইবে এবং তোমাদের প্রাধান্য বজায় থাকিবে। আর তোমরা পরস্পর আত্মীয়তার হক আদায় করিও; তাহাতে নেকনামী বাকী থাকে, জীবনের মূল্য বাড়ে এবং বংশের উন্নতি হয়। জুলুম-অত্যাচার এবং পরস্পর শত্রুতা বর্জন করিও; এই দুই জিনিসের দ্বারা অতীতে অনেক জাতি ধ্বংস হইয়াছে। আর কেহ ডাকিলে তাহার ডাকে সাড়া দিও, সাহায্যপ্রার্থীকে দান করিও এবং সদা সত্য কথা বলিও, আমানত পূর্ণরূপে আদায় করিও।

আর আমি তোমাদিগকে বিশেষরূপে উপদেশ দিতেছি- তোমরা মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সহিত ভাল ব্যবহার বজায় রাখিও। তিনি সমগ্র কোরায়শ বংশের আমানতদার এবং সমগ্র আরবে সত্যবাদীরূপে প্রসিদ্ধ। আমি তোমাদের যতগুলি সৎ উপদেশ দান করিলাম মোহাম্মদের মধ্যে ঐসব গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি আমাদের নিকট যেই ধর্ম নিয়া আসিয়াছেন অনেকেরই হৃদয় তাহা গ্রহণ করে যদিও মানুষের নিন্দার ভয়ে মুখে গ্রহণ করে না।

খোদার কসম! আমি যেন চোখে দেখিতেছি- আমার পূর্ণ বিশ্বাস, আরব এবং পাশ্ববর্তী এলাকার দরিদ্র দুর্বল লোকগণ মুহাম্মদের ডাকে সাড়া দিয়া, তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া মৃত্যুর মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। ফলে কোরায়শ দলপতিগণ অন্যের লেজুড় হইয়া যাইতেছে, তাহাদের বাড়ী-ঘর উজাড় হইয়া যাইতেছে এবং ঐ গরীব-কাঙ্গালগণ তাহাদের উপর প্রাধান্য লাভ করিতেছে।

হে কোরায়শ বংশ! তোমরা মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সাহায্যকারী এবং তাঁহার দলের সহায়তাকারী হইয়া যাও। যেব্যক্তি তাঁহার পথের পথিক এবং তাঁহার আদর্শের অনুসারী হইবে সে নিশ্চয় ভাগ্যবান হইবে। আমার জীবনের আরও অংশ যদি বাকী থাকিত এবং আমার মৃত্যু যদি বিলম্ব করিত নিশ্চয় আমি মুহাম্মদ (সঃ) হইতে সর্বপ্রকার আক্রমণ প্রহিত করিয়া চলিতাম এবং তাঁহার হইতে সকল রকম আপদ-বিপদের প্রতিরোধ করিতাম। (যোরকানী- ১-২৯৫)

অতপর সমবেত কোরায়শ দলপতিগণ তথা হইতে প্রস্থান করিলে আবু তালেব নবীজী (সঃ)-কে পুনঃ ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কোরায়শ দলপতিদের নিকট কোন অন্যায় দাবী কর নাই।

নবীজী (সঃ) আবু তালেবের এই আলাপে তাঁহার ঈমান সম্পর্কে আশান্বিত হইয়া বলিলেন, হে চাচাজান! আপনি ঐ দাবীব কালেমাটা পড়িয়া নিন। যদ্দ্বারা কেয়ামত দিবসে আমি আপনার জন্য শাফাআত বা সুপারিশের সুযোগ লাভ করিব।

উত্তরে আবু তালেব বলিলেন, আমার যদি আশঙ্কা না হইত যে, আমার মৃত্যুর পর তোমাদেরকে কটাক্ষ করিয়া লোকেরা বলিবে, আবু তালেব ভীত হইয়া মৃত্যুর সময় কাপুরুষের ন্যায় এই কালেমা পড়িয়াছে, তবে নিশ্চয় আমি এই কালেমা পড়িয়া নিতাম। (ইবনে হেশাম)

খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মৃত্যু

বিপদ যেন অন্ধকার রজনীর ন্যায় ঘনীভূত হইয়া আসিতে থাকে। আবু তালেবের মৃত্যু হইল, তাহার ঈমান সম্পর্কে হযরতের সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এই নিদারুণ শোক-তরঙ্গে ভাসিতে থাকা অবস্থায়ই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর আর এক শোকের পাহাড় ধসিয়া পড়িল।

এই দশম বৎসরেই রমযান মাসে আবু তালেবের মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পর* হযরতের দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদীজা (রাঃ) ৬৫ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করিলেন। বিবি খাদীজা (রাঃ) হযরতের জন্য অর্থ-সামর্থ্য, ঘর-সংসার, শান্তি-শৃঙ্খলারই শুধু সংস্থাপক ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন,

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিবি খাদীজার মৃত্যু আবু তালেবের মৃত্যুর পূর্বে হইয়াছিল। কিন্তু ইহার বিপরীত মতামতই প্রসিদ্ধ এবং অধিক নির্ভরযোগ্য। (বেদায়া ৩-১২১)

প্রত্যেক পরিস্থিতিতে হযরতকে সান্ত্বনাদানকারিণী, হযরতের অন্তরে বল-ভরসা আনয়নকারিণী। আজ হযরত (সঃ) এইরূপ জীবনসঙ্গিনীকেও হারাইয়া ফেলিলেন; ইহাতে তাঁহার শোকের সীমা থাকিতে পারে কি! এমনকি স্বয়ং হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই বৎসরকে عام الحزن "শোকের বৎসর" বলিয়া আখ্যায়িত করিলেন।

বিবি খাদীজাকে হারাইয়া হযরত (সঃ) অন্তরে কি ভীষণ আঘাতই না পাইলেন! দুনিয়ার এক শ্রেষ্ঠ নেয়ামত যেন তিনি আজ হারাইলেন। বিবি খাদীজা হযরতের অন্তর ও জীবনের এত বড় বিরাট স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন যে, তাহা অন্য কাহারও দ্বারা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী আদর্শ মহিলা জগতে অল্পই জন্ম নেয়। হযরতের জীবনের দীর্ঘ পঁচিশটি বৎসর বিবি খাদীজা (রাঃ) হযরতের সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠায়, পারিবারিক ও সামাজিক ময়দানে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠায় যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন সেই স্মৃতি রেখা হযরতের হৃদয়পট হইতে মুছিয়া যাওয়ার মত ছিল না।

পয়গম্বরীর সূচানাকালে নবীজীর জীবনটা সম্পূর্ণ এলোমেলো শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহার পানাহারের খোঁজ ছিল না, শোয়া-বসার খবর ছিল না। পথে-প্রান্তরে গিরিকন্দরে তিনি উদাসীনভাবে বেড়াইতেন, পড়িয়া থাকিতেন, তখন বিবি খাদীজাই তাঁহার তত্ত্ব লইতেন, খোঁজ করিয়া পানাহার পৌঁছাইতেন, শৃঙ্খলায় ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা করিয়া থাকিতেন। পয়গম্বরী জীবনের সর্বপ্রথম অধ্যায়ে যখন নবীজী (সঃ) আশা-নিরাশার দোলায় দুলিয়া ব্যস্তত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, হেরা গুহা হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে আসিয়াছিলেন তখন বিবি খাদীজাই আদর্শ সহধর্মিণীরূপে নবীজী সান্ত্বনা, প্রেরণা ও বল-ভরসা যোগাইয়াছিলেন। জগতের সকলে যখন নবীজীর কথাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, তখন এই পুণ্যবতী মহীয়সীই সর্বপ্রথম তাঁহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। জাতি ও দেশের সকলে যখন নবীজী (সঃ)-কে উপেক্ষা ও বর্জন করিয়াছিল তখন এই ভাগ্যবতী খাদীজাই তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন। চতুর্দিকে যখন নবীজীর জন্য নিরাশার অন্ধকার, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের ঝড় তখন সেই ঘোর সঙ্কটকালে কর্মজীবনের সর্বপ্রথম সঙ্গিনী এবং ধর্ম জগতের সর্বপ্রথম মুরীদ বিবি খাদীজাই নবীজীর জন্য আলো বহনকারিণী এবং জানে-মালে সর্বপ্রকারে ঝড় ঝঞ্ঝা হইতে আশ্রয়দানকারিণী ছিলেন। সারা দিনের কর্মব্যস্ততা ও দেশজোড়া শত্রুদের উৎপীড়নে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া দিনের শেষে নবীজী (সঃ) যখন বাড়ী ফিরিতেন তখন বিবি খাদীজা প্রকৃত সহধর্মিণীর ধর্ম মতেই হৃদয়ের সর্বময় ভক্তি-শ্রদ্ধা, অন্তরের সবটুকু মায়া-মমতা তাঁহার চরণে নিবেদিত করিয়া তাঁহার দৈহিক ও আত্মিক অশান্তি দূর করণে এবং সুখ-সান্ত্বনা প্রদানে নিজেকে লুটাইয়া দিতেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ) প্রতিদিন এইভাবে খাদীজার সেবায় সারা দিনের ক্লান্তি শ্রান্তি দূর করিয়া নবোদ্যমের সহিত ধর্ম ক্ষেত্রে পুনঃ অবতীর্ণ হইতেন। সুখে-দুঃখে আপদে-বিপদে সর্বদা বিবি খাদীজা নবীজীর সহিত ছায়ার মত জড়াইয়া থাকিতেন; মুহূর্তের জন্যও বিবি খাদীজা নবীজী (সঃ)-এর সেবায় উদাসীন হইতেন না। বিবি খাদীজা ছিলেন নবীজীর আদর্শ সহধর্মিণী, সর্বক্ষেত্রের সহকর্মিণী এবং সর্বাবস্থার সহযোগিনী। অন্তরের ভক্তি আসক্তির সহিত বিবি খাদীজা নিজেকে এবং নিজের সর্বস্বকে নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর চরণে যেভাবে লুটাইয়া দিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত জগতে মিলিবে না। নবীজী (সঃ)ও বিবি খাদীজার প্রতি কিরূপ আকৃষ্ট ছিলেন, তাঁহাকে কিরূপ স্বীকৃতিদান করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিত বিবরণ "শাদী মোবারক" আলোচনায় আলোচিত হইয়াছে। বিবি খাদীজার প্রতি নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আকর্ষণ ও স্বীকৃতি প্রমাণে এতটুকুই যথেষ্ট যে, বিবি খাদীজার বিরহ-ব্যথা চিরকাল নবীজীর হৃদয়ে দাগ কাটিয়াছে।

ইহকালের এহেন জীবন সঙ্গিনী চিরবিদায় নিলেন নবীজী (সঃ) হইতে, নবীজীর সেই বিচ্ছেদ-বেদনার পরিমাপ করা কি সহজ? এই শ্রেণীর ব্যথা-বেদনায় মানুষ ধৈর্যচ্যুত না হইয়া পারে না। বিশেষতঃ প্রায় অর্ধ শতাব্দীর লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী উপকারীজন পিতৃব্য আবু তালেবের শোক ভুলিতে না ভুলিতেই

এই মহাশোকের আঘাত লাগিল নবীজীর অন্তরে। আঘাতের উপর আঘাত, শোকের উপর শোক; স্বয়ং নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কর্তৃক এই বৎসরকে "আমুল হোয্‌ন"– শোকের বৎসর আখ্যা প্রদানই তাঁহার অন্তরের প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছে।

আয়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ

নবুয়তের দশম বৎসর রমযান মাসে বিবি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহার ইন্তেকাল হইল। হযরত (সঃ) শোকে জর্জরিত, তদুপরি তাঁহার ঘর-সংসার দেখিবার ও শৃঙ্খলা করিবার মত কেহ নাই, তাই হযরত (সঃ) পরবর্তী মাস শাওয়াল মাসেই পুনঃ বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন এবং পর পর দুইটি বিবাহ হইল। একটি উম্মুল মোমেনীন সওদা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সঙ্গে। তিনি বিধবা ছিলেন তাঁহার স্বামীর নাম ছিল "সাকরান বিন আমর"। তিনি এবং তাঁহার স্বামী অনেক পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করতঃ আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন। তথায় থাকাকালীন বা মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয় এবং তিনি বিধবা হইয়া থাকেন। পুনঃ বিবাহের প্রস্তাবে তিনি প্রথম দ্বিধা করিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাকে দ্বিধাবোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন; আমার মহব্বত আপনার প্রতি সর্বাধিক, কিন্তু আমার পাঁচ-ছয়টি সন্তান রহিয়াছে; তাহারা সকাল-বিকাল আপনাকে বিরক্ত করিবে। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আমাকে এই কারণে বাধা দেয়। নবী (সঃ) বলিলেন, দ্বিধার আর কোন কারণ নাই তঃ? তিনি বলিলেন, খোদার কসম– আর কোন কারণ না (বেদায়া–১৩৩)

বিবি সওদার পিতা তখন জীবিত এবং অমুসলিম ছিলেন, কিন্তু তিনি হযরতের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে রাজি হইয়া সওদা (রাঃ)-কে নবীর হাতে তুলিয়া দিলেন।

অপর বিবাহ হইয়াছিল আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সঙ্গে। কিন্তু এই বিবাহ শুধু আনুষ্ঠানিক এবং কেবলমাত্র ইজাব-কবুলের বিবাহ ছিল; অন্য কোন রসুমতই হইয়াছিল না। বিবাহের সময় হযরতের বয়স ছিল পঞ্চাশ বৎসর আর আয়েশার বয়স মাত্র ছয় বৎসর।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ন্যায় একনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়ে হিসাবে আদর সোহাগের নিদর্শন স্বরূপ এই বিবাহের আক্কদ্ বা ইজাব কবুল হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এই বিবাহ সম্পর্কে মালায়ে আ'লা তথা আল্লাহর দরবার হইতেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আসিয়াছিল, যাহার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে

১৬৯২। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা–৭৬০) عن عائشة رضى الله تعالى عنها قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْتُكَ فِى الْمَنَام مَرَّتَيْنِ اذا رَجُل يَحْمِلُكَ فِىْ سَرَقَة حَرِيْرٍ فَيَقُوْلُ هٰذه امْرَاتُكَ فَاكْشِفُهَا فَاذَا هِىَ اَنْتِ فَاَقُوْلُ اِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰه يُمْضِه ـ

অর্থ ঃ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহাকে বলিয়াছেন, স্বপ্নে আমায় দুই বার তোমাকে দেখান হইয়াছে– এক লোক রেশমী কাপড়ে তোমাকে বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছে, অতপর তিনি আমাকে বলিলেন, এইটি আপনার স্ত্রী। সেমতে আমি রেশমী কাপড়ের আবরণ উন্মোচন করিলাম এবং দেখিতে পাইলাম তুমি-ই।

নিদ্রা ভঙ্গের পর আমি ভাবিলাম, ইহা যখন আল্লাহর তরফ হইতে তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই বাস্তবায়িত করিবেন।

১৬৯৩। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা– ৫৫) ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (আয়েশা (রাঃ) হইতে) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মদীনায় হিজরত করিয়া আসিবার পূর্বে তৃতীয় বৎসর বিবি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু

তাআলা আনহার মৃত্যু হইয়াছিল। অতপর হযরত (সঃ) দুই বৎসর বা দুই বৎসরের নিকটবর্তী (অর্থাৎ দুই বৎসরের অধিক, কিন্তু তিন অপেক্ষা অনেক কম– দুই বৎসর চারি মাস) মক্কায় অবস্থান করিয়াছেন। (এই সময়েই) আয়েশা (রাঃ)-কে বিবাহের ইজাব-কবুল গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ছয় বৎসর ছিল। অতপর তাঁহাকে ব্যবহারে আনিয়াছিলেন (মদীনায় পৌঁছিয়া; তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর ছিল)।

১৬৯৪। হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি যদি কোথাও অবতরণ করেন এবং তথায় একটি বৃক্ষ দেখেন যাহা কাহারও পশু খাইয়াছে; আর একটি বৃক্ষ দেখেন যাহা কাহারও পশু খায় নাই, এমতাবস্থায় আপনি আপনার পশুকে উক্ত বৃক্ষদ্বয়ের কোন্‌টি খাইতে দিবেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, যেই বৃক্ষটি খাওয়া হয় নাই।

আয়েশা (রাঃ) এই দৃষ্টান্তে বুঝাইতে চাহিতেছিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে একমাত্র আয়েশা (রাঃ)-ই কুমারী ছিলেন। (পৃষ্ঠা– ৭৬০)

ব্যাখ্যা ঃ হযরতের সহিত বিবি আয়েশার ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতার ভঙ্গিমাসুলভ খোশ আলাপের একটি অধ্যায় ছিল এই প্রশ্নোত্তর। নবীজী (সঃ)-এর হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য সকলেই সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। বিবি আয়েশার উল্লিখিত খোশ আলাপটা সেই উদ্দেশেই ছিল।

১৬৯৫। হাদীছ ঃ ওরওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট বিবি আয়েশার বিবাহ প্রস্তাব পাঠাইলেন। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আপনি ত আমাকে ভ্রাতা বলিয়া থাকেন (সেই হিসাবে আয়েশা আপনার ভাতিজী)। নবী (সঃ) বলিলেন, আপনি আমার ধর্মীয় ভ্রাতা এবং কোরআনের উক্তিরূপে ভ্রাতা, সুতরাং আয়েশাকে বিবাহ করার বৈধতায় আমার জন্য কোন বাধা নাই। (পৃষ্ঠা– ৭০৬)

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কোরআনে আছে انما المؤمنون اخوة "সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই"। এই আয়াতের প্রতিই নবী (সঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ঊর্ধ্বজগত হইতে ইঙ্গিত পাওয়ার পর নবীজী (সঃ) এই বিাহের প্রস্তাবদানে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবীর স্বপ্ন অকাট্য ওহী, সেমতে এই বিবাহ প্রস্তাব ওহী দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছিল। তাই পঞ্চাশ বৎসরের বর, ছয় বৎসরের কন্যা– বয়সের এই অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও এই প্রস্তাব প্রদান ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। নবীজীর প্রাণও হয়ত এই প্রস্তাবে স্বাগত জানাইয়াছিল। কারণ, নবীজীর সেবা ও শ্রদ্ধায় আবু বকরের (রাঃ) যে অপরিসীম দান ছিল তাহার স্বীকৃতি স্বয়ং নবী (সঃ) এই ভাষায় দিয়া থাকিতেন–

اِنَّ مِنْ اَمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِى صُحْبَتِهٖ وَمَالِهٖ اَبَا بَكْرٍ لَوْ كُنْتَ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّىْ

لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ اُخُوَّةُ الْاَسْلَامِ وَمُوَدَّتُهٗ -

"বিশ্বজোড়া মানুষের মধ্যে স্বীয় জান মাল দ্বারা আমার সর্বাধিক উপকার করিয়াছেন আবু বকর। আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ভিন্ন অন্য কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো আমার জন্য সম্ভব হইলে আবু বকরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইতাম। তবে ইসলাম ভ্রাতৃত্ব এবং ভালবাসা তাহার জন্য (আমার অন্তরে সর্বাধিক) রহিয়াছে।" এই আন্তরিক স্বীকৃতি কার্যত প্রকাশ করার সুযোগ পাইয়া নবীজী হয়ত পুলকিত ও আনন্দিত ছিলেন। আবু বকরের (রাঃ) আনন্দের ত কোন সীমাই ছিল না। যাঁহার চরণে আবু বকরের সর্বস্ব উৎসর্গীকৃত তাঁহারই চরণে তাঁহারই সেবায় স্বীয় স্নেহের দুলালীকে অর্পণ করিবেন– এই গৌরব এবং আনন্দ কি আবু বকরের অন্তর ধারণ করিতে পারে!

১৬৯৬। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা–৫৫১) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তখন আমার বয়স ছয় বৎসর (পূর্ণ হইয়া সপ্তম বৎসর আরম্ভ) হইয়াছিল।

(আবু বকর (রাঃ) একাই হযরতের সঙ্গে হিজরত করিয়া মদীনায় পৌঁছিয়াছিলেন, মদীনায় আসিয়া বসবাসের ব্যবস্থা করার পর তাঁহারা উভয়েই নিজ নিজ পরিবারবর্গকে নিয়া আসিবার জন্য মক্কায় লোক পাঠাইয়াছিলেন।) অতপর আমরা মদীনায় পৌঁছিলাম এবং বনু হারেসের মহল্লায় অবস্থান করিলাম। আমি ভয়ানক জ্বরে পতিত হইলাম, এমনকি আমার মাথার চুল ঝরিয়া গেল। অতপর জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিবার চেষ্টা-তদবীর করিয়া চুলগুলো একটু বড় করা হইল, তাহা কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছিল।

একদা আমি আমার কতিপয় বান্ধবীর সহিত দোলনায় বসিয়া ঝুলিয়া খেলা করিতেছিলাম, হঠাৎ আমার মাতা আসিয়া আমাকে ডাকিয়া নিয়া গেলেন; আমি কিছুই বুঝিতেছিলাম না, কি উদ্দেশে আমাকে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আমাকে হাত ধরিয়া বাড়ী নিয়া আসিলেন, তখনও আমার শ্বাস ফুলিতেছিল। আমার শ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার পর তিনি আমার মাথা ও মুখমণ্ডল পানি দ্বারা মুছিয়া দিলেন এবং ঘরের ভিতর নিয়া আসিলেন; তথায় মদীনাবাসিনী কতিপয় মহিলা বসিয়া ছিলেন। তাঁহারা আমার প্রতি শুভ এবং মঙ্গল কল্যাণের আশীর্বাদ বাণীর ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। আমার মাতা আমাকে তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিলেন। তাঁহারা আমার বেশ-ভূষা পরিপাটি করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের ভিতর হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) তশরীফ আনিলেন, তখন বেলা উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছিল। অতপর এই মহিলাগণ আমাকে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে সমর্পণ করিয়া দিলেন। আমার বয়স তখন নয় বৎসর।

তায়েফের সফর

খাজা আবু তালেব এবং বিবি খাদীজা (রাঃ) আর দুনিয়ায় নাই; নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাহ্যিক আশ্রয়স্থলও আর নাই। বিবি খাদীজা (রাঃ) ছিলেন নবীজীর গৃহাঙ্গনের, আর খাজা আবু তালেব ছিলের বাহিরের আশ্রয়; এখন নবীজীর উভয় দিক উজাড় হইয়া গিয়াছে। নবীজীর শান্তির নীড়ই শুধু ভাঙ্গে নাই, তাহার বৃক্ষেরও পতন হইয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই নবীজীর ভৌতিক দেহ মন ভাঙ্গিয়া পড়ার কথা। তদুপরি মক্কার দূর্বত্ত শত্রুরা নবীজীর উপর জুলুম অত্যাচারের স্বরাজ পাইয়াছে, তাহাদের জন্য অত্যাচারের পথ একেবারে নিষ্কন্টক হইয়া গিয়াছে। এত দিন আবু তালেবের জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারিত না; এখন সেই বাধা দূর হইয়াছে। তাহাদের ধারণায় নবীজী (সঃ) এখন নিরাশ্রয়! তাঁহাকে লইয়া যাহা খুশী করা যায়– নবীজীর প্রতি অত্যাচার নির্যাতন চালাইতে কোরায়শরা দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। মনের ক্ষোভ মিটাইয়া তাহারা নবীজী (সঃ)-কে উৎপীড় করিতে আরম্ভ করিল।

নবীজীর গৃহভ্যন্তরে আহার্য রান্নার পাত্রে দুর্বত্তরা ময়লা গলিজ পচা গান্ধা আবর্জনা ফেলিয়া যাইত (বেদায়া ৩–১৩৪)। নবীজীর গৃহে মরা পচা ফেলিয়া যাইত; নবীজী তাহা লাঠির মাথায় উঠাইয়া অপসারিত করিতেন এবং উচ্চ কণ্ঠে বলিতেন, হে আবদে মনাফের বংশধর (কোরায়শ)। এই কি প্রতিবেশীর ধর্ম?

নবীজী আল্লাহর ঘরের নিকটে নামায পড়িতেন; সেজদাবস্থায় দুরাচাররা কখনও উটের, কখনও বা সদ্যপ্রসূতা ছাগীর ফুল ইত্যাদি আবর্জনা তাঁহার উপর ফেলিয়া দিত; নবীজীর অসহায় শোকাতুর মেয়েদের কেহ সংবাদ পাইয়া তাহা অপসারণ করিতেন। একদা নবীজী (সঃ) পথ বহিয়া চলিয়াছেন; এক নরাধম ছুটিয়া আসিয়া কতগুলি ধুলাবালি ও আবর্জনা নবীজীর মাথার উপর ফেলিয়া গেল। নবীজী সেই অবস্থায় গৃহে আসিলেন; এখন তাঁহার গৃহে কে আছে যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে, তাঁহার সেবা করিবে! নবীজীর এক কন্যা আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার মাথা পরিষ্কার করিয়া দিতে লাগিলেন। শোকাবিষ্টা মা হারা কন্যার অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া নবীজী তাঁহাকে স্নেহভরে বলিলেন, মা! কাঁদিও না; আল্লাহ তোমার পিতাকে রক্ষা করিবেন। নরাধমেরা এই শ্রেণীর অসভ্যপনা চালাইয়া যাইতে লাগিল; পথে-ঘাটে নীচ ভাষায় গালাগালি ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ত কথাই ছিল না। এতদ্ভিন্ন দৈহিক নির্যাতন চালাইতেও তাহারা দ্বিধা করিত না। নবীজী (সঃ) কা'বা শরীফের নিকটে নামায পড়িতেছিলেন, এক দুরাচার পাপাত্মা আসিয়া তাঁহার গলায় চাদর দিয়া ফাঁস লাগাইয়া দিল, এমনকি নবীজীর শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। আবু বকর (রাঃ) ছুটিয়া আসিলেন এবং নিজের উপর বিপদের ঝুঁকি লাইয়া দুর্বৃত্তকে সজোরে ধাক্কা দিলেন! সে দূরে সরিয়া পড়িল– এইরূপে নবীজী

রেহাই পাইলেন। এই শ্রেণীর আর একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে।

১৬৯৭। হাদীছ ঃ– (পৃষ্ঠা–৭৪০) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ لَئِنْ رَاَيْتُ مُحَمَّداً يُصَلِّىْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَاَطَأَنَّ عَلٰى عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ فَعَلَهُ لَاَخَذَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ ـ

অর্থ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (পাষণ্ড খবিস) আবু জাহল তাহার সংকল্প প্রকাশ করিল, আমি যদি মুহাম্মদকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কা'বা ঘরের নিকট নামায পড়িতে দেখি তবে কসম করিয়া বলি, আমি তাহার ঘাড় পাড়াইয়া পিষ্ট করিয়া দিব। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহার এই সংকল্পের সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, সেইরূপ করিলে (আল্লাহ তাআলার) ফেরেশতা তাহাকে ধরিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কোরআনে "এক্‌রা" সূরায় এই বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে–

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى عَبْداً اِذَا صَلّٰى ـ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى ـ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ـ .... كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ـ فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ـ

অর্থ ঃ দেখ ত! ঐ পাপিষ্ঠের দৌরাত্ম্য, আমার বিশিষ্ট বান্দা যখন নামায পড়েন তখন সে বাধার সৃষ্টি করিতে চায়। দেখ ত, তাহার পাপাচরণ! আমার ঐ বান্দা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আমার ভয়-ভক্তি শিক্ষাদানকারী, আর এই পাপিষ্ঠ সত্যকে স্বীকার করে না, আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে। তাহার এই দৌরাত্ম্য কিছুতেই চলিতে দেওয়া হইবে না। যদি সে বিরত না থাকে তবে পাপ ও মিথ্যা তথা অহঙ্কারের প্রতীক তাহার মাথার লম্বা চুলগুলি ধরিয়া তাঁহাকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া আনিব। সে যেন তাহার দলবলকে সাহায্যের জন্য ডাকিয়া আনে; আমি নরকের পেয়াদা ফেরেশতাকে ডাকিব। (ঐ ফেরেশতা তাহাকে হেঁচড়াইয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিবে।)

নাসায়ী শরীফের হাদীছে উল্লেখ আছে– ঐ দুরাত্মা পাপিষ্ঠ আবু জাহল একদা তাহার ঐ নারকীয় সংকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য অগ্রসর হইয়া হঠাৎ ভীত-সন্ত্রস্তরূপে ত্রাসের সহিত পিছনে হটিয়া আসিল। লোকেরা তাহাকে এইরূপ ভীতি ও ত্রাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমি পা বাড়াইলেই লেলিহান অগ্নির খন্দক ও ভয়াল আকৃতি আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত।

মক্কার দুরাচার নারকীয় আত্মার পাষণ্ডদের পক্ষ হইতে এইভাবে দিনের পর দিন লাঞ্ছনা নিগ্রহ চলিতে লাগিল। অথচ দুনিয়ায় আজ নবীজীর এমন কোন দরদী নাই যে, এই দুর্দিনে তাঁহার সান্ত্বনা যোগাইবে। বাহিরের জন্য তাঁহার কেহ মুরব্বী আশ্রয়ের সম্বল নাই, গৃহে তাঁহার স্ত্রী নাই। নবীজীর জন্য আছে শুধু চতুর্দিকে অন্ধকার। আবু তালেবের ন্যায় পিতৃব্যের বিয়োগ, পুণ্যবতী খাদীজার ন্যায় স্বর্গীয় সুসমাময়ী স্ত্রী সহধর্মিণীর বিচ্ছেদ, আর মাতৃহারা কন্যাগণের বিষাদমাখা ম্লান মুখ। আর আছে এই চরম হতাশাময় অবস্থা নরাধম পাপিষ্ঠদের অকথ্য অত্যাচার।

একদিকে এতগুলি বিপদের একত্র সমাবেশ, অপর দিকে নবুয়তের দায়িত্ব– ইসলাম প্রচার কর্তব্যের অলঙ্ঘনীয় আদেশ। এই চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াও নবীজী মোস্তফার (সঃ) হৃদয় স্বীয় দায়িত্ব কর্তব্য পালনে এক বিন্দু দমিত বা বিচলিত হইল না, তাঁহার লক্ষ্য বিচ্যুত হইল না, তাঁহার জ্ঞানে ধ্যানে মনে প্রাণে একই বিষয়– আল্লাহর দ্বীন প্রচার করা। কিন্তু তাঁহার ইহা বুঝিতেও বাকী থাকিল না যে, মক্কায় ইসলাম প্রচার বর্তমানে অসম্ভব ও নিষ্ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই নবীজী মোস্তফা (সঃ) কর্তব্যে দৃঢ় ও কর্মের পিয়াসী হইয়া ধীরস্থির চিত্তে বিকল্প পন্থার চিন্তা করিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তায়েফ গমন করিতে মনস্থ করিলেন।

মক্কা হইতে প্রায় ৭০/৮০ মাইল দূরে অবস্থিত তায়েফ নগরী; ইহা এতই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যমলা যে, বেহেশত হইতে বিচ্যুত ভূখণ্ড বলিয়া কথিত। ব্যবসা-বাণিজ্যে মক্কাবাসীদের সহিত তায়েফবাসীদের পরিচয়ও ছিল, পরস্পর বৈবাহিক আদান-প্রদানও প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ কা'বা শরীফ তায়েফবাসীদেরও তীর্থস্থান ছিল; হজ্জ উপলক্ষে তায়েফবাসীদেরও মক্কায় আগমন হইত। কোরায়শ প্রধান অনেকেরই তায়েফে বাগ-বাগিচা ছিল। মক্কার পর এই তায়েফকেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) নিজ কর্মস্থল ও ইসলামের প্রচার কেন্দ্র বানাইবার পরিকল্পনা করিলেন।

সেমতে পূর্বালোচিত উম্মুল মোমেনীন সওদা (রাঃ)-কে যিনি বেশী বয়সেরও ছিলেন এবং সংসার পরিচালনার অভিজ্ঞতা সম্পন্নাও ছিলেন, পাঁচ ছয়টি সন্তানের মা হইয়াছিলেন– তাঁহাকে বিবাহ করিয়া নবীজি (সঃ) নিজের ঘরের শৃঙ্খলা আনায়নের ব্যবস্থা করিলেন। ঘরে তাঁহার অবিবাহিত চারিটি কন্যা ছিল– এই মাতৃহারা কন্যাদের জন্য গৃহ সামলাইবার ব্যবস্থা করিয়া নবীজি মোস্তফা (সঃ) তায়েফ গমনের ব্যবস্থা সম্পন্ন করিলেন।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) তায়েফের পথে যাত্রা করিলেন; তাঁহার একমাত্র সঙ্গী হইলেন তাঁহার প্রিয় ভক্ত অনুরক্ত পালিত পুত্র যায়েদ (রাঃ)। দুর্গম গিরি-কান্তার পার হইয়া নবীজী (সঃ) যায়েদ (রাঃ)-সহ তায়েফ নগরীতে উপনীত হইলেন। তাঁহারা তায়েফ পর্যন্ত ৭০/৮০ মাইলের দীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিলেন (যোরকানী, ১–৩০৫)

তায়েফ অঞ্চলে যেসকল গোত্র বাস করিত "বনী সাকীফ" গোত্র তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল। সেই সাকীফ গোত্রে আবদে ইয়ালীল, মসউদ, হাবীব এই ভ্রাতৃত্রয় বংশ প্রধান এবং তথাকার সর্দার সমাজপতি ছিল। তাহাদের একজনের নিকট কোরায়শ বংশীয় একটি কন্যাও বিবাহিতা ছিল। নবী (সঃ) সর্বপ্রথমে তাহাদের নিকট গমন করিলেন। এই প্রধানগণের নিকট উপস্থিত হইয়া নবীজী (সঃ) তাহাদিগকে আল্লাহর পানে আহ্বান করিলেন এবং সত্যের প্রচারে কোরায়শদের অন্যায়ভাবে বাধা দানের ঘটনাবলী ব্যক্ত করিয়া তাহাদিগকে সত্যের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন। তায়েফবাসীরাও কোরায়শদের ন্যায় পৌত্তলিক ছিল এবং তাহারা শস্য-শ্যামল দেশে অর্থ-সম্পদের অধিকারী ছিল– সেই অহঙ্কার এবং গর্বও ছিল তাহাদের ভিতরে বদ্ধমূল। সাকীফ দলপতিগণ নবীজীর আহ্বান অনুরোধ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখান করিল। তাহাদের এক জন ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "আল্লাহ বুঝি খুঁজিয়া আর লোক পাইল না, তোমাকেই পয়গাম্বর করিল।"

নবীজী মোস্তফা (সঃ) উপস্থিত তাহাদের আশা ত্যাগ করিলেন। অবশেষে নবীজী (সঃ) তাহাদের অনুরোধ করিলেন, তাহারা যেন নবীজী সম্পর্কে তাহাদের এই মনোভাব গোপন রাখে। তিনি ভাবিলেন, তাহারা যদি এই বিষাক্ত মনোভাব প্রচার করিয়া বেড়ায় তবে জনসাধারণের মধ্যে সত্যের প্রচার দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। তাহাদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে। ফলে তায়েফের অবস্থাও মক্কার ন্যায় হইয়া উঠিবে, নবীজী (সঃ)-ও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ শত্রুতা ব্যাপক আকারে ছড়াইয়া পড়িবে। সাকীফ প্রধানগণ নবীজির এই অনুরোধও রক্ষা করিল না। তাহারা তায়েফের দুষ্ট দুরাত্মা দুরাচার লোকদেরকে লেলাইয়া দিল, দেশবাসীকে নবীজীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিল। এমনকি তাহাদের চাকর ও দাসগুলিকে পর্যন্ত নবীজীর পিছনে লাগাইয়া দিল। এখন নবীজী (সঃ) কোথাও বাহির হইলেই ঐ সব লোকেরা হৈ হৈ করিয়া তাঁহার চারিদিকে সমবেত হইতে থাকে। পথ চলিতে লাগিলে পিছনে পিছনে বিদ্রূপ গালাগালি বর্ষণ করিয়া চলে। শুধু তাহাই নহে, পাষণ্ডেরা তাঁহার প্রতি ইট-পাথর মারিতে মারিতে তাঁহার দেহ মোবারক রক্তাক্ত করিয়া ফেলে। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কোমল চরণদ্বয় রক্তাক্ত হইয়া যাইত, এমনকি পায়ের রক্ত শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া জুতা পায়ে আটকিয়া যায়।

অসহনীয় প্রস্তরাঘাতে সময় সময় নবীজী (সঃ) অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িতেন। তখন পাষণ্ডরা তাঁহাকে দুই বাহু ধরিয়া তুলিয়া দিত এবং তিনি চলিতে আরম্ভ করিলে পুনরায় প্রস্তর বর্ষণ শুরু করিত। এই সময়

নরাধমদের বিকট হাস্য এবং হৈ হৈ ধ্বনির রোল পড়িয়া যাইত।

তায়েফ প্রবাসে নবীজীর উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল, তিনি যে দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার অনুমান করার জন্য তৃতীয় খণ্ডের ১৫১৪ নং হাদীছখানা লক্ষ্য করা যথেষ্ট। তাহাতে স্বয়ং হযরতের মুখের বিবৃতি বর্ণিত রহিয়াছে– আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহুদ রণাঙ্গনের অবস্থা অপেক্ষা কঠিনতর অবস্থা আপনার জীবনে আর কখনও উপস্থিত হইয়াছিল কি? উত্তরে হযরত (সঃ) তায়েফবাসীদের নির্যাতনে সর্বাধিক দুঃখ-কষ্ট পাওয়ার কথা উল্লেখপূর্বক তাহাদের অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী তুলিয়া ধরিলেন।

ওহুদের জেহাদে নবীজির দাঁত ভাঙ্গিয়াছিল, মাথা ফাটিয়াছিল, তদুপরি সারা দেহ মোবারকে শতের অধিক আঘাত লাগিয়াছিল। প্রিয় পিতৃব্য হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মর্মান্তিক শাহাদাত বরণ এবং আবু সুফিয়ান স্ত্রী হেন্দা কর্তৃক তাঁহার বক্ষ ফাড়িয়া কলিজা চিবানোর দৃশ্যসহ সত্তর জন ছাহাবীর শাহাদাতের মানসিক আঘাতও কম ছিল না। নিকটবর্তী সময়ের সেই ওহুদের দুঃখ-কষ্ট অপেক্ষা প্রায় ছয় বৎসর পূর্বের তায়েফের ঘটনার দুঃখ কষ্টকে অধিক বলা কতই না তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষতঃ এত দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তায়েফের দুঃখ-কষ্টের বিষয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তরে দাগ কাটিয়া থাকা কি সহজ কথা!

নবীজীর সঙ্গী ভক্ত অনুরক্ত পালিত পুত্র যায়েদ (রাঃ) নিজের জান প্রাণ দিয়া নবীজী (সঃ)-কে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি একা এই পরিস্থিতিতে কি করিতে পারেন! তিনিও মাথায় ভীষণভাবে আঘাত পাইয়াছিলেন।

আঘাতের উপর আঘাতে আল্লাহর পেয়ারা রসূল নবীজী মোস্তফা (সঃ) ক্রমশঃ অবসন্ন ও অচৈতন্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পাষণ্ডদের অত্যাচার ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিল। এমতাবস্থায় তিনি পথিপার্শ্বে একটি বাগানের নিকট পৌঁছিলেন। বাগানটি ছিল মক্কার দুই ভ্রাতা রবিয়া পুত্র ওতবা ও শায়বার। মালিকদ্বয় বাগানে উপস্থিত ছিল, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঐ বাগানে আঙ্গুর গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। তাঁহার দেহ এবং পা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল; এই সময় দূর্বত্তরা চলিয়া গিয়াছে; নবীজীর স্বস্তি চেতনাও কিঞ্চিত ফিরিয়া আসিয়াছে; এখন তিনি ক্ষত-বিক্ষত দেহের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারিলেন যে, অবস্থার অনুভূতি করার মত জ্ঞান বোধ তাঁহার ফিরিয়াছে। এই সময় তিনি শান্তি লাভের জন্য শান্তির মূল কেন্দ্র রহমানুর রাহীম রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিকর্তা প্রভু পরওয়ারদেগারের দরবারে উপস্থিতির ব্যবস্থা করিলেন। হাদীছে আছে, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নত ছিল নিম্নরূপ–

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَبَهٗ اَمْرٌ صَلّٰى

অর্থ ঃ "ছাহাবী হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভ্যাস ছিল– কোন বিষয়ে যখন তিনি বিব্রত হইতেন, চিন্তা ও অশান্তি অনুভব করিতেন, তখন তিনি নামাযের আশ্রয় নিতেন। (মেশকাত শরীফ– ১১৭)

সেমতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই চরম দুঃখ-বেদনা, দুরবস্থা ও দুর্দশার সময়ে শরণাপন্ন হইলেন পরম আপন আল্লাহ তাআলার এবং দুই রাকাত নামায পড়িলেন। নামাযান্তে তিনি ঐ মহানের দরবারে মোনাজাতের হাত তুলিলেন, যাঁহার পথে তিনি এই দুর্দশা ও দুর্ভোগের শিকার হইয়াছেন। (যোরকানী, ১–৩০৫)।

নবীজী (সঃ) সেই মহানকেই একমাত্র আপনজনরূপে সম্বোধন করিয়া দোয়া প্রর্থনা করিলেন। দুরবস্থার চরম দৃশ্যের সম্মুখে নবীজীর ঐ প্রার্থনার প্রতিটি পদ ও বাক্যই ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ এবং আল্লাহতে আত্ম নির্ভরশীলতায় পূর্ণতম এবং পূণ্যতম আদর্শ।

নবীজি মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিশাল অন্তরে যে অসীম প্রেরণার ভীষণ উচ্ছ্বাস ছিল, আল্লাহতে প্রগাঢ় বিশ্বাসের যে অটুট বন্ধন ছিল, আল্লাহ অনুরক্তির যে অসাধারণ ভাবাবেগ ছিল– এই প্রার্থনা বা দোয়াটি তাহার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

দোয়াটির আবেগপূর্ণ ভাষা ও ভঙ্গিমায় শত্রুও বলিতে বাধ্য হয়– বিশ্বের প্রতি নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামে আহ্বান যে স্বর্গীয় ও ঐশ্বরিক সেই বিশ্বাসের উপর তীব্র আলোকপাত করে তাঁহার এই প্রার্থনা বা দোয়া।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রচনার নামে নিকৃষ্টতম শত্রুতার অবতারণাকারীও আলোচ্য দোয়াটির ভাবাবেগে মুগ্ধ হইয়া স্বীকার করিয়াছে।

It sheds a strong light on the intensity of his belief in the divine origin of his calling (life of mohamet, by mwir)। দোয়াটি এই–

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِيْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ وَهُوَ انِيْ عَلَى النَّاسِ ـ اَللّٰهُمَّ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّيْ ـ اِلٰى مَنْ تَكِلُنِيْ اِلٰى بَعِيْدٍ يَتَهَجَّمُنِيْ اَوْ اِلٰى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ اَمْرِيْ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلاَ اُبَالِيْ وَلٰكِنْ عَافِيَتُكَ هِيَ اَوْسَعُ لِيْ ـ اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ اَلَّذِيْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مِنْ اَنْ يَّنْزِلَ بِيْ غَضَبُكَ اَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ وَلَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ

অর্থ ঃ "আয় আল্লাহ! তোমারই নিকট ব্যক্ত করিতেছি আমার দুর্বলতা ও এই লোকদের দৃষ্টিতে আমার হেয়তা। হে আল্লাহ হে পরম দয়াময়! তুমি সকল দুর্বলদের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, তুমিই আমারও পালনকর্তা রক্ষাকর্তা। তুমি আমাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিতেছ? অপরের হস্তে– যে আমার প্রতি আক্রমণে উদ্যত হইয়া আসে বা শত্রুর হস্তে– যাহার ক্ষমতায় দিয়াছ আমার সব কিছু? প্রভু হে! (আমার একমাত্র কাম্য তোমার সন্তোষ,) আমার প্রতি তোমার অসন্তোষ না থাকিলে আমি এই সব বিপদ-আপদের কোন পারওয়া করি না; তবে তোমার নিরাপত্তা ও শান্তির দান আমার জন্যও প্রশস্ত। (আমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইব কেন?) প্রভু হে! তোমার যেই পুণ্য জ্যোতির প্রভাবে সকল অন্ধকার তিরোহিত হইয়া যায়, যাহার কল্যাণে ইহ-পরকালের সর্ববিষয়ে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়– সেই পুণ্য জ্যোতির স্মরণ লইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তোমার অসন্তোষ যেন আমাকে ছুঁইতেও না পারে, তোমার কোপ বা অনল দৃষ্টি যেন আমার উপর পতিত না হয়। তোমার সন্তোষই আমার একমাত্র কাম্য! আমি যেন সর্বদা তোমার সন্তোষ লাভ করিতে পারি। তুমি আমার প্রতি সর্বদা সন্তুষ্ট থাক ইহাই আমার আরাধনা। আমার বল-ভরসা একমাত্র তুমিই, তুমি ভিন্ন আমার কোন সম্বল নাই; আমার শক্তি-সামর্থ্য সব কিছু তোমার উপর নির্ভর করে। (বেদায়া ৩–১৩৬)

বাগানের মালিক ওতবা ও শায়বা কাফের, ইসলাম ও নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরম শত্রু ছিল, এমনকি শেষ পর্যন্ত তাহারা কাফের থাকিয়া বদর রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বাগানে উপস্থিত নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রক্ত-ঝরা দেহের এমনই মর্মান্তিক দৃশ্য ছিল যে, তাহা দেখিলে পরম শত্রু চরম নিষ্ঠুর না হইলে নিশ্চয় তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের করুণ অবস্থাদৃষ্টে ওতবা ও শায়বার ন্যায় পরম শত্রুর অন্তরেও দয়ার সৃষ্টি হইল। তাহাদের বাগানের মালী ছিল এক খৃষ্টান "আদ্দাস রুমী"; তাহারা মালীকে বলিল, গাছের এক ছড়া আঙ্গুর পাত্রে করিয়া ঐ লোকটিকে দিয়া আস; তাঁহাকে তাহা খাইতে বলিবা। আদ্দাস হযরতের সম্মুখে আঙ্গুরের ছড়া রাখিয়া দিল। হযরত (সঃ) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলিয়া তাহা হইতে গ্রহণ করা আরম্ভ করিলেন।

আদ্দাস উক্ত বাক্য শ্রবণে হযরতের নূরানী চেহারার প্রতি তাকাইল এবং বলিল, এইরূপ বাক্য ত এই দেশের লোকের মুখে কখনও শুনা যায় না। হযরত (সঃ) তাহার ধর্ম ও দেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, আমি ঈসায়ী ধর্মের, আমার দেশ হইল (ইরাকস্থিত "মাসুল" এলাকায়) "নীনওয়া" অঞ্চলে। হযরত (সঃ) বলিলেন, তাহা ত এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-এর দেশ। হযরতের এই উক্তিতে আদ্দাস আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তাহা জানেন কিরূপে? হযরত (সঃ) বলিলেন, তিনি আমার সমশ্রেণীর ভ্রাতা- তিনি আমার মতই এক জন নবী ছিলেন। এত শ্রবণে আদ্দাস হযরতের হাত, পা, মাথা চুম্বন করত ইসলাম গ্রহণ করিলেন।*

এইরূপ অসহনীয় কষ্ট যাতনার ভিতর দিয়া হযরত (সঃ) শুধু তায়েফ নগরীতে দশ দিন এবং আশে-পাশে আরও কয়েক দিন ইসলাম প্রচারের কাজ চালাইলেন। এই সফরে তাঁহার সর্বমোট এক মাস ব্যয় হয়, কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়া তায়েফে সফর করিয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্য হাসিল হইল না- তায়েফবাসী বনু সাকীফ গোত্র ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিল না।

তায়েফবাসীরা হযরতের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে; অত্যাচারী জালেমদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ ও বদ দোয়া এবং ধ্বংস কামনা করিবার তাই বোধ হয় প্রকৃষ্ট সময় ছিল। কিন্তু হযরত (সঃ) তাহাদের প্রতি বদ দোয়া করেন নাই; কি বলিষ্ঠ ছিল বিশ্ব নবীর বিশ্ব প্রেম! কি প্রাণঢালা মমতা ছিল মানুষের প্রতি! কত প্রশস্ত ছিল তাঁহার হৃদয়! এমনকি আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে ফেরেশতাগণ আসিয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়াছে; হযরত (সঃ) তাঁহাদিগকে অনুমতি দিলেই তাঁহারা সমস্ত তায়েফবাসীকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিবেন, কিন্তু দয়ার সাগর, ধৈর্যের পাহাড় রাহমাতুল্লিল আ'লামীন (সঃ) সেইরূপ অনুমতি মোটেই দেন নাই। বরং তাঁহাকে চিনে না বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ক্ষমার্হ গণ্য করার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে হেদায়েত দান করার জন্য দোয়া করিয়াছেন। তাঁহার আশা এত সুদূরপ্রসারী ছিল যে, এই উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন, যদিও বর্তমান তায়েফবাসী আমার প্রতি ঈমান আনিল না, আমাকে আঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিল, কিন্তু তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের ঔরষের সন্তান-সন্ততি হয়ত ঈমান আনিবে। এইসব বিষয় আল্লাহর দরবারে উল্লেখ করিয়া হযরত (সঃ) তাহাদিগকে আল্লাহর গজব হইতে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডে ১৫৯৪ নং হাদীছে স্বয়ং নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বক্তব্যে এইসব তথ্য বর্ণিত আছে।

সাধনার ফলে ধারণা বহির্ভূত আল্লাহর রহমত আসে

নবীজী মোস্তফা (সঃ) তায়েফ এলাকায় আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য কি সাধনাই না করিলেন! তায়েফবাসীকে আল্লাহর দ্বীন বুঝাইবার চেষ্টায় কত অত্যাচার নির্যাতনই না ভোগ করিলেন! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তায়েফে তাঁহার উদ্দেশ্যের সফলতা হইতে নিরাশ হইলেন এবং সফর সমাপ্তে ব্যর্থতার ব্যাথ্যা ও নিরাশার বিষণ্ণতা লইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তনে তায়েফ হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার এই সাধনা, এই নির্যাতন ভোগ কি একেবারে বিফল যাইবে? আল্লাহ তাআলা বলিলেন- إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নিষ্ঠাবান লোকদের প্রতিদান হইতে বঞ্চিত করেন না।"

---

* ১৯৬১ সনে পবিত্র হজ্জের সুযোগে আল্লাহ তাআলা এই নরাধমকে তায়েফ উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করিয়াছিলেন। বহু চেষ্টা ও কষ্ট করিয়া উক্ত বাগান স্থানেও পৌছার তওফীক হইয়াছিল। এখনও তথায় আঙ্গুর শফরি, আঞ্জির ইত্যাদি বিভিন্ন ফলফলাদীর সমাবেশে একটি উর্বর বাগান রহিয়াছে। বাগানের এক স্থানে ছোট একটি মসজিদ রহিয়াছে যাহা "মসজিদে আদ্দাস" নামে আখ্যায়িত। মনে হয় ঐ স্থানটিতেই হযরত (সঃ) বসিয়া ছিলেন এবং আদ্দাস আঙ্গুরের ছড়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। এখনও তথাকার বড় একটি রাস্তা "শারেয়ে আদ্দাস আদ্দাস রোড" নামে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নরাধমকে আল্লাহ তাআলা ঐ মোবারক মসজিদে দুই রাকাত নামায আদায় করার সুযোগ দান করিয়াছিলেন।

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ অনুরাগী হইবে আল্লাহ তাহার উদ্ধার লাভের পথ করিয়া দিবেন এবং তাহার রিযিক (সাফল্য) যোগাইবেন এমন জায়গা হইতে যেখানে হইতে রিযিক লাভের ধারণাও তাহার ছিল না।"

তায়েফের সাধনার ফল চেষ্টার সাফল্য নবীজী (সঃ) তায়েফে লাভ করিতে পারিলেন না। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র হইতে নবীজির ধারণা বহির্ভূত এক সাফল্য দান করিয়া তাঁহার ভাঙ্গা হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চারের আশাতীত ব্যবস্থা করিলেন।

নবীজী (সঃ) তায়েফ হইতে যাত্রা করিয়াছেন; তায়েফের লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করাইতে পারিলেন না– মনে তাঁহার কত ব্যথা কত নিরাশা! ইহারই মাঝে আনন্দ লাভের এক বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন আল্লাহ তাআলা। নবীজী মোস্তফা (সঃ) শুধু মানুষের নবী নহেন, তিনি জিনদেরও নবী। জিনদেরকে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করানোও তাঁহার দায়িত্ব।

তায়েফ হইতে ফেরার পথে মক্কা হইতে মাত্র এক দিনের পথ ব্যবধানে "নাখ্‌লা" নামক জায়গা; নবীজি (সঃ) তথায় রাত্রি যাপন করিলেন। গভীর রাত্রে নবীজি (সঃ) নামাযে দাঁড়াইয়াছেন; অন্ধকার রজনীতে প্রাণ ঢালা আবেগ মিশাইয়া মধুর সুরে তিনি মাবুদের কালাম পবিত্র কোরআন সশব্দে তেলাওয়াত করিয়া যাইতেছেন। জ্বিনদের সাত বা নয় সংখ্যক একটি দল ঐ পথে যাইতেছিল। তাহারা পবিত্র কোরআন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাত ঈমান গ্রহণ করিল এবং নবীজীর সঙ্গে তাহাদের আলাপও হইল। নবীজী (সঃ) তাহাদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ড ১৬১৯ নং হাদীছে এই জ্বিন দলেরই উল্লেখ রহিয়াছে। জ্বিনদের এই অপ্রত্যাশিত ঈমান গ্রহণের আলোচনা পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে–

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوا اَنْصِتُوْا ـ
فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ـ

অর্থ ঃ (আপনার প্রতি আমার বিশেষ রহমতের একটি ঘটনা–) যখন ধাবমান করিলাম আপনার দিকে জ্বিনদের একটি দল; তাহারা কোরআন শুনিল এবং নিকটে আসিয়া পরস্পর বলিল, চুপ করিয়া শোন। যখন (আপনার পড়া) শেষ হইল তখন তাহারা (ঈমান গ্রহণপূর্বক) নিজেদের জাতির প্রতি চলিয়া গেল; তাহাদের পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করিতে লাগিল। তাহারা দেশে যাইয়া বলিল, হে আমাদের জাতি! আমরা এক মহান কিতাবের পড়া শুনিয়া আসিয়াছি যাহা মূসা নবীর (আঃ) পর অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থনকারীই বটে। ঐ মহান কিতাব সত্যের প্রতি এবং (আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার) সঠিক পথের উজ্জ্বল দিশারী। হে আমার জাতি! সাড়া দাও আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে এবং তাঁহার প্রতি ঈমান গ্রহণ কর; পরওয়ারদেগার তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং কষ্টদায়ক আযাব হইতে তোমাদের বাঁচাইয়া রাখিবেন। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিবে না আল্লাহর আযাব সে কোন মতে ঠেকাইতে পারিবে না এবং আল্লাহ ভিন্ন তাহার কোন সাহায্যকারীও হইবে না।, ঐ শ্রেণীর লোক সুস্পষ্ট ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে। (পারা–২৬, রুকু–৪)

আল্লাহ তাআলার কি রহমত! তায়েফ বাসীদের হেদায়েতের জন্য নবীজী (সঃ) কত কষ্ট না করিলেন। তাহারা হেদায়েত গ্রহণ করিল না। আল্লাহ তাআলা নবীজীর সাধনা ও ধৈর্যের সুফল সাফল্য অন্যত্র হইতে দান করিলেন। সুদূর "নসীবীন" নামক এলাকার বাসিন্দা জ্বিনদের এই দলটিকে এই পথে নিয়া আসিলেন। কোন প্রকার চেষ্টা কষ্ট ব্যতিরেকে তাহাদিগকে মুসলমান দলভুক্ত পাওয়া গেল। তাহারা অনায়াসে ঈমান গ্রহণ

করিল এবং নিজেদের বিরাট সম্প্রদায়ে দ্বীন ইসলামের বড় কর্মী ও প্রচারকের দায়িত্ব পালন করিল। সাধনা ও ধৈর্যের ফল এইভাবেই লাভ হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ দীর্ঘ দিন পূর্বে নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম দিকে একদা নবীজী মোস্তফা (সঃ) দ্বীন ইসলামের প্রচার কার্যে আরবের প্রসিদ্ধ বাৎসরিক হাট "ওকায" মেলায় উপস্থিত হওয়ার জন্য এই পথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ও নবীজী (সঃ) সঙ্গীগণসহ এই "নাখ্‌লা" এলাকায় রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন এবং জামাত করিয়া প্রভাতী নামায পড়িয়াছিলেন। তখনও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল একদল জ্বিন তথায় উপস্থিত হইয়া পবিত্র কোরআন শ্রবণে মুসলমান হইয়াছিল। তাহাদের দ্বারাও জ্বিন সম্প্রদায়ে ইসলাম প্রচারের বিরাট কাজ সমাধা হইতেছিল। তাহাদের ঘটনা বর্ণনায়ও পবিত্র কোরআনের একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল– যাহা ২৯ পারায় "সূরা জ্বিন" নামে প্রসিদ্ধ। তৃতীয় খণ্ড ১৬১৭ নং হাদীছে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণিত আছে।

তায়েফ হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন

দীর্ঘ এক মাসের সফর শেষ করিয়া হযরত (সঃ) মক্কাপানে ফিরিলেন এবং মক্কা নগরীর হেরা পর্বত এলাকায় আসিয়া থামিলেন। মক্কা নগরীতে তখন হযরতের কোন বাহ্যিক সাহায্যকারী ছিল না, অথচ এখন ঐরূপ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। কারণ, মক্কার শত্রুদের জুলুম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া হযরত (সঃ) তায়েফ গিয়াছিলেন। তথা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। এখন স্বাভাবিকরূপেই মক্কার শত্রুগণ আরও অধিক জুলুম অত্যাচারে মাতিয়া উঠিবে। এমতাবস্থায় হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাহ্যিক আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা স্থাপনে নবীজী মোস্তফা (সঃ) অপেক্ষা অধিক দৃঢ় দুনিয়াতে কেহ হয় নাই, হইবেও না। মদীনায় হিজরত উপলক্ষে সওর পর্বত গুহায় লুকাইয়া থাকাবস্থায় প্রাণঘাতী শত্রুরা খুঁজিতে খুঁজিতে ঠিক ঐ গুহার কিনারার নিকট পৌঁছিল। গুহার ভিতর হইতে সঙ্গী আবু বকর (রাঃ) পর্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! শত্রুরা নিজেদের পায়ের দিকে তাকাইলেই আমাদের দেখিয়া ফেলিবে। এই ভয়াবহ সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তেও নবীজি মোস্তফা (সঃ) পূর্ণ অবিচল পর্বত অপেক্ষা অধিক অটল ছিলেন। তিনি ধীরস্থির, শান্ত ও গম্ভীর স্বরে আবু বকরকে সান্ত্বনা দানে বলিলেন– لا تحزن ان الله معنا "চিন্তা করিও না; আল্লাহ তাআলা আমাদের সঙ্গে আছেন।" এই শ্রেণীর ঘটনা ভূরি ভূরি রহিয়াছে।

কিন্তু নবীজি মোস্তফা (সঃ) ছিলেন আদর্শ মানব, অনুসরণীয় নমুনা। বিশ্ব মানবের জন্য করণীয় পন্থা নির্ধারক। মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার বিধান হইল– মানুষ তাহার সাধ্য সামর্থ্যানুযায়ী উসিলা বা অবলম্বন গ্রহণ করিবে; কার্যকারণ জগতে তাহার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দান লাভ হইবে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অবলম্বন গ্রহণ ব্যতিরেকে আল্লাহর নিকট তাঁহার দান চাওয়া হইলে তাহা বেআদবী গণ্য হয়।

আলোচ্য ঘটনায় মক্কায় প্রবেশ করিতে আল্লাহর উপর ভরসা স্থাপনে নবীজীর (সঃ) বিন্দুমাত্র সংশয় বা দূর্বলতা ছিল না! কিন্তু তিনি মানুষ হিসাবে মানুষের জন্য আদর্শ ও ইসলামের নীতি নির্ধারক ককর্মপন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি হেরা পর্বত এলাকায় থামিয়া আরবের রীতি অনুযায়ী কোন একজন শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সমাজগত আশ্রয় লাভ করার চেষ্টা করিলেন। কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের নিকট হযরত (সঃ) এই মর্মে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু সকলেই পাশ কাটিয়া গেল। অবশেষে মক্কার বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী– যিনি পূর্ব হইতেই হযরতের দরদী ছিলেন; হযরত (সঃ) এবং বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের বিরুদ্ধে অসহযোগিতা খণ্ডন করার ব্যাপারে এই মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী একজন অন্যতম প্রচেষ্টাকারী ছিলেন। আজও সেই মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী হযরত (সঃ)-কে আশ্রয় দানের সৌজন্য বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করিল। হযরত (সঃ) তাহার আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং তাহার বাড়ীতেই রাত্রি যাপন করিলেন।

সকাল বেলা আনুষ্ঠানিকরূপে আশ্রয় প্রদানের ঘোষণা জারির করার জন্য মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী তাহার সাত পুত্রসহ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হযরতকে লইয়া কা'বা ঘরের তওয়াফ করার জন্য উপস্থিত হইল এবং তাহাদের প্রহরার মধ্যে হযরতকে তওয়াফ করার অনুরোধ করিল। হযরত (সঃ) তওয়াফ করিতে লাগিলেন। মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী স্বীয় বাহনের উপর দাঁড়াইয়া ঘোষণা দিলেন–

يا معشر قريش انى قد اجرت محمدا فلا يهجه احد منكم -

অর্থ ঃ "হে কোরায়শগণ! তোমরা জানিয়া লও যে, আমি মুহাম্মদকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছি; খবরদার! তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন তাঁহাকে কোন প্রকার বিব্রত না করে। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১-২১২)

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উপকারীজনের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনে অভ্যস্ত ছিলেন। মোতয়ে'ম ইবনে আ'দীর এই উপকার হযরত (সঃ) সর্বদা স্মরণ রাখিয়াছেন, এমনকি বদরের যুদ্ধ-বন্দীগণকে ছাড়িয়া দেওয়া সম্পর্কে সকলের সুপারিশই হযরত (সঃ) প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আজ মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী জীবিত থাকিত তবে তাহার সুপারিশে আমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিতাম।"

১৬৯৮। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা-৫৭৩) عن جبير ابن مطعم رضى الله عنه انَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ اسَارٰى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمَ بْنُ عَدِىٍ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِىْ فِىْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى فَتَرَكْتُهُمْ لَهُ -

অর্থ ঃ মোতয়ে'ম ইবনে আ'দীর পুত্র ছাহাবী জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বদর জেহাদের যুদ্ধবন্দীগণ সম্পর্কে বলিয়াছেন, যদি আজ মোতয়েম ইবনে আ'দী জীবিত থাকিত এবং সে এই (বন্দী) অপদার্থগুলি সম্পর্কে আমার নিকট সুপারিশ করিত, তবে আমি তাহার খাতিরে এইগুলিকে (মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই) ছাড়িয়া দিতাম।

বিভিন্ন গোত্র ও এলাকায় ইসলাম প্রচারে নবীজীর (সঃ) তৎপরতা

"মন্ত্রে সাধন কিম্বা শরীর পাতন"

دست ازطلب ندارم تا كام من برايد

يا تن رسد بجانان يا جاں زتن برايد

"উদ্দেশ্যে সাফল্য লাভ না করিয়া ক্ষান্ত হইব না।
হয় উদ্দেশ্যে সফল হইব, না হয় জীবন বিলাইয়া দিব।"

এই সব প্রবাদ মানুষ মুখে বলে; নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই প্রবাদকে কার্যে পরিণত করিয়াছেন। মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছাইতে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আকৃষ্ট করিতে বিরামহীন সংগ্রাম সাধনা করিয়া চলিয়াছেন তিনি। দীর্ঘ দশ বৎসর সর্বপ্রকার আপদ বিপদ ঝড়ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়া ঐ সাধনা চালাইলেন স্বীয় জন্মভূমি মক্কায়। চরম অত্যাচার এবং চরম বাধাবিঘ্ন বিন্দুমাত্র দমাইতে পারিল না নবীজী (সঃ)-কে তাঁহার সংগ্রাম সাধনায়। কিন্তু আবু তালেব ও বিবি খাদীজার মৃত্যুর পর মক্কা এলাকায় আর ঐ কাজ চালাইবার কোন অবকাশই থাকিল না। তবুও নবীজী (সঃ) ক্ষান্ত হইলেন না নিজ দায়িত্ব কর্তব্য হইতে; ৭০/৮০ মাইল দুর্গম পথ পায়ে হাঁটিয়া কত কত গিরি-কান্তার পার হইয়া তিনি

তায়েফে পৌঁছিলেন। তথায় বিঘ্ন-বিপত্তির বিভীষিকা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইল, নিরাশার অন্ধকার ঘন হইতে ঘনতর হইয়া আসিল, সফলতার কোন আলোই দৃষ্টিগোচর হয় না। উদ্দেশ্যের সংগ্রামে কোন সম্বল নাই, আশ্রয় নাই, কিন্তু আছে তাঁহার অদম্য সাহস-উদ্যম এবং কর্তব্যের প্রতি একনিষ্ঠ লক্ষ্য দায়িত্ব পালনের আকুল আগ্রহ ও সুদৃঢ় স্পৃহা। তাই তিনি শত দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য বলিয়া বেশ কিছু দিন চেষ্টা-সাধনার মধ্যে তায়েফে অতিবাহিত করিলেন। শেষ পর্যন্ত তায়েফ হইতেও নবীজী (সঃ)-কে নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। এখনও কিন্তু তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্র শিথিলতা আসে নাই; এখনও তিনি স্বীয় কর্তব্য পালনে ও দায়িত্ব বহনে পর্বত অপেক্ষা অধিক অনড় অটল।

মানুষকে তাহার কর্মস্পৃহাই বিভিন্ন পথের খোঁজ এবং বিভিন্ন কৌশলের সন্ধান বাহির করিয়া দেয়। নবজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থা তাহাই ছিল। তিনি মক্কায় স্বীয় কৃতকার্যতার পথ রুদ্ধ দেখিয়া তায়েফে গেলেন; তায়েফ হইতে নিরাশরূপে প্রত্যাবর্তন করিয়া দ্বীন ইসলামের প্রচার অভিযানে আর এক সুযোগ উপস্থিত দেখিলেন এবং অবিলম্বে তাহার সদ্ব্যবহারে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

ইসলাম প্রচারে পূর্ব হইতেই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি বিশেষ প্রচেষ্টা ইহাও ছিল যে, বিভিন্ন এলাকা ও দেশ হইতে আগন্তুকদের সমাবেশস্থল বড় বড় বাৎসরিক হাট বা মেলায় বিশেষত হজ্জের মৌসুমে মিনায় যখন দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন গোত্রীয় লোকদের বিপুল সমাবেশ হইত তখন এক এক গোত্রের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আকর্ষণীয় উদাত্ত আহ্বানে তাহাদের চমকিত করিয়া তুলিতেন।

রবিয়া ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি দেখিয়াছি "জুল-মাজায" মেলায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লোকদের সমাবেশে এই আহ্বান জানাইতেছিলেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تُفْلِحُوْنَ ـ

"হে জনমণ্ডলী! তোমরা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" গ্রহণ কর; তোমাদের মঙ্গল হইবে।"

হজ্জ উপলক্ষে মিনায়ও নবী (সঃ) বিভিন্ন গোত্রের নিকট যাইয়া আহ্বান করিতেন–

يَا بَنِىْ فُلاَنٍ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ اٰمُرُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَاَنْ تَخْلَعُوْا مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِه مِنْ هٰذِهِ الْاَنْدَادِ وَاَنْ تُؤْمِنُوْا بِىْ وَتُصَدِّقُوْا بِىْ وَتَمْنَعُوْنِىْ حَتّٰى اُبَيِّنَ عَنِ اللّٰهِ مَا بَعَثَنِىْ بِهٖ ـ

অর্থ ঃ "হে অমুক গোত্রীয় লোকগণ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত রসূল। আমি তোমাদের এই কথাই বলি যে, তোমরা এক আল্লাহর উপাসনা কর, তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক করিও না। আর তোমরা ত্যাগ কর আল্লাহ ভিন্ন ঐ সব দেব-দেবী ঠাকুর-মূর্তি যেসবের পূজা তোমরা করিয়া থাক। আর তোমরা আমার প্রতি ঈমান আন, আমাকে বিশ্বাস কর এবং আমি আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম প্রচার করিতে পারি সেই জন্য তোমরা আমার রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা কর।" (বেদায়া, ৩–১৩৮)

কোন কোন সময় হযরতের অনুরোধ এইরূপ হইত–

لاَ اُكْرِهُ اَحَدًا مِّنْكُمْ عَلٰى شَىٍ بَلْ اُرِيْدُ اَنْ تَمْنَعُوْا مَن يُّؤْذِيْنِىْ حَتّٰى اُبَلِّغَ رِسَالاَتِ رَبِّىْ

অর্থ ঃ "আমি তোমাদের কাহারও উপর কোন বিষয়ে জবরদস্তি করিব না, আমি তোমাদের নিকট শুধু এতটুকুই চাই যে, তোমরা কাহাকেও আমার উপর জুলুম-অত্যাচার করিতে দিও না; আমি যেন আমার প্রভু পরওয়ারদেগারের প্রেরিত বিষয়সমূহকে তাঁহার বান্দাদের সম্মুখে প্রচার করিয়া যাইতে পারি।"

কোন কোন সময় হযরত (সঃ) এইরূপও বলিতেন–

هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِىْ اِلَى قَوْمِهِ فَاِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُوْنِىْ اَنْ اُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّىْ ـ

অর্থ ঃ "আছে কেহ? যে আমাকে তাহার দেশে-খেশে লাইয়া যায়, আমি তাহার আশ্রয়ে পরওয়ারদেগারের বাণী পৌঁছাইতে পারি; আমার জাতি কোরায়েশরা আমাকে আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের বাণী পৌঁছাইতে দেয় না।" (যোরকানী, ১-৩০৯)

এই হৃদয়গ্রাহী আহ্বান সকলেই এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিত যে, প্রত্যেক মানুষকে তাহার বংশধরগণই ভালরূপে জানিয়া থাকে। অর্থাৎ আপনার বংশধর কোরায়শ আপনাকে গ্রহণ করে নাই; আমরা গ্রহণ করিব কেন?

তায়েফ হইতে ব্যর্থ, ক্লান্ত এবং উৎপীড়িত অত্যাচারিত হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর মুহূর্তেই নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার উল্লিখিত প্রচেষ্টার একটি সোনালী সুযোগ সম্মুখে উপস্থিত পাইলেন। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারেই নবীজী (সঃ) তাঁহার সাধনায় সিদ্ধির দ্বারে পৌঁছিলেন, তাঁহার তের বৎসরের ও সবরে মেওয়া ফলার মৌসুম আসিল। ইসলামের উন্নতি, অগ্রগতি ও গৌরব লাভের কেন্দ্র সোনার মদীনায় ইসলামের ও নবীজীর (সঃ) আশ্রয় লাভের সুবর্ণ সুযোগের সূচনা হইল।

ইসলাম মদীনাপানে

মক্কায় ইসলামের আশ্রয় লাভ হইবে সেই আশা মোটেই থাকিল না, তাই নবীজি মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তায়েফে গেলেন। তায়েফের ভাগ্যেও এই মঙ্গল জুটিল না। নবীজী (সঃ) তায়েফ হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

নবুয়তের দশম বৎসর শওয়াল মাসের শেষ দিকে নিবীজী (সঃ) তায়েফপানে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং এই সফরে এক মাস সময় ব্যয় করিয়াছিলেন। সুতরাং নবীজী (সঃ) যিলকদ মাসের শেষ দিকে তায়েফ হইতে মক্কায় পৌঁছিয়াছিলেন। পরবর্তী মাসই হইল হজ্জের মাস- জিলহজ্জ মাস; এই মাসের ১০, ১১ এবং ১২ তারিখে হজ্জ উপলক্ষে মিনায় বহু লোকের সমাগম হইবে। দূর দূর এলাকা হইতে হজ্জের জন্য আগত অসংখ্য লোক জমায়েত হইবে এই মিনায়। নবীজি মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্বব্যহারে প্রস্তুত হইলেন পূর্ণ উদ্যমে। মক্কার পিশাচরাও বসিয়া নাই। তাহারাও নবীজির সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য, তাঁহার কুৎসা করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিল এবং লোকদের নিকট তাঁহাকে ভণ্ড, পাগল, জাদুকর, গণৎকার ইত্যাদি সাব্যস্ত করার অভিযানে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

হজ্জ উপলক্ষে মিনায় জনসমাগম হইল; কোরায়শ দুষ্ট-দুরাচাররা লোকদের ঘাটিতে ঘাটিতে আড্ডায় আড্ডায় যাইয়া নবীজী (সঃ)-এর কুৎসা করিতে লাগিল। পিশাচ আবু লাহাব ত নবীজী (সঃ)-এর পিছনে সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। এক জন প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করিয়াছেন- আমি আমার পিতার সঙ্গে হজ্জে গমন করিয়াছিলাম। আমরা মিনায় অবস্থান করিতেছি এমন সময় হযরত (সঃ) সেখানে আগমন করিলেন এবং বিভিন্ন গোত্রকে সম্বোধনপূর্বক বলিতে লাগিলেন- "তোমরা শুন, আল্লাহ আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তোমরা এক আল্লাহরই উপাসনা কর; তাঁহার সহিত শরীক সাব্যস্ত করিও না! দেব-দেবী ঠাকুর-প্রতিমার পূজা ছাড়িয়া দাও।" তখন হযরতের পিছনে পিছনে একজন টেরা মানুষ চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, সাবধান! হে লোকসকল! এই বেটা তোমাদেরকে নিজের নূতন ধর্ম এবং ভ্রষ্ট দলে ভিড়াইয়া লাত-ওজ্জা দেবীদের হইতে এবং তোমাদের মিত্র দল জ্বিনদের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে চায়। তোমরা তাহার কথা মানিও না, তাহার কথা শুনিও না। এই বেটা মিথ্যাবাদী, বিধর্মী।

ঘটনা বর্ণনাকারী বলিলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই পিছনে পিছনে ধাবমান লোকটি কে? তিনি বলিলেন, সে ঐ লোকটিরই পিতৃব্য আবু লাহাব। (বেদায়া- ১-১৩৮)

আবু জাহল আবু লাহাব গোষ্ঠী যাহারা হযরতের স্বজন বলিয়া পরিচিত, তাহাদের এহেন প্রচারে হযরতের পক্ষে ইসলামের প্রচারকার্য অধিকতর দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি এক মুহূর্তের জন্যও নিরুৎসাহ বা ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। এইভাবে অটল, সঙ্কল্প ও অটুট বিশ্বাস লইয়া যিনি কুর্তব্য পালনে অগ্রসর হইতে পারেন সত্যের সাধনা তাঁহারই সার্থক হইয়া থাকে এবং এইরূপ সত্যের সেবক সাধক জনই আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া বরিত হওয়ার যোগ্য পাত্র। এই ভূমিকায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নত ও আদর্শ এই প্রতীয়মান হয় যে, কর্তব্যের খাতিরেই কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে। ফলাফল মানুষের হাতে নহে, অতএব তাহার জন্য ব্যতিব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়া উচিত নহে। কর্তব্য পালন না করিলে আল্লাহর নিকট অপরাধী হইবে এই তাকিদে কর্তব্য করিয়া যাওয়াকেই বৃহত্তম সফলতা বিবেচনা করা চাই।

একদিকে কোরায়শ সর্দারগণ নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, জাদুকর ইত্যাদি বলিয়া লোক সম্মুখে অপদস্ত করার চেষ্টা চালাইতেছে, তাঁহার উপর ধূলা-বালু নিক্ষেপ করিতেছে, প্রস্তরাঘাতে তাঁহার সর্বশরীর জর্জরিত করিয়া ফেলিতেছে। অপর দিকে নবীজি মোস্তফা (সঃ) মুখে ঘোষণা দিতেছেন– "জোর নাই, জবরদস্তি নাই– আমার কথাগুলি যাহার পছন্দ হইবে সে গ্রহণ করিবে। আমি কাহারও উপর জবরদস্তি করিতে চাই না। আমি কেবল ইহাই চাই যে, আমার প্রভুর বাণীগুলি পৌঁছাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত যেন কেহ আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে না পারে– যাহার ফলে আমার কর্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।*

মৌখিক এই শান্তির ঘোষণা অপেক্ষা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চরিত্র মাহাত্মের ঘোষণা আরও অধিক উন্নত ও অমিয় ছিল যে, বিতণ্ডা নাই, হানাহানি নাই, বিতর্ক নাই, গালির পরিবর্তে গালি নাই, এমনকি অপবাদ ও মিথ্যা দোষারোপের প্রতিবাদ পর্যন্ত নাই। আছে শুধু একনিষ্ঠতার সহিত দায়িত্ব পালন, কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য পালন। আর আছে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিয়া যাওয়া।

মানুষ প্রতি পদক্ষেপে সফলতা দেখিয়া জনকণ্ঠের প্রশংসাধ্বনিতে আনন্দ পাইয়া পুলকিত ও উৎসাহিত এবং অধিক উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অগ্রগামী হইয়া পারে। কিন্তু এই উদ্যম উৎসাহ প্রদর্শনে বিশেষ বাহাদুরী নাই। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে দৃষ্টির প্রশস্ত আয়তনে সফলতার নামমাত্র নাই, প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদানের শব্দমাত্র নাই, আছে কেবল দূর দূর, ছিঃ ছিঃ, গালাগালি নিন্দা-মন্দ, মিথ্যারোপ ও দোষারোপ– এইরূপ ক্ষেত্রে কর্তব্য আঁকড়াইয়া থাকা, সত্যকে বলিষ্ঠ হস্তে ধরিয়া রাখা, সত্য প্রচারের অগ্রাভিযানে দৃঢ়পদ থাকা, উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রখর ও অটুট রাখা মাত্র মহত্ত্বের মহাপালোয়ান এবং আদর্শের মহাপুরুষ জনেরই কাজ। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেই মহত্ত্বের ও আদর্শের যেই পরিচয় তাঁহার আলোচ্য ভূমিকায় দিতেছিলেন তাহার তুলনা জগতে মিলিবে না।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই সাধনা, এই ধৈর্য কি সত্যই বিফল যাইতেছিল? কখনও নহে। নবীজী (সঃ) যে বিভিন্ন সম্মেলন-সমাবেশে এতদিন অবিশ্রান্তভাবে সত্য ধর্ম ও আল্লাহর বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইলেন, তাহাতে বিভিন্ন দেশের সমাগত হাজার হাজার মানুষ নবীজীর মুখ হইতে আল্লাহর মহিমা-গান শ্রবণ করিল, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ সম্বন্ধে অজানা তথ্যাবলী অবগত হইল, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং তাঁহার সৃষ্টির প্রতি নিজেদের কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে অশ্রুতপূর্ব উপদেশাবলী প্রাপ্ত হইল। নিজেদের স্বহস্ত নির্মিত দেবতা প্রতিমাগুলির অপদার্থতা ও অক্ষমতার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। মদ্যপান, যেনা-ব্যভিচার, অন্যায়-অত্যাচার ইত্যাদি মহাপাপসমূহের অনিষ্ট অবগত হইতে পারিল। এইসব সত্যের ঝঙ্কার কোন দিন কাহারও কর্ণ হইতে মর্মে নামিয়া আসিবে– এইরূপ কি হইবে না? নিশ্চয় হইবে এবং ইহাই চরম সাফল্য। নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার আলোচ্য ভূমিকায় এই সুন্নত ও আদর্শ কার্যত শিক্ষা দিয়াছিলেন। পরবর্তী সকল জীবনে তিনি ইহাই মৌখিক শিক্ষাদানে বলিয়াছেন–

لَأنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ -

অর্থ ঃ "তোমার চেষ্টা সাধনায় একটি মানুষেরও হেদায়েত লাভ হয়– ইহা তোমার জন্য দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের বস্তু।"

ইসলামের তবলীগ উদ্দেশে হযরত (সঃ) প্রতিটি লোক সমাবেশস্থলে উপস্থিত হইতেন এবং সত্যের ডাক ইসলামের আহ্বান প্রতি কানে কানে ও ঘরে ঘরে পৌঁছাইবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইয়া যাইতেন। এমনকি সেই যুগের "ওকায", "জুল-মাজায:, "মাজান্নাহ্" ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বাৎসরিক হাট বা মেলায়ও হযরত (সঃ) উপস্থিত হইতেন এবং লোকদিগকে সত্যের প্রতি– ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইতেন। বিশেষত দীর্ঘ তিন বৎসরকাল অসহযোগিতা ও বয়কটের সঙ্কট হইতে বাহির হইয়া এই দশম বৎসর ত হযরত (সঃ) রজব মাস হইতেই বিভিন্ন গোত্রের বস্তিসমূহে উপস্থিত হইয়া ঘরে ঘরে ইসলামের ডাক পৌঁছাইবার এক অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে হযরত (সঃ) ঐতিহাসিক তায়েফ সফর আশে-পাশের পনরটি গোত্রের বস্তিতে সফর করিয়াছিলেন!

(সীরাতুন নবী ১–১৯৩ এবং আসাহুস সীয়ার ১০৩)

সত্যের সাধনায় স্বর্গ ফলে, সবরে মেওয়া ফলে। অসংখ্য ঝিনুক কুড়ানো হয়– তাহার কোন একটার মধ্যে মতি মুক্তা হাতে পাওয়া যায়। নবীজি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এক দশকের সাধনা এবং ধৈর্যও এই পর্যায়ে উপনীত হইল। নিরাশার অন্ধকারের অন্তরালে, চরম ব্যর্থতার দূরপ্রান্ত হইতে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা একটা আশার আলো, সাফল্যের সূচনা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"মিনা" এলাকার সীমা সংলগ্নেই, একটি "আকাবা"* তথা গিরিপথ। হজ্জ মৌসুমে মিনা এলাকায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার ব্যতিব্যস্ততা ও ছুটাছুটিকালে ঐ আকাবার
নিকটবর্তী স্থানে ছয় বা আট জন লোককে দেখিতে পাইলেন। নবীজী (সঃ) তাহাদের নিকটে আসিলেন এবং পরিচয় জানিতে চাহিলেন; তাহারা মদীনাবাসী খায্‌রাজ গোত্রের বলিয়া পরিচয় দিল। হযরত (সঃ) তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলেন এবং পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন।

---

* "আকাবা" সাধারণত কোন বিশেষ স্থানের নাম নহে; পর্বতমালার ফাঁকে– ফাঁকে বাকে যে দুর্গম পথ থাকে তাহাকেই বলে "আকাবা"। মিনার পশ্চিম প্রান্তে ঐরূপ একটি পথ ছিল এবং ঐ পথে পর্বত বেষ্টনীর ভিতরে ঢুকিলেই মস্ত বড় ময়দান, যাহার চতুষ্পার্শ্ব উঁচু পাহাড় দ্বারা রূপে বেষ্টিত যে, ময়দানটি একটা মস্ত বড় গভীর পুকুরের ন্যায় দেখা যায়। উত্তর দিক হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার যে পার্বত্য পথটি ছিল, যাহাকে "আকাবা" বলা হয়, উক্ত পথটুকু ছাড়া ঐ ময়দানের চতুর্দিকে উঁচু পাহাড় ভিন্ন কোনরূপ ছিদ্রও ছিল না, সুতরাং ঐ ময়দানে হাজার হাজার লোক বসিয়া কোন গোপন কাজ করিলে বাহির হইতে আভাস পাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না।

মদীনায় ইসলামের প্রসার এবং তথায় বিশ্ব ইসলামের কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া এবং মদীনার আকাশে প্রিয় নবীর চন্দ্রোদয়ের ব্যাপারে উল্লিখিত আকাবার ময়দানটি ইতিহাসে আলোচনায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কারণ, ঐ স্থানে নবুয়তের দশম বৎসর আলোচ্য ঘটনায় মদীনার ছয় জন লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়া এই ইতিহাসের সূচনা করেন। পরবর্তী বৎসর ঐ স্থানেই বার জন মদীনাবাসী হজ্জ উপলক্ষে হযরতের সঙ্গে মিলিত হন এবং ইসলামের খেদমতে আত্মোৎসর্গ করার বায়আ'ত বা অঙ্গীকার করেন। তৃতীয় বৎসর এই সময়ে এই স্থানেই সত্তর জনের অধিক মদীনাবাসী হযরতের সঙ্গে মিলিত হন এবং বিস্তারিতভাবে ব্যাপকথন হইয়া বায়আ'ত অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া হযরত (সঃ) ব্যাপকভাবে মুসলমানগণকে মদীনায় হিজরত করার পরামর্শ দান করেন, শেষ পর্যন্ত স্বয়ং হযরত (সঃ)ও হিজরত করেন। বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে বর্ণিত হইবে।

এই সব ঘটনা উল্লিখিত ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যদ্দরুন মনে হয় পরবর্তীকালে মক্কায় তুরস্কের শাসন আমলে ঐ ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি মসজিদ নির্মিত হয় যাহা "মসজিদে-আকাবা" নামে প্রসিদ্ধ।

১৯৫০ সনের হজ্জ উপলক্ষে আমি নরাধমের উক্ত মসজিদে হাযির হওয়ার এবং নামায পড়িবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেই সময় উক্ত ময়দান ও এলাকটি সম্পূর্ণরূপে পুরাতন দৃশ্য বহন করিতেছিল যাহা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। পরবর্তীকালে উক্ত ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পর্বতমালা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া দিয়া মিনা হইতে মক্কায় মোটর-বাস যাতায়াতের প্রশস্ত পাকা রাস্তা তৈয়ার করিয়া দেওয়ায় মসজিদটি বড় রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়ান দেখা যায় এবং ঐতিহাসিক গুপ্ত ময়দানটির দক্ষিণ দিক সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া ঐ এলাকাটির দৃশ্যই অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। এমনকি ১৯৫৭ সনে আমি ঐ এলাকায় দাঁড়াইয়া সব কিছু যেন নূতন অনুভব করিতেছিলাম। বর্তমান দৃশ্যে ঐ এলাকার বিশেষ কোন গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নহে।

আল্লাহর কুদরত মদীনায় ইহুদী জাতির আধিক্য এবং তাহারা আসমানী কিতাবের জ্ঞানবাহক। তাহারা জানিত এবং বলিয়া থাকিত যে, এক জন সর্বশেষ পয়গম্বরের আবির্ভাব হইবে এবং তাঁহার আবির্ভাবকাল অতি নিকটবর্তী। এমনকি তাহার। ভেজাল তওরাত কিতাবের মর্মানুসারে অন্য জাতীয় লোকদিগকে তর্ক ও বিবাদস্থলে বলিয়া থাকিত যে, সেই নবীর আবির্ভাব হইলে পর তিনি আমাদের দলে যোগদান করিবেন এবং আমরা তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া তোমাদিগকে ধ্বংস করিব। এই ধরনের কথা মদীনাবাসী লোকগণ ইহুদীদের মুখে অনেক সময়ই শুনিয়া থাকিত। (যোরকানী, ১–৩১০)

আজ মদীনার লোকগণ হযরতের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া এবং তাঁহার কথাবার্তা ও কোরআন তেলাওয়াত শুনিয়া ইহুদীদের সেই কথা স্মরণে আসিল এবং পরস্পর বলিল, মনে হয় ইহুদীদের আলোচিত নবী ইনিই। অতএব আমরা এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়িব না; ইহুদীরা যেন আমাদের অগ্রগামী না হইয়া যায়। এই বলিয়া তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ছয় বা আট জন ছিলেন; সকলের নাম ও পরিচয় সীরাতের কিতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।*

এই ছয় বা আট জন লোক ইসলামকে তাহার আশ্রয়স্থল মদীনায় সর্বপ্রথম বহন করিয়া নিয়া আসেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বিশেষ বরকত লাভ উদ্দেশে নিম্নে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইল। বস্তুত তাঁহারা সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য বিশেষ উপকারী লোক ছিলেন। তাঁহাদের পরিচয় নির্ধারণে ঐতিহাসিকগণের কিছু মতভেদ আছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতানুসারে ছয়টি নাম হইল–

১। আস্‌আদ ইবনে যোরারা (রাঃ)– তিনি এই আকাবায় পর পর তিনটি সম্মেলনের প্রত্যেকটিতে উপস্থিত চিলেন। হিজরী প্রথম বৎসরই মদীনায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

২। আওফ ইবনে হারেস (রাঃ)– তিনি বদর জেহাদে শহীদ হইয়াছিলেন।

৩। রাফে ইবনে মালেক (রাঃ)– তিনি ওহুদ জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

৪। কোতবা ইবনে আমের (রাঃ)– তিনিও আকাবার তিন সম্মেলনে এবং বদরসহ অনেক জেহাদে উপস্থিত ছিলেন। খলীফা ওমর বা ওসমানের (রাঃ) আমলে মৃত্যু হয়।

৫। ওক্‌বা ইবনে আমের (রাঃ)-তিনি বদরসহ সমস্ত জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) আমলে ইয়ামামার জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)– তিনি বদর জেহাদ এবং আরও অনেক জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হাদীছ বর্ণনার প্রসিদ্ধ ছাহাবী জাবের (রাঃ) নহেন; ঐ জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহুর বয়স এই সময় খুবই কম ছিল।

আরও ছয় জনের নাম উল্লেখ করা হইল, যাঁহাদের নাম কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের কোন দুই জন হয়ত উপস্থিত ছিলেন।

---

* পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মদীনায় ইসলামের কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া তথা ইসলামের উন্নতির গোড়া পত্তনের ভিত্তিমূল ছিল এই আকাবার মধ্যে হযরতের সঙ্গে মদীনাবাসীদের গোপন সম্মেলন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই সম্মেলনকে "বায়আ'ত আকাবা" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকেন। "বায়আ'ত" অর্থ হাতে হাত দিয়া দৃঢ়তার সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। এই সম্মেলন পর পর তিন বৎসরে তিন বার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক তিন বৎসরের তিনটি সম্মেলনকে তিনটি "বায়আ'তে আকাবা" গণ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ মোহাদ্দেস এবং বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণের মতে আলোচ্য দশম বৎসরের তথা প্রথম সম্মেলনটিকে বায়আ'ত নামে আখ্যায়িত করা ঠিক নহে। কারণ, এই উপলক্ষে শুধু মদীনাবাসী ছয় বা আট জন ইসলাম গ্রহণই করিয়াছিলেন। কোন প্রকার অঙ্গীকার গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল না, যেরূপ পরবর্তী দুই বৎসর হইয়াছিল। এই সূত্রে "বায়আ'তে আকাবা" দুইটি গণ্য হইবে। (সীরাতে হলবিয়া ২–৮ ও আল বেদায় ওয়ান নেহায়া)

মদীনাবাসীদের সঙ্গে ঐ প্রথম মিলন এবং ছয় বা আট জনের ইসলাম গ্রহণ যে নবুয়তের দশম বৎসরে হইয়াছিল তাহা সীরাতুন নবী প্রথম খণ্ড ১৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

(১) বরা ইবনে মারুর (রাঃ)। (২) কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)। (৩) মোআয ইবনে আফরা (রাঃ)। (৪) ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)। (৫) যাকওয়ান ইবনে কায়স (রাঃ)। (৬) আবুল হাইসম ইবনে তায়্যেহান (রাঃ)।

নবীজী (সঃ) তাঁহাদের নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, আমার মাবুদের পয়গাম পৌঁছাইবার জন্য (তোমাদের দেশে) তোমরা আমার পৃষ্ঠপোষকতা করিবে? তাঁহারা বলিলেন, বোআস যুদ্ধ* গত বৎসরও আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল– এমতাবস্থায় আপনি আমাদের দেশে পদার্পণ করিলে আমরা আপনার পশ্চাতে একমত হইয়া একত্রিত হইতে পারিব না; (ফলে শক্তি অর্জন করা সম্ভব হইবে না)। অতএব এখন আমাদেরকে দেশে যাইতে দিন। হয়ত অচিরেই আল্লাহ আমাদের পরস্পরে

সম্পর্ক ভাল করিয়া দিবেন এবং আমরা সকলকে ইসলাম ঐরূপে বুঝাইব যেমন আপনি আমাদের বুঝাইয়াছেন। তখন আমরা আশা করিতে পারিব যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আপনার পশ্চাতে একত্র করিয়া দিবেন। যদি ঐরূপ হইয়া যায় এবং আমাদের সকলে একত্রিতভাবে একবাক্যে আপনার সঙ্গী অনুসারী হইয়া যায় তবে আপনার ন্যায় শক্তিশালী আর কেহ হইবে না। সুতরাং আগামী বৎসর পুনরায় আপনার সহিত মিলিত হওয়ার কথা থাকিল। এই বলিয়া তাঁহারা মদীনায় চলিয়া গেলেন।

(যোরকানী– ১–৩১২)

তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করত হযরত (সঃ)-কে বলিলেন, আপনি এখন বর্তমান অবস্থার উপর মক্কায়ই অবস্থান করুন। আমরা মদীনায় যাইয়া ইসলামের চর্চা করিব এবং তথাকার প্রধান গোত্রদ্বয়কে ইসলামের উপর একত্রিত করিবার চেষ্টা করিব, আগামী বৎসর এই সময়ে আপনার সঙ্গে পুনর্মিলনের ওয়াদা আমাদের রহিল। (সীরতে হলবিয়াহ, ১–৮)

এইরূপে সকলের অলক্ষ্যে ইসলামের জ্যোতি মদীনা নগরে প্রবেশ করিল। ইসলাম ও আল্লাহর বাণী মন ভরিয়া প্রচার করিবেন এইরূপ স্থানের তালাশেই নবীজীর দীর্ঘ সাধনা ও দীর্ঘ ত্যাগ; আজ সেই ত্যাগ ও সাধনার বৃক্ষে ফুল ফুটিয়াছে। নবীজী (সঃ) এখন ফলের প্রতীক্ষায় আশার সূত্রে দুলিতেছেন।

নবুয়তের একাদশ বৎসর– ঐতিহাসিক বায়আতে আকাবা * (পৃষ্ঠা ৫৫০)

উল্লিখিত ছয় বা আট জন যাঁহারা ইসলাম লাইয়া মদীনায় ফিরিলেন, বাস্তবিকই তাঁহাদের অন্তরে এক বিরাট জয্‌বা প্রেরণা ছিল মদীনার মধ্যে ইসলামকে ফুটাইয়া তোলার। তাঁহারা কার্যত প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণে মানুষের সাধনা শেষ হয় না; সাধনার সূত্রপাত হয় মাত্র। তাঁহারা সত্য সেবক ও খাঁটী প্রচারক হইয়া মদীনায় আসিলেন এবং মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলাম প্রচারে অবিশ্রান্ত চেষ্টা চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

তাঁহাদের চেষ্টা অনেকটা ফলপ্রসূ হইল; মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা আরম্ভ হইয়া গেল। কিছু কিছু লোক ইসলাম গ্রহণও করিলেন, এমনকি এই বৎসর হজ্জ উপলক্ষে নূতন পূরাতন মিলাইয়া বার জনের একটি প্রতিনিধি দল সেই পূর্ববর্ণিত

---

* মদীনায় ইহুদী জাতি প্রবল ছিল, আর প্রবল ছিল পৌত্তলিক দুইটি গোত্র– "আওস" এবং "খাযরজ"। দীর্ঘকাল হইতে এই দুইটি গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ চলিয়া আসিতেছিল। যদ্দরুন তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভীষণ বিরোধ বিরাজমান ছিল; এক পক্ষ কোন কাজে অগ্রসর হইলেও অপর পক্ষ বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইত।

* আমরা নবুয়তের বৎসর নির্ধারণে চান্দ্র বৎসরের সাধারণ সীমা তথা "মহরম" হইতে "যিলহজ্জ" পর্যন্তকেই গণ্য করিয়াছি। কোন কোন লেখক "রবিউল আউয়াল" হইতে "সফর" পর্যন্ত তাহার সীমা ধরিয়াছেন যেহেতু হযরতের জন্ম রবিউল আউয়ালে ছিল; এই সূত্রে অনেক বৎসরের সংখ্যা নির্ধারণে এক বৎসরের বেশ কম হইবে।

আ'কাবায় হযরতের সঙ্গে মিলিত হইলেন; তন্মধ্যে গত বৎসরের পাঁচ জন এবং অবশিষ্ট সাত জন এই বৎসরের নূতন ছিলেন। বারো জনের মোট দশ জন খায্‌রাজ গোত্রের আর দুই জন ছিলেন আওস গোত্রের। প্রথম বারের ছয় জন হইতে জাবের (রাঃ) ব্যতীত পাঁচ জন। অপর সাত জন এই-

(১) মোয়ায ইবনে আফরা (রাঃ)- তিনিসহ তাঁহার মা শরীক সাত ভাই বদর জেহাদে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ওহুদ জেহাদেও উপস্থিত ছিলেন।

(২) জাকওয়ান ইবনে কায়স (রাঃ)- তিনি ওহুদের জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

(৩) ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)- তিনি সব জেহাদে উপস্থিত ছিলেন।

(৪) আব্বাস ইবনে ওবাদা (রাঃ)- তিনি ওহোদের জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

(৫) এযীদ ইবনে সা'লাবা (রাঃ)-এই দশ জনই সকলই খায্‌রাজ গোত্রের ছিলেন। পরবর্তী দুই জন ছিলেন আওস গোত্রের।

(৬) আবুল হায়সাম ইবনে তায়্যেহান (রাঃ) তিনি বদর ও ওহুদসহ সব জেহাদেই অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

(৭) ওয়াইম ইবনে সায়েদা (রাঃ)- তিনিও বদর, ওহুদসহ সব জেহাদেই অংশগ্রহণকারী ছিলেন। (যোরকানী, ১-৩১৩)

এই বার আকাবায় যেই সাক্ষাৎকার হইল, প্রথমবার অপেক্ষা ইহাতে একটি বিশেষ কাজ হইল যাহা প্রথম বারের সাক্ষাৎকারে হইয়াছিল না। প্রথম বারের উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ ইসলাম গ্রহণপূর্বক শুধু আশ্বাস প্রদানেই মদীনায় চলিয়া গিয়াছিলেন, অঙ্গীকার গ্রহণপর্বের ব্যবস্থা হইয়াছিল না। এই বারের আগন্তুকবৃন্দ ইসলাম গ্রহণের পর নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্ত ধারণপূর্বক বিশেষ বিশেষ প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকারের উপর দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন- যাহাকে বায়আ'ত বলা হয়।

বায়আ'তে আকাবা (৫০৫)

"বায়আ'ত" আরবী শব্দ। আভিধানিক দৃষ্টিতে " بيع বাইউন" শব্দের অনুরূপ যাহার অর্থ বিক্রয় করা। বিক্রয় ক্ষেত্রে এক পক্ষ হইতে বিক্রয় অপর পক্ষ হইতে ক্রয় হয়। উভয়ের কার্যকে আরবীতে "মোবায়াআত বলা হয়; যাহার ক্রিয়াপদ বায়াআ' য়ুবাএউ'। পরিভাষায় "বায়আ'ত" বলা হয় কোন মহানের হস্ত ধারণ করিয়া বিশেষ প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকারের উপর দীক্ষা গ্রহণ করা। এই ক্ষেত্রেও দুই পক্ষ হস্ত ধারণকারী প্রতিজ্ঞাকারী, অপর পক্ষ যাহার হস্ত ধারণ করা হয় যাহার নিকট অঙ্গীকার করা হয়। এই ক্ষেত্রেও উভয়ের কার্যকে "মোবায়াআত" বলা হইবে, ক্রিয়াপদও ঐরূপই হইবে। ইসলামে যে বায়আত হয় সেই বায়আত কোন মহান মানুষের হস্তই ধারণ করা হয়। যেমন ছাহাবীগণ নবীজীর হস্ত ধারণ করিতেন এবং তদ্রূপ কোন পীর-বুজুর্গের হস্ত ধারণ করা হয়। কিন্তু ইসলামের বায়আতকে কঠোরতম সাব্যস্তকরণ উদ্দেশে পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, এই বায়আ'তে যদিও বাহ্যতঃ কোন মানুষের হস্ত ধারণ করা হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর হস্ত ধারণ গণ্য করিবে।

আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ـ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

অর্থঃ "নিশ্চয় যাহারা আপনার নিকট বায়আত করে বস্তুত তাহারা আল্লাহর নিকট বায়আত করে। তাহাদের হস্তের উপর বস্তুত আল্লাহর হস্ত রহিয়াছে। অতএব যে এই বায়আত ভঙ্গ করিবে সে নিজেরই সর্বনাশ করিবে। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি আল্লাহর সহিত কৃত প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকার পূর্ণকরিবে, আল্লাহ তাহাকে

অচিরেই অতি বড় পুরস্কার দান করিবেন। (পারা–২৬; রুকু–৯)

বায়আতের মূল অর্থ যেহেতু বিক্রয় করা এবং উভয় পক্ষের ক্রিয়া হইল মোবায়াআত যাহার মূল অর্থ ক্রয়-বিক্রয় অথবা আদান-প্রদান। সুতরাং পরিভাষার ক্ষেত্রেও ঐ মূল অর্থের তথা ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদানের তাৎপর্য লক্ষ্য করিতে হইবে। সেমতে ইসলামের বায়আত ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদানের বস্তুদ্বয় কি তাহা নির্ণয়ে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন মোমেনদের হইতে তাহাদের জান এবং মাল এই বিনিময়ে যে, তাহারা বেহেশত পাইবে। (বিক্রীত বস্তু তাহাদের জান ও মাল ক্রেতা আল্লাহ তাআলা সমীপে সমর্পণের ব্যবস্থা এই হইবে–) তাহারা (ঐ জান ও মাল ব্যয়ে) জেহাদ করিবে আল্লাহর পথে; পরিণামে সে আল্লাহর পথের শত্রুকে মারিবে (–নিজে বাঁচিয়া থাকিবে) বা শত্রুর হাতে মারিবে। (এই উভয় অবস্থায়ই তাহার পক্ষ হইতে বিক্রীত বস্তু জান ও মাল সমর্পণ সাব্যস্ত হইয়া যাইবে। এখন তাহারা প্রাপ্য হইল বিনিময় বা মূল্য– বেহেশত। সেই বেহেশত ইহজগতে দেয়ার নহে; পরজগতে দেওয়ার) অকাট্য ওয়াদা থাকিল। এই ওয়াদা-অঙ্গীকার তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআন সমস্ত আসমানী কিতাবেই বর্ণিত আছে। আল্লাহ অপেক্ষা অধিক অঙ্গীকার রক্ষাকারী আর কে আছে? (তোমাদের ক্ষণস্থায়ী জান-মাল বিক্রয়ে চিরস্থায়ী বেহেশত ক্রয়– ইহা কতই না লাভজনক!)। অতএব তোমরা আনন্দিত হও এই ব্যবসায়ে। আর জানিয়া রাখ (মুসলিম জীবনের) চরম সফলতা ইহাই। (পারা–১১; রুকু–৯)

ইসলামের বায়আত ততা ক্রয়-বিক্রয়ের সর্বদিক উক্ত আয়াতে এই নির্ধারিত হইল–

১। বিক্রীত বস্তু হইল মুসলমানের জান ও মাল।

২। মূল্য হইল বেহেশত।

৩। বিক্রীত বস্তু ক্রেতার নিকট সমর্পণের ব্যবস্থা হইল– মুসলমান কর্তক তাহার জান-মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করা।

৪। ক্রেতা হইলেন আল্লাহ তাআলা যিনি মূল্য প্রদান করিবেন; তিনি মূল্য তথা বেহেশত প্রস্তুত করিয়া আসমানী কিতাবসমূহে তাহা প্রদানের ওয়াদায় আবদ্ধ হইয়া আছেন।

৫। বিক্রেতা হইল মোমেন ব্যক্তি। সে বিক্রীত বস্তু তাঁহার জান ও মাল উল্লিখিত পদ্ধতিতে ক্রেতা সমীপে সমর্পণ করিবে– এই প্রস্তুতি ও প্রতিজ্ঞার দীক্ষা গ্রহণের নামই "বায়আত"।

ইসলামী বায়আতের মূল তাৎপর্য এবং তাহার মৌলিক বিষয় ইহাই। বায়আত ক্ষেত্রে উক্ত মৌলিক বিষয়টি মনে-প্রাণে, ধ্যানে-জ্ঞানে নির্ধারিত লক্ষ্যস্থিত ও উপস্থিত রাখিয়া সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় কোন কোন আনুষঙ্গিক বিষয়ের অঙ্গীকারও গৃহীত হয়। আলোচ্য বায়আতে আকাবায় নবীজি মোস্তফা (সঃ) কর্তৃক মদীনাবাসী নবদীক্ষিত মুসলমানগণ হইতে গৃহীত ঐ শ্রেণীর অঙ্গীকারগুলিও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। সেই গুলি ছিল নিম্নরূপ–

১। আমরা আল্লাহর সহিত তাঁহার উপাসনায়, তাহার গুণাবলীতে এবং তাঁহার আধিপত্য ও অধিকারে কোন অংশীদার বা শরীক সাব্যস্ত করিব না।

২। আমরা চুরি, ডাকাতি তথা কোন প্রকারে পরের স্বত্ব গ্রহণ করিব না।

৩। ব্যভিচার করিব না।

৪। সন্তান-নিধনের পন্থা অবলম্বন করিব না।

৫। (কাহারও প্রতি) মিথ্যা অপবাদ ও দোষারোপ করিব না।

৬। আমরা সৎকর্মে, ন্যায় কাজে আপনার অবাধ্য কখনও হইব না।

৭। শক্ত হউক বা নরম, কঠিন হউক বা সহজ, মনমত হউক বা মন বিরোধী– সর্ববিষয়ে এবং সর্বাবস্থায় আপনার পূর্ণ অনুগত বাধ্য থাকিব, আপনার আদেশে চলিব।

৮। নিজের স্বার্থ বিরোধী অন্যের স্বার্থমুখী আদেশ এবং পরিস্থিতিতেও আপনার পূর্ণ অনুগত বাধ্য থাকিব।

৯। ক্ষমতা ও পদের বেলায় যোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতায় অংশ নিব না।

১০। সর্বপ্রকার পরিস্থিতিতে সত্যের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিব। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে নিন্দা-মন্দ, বদনাম-অখ্যাতির কোন ভয় কখনও করিব না।

এই সব অঙ্গীকার প্রতিজ্ঞার দীক্ষা গ্রহণ সমাপ্তে নবী (সঃ) বলিলেন, এইসব প্রতিজ্ঞা পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া চলিলে তোমরা বেহেশতের অধিকারী হইবে, ত্রুটি করিলে (বেহেশত লাভের অধিকার থাকিবে না) আল্লাহ শাস্তিও দিতে পারেন, ক্ষমাও করিতে পারেন (যদি ক্ষমার ব্যবস্থা কর)। (যোরকানী, ১–৩১৪)

৬ নম্বর প্রতিজ্ঞা "নবীজীর অবাধ্য হইবে না" ইহাতে একটি শব্দ বলা হইয়াছে, فى معروف "সৎ কর্মে, ন্যায় কার্যে"। রসূল (সঃ) কি সৎ ও ন্যায়ের পরিপন্থী আদেশ করিবেন? তবুও ইহা বলা হইয়াছে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাধিকারী হওয়ার প্রথম দিনেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার সুন্নত ও আদর্শের কাঠামো এবং এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার আলো বিশ্বকে দেখাইলেন যে, শাসন এবং ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় লোকদেরকে বাধ্যগত অনুগত বানাইতে ক্ষমতার ব্যবহার, বল প্রয়োগ এবং জোর-জবরদস্তির পন্থা অবলম্বন করিবে না। সততার প্রতিষ্ঠা, ন্যায় অবলম্বন, সৎকর্ম ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা মানুষকে বশ্ করিতে এবং বাধ্য অনুগত বানাইতে চেষ্টা করিবে। ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার ছাড়া আমার আদেশ আমার কথা মানিতেই হইবে। হক-নাহক, সৎ-অসৎ যাচাই না করিয়া আমার অনুসরণ করিতেই হইবে– এইরূপ দম্ভ ঔদ্ধত্যের উক্তিও করিবে না, ভাবও দেখাইবে না, এই পন্থা অবলম্বন করিবে না।

বল প্রয়োগ এবং জোর-জবরদস্তি দ্বারা মানুষকে বশ করিলে, তাহাদের অধীনস্থ ও অনুগত বানাইলে সেই বশ্যতা এবং সেই আনুগত্য মোটেই টেকসই হয় না। পক্ষান্তরে সৎকর্ম, সততা বিস্তার এবং ন্যায় নিষ্ঠা দ্বারা অনুগত ও বশ করিতে পারিলে তাহা সুদীর্ঘ হয় এবং বস্তুত সেই ক্ষেত্রেই প্রকৃত আনুগত্য ও বশ্যতা হইয়া থাকে।

নবীজ মোস্তফা (সঃ)-এর ক্ষেত্রে অনুগত্য প্রকাশে "সৎকর্মে ও ন্যায় কার্যে" শর্ত আরোপের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সকলের জন্য সুন্নত আদর্শ স্থাপনকল্পে নবী (সঃ) নিজের বেলায়ও এই শর্ত আরোপ করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন এই শর্ত আরোপে নবীজী মোস্তফার (সঃ) দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের আভাসও পাওয়া যায় যে, ন্যায় ও সততার মাপকাঠিতে আমার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পরিমাপ করিয়া অনুসরণ করিতে চাহিলে নিশ্চয় তোমরা আমার অনুগত হইতে বাধ্য হইবে। কতখানি সততা, সাহস ও আত্মবিশ্বাস থাকিলে এইরূপ চ্যালেঞ্জ দেওয়া যায়, স্বীয় আদর্শ ও ন্যায়-নীতির উপর অটুট আত্মবিশ্বাস এবং নিঃস্বার্থ নিষ্কলঙ্ক অভ্রান্ত মতবাদের দৃঢ় প্রত্যয় না হইলে এই দাবী কখনও সহজ হইত না। নবীজী (সঃ) অতি সরল এবং দ্ব্যর্থ ও দ্বিধাহীনরূপে এই চ্যালেঞ্জ ও দাবীর সহিত লোকদের স্বীয় আনুগত্যের আহ্বান জানাইলেন। বস্তুত এই বাস্তব আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শক্তির এক বিশেষ উৎস ছিল। শক্তির এই উৎস হাসিলের শিক্ষাই বিশ্বকে প্রদান করিয়াছেন বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

এই শর্ত আরোপে নবীজী মোস্তফা (সঃ) আরও একটি জরুরী বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়াছেন, ক্ষমতাধিকারী লোকদের কর্তব্য– ক্ষমতাকে বাস্তব ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের অধীনস্থ রাখা। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দকে ক্ষমতার অধীনস্থ করাই চাই না। বর্তমান যুগে শাসন ব্যবস্থায় বহু লেকেঙ্কারি এই একটি আদর্শের অভাবেই জন্ম নেয়। এই যুগের ক্ষমতাধারী শাসকগোষ্ঠী ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দকে ক্ষমতার অধীনে রাখে। অর্থাৎ

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাহা ন্যায় ও ভাল বলিবেন তাহাই ন্যায় ও ভাল পরিগণিত হইবে; জনগণ তাহাকেই ন্যায় ও ভাল বলিতে বাধ্য থাকিবে। ইহার ফলে ভাল ও ন্যায়ের নামে শত শত অনাচার অবিচার চালু হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর সুন্নত ও আদর্শ হইল ক্ষমতাকে ভাল ও ন্যায়ের অধীন রাখিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা ভাল ও ন্যায় সাব্যস্ত হইবে, ক্ষমতাধারীরা একমাত্র তাহারই অনুসরণ করিবেন এবং জনগণ একমাত্র তাহাতেই তাহাদের আনুগত্যে বাধ্য থাকিবে। নবী (সঃ) বলিয়াছেন–

لاَ طَاعَةَ لِلْمَخْلُوْقِ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

অর্থ ঃ সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীতে সৃষ্টির আনুগত্য চলিবে না।"

আকাবার এই সম্মেলনও গোপনীয়তার মধ্যে হইল, দীক্ষা গ্রহণও ঐরূপেই হইল। সব কিছুই মক্কার শত্রুদের অবগতির অন্তরালে সমাপ্ত হইল এবং মদীনার লোকগণ স্বদেশে যাত্রা করিলেন। মদীনার এই সব লোক নবীজীর নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন– পবিত্র কোরআন পড়াইতে পারেন এবং ইসলাম শিক্ষা দিতে পারেন এমন একজন লোক আমাদিগকে প্রদান করিবেন। সেমতে নবী (সঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী মোসআ'ব ইবনে ওমায়র (রাঃ)-কে মদীনায় প্রেরণ করিলেন।

মদীনায় প্রথম মোহাজের

মোসআ'ব (রাঃ) সর্বপ্রথম স্বদেশ মক্কা হইতে মদীনায় পৌঁছিলেন। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ত্যাগী পুরুষ; দ্বীন ইসলামের জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। মোসআ'ব (রাঃ) ছিলেন মক্কার এক ভোগ-বিলাসপূর্ণ পরিবারের নয়নমণি। তাঁহার পিতার অগাধ ধন-দৌলত ছিল। কত জাঁকজমকপূর্ণ হইত তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ! কত মূল্যবান হইত তাঁহার পরিধেয়! কত আরামপ্রিয়

ছিলেন তিনি। ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি পিতার সব ধন-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছিলেন। এখন তিনি দীন-দরিদ্র কাঙ্গাল; শত শত টাকা মূল্যের জোড়ার পরিবর্তে এখন তাঁহার অঙ্গ-আবরণ আছে কেবল এক টুকরা ছেঁড়া কম্বল। তাহা পরিধানে তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইতেও সঙ্কোচিত হইতেন যে, সতর খুলিয়া যায় না কি। একদা নবী (সঃ) তাঁহাকে এই অসহায় অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার পূর্বেকার অবস্থা স্মরণে বর্তমান ত্যাগের দৃশ্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই করুণ দৃশ্য লইয়াই তিনি ইহজীবন হইতে বিদায় নিয়াছিলেন। ওহুদের জেহাদে তিনি শহীদ হইয়াছিলেন; তাঁহার কাফনের সম্বল একমাত্র ঐ ছেঁড়া কম্বল টুকরাই ছিল। তাহা এত ছোট ছিল যে, মাথার দিকে টানিয়া মাথা আবৃত করিলে পা বাহির হইয়া পড়িত, পা আবৃত করিলে মাথা বাহির হইয়া পড়িত। এতদ্দৃষ্টে নবী (সঃ) বলিয়াছিলেন, মাথা কম্বলে আবৃত কর, আর "এয্‌খের" ঘাস দ্বারা পা আবৃত করিয়া মোসআ'বকে সমাধিস্থ কর। নবী (সঃ) ঐ দৃশ্য দৃষ্টে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইসলামের পাকা ফল লাভের তথা ইসলামের উসিলায় উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। মোসআ'ব ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারের বিনিময় ও সুফল দুনিয়াতে বিন্দুমাত্রও ভোগ করিয়া যায় নাই; সবটুকুই আখেরাতের জন্য জমা রাখিয়া দুনিয়া হইতে বিদায় নিল। (তৃতীয় খণ্ড, ১৪৫৮ হাদীছ দ্রষ্টব্য)

মদীনায় ইসলামের প্রভাব

গত এক বৎসর হইতে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল। এই বৎসর নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্ত ধারণে দীক্ষা গ্রহণকারী বার জন ভক্ত-অনুরক্তের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় সারা মদীনাতে ইসলামের প্রচার প্রসার অনেক গুণ বাড়িয়া গেল। অধিকন্তু মোসআ'ব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আগমনে ত ইসলামের জন্য কর্ম তৎপরতা ব্যাপক আকার ধারণ করিল।

বিশেষতঃ মহাত্যাগী মোসআ'ব (রাঃ) এবং দীক্ষা গ্রহণকারী বার জন নিষ্ঠাবান ভক্তের চরিত্রের প্রভাব লোক চক্ষের অগোচরে ক্রমে ক্রমে মদীনাবাসীদের হৃদয়ে সুদৃঢ় স্থান করিয়া নিল এবং সমগ্র মদীনায় তাহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িল।

চরিত্র ও আদর্শের প্রভাব সর্বাধিক ব্যাপক ও শক্তিশালী হইয়া থাকে এবং এই প্রভাব আপনা আপনিই বিস্তার লাভ করে; বিস্তারিত করিতে হয় না। যেমন সূর্য যখন তাহার জ্যোতি আভা লইয়া আত্মপ্রকাশ করে তখন আপনা আপনিই তাহার কিরণমালা বিশ্ব চরাচরের সব কিছুর উপর পতিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী মহামতিগণের চরিত্র আদর্শের প্রভাবও বিস্তারিত করার প্রয়োজন রাখে না; আপনা আপনিই ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। মদীনায় মোসআ'ব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তথাকার দ্বাদশ মহানের চরিত্র ও আদর্শের প্রভাবে ইসলামের প্রভাব ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হইল।

মোসআ'ব (রাঃ) মদীনায় আসিয়া আস্‌আদ ইবনে যোরারা (রাঃ)-যিনি আকাবার প্রথম বৎসরের সাক্ষাতকারে উপস্থিত ছিলেন এবং দ্বিতীয় সম্মেলনেও অংশগ্রহণকারী ছিলেন, তাঁহার গৃহে অবস্থান করিলেন। মোসআ'ব (রাঃ) মদীনায় ইসলামের ও পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ব্যাপকভাবে চালাইলেন, এমনকি তিনি "মুক্‌রিল মদীনা" মদীনার শিক্ষক বা অধ্যাপক নামের খ্যাতি লাভ করিলেন। তিনি মদীনার মুসলমানগণের ইমামও ছিলেন, জামাতে নামায পড়াইয়া থাকিতেন। এই সময় মদীনায় মুসল্‌মানদের সাধারণ সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছিয়াছে। (যোরকানী– ৩১৫)

তখনও জুমার নামায ফরয হয় নাই। আসআদ (রাঃ) সপ্তাহে একদিন সকল মুসলমানকে একত্রিত হওয়ার এবং বিশেষভাবে এবাদত করার ব্যবস্থা করিলেন; তাহার জন্য তাঁহারা শুক্রবার দিন ধার্য করিয়া নিলেন। আসআদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইহা একটি বড় সৌভাগ্য যে, তিনিই সর্বপ্রথম শুক্রবার দিনে মুসলমানদের একত্রিত হওয়ার এবং বিশেষভাবে এবাদত-বন্দেগী করার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই নবী (সঃ) আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে ওহী মারফত শুক্রবার ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলেন। কিন্তু মক্কায় তাহা সম্ভব নয়; নবীজী (সঃ) মদীনায় মোসআ'ব (রাঃ)কে পত্রযোগে এই ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ পাঠাইলেন। বিশেষভাবে ইহাও লিখিলেন যে, দুপুর বেলায় সূর্য ঢলিবার পর সমবেতভাবে দুই রাকাত নামাযও পড়িবে। মোসআ'ব (রাঃ) মদীনায় মুসলমানদের ইমাম ছিলেন, তাই তিনিই সর্বপ্রথম জুমার নামাযের অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী। অতপর নবী (সঃ) হিজরত করিয়া মদীনায় পৌঁছিলে আনুষ্ঠানিকরূপে জুমার নামায ফরয হওয়ার নির্দেশ পবিত্র কোরআনের সূরা জুমার মধ্যে নাযিল হয়; তখন হইতে নবী (সঃ) ফরযরূপে জুমার নামাযের জমাত পরিচালনা করেন। (যোরকানী, ১–৩১৫)

গোটা একটি বংশের ইসলাম গ্রহণ

মদীনার দুইটি প্রসিদ্ধ বংশ বনু জফর ও বনু আবদিল আশহাল। একদা আসআদ (রাঃ) মোসআ'ব (রাঃ)-কে সঙ্গে করিয়া ঐ বংশদ্বয়ের মহল্লায় ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করার জন্য রওয়ানা হইলেন এবং এই মহল্লার নিকট গিয়া তাঁহারা উভয়ে একটি বাগানে বসিলেন। ইসলামে দীক্ষিত আরও কতিপয় লোক আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

আবদুল আশহাল গোত্রের দুইজন সর্দার ছিলেন– একজন সা'দ ইবনে মোআয, অপরজন ওসায়দ ইবনে হোযায়ের। তন্মধ্যে সা'দ ছিলেন আসআ'দ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খালাত ভাই। এই সর্দারদ্বয় সংবাদ পাইলেন যে, আসআদ (রাঃ) এবং মোসআ'ব (রাঃ)-সহ মুসলমানগণ অমুক বাগানে একত্রিত হইয়াছেন। এই সংবাদে মোআয ওসায়দকে বলিলেন, তাহারা আমাদের মহল্লায় আসিয়াছে; আমাদের কাঁচা ও দুর্বল লোকগুলিকে গোমরাহ করিয়া ফেলিবে। তুমি যাইয়া তাহাদিগকে খুব করিয়া ধমকাইয়া আস। আমার জন্য

একটু অসুবিধা যে, তাহাদের মধ্যে আসআ'দ আমার খালাত ভাই; তাই ধমকাইবার জন্য তাহার সম্মুখে আমার যাইতে মন চলে না। নতুবা আমিই যাইতাম।

সেমতে ওসায়দ একটি বর্শা হাতে লইয়া ঐ বাগানের দিকে যাইতে লাগিল। আসআ'দ (রাঃ) দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া নিজ সঙ্গী মোসআ'ব (রাঃ)-কে বলিলেন, ঐ যে লোকটি আসিতেছে সে নিজ গোষ্ঠি আব্দুল আশহাল গোত্রের একজন সর্দার; আপনার নিকট আসিতেছে, তাহাকে আল্লাহর দ্বীনের কথা পরিষ্কার ভাষায় বলিবেন, সত্য প্রকাশ করিতে কোন কিছুর খাতির করিবেন না। মোসআ'ব (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকটে বসিলে আমি নিশ্চয় বলিব এবং বুঝাইব।

ইতিমধ্যে ওসায়দ তাঁহাদের নিকট পৌছার সঙ্গে সঙ্গে উগ্রমূর্তি ধারণপূর্বক কঠোর ভাষায় গালাগালি করিয়া বলিল, তোমরা আমাদের সরল লোকগুলিকে বিভ্রান্ত করিতে কেন আসিয়াছ? যদি তোমাদের প্রাণের মায়া থাকে তবে দূর হইয়া যাও। বিকারগ্রস্ত রোগীর গালাগালিতে বুদ্ধিমান ডাক্তার রোগীর প্রতি রাগ না করিয়া দয়াপরবশই হইয়া থাকেন। সেমতে মোসআ'ব (রাঃ) ওসায়দকে মোলায়েমভাবে বলিলেন, শান্তভাবে একটু বসুন এবং আমার কিছু কথা শুনুন; পছন্দ হইলে তাহা গ্রহণ করিবেন, না হইলে এড়াইয়া যাইবেন। গরমের উত্তরে এরূপ নরম। ওসায়দের অন্তরে তাহা রেখাপাত করিল। তিনি বলিলেন, আপনি ত ন্যায় কথা বলিয়াছেন; এই বলিয়া ওসায়দ তাঁহার বর্শাটা মাটিতে গাড়িয়া দিলেন এবং তাঁহাদের নিকট বসিয়া পড়িলেন। মোসআ'ব (রাঃ) খুব সুন্দরভাবে ইসলামের মাহাত্ম্য তাঁহাকে বুঝাইলেন এবং কোরআন শরীফের কিছু অংশ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। ওসায়দ বলিলেন, তাহা ত অতীব সুন্দর, অতীব চমৎকার! তিনি আরও বলিলেন, আপনারা কাহাকেও আপনাদের ধর্মে দীক্ষিত করাকালে কি করিয়া থাকেন? এখন আসআদ (রাঃ) এবং মোসআ'ব (রাঃ) উভয়ে তাঁহাকে বলিলেন, গোসল করিয়া পাক-পবিত্র হইয়া আসুন, পাক পবিত্র কাপড় পরিধান করুন এবং সত্য ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা প্রদানপূর্বক নামায আদায় করুন। ওসায়দ তৎক্ষণাত সব কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া আসিলেন এবং সত্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। এখন তিনি ওসায়দ ইবনে হোযায়র রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। অতপর তিনি আসআদ (রাঃ) এবং মোসআ'ব (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার পিছনে আর একজন লোক আছেন "সা'দ", তিনিও যদি আপনাদের ধর্মে আসিয়া যান তবে আবদুল আশহাল গোত্রের ছোট বড় কেহই আপনাদের ধর্মমত হইতে বাহিরে থাকিবে না। আমি এখনই তাঁহাকে আপনাদের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। এই বলিয়া ওসায়দ (রাঃ) তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সা'দ ত ওসায়দকে পাঠাইয়া দিয়া অপেক্ষায় বসিয়াছিল; ওসায়দ (রাঃ) তাঁহার নিকটই আসিতেছেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখামাত্র সা'দ বলিয়া উঠিল, খোদার কসম ওসায়দ যেই অবস্থায় গিয়াছিল সেই অবস্থা হইতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। নিকটে আসিলে ওসায়দকে সা'দ জিজ্ঞাসা করিলে, তোমাকে যেই কাজে পাঠাইয়াছিলাম তাহার কি করিয়াছ? ওসায়দ (রাঃ) বলিলেন, তাহাদের উভয়ের সঙ্গে কথা বলিয়াছি; তাহাদের দ্বারা আমার কোন আশঙ্কা মনে হইল না, আমি তাহাদেরকে নিষেধও করিয়াছি এবং তাহারাও আমাকে বলিয়াছে– আপনি যাহা বলেন আমরা সেইরূপই করিব।

তবে একটি বিপদের সংবাদ এই পাইলাম যে, বনু হারেসা বংশের লোকজন বাহির হইয়া পড়িয়াছে আসআদকে হত্যা করিবার জন্য, যেহেতু তাহারা জানিতে পারিয়াছে, তিনি আপনার খালত ভাই। তাই তাহারা মনস্থ করিয়াছে তাঁহাকে হত্যা করিয়া আপনাকে অপদস্থ করিবে।

সা'দ এই সংবাদে ভীষণ উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাত ওসায়দের হাতের বর্শাটি লইয়া ছুটিয়া পড়িল যে, বনু হারেসা কোন অপকর্ম না করিয়া বসে। যাত্রাকালে ওসায়দকে তাহাও বলিল যে, মনে হয় তুমি কিছুই কর নাই। সা'দ ঐ বাগানে পৌছিল এবং দেখিল, আসআ'দ কোন প্রকারে শঙ্কিত ও ভীত মনে হয় না, তাই সা'দ ভাবিল যে, আসআদকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সংবাদটা সত্য নহে। এখন সা'দ মোসআ'ব (রাঃ) এবং আসআদ

(রাঃ)-কে কঠোর ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল। মোসআ'ব (রাঃ) পূর্বের ন্যায় অতি মোলায়েম ভাষায় সা'দকে ঐ কথাই বলিলেন যাহা ওসায়দকে বলিয়াছিলেন। ফলে ওসায়দের ন্যায় সা'দও নরম হইয়া পড়িলেন এবং মোসআ'ব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুখে ইসলামের ব্যাখ্যা ও পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত শুনিলেন। অতপর পাক-পবিত্র হইয়া আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন; এখন তিনি সা'দ ইবনে মোআয (রাঃ)।

ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওসায়দ (রাঃ)-সহ স্বীয় বংশ আশহাল গোত্রের লোকদের নিকট উপস্থিত হইলেন। আশহাল গোত্রীয় লোকদের সমাগম হইল। সা'দ (রাঃ) তাঁহার জাতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমাকে কিরূপ গণ্য কর? সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনি আমাদের সর্দার, অতি বিজ্ঞ বিচক্ষণ, ন্যায়নিষ্ঠ। তখন সা'দ (রাঃ) বলিলেন, শুনিয়া রাখ– তোমাদের নারী-পুরুষ কাহারও সহিত আমি কথাও বলিব না যাবত না, তোমরা এক আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ কর। সা'দ (রাঃ) এবং ওসায়দ (রাঃ) তাঁহারা উভয়ই আশহাল বংশের প্রধান; তাঁহাদের এই ঘোষণায় সূর্যাস্তের পূর্বেই ঐ বংশের নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিলেন, তাঁহাদের একটি প্রাণীও ইসলামের সুশীতল ছায়া বহির্ভূত থাকিল না।

"সত্যের গতি অপ্রতিহত", "সবরে মেওয়া ফলে", "আল্লাহর পথে যাঁহারা সাধনা করেন আল্লাহ তাঁহাদের সাধনায় সিদ্ধি দান করেন"। তায়েফে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অসীম সবর এবং অসাধারণ সাধনা ও ত্যাগ ছিল; আজ মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা, নবীজী মোস্তফার (সঃ) সাফল্য। মদীনায় এইরূপ পরিবার কমই ছিল, যেই পরিবারে ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল না।

মোসআ'ব (রাঃ) এবং আসআদ (রাঃ) গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনায় তাঁহাদের অন্তর ভরিয়া গেল, কর্মশক্তি উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। ইসলামের মহিমা চর্চায় সমগ্র মদীনা মুখরিত হইয়া উঠিল।

নবুয়তের দ্বাদশ বৎসর– আকাবায় বিশেষ সম্মেলন*

মদীনায় ইসলামের দ্বিতীয় বৎসর শেষ হইয়াছে, তৃতীয় বৎসর আগত। এই বৎসর মদীনায় ইসলামের বিস্তার পুরোদমে চলিয়াছে। মদীনার বিশিষ্ট দুইটি বংশ "আওস" ও "খাযরাজ" উভয় গোত্রেই ইসলাম প্রসার লাভ করিয়াছে; মদীনার ঘরে ঘরে প্রতিটি পরিবারে ইসলাম প্রবেশ করিয়াছে। এখন হইতেই মক্কার মজলুম অত্যাচারিত মুসলমানদের মধ্যে কাহারও কাহারও দৃষ্টি মদীনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আরম্ভ হইল। ঐ সময়ে অসহনীয় নির্যাতনে জর্জরিত হইয়া কোরায়শ বংশের বনু মাখযুম গোত্রীয় আবু সালামা (রাঃ) মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করেন। তাঁহার হিজরতের কাহিনী অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

আবু সালামা (রাঃ) প্রথমে স্ত্রীকে নিয়ে হাব্‌শা তথা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন। মক্কাবাসীরা মুসলমান হইয়া গিয়াছে এই ভুল সংবাদে যাঁহারা আবিসিনিয়া হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, আবু সালামা (রাঃ) তাঁহাদেরই একজন। প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মক্কায় অবস্থান করিলেন, কিন্তু দুরাচাররা তাঁহার প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার-নির্যাতন চালাইল। ইতিমধ্যে তিনি জানিতে পারিলেন, মদীনায় মুসলমান আছেন– তাঁহারা প্রবাসী মুসলমানকে সহোদররূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সংবাদে তিনি আবিসিনিয়ায় পুনঃ না যাইয়া মদীনায় যাওয়া সাব্যস্ত করিলেন। সে মতে তিনি শিশু পুত্র "সালামা" এবং স্ত্রী উম্মে সালামাসহ উটে চড়িয়া মদীনা পানে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যেই উম্মে সালামার গোষ্ঠীর লোক আসিয়া আবু

* নবীজী (সঃ)-এর মদীনায় প্রস্থানের শুভ সূচনা– আকাবার এই বিশেষ সম্মেলন নবুয়তের ১২শ সনের হজ্জ মৌসুমেই হইয়াছিল, ১৩শ সনে নহে। কারণ, নবীজী (সঃ)-এর মদীনায় হিজরত নবুয়তের ১৩শ সনের রবিউল আউয়াল মাসে ছিল বলিয়া নির্ধারিত। (বেদায়া ৩–১৭৭)

সুতরাং তাহার শুভ সূচনা এবং উক্ত সম্মেলন ১২ সনের হজ্জের মাস যিলহজ্জ মাসে হওয়া অবধারিত।

সালাম (রাঃ)-কে গালাগালি দিয়া বলিল, তোকে ত আমরা বারণ করিতে পারিলাম না, কিন্তু আমাদের মেয়েকে বিদেশে নিয়া যাইতে দিব কেন? এই বলিয়া তাহারা উটের লাগাম আবু সালামার হাত হইতে ছিনাইয়া নিয়া উম্মে সালামাকে বলপূর্বক লইয়া গেল। শিশু পুত্রটি উম্মে সালামার ক্রোড়ে ছিল, এমন সময় আবু সালামার গোষ্ঠীর লোকেরা আসিয়া দাবী করিল, আমাদের বংশের শিশু তোমাদেরকে নিয়া যাইতে দিব কেন? এই বলিয়া তাহারা শিশুটিকে মাতা উম্মে সালামার ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া নিজেদের মধ্যে নিয়া গেল। এখন পিতা, পুত্র ও মাতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

কী মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য! স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীকে জোর করিয়া ছিনাইয়া নেওয়া হইল- তাহার আর্তনাদ, মায়ের বুক হইতে শিশু পুত্রকে ছিনাইয়া লইয়াছে- তাহার ক্রন্দন। কিন্তু কোরায়শ নর পশুদের নিকট এই সবই তুচ্ছ; পাষণ্ডরা এই সমস্তের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করিল না। তাহাদের কর্ম তাহারা করিয়া নিজেদের গৃহে চলিয়া গেল; নির্মম অভিনয়। আবু সালামা (রাঃ) মুহূর্তের মধ্যে নিঃসঙ্গ হইয়া গেলেন; নির্বাক হতভম্ভ কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি ত "মুসলিম," আল্লাহতে আত্মসমর্পণকারী, ইসলামে আত্মোৎসর্গকারী; এই বীভৎস কাণ্ডও তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারিল না। মুসলিমের ইসলাম পরীক্ষার সম্মুখে উজ্জ্বল দৃঢ় ও দীপ্ত হইয়া উঠে; সেই মুহূর্তেই আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝে সত্যের তেজ এবং ত্যাগের সঙ্কল্প উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তাঁহার উটকে প্রিয় মদীনার দিকে ফিরাইয়া দিলেন। সব কিছু পিছনে ফেলিয়া তিনি চলিলেন ইসলামের আশ্রয় পানে। ইসলাম ও ঈমান রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে যথাসর্বস্ব ত্যাগ করত; দ্বীনের আশ্রয়স্থলে চলিয়া যাইবে- মুমিন ও মুসলিমের পরিচয় তাহাই। আবু সালামা (রাঃ) এই অগ্নি পরীক্ষায় খাঁটি মুসলিম হওয়ার পরিচয় দানে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইলেন।

এদিকে উম্মে সালামার যে দশা হইল তাহার বর্ণনায়ও বুক ফাটিয়া যায়। স্বামী পুত্রের বিচ্ছেদ-বেদনায় তিনি ভীষণ কাতর, লোকালয় হইতে দূরে যেস্থানে ঐ মর্মবিদারক ঘটনা ঘটিয়াছিল, প্রতিদিন সেই স্থানে যাইয়া তিনি উণ্মাদিনীর ন্যায় কাঁদিতেন, স্বামী-পুত্রের স্মরণে অশ্রু ধারায় শোকাতুর প্রাণ ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করিতেন। উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এই করুণ অবস্থার উপর প্রায় একটি বৎসর কাটিয়া গেল।

নিরাশার আঁধারে একমাত্র আল্লাহ তাআলার রহমতই আশার আলো। উম্মে সালামা (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন- আমার এই মর্মস্পর্শী অবস্থায় আমার এক আত্মীয়ের অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তাহার অনুরোধে আমার স্বজনগণ আমাকে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিতে এবং আবু সালামার আত্মীয়গণ শিশু পুত্রটিকে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইল। সব কিছুই ঠিক হইল, কিন্তু আমি মদীনার পথ চিনি না, পথের কোন সম্বল আমার নাই, আমার সঙ্গীও কেহ নাই। তবুও আমি শিশু পুত্রকে কোলে লইয়া উটের পিঠে আরোহণ করিলাম এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া মদীনাপানে পাড়ি জমাইলাম। একটি শোকাতুর মহিলা, কোলে আছে শিশু পুত্র; সঙ্গে পাথেয় নাই, সঙ্গী নাই, পথের পরিচয় নাই, একাকী চলিয়াছে মরুভূমির পথে। দেশের মায়া, আত্মীয়-স্বজনের মমতা বাধাদানে ব্যর্থ, পথের দুঃখ-কষ্ট এবং ভাবনাও তাঁহার নিকট তুচ্ছ। তাঁহার একমাত্র আবেগ- দ্বীন ঈমান রক্ষার জন্য স্বামী যেখানে গিয়াছেন তিনিও সেখানে পৌছিবেন।

আল্লাহ তাআলার ঘোষণা- "আমার পথে যে সাধনা করিবে আমি তাহাকে আমা পর্যন্ত পৌঁছাইবার পথ অতিক্রম করাইয়া দিব।" (কোরআন)। আল্লাহ তাআলার মহিমার কি শেষ আছে! উম্মে সালামা (রাঃ) বলিলেন- মক্কা হইতে মদীনার পথে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রমে "তানয়ীম" নামক জায়গায় পৌঁছিতেই মক্কার এক সহৃদয় ব্যক্তি ওসমান ইবনে তাল্‌হার সহিত সাক্ষাত হইল। তখনও তিনি মুসলমান হন নাই, তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু উমাইয়া তনয়া! কোথায় চলিয়াছ? আমি বলিলাম, মদীনায় স্বামীর নিকট। তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্গে কেহ নাই? আমি বলিলাম, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সঙ্গে আছেন, আর আছে এই শিশু। তিনি বলিলেন, তোমাকে এই

অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না; এই বলিয়া তিনি আমার উটের লাগাম ধরিলেন এবং উট চালাইয়া মদীনার পথে চলিলেন। তাঁহার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি জীবনে আমি দেখি নাই। পথে বিশ্রাম মঞ্জিলে পৌঁছিলেন তিনি আমার উটটি বসাইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেন এবং আমি সুন্দরভাবে অবতরণ করিয়া সারিলে তিনি উটটি কোন বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া দিতেন, উহার পিঠের বোঝা নামাইতেন, তারপর নিকটবর্তী কোন বৃক্ষ ছায়ায় আরাম করিতেন এবং যাত্রা করার সময় হইলে গদি ইত্যাদি উটটি বাঁধিয়া আমার নিকটে রাখিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেন। আমি সুস্থিরভাবে আরোহণ করিয়া সুন্দররূপে বসিলে পর তিনি উটের দড়ি ধরিয়া চালিতে থাকিতেন। (মক্কা মদীনার তিন শত মাইলের অধিক) দীর্ঘ পথ তিনি এইরূপ পবিত্রতা ও শৃঙ্খলার সহিত আমাকে পার করাইলেন। প্রাণপ্রিয় মদীনা দূর হইতে দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল। মদীনার 'কোবা' পল্লীতে স্বামী আবু সালামা (রাঃ) বাস করিতেন; তাহার নিকট পৌঁছিয়া ওসমান আমাকে বলিলেন, আপনার স্বামী এ স্থানে বাস করেন, আপনি তাঁহার সমীপে যাইয়া উপস্থিত হউন– আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। এইভাবে আমাকে স্বামীর আশ্রয়ে পৌঁছাইয়া ওসমান মক্কার পথ ধরিলেন। –(বেদায়া ৩– ১৬৯)

পুণ্যবান ও পুণ্যবতী

আবু সালামা (রাঃ) এবং উম্মে সালামা (রাঃ)– স্বামী-স্ত্রীর সাধনার এই চিত্র কতই না সুন্দর! দ্বীনের জন্য দুঃখ-কষ্ট সহনের এবং ত্যাগ স্বীকারের কি অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাহা। তাহার পরিণাম যে আরও কত সুন্দর হইবে সেই আভাস ইহজগতে উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নবীজী (সঃ) হিজরত করিয়া মদীনায় আসিবার দুই-তিন বৎসর পর পুণ্যবান স্বামী আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদীনায় ইন্তেকাল করেন। নবীজী (সঃ) তাঁহার সম্পর্কে সুসংবাদ দানে বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে ডান হস্তে আমল নামা পাইবার সৌভাগ্য সর্বপ্রথম লাভ করিবেন আবু সালামা (রাঃ)। (যোরকানী, ১–৩১৯)

সুন্দর সাধনার কী সুন্দর প্রতিদান! আল্লাহর পথে নির্যাতন ভোগে সর্বপ্রথম সপরিবার মোহাজের– দেশত্যাগী তিনি; তাই চির সাফল্যের প্রতীক ডান হস্তে আমল নামা লাভের চির সৌভাগ্য সর্বপ্রথম লাভ করিবেন তিনি।

আবু সালামা ও উম্মে সালামার দুঃখী জীবনের চরম ভালবাসার যে চিত্র উপরোল্লিখিত বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার কি তুলনা হয়। আবু সালামা (রাঃ) মৃত্যু মুহূর্তে স্বীয় প্রাণপ্রিয় পরিবারের জন্য একটি অতি মূল্যবান সওগাত রাখিয়া গেলেন– আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে দোয়া মোনাজাত করিয়া গেলেন–

اَللّٰهُمَّ اَخْلُفْ فِىْ اَهْلِىْ خَيْرًا مِّنِّىْ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমার স্থলে আমার পরিবারকে আমার অপেক্ষা উত্তমটি দান কর"।

উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছিলাম, যে মুসলমান তাঁহার কোন (ক্ষয়-ক্ষতির) বিপদে নিম্নে বর্ণিত দোয়া পড়িবে, আল্লাহ তাহাকে উত্তম ক্ষতিপূরণ দান করিবেন।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِىْ فَاْجُرْنِىْ فِيْهَا وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا ـ

অর্থ ঃ "আমরা সকলেই আল্লাহর এবং তাঁহার নিকট আমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। হে আল্লাহ! আমার বিপদের সওয়াব আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি; অতএব তুমি আমাকে বিপদের সওয়াব

দান কর এবং যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহা অপেক্ষা উত্তমটি আমাকে দান কর।" (মেশকাত শরীফ, ১৪১ পৃষ্ঠা-)

উম্মে সালামা (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী আবু সালামা (রাঃ) ইন্তেকাল করিলেন তখন সেই বিপদে এই দোয়া পাঠ করিতে আমার অন্তরে দ্বিধার সৃষ্টি হইল। আবু সালামা অপেক্ষা কোন্ মুসলমান উত্তম হইবে? রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের (হিজরত স্থানের) দিকে সপরিবারে সর্বপ্রথম হিজরতকারী ছিলেন তিনি। অবশ্য এই দ্বিধা সত্ত্বেও আমি এই দোয়া পাঠ করিলাম। ফলে আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমায় বদলরূপে দান করিলেন। (রসূলুল্লাহ (সঃ) উম্মে সালামা (রাঃ)-কে সহধর্মিনীরূপে গ্রহণ করিলেন)

মদীনার প্রতিনিধি দল

নবুয়তের দ্বাদশ বৎসর শেষে হজ্জ মৌসুম নিকটবর্তী হইয়াছে; মদীনার মুসলমানগণ পরামর্শে বসিলেন; তাঁহারা আলোচনা করিলেন- রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আল্লাহি অসাল্লামকে আর কত দিন এইভাবে ছাড়িয়া রাখা যায় যে, তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত এবং অবহেলিত অবস্থায় মক্কার পবর্তমালার আঁকেবাঁকে ঘুরিয়া বেড়াইবেন?

সাব্যস্ত এই হইল যে, নবীজী (সঃ)-কে মক্কা হইতে মদীনায় নিয়া আসা বাঞ্ছনীয়। সেমতে মদীনার মুসলমানদের মধ্যে বিরাট প্রাণচাঞ্চল্য এবং কর্মতৎপরতা আরম্ভ হইল। তাঁহারা এইবার নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে মদীনায় আগমনের অনুরোধ করিবেন। সুতরাং সব শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হজ্জযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এমনকি মদীনায় ইসলামী শিক্ষার জন্য নবীজী (সঃ) কর্তৃক প্রেরিত অধ্যাপক মোসআ'ব (রাঃ)ও এই উপলক্ষে মক্কায় আসিলেন। (বেদায়া ৩-১৫৮)

মোশরেক কাফেররাও হজ্জের উদ্দেশে মক্কায় যায়; মদীনা হইতে ঐ শ্রেণীর পাঁচ শত জনের তীর্থ যাত্রীর কাফেলা রওয়ানা হইল। মুসলমানদের দুই জন মহিলা হজ্জযাত্রীসহ মোট ৭৫ জনের দলও মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের ১১ জন আওস এবং অবশিষ্ট সবই খাযরাজ গোত্রীয়। তাঁহাদের মধ্যে ৩০ জনই ছিলেন যুবক শ্রেণীর, বাকীরা বয়স্ক মুরব্বী শ্রেণীর।

এই ৭৫ জন স্বর্গীয় মানুষের কত উল্লাস! কত উৎসাহ-উদ্দীপনা! তাঁহারা সুদূর মক্কা হইতে নিয়া আসিবেন আল্লাহর রসূলকে নিজেদের দেশে; সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন আল্লাহর নবীর; তাঁহার ছায়াতলে থাকিয়া ইসলামী পতাকা সমুন্নত করিবেন তাঁহারা। ইসলামের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের বরকতভরা নামসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইল-

১। ওসায়দ ইবনে হোযায়র (রাঃ) ২। সা'দ ইবনে খায়সামা (রাঃ) ৩। রেফাআ ইবনে আবদুল মোনজের (রাঃ) ৪। আবু হায়সম (রাঃ) ৫। যোহায়র ইবনে রাফে (রাঃ) ৬। সালামা ইবনে সুলামাহ (রাঃ) ৭। আবু বোরদাহ (রাঃ) ৮। নোহায়র ইবনে হায়সম (রাঃ) ৯। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) ১০। মাআ'ন ইবনে আদী (রাঃ) ১১। ওয়ায়েম ইবনে সায়েদা (রাঃ) (উক্ত ১১ জন আওস গোত্রীয়, অবশিষ্ট ৬২ জন পুরুষ খাযরাজ গোত্রীয়।) ১২। আসআদ ইবনে যোরারা (রাঃ) ১৩। সা'দ ইবনে রবী (রাঃ) (১৪) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) ১৫। রাফে ইবনে মালেক (র) ১৬। বারা ইবনে মা'রূর (রাঃ) ১৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর্ (রাঃ) ১৮। ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) ১৯। সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ) ২০। মোনযের ইবনে আম্র (রাঃ) ২১। আবু আইউব (রাঃ) ২২। মোআয ইবনে হারেস (রাঃ) ২৩। আওফ ইবনে আফরা (রাঃ) ২৪। মোআওয়ায ইবনে আফরা (রাঃ) ২৫। ওমরা ইবনে হযম (রাঃ) ২৬। সাহ্ল ইবনে আতীক (রাঃ) ২৭। আওস ইবনে সাবেত (রাঃ) ২৮। আবু তাল্হা (রাঃ) ২৯। কায়স ইবনে আবু ছা'ছা' (রাঃ) ৩০। আম্র ইবনে গাযিয়া (রাঃ) ৩১। খারেজা ইবনে যায়েদ (রাঃ) ৩২। বোশায়র ইবনে সা'দ (রাঃ) ৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ (রাঃ) ৩৪। খাল্লাদ ইবনে সোয়ায়েদ (রাঃ) ৩৫। ওক্বা ইবনে আম্র (রাঃ) ৩৬। যেয়াদ ইবনে

লবীদ (রাঃ) ৩৭। ফরওয়া ইবনে আম্‌র (রাঃ) ৩৮। খালেদ ইবনে কায়স (রাঃ) ৩৯। যাকওয়ান ইবনে আবদে কায়স (রাঃ) ৪০। আব্বাদ ইবনে কায়স (রাঃ) ৪১। হারেস ইবনে কায়স (রাঃ) ৪২। বিশ্‌র ইবনে বরা (রাঃ) ৪৩। সেনান ইবনে সায়ফী (রাঃ) ৪৪। তোফায়ল ইবনে নোমান (রাঃ) ৪৫। মা'কেল ইবনে মোনযের (রাঃ) ৪৬। এযীদ ইবনে মোনযের (রাঃ) ৪৭। মসউদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) ৪৮। যাহ্‌হাক ইবনে হারেসা (রাঃ) ৪৯। এযীদ ইবনে খেযাম (রাঃ) ৫০। যাব্বার ইবনে সখ্‌র (রাঃ) ৫১। তোফায়ল ইবনে মালেক (রাঃ) ৫২। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) ৫৩। সোলায়মান ইবনে আমের (রাঃ) ৫৪। কোতবা ইবনে আমের (রাঃ) ৫৫। আবদুল মোনযের– এযীদ ইবনে আমের (রাঃ) ৫৬। আবুল ইউসর কা'ব ইবনে আমর (রাঃ) ৫৭। সায়ফী ইবনে সাওআদ (রাঃ) ৫৮। সা'লাবা ইবনে গানামা (রাঃ) ৫৯। আম্‌র ইবনে গানামা (রাঃ) ৬০। আব্‌স ইবনে আমের (রাঃ) ৬১। খালেদ ইবনে আম্‌র (রাঃ) ৬২। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওনায়স (রাঃ) ৬৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ৬৪। মোআয ইবনে আম্‌র (রাঃ) ৬৫। সাবেত ইবনে জাযা' (রাঃ) ৬৬। ওমায়র ইবনে হারেস (রাঃ) ৬৭। খাদীজ ইবনে সালামা (রাঃ) ৬৮। মোআ'য ইবনে জাবাল (রাঃ) ৬৯। আব্বাস ইবনে ওবাদা (রাঃ) ৭০। আবু আবদুর রহমান এযীদ ইবনে সা'লাবা (রাঃ) ৭১। আমর ইবনে হারেস (রাঃ) ৭২। রেফাআ' ইবনে আম্‌র (রাঃ) ৭৩। ওকবা ইবনে ওয়াহব (রাঃ)। (বেদায়া ৩–১৬৭)

যেই দুই জন মহীয়সী মহিলা হজ্জ পালনে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও এই মহতী সম্মেলনে শামিল হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম– ৭৪। আসমা বিন্‌তে আম্‌র (রাঃ) ৭৫। উম্মে ওমারা– নাসীবা (রাঃ)।

শেষোক্ত মহিলা নাসীবা (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ একটি নাম। কাহারও মতে তিনি তাঁহার স্বামী যায়েদ ইবনে আসেম (রাঃ) এবং দুই পুত্র– হাবীব (রাঃ) ও আবদুল্লাহ (রাঃ)-সহ এই হজ্জে আসিয়াছিলেন এবং সম্মেলনে শামিল হইয়াছিলেন। (যোরকানী, ১–৩১৬)।

তিনি তাঁহার স্বামী ও পুত্রদ্বয় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে জেহাদেও উপস্থিত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার পুত্র হাবীব (রাঃ)-কে ভণ্ড নবী মোসায়লামা নিজ হাতে নির্মমভাবে শহীদ করিয়াছিল। খলীফা আবু বকরের (রাঃ) আমলে যখন ঐ ভণ্ড নবীকে নির্মূল করার জন্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ ইয়ামামার যুদ্ধ হয় তখন এই বীর মহিলা নাসীবা যুদ্ধ ময়দানে পৌঁছিয়াছিলেন এবং তাঁহার যোগ্য বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করিতে যাইয়া ভীষণভাবে আহত হইয়াছিলেন। তীর বর্শার বারটি আঘাত নিয়া তিনি তথা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। (বেদায়া, ৩–১৬৮)

কাফেলার একজন বিশিষ্ট সদস্য কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ); তিনি তাঁহাদের মনের আবেগ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন, মক্কায় পৌঁছিয়া আমরা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাত লাভের জন্য ব্যাগ্র হইয়া পড়িলাম। এমনকি আমি এবং আমার আর একজন সাথী বরা ইবনে মা'রূর (রাঃ) তিনি একজন সর্দার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন– আমরা দুই জন ভাবাবেগ সামলাইতে না পারিয়া নবীজীর (সঃ) সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আমরা কেহই তাঁহাকে চিনিতাম না। খোঁজ করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি পিতৃব্য আব্বাসের সহিত কা'বা শরীফের নিকটে আছেন। আমরা দ্রুত তথায় উপস্থিত হইলাম এবং সালাম করিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। নবীজী (সঃ) পিতৃব্যকে আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যবসা উপলক্ষে তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল, তাই তিনি বলিলেন, ইনি বরা ইবনে মা'রূর– মদীনার একজন সম্ভ্রান্ত সর্দার। আর আমার নামও বলিলেন, মালেক পুত্র কা'ব। আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না– নবীজী (সঃ) যে, আমার নাম শুনিয়া বলিয়াছিলেন, কা'ব– যিনি কবি! নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পিতৃব্য আব্বাস বলিয়াছিলেন, হাঁ।

কা'ব (রাঃ) আরও বলিয়াছেন, আমরা মদীনাবাসী মুসলমানগণ নবীজীর (সঃ) সঙ্গে সম্মেলনের বিষয় সতর্কতার সহিত গোপন রাখিতেছিলাম। এমনকি আমাদের মদীনা হইতে যেসব অমুসলিম হজ্জে আসিয়াছিল তাহাদের হইতেও গোপন রাখিতেছিলাম। তবে আম্‌র ইবনে হারাম নামক একজন বিশিষ্ট

গোষ্ঠীপতি অমুসলিম আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমি একদা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলাম এবং বলিলাম, আপনি আমাদের একজন বিশিষ্ট সমাজপতি এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আমাদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা; আপনার বর্তমান ধর্মমত পরিবর্তন করুন, যদ্দরুন আপনি সম্মুখ জীবনে নরকী হইবেন– এই বলিয়া, তাঁহাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলাম এবং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত সম্মেলনের কথাও বলিলাম। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং আমাদের সহিত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিলেন। এমনকি ঐ সম্মেলনে নির্বাচিত বার জন প্রধানের একজন তিনি হইলেন। (বেদায়া ৩–১৫৮)

মদীনা হইতে আগত মুসলমানগণ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে গোপন সূত্রে পূর্ববর্ণিত 'আকাবা' ১২ই যিলহজ্জ রাত্রে বিশেষ গোপনীয়তার সহিত সম্মেলন অনুষ্ঠান সাব্যস্ত করিলেন। সকলের এই লক্ষ্য যে, খুব সাবধান হইয়া কাজ করিতে হইবে, কেহ কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবে না, ডাকাডাকি করিবে না।

নির্ধারিত রাত্রের এক তৃতীয়াংশ কাটিয়া যাওয়ার পর যখন সাধারণভাবে লোকজন শুইয়া পড়িল, তখন মদীনাবাসী মুসলমানগণ এক-দুই জন করিয়া নীরবে নিস্তব্ধ আকাবায় পৌঁছিতে লাগিলেন। এইভাবে তাঁহারা সমবেত হইলেন, এখন অপেক্ষা শুধু নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের। ইতিমধ্যে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) তথায় পৌঁছিলেন, তাঁহার চাচা আব্বাস (তখন মুসলমান হন নাই) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার প্রতি হযরতের পূর্ণ আস্থা ছিল। তিনি মদীনাবাসীদের অভিপ্রায় জ্ঞাত ছিলেন। তাই ভ্রাতুষ্পুত্র নবীজীর রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কীয় কথাবার্তা ও ব্যবস্থাদি সরাসরি অবহিত হইয়া আশ্বস্ত হওয়ার জন্য তিনি উপস্থিত থাকিলেন।

আবু বকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)– এই দুই জনকে দুইটি পথে দাঁড় করাইয়া রাখা হইল শত্রুদের গমনাগমন লক্ষ্য রাখার জন্য; এইভাবে বিশেষ গোপনীয়তার সহিত সম্মেলন আরম্ভ হইল। সর্বপ্রথম হযরত (সঃ) সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করুন, কিন্তু সংক্ষেপ করিতে হইবে, কারণ মোশরেকদের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তির আশঙ্কা আছে। অতপর প্রথমে আব্বাস দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, হে খাযরাজ বংশীয় ভাইগণ। মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের মধ্যে যে মর্যাদার লোক তাহা আপনারা অবগত আছেন। আমরা তাঁহাকে শত্রুদের হইতে হেফাযত করিয়া রাখিয়াছি, তিনি স্বীয় (বনী হাশেম) বংশীয় লোকদের মধ্যে মর্যাদা ও হেফাযতের সহিতই রহিয়াছেন। তিনি আপনাদের নিকট চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যে ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করিতেছেন না।

এখন যদি আপনারা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় তাঁহাকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সমর্থন দান করেন তবে আপনারা এই গুরুভার বহনে অগ্রসর হউন। আর যদি একটুও আশঙ্কা থাকে যে, তিনি আপনাদের নিকট যাওয়ার পর আপনারা শত্রুর মোকাবিলায় তাঁহার সাহায্য-সমর্থন ছাড়িয়া দিবেন, তবে আপনারা সে পথ এখনই অবলম্বন করুন, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিন; তিনি নিজ দেশে আপনজনের মধ্যে মান-মর্যাদা ও হেফাযতের সহিতই থাকিবেন।

মদীনাবাসীগণ আব্বাসের ভাষণের উত্তরে বলিলেন, আপনার কথাগুলি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। অতপর তাঁহারা হযরত (সঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি বলুন– প্রভু-পরওয়ারদেগার সম্পর্কে যত দূর ইচ্ছা আমাদের ওয়াদা অঙ্গীকার গ্রহণ করুন, তারপর আপনার ব্যক্তিগত বিষয়েও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন এবং বলুন সেই সব ওয়াদা-অঙ্গীকার পালন করিয়া চলিলে আমাদের কি পুরস্কার লাভ হইবে তাহাও?

হযরত (সঃ) বলিলেন, প্রভু-পরওয়ারদেগার সম্পর্কে আপনাদের কর্তব্য এই যে, একমাত্র তাঁহারই বন্দেগী করিবেন এবং অন্য কোন কিছুকে তাঁহার সঙ্গী-সাথী বা সমকক্ষ শরীকতুল্য মর্যাদা দিবেন না। আর আমার এবং আমার জামাতের জন্য আপনাদের উপর এই কর্তব্য হইবে যে, আমাদিগকে আশ্রয়ের স্থান দিবেন, সাহায্য-সমর্থন দান করিবেন এবং যেইভাবে নিজেদের জান-মাল ও ইজ্জত-হুরমতের হেফাযত করিয়া

থাকেন, আমাদের হেফাযতও তদ্রূপ করিয়া যাইবেন। আপনাদের স্বজনকে কেহ আক্রমণ করিলে আপনারা যেমন তাহাদিগকে রক্ষা করার চেষ্টা করিয়া থাকেন, আমার এবং আপনাদের দেশে গমনকারী মুসলমানদিগকেও কেহ আক্রমণ করিলে আপনারা তাহা প্রতিরোধ করিবেন– সত্যের সহায়তা করিবেন। এইসব কর্তব্য পালন করিয়া চলিলে তাহার প্রতিদানে আপনারা বেহেশত লাভ করিবেন। মদীনাবাসীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উক্তির প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন। আনন্দ-উৎফুল্লতায় তাঁহাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার তরঙ্গ বহিয়া গেল।

ঐ মুহূর্তেই সর্বপ্রথম বরা ইবনে মা'রূর (রাঃ), কাহারও মতে সর্বপ্রথম পূর্ববর্ণিত আসআদ (রাঃ) তাঁহার পর বরা (রাঃ) তাঁহার পর ওসায়দ (রাঃ) পর পর নবীজীর হস্ত ধারণপূর্বক বায়আত গ্রহণ করিলেন যে, আমরা আপনাদের নিশ্চয় নিজ পরিবার-পরিজনের ন্যায় রক্ষা করার চেষ্টা করিব– যদিও আমাদের সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হয়। (যোরকানী, ১-৩১৭)

ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) মদীনাবাসী ছাহাবী, যিনি এই ঘটনায় উপস্থিতবর্গের অন্যতম ছিলেন, এই ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন–

انَّا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَالنَّفَقَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَلَى اَن نَّقُوْلَ فِى اللّٰهِ لاَ تَاْخُذُنَا فِيْهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَعَلَى اَنْ نَنْصُرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ مِمَّا نَمْنَعُ بِهِ اَنْفُسَنَا وَاَزْوَاجَنَا وَاَبْنَاءَنَا وَلَنَا الْجَنَّةُ . فَهٰذِهِ بَيْعَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِىْ بَايَعْنَاهُ عَلَيْهِ .

অর্থ ঃ "আমরা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাতে হাত দিয়া বায়আ'তের ওয়াদা অঙ্গীকার করিয়াছি যে, মনপূত ও অমনপূত– প্রত্যেক অবস্থায় দ্বীন-ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করিয়া যাইব। সচ্ছল ও অসচ্ছল প্রত্যেক অবস্থায়ই দ্বীন ইসলামের জন্য ব্যয় বহন করিব। ইসলামী আদর্শের প্রচার এবং ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও ব্যবস্থার প্রতিরোধ করিয়া যাইব। আল্লাহ অর্পিত দায়িত্ব পালনরূপে হক প্রকাশ ও প্রচার করিয়া যাইব– এই ব্যাপারে কাহারও কোন তিরস্কার ভর্ৎসনা বা বিরোধিতার পরোয়া করিব না। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদের দেশ ইয়াসরেব– মদীনায় তশরীফ আনয়ন করিলে আমরা তাঁহার হেফাযত করিয়া যাইব, যেভাবে আমরা নিজেদের জীবনের ও বিবি-বাচ্চাদের হেফাযত করিয়া থাকি। এই সব কর্তব্য পালনের প্রতিদানে আমরা বেহেশত লাভ করিব। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আমাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার এইরূপ ছিল।"

মদীনাকে ইসলামের একটি শক্তিশালী কেন্দ্ররূপে পাইবার আগ্রহই হযরতের (সঃ) অন্তরে বিশেষরূপে জাগিতেছিল, তাই তিনি মুসলিম জামাতকে সাহায্য-সমর্থন করিয়া যাওয়ার উপরই মদীনাবাসীগণ হইতে বিশেষভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন–

اُبَايِعُكُمْ عَلَى اَنْ تَمْنَعُوْنِىْ مِمَّا تَمْنَعُوْنَ بِهِ نِسَائَكُمْ وَاَبْنَائَكُمْ .

অর্থ ঃ "আমি আপনাদিগকে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিতেছি যে, আপনাদের নিজ নিজ পরিবার-পরিজনকে আপনারা যেইভাবে হেফাযত করিয়া থাকেন, আমার (আমার জামাতের) হেফাযতও তদ্রূপ করিবেন।"

উপস্থিত মদীনাবাসীগণ এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। আবুল হায়সম (রাঃ) নামক

একজন মদীনাবাসী দাঁড়াইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের এবং আমাদের দেশের বিশিষ্ট জাতি ইহুদীদের মধ্যে পরস্পর একটা সহাবস্থান ও সদ্ভাব বিরাজমান রহিয়াছে। এখন আপনার জন্য আমাদের মধ্যকার সেই সদ্ভাবের অবসান ঘটিবে। আপনার উন্নতি সাধিত হইলে পর আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া নিজ দেশে চলিয়া আসিবেন এরূপ সম্ভাবনা আছে কি? হযরত (সঃ) মুচকি হাসি দিয়া বলিলেন, না না, আমি আপনাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিব না, বরং আপনাদের ও আমার মধ্যে এমন দৃঢ় বন্ধন হইবে যে, আমার জান-প্রাণ আপনাদের জান-প্রাণের জন্য এবং আপনাদের জান-প্রাণ আমার জান-প্রাণের জন্য নিবেদিত থাকিবে। আমাদের উভয়ের দায়িত্ব ও সংগ্রাম এবং বন্ধুত্ব ও শত্রুতা এক হইবে। আমি আপনাদের এবং আপনারা আমার অঙ্গরূপে পরিণত হইবেন।

উপস্থিত কাফেলার আর একজন সদস্য আব্বাদ ইবনে ওবাদা (রাঃ) মদীনাবাসীগণকে আর একটি জরুরী কথা বলিলেন। সম্মেলনে সদস্যবর্গের সাত ভাগের প্রায় ছয় ভাগই ছিলেন খাযরাজ গোত্রের এবং বক্তার নিজ গোত্রও ছিল খাযরাজ, তাই তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

হে খাযরাজ বংশ! এই মহানের হস্ত ধারণপূর্বক যে প্রতিজ্ঞা তোমরা গ্রহণ করিতেছ তাহার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়াছ কি? সকলেই বলিলেন, নিশ্চয়। তবুও তিনি বলিলেন, তোমাদের এই প্রতিজ্ঞার অর্থ হইতেছে সাদা কাল সকল শ্রেণীর লোকদের লড়াই ক্রয় করা। সুতরাং যদি তোমাদের ধারণায় এইরূপ আশঙ্কা থাকে যে, সেই লড়াইয়ে তোমাদের ধন-সম্পত্তি ক্ষয় হইলে এবং তোমাদের বড় বড় লোক প্রাণ হারাইলে তোমরা নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে ছাড়িয়া দিবে, তবে এখনই তোমরা তাহা কর। অবশ্য তাহা করা দুনিয়া আখেরাতের ধ্বংস ও অপমান। আর যদি ধন-সম্পদের ক্ষতি এবং বড় বড় লোকদের প্রাণ যাওয়া সত্ত্বেও তোমাদের বর্তমান অঙ্গীকার পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করিয়া যাইবে বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প হও তবে নবীজী (সঃ)-কে দিলেজানে মজবুতরূপে ধর— তোমাদের ইহ-পরকালের সৌভাগ্য হইবেই।

এই উক্তির প্রতিউত্তরে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি দিয়া উঠিলেন— নিশ্চয় আমরা আমাদের মালের ক্ষতি ইত্যাদি বিপদের ঝুঁকি লইয়াই নবীজী (সঃ)-কে গ্রহণ বরণ করিতেছি। তাঁহারা আরও বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ বাস্তবায়িত করিলে আমাদের কি সুফল লাভ হইবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আপনারা বেহেশত লাভ করিবেন।

দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে এইসব কথাবার্তা হইয়াছে এবং তৎপরই বিপুল উৎসাহের সহিত মদীনাবাসীগণ দীক্ষা গ্রহণে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। (বেদায়া, ৩-১৬২)

আর একজন যুবক শ্রেণীর তেজস্বী সদস্য আসআদ (রাঃ); যিনি পূর্ববর্তী দুই বৎসরের আকাবা সম্মেলনের প্রত্যেকটিতে উপস্থিত ছিলেন এবং মদীনায় ইসলাম প্রচার প্রসারে তাঁহার অসীম দান ছিল। নবীজী (সঃ) প্রেরিত শিক্ষক মোসআ'ব (রাঃ)-কে তিনি নিজ বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহাকে লইয়া সমগ্র মদীনায় ইসলাম প্রচারের অভিযান চালাইতেন; সেই প্রচেষ্টায়ই গোটা আবদুল আশহাল বংশ এক দিনে সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই আসআদ (রাঃ)ও দীক্ষা গ্রহণ উপলক্ষে মদীনাবাসীগণকে ঐরূপ বিশেষভাবে সতর্ক করিলেন। তিনি নিজে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে ইয়াসরেব বাসীগণ! ধীরস্থিরভাবে ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করুন। আমরা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আল্লাহর রসূল বিশ্বাস করিয়াই এত দূর হইতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা খুব ভালরূপে জানি যে, তাঁহাকে মক্কা হইতে বাহির করিয়া নিয়া যাওয়া সমগ্র আরবের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার শামিল এবং আপনাদের বহু মূল্যবান প্রাণ বিনষ্টের আশঙ্কা এবং চতুর্দিক হইতে তরবারির কোপ পড়িবার ভয়। হয় আপনারা ঐক্যবদ্ধরূপে ঐসব বিপদে ধৈর্যধারণের জন্য প্রস্তুত হউন; তবে নবীজী (সঃ)-কে গ্রহণ বরণ করুন— দেশে লইয়া চলুন। আর যদি আপনারা নিজেদের মধ্যে ভয়-ভীতি অনুভব করেন তবে নবীজীকে তাঁহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিন এবং তাঁহার সমীপে নিজেদের অক্ষমতা

প্রকাশ করিয়া দিন; আল্লাহ তাআলাও আপনাদের অক্ষম ক্ষমার্হ গণ্য করিবেন।

আসআদের এই বক্তব্য শ্রবণে মদীনাবাসীগণ বলিয়া উঠিলেন, ক্ষান্ত হও হে আসআদ! আজ আমরা যেই দীক্ষা লইয়া যাইব কখনও তাহা ভঙ্গ করিব না, তাহা হইতে তিল পরিমাণ বিচ্যুত হইব না। এই বলিয়া সকলেই উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইয়া দীক্ষা গ্রহণে ধন্য হইলেন। (বেদায়া, ৩-১৫৯

বিগত বৎসর আকাবার দ্বিতীয় সাক্ষাতকারে ১২ জন প্রতিনিধি কর্তৃক যে দীক্ষা গ্রহণ ছিল তাহা ১০টি বিষয়ের উপর প্রতিজ্ঞা ছিল। এই বারের এই তৃতীয় সম্মেলনের দীক্ষা গ্রহণে মদীনাবাসী মুসলমানগণ বিশেষভাবে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা মদীনায় ইসলাম প্রচারে ব্রতী থাকিবেন, প্রবাসী মুসলমান ভ্রাতা-ভগ্নীদিগকে আপন সহোদরের ন্যায় গণ্য করিবেন এবং তাঁহাদের ও নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর সম্ভাব্য সকল প্রকার আক্রমণ প্রতিহতকরা-পূর্বক তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইবেন।

মদীনাবাসীগণের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনাকালে নবীজীর (সঃ) পার্শ্বে তাঁহার পিতৃব্য আব্বাস তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নবীজী (সঃ) বলিলেন, আপনাদের প্রতিজ্ঞা মঞ্জুর করিলাম, অনুমোদন ও স্বীকৃতি দান করিলাম। (বেদায়া, ২-২৬০)

এই সম্মেলন এবং এই প্রতিজ্ঞা ও দীক্ষাপর্ব জগতের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তওহীদ ও শেরেক, ইসলাম ও কুফর, সত্য ও মিথ্যা, পাপ ও পুণ্যের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান এবং ইসলাম ও সত্যের বিজয় সূচিত হইল এই দিনে। যদি এই দিন মদীনাবাসী মুসলমানগণ তাঁহাদের এই শৌর্য-বীর্য, সত্যের প্রতি তাঁহাদের এই অপরিসীম আগ্রহ, নবীজী (সঃ) এবং ইসলাম ও মুসলিম জাতির জন্য তাঁহারা এমন করিয়া যথাসর্বস্ব বিলাইয়া দেওয়ার এই প্রস্তুতি না দেখাইতেন এবং প্রতিশ্রুতি না দিতেন, তবে ইসলামের বিজয় অভিযান কেমন করিয়া কোন্ পথে অগ্রসর হইত তাহা বুঝা কঠিন ছিল। মদীনাবাসীগণের এই অবদান শুধু মুসলমান জাতির জন্যই নহে, সমগ্র মানবকুলের জন্য এক মহা সৌভাগ্য। জগতের বুকে কল্যাণ ও মুক্তির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, পাপ ও অনাচারের স্রোতে সমগ্র ধরণী ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। ধন্য পুণ্যবান মদীনাবাসীগণের দৃঢ় সঙ্কল্প পৃথিবীকে ঐ চরম অভিশাপ হইতে রক্ষার সূচনা করিল! তাই সেই যুগের মদীনাবাসী মুসলমানগণ বাস্তবিকই "আনসার"– সাহায্যকারী অর্থাৎ ইসলাম তথা কল্যাণ ও মঙ্গলে,র সত্য ও ন্যায়ের সাহায্যকারী আখ্যার যোগ্য পাত্র; পুণ্য ও মানবতার তাঁহারা সুযোগ্য মিত্র। তাঁহাদের ভূমিকাই তাঁহাদের এই নাম সার্থক করিয়া তুলিয়াছে, তাই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে মদীনাবাসী মুসলমানগণকে "আনসার" নামের আখ্যা দিয়াছেন।

১৬৯৯। হাদীছ ঃ (পৃষ্ঠা– ৫৩৩) حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ اَرَاَيْتَ اِسْمَ الْاَنْصَارِ كُنْتُمْ تُسَمُّوْنَ بِهٖ اَمْ سَمَّاكُمُ اللّٰهُ قَالَ بَلْ سَمَّانَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ -

অর্থ ঃ গায়লান ইবনে জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলুন ত– "আনসার" নামটি আপনারা নিজেরাই পরস্পর প্রয়োগ করিতেন, না আল্লাহ আপনাদের এই নামের আখ্যা দিয়াছেন? আনাছ (রাঃ) বলিলেন, বরং সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহই আমাদিগকে এই নামের আখ্যা দান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ আনাছ (রাঃ) ইঙ্গিত দিলেন যে, মদীনাবাসী মুসলমানদিগকে পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে "আনসার" নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যথা–

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّلَهُمْ جَنّٰتٍ -

অর্থ ঃ "মোহাজের ও আনসারগণের অগ্রগামীগণ এবং যাঁহারা তাঁহাদের অনুসারী হইয়াছেন পূর্ণ ও উত্তমরূপে, সকলের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহারাও আল্লাহর দানে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আর আল্লাহ তাঁহাদের জন্য বেহেশত তৈয়ার রাখিয়াছেন; তাঁহারা তাহার চিরনিবাসী হইবেন। তাহা অতি বড় সাফল্য।" (পারা-১০ রুকু-১)

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ ....

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ মেহেরবানী করিয়াছেন নবীর প্রতি এবং মোহাজের ও আনসারগণের প্রতি- যাঁহারা নবীর সঙ্গ অবলম্বন করিয়াছেন ভীষণ কঠিন সময়ে।" (পারা-১১, রুকু-৩)

সম্মেলন সমাপ্তে শেষে

সম্মেলনের সর্বদিক সমাপ্ত হইলে রসূলুল্লাহ (সঃ) সকলকে বলিলেন, সতর্কতার সহিত সকলে নিজ নিজ বাসস্থানে চলিয়া যান। একজন সদস্য আব্বাদ ইবনে ওবাদা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল! শপথ করিয়া বলি, আপনার আদেশ হইলে আমরা আগামীকল্যই মিনায় উপস্থিত সমস্ত লোকদের উপর তরবারির অভিযান চালাইয়া দিতে পারি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে এরূপ আদেশ দেন নাই; আপনারা শান্তভাবে বাসস্থানে প্রস্থান করুন। সেমতে সকলে বাসস্থানে পৌছিয়া নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়েন। (বেদায়া, ৩-৬৪)

দীক্ষা গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর হযরতের (সঃ) চাচা আব্বাস বলিলেন, তোমাদের এই দায়িত্ব ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ এবং অঙ্গীকার প্রদান আল্লাহর সম্মুখে, এই পবিত্র মাসে, এই পবিত্র শহরে হইতেছে- তোমাদের হাত আল্লাহর হাতে দিয়া অঙ্গীকার করিতেছ যে, নিশ্চয় নিশ্চয় তোমরা মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সাহায্য সহায়তায় সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে এবং তাঁহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে। মদীনাবাসীগণ সমবেত কণ্ঠে "হাঁ হাঁ" বলিয়া উঠিলেন। আব্বাস এই সব অঙ্গীকারের উপর মহান আল্লাহকে সাক্ষী বানাইলেন।

তারপর মদীনায় মুসলমানগণকে সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত করার উদ্দেশে হযরত (সঃ) তাঁহাদের বারটি শাখা গোত্রের জন্য উপস্থিত লোকগণ হইতে বার জন নেতা নির্বাচনের আদেশ করিলেন। সেমতে আওস বংশ হইতে তিন জন (১, ২, ৩ নং) এবং খাযরাজ বংশ হইতে নয় জন (১২ হইতে ২০ পর্যন্ত) ব্যক্তিবর্গকে নেতা নির্বাচন করা হইল। হযরত নবীজী (সঃ) তাঁহাদের উপর মদীনাবাসীদের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। নির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া নবীজী (সঃ) বলিলেন, (আমি আপনাদের দেশে না যাওয়া পর্যন্ত) যেরূপ আমার উপর দায়িত্ব থাকিবে আমার দেশের লোকদের, তদ্রূপ আপনাদের দেশের লোকদের দায়িত্ব থাকিবে আপনাদের উপর। আপনারা আমার প্রতিনিধি; যেরূপ মারইয়াম তনয় ঈসা নবীর প্রতিনিধি ছিলেন তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যবর্গ। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ গভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, হাঁ আমরা প্রস্তুত আছি। (বেদায়া- ৩-১৬২)

ভোর হইতেই কতিপয় কোরায়শ প্রধান মিনায় মদীনাবাসীদের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, হে খাযরাজ বংশ! এমন কিছু আভাস আমাদের গোচরে আসিয়াছে যে, আপনারা আমাদের (নবুয়তের দাবীদার) লোকটাকে আপনাদের দেশে নিয়া যাইতেছেন এবং আমাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার ন্যায় ঘৃণার বিষয় আমাদের নিকট আর নাই। মদীনায় মুসলমানগণ তাহার উত্তর দেওয়ার পূর্বেই মদীনা হইতে আগত অমুসলিম হজ্জযাত্রীরা শপথ করিয়া বলিয়া উঠিল, এইরূপ কোন কথা হয় নাই, কোন ঘটনাও ঘটে নাই। বস্তুতঃ তাহাদের শপথ সত্যই ছিল, কারণ ঐ অমুসলিমরা ত সম্মেলন এবং প্রতিজ্ঞা ও দীক্ষা সম্পর্কে কিছুই অবগত ছিল না। এই কথাবার্তাকালে মদীনাবাসী মুসলমানগণ পরস্পরের প্রতি তাকাইতে ছিলেন; তাঁহারা কিছুই বলেন নাই।

মদীনার কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেল। কোরায়শ দলপতিরা চলিয়া আসিল, কিন্তু তাহারা এই বিষয়ে খুব

খোঁজাখুঁজি করিল। অবশেষে তাহারা এই ধারণায় উপনীত হইল যে, ঐরূপ কথা সাব্যস্ত হইয়াছে। তাই কোরায়শ মদীনাবাসী মুসলমানদিগকে ধরিবার জন্য তাঁহাদের পিছনে ধাওয়া করিল। কাফেলা তাহাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বার প্রধানের দুই প্রধান– সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ) এবং মোনযের ইবনে আমর (রাঃ) পিছনে ছিলেন। মক্কার কাফেররা তাঁহাদের দুই জনকে নাগালে পাইল বটে, কিন্তু মোনযের (রাঃ)-কে কাবু করিয়া রাখিতে পারিল না। শেষ পর্যন্ত তাহারা সা'দ (রাঃ)-কে বন্দী করিয়া নিয়া আসিল এবং তাঁহার উপর অত্যাচার চালাইল।

মক্কাতে দুই চারি জন মহামতি মানুষ ছিল; যেমন মোতয়েম ইবনে আদী– নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি যাহার অবদান ছিল অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং তায়েফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আশ্রয়দানে। তদ্রূপ আবুল বোখতারী, তাহারও অবদান ছিল অসহযোগের বিরুদ্ধে। সা'দ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর মক্কার দুরাচারদের অত্যাচার দেখিয়া আবুল বোখতারীর মনে দয়া আসিল; সে সা'দ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, মক্কার কোন মানুষের সঙ্গে আপনার মৈত্রী নাই কি? সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আছে। তিনি মোতয়েম ইবনে আদী এবং হারেস ইবনে হরবের নাম উল্লেখ করিলেন। আবুল বোখতারী তৎক্ষণাত যাইয়া ঐ দুই ব্যক্তিকে সা'দের দুরবস্থার সংবাদ দিল। তাহারা বলিল, সত্যিই মদীনার খাযরাজ গোত্রের সা'দ আমাদের বিশিষ্ট মিত্র। বাণিজ্য সফরে মদীনা এলাকায় তিনি আমাদের আশ্রয় ও সাহায্য দিয়া থাকেন। এই বলিয়া তাহারা সা'দের নিকট দৌড়িয়া পৌঁছিল এবং তাঁহাকে দুর্বৃত্তদের কবল হইতে ছুটাইয়া মদীনায় পৌঁছিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিল। মদীনার মুসলমানদের সাহায্য পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি মদীনায় যাইয়া পৌঁছিলেন।

এই সম্মেলন হইতে মদীনাবাসী মুসলমানগণ প্রতিজ্ঞা লইয়া মদীনায় পৌঁছিলেন এবং নিজ নিজ কায়দা-কৌশলে প্রত্যেক ব্যক্তি ও শ্রেণী ইসলাম প্রচারে ব্যাপক আকারের তৎপরতায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তরুণরাও বেশ কাজ করিতে লাগিলেন; তাহারা কোন কোন ক্ষেত্রে তরুণসুলভ কূটকৌশলে বড় বড় সাফল্য লাভ করিতেন।

তরুণদের একটি মজার কাণ্ড

সম্মেলনের দীক্ষায় দীক্ষিত এক তরুণ মোআয ইবনে আমর (রাঃ)– তিনি বাড়ী আসিলেন; তাঁহার পিতা "আমর ইবনুল জমুহ" বৃদ্ধ, স্বীয় গোত্র প্রধান। ঐ সময় গোত্র প্রধানরা অনেকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত দেবমূর্তি রাখিত এবং তাহার গোত্রে উহার পূজা চলিত। মোআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা আম্র এখন মোশরেক, তাহার একটি কাঠের তৈয়ারী "মানাত" নামের মূর্তি আছে। পুত্র মোআয ইবনে আম্র (রাঃ) এবং তাঁহার এক তরুণ বন্ধু মোআয ইবনে জাবাল (রাঃ) রাত্রিবেলা গোপনে ঐ মূর্তিটাকে এক ময়লার খন্দকে ফেলিয়া আসিলেন। ভোর বেলা আম্র তাহার পূজনীয় মূর্তিটা না পাইয়া ভীষণ চটিয়া গেল। বহু খোঁজাখুঁজির পর ময়লার খন্দকে মূর্তিটা পাইয়া উঠাইয়া নিয়া আসিল এবং ধুইয়া-মুছিয়া আতর গোলাপ লাগাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল; আর প্রতিজ্ঞা করিল, এই অপকর্মকারীদের ধরিতে পারিলে ভীষণ শাস্তি দিব। পরবর্তী রাত্রেও ঐ ঘটনা; ভোর বেলা আম্র পুনরায় ঐ ময়লার খন্দক হইতে মূর্তিটা উদ্ধার করিয়া আনিল এবং ঐরূপে পুনঃস্থাপন করিল। কয়েক দিন এই ঘটনা ঘটিবার পর আম্র একদিন মূর্তিটাকে ময়লার খন্দক হইতে উদ্ধার করিয়া পুনঃস্থাপনকালে তাহার গলায় একটি তরবারি লটকাইয়া দিয়া বলিল, হে দেবতা! তোমার প্রতি এই দুর্ব্যবহার কে করে তাহার খোঁজ বাহির করিতে আমি অক্ষম। তোমাকে অস্ত্র দিয়া দিলাম; তুমি দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিও। এইবার অধিক মজার কাণ্ড– তরবারিখানা নিয়া গিয়াছে, আর কোথাও হইতে একটা মরা কুকুর আমদানী করিয়া দেবতাকে তাহার সহিত বাঁধিয়া সেই ময়লার খন্দকে ফেলিয়া রাখিয়াছে। আম্র আজও দেবতার খোঁজে বাহির হইয়া এবং সেই ময়লার খন্দকে অধিক দুরবস্থায় মরা কুকুরের সহিত জড়ানো অবস্থায় পাইয়াছে। এইবার আম্রের চৈতন্য হইল, এইবার আর দেবতাকে

উদ্ধার করিল না, বরং গোষ্ঠীর মুসলমানদের নিকট হইতে ইসলামের শিক্ষা জ্ঞাত হইয়া শেরক ও মূর্তিপূজার অসারতা বুঝিতে পারিল, তওহীদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিল এবং মনে-প্রাণে ইসলাম গ্রহণপূর্বক খাঁটি মুসলমান হইয়া গেল। এখন তিনি আম্‌র ইবনুল জমুহ (রাঃ)। এই ঘটনার উপদেশ ও শিক্ষা স্বয়ং আম্‌র (রাঃ) কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার একটি পংক্তি এই–

وَاللهِ لَوْ كُنْتَ اِلٰهًا لَمْ تَكُنْ # اَنْتَ وَكَلْبُ وَسْطَ بِئْرٍ فِىْ قَرَنْ

'খোদার কসম! হইতে যদি তুমি আমার প্রভু

খন্দকেতে কুকুর সাথে না থাকিতে কভু"। – (বেদায়া ৩–১৬৫)

এই সম্মেলনের পরই হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ব্যাপকভাবে মুসলমাগণকে মদীনায় হিজরত করার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। নিজেও হিজরতের প্রস্তুতি নিয়া আল্লাহর তরফ হইতে অনুমতির অপেক্ষায় রহিলেন। কারণ, নবীর পক্ষে আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট অনুমীত ব্যতিরেকে দেশত্যাগ করা অপরাধ গণ্য হয়, যাহার নমুনা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা ৪র্থ খণ্ডে ব্যক্ত হইয়াছে।

মদীনায় ইসলামের কেন্দ্র স্থাপন তথা ইসলামের উন্নতির সূচনায় আকাবা সম্মেলনের গুরুত্ব যে কত দূর ছিল তাহা বলা বাহুল্য। এই কারণেই দ্বীন দরদী ছাহাবীগণের অন্তরে আকাবা সম্মেলনের মর্যাদা ছিল অনেক বেশী। নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি তাহাই প্রকাশ করিতেছে

১৭০০। হাদীছ ঃ (৫৫০) কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপস্থিতিতে যে আকাবাহ্ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আমরা (মদীনাবাসীগণ) ইসলামের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম, সেই সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম, যদ্দরুন আমি নিজেকে ধৈন্য মনে করি এবং বদরের জেহাদে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য অপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্যের বস্তু আকাবা সম্মেলনকে মনে করিয়া থাকি। যদিও বদরের জেহাদ (অত্যধিক ফযীলতের বস্তু হিসাবে) লোকদের মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ।

ব্যাখ্যা ঃ কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) সর্বশেষ আকাবা সম্মেলনে উপস্থিত পঁচাত্তর জনের অন্যতম ছিলেন এবং ঐ উপলক্ষে বিশেষ কর্মতৎপরতা বহন করিয়াছিলেন। (বেদায়া ওয়ান নেহায়া এবং যোরকানী দ্রষ্টব্য)।

মদীনায় ইসলামের কৃতকার্যতার কারণ

ইসলামের জীবন এক হইতে তের বৎসর মক্কায় কাটিল; এই দীর্ঘ তের বৎসর স্বয়ং নবী (সঃ) মক্কায় থাকিয়া কত সাধনা, চেষ্টা করিলেন! কিন্তু এই দীর্ঘ তের বৎসরে মক্কায় ইসলাম যতটুকু উন্নতি ও প্রসার লাভ করার স্বপ্নও দেখিতে পারে নাই, শুধু দুই বৎসরে মদীনায় তদপেক্ষাও অধিক সাফল্য, উন্নতি ও প্রসার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল– এই আকাশ পাতাল ব্যবধানের রহস্য কি?

দেশে ও সমাজে একটি অভিজাত সম্প্রদায় থাকে; যাহারা দেশ ও সমাজের সর্দার-মাতব্বর, প্রধান হয়। জনগণের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি জমাইয়া রাখা তাহাদের মজ্জাগত স্বভাব। সাধারণ জনগণের জ্ঞান, বিবেক ও স্বাধীনতা এবং চিন্তাশক্তিকে তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতঃ জনমণ্ডলীকে নিজেদের দাস করিয়া রাখিবার জন্য সদা তাহারা আগহান্বিত ও তৎপর থাকে। তাহারা স্বভাবতই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অতি অভিলাষী হইয়া থাকে। গর্ব, অহঙ্কার, অভিমান ও কৌলীন্য তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়।

দেশে বা সমাজে যাহারা ঐ সম্প্রদায়ের সদস্য পদ দখল করিয়া লইতে পারিয়াছে, সর্দার মাতব্বররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়াছে, তাহাদের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকে– অন্য কেহ যেন ঐরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইতে না পারে, তাহাদের শ্রেণীর সদস্যপদে আসিতে না পারে। বিশেষতঃ অন্য কাহারও তাহাদের প্রতি

পক্ষরূপে সামান্য একটু ভবিষ্যত আত্মপ্রতিষ্ঠার আঁচ করিলেই ঐ সর্দার মাতব্বর সম্প্রদায়ের মন-মগজে অভিমান-অহঙ্কার, হিংসা ও ঘৃণার জঘন্য ভাব এমন করিয়া উত্থিত হয় যে, তাহা ভীষণ ক্ষোভ ও ক্রোধে পরিণত হয় এবং তাহাদেরকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। সেই ক্ষোভ ও ক্রোধ তাহাদের মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞান-বিবেককে কঠিন লৌহ মুষ্টিতে এমনভাবে চাপিয়া ধরে যে, সত্যাসত্য ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার শক্তিই তাহাদের লোপ পাইয়া যায় এবং বিপক্ষকে জব্দ করা, হেয় করা, পরাজিত করা, উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টায় তাহারা উন্মাদ হইয়া পড়ে। ফলে বিপক্ষের শত সত্য, শত ন্যায়কেও স্বীয় অন্তরে বা দৃষ্টিতে তিল পরিমাণ স্থান দেওয়া তাহাদের নিকট আত্মহত্যা বলিয়া গণ্য হয়।

বিপক্ষের ন্যায় ও সত্যকে নিজেদের দৃষ্টিতে স্থান দেওয়া দূরের কথা, ঐ সত্য যেন দেশে বা সমাজে এক বিন্দু শিকড় জমাইতে সুযোগ না পায় সেই উদ্দেশে তাহারা দেশ ও জাতিকে ক্ষেপাইয়া মাতাইয়া তোলে ঐ সত্য ও তাহার বাহকের বিরুদ্ধে। কারণ, জনশক্তিই হইল তাহাদের একমাত্র বল-ভরসা। অতএব জনশক্তিকে যেন কেহ তাহাদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন করিতে না পারে সর্বদা তাহাদের সেই চেষ্টা অব্যাহত থাকে। জনগণও ভেড়ীর পালরূপে সকলে একদিকে ছুটিতে অভ্যস্ত, বিশেষতঃ যখন জনসাধারণের বাপ দাদা চৌদ্দপুরুষ এই সর্দার, মাতব্বরদের দাসত্বে জীবন কাটাইয়াছে। ফলে দেশ জাতির সর্বশক্তি ঐ সত্য তাহার ও বাহকের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত মাতাল হইয়া উঠে, ঐ সত্য ও তাহার সেবকদের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে।

শত শত দেশ ও সমাজের ঐ কুখ্যাত সর্দার-মাতব্বর সম্প্রদায়ের ইতিহাস বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা ঐ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া সত্য এবং সত্যের কত আহ্বায়ককে দেশ ও সমাজ হইতে চিরবিদায় দিয়াছে, নির্বাসিত করিয়াছে। "তায়েফ" নগরে মহাসত্য ইসলামের বিপর্যয় এবং নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ব্যর্থতার মূলে ঐ কুখ্যাত সম্প্রদায়ের সৃষ্ট পরিস্থিতিই দায়ী ছিল। তায়েফে ত ঐ কুখ্যাতদের সংখ্যা মাত্র তিন ছিল।

পক্ষান্তরে মক্কা নগরে ঐ কুখ্যাত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল অনেক। ওতবা, শায়বা, আবু সুফিয়ান, আছ আসওয়াদ, ওলীদ, উমাইয়া, উবাই, আবু জহল এবং আরও অনেকে। এই সব দুরাচারদের হাতে সর্দারী মাতব্বরী ত ছিলই, এতদ্ভিন্ন সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ও একমাত্র আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফকে তীর্থ মন্দির বানাইয়া তাহার সেবক প্রধান হইয়াছিল তাহারাই। এই সূত্রে তাহাদের মধ্যে যাজক পুরোহিতের গর্ব-অহঙ্কারও ছিল সমধিক।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মক্কী জীবনের ইতিহাসে পাতায় পাতায় উল্লিখিত এই বাস্তব সত্যটিই নজরে পড়ে যে, ঐ কুখ্যাত সর্দার সম্প্রদায় দুরাচার মাতব্বর শ্রেণীই ইসলাম এবং নবীজী (সঃ)-কে মক্কায় শিকড় জমাইতে দেয় নাই। আবহমানকাল হইতে দেশে দেশে সমাজে সমাজে যাহা ঘটিয়া আসিতেছিল এবং ঘটিয়া থাকে, ইসলাম এবং নবীজী (সঃ) সম্বন্ধে মক্কায় এবং কোরায়শ সমাজে তাহাই ঘটিয়াছিল। ঐ কুখ্যাত সর্দার সম্প্রদায় নিজেরা ত মহাসত্য ইসলাম এবং তাহার বাহক মহানবী (সঃ)-কে গ্রহণ করেই নাই, অধিকন্তু তাহারাই সমাজ ও জনসাধারণকে এ সত্য ও তাহার বাহকের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়াছে, ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। নানা প্রকার ষড়যন্ত্র পাকাইয়া, মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া সত্যকে চাপিয়া মারিবার সর্বাত্মক চেষ্টা তাহারা করিয়াছে। ফলে মক্কায় ইসলামের দ্রুত সাফল্য লাভ সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

পক্ষান্তরে মদীনায় তখন একটা ভিন্ন অবস্থা বিরাজমান ছিল। মদীনার সর্বাধিক প্রভাবশালী পৌত্তলিক দুইটি বংশ "আওস" এবং "খাযরাজ"। দুই সহোদর হইতেই দুইটি গোত্রের উৎপত্তি; তাহাদের পরস্পর গৃহযুদ্ধ ও আত্মকলহ দীর্ঘদিন হইতে অতি বিকট আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যকার সুদীর্ঘ ১২০ বৎসর স্থায়ী বোআস যুদ্ধের ইতিহাস অতি ভয়ঙ্কর। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয়, যাহাতে উভয় পক্ষের ঐ কুখ্যাত সর্দার সম্প্রদায় প্রায় নির্মূল হইয়া যায়। ফলে সমাজ এবং জনসাধারণ মুক্ত স্বাধীন চিন্তা করার অবকাশ পায়, সর্দার-মাতব্বর দুরাচারদের প্রভাবমুক্ত হইয়া নিজ নিজ জ্ঞান-বিবেকে সত্যাসত্যের ও

ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার করার উত্তম সুযোগ পায়। মদীনাবাসী সমাজ ও জনগণের উপর সর্দারী মাতব্বরীর কঠোর লৌহ বাঁধ না থাকায় তাহারা ইসলামের সত্যাসত্য ধীরস্থিরভাবে শান্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া দেখার সুযোগ পাইল। বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধক না থাকিলে সত্য নিজেই নিজের স্থান খুঁজিয়া লয়– সেমতে মাত্র কতিপয় মুসলমানের পবিত্র কোরআন প্রচারের ফলে এবং ইসলামের আভ্যন্তরীণ শিক্ষা ও সদগুণাবলীর মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট মদীনাবাসীগণ দলে দলে ইসলামের ছায়ায় স্থান গ্রহণ করিতেছিল। ইতিমধ্যেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) মদীনায় আসিয়া পড়িলে ত তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণের ভিড় লাগিয়া গেল। এই সত্যটিই নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে–

১৭০১। হাদীছ (পৃষ্ঠা-৫৩৩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِحُوْا فَقَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ فِىْ دُخُوْلِهِمُ الْاِسْلَامَ -

অর্থ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বোআস যুদ্ধের ঘটনাকে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য আল্লাহ তাআলা অগ্রিম সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। মদীনায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পদার্পণ এমন অবস্থায় হইয়াছিল যে, বোআস যুদ্ধের কারণে মদীনাবাসীরা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের সর্দারগণ নিহত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা আঘাতে জর্জরিত ছিল। ইসলামের প্রতি মদীনাবাসীদের সহজে আকৃষ্ট হওয়ার মূলে এইসব কারণ ছিল এবং এই কারণগুলি মদীনায় নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আগমনের পূর্বে বোআস যুদ্ধের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ নবুয়তের একাদশ বা দ্বাদশ বৎসরেই "মে'রাজ শরীফের" ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল! তাহা অতি বড় এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তাহার বিবরণও সুদীর্ঘ। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযা আলোচনায় তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইবে।

মদীনায় ইসলামের দুই বৎসর

নবুয়তের দশম বৎসরের শেষ দিকে হজ্জের মৌসুমে আকাবায় প্রথম সাক্ষাতে ছয় বা আট জন মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা মদীনায় ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল এবং ইসলামের চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল। একাদশ বৎসর হজ্জ মৌসুমে আকাবায় নবীজীর সঙ্গে বার জন মদীনাবাসীর সম্মেলনে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করার প্রতিজ্ঞাসহ কতিপয় বিষয়ের প্রতিজ্ঞায় দীক্ষা গ্রহণ হইয়াছিল। অধিকন্তু বিশিষ্ট ছাহাবী মোসআ'ব (রাঃ) এবং তাঁহার পরে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম (রাঃ) ইসলাম ও পবিত্র কোরআনের শিক্ষাদান এবং প্রচারকার্যে নেতৃত্ব দানের জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক মদীনায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। তখন হইতেই মদীনা ইসলামের কেন্দ্রেরস্বরূপ ধারণ করিয়া উঠিয়াছিল; এমনকি তথায় প্রবাসী মুসলমানদের আশ্রয়েরও ব্যবস্থা হইল।

নবুয়তের একাদশ বৎসরে মদীনায় ইসলামের প্রসার ও প্রবাসী মুসলমানদের নিরাপত্তা এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা হওয়ার পর হইতেই ব্যাপক পরিকল্পনার ভিত্তিতে নহে, বরং শুধু ব্যক্তিগতভাবে আবু সালামা (রাঃ) এবং উম্মে সালামার (রাঃ)-এর ন্যায় কেহ কেহ মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করেন। ইতিমধ্যেই দ্বাদশ বৎসরের শেষ দিকে যুগান্তকারী ঐতিহাসিক তৃতীয় আকাবা সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। অপর দিকে নবী (সঃ) স্বপ্নযোগে মদীনায় মুসলমানদের হিজরত করার ইঙ্গিত লাভ করেন। নবীর স্বপ্ন ওহীই বটে এবং এই ব্যাপারে একাধিক স্বপ্ন ও ইঙ্গিত নবীজী (সঃ) প্রাপ্ত হন। প্রথম ইঙ্গিত যাহা আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সঃ) বলিলেন–

رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ اِلٰى اَرْضٍ بِهَا نَخْلُ فَذَهَبَ وَهْلِىْ اِلٰى اَنَّهَا الْيَمَامَةُ اَوْ هَجَرَ فَاِذَا هِىَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ ـ

অর্থ ঃ "আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, আমি হিজরত করিয়াছি মক্কা হইতে খেজুর বৃক্ষের দেশে। সেমতে আমার ধারণা হইল, ঐ দেশ "ইয়ামামা" বা "হাজার" অঞ্চল হইবে, কিন্তু পরে দেখা গেল সেই দেশের উদ্দেশ্য "ইয়াসরেব" (মদীনা) নগরী ছিল।" এই হাদীছখানা তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত সম্পর্কে নবী (সঃ) বলিয়াছেন–

اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَىَّ اَىَّ هٰؤُلَاءِ الْبِلَادِ الثَّلَاثِ نَزَلْتَ فَهِىَ دَارُ هِجْرَتِكَ الْمَدِيْنَةُ اَوِ الْبَحْرَيْنِ اَوْ قِنَّسْرِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ আমাকে ওহী মারফত জ্ঞাত করিয়াছেন, তিনটি নগরীর যে কোনটিতে আপনি অবতরণ করিবেন তাহাই আপনার হিজরতের স্থান সাব্যস্ত হইবে– মদীনা, বাহরাইন কিম্বা কান্নাসিরীন।"

(তিরমিযী শরীফ)

তৃতীয় বার স্বপ্নযোগে এমন নিদর্শনও বর্ণনা করা হইল যাহাতে নবীজীর হিজরত স্থানরূপে মদীনা নির্ধারিত হইয়া গেল। "নবীজীর হিজরত" আলোচনায় একটি সুদীর্ঘ হাদীছ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইবে; তাহাতে আছে, নবীজী (সঃ) বলিলেন–

قَدْ اُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ اُرِيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের হিজরতের নগরী আমাকে দেখানো হইয়াছে– তাহা খেজুর বাগান পূর্ণ। তবে তাহাতে কোন জায়গা লোনাও রহিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে কাঁকরময় ময়দান আছে।" এই তিনটি নিদর্শন একত্রে একমাত্র মদীনা নগরীতেই রহিয়াছে। খেজুর বাগানপূর্ণ নগরী অনেকই আছে, তৎসঙ্গে অপর নিদর্শনদ্বয় মদীনা ভিন্ন অন্য কোথাও নাই। উক্ত হাদীছে ইহা উল্লেখ আছে যে– "রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কতৃক ঐ স্বপ্ন বর্ণিত হওয়ার পর মক্কার মুসলমানগণ নিজ নিজ সুযোগমতে অনবরত হিজরত করিয়া যাইতে লাগিলেন। এমনকি পূর্বে যাঁহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছেন তাঁহারাও মদীনা পানে ধীরে ধীরে হিজরত করিতে লাগিলেন।"

নবুয়তের দ্বাদশ বৎসর

নবুয়তের দ্বাদশ বৎসরের শেষ মাসে ঐতিহাসিক আকাবার তৃতীয় সম্মেলন আশাতীত সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হইয়াছে। মদীনায় ইসলাম ও মুসলমানদের নিরাপত্তা এবং আশ্রয়ের সুদৃঢ় আশ্বাস লাভ হইয়াছে। মদীনাকে ইসলামের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। মদীনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গমনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

এমতাবস্থায় স্বয়ং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামও মুসলমানদিগকে ব্যাপকভাবে মদীনায় হিজরত করিয়া যাওয়ার প্রতি আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। নবীজী (সঃ) মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করিলেন–

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ اِخْوَانًا وَدَارًا تَأْمَنُوْنَ بِهَا ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য একটি দেশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যথায় তোমরা আশ্রয় পাইবে নিরাপদে থাকিবে এবং তিনি তোমাদের জন্য ভ্রাতৃসুলভ বন্ধুবর্গের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।" (বেদায়াহ, ৩–১৬৯)।

অবশ্য নবীজী (সঃ) নিজে মক্কায়ই থাকিলেন; এই অবস্থায় তাঁহার মক্কায় অবস্থান সাধারণ দৃষ্টিতেও অতি বড় উদারতা ও মহানুভবতার পরিচায়ক ছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আকাবায় সাফল্যজনক সম্মেলনের সংবাদ কোরায়েশরা পাইয়া বসিয়াছিল। এই কারণে তাহারা মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা অধিক বাড়াইয়া দিয়াছিল। এই দুঃসময়ে মহানুভব নবীজী (সঃ) নিজের চিন্তা একটুও করিলেন না। তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল মুসলমানগণকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া। সহচরবৃন্দকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া অবস্থান করিলেন শত্রুপুরীতে– এই আদর্শের দৃষ্টান্ত কতই না বিরল!

মুসলমানগণ যতই ব্যাপক হারে হিজরত করিতে লাগিলেন, কাফেররা ততই কঠোরভাবে বাধার সৃষ্টি করিতে উন্মাদ হইয়া উঠিল। সতুরাং মুসলমানগণ হিজরতের ব্যবস্থা গোপনে গোপনে করিতে লাগিলেন। একমাত্র ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিপরীত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন।

ওমর (রাঃ) মদীনাপানে

ওমর (রাঃ) প্রকাশ্যেই হিজরত যাত্রার সময় সুসম্পন্ন করিয়া তরবারি বক্ষে ঝুলাইলেন, ধনুক তীর ছুঁড়িবার ভঙ্গিতে প্রস্তুত করিলেন। তীরদান হইতে তীর হস্তে ধারণপূর্বক কা'বা শরীফে আসিলেন। তথায় দুরাচার কাফেররা সলা-পরামর্শে এবং গল্প-গুজবে জটলা বাঁধিয়া বসিয়াছিল। ওমর (রাঃ) কা'বা শরীফের তওয়াফ করিলেন, মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকআত নামায আদায় করিলেন, অতপর কাফেরদের জটলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সিংহ গর্জনে সম্বোধন করিলেন, তোমাদের চেহারা বিকৃত হউক– যাহার ইচ্ছা হয়, তাহার মাকে পুত্রশোকে পতিত করার, সন্তান-সন্ততিকে এতীম করার, স্ত্রীকে বিধবা করার, সে যেন হরম শরীফের সীমার বাহিরে আমার সম্মুখে আসে। এই ঘোষণায় কাফেরদের মুখ শুকাইয়া গেল; কাহারও সাহস হইল না ওমরের পিছু ধাওয়া করার। একমাত্র কতিপয় দুর্বল মুসলমান যাঁহারা তাঁহার আশ্রয়ে হিজরত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন তাঁহারা পিছনে ছুটিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার পথের খোঁজ অবগত করিয়া রওয়ানা হইয়া গেলেন। (যোরকানী, ১–৩২০)

তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বড় ভাই যায়েদ ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এবং ভগ্নীপতি সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)-সহ বিশ জনের কাফেলা মদীনাপানে রওয়ানা হইল। এই কাফেলায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন আইয়্যাশ ইবনে রবীআ (রাঃ)। তিনি ছিলেন দুরাচার আবু জহলের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা। তাই তাঁহার হিজরত করায় আবু জাহলের ক্ষোভের সীমা থাকিল না, কিন্তু তিনি ওমরের সহযাত্রী, তাই বাধা দানের সাহস তাহার হইল না। তাঁহারা মদীনায় পৌঁছিবার পর আবু জাহল ভণ্ডামিপূর্ণ এক চক্রান্ত করিল।

আইয়্যাশ (রাঃ) বিপদে পড়িলেন

আইয়্যাশ (রাঃ) ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সহিত নির্বিঘ্নে মদীনায় পৌঁছিয়া যাওয়ার পর আবু জাহল এবং তাহার আর এক দুধভ্রাতা "হারেস" মদীনায় পৌঁছিল এবং আইয়্যাশ (রাঃ)-কে নানারূপ ছল-চাতুরী দ্বারা বুঝাইল, তোমার বৃদ্ধা মাতা তোমার বিচ্ছেদ শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছে। এমনকি তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন যে, তোমাকে না দেখা পর্যন্ত চুল বাঁধিবেন না, ছায়ায় যাইবেন না– রৌদ্রেই থাকিবেন। মাতার ক্লেশ ও দুর্গতির সংবাদে আইয়্যাশ (রাঃ) শেষ পর্যন্ত ঐ দুরাচারদ্বয়ের সঙ্গে মক্কার পথে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। তিনি হয়ত ভাবিলেন, অন্ততঃ একবার মাকে সান্ত্বনা দিয়া আশা আবশ্যক। পথিমধ্যে ছল করিয়া আবু জাহল ভ্রাতৃদ্বয় আইয়্যাশের বাহন থামাইয়া উভয়ে একসঙ্গে তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। হঠাৎ তাঁহাকে কাবু করিয়া হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল এবং মক্কায় আনিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল।

উক্ত কারাগারে ইসলাম গ্রহণ অপরাধে "হেশাম" নামক একজন মুসলমান পূর্ব হইতেই ভীষণ অত্যাচার ভোগ করিতেছিলেন। তিনিও ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাফেলার সঙ্গী হইতে চলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বেই তিনি পাষণ্ডদের হস্তে বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ) উভয়ই কারাগারে নির্যাতন ভোগে আবদ্ধ থাকিলেন; দীর্ঘ দিন এই অবস্থা তাঁহাদের উপর অতিবাহিত হইল। এমনকি রসূলুল্লাহ (সঃ) হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন, তখনও তাঁহারা কারাগারেই আবদ্ধ। এই সময় ত তাঁহাদের শ্রেণীর আবদ্ধ বা দুর্বল মুসলমানদের উপর মক্কার দুরাচারদের নির্যাতন বহু গুণে বাড়িয়া গেল। কারণ, পাষণ্ডরা সকল ক্রোধ ঝাল তাঁহাদের উপরই মিটাইতে লাগিল। আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ) দৈহিক নির্যাতনের সম্মুখীন ত ছিলেনই, আর একটি মানসিক যাতনাও ছিল তাঁহাদের অতি বড়।

আইয়্যাশ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনা ত বিস্তারিত বর্ণিত হইলই যে, তাঁহাকে আবু জাহল ও তাহার ভ্রাতা ধোঁকা দিয়া বিভ্রান্ত করিল; ফলে তিনি বিভ্রান্তিতে পড়িয়া গেলেন। এই বিষয়টিকেই ইতিহাসে وَفَتَنَاهُ فَافْتَتَنَ "তাহারা উভয়ে তাঁহাকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত করিল, ফলে তিনি বিভ্রান্তিতে পতিত হইলেন" বলা হইয়াছে। (বেদায়া ৩-১৭২)

হেশাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকেও এইরূপ বিভ্রান্ত করারই কোন চক্রান্ত করা হইয়াছিল। ওমর (রাঃ) হিজরতে যাত্রার পূর্বে আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ) উভয়কে বলিয়াছিলেন, রজনীর অন্ধকারে প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহ হইতে রওয়ানা হইয়া প্রভাতে "তানাজোব" নামক স্থানে পৌছিবে। ভোর বেলায় যে ঐ স্থানে পৌছিতে না পারিবে তাহার জন্য অপেক্ষা করা হইবে না। ওমর (রাঃ) এবং আইয়্যাশ (রাঃ) ত ভোর বেলা ঐ স্থানে পৌছিলেন, কিন্তু হেশাম (রাঃ) পৌছিলেন না। ফলে ওমর (রাঃ) এবং আইয়্যাশ (রাঃ) পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অপেক্ষা না করিয়া ঐ স্থান হইতে মূল কাফেলায় মিলিত হইয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন, আর হেশাম (রাঃ) দুরাচারদের হাতে আটকা পড়িয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। হেশাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনা স্বয়ং ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই বর্ণনায় রহিয়াছে- وَحُبِسَ هِشَامٌ وَفُتِنَ فَافْتَتَنَ "হেশামকে আটকাইয়া ফেলা হইল, তাঁহাকে বিভ্রান্তিতে ফেলিবার চেষ্টা করা হইল; ফলে তিনি বিভ্রান্তিতে পতিত হইয়া গেলেন।" (বেদায়া, ৩-১৭২)।

এস্থলে আইয়্যাশের ঘটনার ন্যায় বিভ্রান্তির বিবরণ না থাকিলেও উল্লিখিত কথার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিভ্রান্তিকর চক্রান্ত দ্বারাই হেশাম (রাঃ)-কে আটকানো হইয়াছিল এবং তিনি সেই বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ায় হিজরত করিতে পারেন নাই!

আইয়্যাশ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনায় একটি প্রশ্ন সুস্পষ্ট যে, তিনি কাফেরদের কথা কেন বিশ্বাস করিলেন- যেই চক্রান্তে পতিত হইয়া তিনি তৎকালীন একটি বৃহত্তম ফরয হিজরত হইতে বিচ্যুত থাকিলেন? তদ্রূপ হেশাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতিও এই প্রশ্ন যে, হয়ত কাফেরদের চক্রান্তে বিশ্বাস করিয়াই তিনি আটকা পড়িয়া হিজরতের ফরয আদায় হইতে বঞ্চিত থাকিলেন। এই প্রশ্ন লক্ষ্য করিয়া লোকেরাও বলিত এবং তাঁহারাও ভীষণ চিন্হিত ছিলেন যে, হিজরত না করার তৎকালীন বৃহত্তর কবীরা। গোনাহ হইতে তাঁহাদের রেহাই পাওয়ার কোন ব্যবস্থা হইবে না- কাফেরদের চক্রান্তে যেহেতু তাঁহারা নিজেই পতিত হইয়াছেন, তাই উক্ত গোনাহের জন্য শত তওবা করিলেও কবুল হইবে না।

রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন মদীনায় পৌছিয়াছেন এবং সর্বত্রই ঐ জল্পনা কল্পনা। আল্লাহ তাআলার রহমত অসীম, তিনি সবই জ্ঞাত থাকেন; আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ)-এর ত্রুটি কি পরিমাণ ছিল তাহাও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়া হইল। তিনি ঐ সকল জল্পনা কল্পনার অবসান করিয়া পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল করিলেন-

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থ ঃ "আপনি বলিয়া দিন হে বান্দাগণ! যাহারা নিজেদেরই ক্ষতিকর ত্রুটি করিয়াছ, তোমরা আল্লাহর রহমতের আশা ত্যাগ করিও না, নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ এই শ্রেণীর সব গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী দয়ালু ....। এই আয়াত লিপিযোগে মদীনা হইতে মক্কায় আইয়্যাশ ও হেশাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট পৌঁছাইয়া তাঁহাদের সান্ত্বনার ব্যবস্থা করা হইল।

এদিকে নবীজী (সঃ) ঐ শ্রেণীর নির্যাতিত অসহায় মুসলমানগণের মুক্তির জন্য বিশেষ দোয়া করা আরম্ভ করিলেন। এমনকি জামাতের সহিত ফরয নামাযের মধ্যেও সকলকে আমীন বলার সুযোগ দানে সশব্দে ঐ দোয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। মক্কায় আবদ্ধ অত্যাচারিত দুর্বল মুসলমানদের মুক্তির দোয়ায় কতিপয় বিশেষ নামও উল্লেখ করিতেন; তন্মধ্যে আলোচ্য আইয়্যাশ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম সর্বাগ্রে ছিল। দোয়ার মধ্যে আরও একজনের নাম ছিল– সালামা ইবনে হেশাম। তিনি ছিলেন আবু জহলের সহোদর। তিনিও ইসলাম গ্রহণের অপরাধে একই কারাগারে বন্দী ছিলেন। তাঁহার পা আইয়্যাশের পায়ের সহিত শিকলে বাঁধা ছিল। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ–৪) দোয়ার বিস্তারিত বয়ান প্রথম খণ্ড ৫৪৭ নং হাদীছে রহিয়াছে।

আইয়াশ (রাঃ)-এর মুক্তিলাভ

নবী (সঃ) মদীনায় পৌঁছিয়া গিয়াছেন, কিছু সংখ্যক মুসলমান মক্কায় কাফেরদের হস্তে বন্দী রহিয়াছেন বা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আটকা পড়িয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম একই কারাগারে নিক্ষিপ্ত ও ভীষণভাবে অত্যাচারিত হইতেছিলেন। নবী (সঃ) বলিলেন–

مَنْ لِىْ بِعَيَاشِ ابْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ وَهِشَامٍ ـ

অর্থ ঃ "আইয়্যাশ এবং হেশামের মুক্তির জন্য আমি উদ্‌গ্রীব; আমার এই বাসনা পূরণে আত্মদান করিতে কে প্রস্তুত আছ? ওলীদ নামক ছাহাবী বলিলেন, আমি প্রস্তুত আছি। ওলীদ (রাঃ) মক্কায় আসিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিলেন; কারাগারে বন্দীদের আহার তাঁহাদের বংশীয় লোকদের পৌঁছাইবার অনুমতি ছিল; সেমতে এক মহিলা খাদ্য নিয়া যাইতেছিল। ওলীদ (রাঃ) ঐ মহিলার সঙ্গে কথা বলিয়া জানিতে পারিলেন সে ঐ বন্দীদের জন্যই খাদ্য নিয়া যাইতেছে। ওলীদ (রাঃ) তাহার পিছনে পিছনে গেলেন এবং কারাগারের অবস্থান ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিলেন। কারাগারটি নগর প্রান্তে শুধু প্রাচীর বেষ্টিত ছিল– তাহার উপরে ছাদ ছিল না; বন্দীগণ সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে সারা দিন সেই ছাদবিহীন কারাগারে ছটফট করিতেন। ওলীদ (রাঃ) রজনীর অন্ধকারে সেই কারাগারের নিকটে যাইয়া বহু কষ্টে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া লাফাইয়া কারাগারের ভিতরে পড়িলেন। কিন্তু বন্দীদের পায়ে কঠিন লৌহ বেড়ির বাঁধন ছিল; এই অবস্থায় তাঁহারা চলিতে সক্ষম হইবেন না, কিরূপে পলায়ন করিবেন? ওলীদ (রাঃ) এক খণ্ড শক্ত পাথর খুঁজিয়া আনিলেন এবং লৌহ বেড়ির নীচে স্থাপনপূর্বক তরবারি দ্বারা ভীষণ জোরে লৌহ বেড়িতে আঘাত করিলেন; তাহা কাটিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে তাঁহারা মদীনার পানে ছুটিয়া চলিলেন। একটি মাত্র উট ছিল ওলীদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর; তিনি মুক্ত বন্দীদ্বয়কে উটে চড়াইয়া নিজে এই দীর্ঘ প্রায় তিন শত মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিলেন।* (সীরাতে ইবনে হেশাম)

* উল্লিখিত ঘটনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণকারীর নাম "ওলীদ" দেখিয়া মোস্তফা চরিত গ্রন্থে এই ঘটনার বাস্তবতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হইয়াছে এই কারণে যে, আইয়্যাশ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুক্তির জন্য যে নবী (সঃ) নামাযের মধ্যে দোয়া করিয়াছেন সেই দোয়ার মধ্যেই ওলীদ নামীয় ব্যক্তির মুক্তির জন্যও দোয়ার উল্লেখ আছে। ইহাতে বুঝা যায়, ওলীদও তখন

ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পর ওসমান (রাঃ)ও মদীনায় হিজরত করিলেন। (যোরকানী, ১-৩২০)

এইভাবে মক্কা হইতে প্রায় সকল মুসলমানই হিজরত করিয়া গেলেন। মক্কায় রহিলেন শুধু কতিপয় মজলুম মুসলমান- যাঁহারা দুর্বল হওয়া কিম্বা নিজ গোষ্ঠি জ্ঞাতিদের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ বা কারারুদ্ধ জীবন যাপনে বাধ্য ছিলেন। আর ছিলেন শাহেনশাহে দোজাহান সাইয়্যেদুল কাওনাইন হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁহারই আদেশে আবু বকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)।

যথাসম্ভব মুসলমানগণকে আশ্রয় ও নিরাপদ স্থান মদীনায় পৌছাইয়া দিয়াও নবীজী (সঃ) মক্কায় অবস্থান করিলেন আল্লাহ তাআলার অনুমতির অপেক্ষায়।

আনসারগণের সৌজন্য

মুসলমানগণ মক্কা ত্যাগ করতঃ মদীনায় আসিয়া অতি সমাদরে গৃহীত হইলেন। মদীনার আনসারগণ এই প্রবাসী ভ্রাতাদিগকে নিজ নিজ ঘরদুয়ার ও বিষয় সম্পত্তির অংশ প্রদানের প্রস্তাব দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। (১৭১৭ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। এইভাবে মোহাজের ভাইদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্বপ্রকার সৌজন্য প্রদর্শনে আনসারগণ এক অতুলনীয় ইতিহাস সৃষ্টি করিলেন। এতদ্ভিন্ন মদীনার সর্বত্র ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিল, মদীনাবাসী মুসলমানগণ ইসলামের উন্নতিকল্পে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

নবীজীর (সঃ) হিজরত (পৃষ্ঠা- ৫৫১)

মক্কা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্মভূমি; নবুয়তের পূর্বে জীবনের বড় অংশ সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর এই মক্কায়ই কাটিয়াছিল। নবুয়তী জীবনেরও বেশী অংশ মক্কায়ই কাটিয়াছে। মক্কায়ই সৃষ্টির মুকুটমণি আল্লাহ তাআলার ঘর- কা'বা শরীফ অবস্থিত। এই সব কারণে মক্কার প্রতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আকর্ষণ ছিল অনেক বেশী, ভালবাসা ছিল অপরিমেয়। কিন্তু আল্লাহর ও আল্লাহর দ্বীনের ভালবাসা হইল সর্বোচ্চ, সর্বাধিক ও সর্বাগ্রে। দীর্ঘ তের বৎসরের অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষায়ও যখন মক্কা ভূমিতে দ্বীন ইসলামের জন্য নিরাপত্তা সৃষ্টি হইল না, নিরাপদে ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম প্রচারের সুযোগ তথায় হইয়া উঠিল না, তখন নবীজী মোস্তফা (সঃ) নিজ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বাধ্য হইলেন স্বদেশ ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণে। বিষাদ ও দুঃখভরা অন্তরে, ব্যথা বেদনা জড়িত হৃদয়ে স্থির করিলেন মক্কা পরিত্যাগ করিতে। এই সঙ্কল্প গ্রহণের পর মনোব্যথায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) মক্কাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন-

مَا اَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَاَحَبَّكِ اِلَيَّ وَلَوْلَا اَنَّ قَوْمِيْ اَخْرَجُوْنِيْ مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ -

অর্থ ঃ ঃ "মক্কা! কতই না ভাল তুমি!! কতই না ভালবাসি আমি তোমাকে!!! আমার জ্ঞাতিরা তোমার ক্রোড়ে আমাকে থাকিতে দিল না; নতুবা আমি তোমাকি ছাড়িয়া কোথাও বাস করিতাম না।"

(মেশকাত শরীফ ২৩৮)

মক্কায় বন্দী ছিলেন; সুতরাং উল্লিখিত ঘটনা নিশ্চয় অবাস্তব।

এই সংশয় জ্ঞান বিদ্যার অভাবপ্রসূত। কারণ, তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৪র্থ খণ্ডে ঘটনার বর্ণনায় দেখা যায়, সত্যই ওলীদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের অপরাধে মক্কায় বন্দী ছিলেন এবং আইয়্যাশ (রাঃ) ও সালামা (রাঃ)-এর সঙ্গে একই কারাগারে ছিলেন; সেই সময় মুক্তির দোয়ার মধ্যে আইয়্যাশ ও সালামার নামের সহিত ওলীদের নামও ছিল। পরে ওলীদ (রাঃ) কোন উপায়ে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়া মদীনায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। অপর বন্দীগণ কারাগারেই শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলেন। নবী (সঃ) ওলীদের মুখেই আইয়্যাশ ও তাঁহার সঙ্গীদের উপর নির্মম অত্যাচারের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদের মুক্তির জন্য ওলীদ (রাঃ)-কে মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।

নবীজী (সঃ) যখন মক্কা ছাড়িয়া যাইবেন সেই বিচ্ছেদলগ্নে একটি টিলার উপর দাঁড়াইয়া অশ্রুসজল নয়নে কা'বার প্রতি তাকাইলেন এবং গভীর মমতায় ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন—

وَاللّٰهِ اِنَّكِ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَىَّ وَلَوْلاَ اَنِّىْ اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ ـ

অর্থ ঃ খোদার কসম মক্কা! অতি উত্তম দেশ তুমি!! আমার অতি প্রিয় তুমি!!! আমি তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি। তোমা হইতে আমাকে বিতাড়িত করা না হইলে আমি তোমাকে ত্যাগ করিতাম না। (ঐ)

অধিকাংশ আলেমের মতে জগতের বুকে সর্বোত্তম দেশ প্রিয় মদীনা। কিন্তু মদীনা এই গৌরব লাভ করিয়াছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পদার্পণের পর। যাবত না নবী (সঃ) মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় পৌঁছিয়াছিলেন তাবত ঐ গৌরব মক্কার জন্যই নির্ধারিত ছিল।

হিজরতের সূচনা

মদীনায় ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, মুসলমানগণ মদীনায় আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভ করিয়া তথায় তাঁহাদের কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ পাইতেছেন, মদীনা এলাকায় ইসলামের প্রসার ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। এই সব সংবাদ মক্কাবাসীদের অবিদিত থাকে নাই এবং তাহারা এই সংবাদে বিচলিত না হইয়া পারে না। কারণ, তাহাদের সুখ-শান্তি ও বল-শক্তিরই নহে শুধু, বরং তাহাদের বাঁচিবার প্রশ্ন নির্ভর করে সিরিয়ার বাণিজ্যের উপর এবং সেই বাণিজ্যের পথ মদীনাবাসীদের বাগের মধ্যে। সুতরাং মদীনায় মুসলমানদের কেন্দ্র গড়িয়া উঠা এবং তথায় মুসলমানদের শক্তি সৃষ্টি মক্কার কাফের গোষ্ঠীর জন্য মৃত্যু পরোয়ানা। তাই কোরায়শদের মনে এক নূতন চিন্তার উদয় হইল। মুসলমানগণ হাতছাড়া হইয়াছে, মদীনার আওস ও খাযরাজ প্রসিদ্ধ শক্তিশালী দুইটি গোত্রের সমর্থন সহযোগিতা লাভের সুযোগ তাঁহারা পাইয়া বসিয়াছেন। ইহার উপর আবার স্বয়ং মুহাম্মদও (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া যোগ দিতে উদ্যত; এইরূপ হইলে ত ইসলাম ও মুসলমানগণ বহু শক্তি অর্জনের সুযোগ পাইয়া বসিল এবং একটি সুশৃঙ্খল ও সুসংহত কেন্দ্র গড়িয়া তোলার সকল প্রকার সুবিধাই লাভ করিয়া ফেলিল।

মক্কার মোশরেকরা ভালভাবেই জানিত, ইসলামের প্রাণশক্তির উৎসমুখ হইলেন মুহাম্মদ (সঃ)। সুতরাং তাঁহার মদীনা যাওয়া পণ্ড করিতে পারিলে মদীনায় ইসলামী কেন্দ্র গড়িয়া উঠার আশঙ্কা তিরোহিত হইবে। এই ভাবিয়া তাহারা রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে এমন কোন একটা ব্যবস্থা করার চিন্তা করিতে লাগিল যদ্দ্বারা এইসব সুযোগেরও চির সমাপ্তি ঘটে এবং রসূলুল্লাহর (সঃ) আন্দোলনই যেন চিরতরে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যায়। এই উদ্দেশে মক্কাবাসীরা এক শত মেম্বার সম্বলিত তাহাদের সর্বোচ্চ পরিষদ— "দারে নদওয়ার" এক পরামর্শ সভা আহবান করিল।

মক্কার কাফের শত্রুরা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে সর্বশেষ ব্যবস্থা স্থির করার জন্য বিশেষ গোপনীয়তার সহিত রুদ্ধদ্বার কক্ষে এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করিল। এদিকে ইবলীসও এই সুযোগে ইসলামের মূল কর্তন করিয়া দেওয়ার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। রসূলুল্লা (সঃ)-এর প্রাণ বিনাশে কোন সক্রিয় ব্যবস্থাবলম্বনে শত্রু দলকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশে স্বয়ং ইবলীস شيخ نجدى আরব দেশীয় নজদ এলাকা নিবাসী প্রবীন মানুষের আকৃতি ও বেশে উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য তথায় উপস্থিত হইল। এমনকি এই সম্মেলনের মধ্যে সে-ই প্রস্তাব গ্রহণের ভূমিকায় প্রধান হওয়ার সুযোগ পাইয়া বসিল।*

*** সমালোচনা ঃ** আলোচ্য ঘটনায় নজদ নিবাসী বয়ঃবৃদ্ধের আকৃতিতে স্বয়ং ইবলীসের উপস্থিতিকে "মোস্তফা চরিত" গ্রন্থে অস্বীকার করা হইয়াছে। ছুতা ধরা হইয়াছে যে, "যাহারা ঐ কথা বলিয়াছেন তাঁহারা বৃদ্ধের মুখেও ঐ কথা শুনেন নাই, অথবা হযরতের মুখেও ঐ তথ্য অবগত হন নাই। কাজেই বৃদ্ধটি যে ছলধারী শয়তান ইহা তাহাদিগের অনুমান মাত্র।"

এইরূপ উক্তিতে হাসি না আসিয়া পারে না। সীরাত তথা চরিত শাস্ত্রের সমস্ত কিতাবেই আলোচ্য সমাবেশ অনুষ্ঠানের বিবরণ

সম্মেলনে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ হইতে লাগিল। একজন বলিল, মুহাম্মদ (সঃ)-কে বন্দী করিয়া কঠোর দণ্ড দেওয়া হউক; হাতে পায়ে বেড়ি দিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করত যাবজ্জীবন কারাগারে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক। কারাগারে ভীষণ দণ্ড ভোগ করিতে করিতে একদিন মরিয়া যাইবে। শেখ নজদী এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এই প্রস্তাব কার্যকর করিলে তাহার লোকজন ও আত্মীয়স্বজন নিশ্চয় খোঁজ পাইবে এবং তাহাকে উদ্ধার করিতে নিশ্চয় চেষ্টা করিবে; তাহাতে যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনাও ঘটিবে এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত তাহারা উদ্ধার করিয়া নিয়াও যাইবে।

আর একজন বলিল, তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক; সে তাহার দলবলসহ দেশান্তরিত হইলে আমাদের দেশ ঠান্ডা হইবে। শেখ নজদী এই প্রস্তাবেরও প্রতিবাদ করিয়া বলিল, সে যে দেশে যাইবে সেখানেই তাহার বহু ভক্ত জুটিয়া যাইবে। তাহার মিষ্ট কথায় এবং কোমল ব্যবহারে অনেক মানুষ তাহার দলে ভিড়িবে। পরে আমাদেরও বিপদের কারণ হইবে; হয়ত সে দল জুটাইয়া আমাদের উপর আক্রমণ করিবে এবং আমাদের হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা তাহার জন্য সহজ হইয়া যাইবে।

অবশেষে আবু জাহল একটি প্রস্তাব আনিল যে, তাহাকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। তাহাকে হত্যা করিলে চির দিনের জন্য আমরাও স্বস্তি লাভ করিব এবং তাহার ধর্ম ইসলামকেও হত্যা করা হইয়া যাইবে। তবে একা একজনে হত্যা করিলে তাহার গোষ্ঠী হাশেম ও মোত্তালেব বংশ প্রতিশোধ গ্রহণে ছুটিয়া আসিবে। অতএব আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, মক্কা এবং তাহার পার্শ্বস্থ সমুদয় গোত্র হইতে এক-একজন শক্তিশালী যুবক বাছিয়া লইয়া একটি দল গঠন করা হউক, তাহাদের প্রত্যেকের হাতে তরবারি প্রদান করা হউক; তাহারা সকলে এক সঙ্গে মুহাম্মদের উপর তরবারি দ্বারা আঘাত করতঃ তাহাকে হত্যা করিবে। এই ব্যবস্থায় মূল উদ্দেশ্য হাসিল হইয়া যাইবে এবং তাহার কোন পরিণামও বিশেষ ক্ষতিকর হইবে না। কারণ যেহেতু এই হত্যানুষ্ঠানে বহু গোত্রের লোক শামিল থাকিবে তাই বনু হাশেমগণ এতগুলি গোত্রের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাবলম্বনে সাহসী হইবে না। আর প্রাণ বিনিময়ের জরিমানা আদায় করিতে হইলে তাহাও সকল গোত্রের উপর বণ্টিত হইয়া সহজসাধ্য হইয়া যাইবে।

প্রবীণ মানুষবেশী ইবলীস এই প্রস্তাব সানন্দে অনুমোদন করিল এবং সকলেই ইহার প্রতি সমর্থন জানাইল। তাহাদের উক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়িত করিতে রাত্রি বেলা রসূলুল্লাহর (সঃ) শয়ন গৃহ ঘেরাও করারও ব্যবস্থা হইল। শত্রুদের সম্মেলন শেষ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে জিব্রাঈল (আঃ) মারফত হযরত (সঃ) সমুদয় খবর জ্ঞাত হইয়া গেলেন, তাঁহাকে স্বীয় বিছানায় শয়ন করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল এবং মদীনার

উল্লেখ আছে এবং সুস্পষ্টরূপে ইহাও বর্ণিত রহিয়াছে যে, উক্ত সমাবেশে স্বয়ং ইবলীস নজদ অধিবাসী বৃদ্ধের আকৃতিতে যোগদান করিয়াছিল। এখন যেই যুক্তিতে এই বিবরণ খণ্ডন করা হইয়াছে সেই যুক্তিতে ত মূল ঘটনা সমাবেশ অনুষ্ঠানের বিবরণেরও খণ্ডন হইয়া যায়। কারণ, সমাবেশ অনুষ্ঠানের বিবরণও ত কেহ সভা অনুষ্ঠানকারীদের কিম্বা হযরতের মুখে শুনে নাই। বলাবাহুল্য সীরাত তথা চরিত শাস্ত্রের পূর্বাপর প্রচলিত গ্রন্থাবলীর বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়াই সীরাত বা চরিত গ্রন্থাবলী রচনা করা হইয়া থাকে, মোস্তফা চরিতও সেইরূপে রচিত। তাহার শত শত বর্ণনা প্রসিদ্ধ চরিত গ্রন্থাবলী হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সব বর্ণনা মূল ঘটনার লোকদের মুখে বা হযরতের মুখে শুনা হয় নাই, চরিত গ্রন্থাবলীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং যেই যুক্তিতে ইবলীসের আলোচ্য ভূমিকার বিবরণ অস্বীকারযোগ্য সাব্যস্ত হইবে, সেই যুক্তিতে মোস্তফা চরিতের এবং বিভিন্ন চরিত গ্রন্থের অধিকাংশ বিবরণ অস্বীকারযোগ্য হইবে। স্বয়ং ইতিহাস শাস্ত্রই পঙ্গু হইয়া যাইবে। ইতিহাস শাস্ত্রে কয়টি ঘটনা এইরূপ পাওয়া যাইবে যাহা মূল ঘটনার লোকদের মুখে শুনিয়া বা হযরতের মুখে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে? অতএব উল্লিখিত যুক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে যুক্তি নহে, বাতুলতা মাত্র।

এতদ্ভিন্ন উল্লিখিত অস্বীকারের কারণ এলমের অভাবও বটে। ইবলীসের আলোচ্য ভূমিকার বিবরণ ঘটনার অতি নিকটবর্তী লোক– মহামান্য, নির্ভরশীল আস্থার পাত্র, বিশিষ্ট ছাহাবী নবীজীর চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে সনদযুক্তভাবে বহু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। যথা– সীরাত গ্রন্থ বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৩–১৭৫ যোরকানী, ১–৩২১। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর ইতিহাস গ্রন্থ ২–৯৮।

পানে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হইল।*

নবীজী মোস্তফা (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া মদীনায় প্রস্থানের পরিকল্পনা করিলেন এবং ইহাও স্থির করিলেন যে, আলী (রাঃ)-কে মক্কায় রাখিয়া যাইবেন। কারণ, মক্কার জনসাধারণ তাহাদের সমাজপতিদের প্ররোচনায় অজ্ঞতাবশতঃ নবীজীর বিরুদ্ধাচরণ করিলেও নবীজী (সঃ)-কে এত দূর মহাত্মা বলিয়া বিশ্বাস করিত

যে, মক্কায় যাহার যেকোন মূল্যবান বস্তু বা টাকা পয়সা আমানত রাখার আবশ্যক হইত সে তাহা নিঃসংশয়ে নবীজীর নিকট রাখিয়া যাইত। কারণ, সব রকম বিরোধিতা ও বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেও তিনি "সাদেকে আমীন বিশ্বাস্য নির্ভরশীল" বলিয়া সুপরিচিত হইলেন। এমনকি নবীজী যখন মক্কা ত্যাগ করার সঙ্কল্প করিয়াছেন তখনও তাঁহার নিকট বহু মূল্যবান জিনিসপত্র ও টাকা-পয়সা গচ্ছিত ছিল। নবীজী (সঃ) যদি হঠাৎ এক দিনে সমুদয় গচ্ছিত বস্তু ফেরত দিয়া দেন তবে তাঁহার হিজরতের গোপন তথ্য ফাঁস হইয়া যায়। আর লোকদেরকে তাহাদের আমানত পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা না করিলে তাহাই বা কিরূপ হয়! তাই নবীজী (সঃ) আলী (রাঃ)-কে ঐসব আমানত সোপর্দ করিয়া মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণের সুব্যবস্থা করিয়া গেলেন। নবীজীর চরিত্র মাহাত্ম্য এতই অনাবিল ছিল।

নবীজী (সঃ) হিজরতের সুস্পষ্ট অনুমতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত গরমের মধ্যেই আবু বকরের গৃহে আসিলেন। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, কি ব্যাপার? নবীজী (সঃ) বিশেষ সর্তকতার সহিত আবু বকর (রাঃ)-কে অবগত করিলেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। আবু বকর আরজ করিলেন, আমি আপনার সঙ্গেই যাইব কি? নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমার সঙ্গেই যাইতে হইবে। এই সৌভাগ্যের সুযোগ লাভের অসীম আনন্দে আবু বকর (রাঃ) কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই ঘটনা বর্ণনাকারিণী আবু বকর তনয়া বিবি আয়েশা (রাঃ) বলেন, মানুষ যে আনন্দেও কাঁদে তাহার দৃষ্টান্ত আমি ঐ দিনই দেখিলাম। (বেদায়া ৩-১৭৮)

আবু বকর (রাঃ) চারি মাস পূর্বে হিজরতের জন্য দুইটি উত্তম উট ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) হিজরতের সমুদয় ব্যবস্থা কথাবার্তা নির্ধারিত করিয়া নিলেন। হিজরতের ব্যবস্থা বিশেষ গোপনীয়তার মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে, তাই নবীজী (সঃ) রাত্রি আরম্ভে স্বীয় গৃহেই থাকিলেন যেন কাহারও কোন সন্দেহ না হয় এবং যাত্রার পূর্বেই কোন কেলেঙ্কারি সৃষ্টি না হইয়া পড়ে। রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে এক দিকে নবীজী (সঃ) গৃহ ত্যাগের প্রস্তুতি করিতেছেন, অপর দিকে আবু জাহলের প্রস্তাব অনুযায়ী সে নিজে এবং অন্যান্য গোত্র হইতে সংগৃহীত মোট একশত জন শত্রুর দল নবীজীর (সঃ) গৃহ ঘেরাও করিয়া নিল। দারে নদওয়া মক্কার মিলনায়তনের পরামর্শ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমবেত অস্ত্রের আঘাতে নবীজীকে হত্যা করার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করার জন্য তাহারা এই রজনীকেই নির্ধারিত করিয়াছে। আর নবীজী (সঃ)ও হিজরত করিতে গৃহ ত্যাগে এই রজনীকেই সাব্যস্ত করিয়াছেন; আবু বকর (রাঃ) পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী নিজ গৃহে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।

নবীজী (সঃ) পূর্বেই আলী (রাঃ)-কে আমানতসমূহ প্রত্যর্পণের ভার গ্রহণ করার এবং নবীজীর কক্ষে অবস্থান করার বিষয় অবগত ও সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেমতে নবীজী (সঃ) নিজে সবুজ রঙ্গের যে

---

* উল্লিখিত তথ্যের প্রতি পবিত্র কোরআনেও ইঙ্গিত রহিয়াছে-

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ـ

"একটি স্মরণীয় ঘটনা- কাফেরগণ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল; তাহাদের প্রস্তাব এই ছিল যে, আপনাকে বন্দী করিবে বা প্রাণে বধ করিয়া ফেলিবে বা দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবে। এই উদ্দেশে তাহারা গোপন ষড়যন্ত্র আঁটিতেছিল। আল্লাহ তাআলাও তাহাদের ষড়যন্ত্র বান চাল করার গোপন ব্যবস্থা করিতেছিলেন। (ফলে তাহাদের সমুদয় ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হইল, কারণ) আল্লাহ হইলেন সর্বোত্তম ব্যবস্থাকারী।" (পারা-৯, রুকু-১৮)

চাদরখানা মুড়িয়া ঘুমাইতেন সেই চাদরেই আলী (রাঃ)-কে আবৃত করিয়া নিজের শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। নবীজী (সঃ) এখন গৃহ হইতে বাহির হইবেন, কিন্তু একশত প্রাণঘাতী শত্রুর দ্বারা তাঁহার গৃহ অবরুদ্ধ। এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরতে নবীজী মোস্তফা (সঃ) সূরা ইয়াছীনের এই আয়াত তেলাওয়াত করতঃ আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করিয়া অদম্য সাহসের সহিত গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন—

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ -

অর্থ ঃ "আমি তাহাদের চতুর্দিকে বেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদেরকে আবরণে ফেলিয়া দিয়াছি, ফলে তাহারা দেখিতে পাইবে না।"

পবিত্র কোরআনের ইহাও একটি অলৌকিক ক্রিয়া যে, আয়াতের মূল মর্ম ত পূর্বাপর বিষয়বস্তু সামঞ্জস্যই উদ্দিষ্ট থাকে। কিন্তু তাহার শাব্দিক অর্থের সামঞ্জস্যে বিভিন্ন বাহ্যিক ক্রিয়াও আল্লাহ তাআলা তাহার বরকত ও উসিলায় সংঘটিত করেন। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা তাবিজ-গণ্ডা, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি হাজার হাজার আমলের ঐরূপ ক্রিয়া আবহমানকালের অভিজ্ঞতায় সপ্রমাণিত রহিয়াছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পাক-পবিত্র জবান মোবারকে ঐ আয়াত তেলাওয়াত করায় আল্লাহ তাআলা তাহার শাব্দিক অর্থের সামঞ্জস্যময় ক্রিয়ার উপস্থিত ফল এই দান করিলেন যে, অবরোধকারী শত্রুদের দৃষ্টির উপর আল্লাহ তাআলার কুদরতী আবরণ পড়িয়া গেল; নবীজী (সঃ) নির্বিঘ্নে গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন; শত্রুরা তাঁহাকে দেখিল না। এমনকি প্রস্থানকালে নবীজী (সঃ) শত্রুদের উদ্দেশ করিয়া কাঁকরময় মাটি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তাহাদের প্রত্যেকের মাথার উপর তাহার অংশ পতিত হইয়াছিল, কিন্তু মোটেই কোনরূপ টের পায় নাই। গৃহ হইতে বাহির হইয়া নবীজী (সঃ) আবু বকরের গৃহে গেলেন এবং তাঁহারা উভয়ে ঐ গৃহের পিছন দিকের খিড়কি পথে বাহির হইয়া পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী সওর পর্বত উদ্দেশে যাত্রা করিয়া গেলেন।

যাত্রাকালে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই দোয়া করিয়াছিলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَنِىْ وَلَمْ اَكُ شَيْئًا اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى هَوْلِ الدُّنْيَا وَبَوَائِقِ الدَّهْرِ وَمَصَائِبِ اللَّيَالِىْ وَالْاَيَّامِ اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنِىْ فِىْ سَفَرِىْ وَاخْلُفْنِىْ فِىْ اَهْلِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ وَلَكَ فَذَلِّلْنِىْ وَعَلٰى صَالِحِ خُلُقِىْ فَقَوِّمْنِىْ وَاِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِىْ وَاِلَى النَّاسِ فَلاَ تَكِلْنِىْ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّىْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ وَكَشَفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اَنْ يَحِلَّ بِىْ غَضَبُكَ وَيَنْزِلَ عَلَىَّ سَخَطُكَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ فَجَائَةِ نِقْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ وَلَكَ الْعُتْبٰى عِنْدِىْ حَيْثُمَا اسْتَطَعْتُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ -

অর্থ ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ আমি কিছুই ছিলাম না। আয় আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন দুনিয়ার আপদ-বিপদে, সর্বদার ভয়-ভীতিতে, দিবা-রাত্রির বালা-মসিবতে। আয় আল্লাহ! আপনি আমার সঙ্গী হইয়া থাকুন আমার ভ্রমণে এবং আমার পরিবারে আমার অনুপস্থিতির অভাব আপনি পূরণ করিয়া দিন। আমাকে যাহা দান করেন তাহাতে বরকত দান করুন। আমাকে আপনার অনুরক্ত বানাইয়া রাখুন, সৎ চরিত্রের উপর আমাকে দৃঢ় পদ রাখুন, আমাকে আপনার প্রেমিক বানাইয়া

রাখুন। আমাকে মানুষের নিকট সোপর্দ করিবেন না। আপনি সকল দুর্বলের এবং আমি দুর্বলেরও প্রভু, আমি আপনার দেয়ালের আশ্রয় গ্রহণ করি। আপনার নূরে সমস্ত আকাশ ও ভূমণ্ডল আলোকিত হইয়াছে, সকল প্রকার অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে এবং পূর্বাপর সকলের সমস্ত কাজ-কারবার ঐ নূরের বদৌলতেই সুশৃঙ্খল হইয়াছে। আমাকে আশ্রয় দান করুন আমার উপর আপনার গজব পতিত হওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে। আপনার আশ্রয় গ্রহণ করি আপনার নেয়ামত হারা হওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে, অকস্মাৎ আপনার আযাবের আগমন হইতে, আপনার প্রদত্ত সুখ-শান্তির পরিবর্তন ঘটা হইতে। আপনার সকল প্রকার সন্তুষ্টি লাভই আমার একমাত্র কাম্য। আপনার সাহায্য ছাড়া বাঁচিবার স্থান ও শক্তি কোথাও কাহারও নাই।" (যোরকানী, ১-৩২৯)

এদিকে শত্রু দল নবীজীর (সঃ) গৃহ ঘিরিয়া রাখিয়াছে, নবীজীর শয্যার উপর তাঁহারই চাদরে আবৃত আলী (রাঃ)-কে তাহারা হয়ত দ্বারের ফাটল দিয়া বা কোন প্রকারে শায়িত দেখিয়া মনে করিতেছিল, হযরত শুইয়া আছেন। এই মনে করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছে। রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইতেছে অথচ তাহারা উদ্দেশ্য সাধনের কোন সুযোগ পায় নাই, তাই অবশেষে ভোর বেলায় অবরোধকারীরা গৃহ ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। তথায় আলী (রাঃ)-কে দেখিয়া তাহারা হতবাক হইয়া গেল। তাহারা আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কর্তা কোথায়, আলী (রাঃ) উত্তর করিলেন, তিনি কোথায় আছেন তাহা আমি জানি না। (বেদায়া, ৩-১৮)।

তৎক্ষণাত আবু জাহল কতিপয় লোকসহ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ীতে গেল; তাহারা গৃহদ্বারে দাঁড়াইলে আবু বকর তনয়া আস্‌মা (রাঃ) তথায় আসিলেন। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোর পিতা কোথায়? আস্‌মা (রাঃ) বলিলেন, আমি জানি না আব্বা কোথায় গিয়াছেন। আবু জাহল খবিস বজ্জাত আস্‌মা (রাঃ)-কে সজোরে চপেটাঘাত করিল– যাহাতে তাঁহার কানের বালি ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল।

(বেদায়াহ, ৩-১৭৯)

নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) সওর পর্বতে

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহ হইতে বাহির হইয়া নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) রজনীর অন্ধকারে সওর পর্বত উদ্দেশে পথ চলিতে লাগিলেন। নগর হইতে মাত্র ৩/৫ মাইল ব্যবধানেই এই পর্বত অবস্থিত। সুতরাং সাধারণভাবে রাত্রির অন্ধকারে শহর হইতে যাত্রা করিয়া ভোর হইতেই তথায় পৌছার কথা। কিন্তু লুকাইয়া লুকাইয়া পথ অতিক্রম করায় এবং হয়ত সাধারণ পথ ভিন্ন অন্য পথ অবলম্বন করায় সওর পর্বত পর্যন্ত পৌঁছিবার পথেই দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে বিশ্রামেও বাধ্য হইয়াছিলেন, তাই সওর পর্বত গুহায় রাত্রে পৌঁছিয়াছিলেন। (ঐ, ২-১৭৯)

বুধবার দিন যাইয়া যে রাত্রি আসিল তাহা বৃহস্পতিবার রাত্র; এই রাত্রে গৃহ ত্যাগ করতঃ বৃস্পতিবার পূর্ণ দিন অতিক্রান্তে সওর পর্বতে পৌছিয়াছিলেন। সেই রাত্র জুমার রাত্র এবং জুমার দিন, তারপর শনিবার রাত্র ও দিন, তার পরে রবিবার রাত্র ও দিন– এই তিন রাত্র তিন দিন গুহায় বাস করিয়া রবিবার দিনের পর রাত্র সোমবার গভীর রাত্রে সওর পর্বত গুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনা পানে যাত্রা করিয়াছিলেন।

(যোরকানী, ১-৩২৫)

গিরিগুহায় আবু বকর (রাঃ) ও নবীজী (সঃ)

রাত্রির অন্ধকারে সওর গিরি গুহার দ্বারে পৌঁছিয়া আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলিলেন, আপনি বাহিরে অপেক্ষা করুন; আমি প্রথমে গুহার ভিতরে প্রবেশ করি; সর্প-বিচ্ছু ইত্যাদি কষ্টদায়ক কোন কিছু থাকিলে তাহার দুঃখ আমার উপর দিয়াই যাইবে। এই বলিয়া প্রথমে আবু বকর (রাঃ) গুহায় প্রবেশ

করিলেন; গুহার চতুর্দিকে ছিদ্র পথ ছিল যাহা হইতে কোন দংশনকারী জীব বাহির হইতে পারিত। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট অতিরিক্ত কাপড় ছিল; তিনি তাহা খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া ছিদ্রসমূহ কাপড় খণ্ড দ্বারা বন্ধ করিয়া দিলেন। দুইটি ছিদ্র বাকী থাকিতেই কাপড় শেষ হইয়া গেল। আবু বকর (রাঃ) নবীজী (সঃ)-কে ভিতরে প্রবেশের আহ্বান জানাইলেন। নবীজী (সঃ) ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আবু বকর (রাঃ) উন্মুক্ত ছিদ্রের মুখ স্বীয় পা দ্বারা বন্ধ করিয়া উরু বিছাইয়া দিলেন; তাহার উপর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নবীজী (সঃ) মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। এদিকে ছিদ্রের ভিতর বিষাক্ত বিচ্ছু ছিল; আবু বকরের পায়ে বার বার দংশিতে লাগিল। নবীজীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে আশঙ্কায় আবু বকর (রাঃ) বিচ্ছুর দংশন সহ্য করিয়া যাইতেছিলেন, একটুও নড়িলেন না। কিন্তু বিষক্রিয়ায় তাঁহার চোখের অশ্রু নবীজীর চেহারার উপর পতিত হইল; নবীজী (সঃ) জাগিয়া গেলেন এবং আবু বকর (রাঃ)-কে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমার জনক-জননী আপনার চরণে উৎসর্গীত– আমার পায়ে বিচ্ছু দংশিয়াছে। নবীজী (সঃ) দংশন স্থানে থুথু দিয়া দিলেন; তৎক্ষণাত আবু বকর (রাঃ) আরোগ্য লাভ করিলেন। নবীজী (সঃ) ঐ মুহূর্তেই আবু বকরের জন্য দোয়া করিলেন–

رَحِمَكَ اللّٰهُ صَدَّقْتَنِىْ حِيْنَ كَذَّبَنِىْ النَّاسُ وَنَصَرْتَنِىْ حِيْنَ خَذَلَنِىْ النَّاسُ وَاٰمَنْتَ بِىْ حِيْنَ كَفَرَ بِى النَّاسُ وَاٰنَسْتَنِىْ فِىْ وَحْشَتِىْ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন; তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়াছ যখন লোকেরা অবিশ্বাস করিয়াছে, তুমি আমাকে সাহায্য করিয়াছ যখন লোকেরা আমার সাহায্য ছাড়িয়া দিয়াছে, তুমি আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছ যখন লোকেরা আমাকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তুমি আমার সান্ত্বনা যোগাইয়াছ উদ্বেগ অবস্থায়।" নবীজী (সঃ) আরও দোয়া করিলেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَبَابَكْرٍ مَعِىْ فِىْ دَرْجَتِىْ فِى الْجَنَّةِ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! বেহশতে আমার শ্রেণীতে আমার সঙ্গে আবু বকরকে রাখিও।" (ঐ, ১–৩৩৫)

ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফত আমলে অবগত হইলেন যে, কোন কোন লোক তাঁহাকে আবু বকর (রাঃ) অপেক্ষা উত্তম বলিয়া থাকে। ওমর (রাঃ) তখন কসম করিয়া বলিলেন, আবু বকরের (রাঃ) শুধু এক রাত্রের বা শুধু এক দিনের আমল সমগ্র ওমর পরিবারের সারা জীবনের আমল অপেক্ষা উত্তম।

রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া সওর গুহার উদ্দেশে রাত্রির অন্ধকারে পথ চলিতেছিলেন। ঐ সময় আবু বকর (রাঃ) কতক্ষণ নবীজীর পিছনে চলেন, আবার কতক্ষণ সম্মুখে। নবীজী (সঃ) তাঁহার এইরূপ চলনের প্রতি লক্ষ্য করিলেন এবং বলিলেন, আবু বকর! তুমি এইরূপ চলিতেছ কেন? আকু বকর (রাঃ) বলিলেন, যখন পিছন হইতে ধাওয়াকারী শত্রুর আশঙ্কা করি তখন আপনার পিছনে চলি, আবার সম্মুখে অপেক্ষমাণ শত্রুর ভয় করি তখন আপনার সম্মুখে চলি। নবীজী (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন; তুমি কি এই কামনা কর যে, শত্রুর কোন আঘাত আসিলে তাহা আমাকে না লাগিয়া তোমাকে লাগে? আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, যেই আল্লাহ আপনাকে সত্য দ্বীন প্রদানে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ করিয়া বলি– তাহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অতপর ওমর (রাঃ) গুহার ভিতরে রাত্রি বেলায় তাহার ছিদ্রসমূহ বন্ধ করার পূর্ববর্ণিত ঘটনাও বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করিলেন এবং কসম করিয়া বলিলেন, ঐ এক রাত্রের আমল গোটা ওমর পরিবারের সারা জীবনের আমল অপেক্ষা উত্তম। (বেদায়া, ৩–১৮০)

একদা ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সম্মুখে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আলোচনা হইল। ওমর (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমি আকাঙ্ক্ষা রাখি– আমার সারা জীবনের আমল আবু বকরের (রাঃ) শুধু একটি রাত্র বা শুধু একটি দিনের আমলের সমপরিমাণ গণ্য হয়।

রাত্রটি হইল ঐ রাত্র যে রাত্রে তিনি এবং নবীজী (সঃ) এক সঙ্গে চলিয়া সওর গিরি গুহার দ্বারে পৌছিলেন। তথায় পৌছিয়া আবু বকর (রাঃ) নবীজীকে বলিলেন, আপনি গুহায় প্রবেশ করিবেন না, আপনার পূর্বে আমি প্রবেশ করিব; আঘাত পাওয়ার কোন কিছু তাহার ভিতরে থাকিলে আমিই পাইব, আপনার আঘাত লাগিবে না। সেমতে আবু বকর (রাঃ) গুহায় প্রবেশ করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলেন; তাহার ভিতরে চতুর্দিকে ছিদ্র দেখিতে পাইলেন, তাঁহার একখানা অতিরিক্ত লুঙ্গি ছিল, সেই লুঙ্গিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিদ্রগুলির মুখ বন্ধ করিলেন; দুইটি ছিদ্র উণ্মুক্ত থাকিল; কাপড় শেষ হইয়া গিয়াছে; ঐ ছিদ্র দুইটি দুই পায়ে বন্ধ করিয়া রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রবেশের আহ্বান জানাইলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রবেশ করিলেন এবং আবু বকরের কোলে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলেন। ছিদ্র হইতে তাঁহার পায়ে বিচ্ছু দংশন করিল; কিন্তু রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঘুম ভাঙ্গার ভয়ে আবু বকর একটুও নড়িলেন না। তাঁহার অশ্রু ফোঁটা নবীজীর চেহারায় পতিত হইল; নবীজী জাগ্রত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে আবু বকর! তিনি বলিলেন, দংশন লাগিয়াছে– আমার জনক-জননী আপনার চরণে উৎসর্গীকৃত। রসূলুল্লাহ (সঃ) দংশন স্থানে থুথু দিলেন তৎক্ষণাত আরোগ্য হইয়া গেল, কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শেষ জীবনে সেই বিষের ক্রিয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং মৃত্যুর কারণ হইল। (ফলে তিনি নবীজীর জন্য শহীদ হওয়ার মর্তবা লাভ করিলেন).... (মেশকাত শরীফ ৫৫৬)

উল্লিখিত তথ্য ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভাবাবেগ নহে, বাস্তব সত্যই বটে; স্বয়ং নবী (সঃ) ঐরূপই বলিয়াছেন।

হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা অতি উজ্জ্বল চাঁদনী রাত্রে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার ক্রোড়ে হেলান দেওয়া ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আকাশের অগণিত নক্ষত্র সংখ্যার পরিমাণে কোন ব্যক্তির নেক বা সওয়াব আছে কি? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, হাঁ– আছে, ওমর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে আবু বকরের নেকসমূহের পরিমাণ কি? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আবু বকরের একটি নেক ওমরের সারা জীবনের নেকসমূহের সমান। (মেশকাত শরীফ, ৫৬০)

গিরিগুহায় অসীম সাহসের পরিচয়

শত্রু দল নবীজীর গৃহে এবং আবু বকরের গৃহে তাঁহাদেরকে না পাইয়া ব্যাপার বুঝিতে তাহাদের বাকী থাকিল না এবং ব্যবস্থা অবলম্বনেও তাহারা মোটেই বিলম্ব করিল না। অবিলম্বে তাহারা তাঁহাদের খোঁজে চতুর্দিকে ছুটিয়া পড়িল, বিশেষতঃ সেই যুগে একটি বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায় সুপ্রসিদ্ধ ছিল, যাহাদিগকে কায়েফ বলা হইত। পদচিহ্নের পরিচয়, তাহার আবিষ্কার এবং অনুসরণ ঐ সম্প্রদায় অসাধারণে পটু হইত। ঐ সম্প্রদায়ের বিশেষজ্ঞদেরকে চতুর্দিকে নবীজী ও আবু বকরের গন্তব্যস্থানের খোঁজে লাগইয়া দেওয়া হইল। সওর পর্বতের দিকে যে দল চলিয়াছিল তাহারা তাঁহাদের পদচিহ্ন আবিষ্কার করিতে এবং তাহার অনুসরণ করতে সক্ষম হইল। তাহারা সেই সূত্র ধরিয়া চলিতে চলিতে সওর গিরি গুহার দ্বারে উপনীত হইল। (যোরকানী, ১-৩৩০)

সম্মুখে আর কোন পদ চিহ্নের নিদর্শন না দেখিয়া তাহারা ধারণা করিল, হয়ত এই গুহার ভিতরই আসামীরা লুকাইয়া রহিয়াছে। তাই তাহারা তথায় থামিয়া গেল এবং আনাগোনা করিতে লাগিল; এমনকি গুহাভ্যন্তর হইতে আবু বকর (রাঃ) তাহাদেরকে দেখিতে ছিলেন। আবু বকর বিচলিত হইয়া পড়িলেন; বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এখন উপায় কি? প্রাণঘাতী শত্রু দল নিজেদের পায়ের দিকে তাকাইলেই ত আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে– তখন যে, কি অবস্থা হইবে তাহা ত বলিতে হইবে না। ঐ সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভূমিকা অতি অসাধারণ ও অতুলনীয় ছিল।

অশিক্ষিত শত্রুরা নবীজীর (সঃ) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল; শিক্ষিত শত্রু খৃষ্টানরা তদপেক্ষা অধিক

তীক্ষ্ণ অস্ত্র কলম ধারণ করিা নবীজীর সুনাম-সুখ্যাতি ও কৃতিত্বের উপর কালিমা লেপনে তাহাদের সর্বময় শিক্ষা ও কৌশল ব্যয় করিয়াছে। ঐরূপ একজন স্বনামধন্য শত্রু 'মারগোলিয়থ'ও নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আলোচ্য ভূমিকার প্রশংসায় লিখিতে বাধ্য হইয়াছে যে, "মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)– চরম বিপদের সময় যাঁহার মানসিক বল সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বিকশিত হইত, তিনি যে (এই মুহূর্তে) বিশেষ ধীরতা ও সাহসের সহিত কাজ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দে নাই।"

মারগোলিয়থ গোষ্ঠী সত্যের দ্বারে পৌঁছিয়া যাইতে সক্ষম হইত যদি তাহারা আর একটু গবেষণা করিত যে, এই অদম্য মানসিক বল, এই অসীম সাহস, এই অটল ধৈর্য এবং চরম বিপদের মুখে উক্ত গুণাবলীর পরম বিকাশ হইবার মূল কোথায়!

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) আল্লাহর সত্য নবী, তিনি সত্যের অকৃত্রিম সেবক, বিশ্বাসের স্বর্গীয় আদর্শ। তিনি আপন হৃদয়ে আল্লাহকে এমনভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভিতরে বাহিরে সত্যের তেজ, আল্লাহতে বিশ্বাস ও নির্ভরের অনুভূতি এমনভাবে গাঁথিয়াছিলেন যে, দুনিয়ার কোন বিভীষিকা, ভীষণ হইতে ভীষণতর কোন বিপদ এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার সুপ্রশস্ত মহান হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারিত না, তাঁহার ধীরস্থিরতা সর্বদা অটুট থাকিত।

আলোচ্য ঘটনায় নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর যে ভূমিকা ছিল তাহাই উল্লিখিত দাবীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঐ বিভীষিকাপূর্ণ মহাসঙ্কটের মুহূর্তে যখন আবু বকরের (রাঃ) ন্যায় মানুষও বিহ্বল বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন– হায়! কি অবস্থা হইবে! শত্রু দল নিজেদের পায়ের দিকে লক্ষ্য করিলেই আমাদেরকে দেখিয়া ফেলিবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে যাহারা শুধু মানুষ তাহারা কি ব্যাকুল না হইয়া পারে? নিভৃত গুহার মধ্যে মাত্র দুইটি মানুষ। পলায়নের কোন পথ নাই, মুক্তির আশা নাই, ঘাতক দল গুহার মুখে দাঁড়াইয়া আছে– মৃত্যু একরূপ অবধারিত। কিন্তু সেখানেও নবীজী মোস্তফা (সঃ) সমুদ্রের ন্যায় প্রশস্ত ও গভীর, পর্বতের ন্যায় স্থির অটল। বিন্দুমাত্র ব্যাকুলতা নাই, হতাশা নাই; আছে শুধু আল্লাহর করুণার আশা, রহমতে বিশ্বাস এবং আল্লাহর উপর দৃঢ় নির্ভরতা। প্রশান্ত চিত্তে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবু বকর (রাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "চিন্তা করিও না, অধীর হইও না; নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" শুধু এতটুকুর উপর ক্ষান্ত না হইয়া আরও বলিলেন, "যেই দুই জনের তৃতীয় সঙ্গী থাকিবেন আল্লাহ, সেই দুই জনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কি ধারণা কর?"

১৭০২। হাদীছ ঃ عَنْ اَبِىْ بَكْر رضى الله تعالى عنه قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا فِى الْغَارِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَاَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا اَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا ـ

অর্থ ঃ আনাছ (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যখন আমরা (হিজরতের পথে সওর পর্বতের) গুহায় ছিলাম, তখন আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আশঙ্কা প্রকাশ করিলাম শত্রুগণ (আমাদের খোঁজে গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে) এখন তাহাদের কেহ যদি নিজ পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবেই আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে। এতদ শ্রবণে হযরত (সঃ) আমাকে বলিলেন, (এইরূপ কথা মুখেও আনিও না।) হে আবু বকর! ঐ দুই ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ মনে কর (যাহাদের পক্ষে আল্লাহ তাআলার বিশেষ সাহায্য-সহায়তা প্রতি মুহূর্তে বিদ্যমান রহিয়াছে যে,) আল্লাহ স্বয়ং এই দুই জনের তৃতীয় সাথী।

আরও অধিক আশ্চর্যের বিষয়– এই ঘোরতর সঙ্কটময় সময়েও নবীজী মোস্তফা (সঃ) গুহার ভিতরে নামাযে মগ্ন ছিলেন। তায়েফের ঘটনায়ও বলা হইয়াছে, বিপদসঙ্কুল ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নবীজীর (সঃ)

সান্ত্বনা ও শান্তি লাভের একমাত্র অবলম্বন ছিল নামায। তাই গিরি গুহার সঙ্কটময় সময়– যখন ঘাতক দল গুহার মুখে আনাগোনা করিতেছিল, তখনও নবীজী মোস্তফা (সঃ) নামাযে মগ্ন ছিলেন।(যোরকানী, ১–৩৩৬)

গিরিগুহার সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে নবীজী মোস্তফা (সঃ) মানুষের জন্য সান্ত্বনা লাভের এক চরম ভরসা রাখিয়া গিয়াছেন, এক কূলহীন প্রশস্ত আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আল্লাহর করুণার উপর এমন ঐকান্তিক নির্ভরতার দৃষ্টান্ত আর কোথাও মিলিবে কি? আল্লাহ তাআলার করুণা হইতে কোন অবস্থাতেই নিরাশ হওয়া চাই না– ইহার অমর দৃষ্টান্ত ও চির স্মরণীয় আদর্শ স্থাপন করিলেন নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গিরি গুহার সঙ্কট মুহূর্তে। আল্লাহ তাআলাও বলিয়াছেন–

لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহর করুণা হইতে নিরাশ হইও না।"

নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর বুকভরা আশা ও বিশ্বাস ছিল সেই মুহূর্তেই আল্লাহ তাআলার করুণা লাভের; কার্যতঃ হইলও তাহাই। আল্লাহ তাআলা তথা হইতে ঘাতকদলের ফিরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন; অস্ত্রের বা ভূত-প্রেতের ভয় দেখাইয়া নহে, ঝড়-তুফান বা ভূমিকম্পের কাণ্ড ঘটাইয়া নহে; আল্লাহর কুদরতে নিজেদের ধারণা ত্যাগে বাধ্য হইয়া এবং তাহার বিপরীত বিশ্বাসে আসিয়া শত্রু দল ঐ স্থান ত্যাগ করিল, শুধু তাহাই নহে, বরং খোঁজাখুঁজির অভিযানই ত্যাগ করিয়া তাহারা ব্যর্থতা বরণ করিয়া নিল। এইভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রিয় রসূলকে প্রাণঘাতী পাষণ্ডদিগের কবল হইতে রক্ষা করিলেন।

গিরি গুহায় আল্লাহ তাআলার সাহায্য

নবীজী মোস্তফা (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) রাত্রির শুরুর দিকেই গুহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন। তথায় কাফেরদের পৌঁছিবার পূর্বে অনতিবিলম্বেই কুদরতে এলাহী কতিপয় অসাধারণ, কিন্তু সূক্ষ্ম কৌশলের ব্যবস্থা করিল। গুহার মুখে "রাআহ্" নামক এক প্রকার সাধারণ গাছ জন্মিল, তাহার শাখাগুলি গুহামুখে ঝুঁকিয়া পড়িল। আর তথায় মাকড়সা জাল বুনিয়া দিল এবং এক জোড়া জংলী কবুতরও সেখানে বাসা বানাইয়া ডিম পাড়িল।

অনুসন্ধানী দল গুহামুখে পৌঁছিয়া তথায় কিছু সময় আনাগোনা করিল, এমনকি তাহাদের কেহ কেহ ঐ গুহার মধ্যে তাহাদের আসামী পলাইবার সম্ভাবনাও প্রকাশ করিল, কিন্তু তথায় মাকড়সার জাল এবং কবুতরের বাসা দৃষ্টে শেষ পর্যন্ত তাহারা ভাবিল, ঐ গুহায় নিশ্চয় কোন লোক প্রবেশ করে নাই, নতুবা মাকড়সার এইরূপ অক্ষত জাল থাকিত না এবং এইরূপভাবে কবুতরের বাসাও থাকিত না। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা আর গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল না, খোঁজাখুঁজিও করিল না– তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিল।

আল্লাহ তাআলার কী কুদরত! একবারে সাধারণ এবং নাজুক ও দুর্বল উপকরণ দ্বারা তিনি এমন দুর্ধর্ষ শত্রুদিগের সমুদয় অপচেষ্টা বন্ধ করিয়া দিলেন, ভয়াবহ অভিযান ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ঘটনা প্রবাহের আশ্চর্যজনক দৃশ্যপট আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে কি সুন্দর ভঙ্গিমায় বর্ণনা করিয়াছেন–

اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لاَتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ـ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ـ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহর রসূলকে তোমরা যদি সাহায্য না কর, তবুও আল্লাহর সাহায্য তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে। (তাহার দৃষ্টান্ত দেখ–) যখন কাফেরগোষ্ঠী তাঁহাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিল তখন তিনি শুধু দুই জনের একজন ছিলেন (তৃতীয় কোন বাহ্যিক সঙ্গী তাঁহার ছিল না। কি করুণ দৃশ্য ছিল– !) যখন তাঁহারা দুইজন

গিরিগুহার আশ্রয় নিলেন। (আল্লাহর প্রতি কী দৃঢ় প্রত্যয় ছিল রসূলের!) যখন তিনি (এক বিভীষিকাপূর্ণ ভয়ঙ্কর মুহূর্তে) নিজ সঙ্গীকে বলিতেছিলেন, "চিন্তা করিও না, অধীর হইও না; নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাঁহার উপর শান্তি ও ধীরস্থিরতা বর্ষণ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে বিভিন্ন এমন বাহিনী নিয়োগ করিলেন যাহাদেরকে তোমরা দেখ নাই, যাহার প্রতি কেহ লক্ষ্যও করে নাই। আর কাফেরদের (সিদ্ধান্ত- নবীজীকে হত্যা করিবে, সেই) কথাকে আল্লাহ হেয়, নীচ তথা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। আল্লাহর (সিদ্ধান্ত- নবীজী (সঃ) অক্ষত থাকিবেন সেই) কথাই উপরে তথা বলবত থাকিল। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তাঁহার কৌশল অসীম। (পারা-১০, রুকু- ১২)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ- উল্লিখিত আয়াতের جنود জুনুদ শব্দটি বহুবচন; একবচন হইল جند জুন্দ যাহার অর্থ "বাহিনী"। বহুবচন দ্বারা নিশ্চয় বিভিন্ন বাহিনী উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। ফেরেশতা বাহিনীর সাহায্য ত তথায় ছিলই- যাহাদিগকে কেহ দেখে নাই; আর মাকড়সা ও কবুতর, যাহা সামান্য ও সাধারণ বস্তু হিসাবে কেহ তাহার প্রতি লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে তাহাদের দ্বারা সেই সাহায্য হইয়াছে যে, শত্রু দল তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে- এই সাহায্য ত সশস্ত্র মানুষ দ্বারাও কঠিন ছিল। সুতরাং মাকড়সা এবং কবুতরও ঐ স্থানে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহায্যকারী বাহিনীর মধ্যে শামিল বলিয়া গণ্য হইবে।*

গিরি গুহায় পানাহারের ব্যবস্থা

গৃহ ত্যাগের প্রাক্কালে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরিবার বিশেষতঃ তাঁহার কন্যা আস্‌মা (রাঃ) নবীজী ও আবু বকরের জন্য উপস্থিত সহজসাধ্য সামান্য কিছু পাথেয় তৈয়ার করিয়া একটি থলিয়া ছোট একটি মশকে পানি ভরিয়া দিয়াছিলেন। থলিয়া ও শামুকের মুখ বাঁধিবার দড়ি পাওয়া যাইতেছিল না; তাড়াহুড়ার মধ্যে আস্‌মা (রাঃ) স্বীয় কোমরবন্ধ চিরিয়া এক খণ্ড নিজের জন্য রাখিলেন অপর খণ্ড থলিয়া ও মশকের মুখে বাঁধিতে ব্যয় করিয়া দিলেন। (যোরকানী, ১-৩২৮)

এতদ্ভিন্ন গিরি গুহায় থাকাকালে খাদ্য লাভের জন্য একটি ব্যবস্থাও আবু বকর (রাঃ) করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার একজন মুক্ত ও অতি ভক্ত ঈমানদার গোলাম ছিল আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ), তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে মদীনায় যাইবেন, কিন্তু এখনও তিনি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহেই অবস্থান করেন তিনি আবু বকরের মেষপাল চরাইয়া থাকেন। পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী তিনি তাঁহার মেষগুলো চরাইতে চরাইতে সন্ধ্যা বেলা ঐ গুহার নিকটে নিয়া যাইতেন এবং রজনীর অন্ধকারে দুগ্ধ দোহাইয়া দিয়া আসিতেন। নবীজী (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) ঐ দুগ্ধ পানে রাত্র ও দিন কাটাইতেন; গুহায় অবস্থানের তিন দিনের প্রতি দিনই তিনি ঐরূপ করিতেন।

কোরায়শদের খবরাখবর গুহায় পৌঁছিবার ব্যবস্থা

গুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনা যাত্রা করিতে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন এবং সতর্কতার জন্য মক্কাবাসীদের পকিল্পনা, সঙ্কল্প ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে অবগত থাকা আবশ্যক, নতুবা বাহির হইবার সুযোগ সুবিধা কিভাবে নিরূপণ করা হইবে?

আবু বকর (রাঃ) এই প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা নির্ধারিত করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র ছিলেন

*** সমালোচনা ঃ** মোস্তফা চরিত গ্রন্থে মাকড়সার ঘটনা অসত্য, বলিয়া অস্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু স্বাভাবিক ও মামুলীরূপে। বলা হইয়াছে- মাকড়সা দুনিয়াময় জাল বুনিয়া বেড়াইতে পারে, এখানে পারিবে না কেন? আর কবুতরের ঘটনাকে অপ্রামাণিক প্রচলিত গল্প বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে এবং অবিশ্বাস্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ অস্বাভাবিক- নবীর মোজেযাকেও স্বীকার না করার ভূতের আছরেই এইসব প্রলাপ। নতুবা মোস্তফা চরিতসহ সর্বস্তরের সঙ্কলনেই যে সীরাত বা চরিত গ্রন্থাবলী হইতে শত শত বর্ণনা সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং হইয়া থাকে, সেইরূপব গ্রন্থাবলীতেই মাকড়সা ও কবুতর উভয়ের ঘটনাই বর্ণিত আছে এবং অস্বাভাবিক ঘটনারূপেই উল্লেখ হইয়াছে।

আবদুল্লাহ (রাঃ), তিনি ছিলেন অত্যন্ত চালাক চতুর, গভীর জ্ঞানী ও সূক্ষ্ম কুশলী যুবক। তিনি সারা দিন মক্কায় খোঁজ-খবর করিয়া বেড়াইতেন– নবীজী (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে কোথায় কি আলোচনা হইতেছে, কি সঙ্কল্প ও পরিকল্পনা করা হইতেছে। সকল প্রকার সংবাদ তথ্য অবগত হইয়া তিনি রজনীর গভীর অন্ধকারে সওর গুহায় আসিতেন এবং সব সংবাদ নবী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) সমীপে ব্যক্ত করিতেন। তিনি গুহার ভিতরেই রাত্রি যাপন করিতেন, কিন্তু প্রভাতে আলো ছড়াইবার পূর্বেই অন্ধকারের মধ্যে মক্কা নগরে প্রত্যাবর্তন করিতেন; যেন নগরেই রাত্র কাটাইয়াছেন, কেহ যেন ভাবিতেও না পারে যে, রাত্রে তিনি অন্য কোথাও গিয়াছিলেন। এইভাবে প্রতিদিন তিনি সমুদয় তথ্য ও সংবাদ মক্কা নগরী হইতে গুহায় সরবরাহ করিয়া থাকিতেন।

বাহনের ব্যবস্থা

মক্কা নগরী হইতে সওর গুহা পর্যন্ত ত নবী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) পদব্রজেই আসিয়াছিলেন। গুহা হইতে মদীনা গমন ত বাহন ব্যতিরেকে সম্ভব হইবে না, তাই আবু বকর (রাঃ) তাহার সুব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

নবীজী (সঃ) মুসলমানদিগকে মদীনায় হিজরত করার জন্য ব্যাপকভাবে উৎসুক করিয়া তুলিতেছেন, আবার আবু বকর (রাঃ)-কে অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন। এই সব ইঙ্গিতে আবু বকর (রাঃ) চারি মাস পূর্বেই উত্তম দুইটি উট সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; উটদ্বয়কে ভালভাবে ঘাস-পাতা খাওয়াইয়া মোটা-তাজা শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছিলেন।

পার্বত্য মরু অঞ্চলে দূর দেশের পথচলা কঠিন কাজ; দিক ও পথ নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার; তাহার জন্য বিশেষজ্ঞ পারদর্শী লোক আছে! ঐরূপ অঞ্চলে কাফেলা চলার জন্য সেই লোকের বিশেষ প্রয়োজন। বাড়ী হইতে যাত্রার অনেক পূর্বেই আবু বকর (রাঃ) সেইরূপ একজন অতি পারদর্শী লোককে সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে ওরায়কীত; সে তখন ত কাফের ছিলই, পরেও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু খাঁটি ব্যবসায়ীর ধর্ম এবং যুগের বৈশিষ্ট্য হিসাবে আবু বকর (রাঃ) এবং নবীজী (সঃ) তাহাকে নির্ভরশীল গণ্য করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সে পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ার উত্তম পরিচয়ই দিয়াছে। আবু বকর (রাঃ) হিজরতের জন্য তৈয়ারী উটদ্বয় ঐ ব্যক্তির নিকট অর্পণ করিয়া রাখিলেন এবং তাঁহাদের পরিকল্পনা মতে তাহাকে বলিয়া দিলেন, (যাত্রা করার বুধবার দিবাগত রাত্রির পরবর্তী) তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর উটদ্বয় লইয়া তুমি সওর পর্বত গুহার নিকটে যাইবে। সেমতে বৃহস্পতিবার এবং শনিবার দিবাগত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল, রবিবার প্রভাতের দিকে সে উটদ্বয় লইয়া সওর পর্বত এলাকায় পৌছিল এবং রবিবার দিনটা অতিবাহিত হইয়া সোমবারের রাত্র আরম্ভে নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিলে উটদ্বয়কে সওর গিরি গুহার দ্বারে উপস্থিত করিল।

গিরি গুহা হইতে মদীনাপানে

নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) বৃহস্পতিবার (দিনের পূর্বে) রাত্রে গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন; আজ রবিবার চতুর্থ দিন অতিবাহিত হইয়াছে। মক্কার কাফেররা তাহাদের সাধ্যমতে খোঁজাখুঁজি করিয়া নিরাশ হইয়াছে। এখন তাহারা পথেঘাটে খোঁজ করা হইতে ক্ষান্ত ও নিবৃত্ত। নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) গিরি গুহায় তিনটি রাত্র দিন লুকাইয়া থাকার কষ্ট এই সুযোগের অপেক্ষায়ই সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিকল্পনারসঠিক ফল ফলিয়াছে, তাই আজ রবিবার দিবাগত সোমবার রাত্রে অন্ধকার নামিয়া আসিলে তাঁহারা গিরি গুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনার পানে যাত্রা করিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর

মুক্ত দাস আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী সময় মত উপস্থিত হইয়াছিলেন; খেদমত ও সেবার জন্য তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। নবীজী (সঃ), আবু বকর (রাঃ), আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) এবং পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ- এই চারি জনের ক্ষুদ্র কাফেলা মদীনার পানে যাত্রা করিলেন। নবীজী (সঃ) একা একটি উটের উপর, আবু বকর (রাঃ) ও আমের (রাঃ) একত্রে অপর উটটির উপর, আর আবদুল্লাহ তাহার নিজস্ব ব্যবস্থায় পথচলা আরম্ভ করিল। মক্কা-মদীনার পথিকরা সাধারণতঃ যে পথ দিয়া যাতায়াত করে সে পথে চলা মোটেই নিরাপদ নহে, তাই পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ কাফেলা লইয়া লোহিত সাগরের উপকূলীয় পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।*

হিজরত প্রসঙ্গে চির স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ

জগতে কোন মহৎ কার্য সমাধা করিবার আয়োজন পর্বে যাহার উপর সেই কার্যের ভার ন্যস্ত হয়, আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য যোগ্য সহচর, সহকর্মী মনোনীত করিয়া থাকেন। ইসলামের গৌরব ও উন্নতি সাধনের প্রত্যেক অধ্যায়ে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ছাহাবীগণের ভূমিকা এই সত্যের উজ্জ্বল নমুনা।

ইসলামের শুধু রক্ষাই নহে, বরং চরম উন্নতির সোপান ছিল মদীনায় হিজরত। এই মহান হিজরতের আয়োজনকে যাহারা ধৈর্য, সাহস, দূরদর্শিতা, আত্মত্যাগ ও জীবনের উপর ঝুঁকি লইয়া নীরবে সুকৌশলে সফল ও সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ইসলামের ইতিহাসে এবং মুসলিম জাতির হৃদয় প্রকোষ্ঠে চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-

(১) আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তিনি সর্বদা সর্বক্ষেত্রে ইসলামের জন্য, সত্যের জন্য, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য নিজের জান-মাল সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া থাকিতেন। তাঁহার ন্যায় অনুরক্ত সুহৃদ ভক্ত জগতে দুর্লভ। হিজরত আয়োজনে এবং এই মহাযাত্রা সফল করিয়া তুলিতে তাঁহার ত্যাগ ও দান ছিল অপরিসীম। প্রাণের দুলালী কিশোরী আয়েশা ও সন্তান সম্ভবা তরুণী কন্যা আসমাসহ স্বজনকে কারায়েশ শত্রুদের মধ্যে ফেলিয়া নিজে মৃত্যুর বিভীষিকা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। মক্কা হইতে মদীনায় পরিবহনের ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই সম্পন্ন করিয়া রাখিলেন- চারি মাস পূর্বেই দুইটি উট ক্রয় করিয়া পোষণ করিলেন।

নবীজীর (সঃ) একটি মহান আদর্শ

আবু বকর (রাঃ) পরিবহন উদ্দেশে নিজের জন্য একটি এবং নবীজীর জন্য একটি উট চারি মাস পূর্বে ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। নবীজী (সঃ) হিজরতের অনুমতি লাভ আবু বকরের গোচরে আনিলে তিনি বলিলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার

চরণে উৎসর্গীকৃত- এই বাহনদ্বয়ের একটি আপনি গ্রহণ করুন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, মূল্যদানে আমি এই উট গ্রহণ করিতে পারি, অন্যথায় নহে। নেতা, হাদী ও জাতির পরিচালক হওয়ার জন্য কত বড় মহান আদর্শ! নিজকে ভক্তগণের আর্থিক প্রভাব হইতে অতি সাবধানে মুক্ত রাখিবে, অপর দিকে নিজের জন্য কোন ভক্তের উপর আর্থিক চাপ ফেলিবে না। কত মূল্যবান শিক্ষা ও মহান আদর্শ ছিল ইহা!

আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে- আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের জন্য বিভিন্ন

* নবীজীর হিজরত পথের বিশ্রামাগার বা মঞ্জিলগুলি বর্তমানে অপরিচিত। তাহার মধ্যে "রাবেগ" নামক স্থানটি অবশ্য সেই মহাযাত্রার পথের আংশিক সন্ধান প্রদান করে। রাবেগ স্থানটি বর্তমান মক্কা-মদীনার পথেও একটি প্রসিদ্ধ মঞ্জিল। তথা হইতে লোহিত সাগরের আবছায়া পরিদৃষ্ট হয়। যেই যুগে মক্কা-মদীনার নগর-নগরীতে মৎস দেখা যাইত না, তখনও রাবেগ মঞ্জিলে সামুদ্রিক মৎস্য উপভোগ করা যাইত। যদ্দরুন বাংলাদেশী হাজীগণ মক্কা-মদীনার পথে রাবেগ মঞ্জিলের অপেক্ষায় তাকাইয়া থাকেন।

প্রয়োজনে চল্লিশ হাজার দেরহাম ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সব ব্যয় নবীজী মোস্তফা (সঃ) সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এহেন ভক্তের দান এইরূপ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নবীজী (সঃ) এড়াইয়া চলিয়াছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবীজী মোস্তফা (সঃ) এই আদর্শই দেখাইয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– "মৃত্যুর পূর্বে নবী (সঃ) পরিবারের আহার যোগাইতে নিজের লৌহবর্ম এক ইহুদীর নিকট বন্ধক রাখিয়া (দুই বা) তিন মণ খাদ্য তাহার নিকট হইতে বাকীতে ক্রয় করিয়াছিলেন। এমনকি মৃত্যুর সময় তাঁহার সেই লৌহবর্ম ঐ ইহুদীর নিকট বন্ধক অবস্থায় ছিল। (বোখারী শরীফ, পৃষ্ঠা– ৬৪১)

আর্থিক অনটনে নবী (সঃ) ভক্তবৃন্দ ছাহাবীগণের নিকট হইতে ধার লইতে পারিতেন বা তাঁহাদের কাহারও নিকট হইতে ঐ খাদ্য ধারে ক্রয় করিতে পারিতেন; সে ক্ষেত্রে লৌহবর্ম বন্ধক রাখিতে হইত না। কিন্তু নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাহা করেন নাই, এমনকি ভক্তবৃন্দকে তাঁহার এইরূপ অনটন জ্ঞাতও হইতে দেন নাই; মৃত্যুশয্যায়ও এই আদর্শ হইতে তিনি বিচ্যুত হন নাই। নবী (সঃ) ভাবিয়াছেন, ভক্তবৃন্দ তাঁহার এই অনটন বুঝিতে পারিলে ব্যস্ত হইবে– তাহা পূরণ না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না এবং কাহারও উপর তাহা অতিরিক্ত বোঝা হইতে পারে। এমনকি ধারে ক্রয় করিতেও এক ইহুদীর নিকট গিয়াছেন এবং বন্ধক রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন; কোন ভক্তের নিকট হইতে ধারে ক্রয় করেন নাই! কারণ, কোন ভক্ত এই ক্ষেত্রে মূল্য গ্রহণ করিবে না, অথচ ইহা তাহার পক্ষে বোঝা হইতে পারে। কী অতুলনীয় আদর্শ ছিল নবীজীর! চির জীবন তিনি এই শ্রেণীর সোনালী আদর্শের শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন স্বীয় কার্যের মাধ্যমে– শুধু বচনে নহে।

আলোচ্য উটটি চারি শত দেরহামে আবু বকর (রাঃ) ক্রয় করিয়াছিলেন। নবী (সঃ) সেই মূল্যেই উহা গ্রহণ করিলেন। এই উটটি নবীজীর অবশিষ্ট জীবনে "কাসওয়া" বা "জাদআ" নামের বাহন ছিল, অনেক অলৌকিক ঘটনা উহার সহিত বিজড়িত। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তিরোধানের পরও উহা জীবিত ছিল, অবশ্য কেহ উহা ব্যবহার করিত না, মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করিয়া বেড়াইত। খলীফা আবু বকরের (রাঃ) আমলে উহার মৃত্যু ঘটে। (যোরকানী, ১–৩১৮)

নবীজী মোস্তফা (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) রাত্রি বেলা গৃহ হইতে বাহির হইয়া পদব্রজেই সওর পর্বত পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন, এমনকি পায়ে জুতাও ছিল না। নবীজী মোস্তফা (সঃ) প্রস্তরময় পার্বত্য পথে খালি পায়ে চলায় তাঁহার পদদ্বয় রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, গুহায় পৌঁছিয়া চরণযুগলের রক্তধারা দৃষ্টে আমি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম।

সওর পর্বত এক মাইলের অধিক উঁচু। হাঁটার করণে নবীজী (সঃ)-এর অত্যাধিক ক্লান্তি নিশ্চয় আসিয়াছে, তদুপরি চরণযুগলের ঐ অবস্থা, তাই পর্বতারোহণে নবীজী (সঃ) স্থানবিশেষে অপারগ হইয়া পড়িতেন। ঐ অবস্থায় আবু বকর (রাঃ) নবীজী (সঃ)-কে স্বীয় কাঁধে বহন করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে ঘোড়া, উট, খচ্চর এবং গাধাও বহন করিয়াছে এবং তাঁহার প্রত্যেকটি বাহনই সেই বদৌলতে নিজ নিজ শ্রেণী ও জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। তদ্রূপ আবু বকর (রাঃ) ঐরূপ সঙ্কটাবস্থায় নবীজীর (সঃ) বাহন হইতে পারিয়া মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভে ধন্য হইয়াছেন। আবু বকরের (রাঃ) এই শ্রেণীর ত্যাগ ও সেবাকে স্বয়ং নবীজী (সঃ) যেই ভাষায় স্বীকৃতি দিয়াছেন তাহা চির দিন ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন–

مَا لِاَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ اِلاَّ وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلاَ اَبَا بَكْرٍ فَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللّٰهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

অর্থ ঃ "আমার প্রতি যত মানুষের উপকারই রহিয়াছেন, প্রত্যেককেই আমি উহার প্রতিদান দিয়াছি একমাত্র আবু বকর ব্যতীত। আমার প্রতি তাঁহার এরূপ উপকার রহিয়াছে যাহার প্রতিদান আল্লাহ তাআলাই কেয়ামত দিবসে পূর্ণ করিবেন।" (তিরমিযী শরীফ)

(২) আলী (রাঃ), হিজরতের আয়োজন সফল করার মধ্যে তাঁহার ত্যাগ এবং অবদান ছিল অনেক বেশী। যেই শয্যায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যু কাফেররা একরূপ অবধারিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই শয্যার উপর স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দেহ পাতিয়া রাখিয়াছিলেন আলী (রাঃ)। এমনকি নবীজীর চাদরখানাও মুড়ি দিয়া ভেল্কি লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন অবরোধকারী ঘাতকদের চোখে! কত বড় আত্মত্যাগ ও অসীম সাহসের চরম দৃষ্টান্ত ছিল ইহা! যেকোন মুহূর্তে তাঁহার উপর অবরোধকারী ঘাতকদের তরবারি পতিত হইতে পারিত। কারণ, ঘাতক দল তাঁহাকেই নবীজী ভাবিয়া তাঁরে অবস্থিত গৃহকে কড়া দৃষ্টিতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

(৩, ৪) আস্‌মা (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ)– পিতা তাঁহাদেরকে ঘোর বিপদে শত্রুর মধ্যে ফেলিয়া পাড়ি দিলেন মৃত্যুর পথে। এই দুশ্চিন্তায় তাঁহাদের হৃদয়ে কী স্বাভাবিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইতে পারে তাহা সকলেরই বোধগম্য। কিন্তু তাঁহারা আদর্শ মুসলিম রমণীরূপে ধরাপৃষ্ঠে জন্মিয়াছিলেন তাই একিবন্দুও অধীর হইলেন না। বরং সেই চরম দুর্ভাবনার মধ্যে নবীজী ও পিতার জন্য পাথেয় প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের হাবভাবে কেহ ঘুর্ণাক্ষরেও বুঝিতে পারিল না– কিসের আয়োজন করিতেছেন তাঁহারা। কোথাও যদি বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটিত তবে সব আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইত– এই মহাযাত্রা হয়ত সম্ভব হইত না।

(৫) আবু বকর তনয় আবদুল্লাহ (রাঃ)– তিনি নিজ প্রাণের উপর ঝুঁকি লইয়া প্রত্যহ মক্কার সমুদয় সংবাদ পৌঁছাইয়াছেন নিভৃত সওর গুহায়। উহার উপর ভিত্তি করিয়াই তিন দিন তিন রাত্র পরে বাহির হইয়াছিলেন নবীজী মোস্তফা (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) গুহা হইতে মদীনার পানে।

(৬) আবু বকরের মুক্ত দাস আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) তিনি প্রত্যহ ঐ নিভৃত গুহায় আহার পৌঁছাইবার গোপন ব্যবস্থা করিয়া থাকিতেন।

ধন্য আবু বকর (রাঃ), আলী (রাঃ) ও আবু বকর পরিবার। তাঁহাদেরই আত্মত্যাগ, লক্ষ্য আদর্শের একমুখীতা, মনোবলরও কর্মকৌশল ইত্যাদি গুণাবলীর সমাবেশেই শত্রুদের বেষ্টন ভেদ করিয়া আল্লাহর আশ্রয়স্থলে যাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। কেয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমান তাঁহাদের নিকট ঋণী হইয়া থাকিবে।

হিজরত পর্বের এই পর্যন্ত বর্ণিত বিষয়াবলীর মৌলিক বর্ণনা সম্বলিত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত একখানা হাদীছ নিম্নে তরজমা করা হইল। হাদীছখানা অতি দীর্ঘরূপে বোখারী (রঃ) ৫২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় কতিপয় ঘটনা একত্রে সমাবেশিত আছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য আমরা প্রত্যেক ঘটনার অংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তরজমা করিয়াছি। নবুয়তের পঞ্চম বৎসর–আবিসিনিয়ায় হিজরত পরিচ্ছেদে "আবু বকরের আবিসিনিয়ায় হিজরত" আলোচনায় প্রথম অংশের তরজমা হইয়াছে। এস্থানে দ্বিতীয় অংশের তরজমা দেওয়া হইল।

১৭০৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫২৩) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মুসলমানদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমাদের হিজরত করিয়া যাওয়ার স্থানটি আমাকে স্বপ্নে দেখান হইয়াছে– তথায় খেজুর বাগানের আধিক্য রহিয়াছে এবং উহার উভয় পার্শ্বে কাঁকরময় ময়দান বিদ্যমান। মদীনার এলাকাটি উক্ত উভয় গুণেরই বাহক। সেমতে অনেক মুসলমানই মদীনায় হিজরত করিয়া গেলেন, এমনকি যাহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদেরও অধিকাংশই মদীনায় চলিয়া গেলেন। আবু বকর (রাঃ)ও মদীনায় হিজরত করিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি করিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাকে একটু থামিয়া যাইতে বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, আমি আশা করিতেছি, আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আমাকেও হিজরতের অনুমতি প্রদান করা হইবে। আবু বকর (রাঃ) হযরতের চরণে স্বীয় ত্যাগ কোরবানী পেশ করতঃ আশ্চর্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি সত্যই ঐরূপ আশা পোষণ করিতেছেন। হযরত নবী (সঃ) বলিলেন, হাঁ। এতদশ্রবণে আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহযাত্রী হওয়ার উদ্দেশে হিজরত মুলতবী রাখিলেন এবং হিজরত উদ্দেশে তাঁহার সংগৃহীত বিশেষ দুইটি উটকে ভালভাবে

বাবুল পাতা খাওয়াইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন– এ অবস্থায় চারি মাস কাটিল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা দ্বিপ্রহরের সময় আমার পিতা আবু বকরের (রাঃ) গৃহে আমরা বসিয়াছিলাম। এমতাবস্থায় আমাদের একজন আবু বকর (রাঃ)-কে সংবাদ দিল, ঐ দেখুন! (আপনার গৃহাভিমুখে) রসূলুল্লাহ (সঃ), (দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রের কারণে) তিনি সম্পূর্ণ মাথা কাপড়ে আবৃত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। এরূপ দ্বিপ্রহরে ইতিপূর্বে আমাদের গৃহে কখনও তিনি আসেন নাই। আবু বকর (রাঃ) খবরটা শুনামাত্র চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আমার পিতা-মাতা সর্বস্ব তাঁহার চরণে উৎসর্গীকৃত–তিনি নিশ্চয় কোন বিশেষ কারণে এই সময়ে আমার গৃহে তশরীফ আনিতেছেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইতিমধ্যে হযরত (সঃ) গৃহদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। তৎক্ষণাত সাদর সম্ভাষণ জানানো হইল। হযরত (সঃ) গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং আবু বকর (রাঃ)-কে বলিলেন, ঘর হইতে লোকজন বাহির করিয়া দেওয়া হউক। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, একমাত্র আপনার স্বজনগণই গৃহে আছেন, অন্য কেহ নাই। হযরত (সঃ) বলিলেন, বিশেষ খবর এই যে, আমাকে মক্কা হইতে হিজরত করিয়া যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আপনার চরণে আমার পিতা-মাতা সর্বস্ব উৎসর্গীকৃত– আপনি সঙ্গী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা রাখেন? হযরত (সঃ) বলিলেন, হাঁ। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার জনক-জননী আপনার চরণে উৎসর্গীকৃত– আপনি আমার উটদ্বয় হইতে একটি উট কবুল করুন। হযরত (সঃ) বলিলেন, কবুল করিলাম, কিন্তু মূল্যের বিনিময়ে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতপর আমরা তাঁহাদের জন্য তাড়াহুড়ার মধ্যে কিছু পাথেয়ের ব্যবস্থা করিলাম এবং কিছু খাদ্যবস্তু একটি থলিয়ার মধ্যে ভরিয়া দিলাম। (আয়েশার ভগ্নী) আসমা (রাঃ) কোমরবন্ধের কাপড়খানা হইতে এক অংশ ফাড়িয়া উহা দ্বারা ঐ থলিয়ার মুখ বাঁধিয়া দিলেন। (তিনি যে, আল্লাহর রসূলের খদমতের জন্য স্বীয় কোমরবন্ধ ছিঁড়িয়া দুই টুকরা করিয়াছিলেন, সেই ঘটনা চির স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে,) ঐ সূত্রেই তাঁহাকে "জাতুন নেতাকাইন"–"দুই কোমরবন্ধওয়ালী" বলা হইয়া থাকে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, (রাত্রি বেলা) হযরত (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) গোপনে গৃহ ত্যাগ করত সওর পর্বতের গুহায় পৌঁছিলেন এবং তথায় তিন রাত্র লুকাইয়া থাকিলেন। আবু বকরের এক ছেলে ছিল আবদুল্লাহ– সে ছিল যুবক এবং অতিশয় চালাক চতুর। সে সারা রাত্রি ঐ পর্বত গুহায় তাঁহাদের নিকট থাকিত, কিন্তু প্রভাতে অন্ধকার থাকিতেই মক্কা নগরীতে আসিয়া যাইত, যেন সে মক্কার ভিতরেই রাত্রি যাপন করিয়াছে। হযরত (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে কাফেররা যত কিছু ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করিত, সব কিছুর সংবাদ আবদুল্লাহ রাত্রি বেলা তাঁহাদিগকে অবগত করিয়া আসিতেন। আবু বকরের একজন ক্রীতদাস ছিল "আমের ইবনে ফোহায়রা", সে বকরীর দল চরাইয়া ঐ পাহাড়ের নিকট লইয়া যাইত এবং রাত্রির অন্ধকার আসিয়া গেলে তাঁহাদিগকে দুগ্ধ পৌঁছাইত, তাঁহারা ঐ দুগ্ধের উপর রাত্রি যাপন করিতেন। আমের ইবনে ফোহায়রা রাত্রির অন্ধকার থাকিতেই বকরীর দল লইয়া তথা হইতে মক্কা নগরীতে চলিয়া আসিত– প্রত্যহই সে এইরূপ করিত। এতদ্ভিন্ন হযরত (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) একজন সুবিজ্ঞ পথপ্রদর্শকও পূর্ব হইতেই মজুরির উপর ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং উভয়ের বাহন তাহার হাওয়ালা করিয়া দিয়া তাহাকে তিন রাত্র পর সওর পর্বতের নিকট উপস্থিত হইতে বলিয়া গিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি কাফেরই ছিল, কিন্তু তাহার উপর তাঁহাদের আস্থা ছিল।

নির্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী তিন রাত্র অতিবাহিত হইয়া প্রভাতেই সেই ব্যক্তি উটদ্বয় লইয়া সেই এলাকায় উপস্থিত হইল। (অবশ্য দিন অতিবাহিত হইবার পর রাত্রি বেলা সুযোগমতে) হযরত (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) পর্বতগুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনার পথে রওয়ানা হইলেন। ক্রীতদাস আ'মের ইবনে ফোহায়রা এবং পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। পথপ্রদর্শক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে (সাধারণ চলাচলের পার্বত্য পথে অগ্রসর না করিয়া লোহিত সাগরের) উপকূলবর্তী পথে পরিচালিত করিল।

১৭০৪। হাদীছ ঃ (৫৫৫) আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য (হিজরতের সময়) রাস্তায় খাইবার কিছু খাদ্য তৈয়ার করিলাম এবং উহা একটি থলিয়ার মধ্যে রাখিলাম। থলিয়ার মুখ বাঁধিবার জন্য আমি আমার আব্বা আবু বকর (রাঃ)-কে বলিলাম, বাঁধিবার কিছু পাইতেছি না, একমাত্র আমার কোমর বাঁধিবার কাপড়টা আছে। আব্বা বলিলেন, উহাই দুই খণ্ড করিয়া নাও। আমি তাহাই করিলাম (এবং এক খণ্ড আমার কোমরবন্ধের কাজে রাখিলাম, অপর খণ্ডের দ্বারা ঐ খাদ্যের থলিয়া এবং পানির মশকের মুখ বাঁধিয়া দিলাম।) সেই সূত্রেই আমাকে দুই কোমরবন্ধওয়ালী বলা হইয়া থাকে।

আবু বকরের সদা সতর্কতা

আবু বকর (রাঃ) বহিরাঞ্চলে নবীজী (সঃ) অপেক্ষা অধিক পরিচিত ছিলেন। কারণ, তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। দেশ-বিদেশের লোকজনের সহিত তাঁহার পরিচয় হইত। সেমতে হিজরতের-পথে এমন লোকদের সহিত সাক্ষাত হইত যাহারা আবু বকর (রাঃ)কে চিনিত, কিন্তু নবী (সঃ)-কে চিনিত না। ঐরূপ কোন কোন লোক আবু বকর (রাঃ)-কে নবী (সঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিত– আপনার অগ্রবর্তী লোকটি কে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আব বকর (রাঃ) বলিতেন, هذا الرجل يهدينى السبيل "এই ব্যক্তি আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।"

প্রশ্নকারী ভাবিত, দুনিয়ার পথ প্রদর্শক, আর আবু বকর (রাঃ) আখেরাতের পথ উদ্দেশ করিতেন। এইভাবে নবীজীর (সঃ) পরিচয় গোপন থাকিয়া যাইত– ঐ সময় যাহার অত্যধিক প্রয়োজন ছিল অথচ আবু বকর (রাঃ)-কে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইত না। মিথ্যার আশ্রয় না লইয়া নবীজীর (সঃ) পরিচয় গোপন রাখার এক কৌশল ছিল। এই শ্রেণীর কৌশলকে শরীয়ত মতে "তৌরিয়া" বলা হয়। কাহারও কোন ক্ষতি না হয়– শুধু নিজের স্বার্থ রক্ষায় ঐরূপ কৌশল অবলম্বন জায়েয ইহাকে ধোকা বলা যাইবে না। অবশ্য এইরূপ কৌশলে কাহারও ক্ষতি হইলে তাহা ধোকা বলিয়া গণ্য হইবে এবং নাজায়েয হইবে।

মদীনার পথে বিপদ

মক্কার মোশরেকেরা নবীজী (সঃ)-কে অনেক খুঁজিয়াও যখন পাইল না তখন তাহারা অন্য এক কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা সর্বত্র ঘোষণা জারি করিয়া দিল– মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও আবু বকরকে বন্দী বা নিহত করিতে পারিলে কোরায়শরা উভয়ের বিনিময়ে এক একশত উট পুরস্কার প্রদান করিবে। এই ঘোষণা তাহারা বিভিন্ন দলপতি এবং বিশিষ্ট লোকদের নিকটও বিশেষভাবে পৌঁছাইল।

কাফের-মোশরেকেরা ত নবীজীর (রাঃ) সর্বদার শত্রু আছেই, তদুপরি দুই শত উটের লালসা; অতএব নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ)-কে পাইবার প্রতি তৎকালীন আরবীয় দস্যু প্রকৃতির লোকদের কিরূপ আগ্রহ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আরবের "বনু মোদলাজ" গোত্র;কোরায়শরা তাহাদের নিকটও লোক পাঠাইয়া উক্ত ঘোষণার সংবাদ পৌঁছাইল! ঐ গোত্রেরই এক দুর্ধর্ষ ব্যক্তি সোরাকা ইবনে মালেক; ঐ ঘোষণার সংবাদ সেও অবগত ছিল। একদিন তাহারই বংশীয় একজন লোক হঠাৎ বহু দূর হইতে নবীজীর (সঃ) কাফেলা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাত তাহাকে অবহিত করিল। সোরাকা দুই শত উটের পুরস্কার একা লাভ করিবার উদ্দেশে কৌশলের সহিত গোপনে অস্ত্র লইয়া কাফেলার পিছনে ধাওয়া করিল।

আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সোরাকা যখন আমাদের অতি নিকটবর্তী আসিয়া গেল, তখন আমি অস্থির হইয়া বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের পিছনে ধাওয়াকারী আমাদেরকে পাইয়া ফেলিল! এই কথা

বলিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। নবীজী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁদ কেন? আমি আরজ করিলাম, আমার জীবনের জন্য কাঁদি না, আপনার চিন্তায় কাঁদিতেছি। নবী (সঃ) সম্পূর্ণ শান্ত অবিচল কিন্তু আমার হতাশাদৃষ্টে আল্লাহ তাআলার দরবারে ফরিয়াদ করিলেন–

اَللّٰهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ اَللّٰهُمَّ اصْرَعْهُ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তাহার বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষ হইতে তুমিই যথেষ্ট হইয়া যাও। হে আল্লাহ! তাহাকে পাছাড়ে পতিত কর।" অমনি তাহার ঘোড়ার পা পেট পর্যন্ত পার্বত্য পাথর জমিতে গাড়িয়া গেল। সে ব্যাপারটা ভালরূপেই বুঝিতে পারিল, তাই চীৎকার করিয়া বলিল, নিশ্চয় আপনাদের বদ দোয়ায় আমার এই বিপদ আসিয়াছে। আমার জন্য দোয়া করুন আমি মুক্তি পাইয়া যাই। আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করিব না, বরং আপনাদের হইতে শত্রু বিতাড়নে সাহায্য করিব। হযরত (সঃ) তাহার মুক্তির জন্য দোয়া করিলেন এবং তাহাকে কথা বলার সুযোগ দানে দাঁড়াইলেন।

সোরাকা নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ সময়ই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) জয়ী হইবেন। আমি তাঁহাদের প্রতি লোকদের বিষাক্ত মনোভাব তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিলাম এবং আমার বিভিন্ন বস্তু সামগ্রী পাথেয় ইত্যাদি গ্রহণের অনুরোধ করিলাম; তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। এমনকি আমি বলিলাম, অমুক স্থানে আমার মেষপাল রহিয়াছে, আপনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী উহা হইতে নিয়া যাইবেন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমার প্রয়োজন হইবে না। তিনি আমাকে শুধু এই বলিলেন, আমাদের সংবাদ গোপন রাখিও! আমার অভিপ্রায় মতে তিনি একটা চামড়া খণ্ডে আমার জন্য নিরাপত্তা পত্রও লিখিয়া দিলেন। ঘটনার মূল ব্যক্তি সোরাকা ইবনে মালেকের ভ্রাতার মাধ্যমে ভ্রাতুষ্পুত্র আবুদুর রহমান হইতে বোখারী (রঃ) নিম্নের হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন– যাহা মূল কিতাবে ১৭০৩ নং হাদীছের সঙ্গেই রহিয়াছে।

১৭০৫। হাদীছ ঃ সোরাকা ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের নিকট কোরায়শ কাফেরদের প্রেরিত লোক উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ জ্ঞাত করিল যে, কোরায়শরা রসূলুল্লাহ এবং আবু বকরকে হত্যা বা বন্দী করার উপর (প্রত্যেকের জন্য) একশত উট পুরস্কার দানের ঘোষণা করিয়াছে।

অতপর একদিন আমি আমার গোত্রীয় লোকদের সঙ্গে বসিয়া খোশগল্প করিতেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আসিয়া আমায় খবর দিল যে, আমি উপকুলবর্তী পথে কতিপয় পথিকের গমন লক্ষ্য করিয়াছি; আমার মনে হয় মুহাম্মদ এবং তাহার সঙ্গীগণই হইবে। সোরাকা বলেন, আমি তখন পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া নিলাম যে, সেই পথিকগণ তাঁহারাই হইবেন, কিন্তু ঐ খবরদাতা ব্যক্তিকে পুরস্কার লাভের সুযোগ গ্রহণ হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশে প্রবঞ্চনাস্বরূপ বলিলাম, ঐ পথিকগণ তাঁহারা নহেন, বরং ঐ পথিকগণ হইতেছে অমুক অমুক, কিছু সময়ের জন্য খবরটার প্রতি তৎপরতা না দেখাইয়া সকলের সঙ্গে বসিয়া থাকিলাম। তারপর তথা হইতে উঠিয়া বাড়ী আসিলাম এবং আমার এক দাসীকে বলিলাম, আমার ঘোড়াটা বাড়ী হইতে বাহির করিয়া অমুক স্থানে আড়ালে নিয়া রাখ এবং আমি আমার বল্লমটা হাতে লইয়া বাড়ীর পিছন দিকের পথে বাহির হইলাম, এমনকি বল্লমটার ফলক নীচের দিকে রাখিয়া শোয়াইয়া নিয়া চলিলাম। (উদ্দেশ্য গোপন রাখার জন্য এইসব ব্যবস্থা; যেন অন্য কেহ সঙ্গী হইয়া পুরস্কারের অংশীদার না হইয়া বসে।)

এইরূপ গোপনভাবে আমি আমার ঘোড়ার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং উহার উপরে আরোহণ করিয়া দ্রুতগতিতে চালাইলাম, এমনকি অল্প সময়ের মধ্যে আমি ঐ পথিকদের নিকটে পৌছিয়া গেলাম। এমতাবস্থায় আমার ঘোড়াটি হোঁচট খাইয়া গেল এবং আমি উহার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া আমি আমার তীরদান হইতে গণনকার্যের তীর বাহির করিয়া গণনা করিয়া দেখিলাম আমি উদ্দেশে সফলকাম হইব কিনা। গণনার ফলাফল আমার মনোবাঞ্ছা বিরোধী বাহির হইল, কিন্তু আমি গণনার ফলাফলের পায়রবী না করিয়া পুনঃ ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া উহাকে দ্রুত অগ্রসর করিলাম এবং এত নিকটবর্তী হইয়া গেলাম যে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনিতে

লাগিলাম। তিনি কিন্তু পিছনের দিকে মোটেও তাকান না, অবশ্য আবু বকর (রাঃ) বার বার (পিছনে আমার দিকে) তাকাইতে ছিলেন। ইতিমধ্যে আমার ঘোড়ার সম্মুখের পা দুইটি হাঁটু পর্যন্ত (পাথরীর) যমীনের মধ্যে গাড়িয়া গেল এবং আমি উহার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলাম। অতপর আমি উহাকে সজোরে হাঁকাইলাম, ঘোড়াটি উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পা দুইখানা উঠাইতে সক্ষম হইতেছিল না। অবশ্য অতি কষ্টে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, যে স্থানে তাঁহার পা গাড়িয়া গিয়াছিল তথা হইতে ধুলা-বালু ধুঁয়ার ন্যায় আকাশের দিকে উঠিতেছে। তখন পুনরায় আমি গণনকার্যের তীর দ্বারা গণনা করিলাম, এইবারও ফলাফল আমার মনোবাঞ্ছা বিরোধীই বাহির হইল। তখন আমি তাঁহাদের প্রতি আমার পক্ষ হইতে নিরাপত্তা দানের ধ্বনি উচ্চারণ করিলাম। সেমতে তাঁহারা দাঁড়াইলেন। আমি ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া তাঁহাদের নিকট পৌঁছিলাম। আমি যখন তাঁহাদের নিকট পৌঁছিতে বিপদগ্রস্ত হইতেছিলাম, তখন আমার অন্তরে এই কথাই জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আন্দোলনটা অচিরেই প্রাধান্য লাভ করিবে, তিনি নিশ্চয় জয়ী হইবেন।

অতপর আমি তাঁহাকে জানাইলাম, আপনার দেশবাসী আপনার বিনিময়ে একশত উট পুরস্কার দানের ঘোষণা জারি করিয়াছে। তাঁহাকে আমি লোকদের সমুদয় ইচ্ছা-এরাদার বিস্তারিত বৃত্তান্তও শুনাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহাদের খেদমতে খাদ্য এবং আবশ্যকীয় বস্তু পেশ করিলাম, কিন্তু তাঁহাদের জন্য কোন কিছুই আমার ব্যয় করিতে হইল না। তাঁহারা আমার নিকট কোন অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিলেন না শুধুমাত্র একটি কথা হযরত (সঃ) আমাকে বলিলেন– আমাদের সংবাদটা গোপন রাখিও। তখন আমি হযরতের খেদমতে আরজ করিলাম, আমার জন্য একটি নিরাপত্তা-দানপত্র লিখিয়া দিন। হযরত (সঃ) আ'মের ইবনে ফোহায়রাকে লিখিবার আদেশ করিলেন। তিনি একটি চর্ম খণ্ডে উহা লিখিয়া দিলেন। তারপর হযরত (সঃ) চলিয়া গেলেন। (আমি ফিরিয়া আসিলাম)।

সোরাকা ইবনে মালেকের ইসলাম গ্রহণ

সোরাকা নবীজী (সঃ)-এর কাফেলাকে বিদায় দিয়া বাড়ীর পথ ধরিল। সে তাহার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী যে কোন মানুষকে নবীজীর তালাশকারী পাইত তাহাকেই বলিত, আমি অনেক তালাশ করিয়াছি; তোমার তালাশের প্রয়োজন হইবে না। যখন এই সংবাদ প্রচার হইয়া গেল যে, নবী (সঃ) মদীনায় পৌঁছিয়া সারিয়াছেন তখন সোরাকা তাহার পূর্ণ কাহিনী লোকদের নিকট বর্ণনা করা আরম্ভ করিল। কিভাবে সে নবীজীর কাফেলার পিছনে ধাওয়া করিল, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের দৃঢ় মনোবল ও অবিচল ভরসা কিরূপ দেখিল এবং তাঁহার ঘোড়ার সমুদয় ঘটনা কিরূপ ঘটিল– এই সব সে সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিল।

সোরাকার বর্ণিত ঘটনাবলী দেশময় ছড়াইয়া পড়িল;কোরায়শ দলপতিরা ইহাতে দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল যে, এইরূপ অলৌকিক ঘটনা শ্রবণে অনেক লোক মুসলমান হইয়া যাইবে। সোরাকা একজন সম্ভ্রান্ত লোক, তিনি বনু মোদলাজ গোত্রের বিশিষ্ট বিত্তশালী সমাজপতি ছিলেন। তাঁহার বিবৃতিতে ইসলাম প্রসারের আশঙ্কা করিয়া আবু জাহল কাব্যের মাধ্যমে তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিল–

بَنِىْ مُدْلَجٍ اِنِّىْ اَخَافُ سَفِيْهَكُمْ ـ سُرَاقَةَ مُسْتَغْوٍ لِنَصْرِ مُحَمَّدٍ
عَلَيْكُمْ بِهِ اَلاَّ يُفَرِّقَ جَمْعَكُمْ ـ فَيُصْبِحُ شَتّٰى بَعْدَ عِزٍّ وَّسُوْدَهٖ ـ

অর্থ ঃ "হে বনু মোদলাজ গোত্র। তোমাদের বাকা সোরাকা সম্পর্কে আমার আশঙ্কা হয়! সে লোকদের বিভ্রান্ত করিয়া মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম) সাহায্যের পথে আকৃষ্ট করিবে। তোমরা সতর্ক

থাকিও, সে যেন তোমাদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিতে না পারে। অন্যথায় তোমাদের বংশ প্রাধান্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের পর দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যাইবে।

সোরাকা এই সতর্কবাণীর উত্তরে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া কবিতা প্রচার করিল–

أَبَا حَكَمٍ وَاللّٰهِ لَوْ كُنْتَ شَاهِداً ـ لأَمْرِ جَوَادِي اِذْ تَسُوخُ قَوَائِمُه

عَجِبْتَ وَلَمْ تَشْكُكْ بِاَنَّ مُحَمَّداً ـ رَسُولٌ وَبُرْهَانٌ فَمَنْ ذَا يُقَاوِمُه ـ

عَلَيْكَ فَكُفَّ الْقَوْمَ عَنْهُ فَاِنَّنِي ـ اَخَالُ لَنَا يَوْماً سَتَبْدُوْ مَعَالِمُه ـ

অর্থ ঃ "হে আবুল হাকাম (আবু জাহল)! খোদার কসম, তুমি যদি উপস্থিত থাকিতে আমার ঘোড়ার ঘটনার সম্মুখে * যখন উহার পাগুলি গাড়িয়া গিয়াছিল; তবে তুমিও আশ্চর্যান্বিত হইতে এবং তোমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিত না এই বিষয়ে যে, মুহাম্মদ রসূল এবং সত্যের উজ্জ্বল প্রমাণ । এমন কে আছে যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে? তুমি যাও– লোকদিগকে তাঁহার হইতে বিরত রাখার চেষ্টা কর; আমার ত ধারণা– অচিরেই এমন দিন আমাদের সম্মুখে আগত যেদিন তাঁহার প্রাধান্যের ও বিজয়ের নিদর্শনসমূহ দিবালোকের ন্যায় প্রকটিত হইয়া উঠিবে।" (বেদায়া, ৩–১৮৭)

আরবের পৌত্তিলিকদের মধ্যে তৎকালে আত্মীগর্ব আত্মশ্লাঘা অত্যধিক ছিল। নিজেদের নীতি ও কৃষ্টি ত্যাগ করা তাহাদের জন্য কঠিন ছিল। নবীজীর (সঃ) পিতৃব্য খাজা আবু তালেব নবীজীর (সঃ) সত্যবাদিতায় পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু নিজ পূর্বপুরুষদের নীতি ও কৃষ্টি রক্ষায় এতই দৃঢ় ছিলেন যে, শত বুঝিয়াও মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান গ্রহণ করিলেন না। সোরাকার অবস্থাও প্রায় সেইরূপই হইতে যাইতেছিল। সে নিজের ঘটনার অলৌকিকতার দ্বারা নবীজীর রসূল হওয়ার পক্ষে আবু জাহলকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছে, কিন্তু সব কিছু জানিয়াও ঈমান গ্রহণে অনেক বিলম্ব করিয়াছে।

হিজরতের ঘটনার সাত বৎসর পর অষ্টম বৎসরে মক্কা বিজয়ের সংলগ্নে হোনায়ন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মক্কা হইতে ১২/১৩ মাইল ব্যবধানে "জেয়ে'ররানা" নামক স্থানে নবীজী (সঃ) অবস্থানরত ছিলেন। তখন নবীজীর চতুর্দিকে কত ভিড়! লোকে লোকারণ্য– এই সময় সোরাকা তথায় উপস্থিত ছিলেন। নবীজী (সঃ) প্রদত্ত চর্ম খণ্ডে লিখিত নিরাপত্তানামা তখনও তাহার নিকট সুরক্ষিত ছিল। লোকেরা তাহাকে নবীজীর (সঃ) নিকট যাইতে বাধা দিতেছিল, তাই সে দূর হইতে নিরাপত্তানামাসহ হস্ত উত্তোলনপূর্বক উচ্চকণ্ঠে বলিল, ইয়া

*** সমালোচনা** "মোস্তফা চরিত" গ্রন্থের সঙ্কলক আকরম খাঁ মরহুমের কুঅভ্যাস নবীগণের মোজেযা বা অস্বাভাবিক ঘটনাবলী অস্বীকার করা। তাঁহার এই কুঅভ্যাসটা বাতিক রোগ অপেক্ষা অধিক নিরারোগ্য। ঐ শ্রেণীর সামান্য ঘটনার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁহার স্বভাব ভুলেন না।

সোরাকা ইবনে মালেকের আলোচ্য ঘটনায় তাহার ঘোড়ার সম্মুখ পদদ্বয় গাড়িয়া যাওয়ার চিত্রকে তিনি তাঁহার সঙ্কলনে যে ভাষায় তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রচেষ্টা একমাত্র ইহাই যে, ঘটনাটা নিছক স্বাভাবিক ছিল– ইহাতে অস্বাভাবিকতার কিছুই ছিল না। তাঁহার বক্তব্য এই–" সোরাকা দিগ্বিদিক না দেখিয়া ঘোড়া ছুটাইয়াছিল, ঘোড়াটাও লম্ফন কুর্দনপূর্বক বাধাবিঘ্নগুলি উল্লম্ফন করিতে করিতে তীর বেগে ছুটিয়াছিল– এই উত্তেজনা ও অসতর্কতার ফলে ঘোড়ার সম্মুখ পদদ্বয় ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেল।"

নবীর অস্বাভাবিক ঘটনা মোজেযাকে স্বাভাবিক বানাইবার অপচেষ্টা খাঁ মরহুমের উল্লম্ফন কুর্দন দেখিলে হাসি আসে। ঘটনা ত বাংলাদেশের বিল অঞ্চলে কাদা ও নরম মাটির মধ্যে নহে যে, লম্ফন উল্লম্ফনে স্বাভাবিকভাবে ঘোড়ার পা ভূমিতে প্রোথিত হইয়া যাইবে। ঘটনা ত আরব দেশের পার্বত্য পাথরী যমীনের; সেখানে লম্ফন উল্লম্ফনে ঘোড়ার পা, তাহাও পিছনের পদদ্বয় নহে– শুধু সম্মুখ পদদ্বয় প্রোথিত হইয়া যাওয়া এবং উহা স্বাভাবিকভাবে হওয়ার দাবী একমাত্র পাগলেই করিতে পারে। বিশেষত বোখারী শরীফের হাদীছেই স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, শক্ত পাথরী যমীনে ঘোড়ার পা গাড়িয়া গিয়াছিল।

সর্বোপরি ঘটনার মূল সোরাকা, যিনি এ ঘোড়ার পৃষ্ঠে ছিলেন, তিনি তাঁহার কাব্যে উক্ত ঘটনাকে অস্বাভাবিক সাব্যস্ত করিয়া নবীজীর (সঃ) রসূল ওয়ার প্রমাণরূপে আবু জাহলকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন– ইহার মোকাবিলায় খাঁ মরহুমের কুর্দন উল্লম্ফন কি কোন ফলদায়ক হইবে?

রসূলাল্লাহ! এই যে, আপনার দেওয়া লিখিত নিরাপত্তানামা আমার নিকট রহিয়াছে; আমি সোরাকা ইবনে মালেক। নবীজী (সঃ) বলিলেন, যাহাকে যে কথা দেওয়া হইয়াছে আজ তাহা পূরণ করিবার দিন; এই বলিয়া নবীজী (সঃ) সোরাকাকে তাঁহার নিকটে পৌছিবার সুযোগ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। সোরাকা নবীজী মোস্তফার (সঃ) চরণে শরণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিলেন; এখন তিনি সোরাকা ইবনে মালেক (রাঃ)। (সীরাতে ইবনে হেশাম)

দস্যু দলের আক্রমণ

রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ)কে বাগে না পাইয়া কোরায়শরা খুবই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। তাহারা পূর্ব হইতে জানিত রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায়ই যাইবেন, তাই তাঁহাদের প্রত্যেককে হত্যা বা বন্দী করার জন্য একশত উট পুরস্কারের ঘোষণাটা মদীনা যাওয়ার পথের এলাকাসমূহে জোরালোভাবে প্রচার করা হইয়াছে।

সেই বৃহৎ পুরস্করের আশায় আসলাম গোত্রের প্রধান "বোরায়দা" ৭০ জন দুর্ধর্ষ ব্যক্তিকে লইয়া নবীজীর (সঃ) কাফেলার খোঁজে বাহির হইল। খোঁজ পাইয়াও বসিল। এমনকি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ক্ষুদ্র কাফেলার সহিত তাহাদের সাক্ষাত হইল। কি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত! কি ভয়াবহ দৃশ্য!

একদিকে ৭০ জন দুর্ধর্ষ সশস্ত্র দস্যু বিদ্বেষ ও প্রলোভনে উত্তেজিত উৎসাহিত এবং যাঁহাদের মুণ্ডপাতে শ্রেষ্ঠ পুণ্য ও দুই শত উট লাভের আশা, তাঁহাদেরকে বাগে পাইয়া বসিয়াছে। অপর দিকে নিরস্ত্র নিরীহ মাত্র চার জন লোক– তাহার মধ্যেও একজন বিধর্মী এবং তাঁহারা ভীত সন্ত্রস্ত পলাতক পথিক– ঐ দুস্য দলের কবলে পতিত।

এই অবস্থায় মানুষের কল্পনায় নবীজীর রক্ষাপ্রাপ্তি সম্ভবপর বিবেচিত হইতে পারে কি? এহেন ঘোর বিপদ মুহূর্তেও নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ধীরস্থিরতায় এবং স্বর্গীয় গাম্ভীর্যে বিন্দুমাত্র শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় নাই। এই আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়ানো অবস্থায় একটু চাঞ্চল্য বা অধৈর্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আল্লাহর কার্যে নীরব-অবিচল আত্মনিয়োগ এবং আল্লাহ-নির্ভরতার এই প্রভাব যে– রক্ষা করার সকল ভার এবং সমস্ত ভাবনা একমাত্র আল্লাহর উপর ন্যস্ত। কর্তব্যের এই সাধনা এবং বিশ্বাসের এই তেজ ও ঈমানের এই শক্তিই হইল ঐ অসাধারণ সাহস ও দৃঢ়তার মূল উৎস।

কী প্রশান্ত চিত্ত, প্রশস্ত হৃদয়! দস্যু দলপতি বোরায়দা নবীজীর (সঃ) সম্মুখে আসিতেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) ধীর কণ্ঠে শান্ত স্বরে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে বলিল, বোরায়দা। "বোরায়দা" শব্দ "বার্দ" ধাতু হইতে এবং বার্দ অর্থ শীতলতা, শান্তি; এই সূত্রে তাহার নাম হইতে নবী (সঃ) শুভলক্ষণ* গ্রহণপূর্বক আবু বকর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমাদের কার্যে শান্তি ও শীতলতা লাভ হইবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ গোত্রের? সে বলিল, "আসলাম" গোত্রের। "আসলাম" শব্দ "সেল্ম" ধাতু হইতে, যাহার অর্থ নিরাপত্তা নিষ্টন্টকতা। ইহা হইতেও শুভলক্ষণ গ্রহণপূর্বক নবী (সঃ) বলিলেন, আমাদের কন্টক দূর হইবে, নিরাপত্তা লাভ হইবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন বংশ-শাখার, সে বলিল, "বনু সাহ্‌ম" হইতে। "সাহ্‌ম" অর্থ তীর। নবী (সঃ) বলিলেন, হে আবু বকর! তোমার সৌভাগ্যের তীর আগত।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রশান্তে দস্যু দলপতিকে ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিল, তাহার সর্বাঙ্গে শিথিলতা ও শীতলতা আসিয়া গেল; দুস্যতার পরিবর্তে এখন তাহার মধ্যে বন্ধুত্বের ভাব ফুটিয়া উঠিল। শান্ত কণ্ঠে কোমল স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার পরিচয় কি? নবীজী (সঃ) আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠতাপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন– انا محمد بن عبد الله رسول الله "আমি আবদুল্লাহর

* যেকোন বস্তু হইতে শুভলক্ষণ গ্রহণ করা জায়েয আছে, কিন্তু কোন কিছু হইতেই কুলক্ষণ গ্রহণ করা জায়েয নাই।

পুত্র মুহাম্মদ– আল্লাহর রসূল” (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। বোরায়দা নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না, প্রেম-পুণ্যে উদ্ভাসিত নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্বর্গীয় দৃষ্টির তীর তাহার অন্তরে বিদ্ধ হইয়া গেল। সে দমিত ও নমিত, কিন্তু আত্মবলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা দিয়া উঠিল–

আশ্‌হাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ।

দলপতি বোরায়দার ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহচররাও ইসলাম গ্রহণে নবীজীর (সঃ) চরণে লুটাইয়া পড়িল। কী অপূর্ব দৃশ্য! এক / দুই জন নহে–৭০ জন রক্ত-মাতাল হিংস্র শত্রু মুহূর্তের মধ্যে বশীভূত হইয়া মিত্রে পরিণত হইয়া গেল। সত্যের বল-শক্তি এইরূপই হয়–জাদুমন্ত্রের শক্তিও উহার সম্মুখে তুচ্ছ।

বোরায়দা (রাঃ) অবনত মস্তকে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করিলেন যে, তাঁহারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন; কোন প্রকার বাধ্য হইয়া নহে। নবীজী (সঃ) রাত্রির বিশ্রাম শেষে ভোর বেলা যাত্রা করিলেন। তখন বোরায়দা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার কাফেলা উড্ডীয়মান বিজয় পতাকার সহিত মদীনায় প্রবেশ করিবে। সেমতে বোরায়দা (রাঃ) নিজ আমামা–শিরস্ত্রাণ দ্বারা তাঁহার বর্শা ফলকে ইসলামের বিজয় নিশান তৈয়ারী করিয়া মহা উৎসাহে বীর দর্পে অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। মদীনা বেশী দূরে নহে; কাফেলাওয়ালাদের মনে কতই না পুলক ও কৌতূহল! নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে কেন্দ্র করিয়া চলিয়াছেন সকলে; আর বোরায়দা (রাঃ) অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন ইসলামের বিজয় পতাকা বহন করিয়া। এই মনোহর দৃশ্য সমেতই কাফেলা পৌঁছিল মদীনার উপকণ্ঠে।

(যোরকানী, ১–৩৫০)

মদীনার পথে খাদ্যের ব্যবস্থা

আবু বকর (রাঃ) গৃহ ত্যাগকালে কিছু পাথেয় সঙ্গে লইয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন পথিমধ্যেও সুযোগমত আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐরূপ একটি ঘটনা এই–

১৭০৬। হাদীছ ঃ বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন মদীনাপানে যাইতেছিলেন তখন সোরাকা ইবনে মালেক নামক এক ব্যক্তি তাঁহার পিছনে ধাওয়া করিল। হযরত নবী (সঃ) তাহার প্রতি বদ দোয়া করিলেন। তৎক্ষণাত ঐ ব্যক্তির বাহন ঘোড়ার পা যমীনে গাড়িয়া গেল! সে ভয় পাইয়া হযরত (সঃ)-কে অনুরোধ করিতে লাগিল, আপনি আমার জন্য দোয়া (করিয়া আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার) করুন: আমি আপনার কোন অনিষ্ট করিব না। হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাহার জন্য দোয়া করিলেন। সে মুক্তি পাইয়া গেল।

অতপর হযরত (সঃ) পিপাসা অনুভব করিলেন, এমতাবস্থায় এক রাখালের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিলেন; সঙ্গী আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তখন আমি একটি পাত্র লইয়া ঐ রাখালের নিকট হইতে কিছু দুগ্ধ দোহাইয়া আনিলাম। হযরতের নিকট সেই দুগ্ধ পেশ করিলে তিনি তাহা পান করিলেন, যাহাতে আমার অন্তর আনন্দে ভরিয়া গেল।

১৭০৭। হাদীছ ঃ (৫১৫) আ'যেব (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এবং হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মক্কা হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং শত্রু কাফেররা আপনাদের তালাশে পিছনে ধাওয়া করিল, তখন আপনারা কি করিয়াছিলেন? আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, মক্কা হইতে (মক্কার এলাকাস্থ সওর পর্বত গুহায় তিন দিন লুকাইয়া থাকার পর তথা হইতে রাত্রি বেলা) বাহির হইয়া আমরা সারা রাত্র পথ চলিলাম এবং পরের দিনও চলিলাম; যখন উত্তাপময় দ্বিপ্রহরের সময় উপস্থিত হইল তখন আমি বিশ্রামের উদ্দেশে ছায়ার জন্য চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম এবং বড় একটি পাথরের ছায়া দেখিতে পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। তথাকার জায়গাটা একটু সমান করিয়া বিছানা বিছাইয়া দিলাম এবং হযরত

নবী (সঃ)-কে আরাম করার অনুরোধ জানাইলাম। নবী (সঃ) আরাম করিলেন এবং আমি চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম এই উদ্দেশে যে, শত্রু দলের পক্ষ হইতে আমাদের তল্লাশকারী কাহাকেও দেখা যায় কি-না।

হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, এক বকরীর রাখাল তাহার বকরী দল হাঁকাইয়া এই পাথরের দিকে নিয়া আসিতেছে; তাহারও উদ্দেশ উহাই যে উদ্দেশে আমরা পাথরটির নিকট আসিয়াছি। আমি তাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মালিক কে? সে তদুত্তরে কোরায়শ বংশের এমন এক লোকের নাম উল্লেখ করিল যে আমার পরিচিত। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার বকরী পালের মধ্যে দুগ্ধবতী বকরী আছে কি? সে বলিল, হা আছে। আামি বলিলাম, আমাদের জন্য দুগ্ধ দোহাইয়া দিবে কি? সে বলিল, হাঁ দিব এবং একটি বকরী সেই উদ্দেশে বাঁধিয়া রাখিল। বকরীর স্তন হইতে ধুলা-বালু ভালরূপে ঝাড়িয়া ফেলার অতপর তাহার হাতদ্বয় ভালরূপে ঝাড়িতে বলিলাম। সে তাহা করিয়া আমার জন্য দুগ্ধ দোহাইল। সেই দুগ্ধ আমি একটি পাত্রের মুখে কাপড় রাখিয়া ছাঁকিয়া এবং উহার মধ্যে পানি ঢালিয়া উপর হইতে নীচ পর্যন্ত সুশীতল ঠাণ্ডা করিলাম, অতপর তাহা লইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিলাম। দেখিলাম, হযরত (সঃ) নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া উঠিয়াছেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! দুগ্ধ পান করুন। হযরত তৃপ্তির সহিত ঐ দুগ্ধ পান করিলেন। আমি তাহাতে খুবই আনন্দিত হইলাম। তারপর আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূল্লাল্লাহ (সঃ)! এই সময় কি পুনঃ যাত্রা আরম্ভ করিবেন? হযরত (সঃ) বলিলেন, হাঁ। সেমতে আমরা যাত্রা করিলাম।

এদিকে মক্কাবাসীগণ আমাদের খোঁজে লাগিয়া আছে, কিন্তু তাহারা আমাদিগকে বাগে পায় নাই। অবশ্য একমাত্র সোরাকা ইবনে মালেক নামক ব্যক্তি আমাদের খোঁজ পাইল এবং দ্রুত ঘোড়া হাঁকাইয়া আমাদের নিকটে চলিয়া আসিল। তখন আমি আতঙ্কিত অবস্থায় আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ। পিছনে ধাওয়াকারী আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। হযরত (সঃ) ধীর স্থিরতার সহিত বলিলেন, কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা করিও না– আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।

মদীনার পথে নবীজীর কাফেলা আরও কয়েক স্থানে দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করিয়াছিল। ঐ সবের বিবরণ এই

উম্মে মা'বাদের কুটিরে নবীজীর (সঃ) কাফেলা

নবীজীর (সঃ) কাফেলা "কোদায়দ" নামক বস্তিতে পৌঁছিল। তথায় একটি কুটিরে উম্মে মা'বাদ পরিবার বাস করিত। উম্মে মা'বাদ এক পুণ্যাত্মা বৃদ্ধা, তাহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। সে তাহার গৃহাঙ্গনে বসিয়া থাকিত, শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিকদের খাদ্য-পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করিত, তাহাদের সেবা করিত।

ঐ এলাকায় তখন খুব অভাব, অনাবৃষ্টির দরুন ঘাস-পাতারও খুব অভাব। তাই পশুপালের অবস্থাও অতিশয় সূচনীয়। উম্মে মা'বাদের স্বামী মেষপাল চরাইতে বহু দূরে কোথাও চলিয়া গিয়াছে। এই সময় নবীজীর (সঃ) কাফেলা ঐ কুটীর পৌঁছিল এবং তাহারা দুগ্ধ, গোশত বা খেজুর যাহাই হউক ক্রয় করিতে চাহিলেন। উম্মে মা'বাদ বলিল, আমার নিকট পানাহারের কিছু থাকিলে আমি আপনাদের আতিথেয়তায় কার্পণ্য করিতাম না, আমি নিজেই আপনাদের সেবা করিতাম, আপনাদের মূল্য দিতে হইত না।

নবী (সঃ) লক্ষ্য করিলেন, কুটিরের এক প্রান্তে অতি কৃশ ও দুর্বল একটি ছাগী শুইয়া আছে। নবীজী (সঃ) উম্মে মা'বাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ ছাগীটির কি অবস্থা? সে বলিল, উহা এতই দুর্বল যে, মেষপালের সঙ্গে চরিতে যাওয়ার বলও পায় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাতে দুগ্ধ আছে কি? সে বলিল, উহা দুগ্ধ দানের সম্ভাবনা হইতেও অনেক অধম। তারপরও নবীজী (সঃ) উম্মে মা'বাদকে বলিলেন, ঐ ছাগীটা দোহন করিতে অনুমতি আছে কি? সে বলিল, উহার স্তনে দুধ আছে মনে করিলে দোহন করিতে পারেন। নবী। (সঃ) উম্মে

মা'বাদের ছোট্ট ছেলে মা'বাদকে বলিলেন, হে বালক! ছাগীটা নিয়া আস ত। ছাগীটা নিয়া আসিলে নবী (সঃ) দোহনের জন্য উহাকে আবদ্ধ করিলেন এবং বিসমিল্লাহ বলিয়া স্তনে ও পেটে হাত বুলাইলেন এবং দোয়াও করিলেন। পুনরায় উহার স্তনে হাত বুলাইলেন এবং বার বার আল্লাহর নাম জপিলেন।

অতপর বলিলেন, বড় একটি পাত্র আন– যাহার খাদ্যে এক দল লোকের পেট পুরিতে যথেষ্ট হয়। ইতিমধ্যেই ছাগীটার স্তন দুগ্ধে ফাঁপিয়া উঠায় পিছনের পাদ্বয় ফাঁক করিয়া দিল এবং জাবর কাটিতে আরম্ভ করিল। নবী (সঃ) প্রবল বেগে দুগ্ধ দোহন করিতে লাগিলেন। বড় পাত্রটি দুগ্ধপূর্ণ হইলে সর্বপ্রথম ঐ পাত্র উম্মে মা'বাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে কাফেলার লোকদের প্রদান করিলেন। প্রত্যেকে বার বার পান করিয়া অতিমাত্রায় পরিতৃপ্ত হইল। সকলে পরিতৃপ্ত হইলে সর্বশেষে নবীজী মোস্তফা (সঃ) পান করিলেন। এহেন মহান আদর্শ কার্যত শিক্ষাদানের পর মৌখিকও বলিয়া দিলেন–"সকলকে পান করাইবার ভার যাহার উপর ন্যস্ত থাকিবে সে সকলের পরে পান করিবে।" অতপর দ্বিতীয় বার ঐ পাত্রে দোহন করিয়া পুনঃ পুনঃ সকলকে পান করাইলেন। নবীজীর দ্বারা এই অসাধারণ বরকত লাভে তাহারা তাঁহাকে "মোবারক"–বরকত ও মঙ্গলময় বলিয়া প্রশংসা করিল।

তারপর নবী (সঃ) তৃতীয়বার ঐ পাত্রে দুধ দোহন করিয়া উম্মে মা'বাদের গৃহে রাখিয়া গেলেন এবং বলিলেন, তোমার স্বামী– মা'বাদের পিতা বাড়ী আসিলে তাহাকে পান করাইও। নবীজীর (সঃ) কাফেলা তথা হইতে রওয়ানা হইয়া গেল; ইতিমধ্যেই স্বামী আবু মা'বাদ মেষপাল লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। ঘাসের অভাবে মেষগুলি এতই দুর্বল ছিল যে, হাঁটিতে সক্ষম হইতেছিল না, এতই কৃশ ছিল যে, উহাদের অস্থি-মজ্জা পর্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। গৃহে দুগ্ধ দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। উম্মে মা'বাদকে জিজ্ঞাসা করিল, দুগ্ধ কোথা হইতে পাইলে? মেষপাল ত বাড়ীতে ছিল না, দুগ্ধের কোন ছাগীও গৃহে ছিল না। উম্মে মা'বাদ বলিল, তোমার কথা সত্যই, কিন্তু আমাদের গৃহে এক "মোবারক"–বরকতময় মহৎ ব্যক্তির আগমন হইয়াছিল তাঁহার দ্বারা এই ঘটনা ঘটিয়াছে। অতপর উম্মে মা'বাদ দুগ্ধ দোহনের পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়া শুনাইল। আবু মা'বাদ কৌতূহলে সেই মহান আগন্তুকের বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিল। উম্মে মা'বাদ স্বামীর নিকট নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আকৃতি-প্রকৃতি ও রূপ-গুণের বিবরণ যে ওজস্বিনী ভাষায় প্রদান করিয়াছিল, উহার যথাযথ অনুবাদ বাংলা ভাষায় সম্ভব নহে। সামান্য কিছু আভাস দেওয়া যাইতে পারে। উম্মে মা'বাদ বলিল–

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি– অতি উজ্জ্বল বর্ণ সুপুরুষ তিনি, মুখশ্রী তাঁহার দীপ্ত ও আভাপূর্ণ, চরিত্র তাঁহার অতি মধুর, পেট তাঁহার স্ফীত নহে, দেহ তাঁহার কৃশ নহে– সুন্দর সুঠাম। খুব কাল তাঁহার চোখের তারা, ঘন ও সুদীর্ঘ তাঁহার নয়নের লোমরাজি। কর্কষ নহে– গম্ভীর তাঁহার স্বর, নয়নযুগলে অতি সাদার মধ্যে অতি কাল পুতুলি; প্রকৃতিই যেন সুরমা দিয়া দিয়াছে তাঁহার নয়নে, ভ্রূযুগল পরস্পর সংযোজিত, অতি কাল তাঁহার কেশদাম, গ্রীবা তাঁহার দীর্ঘ, দাড়ি তাঁহার ঘন। মৌন অবস্থায় তাঁহার উপর গুরুগম্ভীর ভাবের দৃশ্য ফুটিয়া উঠে, কথা বলিলে সকলের মনপ্রাণ মোহিত করিয়া দেয়। তাঁহার কথা মুক্তার দীর্ঘ মালার ন্যায় সুবিন্যস্ত– তাহা হইতে যেন এক একটি মুক্তা পর পর খসিয়া পড়িতেছে। মিষ্ট ও প্রাঞ্জল তাঁহার ভাষা, সুস্পষ্ট তাঁহার বর্ণনাধারা, ত্রুটি থাকে না আধিক্যও হয় না তাঁহার কথার মধ্যে। দূর হইতে দেখিলে তাঁহার রূপ-লাবণ্য মুগ্ধ করিয়া ফেলে, নিকটে আসিলে (তাঁহার ঐশিক প্রভাব দৃষ্টি ঝলসাইয়া দেয়, কিন্তু) তাঁহার প্রকৃতির মাধুরী মোহিত করিয়া ফেলে। দেহ তাঁহার মধ্যমাকার– দেখায় অপ্রিয় দীর্ঘও নহে, হেয় মানের খর্বও নহে, (পুষ্টি ও পুলকে সেই দেহ) রসাল বৃক্ষ ডালার ন্যায়– সেই ডালা কচিও নহে দীর্ঘ দিনেরও নহে। তিন জনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক সুদর্শন ও সুমহান। সঙ্গীরা তাঁহাকে সদা বেষ্টন করিয়া থাকে। তাহারা তাঁহার কথা অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে এবং কোন আদেশ করিলে অতি আগ্রহের সহিত পালন করে। সকলের সেবার পাত্র তিনি, সকলেই তাঁহার হুজুরে জটলা বাঁধিয়া থাকে। তিনি বিষণ্ন আকৃতিতে থাকে না। তিরস্কার করা ধিক্কার দেওয়া তাঁহার স্বভাবে নাই।

আবু মা'বাদ স্ত্রীর মুখে এই বর্ণনা শুনিবা মাত্র শপথ করত বলিয়া উঠিল, ইনিই ত কোরায়শদের সেই মহান। তাঁহার দর্শন পাইলে নিশ্চয় তাঁহার চরণে আমি শরণ লইতাম; তাহার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনা করিয়া যাইব। আমি তাঁহার সাহচর্যের কামনা করি, সুযোগ পাইলে সেই মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূরণ করিব।

নবীজী (সঃ) চলিয়া যাওয়ার পরও ছাগীটি সকাল-বিকাল ঐরূপ অসাধারণভাবে দুগ্ধ দিয়া থাকিত এবং দীর্ঘ দিন বাঁচিয়াও ছিল। (যোরকানী, ১-৩৪০)

আবু মা'বাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, সাধনা তাঁহার সফল হইল। স্বামী আবু মা'বাদ এবং স্ত্রী উম্মে মা'বাদ সপরিবারে মদীনায় উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উম্মে মা'বাদের ভ্রাতা "হোবায়শ"ও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মক্কা বিজয়ে শহীদ হইয়াছিলেন। তাঁহার মাধ্যমে উম্মে মা'বাদ হইতে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের সকলে ইসলাম গ্রহণের বিবরণ। (যোরকানী, ১-৩৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

উম্মে মা'বাদের ঘটনা জ্বিন সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রসার লাভ করিয়াছিল; তাহারা অদৃশ্য কণ্ঠে কাব্যের মাধ্যমে মক্কায় এই ঘটনা সুললিত সুরে গাহিয়া প্রচার করিল।

আবু বকর তনয়া আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পিতা আবু বকর (রাঃ) ও নবীজী মোস্তফা (সঃ) গৃহ ত্যাগের ৪/৫ দিন পরে আমরা ত তাঁহাদের কোন সংবাদ অবগত নহি; ইতিমধ্যেই একটি অদৃশ্য কণ্ঠের এই কবিতা মক্কার লোকজন শুনিতে পাইল।

جَزَى اللّٰهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهٖ ـ رَفِيْقَيْنِ حَلاَّ خَيْمَتَىْ أُمِّ مَعْبَدِ

هُمَا نَزَلاَ بِالْبِرِّ وَارْتَحَلاَ بِهٖ ـ فَاَفْلَحَ مَنْ اَمْسٰى رَفِيْقَ مُحَمَّدِ

سَلُوْا أُخْتَكُمْ عَنْ شَاتِهَا وَانَائِهَا ـ فَانَّكُمْ اِنْ تَسْاَلُوْا الشَّاَةَ تَشْهَدِ

دَعَاهَا بِشَاةٍ حَائِلٍ فَتَحَلَّبَتْ ـ لَهٗ بِصَرِيْحٍ صَرَّةَ الشَّاةِ مُزْبِدِ

فَغَادَرَهَا رَهْنًا لَدَيْهَا لِحَالِبٍ ـ يَدُرُّ لَهَا فِىْ مَصْدَرٍ ثُمَّ مَوْرِدِ ـ

অর্থ ঃ "সকলের প্রভু আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন ভ্রমণ সঙ্গীদ্বয়কে, যাঁহারা উম্মে মা'বাদের কুটিরে অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মহাপুণ্যবানরূপে তথায় অবতরণ করিয়াছিলেন এবং ঐরূপেই তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বন্ধুত্ব যাহারই লাভ হইয়াছে, সাফল্য লাভে সে-ই ধন্য হইতে পারিয়াছে। তোমাদের ভগ্নী উম্মে মা'বাদকে তাহার ছাগী এবং বিরাট পাত্রের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর; ঐ ছাগীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেও সে ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। মুহাম্মদ (সঃ) উম্মে মা'বাদকে ডাকিলেন তাহার এমন একটি ছাগীর জন্য, যাহা ছিল বন্ধ্যা (অতএব উহার স্তনে দুগ্ধের অস্তিত্বই ছিল না), কিন্তু ঐ ছাগীর স্তন খাঁটি দুগ্ধ এমন প্রবল বেগে প্রদান করিল যে, উহার ফেনার স্তূপ জমিয়া গেল। অবশেষে ঐ ছাগীটি উম্মে মা'বাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া চলিয়া গেলেন, প্রত্যেক দোহনকারী উম্মে মা'বাদের জন্য পুনঃ পুনঃ দুগ্ধ দোহন করিতে থাকিবে। (বেদায়া ও যোরকানী,৩৪২)

উম্মে মা'বাদের নিবাস এলাকা "কোদায়দ" মক্কা-মদীনার পথে মদীনা অপেক্ষা মক্কার অধিক নিকটবর্তী ছিল। বদান্যতা গুণে সে মক্কা এলাকায় পরিচিত ছিল এবং তাহার কুটির পথিকদের বিশ্রামাগার ছিল,, দেশ-বিদেশের পথিকগণ তথায় সেবা ও সহানুভূতি পাইয়া থাকিত, তাই ঐ কুটিরও লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। সেমতে জ্বিনদের উক্ত কবিতা মক্কার মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল এবং যাঁহারা নবীজীর (সঃ) কাফেলার সংবাদ জ্ঞাত হইতে আগ্রহী ছিলেন তাঁহারাও আশ্বস্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিলেন।

উম্মে মা'বাদের কুটিরে ছাগী দোহনের যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি মোজেযা। এ মোজেযাটির বিভিন্ন দিক ছিল। যথা-

১। ঘাসের অভাবে ছাগীটি এতই কৃশ ও দুর্বল ছিল যে, চারণ ভূমিতে যাইতে অক্ষম ছিল। উম্মে মা'বাদ নিজেই এই কথা বলিয়াছিলেন। অতএব সাধারণভাবেই উহা দুগ্ধশূন্য ছিল। নবীজীর (সঃ) মোজেযায় তাহাতে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছিল।

২। ছাগীটির কোন বাচ্চা জন্মিয়াছিল না, যাহাতে উহার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইতে পারে। জ্বিনদের কাব্যে যে ঐ ছাগীটির গুণবাচক حائل হাএল" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার আভিধানিক অর্থই হইল كل انثى لا تحمل " ঐ মাদী জীব যে গর্ভধারণ করে না" অর্থাৎ বন্ধ্যা। সেমতে ঐ ছাগীটি গর্ভধারণের যোগ্যই ছিল না, সুতরাং স্বাভাবিকভাবে উহার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চারই হইতে পারে না। একমাত্র নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযায়ই তাহা সম্ভব হইয়াছিল।

৩। বড় পাত্র- যাহার মধ্যে একদল লোক পরিতৃপ্ত হওয়ার পরিমাণ পানীয় সামলাইতে পারে- স্বাভাবিকরূপে একটি অতি উত্তম ছাগী হইতেও ঐরূপ পাত্র বারংবার পরিপূর্ণ হওয়ার মত দুগ্ধ লাভ হইতে পারে না। এই ঘটনায় ঐরূপ হইয়াছিল এবং ৭/৮ জন মানুষ পুনঃ পুনঃ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল; ইহাও মোজেযাই ছিল।

৪। আরও অধিক আশ্চর্যজনক বিষয় এই ছিল যে, দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ঐ ছাগীটি এইরূপ অস্বাভাবিকভাবে দুগ্ধ দিতেই ছিল।

আলোচ্য ঘটনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্তের পরশে উল্লিখিত অস্বাভাবিক ঘটনাই বাস্তবায়িত হইয়াছিল, যাহা দৃষ্টে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীগণ নবীজী (সঃ)-কে স্বতঃস্ফূর্ত "মোবারক" নামে আখ্যা দিয়াছিল এবং আবু মা'বাদ নিজ গৃহে দুগ্ধ দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল। মুসলমান জ্বিন সম্প্রদায়ও এই ঘটনাকে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সত্য রসূল হওয়ার সাক্ষ্যরূপে প্রচার করিয়াছিল। এইসব তথ্য সীরাত তথা চরিত-শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ কিতাবসমূহের সবগুলিতেই বর্ণিত রহিয়াছে।*

মদীনার পথে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম কর্তৃক আহার যোগাইবার এরূপ আরও ঘটনা সীরাত গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত রহিয়াছে।

ঐরূপ আরও ঘটনা

মদীনার পথে নবীজী (সঃ)-এর কাফেলা এক রাখালের নিকট দিয়া যাইতেছিল, আহারের প্রয়োজন

সমালোচনা ঃ "মোস্তফা-চরিত" গ্রন্থে ছাগীর দুগ্ধ সম্পর্কীয় সমুদয় তথ্য হইতে চোখ বন্ধ করিয়া শুধু গ্রন্থকারের নিজ অনুমানের ভিত্তিতে ঘটনাটিকে স্বাভাবিক প্রমাণ করিবার অপচেষ্টায় বলা হইয়াছে- "সম্ভবত কৃশ মনে করিয়া কয়েক দিন তাহাকে দোহন করা হয় নাই, তাহার স্তনে কয়েক দিনের যে দুগ্ধ সঞ্চিত ছিল তাহা পথিকগণের পক্ষে নিত্যান্ত অপ্রচুর হইল না। দুগ্ধের সাথে পানি মিশ্রিত করিয়া পান করার নিয়ম আরবে প্রচলিত ছিল।"

পাঠক! লক্ষ্য করিলেন! ইতিহাসে বর্ণিত তথ্যগুলিকে কিরূপে মুছিয়া ফেলা হইল। বলা হইল- কয়েক দিনের দুগ্ধ স্তনে সঞ্চিত ছিল; অথচ ছাগীটি ছিল হায়েল অর্থাৎ বন্ধ্যা, যাহার গর্ভে বাচ্চা জন্মে না, স্তনে দুগ্ধ কোথা হইতে আসিবে? বলা হইয়াছে, পথিকগণের পক্ষে; অথচ গৃহস্বামীরাও পান করিয়াছিল, এমনকি অনুপস্থিতের জন্যও এক পাত্র রাখা হইয়াছিল। বলা হইয়াছে, নিতান্ত অপ্রচুর হইল না, অথচ প্রত্যেকে পুনঃ পুনঃ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে মোস্তফা-চরিত গ্রন্থকার দুগ্ধে পানি মিশ্রিত করা সাব্যস্ত করিল, তবুও মোজেযা স্বীকার করিল না।

এইরূপ অপদার্থ মগজ হইতে নিঃসৃত বাতুলতার সমালোচনা করা যায়? প্রবীণ পণ্ডিত মরহুমের সমালোচনা হয়ত পাঠককেও মর্মাহত করে। কিন্তু নবীজীর মোজেযার প্রতি স্বীকৃতি দানে যাহারা এত সঙ্কীর্ণ, তাহাদের অধিকার ছিল না মোস্তফা-চরিত সঙ্কলন করিয়া মুসলমানদিগকে বিভ্রান্ত করার। মূল ঘটনা যেসব গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে আমাদের উদ্ধৃত তথ্যসমূহ ঐসব গ্রন্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত তথ্যসমূহ বাদ দিয়া, বরং উপেক্ষা করিয়া ঘটনাকে মনগড়ারূপে 'সম্ভবত' 'জনিত' ইত্যাদি নিজ উক্তির আড়ালে বিকৃত করা শিক্ষা ও সভ্যতার বিপরীত নহে কি?

ছিল। তাঁহারা রাখালকে কোন একটি ছাগী হইতে দুগ্ধদানের অনুরোধ করিলেন। আরবে এই নীতি সর্বত্র প্রচলিত ছিল যে, পথিকগণ যেকোন মেষপাল ইত্যাদি হইতে নিজ প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে।

রাখাল বলিল, আমার পেষপালে দুগ্ধ দেওয়ার যোগ্য কোন ছাগী নাই; একটি ছাগী আছে, উহার বয়সও কম। এই শীত মৌসুমের আরম্ভে বাচ্চা দিয়াছিল। সেই বাচ্চা ছিল অসম্পূর্ণ দেহবিশিষ্ট, বহু দিন পূর্বে ঐ ছাগীটির দুগ্ধ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। নবী (সঃ) বলিলেন, ঐ ছাগীটিই নিয়া আস। উপস্থিত করা হইলে নবীজী (সঃ) স্তনে হস্ত বুলাইলেন এবং দোয়া করিলেন। উহার স্তনে দুগ্ধ নামিয়া আসিল। আবু বকর (রাঃ) একটি পাত্র নিয়া আসিলেন। নবীজী (সঃ) দোহন করিলেন। প্রথমবার আবু বকর (রাঃ) পান করিলেন, দ্বিতীয় বার ঐ রাখাল পান করিল– এইভাবে সকলে পান করিলে সর্বশেষে নবীজী (সঃ) পান করিলেন।

ঘটনাদৃষ্টে রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, খোদার কসম! আপনি কে? আপনার ন্যায় ব্যক্তি ত আমি আর দেখি নাই। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমার পরিচয় জ্ঞাত করিলে সংবাদ গোপন রাখিবে ত? সে বলিল, হাঁ। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমি মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)– আল্লাহর রসূল। রাখাল বলিল, কোরায়েশরা যাহাকে ধর্মত্যাগী বলিয়া থাকে আপনিই তিনি। নবী (সঃ) বলিলেন, তাহারা এরূপই বলিয়া থাকে। রাখাল বলিল, আমার স্বীকৃতি ঘোষণা করিতেছি যে, আপনি নিশ্চয় নবী এবং আপনার ধর্ম সত্য; আপনি যাহা করিয়াছেন নবী ভিন্ন কেহ তাহা করিতে সক্ষম হইবে না, আমি আপনার সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করি। নবী (সঃ) বলিলেন, তুমি এখন আমার সঙ্গী হইতে পারিবে না। আমার বিজয় ও প্রাবল্যের সংবাদ অবগত হইলে পর তুমি আমার নিকটে চলিয়া আসিও।* (বেদায়া, ৩–১৯৪)

একটি ঘটনা

আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা ত্যাগ করিবার পথে আমরা একটি গোত্রের বস্তিতে পৌঁছিয়া এক কুটিরে অবতরণ করিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঐ কুটিরে এক মহিলার অবস্থান। সন্ধ্যা বেলা তাহার পুত্র মেষপাল চরাইয়া উহা লইয়া বাড়ী প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। তাহার মাতা তাহাকে একটি ছুরি প্রদান করিয়া বলিলেন– এই ছুরি ও একটি মেষ লইয়া পথিক মুসাফিরদের নিকট যাও এবং বল, আপনারা এই মেষটি জবাই করিয়া নিজেরাও খওয়ার ব্যবস্থা করুন আর আমাদেরকেও দিন। মহিলার পুত্র ছুরি ও একটি ছাগী লইয়া পৌঁছিলেন। নবীজী (সঃ) ছুরি ফেরত দিলেন এবং বলিলেন, দুগ্ধ দোহনের পাত্র নিয়া আস। বালক বলিল, ছাগীটিত কম বয়সের– এখনও পাঠার পালে আসে নাই * (ইহাতে দুগ্ধের সম্ভাবনা নাই)। নবীজী (সঃ) বলিলেন, তুমি যাও; সে যাইয়া পাত্র নিয়া আসিল। নবী (সঃ) ছাগীটির স্তনে হাত বুলাইলেন, অতপর দুগ্ধ দোহাইলেন; পাত্রটি দুগ্ধে পূর্ণ হইলে উহা বালকের মাতার জন্য পাঠাইলেন। সে তৃপ্ত হইয়া পান করিলে পুনরায় দোহাইলেন। উহা সঙ্গীগণ পান করিলেন, সর্বশেষে নবীজী (সঃ) পান করিলেন। তথায় কাফেলা দুই রাত্র অবস্থান করিল। কুটির বাসীরা নবীজী (সঃ)-কে "মোবারক– বরকত ও মঙ্গলময়" নামে আখ্যায়িত করিল।

ঐ মহিলার মেষপালে বরকত হইল, উহা সংখ্যায় অনেক বাড়িয়া গেল। মহিলা তাহার মেষপালসহ পুত্রকে লইয়া মদীনায় পৌঁছিল। পুত্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল মা! ঐ যে মোবারকের সঙ্গী ব্যক্তি। তাঁহারা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে "মোবারক" নামে আখ্যা দিয়াছিল।

মাতা তৎক্ষণাৎ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকটে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে

* পাঠক! "মোস্তফা-চরিত" সঙ্কলক এই ঘটনাকে কি বলিয়া স্বাভাবিক বানাইবে? ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হওয়ার কারণেই ত ঘটনায় উপস্থিত রাখাল স্পষ্ট বলিয়াছে, আপনি যাহা করিয়াছেন নবী ভিন্ন কেহ করিতে পারে না।

* "মোস্তফা-চরিত" সঙ্কলক এই ঘটনায় ছাগীটির দুগ্ধ দেওয়ার স্বাভাবিকতা কিরূপে নির্ণয় করিবেন? উল্লিখিত দুইটি ঘটনা ঐসব কিতাবেই বর্ণিত রহিয়াছে যেসব কিতাব হইতে উম্মে মা'বাদের ঘটনা মোস্তফা-চরিত গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আল্লাহর বান্দা! আপনার সঙ্গী সেই মহাপুরুষ কে ছিলেন, আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তিনি আল্লাহর নবী। মহিলা বলিলেন, আমাকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিন। আবু বকর (রাঃ) তাঁহাদিগকে নবীজী (সঃ)-এর সমীপে পৌঁছাইয়া দিলেন; তাঁহারা নবীজী (সঃ)-কে কিছু পনির এবং গ্রাম্য সমগ্রী হাদিয়া পেশ করিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নবীজী (সঃ) তাঁহাদিগকে দাওয়াত খাওয়াইলেন এবং পরিধেয় ইত্যাদি উপহার দিলেন। (যোরকানী, ১-৩৪৯, বেদায়া ৩-১৯২)

নূতন শুভ্র বসনে মদীনায় উপস্থিতির ব্যবস্থা

১৭০৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৫৪) যোবায়র (রাঃ) ছাহাবীর পুত্র ওরওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) মদীনা যাওয়ার পথে যোবায়র রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সহিত সাক্ষাত হইল- তিনি কতিপয় মুসলমান বণিকের সঙ্গে বাণিজ্য কাফেলায় সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। যোবায়র (রাঃ) নবীজী (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ)-কে সাদা কাপড়ের নূতন পোশাক পরাইয়া দিলেন।

মদীনার শহরতলীতে নবীজীর (সঃ) উপস্থিতি

মক্কা হইতে রওয়ানা হওয়ার দিন-তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মতভেদ আছে। সিদ্ধ মত ইহাই যে, হযরত (সঃ) রবিউল আউয়াল চাঁদের প্রথম তারিখ (বুধবার দিবাগত) বৃস্পতিবার রাত্রে মক্কা নগরী ত্যাগ করতঃ সওর পর্বত গুহায় পৌঁছিয়াছিলেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত শুক্রবার রাত্র হইতে রবিবার পর্যন্ত চারি দিন তিন রাত্র গুহার পথে এবং গুহায় উদ্‌যাপন করিয়া (রবিবার দিবাগত) সোমবার রাত্রে গুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিন দ্বিপ্রহরের পূর্বে মদীনায় পৌঁছিলেন। (ফতহুল বারী, ৭-১৮৮)

মক্কা হইতে মদীনায় পৌঁছিতে মদীনার শহরতলী কোবা পল্লী দিয়াই প্রবেশ পথ। এই কোবা পল্লীতে বনী আম্‌র ইবনে আওফ গোত্রের বসবাস। তাঁহাদের মহানুভবতা ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মক্কা হইতে বিতাড়িত ও আগত মজলুম অত্যাচারিত সর্বহারা মুসলমানগণ এই পল্লীর উক্ত গোত্রে বেশী পরিমাণে শুধু আশ্রয়ই পাইতেন না, বরং সহোদররূপে সমাদরে গৃহীত ও সযত্নে আপ্যায়িত হইতেন। মজলুম মোহাজেরগণের প্রথম ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র সর্বস্ব হইতে বিচ্ছিন্ন আবু সালামা (রাঃ) এই পল্লীতেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার দুঃখিনী স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) শিশু পুত্রসহ দীর্ঘ এক বৎসর পর এই পল্লীতেই স্বামীর সহিত আশ্রয় পাইয়াছিলেন। আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পর সস্ত্রীক হিজরতকারী আমের ইবনে রবীয়া (রাঃ) তাঁহার পর আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (রাঃ) এবং তাঁহার স্ত্রী, ভ্রাতা ও তিন ভগ্নী সকলেই হিজরত করিয়া কোবা পল্লীতে মোবাশ্‌শের ইবনে আবদুল মোনযের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। (বেদায়া৩- ১৭১)

ওমর (রাঃ) এবং তাঁহার পরিবারবর্গ, ভ্রাতা, ভগ্নীপতিসহ বিশ জন সকলেই কোবা পল্লীতে রেফাআ, ইবনে আবদুল মোনযের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। (বেদায়া ২-১৭৩)।

হামযা (রাঃ), যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ), আবু মারসাদ (রাঃ), মারসাদ (রাঃ),আনাছাহ (রাঃ) এবং আবু কাব্‌শা (রাঃ) তাঁহারও কোবা পল্লীতে কুলসুম ইবনে হাদম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। (বেদায়া, ৩-১৭৪)

নবীজী মোস্তফা (সঃ) মক্কা হইতে আত্মগোপন করিয়া যাত্রা করিয়াছেন- মদীনাবাসী মুসলমানগণ যথাসময়ে এই সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অপরিসীম প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়া

পড়িয়াছিল। সমগ্র শহর ও শহরতলীর মুসলমানদিগের আনন্দ-উৎসাহের সীমা ছিল না। কারণ তাঁহাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, নবীজী মোস্তফা (সঃ) মক্কা হইতে যাত্রা করিয়া মদীনায় পৌঁছিবেন। মদীনার মুসলমানগণ প্রত্যহ নগর এলাকার বাহিরে উন্মুক্ত কাঁকরময় ময়দানে দাঁড়াইয়া অধীর আগ্রহে তাকাইয়া থাকিতেন নবীজীর (সঃ) কাফেলার আগমন প্রতীক্ষায়। সূর্যের প্রখর উত্তাপই তাঁহাদিগকে সেই প্রতীক্ষা হইতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিত সূর্য তাপ অসহনীয় না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা বাড়ী ফিরিতেন না।

১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিনও ঠিক ঐরূপেই মদীনাবাসী মুসলমানগণ সূর্য তাপে বাধ্য হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন মাত্র। ইতিমধ্যেই হুলস্থুল পড়িয়া গেল, কোলাহল জাগিয়া উঠিল– উজ্জ্বল শুভ্র বসন পরিহিত ক্ষুদ্র কাফেলা মদীনার ঊর্ধ্বপ্রান্ত পথে কোবা পল্লীর পানে আগত পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নগরময় আনন্দ-উৎসাহের হিল্লোল বহিয়া গেল। মুসলমানগণ দলে দলে ঘর হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। সকলেরই মনে আজ পুলক অফুরন্ত উল্লাস; দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ পূরণ হইবে– আল্লাহর রসূলকে আজ তাঁহারা নিজেদের মধ্যে পাইবেন "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম"।

ধীরে ধীরে নবীজীর (সঃ) কাফেলা কোবা পল্লীতে উপনীত হইল। বার রাত্র বার দিনের কঠিন সফরে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নবীজী মোস্তফা (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে লইয়া একটি খেজুর গাছের ছায়াতলে উপবেশন করিলেন। নবীজী (সঃ) মৌনভাবে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার পাশেই আছেন আবু বকর (রাঃ)। নবীজীর পোশাক-পরিচ্ছদে কোন জাঁকজমক নাই, উপবেশনে কোন পার্থক্য ও আড়ম্বর নাই– যাহা দেখিয়া সাধারণ লোকে সহজে নবীজী (সঃ)-কে চিনিত পারিত। এমনকি যাঁহারা পূর্বে নবীজী (সঃ)-কে দেখেন নাই, আবু বকর (রাঃ)-কেও চিনিতেন না, তাঁহাদের অনেকে আবু বকর (রাঃ)-কে নবীজী মনে করিয়া তসলীম জানাইতেছিলেন। কারণ, আবু বকর (রাঃ) বয়সে নবীজী (সঃ) অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট হইলেও তাহাকে নবীজী (সঃ) অপেক্ষা অধিক বয়সের দেখাইত। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নবীজী (সঃ) অভ্যর্থনাকারী ও সাক্ষাৎকারীগণের ভিড়ে যাতনা অনুভব করিবেন– অবলীলাক্রমে তিনি ঐভাবে তাহা হইতে রক্ষা পাইলেন। হয়ত এই কারণেই আবু বকর (রাঃ) তসলীম গ্রহণে বাধার সৃষ্টি না করিয়া মৌনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময় ছায়া সরিয়া যাওয়ায় নবীজীর চেহারার উপর রৌদ্র লাগিতে লাগিল। আবু বকর (রাঃ) অবিলম্বে নিজ বস্ত্রের সাহায্যে নবীজীর জন্য ছায়া করিয়া দাঁড়াইলেন। ছায়া করাও হইল এবং ভক্ত-অনুরক্ত খাদেম ও প্রভুর মধ্যে পার্থক্যের পরিচয়ও হইয়া গেল।

বৃক্ষ ছায়াতলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও কুশলবাদ আলাপ-আলোচনার পর নবীজী (সঃ) কোবা পল্লীর কুলসুম ইবনে হদমের গৃহে আপ্যায়িত হইলেন। যে কয় দিন নবীজী (সঃ) কোবায় অবস্থান করিয়াছিলেন এই গৃহেই অবস্থান করিলেন, কিন্তু জনসাধারণের সহিত সাক্ষাত অনুষ্ঠানে তিনি সা'দ ইবনে খায়সামা (রাঃ) ছাহাবীর গৃহে বসিতেন। কারণ, এই গৃহস্বামী ছিলেন পরিবার শূন্য; এই গৃহে নবীজীর নিকট লোকদের যাতায়াত ও সাক্ষাত সুবিধাজনক ছিল। (বেদায়া, ৩–১৯৭)

নবীজী (সঃ) মক্কা হইতে বাহির হইয়া আসায় কৃতকার্য হইলে পর আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষে সহজ হইয়া গেল নবীজীর নিকট মক্কাবাসীদের গচ্ছিত বস্তু তাহাদেরকে ফিরাইয়া দেওয়া। সেমতে তিনি যথাসম্ভব দ্রুত মালিকদিগকে তাহাদের বস্তু প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। মক্কা হইতে নবীজীর যাত্রা করার তিন দিন পরে আলী (রাঃ)ও মক্কা ত্যাগ করতঃ হিজরত করিয়া কোবা পল্লীতেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত মিলিত হইলেন। (বেদায়া, ৩–১৯৭)

কোবা পল্লীতে নবী (সঃ) সোমবার পৌঁছিয়াছিলেন এবং শুক্রবার পর্যন্ত ঐ পল্লীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহা অবধারিত যে, কোবা হইতে নবীজীর প্রস্থান শুক্রবার ছিল; কাহারও মতে পরবর্তী শুক্রবার, কিন্তু অধিকাংশের মতে দ্বিতীয় শুক্রবার। সেমতে কোবা পল্লীতে নবীজীর (সঃ) অবস্থান (অবতরণ ও প্রস্থানের দিনকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় গণনা করিয়া) বার দিন ছিল। (বেদায়া, ৩ –১৯৮)

ছাহাবী আনাছ (রাঃ)– যাঁহার বয়স এই সময় মাত্র দশ বৎসর ছিল; তিনি পরবর্তীকালে আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা নিজ স্মরণ অনুযায়ী প্রদান করিয়াছেন যে, কোবা পল্লীতে নবী (সঃ) চৌদ্দ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। হয়ত তাঁহার স্মরণ মতে নবীজীর কোবা পল্লীতে অবতরণ শুক্রবার দ্বিপ্রহরে ছিল এবং তথা হইতে মদীনা নগরে প্রস্থান তৃতীয় শুক্রবার দ্বিপ্রহরের পূর্বে ছিল। সেমতে অবতরণ ও প্রস্থানের অর্ধ অর্ধ দিনের সমষ্টিকে একদিন গণ্য করিয়া চৌদ্দ দিন বলা হইয়াছে। (আসাহহুস সিয়ার– ১০৯)

কোবা পল্লীতে মসজিদ নির্মাণ

কোবা পল্লীতে ১২ দিন বা ১৪ দিন অবস্থান কালে নবীজী (সঃ) তাঁহার একটি বিশেষ আদর্শ ও সুন্নত বাস্তবায়ন করিলেন। নবীজীর (সঃ) বিশেষ মৌলিক আদর্শ ও সুন্নত এই যে, যেস্থানেই মুসলমানের বসবাস হইবে, তথায় সর্বদা জামাতের সহিত নামায আদায় করার সুব্যবস্থা করিবে। মুসলমানদের জন্য এই আদর্শ বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনেরও ইঙ্গিত। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ـ

অর্থ ঃ "মুসলমান এমন জাতি, তাহাদিগকে কোন ভূখণ্ডে শক্তি-সামর্থ্যের সুযোগ দান করিলে তাহারা তথায় নামায জারি করার সুব্যবস্থা করে...।"

কোবা পল্লীতে মুসলমানগণের মুক্ত ধর্মীয় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সুযোগে মুসলমানদের কর্তব্য তথায় জামাতে নামাযের প্রচলন এবং ইসলামের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদ তৈয়ার করা। নবীজী (সঃ) তাঁহার ১২/১৪ দিনের সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে সেই কর্তব্যের উদ্বোধন করেন। ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ ঐ কোবা পল্লীতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্তে তৈয়ার হয়। মুসলমান সর্ব সাধারণের জন্য এবং আনুষ্ঠানিক মসজিদরূপে পূর্ণ আকৃতিপ্রাপ্ত মসজিদ সর্বপ্রথম এই মসজিদে কোবা-ই ছিল। ইহার পূর্বে ব্যক্তিগত নির্দিষ্ট নামাযের স্থানরূপে বা গোত্রীয় সমাজের নামাযের জন্য অতি সমান্য ঘেরাওয়ের রক্ষণায় নির্দিষ্ট নামাযের স্থান আরও তৈয়ার হইয়াছিল, কিন্তু আনুষ্ঠানিকরূপে পূর্ণাঙ্গ জামে মসজিদ এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম কোবা পল্লীর এই জামে মসজিদই। উক্ত মসজিদের গৌরব পবিত্র কোরআনেও নিম্নরূপ উল্লেখা আছে–

لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ـ

অর্থ ঃ "যেই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে পরহেজগারী– আল্লাহ অনুরক্তির উপর প্রথম দিন হইতে উহার সঙ্গেই আপনার সম্পর্ক রাখা বাঞ্ছনীয়। ঐ মসজিদের পল্লীবাসীরা (উত্তম লোক। তাহারা) পাক-পবিত্রতা ভালবাসিয়া থাকে। (পারা–১১, রুকু–২)

অনেকের মতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোবায় পদার্পণের প্রথম দিনেই এই মসজিদের ভিত্তি রাখিয়াছিলেন। (বেদায়া– ৩–২০৯)

কোবা মসজিদের ফযীলত

কোরআন শরীফে এই মসজিদের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা করিয়াছেন– এই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে আল্লাহর তাক্ওয়া তথা পরহেজগারী ও আল্লাহ অনুরক্তির উপর। এই পল্লী হইতে চলিয়া যাওয়ার

পরও নবী (সঃ) এই মসজিদে আসিতেন এবং নামায পড়িতেন। প্রথম খণ্ড ৬৩১ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে– নবী (সঃ) প্রতি শনিবার এই কোবা পল্লীর মসজিদে সুযোগ হইলে বাহনে নতুবা পদব্রজে আসিতেন এবং দুই রাকাআত নামায পড়িতেন।

হাদীছে আছে– এই মসজিদে নামায পড়িলে ওমরা আদায় করার সওয়াব লাভ হয়। (যোরকানী, ১–৩৫১)

কোবা হইতে মদীনার শহর পানে প্রস্থান

বার বা চৌদ্দ দিন কোবা পল্লীতে অবস্থানের পর শুক্রবার দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার দাদার মাতৃকুল নাজ্জার বংশের লোকদিগকে তাঁহার মদীনা নগরীতে যাত্রার সঙ্কল্পের সংবাদ জ্ঞাত করিলেন।

দীর্ঘ দুই সপ্তাহ আগ্রহ ও অপেক্ষায় কাটিয়া গিয়াছে! এখন নবীজীর (সঃ) আগমন সংবাদ পাইয়া নগরবাসীগণের আনন্দোল্লাস ও উৎসাহ-উদ্দীপনার আর সীমা থাকিল না। তৎকালীন আরবীয় বীর জাতির প্রথানুসারে তাঁহারা সকলে তরবারি ঝুলাইয়া ফৌজী কায়দায় নবীজী (সঃ)-কে রাজকীয় অভ্যর্থনার সহিত নিয়া আসিবার জন্য ছুটিয়া চলিলেন। নগরের মুসলমানদের মধ্যে এই শুভ সংবাদ অবিলম্বে প্রচারিত হইয়া পড়িল। আবাল-বৃদ্ধ-বর্নিতা সকলে আনন্দে উল্লাসে মাতিয়া উঠিল।

শুক্রবার দিনের দীর্ঘ অংশ অতিক্রমের পর নবীজী (সঃ) কোবা হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বনী সালেম গোত্রের মহল্লায় পৌঁছিতেই জুমার নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল। নবীজী (সঃ) তাঁহার একশত জন সঙ্গীসহ ঐ গোত্রের নির্দিষ্ট নামাযের স্থানে জুমার নামায আদায় করিলেন। নবীজীর (সঃ) জন্য ইহা সর্বপ্রথম জুমা ছিল।

নবীজী (সঃ)-এর সর্বপ্রথম জুমার খোতবা

উক্ত জুমায় নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খোতবার মর্ম নিম্নরূপ ছিল–

সমস্ত মহিমা-গরিমা একমাত্র আল্লাহর জন্য; আমি তাঁহার মহিমা গাহি ও প্রচার করি। আমি তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং (কর্তব্য পালনে ত্রুটির জন্য) তাঁহারই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই। সৎ পথ লাভ তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করি। তাঁহার প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখি। তাঁহাকে অমান্য করিব না। তাঁহাকে অমান্য করে এমন ব্যক্তিকে কখনও মিত্র বানাইব না। আমি এই সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই; তিনি এক, তাঁহার অংশীদার কেহ নাই এবং এই সাক্ষ্যও ঘোষণা করিতেছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার বান্দা ও প্রেরিত রসূল। যখন দীর্ঘকাল যাবত বিশ্ব রসূল হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে– যখন ধরাপৃষ্ঠ হইতে সত্য জ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যখন মানব জাতি ভ্রষ্টতা ও অনাচারে ডুবিয়া গিয়াছে, যখন বিশ্বের আয়ু শেষ প্রায় এবং কেয়ামত বা মহাপ্রলয় সমাগত, কর্মফল ভোগের নির্ধারিত সময় নিকটবর্তী– এহেন সময় আল্লাহ তাঁহার রসূল মুহাম্মদ (সঃ)-কে সত্যের জ্যোতি, জ্ঞানের আলো, সদুপদেশের আকর সঠিক ও বাস্তবমুখী ধর্ম দিয়া জগদ্বাসীর প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ এবং তাঁহার রসূলের অনুগত হইয়া চলিলেই মানব জীবনের চরম সফলতা লাভ হইবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের অনুগত হইয়া না চলিলে পদস্খলন, অপরাধ প্রবণতা এবং সুদূরপ্রসারী ভ্রষ্টতা অবধারিত।

হে জনমণ্ডলী! তোমাদের প্রতি আমার চরম উপদেশ– তামরা তাক্ওয়া পরহেজগারী– আল্লাহ অনুরক্তি ও আল্লাহর ভয়-ভক্তি অবলম্বন কর (অর্থাৎ বিবেকের ঐ চরম উৎকর্ষতা লাভ কর যে, কুভাব-কুচিন্তা ও অপরাধ-প্রবণতার প্রবৃত্তিই হৃদয় হইতে মুছিয়া যায়– ঐসব কদর্যের প্রতি এমন ঘৃণা জন্মে যে, তাহা স্বতই বিষবৎ পরিত্যজ্য বোধ হয়)।

পরকালের চিন্তা ও আল্লাহর ভয়-ভক্তি অবলম্বনের উপদেশ– এক মুসলিম অপর মুসলিমকে দিবার মত

উৎকৃষ্টতর উপদেশ ইহাই। যেসব দুষ্কর্মে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁহার আযাবের ভয় দেখাইয়াছেন– সাবধান! তাহার নিকটেও যাইও না; ইহা আপেক্ষা উত্তম সদুপদেশ আর কিছুই হইতে পারে না, ইহা অপেক্ষা উত্তম সতর্কবাণী আর কিছু হইতে পারে না। প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহকে ভয় করিয়া আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জন করা– যাহাকে "তাক্ওয়া" বলে; এই তাক্ওয়াই হইল মানুষের জন্য পরকালের সাফল্য লাভে প্রকৃত সাহায্যকারী।

আল্লাহর সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক এবং যে কর্তব্য রহিয়াছে– যেব্যক্তি সেই সম্পর্ক ও কর্তব্যকে ভিতরে-বাহিরে, প্রকাশ্যে-গোপনে ত্রুটিমুক্ত ও নিখুঁত করিতে সচেষ্ট থাকিবে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে; ঐ ব্যক্তির এই প্রচেষ্টা তাহার জন্য ইহজীবনে অতি বড় সুনাম এবং পরজীবনে মহাসম্বল ও মহাসম্পদ হইবে– যখন মানুষের একমাত্র নির্ভরস্থল হইবে তাহার কৃত আমল। উল্লিখিত প্রচেষ্টা ছাড়া মানুষ দুনিয়ার বুকে যাহা কিছু করে, পরজীবনে সে শত আকাঙ্ক্ষা করিবে যেন হিসাব-নিকাশ হইতে অনেক অনেক দূরে থাকে।

আল্লাহ তাআলা তোমাদিগকে তাঁহার সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের দায়িত্ব কর্তব্যের ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতেছেন। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি অতিশয় দয়াময় ও কৃপাময়। আল্লাহর কথা সত্য, তাঁহার অঙ্গীকার সুরক্ষিত ও অলঙ্ঘনীয়– সেই মহানই বলিয়াছেন, "আমার কথার রদবদল নাই, আমি বান্দাদের প্রতি আদৌ কোন অবিচার করিব না।"

ইহজীবন ও পরজীবন– উভয় জীবনের ব্যাপারে ভিতরে-বাহিরে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বতোভাবে আল্লাহর ভয়-ভক্তি সকলে অবলম্বন কর। যেব্যক্তি আল্লাহর ভয়-ভক্তি অবলম্বন করিবে আল্লাহ তাআলা তাহার গোনাসমূহ মুছিয়া ফেলিবেন এবং অতি বড় প্রতিদান তাহাকে দান করিবেন। যাহার ভিতরে আল্লাহর ভয়-ভক্তি থাকিবে সে চরম সাফল্য লাভ করিবে।

স্মরণ রাখিও, আল্লাহর ভয়-ভক্তি তাঁহার গজব হইতে রক্ষা করে, তাঁহার আযাব হইতে বাঁচায়, তাঁহার অসন্তুষ্টি হইতে হেফাযত করে। আরও আল্লাহর ভয়-ভক্তি চেহারা উজ্জ্বল করিবে, প্রভু-পরওয়ারদেগারকে সন্তুষ্ট করিবে, মান-মর্যাদা ঊর্ধ্বে নিয়া যাইবে।

ইহজীবনের সুখ ভোগ কর, (কিন্তু ভোগের মোহে) আল্লাহর দাবী পূরণে শিথিল হইও না। আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার কিতাব শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার (পর্যন্ত পৌঁছার) পথ সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এখন কে প্রকৃতপক্ষে সত্যের সেবক আর কে মিথ্যাবাদী কপট, তাহাই আল্লাহ দেখিয়া নিবেন। সুতরাং আল্লাহ যেরূপ তোমাদের চরম উপকার করিয়াছেন তদ্রূপ তোমরাও নিজেদের উপকার কর– আল্লাহর শত্রুদের শত্রু গণ্য কর এবং তাঁহার (দ্বীনের) জন্য যথাযোগ্য জেহাদ কর। তিনি তোমাদিগকে (তাঁহার নিজের জন্য) নির্বাচিত করিয়াছেন এবং তোমাদের নাম রাখিয়াছেন, মুসলিম– আত্মসমর্পনকারী।

(আল্লাহ তাআলা কিতাব ও পথের সন্ধান দানের সুব্যবস্থা এই উদ্দেশে করিয়াছেন–) যেন ধ্বংসের পথ অবলম্বনকারী সেই পথে ধ্বংস হয় সুস্পষ্টরূপে জানিয়া-বুঝিয়া লওয়ার পর। (ফলে তাহার কোন আপত্তির অবকাশ থাকিবে না।) এবং বাঁচিবার পথের সন্ধানী বাঁচিয়া যায় সুস্পষ্ট পথ পাইয়া। নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও কোন শক্তি নাই। অতএব সদা আল্লাহকে স্মরণ রাখিও, আর পরজীবনের জন্য সম্বল করিয়া লও। আল্লাহর সহিত নিজ সম্পর্ক যে দৃঢ় ও নিখুঁত করিয়া লয়, মানুষের সঙ্গে তাহার সমুদয় সম্পর্কের জন্য আল্লাহ তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়া যান। কারণ, মানুষের উপর আল্লাহরই হুকুম চলে– আল্লাহর উপর মানুষের হুকুম চলে না। মানুষ আল্লাহর উপর প্রভুত্ব রাখে না– আল্লাহই মানুষের উপর প্রভুত্ব রাখেন। আল্লাহু আকবর– আল্লাহ সর্বমহান; সেই মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও হস্তে কোন শক্তি নাই।

–(ওয়াকেদী ২–১১৭, বেদায়া ৩)

জুমা শেষে নগরের দিকে যাত্রা

জুমার নামায শেষ করিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আবার নগর পানে যাত্রা করিলেন। নবী (সঃ) তাঁহারই বাহনের উপর পিছনে আবু বকর (রাঃ)-কে বসাইলেন এবং ধীরে ধীরে নগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দীর্ঘ তিন বৎসর হইতে মক্কার নীরব আকাবা প্রান্তরে এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যবস্থা করা হইতেছিল, তিন মাস পূর্বেও সেই আকাবার গভীর নিস্তব্ধ নিবিড় অন্ধকারের আড়ালে গুপ্ত পরামর্শ করা হইয়াছিল যে, নবীজী মোস্তফা (সঃ) মদীনায় আগমন করিবেন– আজ সেই পুণ্য প্রতিশ্রুতি সফল হইতে চলিয়াছে। মদীনার আনসার ও প্রবাসী মোহাজেরগণ বহু দিনের ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর নিজেদের আশাতীত সৌভাগ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে-উৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন।

মুসলিম মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নবীজীর প্রাঢালা অভ্যর্থনার জন্য মাতিয়া উঠিয়াছে। বনু নাজ্জার বংশের সশস্ত্র লোকগণ নবীজীর কাসওয়া উষ্ট্রীর অগ্রে-পশ্চাতে এবং দক্ষিণে বামে দল বাঁধিয়া চলিয়াছেন রাজকীয় শান প্রদর্শনে। স্থানে স্থানে খঞ্জর ও বর্শা চালাইয়া যুদ্ধ মহড়া প্রদর্শনীর ধুম চলিয়াছে। সমগ্র নগরের ছাদ ও বারান্দাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া গেল উৎসুক দর্শকদের ভিড়ে। এমনকি (তখন শরীয়তে পর্দার হুকুম ফরয হইয়াছিল না, তাই) অভিজাত মহিলারা পর্যন্ত নিজ নিজ গৃহের ছাদে আরোহণ করিয়া অনন্ত আবেগে তাকাইয়া ছিল নবীজীর দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষায়। সকলের অন্তরে আন্দ হিল্লোল বহিয়া যাইতেছিল নবীজীর আগমন আশায়। কী আনন্দ! কী আগ্রহ সকলের মনে! নর-নারী, ছোট-বড় সকলের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে মহা আনন্দের আভা। বালক-বালিকাদের বিরামহীন ছুটাছুটি চলিয়াছে সড়কে সড়কে, গলিতে গলিতে। তাহারা দফ্ বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে সর্বত্র আনন্দ ধ্বনি দিতে লাগিল আল্লাহু আকবার, জাআ-মুহাম্মদ । মুহাম্মদের শুভাগমন– ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। আল্লাহু আকবার, জাআ রসূলুল্লাহ! –আল্লাহর রসূলের শুভাগমন।

সকলের অন্তরে আজ নব কৌতূহল, চেহারায় তাঁহাদের আনন্দোচ্ছ্বাস, সম্মুখে তাঁহাদের কত কত রঙ্গীন স্বপ্ন; এই অতুলনীয় আনন্দ-উৎসবের মাঝে মহামানব নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বহন করিয়া তাঁহার কাসওয়া উষ্ট্রী ধীরে ধীরে নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। মদীনার বিশিষ্ট শ্রেণীর প্রায় পাঁচ শত গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ আগাইয়া আসিলেন নবীজী (সঃ)-কে স্বাগত জানাইবার জন্য। শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا ـ مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا ـ مَادَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ
اَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِيْنَا ـ جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ

"মোদের পরে পূর্ণ চাঁদের হয়েছে উদয়
সানিয়াতুল-অদা* পথে দেখ্‌বি যদি আয়।
শোকর করব মোরা সদা সর্বজনে
ডাকবে যাবত ধরা পৃষ্ঠে কেহ আল্লাহ পানে*
মহান তুমি আস্‌ছ ধরায় মোদের শান্তি নিয়ে
বরণ করব তোমায় মোরা প্রাণ ঢেলে দিয়ে।
(যোরকানী, ১–৩৫৯, বেদায়া ৩–১৯৭)

---

* মদীনা নগরে প্রবেশ প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ পর্বতমালার একটি বিশেষ স্থান।

* অর্থাৎ যাবত আল্লাহর নাম তথা জগতের অস্তিত্ব থাকিবে।

মদীনা নগরে নবীজী (সঃ)

মদীনার রাজপথে নবীজীর বাহন চলিতেছে। কত মনের কত আকাঙ্ক্ষা! নবীজী (সঃ) আমাদের গৃহে অবতরণ করিবেন! প্রত্যেক গৃহ হইতে নবীজী (সঃ)-কে সাদর আহ্বান জানানো হইতেছিল। নবীজীর (সঃ) অন্তরে এই ইচ্ছা বিদ্যমান ছিল যে, তিনি তাঁহার পিতামহের মাতুল বনু নাজ্জার গোত্রের কোন গৃহে অবতরণ করিয়া তাঁহাদের সম্মান বর্ধিত করিবেন। নবীজী (সঃ) তাঁহার মনোভাব মুখেও প্রকাশ করিয়াছেন–

اَنْزِلُ عَلٰى بَنِى النَّجَّارِ اَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اُكْرِمُهُمْ بِذٰلِكَ ـ

অর্থ ঃ "পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের মাতুল বনু নাজ্জার গোত্রে অবতরণ করিব; এতদ্দ্বারা আমি তাঁহাদের সম্মান বর্ধিত করিব।" (মুসলিম শরীফ) কিন্তু বনু নাজ্জার গোত্রের লোকও ত অনেক। প্রত্যেকেই নবীজী (সঃ)-কে প্রাণঢালা সাদর অভিবাদন জানাইতেছিলেন। নবীজী (সঃ) সকলের সহিত সমব্যবহার প্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহার অবতরণের ব্যাপারে নিজ ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। নবীজী (সঃ) সকলকে একই উত্তর দিতেছিলেন– "আমার উষ্ট্রীকে তাহার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দাও, সে আল্লাহর আদেশে চলিবে, আল্লাহর আদেশে বসিবে; আল্লাহ আমাকে যথায় অবতরণ করাইবেন আমি তথায়ই অবতরণ করিব। নবীজী (সঃ) সবাইকে এই উত্তর দিতে লাগিলেন এবং উষ্ট্রীর লাগাম শিথিল করিয়া দিলেন। উষ্ট্রী ধীরে ধীরে চলিয়া নাজ্জার গোত্রীয় আবু আইউব আনসারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ীর নিকটে পৌঁছিয়া বসিয়া পড়িল।

নবীজী (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার আপনজন (বনু নাজ্জার গোত্রের) কাহার গৃহ অধিক নিকটবর্তী? আবু আইউব আনসারী (রাঃ) আনন্দে গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, সর্বাধিক নিকটবতী আমার গৃহ এই আমার গৃহদ্বার। নবীজী (সঃ) তাঁহাকে বলিলেন, গৃহে যাইয়া আমাদের জন্য আরাম করার ব্যবস্থা করিয়া আস। তৎক্ষণাত আবু আইউব (রাঃ) গৃহে গেলেন এবং সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া আসিলেন। আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনাদের আরামের ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়াছি। আপনি ও আবু বকর (রাঃ) আল্লাহর বরকত ও মঙ্গলময়, আপনারা উভয়ে তশরীফ নিয়া চলুন। তাঁহারা সেই গৃহে তশরীফ নিয়া গেলেন। (বেদায়া ৩–২০০)

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) এবং তাঁহার সহিত নবীজীর পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) যিনি পূর্বেই হিজরত করিয়া আসিয়াছিলেন– উভয়ে নবীজীর (সঃ) আসবাবপত্র উঠাইয়া গৃহে নিয়া গেলেন। (যোরকানী, ১–৩৫৭)

বনু নাজ্জার বংশীয় কতিপয় বালিকা আনন্দে আত্মহারা হইয়া দফ্ বাজাইয়া আনন্দ গীত বা তারানা গাহিতে লাগিল–

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ ـ يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِّنْ جَارٍ ـ

"বনু নাজ্জার দুলালী মোরা আনন্দ মোদের চরম।
মুহাম্মদ মোদের পড়শী হলেন ভাগ্য মোদের পরম।"
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)

নবীজী (সঃ) তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমাকে ভালবাস? তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, কসম খোদার নিশ্চয় ইয়া রসূল্লাল্লাহ! নবীজী (সঃ) তাহাদের একবার উক্তির উত্তরে তিন বার বলিলেন, আমিও তোমাদেরকে ভালবাসিব– আল্লাহ সাক্ষী আছেন আমার অন্তর তোমাদেরে ভালবাসে (বেদায়া ৩–৩০০)

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শ ছিল–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا ـ

অর্থঃ "আমার উম্মতে শামিল নহে ঐরূপ ব্যক্তি যে ছোটদেরকে স্নেহ-মমতা ও আদর না করে এবং বড়দিগকে সম্মান না করে। (মেশকাত শরীফ, ৪২৩)

আবু আইউব আনসারীর (রাঃ) গৃহে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবতরণের পিছনে একটি ঐতিহাসিক পটভূমি রহিয়াছে। যাহার বিবরণ এই –

ঐতিহাসিকদের অগ্রগণ্য মত হিসাবে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্মের এক হাজার বৎসর পূর্বেকার ঘটনা– তখন ইয়ামানের বাদশাহদের পদবী ছিল "তুব্বা", যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। সেই "তুব্বা" পদবীর এক বাদশাহ– যিনি অতিশয় নেক ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন, তিনি কোন এক ভ্রমণে মদীনার এলাকায় পৌঁছিলেন; ঐ এলাকা তখন অনাবাদী। সঙ্গী আলেমগণ, যাঁহারা আসমানী কিতাবের খাঁটি এলম রাখিতেন, তাঁহাদের মারফত তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই এলাকায়ই সর্বশেষ পয়গম্বর "মুহাম্মদ" (সঃ) নামীয় রসূলের হিজরতের স্থান হইবে।

বাদশাহ এই ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাত হইতে পারিয়া ঐ অঞ্চলে আলেমদের একটি দলের বসতি স্থাপন করিয়া তাহা আবাদ করিলেন এবং অখেরী যমানার পয়গম্বর মুহাম্মদ (সঃ)-কে লক্ষ্য কলিয়া একখানা লিপিও লিখিলেন, যাহার মধ্যে তিনি হযরতের প্রতি স্বীয় ঈমান বিশ্বাস প্রকাশ করতঃ আখেরাতে তাঁহার শাফাআ'ত কামনা করিয়াছেন। পত্রখানা তথায় বসবাসকারী একজন আলেমের হস্তে অর্পণ করিয়া তাহা স্বয়ং বা তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণের পরম্পরা আখেরী যমানার পয়গম্বরের নিকট পৌঁছাইবার অসিয়ত করিয়াছিলেন।

সেই "তুব্বা" বাদশাহ হযরতের উদ্দেশে তথায় একটি বাড়ীও তৈয়ার করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন আবু আইউব আনসারী (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ী সেই "তুব্বা" বাদশাহ কর্তৃক তৈয়ারী বাড়ীর স্থানেই অবস্থিত। এমনকি সেই বাদশাহর উল্লিখিত লিপিখানাও হযরতের হস্তে পৌঁছিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। এক হাদীছে ইহাও বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা "তুব্বা-কে মন্দ বলিও না; সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। (তফসীর রুহুল মাআ'নী, ২৫–১২৭)

কোবা পল্লী সম্পর্কীয় ঘটনাবলী বর্ণনায় একটি হাদীছ

১৭০৯। হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা হইতে বাহির হইবার পরেই সারা মদীনায় খবর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা ত্যাগ করতঃ মদীনাপানে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। সেমতে মদীনার মুসলমানগণ প্রতিদিন ভোর হইতেই মদীনার বাহিরে আসিয়া হযরতের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাকিতেন, এমনকি রৌদ্রের উত্তাপে প্রস্থানে বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা অপেক্ষা করিতেন।

একদিন তাঁহারা ঐরূপ অপেক্ষা করতঃ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন। এমতাবস্থায় এক ইহুদী ব্যক্তি উঁচু টিলার উপর কোন আবশ্যকবশতঃ দাঁড়াইলে সে দূর হইতে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে সাদা পোশাকে দেখিতে পাইল! ইহুদী ব্যক্তি তাঁহাদিগকে দেখা মাত্র অধীর হইয়া উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল– হে আরব বংশধরগণ! তোমাদের অদৃষ্টের শুভ চন্দ্র উদিত হইয়াছে– যাহার অপেক্ষা তোমরা করিতেছিলে। এই সংবাদ শুনামাত্র মুসলমানগণ ফৌজী কায়দায় সুসজ্জিত হইয়া ছুটিয়া চলিল এবং মদীনার শহর প্রান্তের কাঁকরময় ময়দানে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করিল।

হযরত (সঃ) সঙ্গীগণকে লইয়া (মূল মদীনা শহরে আসিলেন না, বরং) ডান দিকের রাস্তায় অগ্রসর হইয়া বনী আম্র ইবনে আওফ গোত্রের বস্তিতে অবতরণ করিলেন। সেদিন রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার

ছিল। সাক্ষাতকারী লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইলেন; রসূলুল্লাহ (সঃ) চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মদীনাবাসী যাঁহারা পূর্বে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেন নাই তাঁহারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতিই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অতপর যখন হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শরীরে রৌদ্র আসিবার দরুন আবু বকর (রাঃ) আগাইয়া আসিয়া স্বীয় চাদরের সাহায্যে হযরতের উপর ছায়া দানের ব্যবস্থা করিলেন তখন সকলে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামকে চিনিতে পারিলেন।

ঐ বস্তিতে হযরত (সঃ) দশ দিনের অধিক অবস্থান করিলেন এবং তথায় একটি মসজিদ তৈয়ার করিলেন। * সেই মসজিদটির প্রশংসাই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হইয়াছে যে, "এই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে আল্লাহ তাআলার একনিষ্ঠ ভয়-ভক্তির উপর।" হযরত (সঃ) তথায় সেই মসজিদেই নামায পড়িয়া থাকিতেন। তারপর হযরত (সঃ) মূল মদীনায় পৌঁছিবার জন্য স্বীয় বাহনে আরোহণ করতঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্যান্য লোকগণ হযরতের (সঃ) পিছনে চলিতে লাগিলেন। হযরতের বাহন ঠিক ঐ স্থানে আসিয়া বসিয়া পড়িল যে স্থানে বর্তমানে রসূলল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মসজিদ অবস্থিত। তথায় হযরতের পৌঁছিবার পূর্ব হইতেই কিছু সংখ্যক মুসলমান নামায পড়িয়া থাকিতেন এবং ঐ স্থানটি বস্তুত মদীনাবাসী দুই এতীম ছেলের মালিকানায় ছিল, ঐ স্থানে খেজুর শুকান হইত। হযরত (সঃ) ঐ স্থানটি তাহার মালিক ভ্রাতাদ্বয়ের নিকট হইতে খরিদ করিতে চাহিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রসূল্লাল্লাহ! আমরা বিক্রি করিব না, বরং ইহা আপনাকে বিনা মূল্যে হেবা করিয়া দিব (একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই ইহার বিনিময়ের প্রত্যাশা রাখিব)। কিন্তু হযরত (সঃ) বিনা মূল্যে গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন না, অবশেষে হযরত (সঃ) মালিকদ্বয়ের নিকট হইতে তাহা খরিদ করিয়া লইলেন, তারপর তথায় মসজিদ তৈয়ারের ব্যবস্থা করিলেন। মসজিদ তৈয়ারকালে ইট-পাথর বহন করিয়া আনার কার্যে স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)ও শরীক হইয়াছেন এবং তিনি সেই ইটের বোঝা বহনকালে দুইটি বয়েত পড়িতেছিলেন–

هٰذَا الْحِمَالَ لَاحِمَالَ خَيْبَرْ ـ هٰذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاَطْهَرْ

"এই বোঝা জাগতিক ধন-দৌলতের বোঝা নহে; হে পরওয়ারদেগার! আমি বিশ্বাস করি, এই বোঝা দুনিয়ার ধন-দৌলতের বোঝা অপেক্ষা অনেক মূল্যবান, অনেক পবিত্র।"

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرَ الْاٰخِرَةْ ـ فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ ـ

"হে আল্লাহ! আখেরাতের প্রতিদান-পুরস্কারই আসল, অতএব আনসার ও মোহাজেরগণের প্রতি দয়া করুন– (তাহাদিগকে সেই পুরস্কার প্রতিদান পূর্ণরূপে দান করুন)।"

১৭১০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৫৬) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মদীনার দিকে আসিতেছিলেন, আবু বকর (রাঃ) তাঁহার পিছনে পিছনে ছিলেন। তিনি (বয়সে ছোট বটে, কিন্তু বাহ্যিক আকৃতিতে হযরত (সঃ) অপেক্ষা অধিক) বৃদ্ধ দেখাইতেন এবং তিনি বাহিরাঞ্চলের লোকদের নিকট পরিচিত ছিলেন (যেহেতু তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দেশ-বিদেশ ঘুরিতেন)। পক্ষান্তরে হযরত (সঃ) বয়সে বড় হইয়াও বাহ্যিক আকৃতিতে আবু বকর অপেক্ষা অধিক) বলিষ্ঠ দেখাইতেন এবং তাঁহাকে সাধারণত লোকেরা চিনিত না। পথিমধ্যে লোকদের সঙ্গে দেখা হইলে তাহারা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট হযরতের প্রতি ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিত তিনি কে? তখন আবু বকর (শত্রুর ভয়ে গোপনীয়তা অবলম্বনে) বলিতেন, এই লোক আমাকে পথ দেখাইয়া থাকেন। জিজ্ঞাসাকারী ইহার অর্থ "সাধারণ জাগতিক পথ" গণ্য করিত; আর আবু বকর (রাঃ) আখেরাতের পথ উদ্দেশ করিতেন। এইভাবে আবু বকর (রাঃ) স্বীয় উক্তিতে সত্যবাদী থাকিয়া মূল বিষয় গোপন রাখিতেন।

---

* সেই বস্তিটির নামই 'কোবা' তথায় এখনও সেই মসজিদ বিদ্যমান রহিয়াছে।

এক সময় আবু বকর (রাঃ) পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি দ্রুত ঘোড়া হাঁকাইয়া তাঁহাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইতেছে। তখন আবু বকর (রাঃ) আতঙ্কিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! ঐ দেখুন এক অশ্বারোহী ঘাতক শত্রু আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইতেছে। তখন হযরত পিছনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, اللهم اصرعه ইয়া আল্লাহ! এই মানুষটাকে পাছড়াইয়া ফেলুন। তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি (আবদ্ধরূপে) দাঁড়াইয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। ঐ লোকটি বলিল, হে আল্লাহর নবী! আমাকে যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব। (আমাকে রক্ষা করুন)। হযরত (সঃ) তাহাকে বলিলেন, সম্মুখের দিকে আর অগ্রসর হইও না এবং আমাদের পিছনে যে কাহাকেও আসিতে দেখিবে তাহাকে ফিরাইয়া দিবে। (সে ব্যক্তি তাহাই করিল– কাহাকেও হযরতের তালাশে আসিতে দেখিলে সে বলিত, এই দিকে যাইতে হইবে না, আমি সব দেখিয়া আসিয়াছি।)

আবু বকর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কুদরত! যেব্যক্তি দিনের প্রথম ভাগে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শত্রু বা ভক্ষক ছিল, সে-ই দিনের শেষভাগে তাঁহার মিত্র ও রক্ষক হইয়া দাঁড়াইল।

মদীনায় পৌঁছিয়া হযরত (সঃ) মূল শহরে আসিলেন না, বরং শহরের কিনারায় (কোবা নামক মহল্লায়) অবস্থান করিলেন। তথায় কয়েক দিন অবস্থান করার পর হযরতের (সঃ) মদীনা শহরে অবস্থান করিলেন। তথায় কয়েক দিন অবস্থান করার পর হযরত (সঃ) মদীনা শহরে অবস্থানকারী আনসারগণকে একদিন সংবাদ পাঠাইলেন। তাঁহারা হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং সালাম আরজ করিয়া নিবেদন জানাইলেন আপনারা উভয়ে এখনই যানবাহনে আরোহণ করিয়া মদীনা শহরে চলুন; আমরা আপনাদের চির খাদেমরূপে আজ্ঞাবহ থাকিব। হযরত নবী (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) বাহনে আরোহণ করিলেন। মদীনাবাসী আনসারগণ ফৌজী সজ্জায় সজ্জিত অবস্থায় তাঁহাদিগকে নিজেদের মধ্যস্থলে বেষ্টিতরূপে রাজকীয় শান-শওকতের সহিত মদীনায় নিয়া আসিলেন!

হযরত (সঃ) মদীনায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সারা মদীনা উল্লাস ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল– বাড়ী ঘরের ছাদ এবং উঁচু উঁচু টিলাসমূহের উপর হইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শুভাগমন ধ্বনি গর্জিয়া উঠিতে লাগিল।

এইরূপ স্বতস্ফূর্ত উল্লাস ধ্বনির মধ্য দিয়া হযরত (সঃ) অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে আবু আইউব আনসারী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ীর নিকটে আসিয়া অবতরণ করিলেন।

নবী (সঃ) আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার আপনজনের মধ্য হইতে কাহার বাড়ী নিকটবর্তী আছে? আবু আইউব আনসারী (রাঃ) আরজ করিলেন, আমি উপস্থিত আছি; আমার বাড়ীই সর্বাধিক নিকটবর্তী– এই আমার ঘর এবং এই আমার বাড়ীর গেট। হযরত (সঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আচ্ছা– বাড়ী যাও এবং আমার জন্য আরাম করার ব্যবস্থা কর। আবু আইউব (রাঃ) (তাহা করিলেন এবং) বলিলেন, আপনারা উভয়ে [হযরত (সঃ) এবং আবু বকর (রাঃ)] আমার বাড়ী তশরীফ নিয়া চলুন। আল্লাহ আমাদেরকে বরকত দান করিবেন। সেমতে হযরত নবী (সঃ) আবু আইউবের গৃহে তশরীফ আনিলেন।

১৭১১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৫৯) আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন হিজরত করিয়া মদীনা অঞ্চলে পৌঁছিলেন তখন প্রথম অবস্থায় তিনি মদীনার মূল শহরে আসেন না বরং তিনি মদীনার ঊর্ধ্ব প্রান্তে অবস্থিত বনু আম'র ইবনে আওফ গোত্রের (কোবা নামক) মহল্লায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় হযরত (সঃ) চৌদ্দ দিন অবস্থান করিলেন, অতপর (মদীনার সুপ্রসিদ্ধ গোত্র হযরতের দাদার মাতুল বংশ) বনু নাজ্জার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকগণকে সংবাদ দিলেন। তাঁহারা (হযরতের মনোবল দৃঢ় করার উদ্দেশে শান-শওকতের সহিত) ফৌজী সজ্জায় সজ্জিত হইয়া হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হযরত (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) সমভিব্যবহারে উটের উপর সওয়ার হইয়া মদীনা শহর পানে যাত্রা করিলেন। বনু নাজ্জার গোত্রের লোকগণ হযরত (সঃ)-কে চতুর্দিকে বেষ্টিত করিয়া

রাখিয়াছিল। আনাস (রাঃ) বলেন, সেই স্মৃতি এখনও যেন আমার চোখে ভাসে।

এইভাবে বিশেষ শান-শওকতের সহিত হযরত (সঃ) মদীনা শহরে পৌঁছিলেন এবং তাঁহার বাহনটি আবু আইউব আনসারী রাযিয়াল্লাহ তাআলা আনহুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িল। হযরত (সঃ) (শহরে তথায় অবস্থান করিলেন এবং তিনি) নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলে যথায় থাকিতেন তথায় নামায আদায় করিয়া লইতেন। এমনকি বকরী রাখার ঘরেও তিনি আবশ্যকবোধে নামায পড়িয়া থাকিতেন (তখন মসজিদের কোন ব্যবস্থা ছিল না)। অতপর হযরত (সঃ) মসজিদ তৈয়ারীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং (বর্তমান মসজিদে-নববীর স্থানটি ঐ সময় খেজুর বাগান ছিল, তাহা সম্পর্কে কথা-বার্তা চালাইবার উদ্দেশে) বনু নাজ্জার গোত্রের প্রধানদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা তোমাদের এই বাগানটির মূল্য কি চাও তাহা আমাকে বল। তাহারা বলিল, খোদার কসম আমরা মূল্য চাহি না, ইহার মূল্য আমরা একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট হইতে চাহি।

সেই বাগানটিতে ছিল কতিপয় মুসলিমের পুরাতন কবর এবং পুরান ঘর-বাড়ীর ভগ্নস্তূপ ও খেজুর বৃক্ষ। হযরত (সঃ) কবরগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ করিলেন ভগ্নস্তূপগুলি সমান করিয়া ফেলিতে এবং খেজুর বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। তাহাই করা হইল এবং খেজুর বৃক্ষগুলিকে মসজিদের কেবলার দিকে সারিবদ্ধাকারে গাড়িয়া দেওয়া হইল। মসজিদের দরজার উভয় চৌকাঠ পাথরের তৈয়ার করা হইয়াছিল। সেই পাথর (এবং ইট ইত্যাদি) উঠাইয়া আনিবার সময় ছাহাবীগণ তারানা গাহিতেছিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)ও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাদের তারানা এই—

اَللّٰهُمَّ لَاخَيْرَ اِلاَّ خَيْرَ الْاٰخِرَةْ - فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ -

"হে আল্লাহ! পরকালের উন্নতিই একমাত্র উন্নতি, অতএব আনসার ও মোহাজের জামাতকে সেই পথে সাহায্য করুন।"

আবু আইউব (রাঃ)-এর গৃহে নবীজী (সঃ)

আবু আইউব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহ ছিল দ্বিতল। তিনি নবীজী (সঃ)-কে উপর তলায় অবস্থানের অনুরোধ করিলেন। আরজ করিলেন হে আল্লাহর নবী! আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গীত; আপনার চরণ আমাদের মাথার উপর থাকিবে ইহাই অবধারিত। আমার পক্ষে সম্ভব নহে, আমি আপনার উপরে অবস্থান করিব। অতএব আমরা নীচের তলায় আসিয়া যাই, আপনি উপর তলায় তশরীফ নিয়া যাইবেন। নবী (সঃ) বলিলেন, আবু আইউব! আমার এবং আমার সাক্ষাত প্রার্থীদের জন্য সুবিধাজনক ইহাই যে, আমি নীচের তলায় থাকি। অগত্যা তাহাই হইল। আবু আইউব পরিবার উপর তলায় এবং নবীজী মোস্তফা (সঃ) নীচের তলায় থাকিলেন।

রাত্রিবেলা উপর তলার একটি পানির পাত্র ভাঙ্গিয়া গিয়া পানি ছড়াইয়া পড়িল। আবু আইউব (রাঃ) ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন যে, নীচের তলায় পানি পড়িলে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কষ্ট হইবে, তাই নিজেদের যে একমাত্র লেফ ছিল উহা সম্পূর্ণ ভিজাইয়া পানি মুছিয়া নিলেন।

এতদ্ভিন্ন আবু আইউব (রাঃ) এবং তাঁহার স্ত্রী এই ভাবিয়া ভীত থাকিলেন যে, আমরা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপরে আছি, আমরা তাঁহার উপরে চলাফেরা করি! এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা শয্যা ত্যাগ করিয়া কক্ষের এক কিনারায় সারা রাত্র বসিয়া থাকিলেন। ভোর বেলা নবীজী (সঃ)-কে সকল তথ্য অবগত করিয়া তাঁহাকে উপর তলায় যাইবার অনুরোধ করিলেন। নবী (সঃ) পূর্বের ন্যায় এইবারও সাক্ষাতপ্রার্থীদের সুবিধার কথা উল্লেখ করিলেন। কিন্তু আবু আইউব (রাঃ) উপরে থাকিতে কোন প্রকারেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে নবী (সঃ) উপর তলায় তশরীফ নিলেন, আবু আইউব পরিবার নীচের তলায় অবস্থান করিল।

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আহার্য তৈয়ার করিয়া নবীজী (সঃ)-এর সমীপে উপস্থিত করিলাম। নবী (সঃ) তাহা হইতে গ্রহণ করার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা আমাদের নিকট ফেরত পাঠাইতেন। আমরা লক্ষ্য করিতাম পাত্রস্থ খাদ্যের কোন্ স্থানে নবীজীর আঙ্গুলের চিহ্ন দেখা যায়? আমি এবং আমার স্ত্রী ঐ বরকতপূর্ণ স্থান তালাশ করিয়া তথা হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতাম। একদা আমরা ভীষণ উদ্বিগ্ন হইলাম যে, পাত্রস্থ খাদ্যের কোন স্থানেই নবীজীর আঙ্গুলির চিহ্ন দেখা যায় না; মনে হয় নবীজী (সঃ) পাত্র হইতে কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

আবু আইউব (রাঃ) বলেন, আমি অতিশয় ব্যস্ত-ত্রস্তভাবে নবীজীর খেদমতে উপস্থিত হইয়া খাদ্য গ্রহণ না করার হেতু জানিতে দরখাস্ত করিলাম। নবী (সঃ) বলিলেন, এই খাদ্যে পেয়াজের গন্ধ ছিল। তাই আমি খাই নাই। কারণ আমাকে ফেরেশতার সঙ্গে আলাপ করিতে হয়; বিন্দুমাত্র দুর্গন্ধেও ফেরেশতাগণের কষ্ট হয়। তোমরা ঐ খাদ্য খাইয়া নাও। অতপর নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খাদ্যে আর কোন সময় পেয়াজ রসুন দেওয়া হইত না। (যোরকানী, ১-৩৫৮)

পেঁয়াজ-রসুন খাওয়া সম্পর্কে মাসআলা ইহাই যে, যে সময় বা যেস্থানে ফেরেশতাগণের আনাগোনা থাকে বা লোকদের সহিত মেলামেশা হয়; ঐরূপ সময় ও ক্ষেত্রে পেয়াজ-রসুনের দুর্গন্ধ মুখে রাখিয়া উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ। সেমতে পেয়াজ-রসুন খাইয়া মসজিদে বা নামাযে গমন একেবারেই নিষিদ্ধ। অবশ্য যদি পেয়াজ-রসুন পূর্ণ পক্ক হয় যাহাতে দুর্গন্ধের লেশমাত্র নাই, তবে স্বতন্ত্র কথা।

আবু আইউব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে নবীজী (সঃ) অবস্থানকালে অন্যান্য ছাহাবীগণ নবীজীর জন্য খাদ্যসামগ্রী হাদিয়া দিয়া থাকিতেন। মদীনাবাসী যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন ঐ সময় সর্বপ্রথম আমি হাদিয়া নিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। একটি পাত্রে দুধ ও মাখনে খণ্ড-বিখণ্ড রুটি ভিজাইয়া রাখা হইয়াছিল যাহাকে "ছরীদ" বলা হয়। আমি ঐ খাদ্যের পাত্র লইয়া নবীজী (সঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া আরজ করিয়াছিলাম, আমার মাতা এই খাদ্য হাদিয়া পাঠাইয়াছেন। নবী (সঃ) উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত মঙ্গল ও উন্নতি দান করুন।" অতপর উপস্থিত সকলকে ডাকিয়া একত্রে ঐ খাদ্য খাইয়াছিলেন।

যায়েদ ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরে যাঁহার হাদিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তিনি হইলেন সা'দ ইবনে ওবাদা (রাঃ)। তিনি গোশ্‌তের সুরুয়ায় ভিজানো রুটি উপস্থিত করিয়াছিলেন। এইভাবে প্রতি দিনই বিভিন্ন ছাহাবীগণের খাদ্য হাদিয়া নবীজী (সঃ)-এর সমীপে উস্থিত হইয়া থাকিত। প্রত্যেক রাত্রেই দেখা যাইত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দ্বারে তিন-চারি জন ছাহাবী খাদ্যসামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। (বেদায়া, ৩-২০২)

নবীজীর (সঃ) পদার্পণে মদীনা

মদীনা নগরীর পূর্ব নাম ছিল "ইয়াসরেব"। নবী (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাহার নাম "মদীনা" হইবে (দ্বিতীয় খণ্ড ৯৫৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। "মদীনা" অর্থ নগরী বা শহর। সেমতে নবীজীর আগমনের পরে সাধারণভাবে ইহাকে "মদীনাতুন নবী" বলা হইত; অর্থাৎ নবীর শহর। অতপর সংক্ষেপে শুধু "মদীনা" শব্দই থাকিয়া যায়। তাহার সহিত একটি গুণবাচক শব্দ মিলাইয়া বলা হয় "মদীনা মোনাওয়ারা" অর্থাৎ নূরে পরিপূর্ণ নগরী। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পদার্পণে এই নগরীর প্রকৃত অবস্থার ইঙ্গিত তাহার আর একটি নামের দ্বারা পাওয়া যায়; সেই নামটি আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং স্থির করিয়াছেন।

মুসলিম শরীফের এক হাদীছে আছে– জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি ان الله سمى المدينة طابة নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মদীনার নাম 'তাবাহ' রাখিয়াছেন।

'তাবাহ' অর্থেই বিভিন্ন হাদীছে ইহার নাম 'তায়বাহ'ও উল্লেখ আছে। সাধারণভাবে গুণবাচক শব্দের সহিত এই নগরীকে "মদীনা তায়্যেবা"ও বলা হয়।

"তাবা, তায়বা ও তাইয়্যেবা" শব্দত্রয়ের এক অর্থ 'উৎকৃষ্ট', ভূপৃষ্ঠে মদীনা সত্যই সর্বোৎকৃষ্ট ভূখণ্ড। এমনকি অনেকের মতে নবীজীর আগমনে মদীনা মক্কা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত শব্দত্রয়ের আর এক অর্থ পাক-পবিত্র মদীনার ভূখণ্ডে মহা পবিত্রাত্মা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পদার্পণে মদীনা এমন পবিত্র হইয়াছিল যে, ইহুদী মোনাফেকদের ন্যায় অপবিত্রদের তথায় সাময়িক অবস্থান সত্ত্বেও তাহা আল্লাহ তাআলার নিকট পবিত্র গণ্য হইতেছিল। এমনকি অপবিত্রদেরকে বাহির করিয়া দেওয়ার বৈশিষ্ট্য মদীনার ভূমিতে আল্লাহ তাআলা প্রদান করেন, যাহার বিকাশ সাধারণভাবে সময় সময় ক্ষেত্রবিশেষে ত হইয়াছেই; কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মদীনার এই বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশ হইবে। এই তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৫৫ নং হাদীছে রহিয়াছে।

মদীনার সওগাত

আল্লাহ তাআলার রহমতে বিগত ১৯৬১ ইং সনে পবিত্র হজ্জের সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং ইসলাম ও ঈমানের প্রাণকেন্দ্র, মাহবুবে খোদার পবিত্র শহর সোনার মদীনায় হাযির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে পবিত্র মদীনাকে স্মরণ করিয়া এবং তাজদারে মদীনা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে দরূদ ও সালাম পেশ করিয়া একটি আরবী কাসীদাহ পাঠ করিয়াছিলাম। তখন বোখারী শরীফ চতুর্থ খণ্ড অনুবাদ লেখা হইতেছিল। পাঠকদের উপভোগের জন্য উক্ত কাসীদা "মদীনার সওগাত" নামে পেশ করিলাম।

أُحِبُّ الْأَرْضَ تَسْكُنُهَا سُلَيْمٰى - وَيَاتِيْهَا فُؤَادِيْ يُسْتَطَارُ

প্রিয় পাত্রের দেশ আমার নিকট বড়ই আদরণীয়, আমার অন্তর সেখানে উপস্থিত হইতে উড়িয়া আসে।

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِىْ - وَلٰكِنْ حُبُّ مَنْ حَوَتِ الدِّيَارُ

তথাকার দালান-কোঠা ইমারত ইত্যাদি আমাকে আকৃষ্ট করে না, কিন্তু তথায় যিনি বসবাস করিতেন তাঁহার মহব্বতই আমাকে আকৃষ্ট করে।

نَعَمْ حُبُّ الدِّيَارِ اَرْضٍ - بِهَا الْمَحْبُوْبُ فِىْ قَلْبِىْ يَفُوْرُ

হাঁ হাঁ, যেই দেশ প্রাণাধিক প্রিয় পাত্রের দেশ, সেই দেশের প্রতিটি ঘর-দুয়ারের প্রতি মহব্বতও নিশ্চয় আমার অন্তরে উথলিয়া উঠে।

مَدِيْنَةُ طَيْبَةٍ نَفْسِىْ فِدَاهَا - بِهَا اٰثَارُ مَحْبُوْبٍ تُزَارُ

আমার জান-প্রাণ মদীনা তাইয়্যেবার উপর উৎসর্গ; সেখানে মাহবুবে খোদার বহু নিদর্শনের জেয়ারত লাভ হয়।

وَتُرْبَةُ طَيْبَةَ كُحْلٌ لِعَيْنِىْ - وَاَطْيَبُ لَايُضَاهِيْهَا الْعَبِيْرُ

মদীনা তাইয়্যেবার মাটি আমার চক্ষের সুরমা এবং আমার জন্য এরূপ সুগন্ধি যাহার মোকাবিলায় মেশ্ক-আম্বরও অতি তুচ্ছ।

وَتُرْبَتُهَا عَلٰى رَاْسِىْ وَعَيْنِىْ - وَلِىْ فِيْهَا السَّعَادَةُ وَالسُّرُوْرُ

উহার মাটি আমার মাথার উপর ও চোখের উপর রাখি, উহার স্পর্শে আমার সৌভাগ্য ও শান্তি নিহিত রহিয়াছে।

بِهَا دَارُ الْحَبِيْبِ حَبِيْبِ رَبِّيْ ـ وَأَنْوَارٌ لَهَا دَوْمًا ظُهُوْرٌ

তথায় মাহবুবে খোদার আবাসিক ঘর-বাড়ী রহিয়াছে এবং সর্বদা তথায় নূরই নূর প্রকাশ পাইতেছে।

وَقُبَّةُ رَوْضَةٍ خَضْرَاءُ تَزْهُوْ ـ عَلٰى شَمْسٍ وَّبَدْرٍ يَّسْتَنِيْرُ

তথায় আরও আছে মাহবুবে খোদার রওজা পাকের "সবুজ গম্বুজ", যাহার নূরানী উৎকর্ষ চন্দ্র-সূর্য হইতেও অধিক।

وَرَوْضَةُ جَنَّةٍ فِيْ دَارِ دُنْيَا ـ تَعَالَوْا فَاقْبَلُوْا بُشْرٰى وَّزُوْرُوْا

তথায় আরও আছে ভূপৃষ্ঠে বেহেশতের বাগান। সকলে আসুন এবং তথায় প্রবেশের সুসংবাদ গ্রহণ করত তাহা স্বচক্ষে জেয়ারত করুন।

تَعَالَوْا فَادْخُلُوْهَا بِالسَّلَامِ ـ سُرُوْرٌ وَابْتِهَاجٌ وَّالْحُبُوْرُ

সকলে আসুন এবং সেই বেহেশতের বাগানে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করুন। তথায় আনন্দই আনন্দ, শান্তিই শান্তি, সুখই সুখ।

تَعَالَوْا يَاعُصَاةُ يَاضِيَاعُ ـ فَبَابُ مُحَمَّدٍ مَلْجَى طَهُوْرٌ

হে পাপী গোনাহগারগণ! হে নরাধমগণ! আস–আস; হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দ্বার ও দরবার তোমাদেরকে আশ্রয় দান এবং পরিচ্ছন্ন করিবে।

فَبَابُ مُحَمَّدٍ مَلْجَى لِجَانٍ ـ وَمَاوًى اِذْ تَرَاكَمَهُ الصَّغَارُ

তাঁহার দরজা গোনাহগারদের জন্য বিশেষ আশ্রয়স্থল এবং গোনাহগার যখন বিপদে বেষ্টিত হইয়া পড়ে তখন ঐ দরজা তাহার পক্ষে নিরাপদ স্থান।

وَبَابُ مُحَمَّدٍ مَاحِى الذُّنُوْبِ ـ وَلَوْ كَانَتْ تُعَادِلُهَا الْبُحُوْرُ

তাঁহার দরজায় উপস্থিত গোনাহসমূহ মুছিয়া দেয়, যদিও তাহা সমুদ্র পরিমাণ হয়।

وَمَنْ يَّاْتِيْ بِهٰذَا الْبَابِ يَوْمًا ـ سَيَغْفِرُ ذَنْبَهُ الرَّبُّ الْغَفُوْرُ

তাঁহার দরওয়াজায় যে ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, অচিরেই ক্ষমাশীল প্রভু আল্লাহ তাআলা তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন।

اَتَيْتُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَبْغِيْ ـ نَوَالَكَ مِنْ ذُنُوْبِيْ اَسْتَجِيْرُ

হে আল্লাহর রসূল! আপনার দরবারে আমি নরাধম হাযির হইয়াছি; আল্লাহর নিকট স্বীয় গোনাহের কুফল হইতে পানাহ চাহিতেছি, এ সম্পর্কে আপনার সুদৃষ্টি কামনা করি।

اَتَيْتُكَ تَائِبًا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ ـ رَجَاءً لِلشَّفَاعَةِ هَلْ تُجِيْرُ

খোদার দরবারে সমস্ত গোনাহ হইতে তওবা করতঃ শাফাআ'তের জন্য আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি– আশা করি আপনি আশ্রয় দান করিবেন।

وَمَنْ لِيْ مِنْ هَلَاكِيْ يَوْمَ يَاتِيْ ـ صَحَائِفُ سُوْءِ اَعْمَالِيْ تَطِيْرُ

কেয়ামতের দিন যখন আমার বদ-আমলের আমল নামা উড়িয়া আসিয়া আমার হাতে পৌছিবে তখন অধঃপতন হইতে রক্ষা পাইবার উসিলা আমার পক্ষে আর কে হইবে–

سِوَاكَ يَاشَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ ـ وَدُوْنَكَ يَاجَوَادُ يَابَشِيْرُ

আপনি ভিন্ন? আপনি সমস্ত গোনাহগারের পক্ষে শাফাআ'তকারী এবং দয়ার সাগর ও সুসংবাদ বহনকারী।

لَوَعْدُكَ بِالشَّفَاعَةِ حِرْزَ نَفْسِيْ ـ وَاَنَّكَ لَاتُخَيِّبُ مَن يَّزُوْرُ

আপনি স্বীয় উম্মতের শাফাআতের যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহাই আমার পক্ষে রক্ষাকবচ। আপনারই ওয়াদা যে, আপনার (রওজা) জেয়ারতকারীকে কস্মিনকালেও বঞ্চিত করিবেন না।

عَلَيْكَ صَلٰوةُ رَبِّىْ وَالسَّلَامُ ـ دَوَامًا مَّايُقَلِّبُنَا الدُّهُوْرُ

যাবত এই বিশ্ব ভূমণ্ডলের যুগ চালু থাকিবে তাবত আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম চলিতে থাকিবে।

وَرَحْمَةُ رَبِّنَا الاَفُ اَلْفِ ـ عَلَيْكَ الدَّهْرَ يَابَدْرُ الْمُنِيْرُ

হে পূর্ণিমার চন্দ্র! বিশ্ব প্রভুর কোটি কোটি রহমত আপনার উপর চিরকাল বর্ষিত হইক–আমীন! আমীন!

নবীজী (সঃ)-এর আগমনে মদীনাবাসীদের উল্লাস

১৭১২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৮৮) মদীনাবাসী বিশিষ্ট ছাহাবী বরা-ইবনে আ'যেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনায়) আমাদের নিকট সর্বপ্রথম মোসআ'ব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) আসিয়াছিলেন। তাঁহারা মদীনার লোকদিগকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন। অতপর বেলাল (রাঃ), সা'দ (রাঃ) এবং আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) আসিলেন। তারপর ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ছাহাবীদের কুড়ি জনের একটি দল লইয়া পৌঁছিলেন। তারপর হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পৌঁছিলেন।

ছাহাবী বরা ইবনে আ'যেব (রাঃ) বলেন, আমি মদীনাবাসীগণকে কখনও কোন বস্তু দ্বারা ঐরূপ উল্লাসিত হইতে দেখি নাই যেরূপ উলসিত হইয়াছিলেন তাঁহারা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আগমনে। এমনকি কচি-কাঁচা মেয়েরাও উল্লাসের সহিত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শুভাগমন-ধ্বনি দিতেছিল।

হিজরতের গুরুত্ব

ইসলামে মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, হিজরতের দ্বারাই ইসলাম ও মুসলমানদের মুক্তি এবং শক্তির সূচনা হইয়াছে। হিজরতের পরেই মদীনাকে কেন্দ্র করিয়া ইসলাম ও মুসলমানদের সার্বভৌমত্ব বিশ্ব বুকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবই নহে শুধু, বরং বাস্তবায়িত হইয়াছে। তাই ইসলামের ইতিহাসে এই হিজরতের গুরুত্ব অনেক বেশী; এমনকি এই মহান হিজরতকে মুসলমানদের নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য ইসলামী বৎসরের গণনা হিজরত হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।

ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতকালে মুসলমানদের স্বতন্ত্র বৎসর গণনার প্রয়োজন সাব্যস্ত করা হইলে হিজরী সনের আরম্ভ সম্পর্কে আলোচনা হইল। কাহারও প্রস্তাব হইল নবীজী (সঃ)-এর জন্ম হইতে আরম্ভের, কাহারও প্রস্তাব হইল নবীজীর (সঃ) মৃত্যু হইতে আরম্ভের। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে হিজরত হইতে আরম্ভ করাই সাব্যস্ত হয়। নবীজীর (সঃ) হিজরতের সূচনা ছিল আকাবা গিরি কান্তারে মদীনাবাসীদের

তৃতীয় বায়আ'ত বা দীক্ষা গ্রহণ– যাহা জিলহজ্জ মাসের মধ্য দিকে হইয়াছিল; ঐ ভাঙ্গা মাসের পরবর্তী মাসই ছিল "মহররম"। তাই মহররম মাস হইতে বৎসর আরম্ভের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। হিজরতকে কেন্দ্র করিয়া ইসলামী বৎসর গণনার বিষয়টি নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে–

১৭১৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৬০) عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قَالَ مَا عَدُّوْا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ مِنْ وَفَاتِهِ مَاعَدُّوْا اِلاَّ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِيْنَةَ -

অর্থ ঃ ছাহাবী সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলিয়াছেন, সনের গণনা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নবুয়তপ্রাপ্তির সময় হইতে আরম্ভ করা হয় নাই এবং তাঁহার মৃত্যুকাল হইতেও আরম্ভ করা হয় নাই। মদীনায় তাঁহার হিজরত উপলক্ষ করিয়াই ঐ গণনা আরম্ভ করা হইয়াছে। অতপর আমরা ইনশা আল্লাহ তাআলা হিজরী সালের ভিত্তিতে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর আলোচনা করিব।

হিজরী প্রথম বৎসর

এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইহুদী সম্প্রদায়ের ইসলামে প্রবেশ। মদীনায় ধন-দৌলত, শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে প্রথম নম্বরে ছিল ইহুদী সম্প্রদায়, পৌত্তলিকরা ছিল দ্বিতীয় নম্বরে। ইতিপূর্বে মদীনার আওস ও খাযরাজ পৌত্তলিক গোত্রদ্বয়ে ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল, নবীজী (সঃ) মদীনায় পদার্পণ করিলে মন্থর গতিতে এবং নগণ্য সংখ্যায় হইলেও ইহুদী সম্প্রদায়ে ইসলাম প্রবেশ করে। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই ইহুদীদের বিশিষ্ট বিজ্ঞ আলেম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ

১৭১৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৫৬) আনাছ (রাঃ) নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় প্রবেশের ধারাবাহিক বিবরণ দানে বলিয়াছেন, নবীজী (সঃ) আবু আইউব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর) বাড়ীর নিকটে অবতরণ করিলেন।

এখানে হযরত নবী (সঃ) স্বীয় লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। এমতাবস্থায় (ইহুদীদের অন্যতম বিশিষ্ট আলেম) আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বাগানে ফল-ফলারি আহরণ করিতে থাকাবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আগমন সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাত সেই আহরিত ফলের বোঝাসহ হযরতের নিকট ছুটিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত হযরতের কথাবার্তা শ্রবণ করিলেন এবং বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) পুনঃ হযরতের খেদমতে হাযির হইয়া ঘোষণা দিলেন, "আমি মনে-প্রাণে সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল, আপনি সত্য দ্বীন বহন করিয়া আনিয়াছেন।"

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হযরতের নিকট ইহাও আরজ করিলেন, ইহুদীগণ খুব ভালরূপেই জানে যে, আমি তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় একজন। আমার পিতাও তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং আমি তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম, আমার পিতাও তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন।* আপনি ইহুদীদেরকে ডাকিয়া এই বিষয়টি যাচাই করিয়া দেখুন। তাহাদিগকে আমার সম্পর্কে

* আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই বক্তব্য ও প্রচেষ্টা স্বীয় অহঙ্কার প্রকাশার্থে ছিল না, বরং আসল উদ্দেশ্য ছিল ইহুদীদের মধ্যে তাঁহার যে বাস্তব মর্যাদা ও উচ্চ স্থান রহিয়াছে তাহা হযরত (সঃ)-কে জ্ঞাত করা; যেন হযরত (সঃ) তাঁহার ইসলামের দ্বারা ইহুদীগণকে প্রভাবান্বিত করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরতের বিশেষ দৃষ্টির সৌভাগ্যও তিনি অধিক লাভ করিতে পারেন।

জিজ্ঞাসা করুন এর পূর্বে যে, তাহারা আমার ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারে। কারণ, (ইহুদী জাতি মিথ্যা অপবাদে বড়ই পটু;) তাহারা যখন জানিতে পারিবে যে, আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি তখন তাহারা আমার উপর দোষারোপ আরম্ভ করিবে।

সেমতে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহুদীগণকে সংবাদ দানের জন্য লোক পাঠাইলেন। তাহারা হযরতের নিকট উপস্থিত হইল। হযরত (সঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, হে ইহুদীগণ! তোমরা তোমাদের সর্বনাশা পরিণাম হইতে সতর্ক হও- তোমরা খাঁটিভাবে আল্লাহর ভয়-ভক্তি অবলম্বন কর, একমাত্র আল্লাই সকলের মা'বুদ, তিনি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই। নিশ্চয় তোমরা ভাল ভাবেই জ্ঞাত আছ যে, আমি আল্লাহর খাঁটি ও সত্য রসূল এবং আমি সত্য ধর্ম নিয়া তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। অতএব তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া লও। তাহারা উত্তরে বলিল, ইসলাম কি জিনিস তাহা আমরা জানি না, বুঝি না। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে তিন বার তাহাদের এইরূপ কথা কাটাকাটি হইল। অতপর হযরত (সঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কিরূপ ব্যক্তি গণ্য হইয়া থাকেন? তাহারা বলিল, তিনি ত আমাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ও সর্দার এবং সর্বাধিক বিজ্ঞ আলেম পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাঁহার পিতাও তদ্রূপই ছিলেন। হযরত (সঃ) বলিলেন, সেই আবদুল্লাহ ইবনে সালাম যদি ইসলাম গ্রহণকারী হয় তবে? তাহারা বলিল, আল্লাহর পানাহ- তিনি ইসলাম গ্রহণ করিবেন- ইহা সম্ভবই নহে। হযরতের সঙ্গে তাহাদের এই বিতর্ক তিন বার হইল। (আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) নিকটেই লুকাইয়া ছিলেন।) হযরত (সঃ) বলিলেন, হে ইবনে সালাম! তুমি বাহির হইয়া আস। তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং ইহুদীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে ইহুদী জাতি! তোমরা আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগাইয়া তোল। যেই আল্লাহ সকলের মা'বুদ, তিনি ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই; সেই আল্লাহর শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, তোমরা নিশ্চয় একনিষ্ঠরূপে জান এবং বুঝ যে, তিনি [নবী (সঃ)] আল্লাহর রসূল, তিনি সত্য ধর্ম বহন করিয়া আনিয়াছেন। ইহুদীগণ বলিল, আপনার এই কথা সত্য নহে।* অতঃপর (ঝগড়া সৃষ্টির আশঙ্কায়) হযরত (সঃ) ইহুদীদেরকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

১৭১৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৬১) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় আগমনের সংবাদ অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং আরজ করিলেন, আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব, যাহার সঠিক জ্ঞান একমাত্র নবীরই থাকিতে পারে-(১) কেয়ামত অতিশয় নিকটবর্তী হইয়া আসার আলামত কি? (২) বেহেশত লাভকারীগণের আতিথেয়তা সর্বপ্রথম কি বস্তুর দ্বারা করা হইবে, (৩) সন্তান পিতার বা মাতার আকৃতি লাভ করার সূত্র কি?

হযরত (সঃ) বলিলেন, এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনই (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে) জিব্রাঈল ফেরেশতা আমাকে জ্ঞাত করিয়া গিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলিলে, ইহুদীগণ ত জিব্রাঈলকে শত্রু মনে করিয়া থাকে। অতপর হযরত (সঃ) প্রশ্নগুলির উত্তর দান করতঃ বলিলেন, কেয়ামত অতিশয় নিকটবর্তী হইয়া আসার আলামত হইল, একটি আগুন বাহির হইবে- সেই আগুনটি লোকদিগকে পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তের দিকে হাঁকাইয়া নিয়া চলিবে। আর বেহেশত লাভকারীগণের সর্বপ্রথম খাদ্যবস্তু হইবে একটি মৎস্যের কলিজার ছোট টুকরা। আর (গর্ভাশয়ের মধ্যে নর-নারীর উভয়ের বীর্য মিলিত হওয়ার সময়) পুরুষের বীর্যের প্রাবল্য ও আধিক্য হইলে সন্তান পিতার আকৃতি ধারণ করে এবং নারী বীর্যের প্রাবল্য ও আধিক্য হইলে সন্তান মাতার আকৃতি ধারণ করে।

---

* এক হাদীছে আছে, প্রথমে ইহুদীগণ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) সম্পর্কে বলিয়াছেন- তিনি আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির সন্তান। আর তাঁহার ইসলাম প্রকাশের পর তাহারা বলিল, সে আমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সন্তান। তখন আবুদল্লাহ ইবনে সালাম (রঃ) বলিলেন; ইয়া রসূল্লাল্লাহ! ইহুদীদের এই মিথ্যা অপবাদের ভয়ই আমি করিতেছিলাম। অর্থাৎ তিনি যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা এই অপবাদের ভয়েই। তাহাদের অপবাদ তাহাদের মুখেই মিথ্যা প্রমাণ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তৎক্ষণাত বলিয়া উঠিলেন اشـهـد ان لا الـه الا الـلـه وانـك رسـول الـلـه "আমি মনে-প্রাণে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই এবং আপনি আল্লাহর রসূল।

হযরত (সঃ)-এর নিকট ইহুদী আলেমগণের উপস্থিতি

মদীনায় হযরতের আগমন সংবাদ প্রচারিত হইলে পর তথাকার সংখ্যাগুরু, আধিপত্য ও প্রতিপত্তিশালী জাতি ইহুদীদের আলেমগণ– যাহারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব মারফত হযরতের আবির্ভাব সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল, তাহারা হযরতের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্য হইতে অধিকাংশ ত সত্যকে সম্পূর্ণরূপে গোপন ও হজম করিয়া ফেলিল। তাহারা হযরত (সঃ)-কে পূর্ণরূপে চিনিয়া নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া সত্ত্বেও স্বীয় জ্ঞান-বিবেক এবং অন্তরের অটল সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করত তাঁহাকে অস্বীকার করিল। আর কিছু সংখ্যক ঐরূপও ছিল যাহারা উপরোক্ত দলের ন্যায় স্বীয় জ্ঞান-বিবেক ও অন্তরের অটল সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে না পারিয়া আপন লোকদের নিকট সত্য প্রকাশ করিল, কিন্তু স্বীয় সঙ্গীদের সমর্থন না পাওয়ায় আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কবলে পতিত হইয়া নিজের সিদ্ধান্ত বিসর্জন দিতে বাধ্য হইল। যেমন ইহুদীদের বিশিষ্ট গোত্র বনু নযীরের একজন সর্দার "আবু ইয়াসের ইবনে আখতাব" যে সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল এবং নিজ লোকদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিল– اطـيـعـونـى فـان هـذا الـنـبـى الـذى كـنـا نـنـتـظـر "তোমরা সকলে আমার কথা মান, নিশ্চয় তিনি সেই নবী যাঁহার আবির্ভাবের অপেক্ষা আমরা করিতেছিলাম।" কিন্তু তাহার ভ্রাতা "হুয়াই ইবনে আখতাব" সেও তাহাদের অন্যতম বিশিষ্ট সর্দার ছিল, সে ভ্রাতার উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিল এবং সর্বসাধারণও তাহার সঙ্গেই হইয়া গেল। (ফতহুল বারী, ৭–২২০)

ইহুদী আলেমগণ যদি সমবেতভাবে তাহাদের উপলব্ধিকৃত সত্য উপেক্ষা না করিত এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে রসূলরূপে গ্রহণ করিয়া নিত তবে গোটা ইহুদী সম্প্রদায় ইসলামের ছায়াতলে ছুটিয়া আসিত। এই বিষয়টি স্বয়ং হযরত (সঃ) নিম্নোক্ত হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন।

১৭১৬। হাদীছ ঃ عـن ابـى هـريـرة رضـى الـلـه تـعـالـى عـنـه عَـنِ الـنَّـبِـىِّ صَلَّـى الـلّٰـهُ عَلَـيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اٰمَنَ بِىْ عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لَاٰمَنَ بِىْ الْيَهُوْدُ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইহুদীদের মধ্যে (তাহাদের আলেম শ্রেণীর দশ জন লোক এমন রহিয়াছে, সেই) দশ জন লোক আমার প্রতি ঈমান আনিলে গোটা ইহুদী সম্প্রদায় আমার প্রতি ঈমান আনিত।

ব্যাখ্যা ঃ আলেমদের পদস্খলনে গোটা জাতিরই পদস্খলন হইয়া থাকে; সেই সূত্রেই আলেমদের ঘাড়ে মস্ত বড় দায়িত্ব এবং গোনাহের বোঝাও বড় হইবে, সুতরাং আলেমকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

মসজিদে নববী নির্মাণ

মদীনার মূল শহরে পৌঁছিবার পর নবী (সঃ) মসজিদ তৈয়ারীর পকিল্পনা নিলেন, মসজিদকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার আবাসিক গৃহ তৈয়ার হইবে এই ইচ্ছাও হয়ত তিনি পোষণ করিতেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মদীনা নগরীতে প্রবেশকালে নবীজী (সঃ) তাঁহার "কাসওয়া" উষ্ট্রীর উপর আরোহিত ছিলেন এবং নিজের অবতরণ সম্পর্কে বলিয়া দিয়াছিলেন, উষ্ট্রী আল্লাহর হুকুমে চলিবে; যথায় ইচ্ছা বসিবে, তিনি তথায়ই

অবতরণ করিবেন। উষ্ট্রী আবু আইউব (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ী নহে, বরং বাড়ীর নিকটবর্তী একটি উন্মুক্ত স্থানে বসিল। তখন নবী (সঃ) বলিয়াছেন, هذ المنزل ان شاء الله "ইনশাআল্লাহ ইহাই আমার বাসস্থান হইবে।"

অতপর উট হইতে অবতরণ করিতে নবীজী (সঃ) বলিয়াছিলেন–

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلاً مُّبَارَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ـ

অর্থ ঃ হে পরওয়ারদেগার! আমাকে যে স্থানে অবতরণ করাইয়াছ উহাকে বরকতপূর্ণ করিয়া দাও; উত্তম স্থানে অবতরণ করানো তোমারই কাজ। (ওয়াফাউল ওয়াফ, ১–২৩০)

মসজিদ তৈরীর পকিল্পনা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত ভূখণ্ডকেই নবী (সঃ) মসজিদের জন্য নির্বাচন করিলেন। ঐ ভূখণ্ডের এক পার্শ্বে উট বাঁধা হইত, একদিকে খেজুর শুকানোর খলা ছিল, এক খণ্ডে প্রাচীন গোরস্থান ছিল, কিছু অংশে খেজুর বাগানও ছিল। ঐ ভূখণ্ডটির মালিক ছিল দুই জন এতীম বালক; তাঁহারা স্বয়ং এবং তাঁহাদের অভিভাবক বিশিষ্ট ছাহাবী আস'আদ ইবনে যোরারা (রাঃ) সকলেই ঐ ভূখণ্ড মসজিদের জন্য বিনা মূল্যে দান করিতে চাহিলেন। কিন্তু নবী (রাঃ) বিনা মূল্যে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। এমনকি ঐ ভূস্বামীদের গোত্র বনু নাজ্জার সকলেই উক্ত দান গ্রহণ করিতে নবীজী (সঃ)-কে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু নবী (সঃ) শেষ পর্যন্ত সম্মত হইলেন না। ভূখণ্ডের মূল মালিক দুই এতীম বালক, তাই এতীমের মালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনেই হয় ত নবীজী (সঃ) তাহা বিনা মূল্যে গ্রহণের সর্বপ্রকার আবেদন-নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে এই ভূখণ্ডের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করা হইল দশ দীনার স্বর্ণ মুদ্রা এবং ঐ মূল্য আবু বকর (রাঃ) পরিশোধ করিয়াছিলেন। (ঐ ২৩১)

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শ কত সুন্দর ও কত সরল। মসজিদের ভূমি সংগ্রহ করিয়া মসজিদ নির্মাণ কার্য সম্পাদনে স্বয়ং নবীজী (সঃ) নিজে সামান্য দিনমজুরের মত ইট ও পাথরের মোট বহনে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আনসার ও মোহাজেরগণ কার্য সম্পাদনে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহারা ছুটিয়া আসিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন–

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِىُّ يَعْمَلُ ـ ذَاكَ اِذاً لَلْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ ـ

আমরা যদি বসিয়া থাকি আর নবী (সঃ) পরিশ্রম করেন, তবে ইহা জঘন্য ধৃষ্টতার কাজ। (ঐ ১৩৫)

নবীজীর (সঃ) সঙ্গী হইয়া ভক্ত ছাহাবীগণ মসজিদ তৈয়ার করিতেছেন– তাঁহাদের উৎসাহের সীমা আছে কী? আনন্দে-উৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া এই মোহাজরগণ সমবেত কণ্ঠে তারানা গাহিয়া যাইতেছিলেন; নবীজী মোস্তফা (সঃ)ও তাঁহাদের সহিত কণ্ঠ মিশাইয়া উৎসাহ যোগাইবার জন্য সেই তারানা গাহিতেছিলেন। ১৭০৯ নং হাদীছে সেই তারানার দুইটি ছড়া এবং ১৭১১ নং হাদীছে আর একটি ছড়ার উল্লেখ হইয়াছে।

নবীজী (সঃ) এবং ছাহাবীগণের সমবেত প্রচেষ্টায় মসজিদ নির্মিত হইল। এই প্রথম নির্মাণকালে মসজিদটির দৈর্ঘ্য সত্তর হাত, প্রস্থ ষাট হাত, উচ্চতা সাত হাত ছিল। পবরর্তীকালে নবীজীর (সঃ) আমলেই প্রয়োজনবোধে এ মসজিদের প্রথম সম্প্রসারণ হয়– দৈর্ঘ্যে একশত হাত, প্রস্থেও একশত হাত।

(ওয়াফাউল ওয়াফা– ১)

মূল মসজিদ তৈয়ারীর পর এক সময় নবীজী (সঃ) মসজিদ সংলগ্ন উহার একটি বারান্দাও তৈয়ার করেন। এক বর্ণনায় ঐ বারান্দা তৈয়ারীর সময়কালও নির্ণীত হয়। মসজিদ যখন তৈয়ার হয় তখন নামাযের কেবলা ছিল বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে, যাহা মদীনা হইতে উত্তরে। হিজরতের ১৬ বা ১৭ মাস পরে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হইয়া নামাযের কেবলা কা'বা শরীফের দিকে নির্ধারিত হয় । যাহা মদীনা হইতে দক্ষিণ দিকে। এইভাবে বিপরীত দিকে কেবলা পরিবর্তিত হইলে মসজিদেরও সম্মুখ-পশ্চাৎ পরিবর্তিত হয়। প্রথমে মসজিদের সম্মুখ তথা কেবলা দেওয়াল ছিল উত্তর দিকস্থ দেওয়াল। কেবলা পরিবর্তন হইলে মসজিদের

সম্মুখ হইয়া যায় দক্ষিণ দিকের দেওয়াল এবং স্বভাবতই মসজিদে প্রবেশ পথ উত্তর দিকের দেওয়ালে করিতে হয়। এই সময় উত্তর দিকের দেওয়ালের গায়ে খেজুর পাতার একখানা চাল সংযোগ করিয়া সম্মুখ দিকে উন্মুক্ত একটি বারান্দা বা চাতাল তৈয়ার করা হয় (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১-৩২১)।

উল্লিখিত চাতাল বা বারান্দাকেই আরবি ভাষায় "সোফ্‌ফা" বলা হয়। নিঃসম্বল, নিঃস্ব, নিরাশ্রয় সর্বহারা মুসলমান– মদীনাতে যাহাদের কোন আপনজন বা আশ্রয়স্থল নাই, এই শ্রেণীর লোকদের সাময়িক আশ্রয়ের জন্য নবীজী (সঃ) ঐ বারান্দা তৈয়ার করিয়াছিলেন। "সোফ্‌ফা" অর্থ বারান্দা, এই সূত্রেই তথায় আশ্রয় গ্রহণকারীগণকে "আসহাবে সোফ্‌ফা বা বারান্দার আশ্রিত" আখ্যায় স্মরণ করা হইত।

এই অস্থায়ী আশ্রয় জীবনে বিভিন্ন সূত্র সমন্বয়ে তাঁহাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হইত। তাঁহারা নিজেরাও জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া কিছু জোটাইতেন এবং খেজুর বাগানের মালিক আনসারগণও নিজ নিজ সাধ্যমতে কিছু খেজুরের ছড়া মসজিদে ঝুলাইয়া রাখিয়া যাইতেন। আর নবী (সঃ) নিজে এবং অন্যান্য মুসলমানগণ নিজ নিজ গৃহে তাঁহাদিগকে মেহমানরূপে নিয়া যাইতেন। নিঃস্ব নিঃসম্বল হওয়ায় তাঁহাদের আর্থিক দুর্বলতা ছিল চরম, তাই তাঁহাদের পরিধেয়ও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইত। পারিবারিক জীবনের সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের সাংসারিক কোন ব্যস্ততা হইত না। তাঁহারা এই সুযোগ এক মহান কাজে ব্যয় করিতেন। তাঁহারা সর্বদা নবীজী (সঃ)-এর সঙ্গে চাপিয়া থাকিয়া দ্বীনের শিক্ষা কোরআন-হাদীছের চর্চায় লিপ্ত থাকিতেন। মদীনার বাহিরে কোথাও শিক্ষকের চাহিদা হইলে নবী (সঃ) তাঁহাদের হইতেই শিক্ষক পাঠাইতেন।

স্মরণ রাখিবেন, মসজিদে নববীর এই বারান্দায় আশ্রয় লাভকারী আসহাবে সোফ্‌ফাগণ কোন স্থায়ী ও বিশেষ সম্প্রদায় ছিল না– যেরূপ হইয়া থাকে হিন্দুদের মধ্যে যোগী-সন্ন্যাসী, বৈরাগী বা ভিক্ষু সম্প্রদায়।

নবীজীর (সঃ) সুন্নত, ইসলামের আদর্শ পারিবারিক জীবন লাভের সংস্থান সাপেক্ষে সাময়িক আশ্রয় গ্রহণরূপে তাঁহারা ঐ বারান্দায় আশ্রয় লইতেন। আদর্শগত সাধারণ জীবিকার সুযোগ যখনই যাঁহার লাভ হইত তখনই তিনি ঐ আশ্রয় হইতে কাটিয়া পড়িতেন। আসহাবে সোফ্‌ফাগণের স্বরূপ নির্ণয়ে মদীনার ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ "ওয়াফাউল ওয়াফা" গ্রন্থে বোখারী শরীফের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) হইতে উদ্ধৃতি বিদ্যমান আছে–

الصفة مكان فى مؤخر المسجد النبوى مظلل اعد لنزول الغرباء فيه ممن لاماوى له ولا اهل وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم او يموت او يسافر -

অর্থাৎ "সোফ্‌ফা" একটি বিশেষ স্থান, যাহা মসজিদে নববীর পিছনে (কেব্‌লার দিকের বিপরীত দিকের প্রান্তে)উপরে চাল বা ছাপ্পর দেওয়া ছিল। গরীব দুস্থ, যাঁহাদের ঘর-বাড়ী, পরিবার-পরিজন না থাকিত, ঐরূপ লোককে আশ্রয় দেওয়ার উদ্দেশে উহা তৈয়ার করা হইয়াছিল। তথায় আশ্রয়ীগণের সংখ্যা সময়ে বেশী, সময়ে কম হইত এইভাবে যে, তাঁহাদের কেহ বিবাহ করিয়া পারিবারিক জীবনের সংস্থান করিয়া লইতেন, কাহারও মৃত্যু হইত, কেহ অন্যত্র চলিয়া যাইতেন।

সারকথা, সোফ্‌ফা বা এ বারান্দায় কোন বিশেষ সম্প্রদায় সৃষ্টি করা মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না, সাময়িক আশ্রয় দানের ব্যবস্থা ছিল মাত্র। তথায় আশ্রয় গ্রহণকারী সকলেই সুযোগ মতে সাধারণ জীবন যাপনে চলিয়া যাইতেন। আসহাবে-সোফ্‌ফাগণের একজন প্রসিদ্ধ সদস্য ছিলেন আবু হোরায়রা (রাঃ)। তিনি পরবর্তী জীবনে এক প্রদেশের গভর্ণরও হইয়াছিলেন।

তৎকালীন মসজিদে নববী

ইসলাম বাহ্যিক আড়ম্বর পছন্দ করে না, সর্বক্ষেত্রে সরলতাই ইসলামের আদর্শ। তদুপরি ঐ যুগে বিশেষতঃ মরু অঞ্চল মক্কা-মদীনায় লোকদের সাধারণ আবাস গৃহও অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানেরই ছিল।

সেমতে মসজিদে নববীর নির্মাণও ঐ শ্রেণীর ছিল। কাঁচা ইটের প্রাচীর, খেজুর গাছের আড়া ও খুঁটি এবং খেজুর পাতার ছাপ্পর, বৃষ্টি হইলে পানি ঝরিত। এই ছিল তৎকালীন মসজিদে নববীর আকৃতি (বাংলা বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ড ২৯১ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। তাহাতে ছিল না কোন সমুচ্চ গুম্বজ, ছিল না সুদীর্ঘ মিনার।*

অনাড়ম্বররূপে তৈয়ারী ঐ মসজিদটি নবীজীর গুরুত্বপূর্ণ জীবনের দশটি বৎসর এবং তাঁহার পরেও খলীফাগণের আমলে শুধু কেবল নামায বা এবাদতের স্থানই ছিল না; বরং এই মসজিদই ইসলামের সর্বপ্রকার জরুরী কার্যের প্রধানতম বরং একমাত্র কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এমনকি বৈদেশিক রাজন্যবর্গের সহিত সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়াবলীর উপর ফরমান জারির কেন্দ্রও এই মসজিদই ছিল এবং এই খেজুর পাতার মসজিদেরই এত বড় প্রভাব ছিল যে, উহার সম্মুখে আসিলে পারস্য ও রোম মহাদেশের রাজদূতগণের কলিজাও কাঁপিয়া উঠিত।

নবীজী (সঃ)-এর আবাসিক গৃহ তৈয়ার

পূর্বেই বলা হইয়াছে, নবীজীর উষ্ট্রী ঐ স্থানে বসিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নবী (সঃ) বলিয়াছিলেন– ইনশা-আল্লাহ ইহাই আমার বাসস্থান হইবে। তাই মসজিদ তৈয়ারর পরেই নবীজী (সঃ) তাঁহার সেই সঙ্কল্প বাস্তবায়ন করিলেন। ঐ সময় নবীজীর সহধর্মিনী ছিলেন দুই জন– সওদা (রাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ)। অবশ্য আয়েশা (রাঃ)
তখনও নবীজীর গৃহিণী হইয়াছিলেন না। কিন্তু নবীজীর কন্যাগণ ত ছিলেন। তাই নবীজী (সঃ) মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে মসজিদেরই সমান সামনে কাঁচা ইট এবং খেজুর গাছ ও পাতার দুইটি কক্ষ তৈয়ার করিলেন। পরবর্তীকালে প্রয়োজনমত আরও নয়টি কক্ষ তৈয়ার করিয়াছিলেন; কক্ষগুলি সবই মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছিল, অবশ্য মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে কোনে কক্ষ ছিল না। (ওয়াফাউল ওয়াফা, ১–৩২৫)

নবীজীর কক্ষগুলি কাঁচা ইট, খেজুর গাছের খুঁটি ও আড়া এবং খেজুর পাতার উপর মাটি ফেলিয়া ছাদ– এই আকৃতিতে তৈয়ার ছিল। দরজায় মেষের লোমে বুনা চট ঝুলানো ছিল। এই ছিল সরদারে দো-জাহান বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গৃহের আকৃতি– যথায় তিনি সারা জীবন পরিবার পরিজন নিয়া বসবাস করিয়া গিয়াছেন। কত কত এলাকা তিনি জয় করিয়াছিলেন, তথাকার ধন-সম্পদ হস্তগত করিয়াছিলেন; কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার গৃহ ঐ আকৃতিরই ছিল। প্রায় শতাব্দীকালের পর ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের শাসন আমলে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ প্রয়োজন হইলে ঐ কক্ষসমূহ ভাঙ্গিয়া মসজিদ বর্ধিত করা হইয়াছে।

কক্ষসমূহ উচ্ছেদ উপলক্ষে ছাহাবী তনয় তাবেয়ীগণের অনেকে মসজিদে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন– "কক্ষগুলি বিদ্যমান রাখিতে পারিলে কত ভাল হইত। পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ লাভের সুযোগ হইত তাহারা বাড়ী-ঘরের মান নিম্নের রাখিত; তাহারা দেখিতে পাইত– আল্লাহ তাঁহার নবীর জন্য কিরূপ বাসস্থান পছন্দ করিয়াছিলেন। অথচ নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্তে বিশ্ব ধনভাণ্ডারের চাবিগুচ্ছ প্রদত্ত ছিল।" (ঐ ৩২৭)।

মক্কা হইতে নবীজী (সঃ)-এর পরিবারবর্গ আনয়ন

মসজিদ এবং উহার সঙ্গে আবাস গৃহের দুইটি কক্ষ তৈয়ার হওয়ার পর হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয়

* কবি গোলাম মোস্তফা সঙ্কলিত "বিশ্বনবী" গ্রন্থের বিবরণ– "চারি কোণে চারিটি মিনার ছিল, ইহার সুউন্নত মিনার তখনকার দিনে বাস্তবিকই এক নূতন শিল্প বলিয়া পরিগণিত হইত।"

উক্ত গ্রন্থের এই সব বর্ণনাদৃষ্টে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত মনে পড়ে; আয়াতটির মর্ম হইল– "তোমরা লক্ষ্য কর না কবিগণ হর রকম ময়দানেই (এমনকি শুধু কল্পনার ময়দানেও চক্কর খাইতে থাকে। (পারা– ১৯, রুকু– ১৫)।

পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) এবং বিশিষ্ট খাদেম আবু রাফে'কে মক্কায় প্রেরণ করিলেন উম্মুল মোমেনীন সওদা (রাঃ) এবং তৃতীয় কন্যা উম্মে কুলসুম ও কনিষ্ঠা কন্যা ফাতেমা জোহরাকে নিয়া আসিবার জন্য। হযরতের দ্বিতীয় কন্যা রোকাইয়া (রাঃ) স্বীয় স্বামী ওসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে পূর্বেই মদীনায় পৌঁছিয়াছিলেন এবং জ্যেষ্ঠ্য কন্যা তখনকার অমুসলিম স্বামী আবুল আ'ছের নিকট আবদ্ধ ছিলেন, আর উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) স্বীয় পিতা আবু বকরের (রাঃ) পরিবারবর্গের সঙ্গেই ছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহকে মক্কায় পাঠাইলেন স্ত্রী উম্মে রুমান, পুত্র আবদুর রহমান এবং কন্যা আস্‌মা ও উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ)-কে নিয়া আসিবার জন্য।

হযরতের পরিবারবর্গ মদীনায় পৌঁছিলে হযরত (সঃ) আবু আইউব আনসারীর গৃহ ত্যাগ করতঃ মসজিদ সংলগ্ন তৈয়ারী স্বীয় বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন।

মদীনায় নবীজী (সঃ) কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়াপত্তন

আল্লাহ তাআলার দাসত্ব পালন ও প্রতিষ্ঠা উভয়টি ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু দাসত্ব পালন হইল প্রথম নম্বরে, আর দাসত্ব প্রতিষ্ঠা হইল দ্বিতীয় নম্বরে। তাই ইসলামের মক্কী জীবনে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়াপত্তনে তৎপরতা অবলম্বিত হয় নাই, এমনকি জেহাদের অনুমতিও দেওয়া হয় নাই। অবশ্য মুসলমানকে আল্লাহর দাসত্ব পালনের সুযোগপ্রাপ্তির সাথে সাথে উহা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং পরিকল্পনাও গ্রহণ করিতে হয়। মক্কায় আল্লাহর দাসত্ব পালনেরই সুযোগ ছিল না। মদীনায় আসার পর নবীজী (সঃ) এবং মুসলমানগণ সেই সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। এমনকি আল্লাহর দাসত্ব পালনে এবাদত বন্দেগীর কেন্দ্র মসজিদও নবীজী (সঃ) তৈয়ার করিয়া সারিলেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার কর্ম পরিকল্পনা এত দ্রুত ধাবমান করিলেন যে, বিরতিহীনরূপে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। আল্লাহর দাসত্ব পালনের সুযোগপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহা পালন করিয়া যাওয়ার সার্বিক ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়াই নবীজী (সঃ) তাহার প্রতিষ্টার চেষ্টায় অগ্রসর হইলেন।

নবীজী (সঃ) এই পকিল্পনায় সর্বপ্রথম মদীনা এলাকাকে গৃহযুদ্ধমুক্ত শান্তির এলাকায় পরিণত করার ব্যবস্থা করিলেন। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা না থাকিলে কোন কাজেরই অগ্রগতি সাধন সম্ভব হয় না। এই পদক্ষেপে নবীজী (সঃ) মদীনার বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সহাবস্থান চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করিলেন।

মদীনার আদি অধিবাসীর পৌত্তলিক গোত্রগুলিতে ইসলামের প্রভাব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে মুসলমানগণ প্রবল ছিলেন– যাঁহারা আনসার নামে আখ্যায়িত ছিলেন। আর এক শ্রেণী ছিলেন প্রবাসী মুসলমান, মদীনায় তাঁহাদেরও সংখ্যা যথেষ্ট ছিল; তাঁহারা মোহাজের নামে আখ্যায়িত ছিলেন। মদীনার আদি অধিবাসী আর এক সম্প্রদায় ছিল ইহুদী; নবীজীর (সঃ) আগমনের পূর্বে মদীনায় তাহাদেরই প্রাবল্য এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

মুসলমানদের দুই শ্রেণী– আনসার ও মোহাজের এবং ইহুদী সম্প্রদায়, এই তিন শ্রেণীকে নবী (সঃ) সহাবস্থান ও মদীনার দেশরক্ষা চুক্তিতে এক করার ব্যবস্থা করিলেন।

আনসার মোহাজের ও ইহুদীদের মধ্যে সহাবস্থান চুক্তির ঐতিহাসিক সনদ সম্পাদন

সনদটির শিরোনাম ছিল নিম্নরূপ–

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইহা কোরায়শ বংশীয় (প্রবাসী বা মোহাজের) মুসলমান আর মদীনাবাসী মুসলমান এবং তাঁহাদের সহিত যাহারা দেশরক্ষা ও শান্তি অভিযানে অংশগ্রহণ করিবে– সকলের মধ্যে নবী মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক সম্পাদিত সনদ।

সনদটির সর্বপ্রথম অনুচ্ছেদ ছিল এই–

"স্বাক্ষরকারী সকল দল অন্য সকলের মোকাবিলায় এক গণ্য হইবে।" অর্থাৎ চুক্তি বা সনদের মর্ম ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উহার বিরোধীদের মোকাবিলায় স্বাক্ষরকারীগণ অভিন্নরূপে সংগ্রাম করিবে।

অতপর সনদের মধ্যে অনেক অনুচ্ছেদই ছিল, তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ কতিপয় অনুচ্ছেদ এই–

১। ইহুদী সম্প্রদায়– যাহারা আমাদের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরে যোগ দিয়াছে, তাহাদের জন্য সাহায্য এবং (নাগরিকত্বের) সমান সুযোগ থাকিবে। তাহাদের কাহারও প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না, তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধে তাহার শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করা হইবে না।

২। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ইহুদীদের সপক্ষে আরও একটি ধারা ছিল, তাহারা নিজেদের ধর্মীয় স্বাধীনতা পাইবে।

৩। ইহুদীদের কেহ মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন যুদ্ধে অবতরণ করিতে পারিবে না।

৪। সনদে স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায়ের প্রতি কাহারও আক্রমণ হইলে অন্য স্বাক্ষরকারীগণ ঐ সম্প্রদায়ের সাহায্য-সহায়তা করিবে। অবশ্য অন্যায়ের ক্ষেত্রে কোন সাহায্য করা হইবে না।

৫। স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়গণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে মুসলমানদের ন্যায় ইহুদীগণও ব্যয়ভার বহনে বাধ্য থাকিবে– যাবত যুদ্ধ চলিতে থাকে।

৬। স্বাক্ষরকারী এক মিত্র অপর মিত্রকে তাহার অন্যায়ে সাহায্য করিবে না, সর্বক্ষেত্রে অত্যাচারিতের পক্ষে সাহায্য থাকিবে।

৭। স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায় সমবেতভাবে ইয়াসরেব (মদীনা) এলাকাকে রক্ষা করিতে এবং অপরাধমুক্ত রাখিতে বাধ্য থাকিবে।

৮। স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায় মক্কার কোরায়শদের বা তাদের কোন মিত্রকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারিবে না।

৯। সকল মোমেন মোত্তাকী ঐ শ্রেণীর প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত থাকিবে, যে অবাধ্য হয় কিম্বা অত্যাচার, অপরাধ, সীমা লঙ্ঘন বা মোমেনদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় ঘটানোর কাজে লিপ্ত হয়। মোমেনদের ঐক্যবদ্ধ হস্ত ঐ শ্রেণীর লোককে শায়েস্তা করায় সক্রিয় থাকিবে– যদিও ঐ লোক তাহাদের কাহারও নিজ সন্তান হয়।

১০। (কাহারও সহিত মৈত্রী স্থাপনে আনসার ও মোহাজের–) সকল মুসলমানের মৈত্রী এক হইবে। বিশেষতঃ জেহাদের বেলায় মুসলমানদের একজনকে ছাড়িয়া অন্যজন কাহারও সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিবে না। প্রয়োজন হইলে এরূপ মৈত্রী স্থাপন করিবে যাহা সকলের স্বার্থ রক্ষায় সমান হয় এবং সকল মুসলমানের পক্ষে ন্যায় হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের কোন এক জামাত অন্যদেরকে ছাড়িয়া বা সকল মুসলমানদের স্বার্থ সমানভাবে না দেখিয়া শুধু এক দলের স্বার্থের জন্য কাহারও সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিবে না।

১১। এই সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান– যাহারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহাদের কেহ কোন ফাসাদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর সহায়তা করিতে পারিবে না, তাহাকে সমর্থন দিতে পারিবে না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে কেহ সাহায্য সমর্থন দিলে তাহার উপর আল্লাহর লা'নত ও গযব পড়িবে এবং তাহার ফরয নফল কোন প্রকার এবাদত কবুল হইবে না।

১২। সনদের কোন বিষয়ে কোন বিতর্কের সূত্রপাত হইলে উহার মীমাংসা একমাত্র আল্লাহ এবং মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর ন্যস্ত হইবে।

১৩। স্বাক্ষরকারী মিত্রদের কোন সম্প্রদায়ে এমন কোন বিবাদের সৃষ্টি হইলে– যাহার প্রতিক্রিয়া ছড়াইয়া পড়ার আশঙ্কা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত বিবাদের সমাপ্তি আল্লাহর এবং আল্লাহ রসূল মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লামের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে।

অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ তাআলার আদেশে প্রাপ্ত যে মীমাংসা ও সালিস করিয়া দিবেন তাহাই চূড়ান্ত ও সকলের গ্রহণীয় সাব্যস্ত হইবে।

সনদের সর্বশেষ অনুচ্ছেদ ছিল এই–

আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (সঃ) ঐ ব্যক্তির সাহায্য সমর্থনে থাকিবেন যে অঙ্গীকার রক্ষা করিয়া চলিবে এবং সৎ-সাধু হইয়া জীবন যাপন করিবে। (সীরতে ইবনে হেশাম এবং বেদায়া, ৩–২৪৪)

এই সনদ সম্পাদনের মাধ্যমে ইসলামের এমন একটি রূপের বিকাশ হইল যাহা সম্পর্কে এত দিন কোন ধারণা করা যায় নাই। রাষ্ট্র পরিচালনায়, সমাজ ব্যবস্থায় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষায় ইসলামী নীতির রূপরেখা কি হইবে তাহা এত দিন অপ্রকাশিত ছিল। কারণ ইসলাম এত দিন আত্মরক্ষায় অক্ষম ছিল; নীতিমালার প্রকাশ সে কোথায় করিবে?

মদীনায় ইসলাম তাহার স্বাধীনতার উৎস লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় নীতির রূপরেখা প্রকাশ করিয়াছিল যে, ইসলাম তাহার রাষ্ট্রীয় শক্তি ও প্রভাবের দ্বারা অন্য ধর্মের নাগরিকদের উপর ইসলাম বলপূর্বক চাপাইয়া দিবে না। সহাবস্থান বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইসলাম সকলকে নিজ নিজ ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিবে। প্রথম দিন হইতেই ইসলামের সমাজ ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উক্ত উদার নীতির রূপরেখা প্রকাশ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও এই ব্যাপারে আজও ইসলামকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে। আজও লোকদের ধারণা– ইসলামী রাষ্ট্রে বা ইসলামী শাসনে অমুসলিমদের গলা কাটিয়া জবরদস্তি তাহাদের মুসলমান করা হয়।

উল্লিখিত চুক্তিটি শুধু দেশ রক্ষা শান্তি রক্ষা এবং মদীনায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ এড়াইবার জন্য রাজনৈতিক চুক্তি ছিল।

মদীনায় ইহুদী সম্প্রদায় ধনে-জনে, শিক্ষা-দীক্ষায়, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে প্রবল ছিল এবং এই সম্প্রদায় ছিল মুসলমানদের ঘোর শত্রু। এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের শক্তিশালী হইতে হইলে নিজেদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মদীনায় মুসলমানদের দুইটি সম্প্রদায় ছিল– আনসার তথা মদীনার অধিবাসী মুসলমান আর মোহাজের তথা বহিরাগত মুসলমান। এই দুই শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে পরস্পর তিল পরিমাণ বিভেদ সৃষ্টি হইলেই মদীনায় মুসলমানদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে চুরমার হইয়া যাইত, মদীনায় মুসলমানদের প্রভাব কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না; বরং চিরকাল ইহুদীদের প্রভাবতলে থাকিতে হইত। আর ইহুদীদের ন্যায় শত্রুদের বেষ্টনে থাকায় মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল প্রকট। তাই নবী (সঃ) মুসলমান শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে সামাজিক ঐক্যবন্ধন সৃষ্টির জন্য উভয় শ্রেণীকে আনুষ্ঠানিকরূপে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবস্থাকেই আরবী ভাষায় "মোআখাত" বলা হয়, যাহার অর্থ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন।

এই ভ্রাতৃত বন্ধন দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ত সৃষ্টি হইলই, এতদ্ভিন্ন ছিন্নমূল সর্বহারা বহিরাগত মুসলমানদের আশ্রয় লাভেরও বিশেষ সুব্যবস্থা হইল।

আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন (পৃঃ ৫৩৩–৫৬১)

মক্কায় সর্বস্ব ত্যাগ করত হিজরত করিয়া মদীনায় আগমনকারী নিঃস্ব মুসলমানদের জন্য এক একজন মদীনাবাসী মুসলমান তথা আনসারের সঙ্গে এক একজন মোহাজেরের "মোআখাত–ভাই-বন্ধী" বা বন্ধুত্ব স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একদা এক মজলিসে ৪৫ জন আনসারের সঙ্গে ৪৫ জন মোহাজেরের ভাই

বন্ধী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করত হযরত (সঃ) এই মহান কার্যের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। (আসাহহুস সিয়ার, ১১০)। আনসার তথা মদীনাবাসী মুসলমানগণ এই ভাই-বন্ধীর এমন মর্যাদা দান করিয়াছিলেন যাহার নজির কোন জাতির ইতিহাসে নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডে ১১৩৭ নং হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের গৃহে আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপনের কাজ করিয়াছিলেন।।

আনসারগণের চরম সহানুভূতি

১৭১৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৩৪) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভাই-বন্ধী অনুষ্ঠিত হওয়ার পর) আনসারগণ হযরতের খেদমতে আরজ করিলেন, আমাদের এবং মোহাজের ভাইদের মধ্যে আমাদের সম্পত্তি বন্টন করিয়া দিন। হযরত (সঃ) তাহা অস্বীকার করিলেন। অতপর তাঁহারা বলিলেন, তবে মোহাজের ভাইগণ আমাদের জায়গা-জমিতে কাজ করিবেন, সে সূত্রে তাঁহারা উহার উৎপন্নে আমাদের শরীক হইবেন। ইহাতে সকলেই সম্মতি দান করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আনসারগণ কর্তৃক মোহাজেরগণের প্রতি চরম সহানুভূতির অসংখ্য উপমা এবং ইতিহাস হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে। যথা– দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৬১ নং হাদীছে একটি ঘটনা রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) মোহাজের এবং সা'দ ইবনে রবী (রাঃ) আনসারী– এই দুই জনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিয়াছিলেন। সেমতে সা'দ (রাঃ) স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্তাব করিলেন, আমি একজন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি, আপনি আমার ভ্রাতা; সেই হিসাবে আমার ধন-সম্পদের অর্ধভাগ আমি আপনাকে দিয়া দিলাম।

এমনকি প্রবাসী বিদেশী মানুষ হিসাবে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) মোহাজেরের নিকট কেহ মেয়ে বিবাহ দিতে সম্মত হইবে না আশঙ্কায় সা'দ (রাঃ) এই প্রস্তাবও করিলেন যে, আমার দুই স্ত্রী আছে (তখন পর্দার মাসআলা না থাকায়) আপনি উভয়কে দেখিয়া যাহাকে পছন্দ করিবেন আমি তাহাকে তালাক দিয়া দিব; আপনি বিবাহ করিয়া নিবেন।

ঐরূপ দ্বিতীয় খণ্ড ১১৫৮ নং হাদীছেও বর্ণিত আছে, বাহরাইন এলাকা জয় হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) ইসলামের জন্য কর্মতৎপরতায় আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ আনসারগণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, এই এলাকার পতিত জমিগুলি তোমাদের নামে লিখিয়া দেই। আনসারগণ উত্তরে বলিয়াছিলেন, যদি আপনি আমাদেরকে জমি লিখিয়া দিতে চান তবে প্রথমে আমাদের মোহাজের ভাইগণকে ঐ পরিমাণ জমি লিখিয়া দিয়া তারপরে আমাদিগকে দিবেন।

পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ তাআলা আনসারগণের চরম উদারতার বর্ণনায় আয়াত নাযিল করিয়াছিলেন–

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ـ

অর্থ ঃ "অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও আনসারগণ নিজেরা না খাইয়া অন্যকে অগ্রগণ্য করিয়া থাকে, অন্যের অভাব মিটাইয়া থাকে।"

এই আয়াত যেই বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছিল তাহা অত্যন্তই কৌতূহলজনক। একদা এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি নবীজীর (সঃ) নিকট উপস্থিত হইল। নবী (সঃ) প্রথমে নিজ গৃহিণীদের নিকট খোঁজ নিলেন; সংবাদ আসিল, আমাদের নিকট পানি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ক্ষুধার্তের মেহমানীর জন্য কে প্রস্তুত আছে। একজন আনসারী ছাহাবী নিবেদন করিলেন, আমি আছি। অতিথিকে নিয়া তিনি গৃহে গেলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অতিথির সেবা উত্তমরূপে করিও। স্ত্রী বলিলেন, শিশু সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্য

ব্যতীত অতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে গৃহের এই সামান্য খাদ্য নিজেরা কেহ না খাইয়া অতিথিকে সম্পূর্ণ খাওয়াইবার এক অভিনব কৌশল করিলেন । শিশু সন্তানদের ঘুম পাড়াইয়া রাখিলেন। ঐ সময় পর্দার মাসআল্লা ছিল না আরবের প্রথানুসারে গৃহের সকলকে অতিথির সহিত বসিয়া একই পাত্রে খাইতে হইবে। এই সমস্যার সমাধানে স্ত্রী স্বামীর পরামর্শানুযায়ী ছল করিয়া গৃহের প্রদীপ নিভাইয়া দিলেন। অতপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অতিথির সঙ্গে খাইতে বসিয়া গেলেন এবং এমন ভাব দেখাইলেন যেন তাঁহারাও খাইতেছেন। প্রকারান্তরে তাঁহারা এক লোকমাও খাইলেন না– সুকৌশলে সম্পূর্ণ খাদ্যটুকু অতিথিকে খাওয়াইয়া নিজেরা উপবাসে রাত্র কাটাইলেন। তাঁহাদের এই অতুলনীয় মহানুভবতা লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিত আয়াত নাযিল হইল।

আত্মনির্ভরশীলতায় মোহাজেরগণের দৃঢ়তা

আনসারগণ এইভাবে অসাধারণ উদারতা মহানুভবতা দেখাইতেছিলেন কিন্তু মোহাজেরগণ ইহাকে সুযোগরূপে কখনও গ্রহণ করেন নাই। আনসারগণের মহানুভবতায় একান্ত কৃতজ্ঞ থাকিয়াও মোহাজেরগণ কায়িক পরিশ্রম এবং ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা নিজেদের জীবিকা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করিতেন।

১৭১৭ নং হাদীছে দেখিতে পাইয়াছেন, আনসারগণ নিজেদের সম্পত্তি মোহাজেরগণকে ভ্রাতা হিসাবে বন্টন করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মোহাজেরগণ তাহাতে সম্মত না হইয়া কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে বর্গা প্রথায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তদ্রূপ দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৬১ নং হাদীছের ঘটনায়ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) মোহাজের সা'দ (রাঃ) আনসারীর মহানুভবতার প্রস্তাব সম্পত্তি ও স্ত্রী বন্টন করিয়া নেওয়ার প্রস্তাবকে ধন্যবাদের সহিত এড়াইয়া গিয়া বলিয়াছিলেন– ভাই! আমাকে বাজার দেখাইয়া দিন। তিনি বাজারে যাইয়া ব্যবসা দ্বারা প্রতিদিন সামান্য সামান্য উপার্জন করিতে লাগিলেন এবং অনতিবিলম্বেই বিবাহ করিলেন। হযরত (সঃ) তাঁহাকে ওলীমা খাওয়াইবার পরামর্শ দিলেন; তাহা করিতেও তিনি সক্ষম হইলেন। এমনকি ব্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি কালে বহু ধনের অধিপতি হইয়াছিলেন।

আয়েশা (রাঃ)-কে গৃহে আনয়ন

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সহিত বিবাহের ইজাব-কবুল হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সময় বিবাহের শুধু ইজাব-কবুলই হইয়াছিল। আয়েশা (রাঃ)-কে নবীজী (সঃ) নিজ গৃহে আনিয়াছিলেন না। তখন তাঁহার বয়সও অনেক কম ছিল– মাত্র ছয় বৎসর । মদীনায় হিজরত করিয়া আসার ৭ বা ৮ মাস পরে নবী (সঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে নিজ গৃহে আনিলেন; তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। ১৭৯৬ নং হাদীছে বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

আযানের প্রবর্তন

মক্কার সুদীর্ঘ জীবনে নবীজী (সঃ) এবং মুসলমানগণ মনের সাধ মিটাইয়া নামায পড়িতে পারিতেন না। মসজিদে সমবেত হইয়া জামাতে নামায আদায় করার পূর্ণ সুযোগ ছিলই না। মদীনায় সেই সব বাধা-বিপত্তি নাই; মুসলমাগণ তাঁহাদের মা'বুদের সর্বপ্রথম এবাদত নামায মনের সাধ মিটাইয়া আদায় করার পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছেন। জামাতের সহিত নামায আদায় করার জন্য মসজিদ তৈয়ার হইয়াছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং জুমার নামায মুসলমানগণ নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পিছনে সমবেতভাবে জামাতের সহিত

আদায় করিতেছেন।

লোকেরা অনুমানে নামাযের সময় নিরূপণ করিয়া মসজিদে আগমন করিয়া থাকেন– ইহাতে নিশ্চিত অসুবিধা হইতে লাগিল। এই অসুবিধা এড়াইবার জন্য নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত মুসলমানদের সলা-পরামর্শ হইতেছিল। এমতাবস্থায় এক কৌতূহলজনক ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আযান প্রবর্তিত হইল– যাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

আযান প্রথা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এক নবযুগের সূচনা করিল। তওহীদের ঘোষণা, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল এই ঘোষণা– যাহা গৃহ প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে বসিয়া শুধু নিজ মুখে উচ্চারণ করিতেও মুসলমাগণ সন্ত্রস্ত থাকিত, নামায আদায় করিতে মুসলমানরা নিজেরাই শত বাধার সম্মুখীন হইত– অপরকে উহার প্রতি আহ্বান করার ত প্রশ্নই ছিল না।

আজ সেই তওহীদের ঘোষণা, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল হওয়ার ঘোষণা, নামাযের প্রতি আহ্বান গৃহভ্যন্তরে নহে, শুধু মুখের উচ্চারণে নহে, শুধু সুযোগ প্রাপ্তিতে নহে– বরং নীতিগতভাবে ও রীতিমত বলিষ্ঠ কণ্ঠে, সর্বোচ্চ স্বরে আকাশে-বাতাসে মিশাইয়া দেওয়া হইতেছে।

প্রতিদিন পাঁচ পাঁচ বার ঐ ঘোষণা ও আহ্বানের বজ্রনিনাদে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতে লাগিল। আযানের এই অপূর্ব ধ্বনি তরঙ্গ মানুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করায় তাহাদের মন-প্রাণ ঝংকৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইসলামের গৌরব মুসলমানদের বিজয় ধ্বনির মহাস্বর সেই আযান, যাহা বিশ্বের মিনারে মিনারে আজও ধ্বনিত হইতেছে– হিজরতের প্রথম বৎসরই এই মহাধ্বনি ইসলামের বিধানরূপে প্রবর্তিত হয় এবং আবহমানকালের জন্যই ইসলামের গৌরব ও বিজয় স্মৃতিরূপে চিরায়ত বিধি আকারে সর্বত্র প্রচলিত হয়।

মদীনায় ইসলামের এক নবরূপের আবির্ভাব

মক্কায় সুদীর্ঘ তের বৎসর নবীজীর (সঃ) নীতি ছিল বিধর্মীদের জুলুম-অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া যাওয়া। এক গালে চড় খাওয়া সত্ত্বেও অপর গাল পাতিয়া দিয়াও সংঘর্ষ এড়াইতে হইবে– এই ছিল তাঁহার নীতি। মক্কার পাষণ্ডরা তাঁহার উপর এবং তাঁহার ভক্তগণের উপর কি অমানুষিক অত্যাচারই না করিয়াছে! স্বয়ং নবীজী (সঃ)-কে গালাগালি দিয়াছে, প্রহার করিয়াছে, নানা প্রকারে তাঁহাকে উৎপীড়ন করিয়াছে, সামাজিক বয়কট করিয়াছে, শেষ পর্যন্ত প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিয়াছে। মুসলমানদের উপর ত অত্যাচারের সীমাই ছিল না। কিন্তু নবীজীর (সঃ) পক্ষ হইতে প্রতিরোধ বা প্রতিকার ছিল না; নীরবে সহ্য করিয়া চলাই ছিল তাঁহার নীতি। দীর্ঘ তের বৎসরেও এই নীতির সুফল ফলিল না। মক্কার পাষণ্ডরা এই নীতির পাত্র ছিল না। তাহাদের উপর এ সাধু নীতির বিরূপ ক্রিয়া হইল। এই নীতির সুযোগে পাষণ্ডরা জুলুম-অত্যাচারের পরিমাণ দিনের দিন বাড়াইল বৈ কমাইল না। অবশেষে বাধ্য হইয়া নবীজী (সঃ) এবং মুসলমানগণ ঘর-বাড়ী, টাকা-কড়ি, আত্মীয়-স্বজন বর্জন করতঃ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মদীনায় চলিয়া আসিলেন। মদীনায় আসিয়া নবীজী (সঃ) অন্য একটি সত্যের প্রতি দৃষ্টি দিলেন যে, নিষ্ক্রিয় সহ্য দুষ্কৃতির প্রশ্রয় দেয়। অতএব অত্যাচারী জালেমকে অবশ্যই সক্রিয়ভাবে বাধা দিতে হয় এবং যত দিন না তাহার উপর জয়লাভ করা যায় তত দিন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হয়। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানিয়া চলায় যাহারা বাধার সৃষ্টি করে, আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী করা যাহারা অপরাধ গণ্য করিয়া উৎপীড়ন করে, জুলুম-অত্যাচার করে, তাহারা প্রকৃতই জালেম, সত্যের শত্রু। এই জালেমদেরকে দমন করিতে হইবে, এই শত্রুদেরকে বাধা দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে হইবে, অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।

এই যুদ্ধ নিছক রাজ্য জয়ের জন্য নহে, ডাকাতের মত নিজ স্বার্থ লোভে নরহত্যা ও লুণ্ঠন করার ন্যায় নহে। এই যুদ্ধ মঙ্গলের জন্য, সত্য আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তথা ডাক্তারের মত দেহের শান্তি ও সুস্থতা রক্ষাকল্পে

উহার অবাঞ্ছিত ও দূষিত অংশ অস্ত্রোপচারে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়ার ন্যায়। এই যুদ্ধকেই জেহাদ বলা হয়।

জেহাদে অস্ত্র ধারণ ও অস্ত্র প্রয়োগ আছে বটে; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অস্ত্র প্রয়োগ নিন্দনীয় নহে। সত্য ও আদর্শের জন্য, শান্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র প্রয়োগ অতি মহৎই বটে।

বিশ্ব বুকে সত্য, শান্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠায় নবীজী মোস্তফা (সঃ) মক্কায় দীর্ঘ তের বৎসর সহ্য সহিষ্ণুতার সাধু নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন; পাত্রের অযোগ্যতা হেতু উদ্দেশ্যের সফলতায় প্রতিষ্ঠা তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। মদীনায় আসিয়া নবীজী (সঃ) ঐ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠায় জেহাদের বলিষ্ঠ নীতির প্রতি দৃষ্টি দিলেন।

তাঁহার এই নীতি পরিবর্তনের সূচনায় আল্লাহ তাআলার ইঙ্গিত এবং পরিপূর্ণ সমর্থনও ছিল অতি সুস্পষ্ট। মদীনায় হিজরত এবং প্রবাসীদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা মোটামুটি শৃঙ্খলায় আসার পর পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইল–

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ - اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ -

অর্থ ঃ (মুসলিম জাতি) যাহারা (এক আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতি দানের অপরাধে পথে ঘাটে) আক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহাদেরকে সংগ্রাম করার অনুমতি প্রদান করা হইল। কারণ, তাহারা অত্যাচারিত। নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে জয়ী করিতে সক্ষম। তাহাদেরকে অন্যায়রূপে তাহাদের ঘড়-বাড়ী হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে শুধুমাত্র এই কারণে যে, তাহারা বলে, আমাদের প্রভু এক আল্লাহ। (পারা–১৭, রুকু–১২)

মুসলমানদের নীতি পরিবর্তনের আহ্বানে আরও আয়াত অবতীর্ণ হইল। যথা–

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -

অর্থ ঃ "আল্লাহর পথে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। তবে (কোথাও চুক্তিবদ্ধ থাকিলে তথায় চুক্তির) সীমা লংঘন করিও না। সীমা লংঘনকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না।" (পারা–২, রুকু– ৮)

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ -

অর্থ ঃ "আর (যাহারা তোমদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী) তাহাদের যথায় পাও হত্যা কর এবং যেখান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে সেখান হইতে তোমরাও তাহাদেরকে বিতাড়িত কর। আর জানিয়া রাখ, (জুলুম-অত্যাচার, আল্লাহর ধর্মে বাধাদান ইত্যাদি) অপকর্ম হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা বেশী ভয়াবহ। (অতএব যাহারা ঐ শ্রেণীর অপকর্মে লিপ্ত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমীচীনই বটে।)" ঐ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ -

অর্থ ঃ (আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় যাহারা বাধাদানকারী) তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যাইতে থাকিবে যাবত না আল্লাহর দ্বীনে অন্তরায় সৃষ্টি রহিত হইয়া যায় এবং আল্লাহ দ্বীনের প্রাবাল্য প্রতিষ্ঠিত হয়। (পারা– ২, রুকু– ৮)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ - وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ - وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ ঃ "জেহাদ তোমাদের জন্য অবধারিত কর্তব্য করা হইল, যদিও তোমরা তাহা কঠিন মনে কর। তোমরা যাহা কঠিন গণ্য করিতেছ হয়ত তাহাতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত এবং যাহা তোমরা ভাল মনে

করিতেছ হয়ত তাহাতে তোমাদের অমঙ্গল রহিয়াছে। আল্লাহই সব জানেন তোমরা জান না।"
(পারা-২, রুকু-১০)

মুসলমানদের তৎকালীন প্রথম নম্বরের বিপক্ষ মক্কার কাফেরদের চরম উগ্রতাও নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নীতি পরিবর্তনকে অপরিহার্য করিয়া তুলিতেছিল এবং পরিবর্তিত নূতন নীতিতে দ্রুত অগ্রসর হইতে বাধ্য করিতেছিল।

মক্কার কাফেররা নবীজী (সঃ) এবং মুসলমানদিগকে দীর্ঘ দিন যাবত জুলুম-অত্যাচারে কাবু করিয়া রাখিয়াছিল। হিজরতের পর তাহারা দেখিল, শিকার সম্পূর্ণরূপে তাহাদের হাতছাড়া হইয়া নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মুসলমানগণ মদীনায় সমাদরে গৃহীত হইয়াছে, তাহারা তথায় শান্তি স্বস্তির সহিত ধর্মকর্ম পালনের পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছে। যে ধর্মের উচ্ছেদ সাধনে কোরায়শরা এক যুগ ধরিয়া চেষ্টা-পরিশ্রম করিয়াছে, আজ সেই ধর্ম মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দ্রুত প্রতিষ্ঠা এবং বিস্তার লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই সব সংবাদে তাহাদের শয়তানী ক্রোধ শত গুণে বাড়িয়া গেল। তারপর এই সংবাদও তাহারা অবগত হইল যে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মদীনার মুসলমান, মক্কার প্রবাসী মুসলমান, এমনকি ধনে-জনে পুষ্ট মদীনার ইহুদীদিগকে লইয়া এক আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন। উক্ত সনদের একটি বিশেষ অনুচ্ছেদে কোরায়শ এবং তাহাদের মিত্রদের প্রতি বৈরী হওয়ার উপর মদীনার সকল সম্প্রদায়কে সম্মত করাইয়াছেন। মদীনার সকল সম্প্রদায়কে এক বিশেষ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করাইয়া আন্তর্জাতিক সন্ধি স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যেকোন দেশ মদীনা আক্রমণ করিলে ধর্ম গোত্র নির্বিশেষে সকলে একযোগে সেই আক্রমণ প্রতিহত করিবে। এইভাবে মুসলমানগণ মদীনায় নিজেদের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করিতে সফল হইয়াছে। এখন মদীনা আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে হেস্তনেস্ত, বিধ্বস্ত করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িতেছে। এইসব শুনিয়া ও ভাবিয়া কোরায়েশরা ক্ষোভে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। একদিকে মুসলমানদের শান্তি লাভের উপর ক্ষোভ ক্রোধ, অপর দিকে তাহাদের শক্তি সঞ্চয়ের উপর আতঙ্ক।

নরাধমরা নবীজী (সঃ) ও তাঁহার সহচরবর্গের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, এখন তাহা তাহাদের স্মরণ পথে উদিত হইতে লাগিল এবং অন্তরে আতঙ্ক উঁকি দিল যে, মুসলমানগণ এইভাবে আরও কিছু শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়াস পাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের পরিণাম কত শোচনীয় হইতে পারে।

তাহাদের আতঙ্কের আর একটি বিশেষ কারণ ত অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। মক্কা এলাকা উৎপাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম; বাণিজ্যই হইল ঐ এলাকার লোকদের একমাত্র জীবন সম্বল এবং সিরিয়ার বাণিজ্যই তাহাদের প্রধান অবলম্বন। আর মক্কা ও সিরিয়ার বাণিজ্য পথটি মদীনাবাসীদের বাগে রহিয়াছে। ঐ পথে চলাচলকারীদের বাণিজ্যসম্ভার লুণ্ঠন করা এবং মক্কাবাসীদের এই বাণিজ্য পথ বন্ধ করা মদীনাবাসীদের পক্ষে অতি সহজ। মক্কাবাসীরা মুসলমানদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া তাঁহাদের সহিত যে শত্রুতা স্থাপন করিয়াছিল, তাহাও তাহারা উত্তমরূপে অবগত ছিল। সুতরাং মদীনায় মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা লাভ মক্কার কাফেরদের জন্য মৃত্যু পরোয়ানা। এই সকল চিন্তা ও উদ্বেগ কোরায়শদের ক্ষোভ আতঙ্ক অগ্নির মাঝে কেরোসিনের কাজ করিল। শিকড় জমাইয়া অজেয় হইবার পূর্বেই কাল বিলম্ব না করিয়া মুসলমান জাতিকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য তাহারা উন্মাদ হইয়া উঠিল। এমনকি মদীনা আক্রমণে মুসলমানদিগকে তথা হইতে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনায় নানা রকম চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিল এবং উস্কানিমূলক কার্যে উগ্রমূর্তি ধারণ করিল। কোরায়শদের ষড়যন্ত্র চক্রান্ত কত মারাত্মক ছিল, একটি নমুনা লক্ষ্য করুন-

রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং মুসলমানগণ মক্কায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া মদীনায় আসিয়াছিলেন। এখানেও তাঁহারা যেন আশ্রয় না পান, মক্কার দুরাচাররা সেই ফিকিরে লাগিয়া গেল। ইহার সুযোগ লাভের অবকাশও মদীনায় ছিল। এই সময় মদীনায় খাযরাজ বংশীয় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত প্রতিপত্তিশালী

মোশরেক ছিল। সমগ্র মদীনায় তাহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল, এমনকি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় আগমনের পূর্ব মূহূর্তে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আবদুল্লাহই মদীনার শাসক ও প্রধান নিযুক্ত হইবে। অচিরেই তাহার শিরে পরাইবার জন্য রাজমুকুটও তৈয়ার হইতেছিল; কিন্তু রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় পদার্পণে ঐসব পরিকল্পনা বানচাল হইয়া গিয়াছে। এই কারণে স্বাভাবতই তাহার ক্রোধ পড়িয়াছে নবীজীর (সঃ) উপরে। এই সংবাদ কোরায়শদের অবিদিত ছিল না এবং তাহারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতেও মোটেই বিলম্ব বা ক্রুটি করিল না। তাহারা আবদুল্লাহ এবং তাহার দলস্থ মোশরেক-পৌত্তলিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতে উত্তেজিত করিয়া আবদুল্লাহর নিকট গোপন পত্র প্রেরণ করিল। যাহার মর্ম এই ছিল–

"তোমরা (আমাদের ধর্মাবলম্বী হইয়াও) আমাদের পরম শক্র ব্যক্তিকে তোমাদের দেশে আশ্রয় দিয়াছ। হয় তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেল, না হয় তোমাদের দেশ হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দাও। অন্যথায় আমরা নিশ্চয় আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিব এবং তোমাদের যুবক দলকে হত্যা করিব, তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে ছিনাইয়া নিয়া আসিব।"

আবদুল্লাহর নিকট এই পত্র পৌঁছিলে সে অতি উৎসাহী হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তি সংগ্রহে তৎপর হইল এবং নবীজীর (সঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি করিল।

রসূলুল্লাহ (সঃ) এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বয়ং আবদুল্লাহ এবং তাহার দলের লোকদের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, দেখিতেছি কোরায়শদের চাল তোমাদের উপর বেশ চলিয়া গিয়াছে, তোমরা তাহাদের ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছ। তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, কোরায়শরা আক্রমণ করিলে তাহারা তোমাদের যে ক্ষতি করিবে– তাহাদের উস্কানিতে তোমরা যাহা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ, তাহার ফলে তোমাদের নিজেদের হাতে নিজেদের ক্ষতি তদপেক্ষা তিল পরিমাণও কম হইবে না। মুসলমানদের মধ্যে তোমাদের পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজন রহিয়াছে। অতএব মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে তোমাদেরই সেই পুত্র, ভ্রাতা ও স্বজনরা মারা পড়িবে। নবীজীর (সঃ) এই যুক্তিপূর্ণ উক্তির প্রভাবে আবদুল্লার দলের মধ্যে মত পরিবর্তনের হিড়িক পড়িয়া গেল, তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। আবদুল্লাহও নীরব থাকিতে বাধ্য হইল।

কোরায়শদের এই সব ষড়যন্ত্র এবং উস্কানির মুখে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় বসিয়া থাকা নবীজীর (সঃ) পক্ষে সমীচীন ছিল– কোন পাগলও ইহা ভাবিতে পারে না। কর্তব্যের খাতিরেই নবীজীকে সক্রিয় হইতে হইল। অত্যাচারী জালেম শক্তিকে শক্তি দ্বারা বাধা দানের বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করিতে হইল। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে বাধা দানকারীদের বাধা অপসারণে তাহাদিগকে দমাইবার জন্য শক্তির মোকাবিলায় শক্তি প্রয়োগের নীতিতে নবী (সঃ) অগ্রসর হইলেন– ইহাই বলিষ্ঠ জাগ্রত জীবনের লক্ষণ বটে। সসম্মানে জাতিগতভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই নীতি অপরিহার্য। যত দিন না ইহাতে জয়লাভ হয় তত দিন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হয়। নবীজী মোস্তফা (সঃ) মদীনার জীবনে সেই সংগ্রামেই অবতীর্ণ হইলেন।

চির শত্রু মক্কার দস্যুদের উস্কানির প্রতিরোধে প্রথম প্রথম ছোট ছোট অভিযান পরিচালিত হয়, যাহার ফলে বড় বড় যুদ্ধের সূচনা হইয়া পড়ে। নবীজীর (সঃ) দশ বৎসর জেহাদী জীবনের বেশীর ভাগ জেহাদ এই অনুক্রমেই ছিল।

এতদ্ভিন্ন ইহুদী জাতি, যাহারা স্বভাবতই ক্রুর কুটিল, তাহারাও ইসলামের উন্নতিতে এবং মদীনায় তাহাদের দীর্ঘ দিনের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব হইতে থাকায় সহাবস্থান চুক্তি ভঙ্গ করিয়া অশান্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়। তাহাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে কতিপয় জেহাদের সূচনা হয়। এইভাবে মদীনায় নবীজীর (সঃ) দশ বৎসরের জীবনে তাঁহাকে কতগুলি যুদ্ধ-জেহাদে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনী আলোচনায় সেই সব জেহাদের বিবরণ এক বিশেষ অধ্যায়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। বাস্তবিকই তাহা এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায়। মুষ্টিমেয় সংখ্যার জামাত অতি

নগণ্য সম্বল লইয়া যেভাবে বিদ্যুৎ গতিতে জয়লাভ করিয়া যাইতে থাকে, তাহা দৃষ্টে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, জেহাদগুলি প্রকৃতই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযা ও ইসলামের সত্যতার উজ্জ্বল প্রমাণ ছিল।

মূল বোখারী শরীফে ৫৬৩ হইতে ৬৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সেই সব জেহাদের বিবরণ বর্ণিত আছে। বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় খণ্ডে প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠাব্যাপী উহার অনুবাদ রহিয়াছে এবং অধ্যায়টির ভূমিকায় জেহাদ সম্পর্কে এবং জেহাদে অবতরণের সূচনায় নবীজীর (সঃ) প্রজ্ঞাময় বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনী সঙ্কলনে ঐ সব জেহাদের বিবরণদান অবশ্যই অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু আমাদের তৃতীয় খণ্ডে সেসব বিষয় সম্বলিত হাদীছের অনুবাদ হইয়া যাওয়ায় বর্তমান খণ্ডে আমরা আলোচনা হইতে বিরত হইয়াছি। আমরা হিজরী সালগুলির ঘটনাবলী আলোচনায় ঐ জেহাদসমূহের শুধু নাম উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকিব। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ড হইতে উদ্ধার করার জন্য পাঠক সমীপে অনুরোধ রহিল।

হিজরী প্রথম বৎসর

এই সালে নবী (সঃ) তিনটি অভিযানের ব্যবস্থা করেন। অভিযানগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিল এবং নবী (সঃ) সঙ্গে থাকেন নাই। সর্বপ্রথম অভিযানটি পরিচালিত হয় হামযা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে, দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয় ওবায়দা ইবনুল হারেস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে, তৃতীয় অভিযান পরিচালিত হয় সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে।

হিজরী দ্বিতীয় বৎসর

এই বৎসর সর্বপ্রথম নবী (সঃ) স্বয়ং জেহাদ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বপ্রথম অভিযান ছিল– গযওয়া আবওয়া বা ওদ্দান। পর পর এইরূপ আরও তিনটি অভিযান স্বয়ং নবী (সঃ) কর্তৃক পরিচালিত হয়– গাযওয়া বাওয়াত, গাযওয়া ওসায়রা ও গাযওয়া সাফওয়ান।

এই বৎসরই নবীজী (সঃ) মক্কার দস্যুদের বিরুদ্ধে তাঁহার বৈজ্ঞানিক রণকৌশল জোরদার করার জন্য আর একটি অতি সুন্দর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। মক্কা এলাকার ভিতরে গোয়েন্দা দল পাঠাইয়া শত্রুদের গমনাগমন ও তাহাদের খবরাখবর গোপনে অবগত থাকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে গোয়েন্দা দল প্রেরিত হয়।

কেব্‌লা পরিবর্তন

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট বলিয়াছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ـ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরাপুরিভাবে ইসলামের আওতাভুক্ত হও।"

পরিপক্ব ও পরিপূর্ণ ঈমান-ইসলাম আন্তরিক বিশ্বাস ও দৈহিক আমল ভিন্ন আর একটি সূক্ষ্ম জিনিসের দাবী করে। সেই জিনিসটি হইল মানসিক পরিবর্তন। ঈমানে মোফাস্‌সাল কালেমার বিষয়বস্তুগুলির প্রতি অটুট বিশ্বাস স্থাপন এবং পূর্ণ শরীয়তের ফরয, ওয়াজিব, হালাল-হারাম অনুযায়ী সমুদয় আমল সম্পাদন। এর পরেও পরিপক্ক ঈমান ইসলামের আর একটি দাবী থাকে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের তথা ইসলামী

শরীয়তের মানসিক গোলামী। অর্থাৎ নিজের মন-মানস চিত্ত ও অভিলাষকে আল্লাহ ও রসূলের পূর্ণ অনুগত বানাইয়া নেওয়া যে, ভিন্ন ধর্মীয়, ভিন্ন রীতির বা ভিন্ন পরিবেশের কোন প্রকার প্রভাব বা আকর্ষণ তাহার মানস অভিলাষকে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট করিতে না পারে। এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে এই হাদীছে উল্লেখ আছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন–

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنُ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের কেহ পরিপক্ব ঈমানদার সাব্যস্ত হইবে না যাবত না তাহাদের মানস অভিলাষ পূর্ণ অনুগত হইয়া যায় ঐ জীবনব্যবস্থার, যাহা আমি বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছি।"

ছাহাবায়ে কেরামগণকে আল্লাহ তাআলা সর্বদিক দিয়া পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়া পূর্ণ পরিপক্ব মোমেন-মুসলিমরূপে গড়িয়াছিলেন। ভীষণ দুর্যোগ দুর্ভোগের প্রলয়ঙ্করী কম্পন তাঁহাদের উপর বহাইয়া তাঁহাদের ঈমান ও ইসলামকে পরীক্ষা করা হইয়াছে–

مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۤءُ وَالضَّرَّاۤءُ وَزُلْزِلُوْا ـ

অর্থ ঃ "দুর্যোগ, দুর্ভোগ ও বিভীষিকাপূর্ণ নির্যাতন তাঁহাদিগকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল।"

(কোরআন শরীফ)

অর্থ ঃ ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন সর্বস্ব ত্যাগপূর্বক হিজরতের দ্বারাও তাঁহাদের পরীক্ষা করা ইয়াছিল। এইভাবে ঈমান ও ইসলামের পরীক্ষার সেলসেলায় অনেক বিষয়ের দ্বারা আল্লাহ তাআলা ছাহাবীগণের মানসিক পরিবর্তনের পরীক্ষাও করিয়াছেন। সব রকম পরীক্ষায়ই ছাহাবীগণ উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন এবং সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তবেই ত তাঁহারা ইসলামের এত দূর উন্নতি সাধনে কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন এবং স্বয়ং আল্লাহর রসূল কর্তৃক তাঁহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি আদর্শ হওয়ার যোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন–

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ ـ

অর্থ ঃ "আমার ছাহাবীগণ (ইসলামের ও ঈমানের পথে দিশারী হওয়ায়) উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ, তাঁহাদের প্রতিজনের অনুসরণই তোমাদিগকে সত্য পর্যন্ত পৌঁছাইবে।"

মানসিক পরিবর্তনের পরীক্ষায় আল্লাহ তাআলা ছাহাবীগণকে কেবলার বিষয় দ্বারা একটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মক্কা হইতে আগত মোহাজের মুসলমানগণ ইসলাম পূর্বকালে নিজেদেরকে কা'বা ঘরের পুরোহিত সেবাইত গণ্য করিয়া নানা কুসংস্কার সৃষ্টি করিয়াছিল। যথা– তাহারা যে বহিরাগতকে বস্ত্র না দিবে সে কা'বার তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ কার্য উলঙ্গ হইয়া সম্পাদন করিবে, হজ্জ আদায় করিতে তাহারা আরাফার ময়দানে যাইবে না ইত্যাদি।

কা'বা শরীফের ভক্তি ভাল জিনিস, কিন্তু সেই ভক্তিকে কেন্দ্র করিয়া বহু অনাচারজনিত পৌরোহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল। আর মক্কাবাসীরা এই পৌরোহিত্য জিয়াইয়া রাখার স্বার্থে কা'বা গৃহের ভক্তিতে গদগদ ছিল।

মক্কাবাসী মুসলমানগণ যখন হিজরত করিয়া মদীনায় আসিলেন তখন আল্লাহ তাআলা কা'বা শরীফের বিপরীত দিক বায়তুল মোকাদ্দাসের দিককে কেবলা বানাইবার আদেশ করিলেন। আল্লাহ পরীক্ষা করিতে চাহিলেন আল্লাহর আদেশে কা'বা ছাড়িয়া, কা'বার পুরোহিতরা কেবলা হওয়ার সম্মান তাহা অপেক্ষা কম মর্যাদার বায়তুল মোকাদ্দাসকে দিতে সন্তুষ্ট চিত্তে রাজি হয় কিনা। দীর্ঘকালের পৌরোহিত্য আল্লাহর আদেশে এইভাবে ক্ষুণ্ন করিয়া রসূলের মারফত দেওয়া আল্লাহর আদেশকে সর্বোচ্চে স্থান দেওয়ার মানসিকতা কাহার ভিতরে কতটুকু সৃষ্টি হইয়াছে– তাহাই আল্লাহ তাআলা এই পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়া নিতে চাহিলেন। পবিত্র কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই দীর্ঘ ১৬–১৭ মাস পর এই পরীক্ষার সমাপ্তিলগ্নে এই তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন–

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ -

অর্থ ঃ "মদীনায় আসিয়া যেই কেব্‌লার উপর আপনি থাকিলেন তাহার আদেশ একমাত্র এই উদ্দেশে করিয়াছিলাম যে, দেখিয়া নিব- কে রসূলের কথা মানে, কে ফিরিয়া থাকে।" (পারা- ২, রুকু- ১)

পরীক্ষাকাল ১৬ বা ১৭ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই উম্মতের জন্য স্থায়ী কেবলারূপে কা'বা শরীফের দিক নির্ধারিত হয় হিজরী দ্বিতীয় বৎসরে। কেবলা পরিবর্তনের বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৩৬ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

হিজরী দ্বিতীয় বৎসরেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ইসলামের প্রথম মহাসমর বদরের জেহাদ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; যাহার বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ৩৮ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

বদর জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনের মাত্র এক সপ্তাহ পরেই নবী (সঃ)-কে ছোট একটি অভিযানে যাইতে হয়। স্বয়ং নবীজী (সঃ) এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন; অভিযানটি গাযওয়া বনী সোলায়ম নামে অভিহিত।

তারপর "গাযওয়া ছবীক" নামে আরও একটি অভিযান এই বৎসরই পরিচালিত হয়। ঘটনা এই ছিল যে, বদর যুদ্ধে মক্কার কফেরদের শোচনীয় পরাজয় হইল। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা রক্ষা নিয়া বদর যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। অথচ আবু সুফিয়ান তাহার কাফেলাসহ নিরাপদে মক্কায় পৌঁছিল আর মক্কার সর্দাররা রণাঙ্গনে নিহত হইল। পরাজয়ের শোকাবহ সংবাদ মক্কায় পৌঁছিলে আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করিল, সে স্ত্রী সঙ্গম করিবে না যাবত না মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) হইতে প্রতিশোধ লয়।

সেমতে আবু সুফিয়ান দুই শত লোক লইয়া গোপনে মদীনার নিকট অবতরণ করিল এবং ইহুদীদের সাহায্যে দুই জন মদীনাবাসী মুসলমানকে হত্যা করিয়া লুকাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সংবাদ প্রকাশ পাইয়া গেল এবং রসূলল্লাহ (সঃ) স্বয়ং তাহাকে পাকড়াও করিবার জন্য দ্রুত অভিযান চালাইলেন। আবু সুফিয়ান পূর্বেই পলাইয়া যাইতে সক্ষম হইল। (বেদায়া, ৩-৩৪৪)

এই বৎসরই নবীজীর (সঃ) কন্যা রোকাইয়্যা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন, যিনি ওসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিবাহে ছিলেন। নবীজীর (সঃ) জ্যেষ্ঠা কন্যা যয়নব (রাঃ)- যিনি এত দিন মক্কায়ই ছিলেন, এই বৎসরই তিনি মদীনায় পৌঁছেন। এই বৎসরই ফাতেমা (রাঃ) আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গৃহে আসেন; বিবাহের আক্‌দ পূর্বের বৎসরই হইয়াছিল। (বেদায়া ৩-৩৪৬)

হিজরী তৃতীয় বৎসর

এই বৎসরের প্রথম দিকে ছোট দুইটি অভিযান চালাইতে হয়- গাযওয়া নজদ বা জী আমর এবং গাযওয়া ফুরু।

ইতিমধ্যেই নবীজী (সঃ) এক নূতন বিপদের সম্মুখীন হইলেন- এত দিন বহির্শত্রুর সহিত সংগ্রাম ছিল। এইবার মদীনার অভ্যন্তরে প্রকাশ্য শত্রুতা সৃষ্টি হইয়া গেল। মদীনার প্রভাবশালী শক্তিশালী ইহুদী সম্প্রদায় সহাবস্থান ও শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিদ্রোহ এবং নানা প্রকার উস্কানিমূলক উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ ধনবান গোত্র ছিল বনী কায়নুকা, তাহারা স্বর্ণ ব্যবসায়ী ছিল। সর্বপ্রথম এই গোত্রই বিদ্রোহ করে; নবী (সঃ) সাফল্যজনকভাবে তাহাদিগকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করিতে সক্ষম হইলেন। তারপরেই ইহুদীদের আর এক প্রভাবশালী গোত্র বনু নজীর বিদ্রোহ করিল। তাহাদের বিরুদ্ধেও নবী (সঃ) সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করিতে সফল হইলেন। অনেকের মতে এই দ্বিতীয় বিদ্রোহ হিজরী চতুর্থ বৎসরে হইয়াছিল।

তৃতীয় খণ্ডে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিদ্রোহ দুইটির বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে।

এই আভ্যন্তরীণ বিপদের ভিতর দিয়াও নবী (সঃ) বহির্শক্রর প্রধান কোরায়শদেরকে শায়েস্তা করার এবং তাহাদিগকে দমাইয়া রাখার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা– তাহাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক অবরোধ অব্যাহত রাখেন। সেই সেলসেলায় নবীজীর (সঃ) পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে ছোট একটি অভিযানের ব্যবস্থা করেন এবং তাহাতে সাফল্য লাভ হয়।

এরই মধ্যে ইহুদীদের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমাইবার ব্যবস্থায় নবী (সঃ) অধিক সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। ইহুদীদের ধনকুবের কা'ব ইবনে আশরাফ নামীয় ব্যক্তি বিদ্রোহ উস্কাইয়া রাখিতে অত্যধিক তৎপর ছিল এবং মুসলিম জাতির ধ্বংসকল্পে তাহার সমুদয় ধনশক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়োজিত রাখিয়াছিল। বিনা রক্তপাতে তাহাকে হত্যা করাইতে নবী (সঃ) সফল হইলেন।

এই শ্রেণীর আরও এক ইহুদী সওদাগর ছিল আবু রাফে। ধনশক্তি এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির সহিত সওদাগরী সূত্রে তাহার বৈদেশিক খ্যাতি, পরিচয় ও মিত্রতা অনেক ছিল। সেও তাহার সমুদয় শক্তি-সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছিল। রক্তপাতহীন ব্যবস্থায় তাহাকেও হত্যা করাইতে নবীজী (সঃ) সফল হইলেন।

ইতিমধ্যে ভীষণ বিপদের কালো মেঘ মদীনার মুসলমানদেরকে ঘিরিয়া ধরিল। মক্কার মোশরেকেরা সর্বশক্তি একত্র করিয়া বদর সমরের প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশে তিন শত মাইল অগ্রসর হইয়া মদীনার শহরতলীতে পৌছিল এবং ইসলামের দ্বিতীয় মহাসমর ইতিহাস প্রসিদ্ধ ওহুদের জেহাদ অনুষ্ঠিত হইল যাহার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

এই বৎসরই শেষ ভাগে (কাহারও মতে হিজরতের চতুর্থ বৎসর) মক্কার অনতিদূরে রাজী নামক এলাকায় এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছিল (তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

এই বৎসর ওসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সহিত নবী (সঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম (রাঃ)-এর বিবাহ হইয়াছিল। এই বৎসরই হাসান (রাঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হিজরী চতুর্থ বৎসর

এই বৎসরের প্রথম দিকেই বনু আসাদ নামীয় একটি পৌত্তলিক গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে মদীনা আক্রমণের আয়োজন করিল। তাহাদের মধ্য হইতেই এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-কে সেই সংবাদ পৌছাইল। নবীজী মোস্তফা (সঃ) আবু সালামা (রাঃ)-কে নেতৃত্ব প্রদান করিয়া সেই গোত্রের প্রতি একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন; শত্রুরা পলায়ন করিল।

এই বৎসরের প্রথম ভাগে আর একটি দুঃখজনক ঘটনায় নবীজী (সঃ) কর্তৃক প্রেরিত অনেক জন বিশিষ্ট ছাহাবী প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ইতিহাসে তাহা বীরে মাউনার ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ। এই বৎসরই স্বয়ং নবী (সঃ) আর একটি অভিযানে নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন; যাহা গাযওয়া জাতুর রেকা নামে প্রসিদ্ধ। (তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)

এই বৎসরই ইমাম হোসাইন (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৎসরই নবী (সঃ) উম্মে সালামা (রাঃ)-কে বিবাহ কলিয়াছিলেন।

হিজরী পঞ্চম বৎসর

এই বৎসরের সেরা ঘটনা হইল ইসলামের বৃহত্তম মহাসমর খন্দকের জেহাদ। তৃতীয় খণ্ডে সুদীর্ঘ আট পৃষ্ঠাব্যাপী তাহার ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত মহাসমর সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই মদীনার সর্বশেষ ইহুদী

গোত্র নজিরবিহীন বিশ্বাসঘাতক বনু কোরায়যাকে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান পরিচালিত হয়। তাহার বিবরণও তৃতীয় খণ্ডে দীর্ঘ আট পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

অনেকের মতে এই বৎসরই নবী (সঃ) মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ সর্দার আবু সুফিয়ান তনয়া উম্মে হাবীবা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। আবু সুফিয়ান তখন মুসলমান হন নাই, উম্মে হাবীবা (রাঃ) মুসলমান ছিলেন এবং নিজ স্বামীর সহিত হিজরত করিয়া আবিসিনিয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন। তথায় তিনি বিধবা হইয়া পড়েন। তিনি আবিসিনিয়ায় থাকাবস্থায়ই হযরত নবী (সঃ) তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন এবং সেই দেশের বাদশার ব্যবস্থাপনায় বিবাহ সম্পন্ন হইল। এমনকি বাদশাহ নিজেই তাঁহার মহরানা চারি হাজার দেরহাম আদায় করিয়া দিলেন। বিবাহ সম্পাদনেও বাদশাহই রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উকিল ছিলেন। বিবাহ সম্পাদনের পরে তাঁহাকে শোরাহ্‌বীল ইবনে হাসানা (রাঃ) ছাহাবীর তত্ত্বাবধানে মদীনায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। (বেদায়া ৩-১৪৩)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত এই বিবাহের ইঙ্গিত বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছিল। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ـ

"অচিরেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের এবং তোমাদের শত্রুদের মধ্যে ভালবাসার একটি সূত্র সৃষ্টি করিয়া দিবেন।"

মুসলমানদের সর্বপ্রধান ও সর্বেসর্বা ছিলেন নবীজী মোস্তফা (সঃ)। আর মুসলমানদের তৎকালীন প্রধান শত্রু পক্ষ মক্কার কোরায়শদের সর্দার ও সেনাপতি ছিলেন আবু সুফিয়ান। নবীজী (সঃ) এবং আবু সুফিয়ানের মধ্যে এই বিবাহ সূত্রে শ্বশুর জামাতার সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়া গেল। আবু সুফিয়ানের কন্যা মুসলমান জাতির মাতা হইয়া গেলেন। (বেদায়া, ১-১৪৩)

এই বৎসরই নবী (সঃ) যয়নব (রাঃ)-কে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহ শুধু আল্লাহর আদেশেই হয় নাই, বরং স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই জিব্রাঈল (আঃ) ফেরেশতার মাধ্যমে এই বিবাহ সম্পাদনকারী ছিলেন বলিয়া পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনের আয়াত–

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا ـ

অর্থ ঃ "যায়েদ যখন যয়নব হইতে নির্লিপ্ত হইয়া গেল তখন আমি তাহাকে আপনার বিবাহে দিয়া দিলাম।" এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়াই বিবাহ সম্পাদন ছিল।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যয়নব (রাঃ) (যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিবার পর তিনি) যখন ইদ্দত পূর্ণ করিয়া নিলেন, তখন নবী (সঃ) ঐ যায়েদ (রাঃ)-কেই বলিলেন, তুমি যাইয়া যয়নবকে আমার বিবাহের প্রস্তাব জানাও। সেমতে যায়েদ (রাঃ) যয়নবের নিকটে আসিলেন; তখন যয়নব (রাঃ) রুটি পাকাইবার জন্য আটা তৈয়ার করিতেছিলেন (ঐ সময় পর্দার মাসআলা ছিল না)।

(যয়নব (রাঃ) যায়েদেরই দীর্ঘ দিনের স্ত্রী ছিলেন; তবুও যায়েদ (রাঃ) বলেন–) আমার অন্তরে যয়নবের সম্মান ও শ্রদ্ধার এত বড় ভাব উপস্থিত হইল যে, আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইলাম না এই কারণে যে, নবী (সঃ) তাঁহাকে বিবাহে গ্রহণ করার আলোচনা করিয়াছেন। সেমতে আমি তাঁহার প্রতি পৃষ্ঠ দানে বিপরীত দিকে মুখ করিয়া বলিলাম, আপনি মহাসুসংবাদ গ্রহণ করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আপনার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিয়া পাঠাইয়াছেন।

যয়নব (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার মহান প্রভু-পরওয়ারদেগারের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতিরেকে কিছু করিব না। এই বলিয়া তিনি তাঁহার নামায কক্ষে যাইয়া দাঁড়াইলেন। ইতিমধ্যেই পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল

হইয়া গিয়াছে যাহাতে আল্লাহ তাআল্লা বলিয়াছেন– "যায়েদ যখন যয়নব হইতে নির্লিপ্ত হইয়া গেল তখন আমি যয়নবকে আপনার বিবাহে দিয়া দিলাম।" এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর রসূলুল্লাহ (সঃ) যয়নবের কক্ষে অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকেই তশরীফ নিয়া গেলেন। অতপর বিবাহের ওলীমা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া লোকজনকে দাওয়াত করিলেন। (মুসলিম শরীফ, বেদায়া ৩–১৪৬)

বোখারী শরীফেরই এক হাদীছে বর্ণিত আছে, যয়নব (রাঃ) নবীজীর (সঃ) স্ত্রীগণের উপর গর্ব করিয়া বলিতেন, আপনাদের বিবাহ সম্পাদন করিয়াছেন আপনাদের আত্মীয়গণ। পক্ষান্তরে আমার বিবাহ সম্পাদন করিয়াছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সপ্ত আকাশের উপরে।

এই বিবাহের ওলীমা লগ্নেই পর্দা ফরয হওয়ার আদেশ কোরআনে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

হিজরী ৬ষ্ঠ বৎসর

এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য প্রথম ঘটনা জী-কারাদের অভিযান। এই অভিযানের সূচনায় অতি মজার একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার বিবরণ ৩য় খণ্ডে রহিয়াছে। ১১৫০৭নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

আর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা গযওয়া বনী মোস্তালেক বা মোরায়সী অভিযান। এই জেহাদটির তারিখ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রাঃ) দুইটি অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন– হিজরী চতুর্থ বৎসরে হিজরী ষষ্ঠ বৎসরে এবং ষষ্ঠ বৎসরের অভিমতই প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন।

"খোযাআ" গোত্রের একটি শাখা বংশ বনী মোস্তালেক; "মোরায়সী" নামক একটি ঝর্ণার নিকট খোযাআ গোত্রের বস্তি ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) এই মর্মে সংবাদ পাইলেন যে, বনী মোস্তালেকদের সর্দার হারেস লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিতেছে মদীনা আক্রমণ করার জন্য। নবী (সঃ) একজন ছাহাবীকে তথায় প্রেরণ করিয়া সংবাদটির বাস্তবতা তদন্ত করাইলেন। সংবাদটি সত্য প্রমাণিত হইল; তাই নবী (সঃ) তাহার প্রতিকারে দ্রুত অগ্রসর হইলেন। মুসলমানদের প্রথম আক্রমণেই শত্রু দল পরাজিত হইল; অনেকে পলাইয়া গেল এবং বহু সংখ্যক বন্দী হইল।

বন্দীদের মধ্যে বংশপতি হারেসের দুহিতা "জোআয়রিয়া"ও ছিল। জোআয়রিয়া নবীজীর (সঃ) শরণাপন্ন হইয়া ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিলেন এবং নিজের পরিচয়ও দিলেন যে, আমি বংশের সর্দার হারেসের কন্যা। তাঁহার অবস্থাদৃষ্টে নবীজীর (সঃ) মহানুভব অন্তর দয়ায় উথলিয়া উঠিল। নবীজী (সঃ) তাঁহাকে চির গৌরবের আশ্রয় দানে চরম ভাগ্যবতী বানাইয়া দিলেন যে, তাঁহাকে নিজ দাম্পত্যে স্থান দান করিয়া বিশ্ব মুসলিমের জননী বানাইয়া দিলেন।

এই জেহাদে মোস্তালেক বংশের অনেক নর-নারী বালক-বালিকা বন্দী হইয়া আসিয়াছিল। অবিলম্বে মদীনায় এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল যে, নবীজী (সঃ) এক মহা উদারতার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, বিজিত বনী মোস্তালেক বংশের সর্দার হারেসের বন্দিনী দুহিতার পাণি গ্রহণে তাঁহাকে ধন্য করিয়াছেন। তখন মুসলমানগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, বনী মোস্তালেক বংশের লোকগণ এখন হযরতের শ্বশুরকুল, সুতরাং ইহাদিগকে আর দাস-দাসীরূপে রাখা সঙ্গত হইতেছে না। নবীজীর (সঃ) সহধর্মিণী মাত্রই মুসলমানদের মাতা, অতএব জননী জোআয়রিয়ার বংশের সমস্ত লোকই এখন মুসলমানদের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন। মদীনার মুসলমানগণ কালবিলম্ব না করিয়া বনী মোস্তালেকের সমস্ত বন্দী দাস-দাসীদেরকে মুক্তি দিয়া দিলেন।

এই অভিযান কতিপয় ঘটনার দরুন স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। হাদীছে তফসীরে এবং ইতিহাসে ঐসব ঘটনার আলোচনায় এই অভিযানের উল্লেখ আসিয়া থাকে।

প্রথম ঘটনা ঃ মদীনার অধিবাসীদের একটি শ্রেণী ছিল মোনাফেক– কপট মুসলমান। বস্তুতঃ তাহারা

ইসলাম ও মুসলমানদের পরম শত্রু, কিন্তু আতঙ্ক, স্বার্থ-লোভ কিম্বা ষড়যন্ত্রের উদ্দেশে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে এবং মুসলমানদের দলে মিশিয়া থাকে।

আলোচ্য অভিযানে ঐ শ্রেণীর শয়তানদের বড় সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যোগদান করিয়াছিল। মুসলমানদের সুদৃঢ় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা, মোহাজের ও আনসারগণের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দেওয়া ইত্যাদি শত্রুতামূলক কাজের সুযোগ সন্ধানে তাহারা সদা তৎপর থাকিত। এ অভিযানে একদা পানি সংগ্রহ করিতে ভিড় হয় এবং একজন মোহাজের ও একজন আনসারের মধ্যে বিবাদ হয়। সেই সুযোগে মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ উস্কানি এবং উত্তেজনামূলক কথাবার্তা ছড়াইতে লাগিল। তাহার সম্মুখে তাহার দলের কতিপয় লোক সমবেত ছিল। তাহাদের মধ্যে খাঁটি মুসলমান এক যুবক যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের সম্মুখে মোনাফেক আবদুল্লাহ মোহাজেরগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিল, তাহারা আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের উপর প্রাধান্য এবং প্রাবল্য দেখায়। তাহাদের ও আমাদের অবস্থা ঐ প্রবাদের ন্যায়– "কুকুরকে মোটা-তাজা বানাও যেন সে তোমাকে খায়।" এই বিদেশীদেরকে তোমরা এক দানা দ্বারাও সাহায্য করিও না; বাধ্য হইয়া তাহারা এদিক সেদিক চলিয়া যাইবে। এইবার মদীনায় যাইয়া দেশবাসী শক্তিশালীরা বিদেশী দুর্বলদের নিশ্চয় বাহির করিয়া দিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি অবাঞ্ছিত কথাবার্তা বলিল এবং লোকদিগকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করিল।

তাহার এইসব কথাবার্তা খাঁটি মুসলমান যুবক যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) শুনিলেন এবং নবীজীর গোচরে আনিলেন। নবীজীর (সঃ) নিকটে ওমর (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি মোনানেফ আবদুল্লাহকে হত্যা করার মত প্রকাশ করিলেন। নবী (সঃ) ওমরকে বরিলেন, তাহাকে হত্যা করিলে লোকেরা বলিবে, মুহাম্মদ তাঁহার দলের লোকদেরকেও হত্যা করেন (আবদুল্লাহ ত প্রকাশ্যে মুসলমান দলভুক্ত ছিল)।

মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ এই সংবাদ অবগত হইল যে, তাহার কথাবার্তা নবীজীর গোচরে আসিয়াছে। তখন সে নবীজীর (সঃ) নিকট আসিয়া কসম করিয়া ঐসব কথা অস্বীকার করিল এবং বলিল, সে ঐরূপ কথা মুখেও আনে না। উপস্থিত কেহ কেহ নবীজী (সঃ)-কে প্রবোধ দিল যে, যায়েদ ইবনে আরকাম যুবক ছেলে; হয়ত সে বুঝিতে ভুল করিয়াছে। মোনাফেক আবদুল্লাহ অভিজাত শ্রেণীর লোক ছিল।

মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহর এই জঘন্য ভূমিকা ও কথাবার্তার বর্ণনায় পবিত্র কোরআনে ২৮ পারায় "মোনাফেকুন" নামের সূরাটি নাযিল হইল। ঐ সূরায় পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

"মোনাফেকেরা আপনার সম্মুখে আসিলে বলে, আমরা মনে-প্রাণে সাক্ষ্য দেই– নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ ত জানেন, আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন– মোনাফেকেরা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী (তাহারা অন্তরে কখনও আপনাকে আল্লাহর রসূল মান্য করে না)। তাহারা মিথ্যা কসমের আড়ালে নিজেদেরকে রক্ষা করিয়া লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীন হইতে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। তাহাদের কার্যকলাপ নিতান্তই জঘন্য। তাহারা মুখে ঈমান প্রকাশ করার পর সেই মুখেই আবার কুফরী কথা বলে; ফলে তাহাদের অন্তরে মোহর লাগিয়া গিয়াছে; তাহারা ঈমান গ্রহণ করিবে না। তাহাদের বাহ্যিক আকৃতি আপনাকেও আকৃষ্ট করে, তাহাদের মিষ্ট কথা আপনারও ভাল লাগে (কিন্তু তাহাদের এই আকৃতি ও কথার মূলে কোন শক্তি নাই) তাহদের অবস্থা ঐ থামগুলির ন্যায়, যেইগুলি মাটিতে প্রোথিত নহে– শুধু হেলান দিয়া দাঁড় করিয়া রাখা হইয়াছে। (ঐগুলি যতই মোটা-মজবুত হউক, কিন্তু প্রোথিত না হওয়ায় কোন শক্তি নাই; মোনাফেকদের ভাল আকৃতি ও মিষ্ট কথার অবস্থাও তদ্রূপই। যেহেতু তাহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাই) তাহারা সর্বদা আতঙ্কগ্রস্ত থাকে। তাহারা নিছক শত্রু; তাহাদের হইতে সদা সর্তক থাকিবেন। আল্লাহ তাহাদেরকে ধ্বংস করুন; তাহারা কিভাবে উল্টা পথে চলে।"

এই ভূমিকা বর্ণনার পর আলোচ্য ঘটনায় আবদুল্লাহর বিষাক্ত উক্তিগুলিও আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায়

বর্ণনা করিয়াছেন– যাহা যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ কসম খাইয়া অস্বীকার করিয়াছিল।

উক্ত সূরা নাযিল হইলে পর রসূলুল্লাহ (সঃ) যায়েদ (রাঃ)-কে ডাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ তাআলা তোমার সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছেন।

এখন আবদুল্লাহর ভূমিকা পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহার এক ছেলে ছিলেন খাঁটি মুসলমান, তাঁহার নামও আবদুল্লাহ। তিনি নবীজীর নিকট আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এইরূপ শুনা যায় যে, আপনি মোনাফেক আবদুল্লাহকে হত্যা করার চিন্তা করিতেছেন; যদি তাহাই হয় তবে আমি তাহার মুণ্ডু কাটিয়া আপনার নিকট উপস্থিত করি। অন্য কেহ হত্যা করিলে হয়ত মানবীয় স্বভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া আমি জাহান্নামী হইতে পারি। রসূলুল্লাহ (সঃ) পুত্র আবদুল্লাহকে বলিলেন, যত দিন সে আমাদের জামাতে মিশিয়া আছে, আমি তাহাকে হত্যা করিতে চাহি না।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এই অভিযানে আর একটি ঘটনা এমন ঘটাইল যাহা তাহার জীবনের সমস্ত অপকর্ম ছাড়াইয়া গেল।

এই ভ্রমণে নবীজীর (সঃ) সহিত মুসলিম জননী আয়েশা (রাঃ)ও ছিলেন। খবিস মোনাফেক আবদুল্লাহ জঘন্য ষড়যন্ত্ররূপে জাতির জননী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নামে মিথ্যা অপবাদ গড়িয়া লোকদের মধ্যে তাহার চর্চা করিল। ইহাতে এক মহা বিভ্রাটের সৃষ্টি হইল। অবশেষে পবিত্র কোরআনে সুদীর্ঘ বয়ান অবতীর্ণ হইয়া মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পবিত্রতা প্রমাণ করিল।

এই ঘটনার সুদীর্ঘ বর্ণনা বোখারী শরীফের হাদীছে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইনশাআল্লাহু তায়ালা ষষ্ঠ খণ্ডে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ফযিলত পরিচ্ছেদে উহার অনুবাদ ও বিস্তারিত আলোচনা হইবে।

আলোচ্য বৎসরের সর্বশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল "হোদায়বিয়ার সন্ধি"। এই সন্ধির ফলেই মুসলিম জাতি সর্বপ্রথম নিজস্ব সত্তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করে এবং ইসলামের জন্য অগ্রাভিযানের সুযোগ লাভ হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে "হোদায়বিয়ার জেহাদ" শিরোনামে ৩৫ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত রহিয়াছে।

হিজরী সপ্তম বৎসর

নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কর্মতৎপরতা হিজরতের পরবর্তী বৎসরগুলিতে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে চলিতেছিল। হিজরী ষষ্ঠ বৎসরের যিলহজ্জ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদন করিয়া নবীজী (সঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সন্ধির দরুন মক্কাবাসীদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ হইতে অবকাশ পাইয়াছেন। এই অবকাশে কালবিলম্ব না করিয়া বিশ্বব্যাপী ইসলামের আহ্বান ছড়াইয়া দেওয়ার এক আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করিলেন। বিশ্বের বড় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজন্যবর্গের প্রতি, বিভিন্ন গোত্রপতি, সমাজপতি এবং বড় বড় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দূত মারফত ইসলামের আহ্বানে সীলমোহরকৃত লিপি প্রেরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

একদা নবী (সঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন, আগামীকল্য সকাল বেলা তোমরা সব আমার সহিত একত্রিত হইবে। সেমতে পরবর্তী দিন ফজরের নামাযে সকলে বিশেষভাবে উপস্থিত হইলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিয়ম ছিল, তিনি ফরয নামাযান্তে কিছু সময় তসবীহ পড়া ও দোয়া করায় মগ্ন থকিতেন। আজ সেই নিয়ম পালন পরে উপস্থিত ছাহাবীবর্গের প্রতি ফিরিয়া মিম্বর পরে দাঁড়াইলেন এবং ভাষণ দানে আল্লাহ তাআলার গুণগান ও প্রশংসা করিয়া সকলকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, আমি তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে বহির্বিশ্বের রাজ-রাজড়াদের প্রতি প্রেরণ করার ইচ্ছা করিতেছি। তোমরা আমার কথার ব্যতিক্রম করিবে না। আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে কর্তব্য

পালন করিয়া যাইবে। জনগণের কোন দায়িত্ব কাহারও উপর ন্যস্ত করা হইলে যদি সে তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের চেষ্টা না করে, তবে আল্লাহ তাহার জন্য বেহেশত হারাম করিয়া দিবেন।

তোমরা নিজ নিজ কর্তব্যে যাইবে এবং ঐরূপ করিবে না যেরূপ করিয়াছিল ঈসা আলাইহিস সালামের প্রেরিত দূত বনী ইসরাঈলগণ। তাহারা নবীর কথার ব্যতিক্রম করিয়াছিল; নিকটবর্তী স্থানে পৌছিয়াছিল, কিন্তু দূরবর্তী স্থানে যায় নাই।

ছাহাবীগণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদিগকে যেকোন আদেশ করেন, যেকোন দেশে প্রেরণ করেন– আমরা আপনার কথার ব্যতিক্রম কখনও করিব না। তখন নবী (সঃ) এক একজনকে একজনের নিকট প্রেরণের জন্য নির্ধারিত করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ গন্তব্য দেশের ভাষাও শিক্ষা করিয়া নিলেন। (তাবাকাত, ১–২৭৪, ৩–২৬৮)

সেমতে ঐ যিলহজ্জ মাসের পরবর্তী সপ্তম বৎসরের প্রথম মাস মহররমেই নবীজী (সঃ) তৎকালীন বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের ছয় জন সম্রাটের প্রতি লিপি লিখিলেন এবং ছয় জন দূত একই দিনে প্রেরণ করিয়া এই ব্যবস্থার উদ্বোধন করিলেন।

১। সর্বপ্রথম দূত আম্‌র ইবনে উমাইয়া (রাঃ); তাঁহাকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশে নবীজী (সঃ) দুইখানা পত্র লিখিয়াছিলেন– একখানা পত্রে ইসলামের আহ্বান এবং পবিত্র কোরআনের কতিপয় আয়াত লিখিয়াছিলেন। বাদশাহ এই লিপিখানা হস্তে ধারণ পূর্বক শ্রদ্ধার সহিত উভয় চোখে স্পর্শ করিলেন এবং সিংহাসন হইতে নামিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। অতঃপর কালেমা শাহাদত পাঠে ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং আক্ষেপের সহিত বলিলেন, সক্ষম হইলে অবশ্যই আমি নবীজী (সঃ) সমীপে উপস্থিত হইতাম।

অপর পত্রে লিখিয়াছিলেন, মক্কা হইতে যাঁহারা হিজরত করিয়া আবিসিনিয়ার আশ্রয় নিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বাহনের ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য। এই পত্রের আদেশও তিনি উত্তমরূপে পালন করিয়াছিলেন। দুইটি নৌকাযোগে তিনি তথাকার প্রবাসী ৮০ জন নারী-পুরুষ মুসলমানকে মদীনায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দলপতি জাফর রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হস্তে নবীজী (সঃ) সমীপে লিপির উত্তরও পাঠাইয়াছিলেন– তাহাতে নিজের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ লিখিয়াছিলেন। (ঐ ২৫৯)

২। তৎকালীন সর্ববৃহৎ শক্তি রোমের সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নিকট লিপি পাঠাইয়াছিলেন দেহইয়া কল্‌বী (রাঃ) মারফত। এই লিপির বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৬ নং হাদীছে রহিয়াছে।

৩। তৎকালীন দুই বৃহৎ শক্তির দ্বিতীয় পারস্য সম্রাটের নিকট লিপি পাঠাইয়াছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে হোযায়ফা (রাঃ) মারফত। লিপির মর্ম ছিল–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى كِسْرٰى عَظِيْمِ فَارِسَ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَاٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا اَسْلِمْ تَسْلَمْ فَاِنْ اَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْمَجُوْسِ ـ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের তরফ হইতে পারস্য প্রধান কেসরার নিকট– সালাম তাহাকে যে সত্যের অনুসরণ করে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলকে বিশ্বাস করে। আমি সাক্ষ্য দেই, আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নাই এবং আমি আল্লাহর রসূল সমগ্র বিশ্ব মানবের প্রতি– সকল জীবন্তদিগকে সতর্ক করার জন্য। ইসলাম গ্রহণ করুন; শান্তিতে থাকিবেন, যদি আপনি ইসলামকে অস্বীকার করেন তবে আপনার প্রজা সমস্ত অগ্নিপূজকরাই অস্বীকার করিবে, ফলে সকলের পাপের জন্য আপনি দায়ী হইবেন। (সীরাতুন নবী)

মহাপ্রতাপশালী পারস্য সম্রাট– যাহাকে তাহার প্রজা ও অধীনস্থগণ পূজনীয় প্রভু গণ্য করিত এবং সকলেই তাহার সম্মুখে অবনত মস্তকে সেজদা করিয়া থাকিত; তাহার নিকট কেহ কোন লিপি পেশ করিলে তাহাতে সর্বপ্রথম সকলের উপর তাহার নাম লেখা অবশ্য কর্তব্য ছিল। তাহার নামের পূর্বে কোন কিছু লেখা মহা অপরাধ গণ্য করা হইত। সেমতে এই লিপিতে যখনই সে দেখিল, তাহার নামের উপরে প্রথম আল্লাহর নাম তার পর আবার মুহাম্মদ নাম। তখনই সে ক্রোধে বেসামাল হইয়া পড়িল এবং লিপিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

দূত আবদুল্লাহ (রাঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া নবী (সঃ)-কে তাঁহার লিপি ছিঁড়িয়া ফেলার সংবাদ পৌঁছাইতেই নবী (সঃ) আল্লাহর হুজুরে নিবেদন করিলে ان يمزقوا كل ممزق "আয় আল্লাহ! তাহারা যেন টুকরা টুকরা হইয়া যায় যেরূপ আমার লিপিকে টুকরা টুকরা করিয়াছে।" বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৫৭ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

ক্রোধে আত্মহারা সম্রাট ইতিমধ্যেই তাহার অধীনস্থ ইয়ামান প্রদেশের শাসনকর্তা বাযানকে ফরমান পাঠাইল– অবিলম্বে আরবের নবুয়তের দাবীদার মুহাম্মদকে গ্রেফতার করিয়া আমার দরবারে হাযির কর। আদেশ পাওয়া মাত্র বাযান গ্রেফতারী পরোয়ানাসহ দুই জন রাজ কর্মচারীকে মদীনায় পাঠাইয়া দিল। তাহারা মদীনায় পৌঁছিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং বাযানের গ্রেফতারী পরোয়ানার লিপি অর্পণ করিল।

রসূলুল্লাহ (সঃ) লিপির মর্মে মুচকি হাসি হাসিলেন এবং আগন্তুকদ্বয়কে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন। নবীজী (সঃ) যখন কথা বলিতেছিলেন তখন তাহাদের বুক থর থর কাঁপিতেছিল। নবীজী (সঃ) তাহাদেরকে বলিলেন, আমার বক্তব্য আমি আগামীকল্য বলিব।

দ্বিতীয় দিন তাহারা নবীজী (সঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও এবং তোমাদের প্রেরক বাযানকে সংবাদ দাও যে, আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তাহার প্রভু সম্রাটকে গত রাত্রির সাত ঘণ্টা অতিক্রান্তের পর মারিয়া ফেলিয়াছেন। সম্রাটের পুত্রকেই আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি লেলাইয়া দিয়াছেন। পুত্র তাহার পিতা সম্রাটকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা চলিত জুমাদাল উলা মাসের দশ তারিখ মঙ্গলবার রাত্রের ঘটনা। তাহারা উভয়ে ইয়ামনে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাযানকে ঐ সংবাদ পৌঁছাইলে বাযান এবং ইয়ামানে উপস্থিত তাঁহার পরিবারবর্গ ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১–২৬৯)

৪। মিসরীয় কিবতী জাতির খৃস্টান শাসনকর্তা মোকাওকাসের নিকট লিপি পাঠাইয়াছিলেন হাতেব ইবনে আবু বালতায়া (রাঃ) মারফত। সে নবীজীর (সঃ) দূতকে সম্মান করিয়াছে, যথাসত্বর সাক্ষাত দান করিয়াছে, নবীজীর লিপিকে অতিশয় সম্মান করিয়াছে; একটি হস্তি দাঁতের কৌটায় হেফাযতের সহিত সংরক্ষণ করিয়াছে। নবীজীর (সঃ) জন্য মূল্যবান হাদিয়া–উপঢৌকনও পাঠাইয়াছিল; এই উপঢৌকনের মধ্যে ছিল কতিপয় দুষ্প্রাপ্য শ্বেত বর্ণের অশ্বতরী দুলদুল।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শনে মোকাওকাস কোন ত্রুটি করে নাই। সে শ্রদ্ধার সহিত নবীজীর লিপির উত্তরও দিয়াছে। উত্তরে সে প্রকাশ করিয়াছে– আমি জানিতাম, একজন নবীর আবির্ভাব বাকী রহিয়াছে; আমার ধারণা ছিল তাঁহার আবির্ভাব সিরিয়া হইতে হইবে।

মোকাওকাস ইসলাম গ্রহণ করে নাই। নবী (সঃ) নিজ উদারতা ও আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে তাহার উপঢৌকন গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অসন্তুষ্টির সহিত বলিয়াছিলেন, রাজত্বের লালসা তাহাকে ইসলাম হইতে বঞ্চিত রাখিল, অথচ তাহার রাজত্বের স্থায়িত্ব নাই। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১–২৬০)

মোকাওকাস খৃস্টান ছিল, কিন্তু সে নবীজীর লিপিখানা সুরক্ষিতরূপে রাখিয়াছিল। দীর্ঘকাল তাহা

রাজভাণ্ডারে সযত্নে সুরক্ষিত ছিল। এমনকি এই যুগেও তাহা মুসলমানদে হস্তগত হইয়া কপির ফটো ব্লক প্রকাশিত হইয়াছে। বরকতের জন্য আমরা উহার ফটো ব্লক ছাপাইয়া দিলাম।

১৮৪০ ইং মোতাবেক ১২৬০ হিজরীর দিকে তুরস্কের শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান আবদুল মজিদ খান। তখন মক্কা-মদীনাসহ হেজায এলাকা তুরস্কের শাসনেই ছিল। নবীজীর রওজা পাকের সবুজ গুম্বজসহ বর্তমান মসজিদে নববীর সম্মুখ ভাগ সুলতান আবদুল মজিদ খানের নির্মিত। সেই সুলতান আবদুল মজিদ খানের আমলের ঘটনা—

ফ্রান্সের একজন পর্যটক মিসরস্থ কিবতিয়া শহরে পৌঁছিলেন। তথায় খৃষ্টানদের বড় একটি গির্জা ছিল; উক্ত গির্জার প্রধান যাজক পাদ্রীর নিকট ঐ লিপি মোবারক সুরক্ষিত ছিল। পর্যটক খোঁজ পাইয়া পাদ্রী হইতে তাহা ক্রয় করিয়া আনেন এবং সুলতান আবদুল মজিদ খান সমীপে উপহাররূপে উপস্থিত করেন।

তুরস্কের রাজভাণ্ডারে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কতিপয় বরকতপূর্ণ স্মৃতিচিহ্ন সুরক্ষিত আছে। সুলতান আবদুল মজিদ খান (রঃ) এই মহামূল্যবান লিপি মোবারকও তাহাতে শামিল করিয়া রাখেন। কোন মহামতি ব্যক্তির সৌজন্যে সেই মহামোবারক লিপির ফটো ব্লক প্রকাশিত হয়।

কালের আবর্তনে লিপির কোন কোন অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে মনে হয় এবং লিপির গায়ে দাগ ও রেখা সৃষ্টি হইয়াছে। চেষ্টা করিলে উক্ত দাগ ও রেখামুক্ত ফটো ব্লক তৈয়ার করা সম্ভব হইত, কেহ কেহ সেইরূপ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা মূল বস্তুর অবিকল ছাপ গণ্য হয় না। তাই আমরা সেই চেষ্টায় অগ্রসর হই নাই।

ঢাকা লালবাগের ইতিহাস প্রসিদ্ধ দুর্গে তথা কিল্লার ভিতরে শাহী আমলের যে মসজিদ আছে সেই মসজিদ হইতে এই মহাসওগাত লাভ করা হইয়াছে।

লিপির ছবিখানা নিম্নরূপ
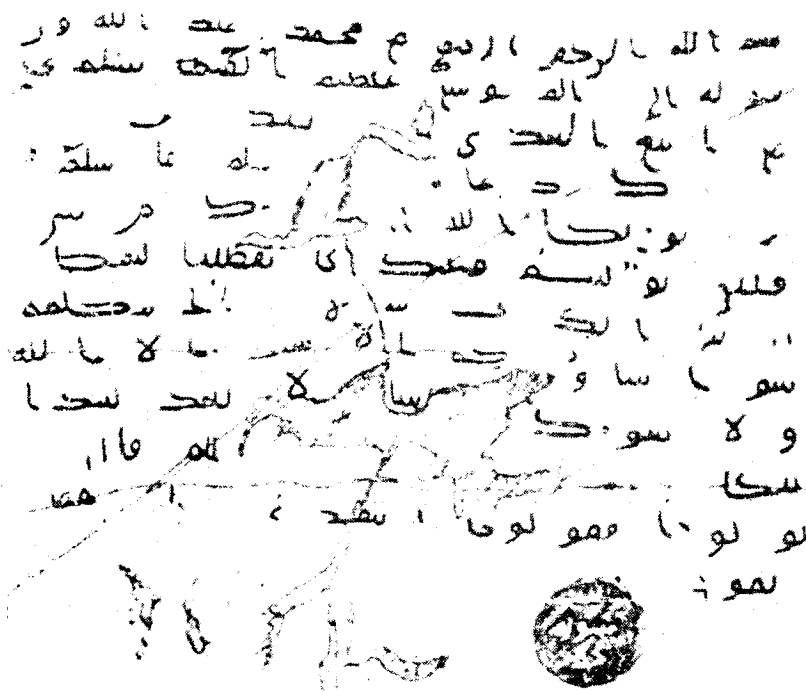
বর্তমান আরবিয় বর্ণমালায় লিপিখানার বিষ বস্তু এই –

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلٰى الْمُقَوْقَسِ عَظِيْمِ الْقِبْطِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلَامِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ مَا يُفْجِعُ الْقِبْطَ - يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ - فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানের রাহীম–

আল্লাহর বান্দা এবং তাঁহার রসূল মুহাম্মদের পক্ষ হইতে কিব্‌তী প্রধান মোকাওকাসের নিকট– সত্যের যে অনুসরণ করে তাহার প্রতি সালাম। অতপর আমি আপনাকে ইসলামের আহ্বান জানাইতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকিতে পারিবেন; আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। ইসলাম হইতে আপনি ফিরিয়া থাকিলে কিব্‌তী জাতির উপর যে বিপদ আসিবে সেই জন্য আপনি দায়ী হইবেন।

হে কিতাবধারীগণ! তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ঐকমত্যের কথাটি বাস্তবায়িত করার প্রতি আসিয়া যাও– তাহা এই যে, আমরা আল্লাহ ভিন্ন কাহারও উপাসনা করিব না, তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত করিব না এবং আমরা আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে প্রভুর মর্যাদা দিব না। যদি তোমরা একত্ববাদ বাস্তবায়িত করা হইতে ফিরিয়া থাক তবে সাক্ষী থাকিও– আমরা এক আল্লাহর সমীপে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী।

৫। রোমের আশ্রিত রাজ্য সিরিয়ার শাসনকর্তা মোনযের ইবনে হারেসগাস সানীর নিকটও নবী (সঃ) লিপি শুজা ইবনে ওহ্‌ব (রাঃ) ছাহাবী মারফত প্রেরণ করিয়াছিলেন। বেদায়াহ, ৩–৬৮) প্রথম খণ্ড ৬ নং হাদীছে বর্ণিত ঘটনায় রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সিরিয়াস্থ ইলিয়া শহরে আগমনের যে উল্লেখ রহিয়াছে– সেই আগমন উপলক্ষে রোম সম্রাটের আতিথেয়তার ব্যবস্থাপনায় তখন মোনযের ইবনে হারেস অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত ছিল।

লিপিবাহক শুজা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শাসনকর্তা হারেসের সাক্ষাতের জন্য পৌঁছিলাম এবং ২/৩ দিন অপেক্ষারত থাকিলাম। তাহার এক গৃহরক্ষী ছিল রোমান বংশীয়, তাহার নাম "মোরী"। সে আমাকে বলিল, অমুক অমুক বিশেষ দিন ছাড়া হারেসের সাক্ষাত হইবে না। আমি অপেক্ষায় থাকিলাম। মোরীর সহিত আমার বেশ সম্পর্ক হইয়া গেল। সে আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করিত। উত্তরে আমি নবীজীর (সঃ) গুণাবলী বর্ণনা করিতাম এবং তিনি যেই ধর্মের আহ্বান করিয়া থাকিতেন সেই ধর্ম ইসলামের বয়ানও তাহার নিকট করিতাম। মোরী আমার বক্তব্য শ্রবণে অত্যধিক মোহিত হইত, এমনকি কাঁদিয়া অস্থির হইয়া যাইত আর আমাকে বলিত, "আমি ইঞ্জীল কিতাব পাঠ করিয়া থাকি! তাহাতে এই নবীর গুণাবলীর উল্লেখ ঠিক এইরূপই পাইয়া থাকি। আমি তাঁহার প্রতি ঈমান আনিলাম এবং পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। অবশ্য আমি ভয় করি, মোনযের ইবনে হারেস জানিতে পারিলে আমাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিবে।" মোরী আমাকে অত্যধিক সম্মান করিত এবং যত্নের সহিত আতিথেয়তা করিত।

একদা শাসনকর্তা হারেস রাজমুকুট পরিধানে দরবারে বসিল এবং আমাকে সাক্ষাত দানের সময় দিল। আমি উপস্থিত হইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লিপিখানা তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম। লিপির বিষয়বস্তু ছিল এই–

سَلاَمٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَاٰمَنَ بِهٖ وَادْعُوْكَ اِلٰى اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ يَبْقٰى مُلْكَكَ ـ

অর্থ ঃ "সালাম তাহার প্রতি যে সত্যের অনুসরণ করে এবং সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আমি আপনাকে আহ্বান জানাই, আপনি আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ করুন যিনি এক– তাঁহার কোন শরীক নাই; আপনার রাজত্ব অটুট থাকিবে।" (বেদায়া, ৩-২৬৮)

সে লিপি পাঠ করিয়া ক্রোধে বেসামাল হইয়া পড়িল এবং লিপিখানা ফেলিয়া দিয়া বলিল, এমন কে আছে যে আমার রাজত্ব ছিনাইয়া নিতে পারে? আমি অভিযান চালাইব এবং সে সুদূর ইয়ামানে থাকিলেও তাহাকে পাকড়াও করিয়া আনিব। এখন হইতে লোক-লস্কর একত্রিত করা হইবে। ঐ দরবারে বসা অবস্থায়ই সে সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিল এবং তথা হইতে উঠিয়া যুদ্ধের অশ্বসমূহের পায়ে নাল লাগাইয়া প্রস্তুত করার আদেশ জারি করিয়া দিল।

লিপিবাহক শুজা (রাঃ) বলেন, সে যুদ্ধের এইসব তৎপরতা ও প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়া আমাকে বলিল, তোমার গুরুকে এই সমাচার অবগত কর। শাসনকর্তা মোনযের ইবনে হারেস রোম সম্রাটের নিকটও পত্রযোগে আমার বিষয় এবং যুদ্ধের জন্য তাহার প্রস্তুতির সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

রোম সম্রাটের অবস্থা ত ৬নং হাদীছে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে, সে নবীজীর (সঃ) বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্বদানে ভাবাবেগে কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব রোম সম্রাট তাহাকে পত্রের উত্তরে সতর্ক করিয়া দিল যে, ঐ নবীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবে না; তাঁহার বিরুদ্ধে তৎপরতা বন্ধ কর, আর ইলিয়া শহরে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাত কর।

শুজা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, শাসনকর্তা মোনযের ইবনে হারেসের নিকট যখন রোম সম্রাটের এই উত্তর পৌঁছিল তখন সে দমিয়া গেল। সে আমাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আমার গুরুর নিকট প্রত্যাবর্তনে কোন্ দিন যাত্রা করিবেন? আমি বলিলাম, আগামীকল্য। মোনযের তৎক্ষণাত আমাকে একশত তোলা স্বর্ণ এবং যাতায়াত ব্যয় ও পোশাক-পরিচ্ছদ উপহার দেওয়ার আদেশ করিল। আর মোরীকে আদেশ করিল, আমার সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্য।

মোরী আমার মারফত নবীজী (সঃ)-এর সমীপে সালাম আরজ করিলেন। আমি নবীজীর খেদমতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মোনযের ইবনে হারেসের সমুদয় সংবাদ অবগত করিলাম। নবী (সঃ) বলিলেন, তাহার রাজত্বের অবসান অবশ্যম্ভাবী। আর নবী সমীপে মোরীর পক্ষ হইতে সালাম নিবেদন করিলাম এবং তাঁহার কথাবার্তা শুনাইলাম। নবী (সঃ) বলিলেন, সে সত্যবাদী। মোনযেরের ভাগ্যে ঈমান জুটিল না।

(তাবাকাত, ১-২৬২)

৬। আরবের একটি প্রসিদ্ধ সুফলা এলাকা "ইয়ামামা"। তথাকার সর্বপ্রধান ব্যক্তি ছিল "হাওয়াযা ইবনে আলী।" এলাকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐ ব্যক্তি তথাকার সর্বাধিক প্রভাবশালী লোক। তাহার নিকটও নবী (সঃ) সালীত ইবনে আম্র (রাঃ) ছাহাবী মারফত লিপি পাঠাইলেন। লিপিতে তাহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন। সে লিপি পাঠ করিয়া কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান না করিলেও মোলায়েমভাবে প্রত্যাখ্যানই করিল। সে নবীজীর (সঃ) লিপির উত্তরে লিপি লিখিল, যাহার মর্ম এই ছিল– আপনি যেই বস্তুর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন তাহা অতি সুন্দর ও উত্তমই বটে। তবে আমি আমার জাতির কবি ও বক্তা, সমগ্র আরব আমাকে ভয় করে। অতএব প্রাধান্যের কিছু অংশ আপনার সহিত আমাকে দিতে হইবে, তবেই আমি আপনার কথা গ্রহণ করিতে পারি।

সে লিপির এই উত্তর দান করিল আর নবীজী (সঃ)-এর দূতকে পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিভিন্ন উপঢৌকন

প্রদান করিল। দূত প্রত্যাবর্তন করিলে নবীজী (সঃ) তাহার লিপি পাঠ করিয়া বলিলেন, (ইসলামের বিনিময়ে) যদি সে একটি খেজুর পরিমাণ জায়গার কর্তৃত্বও দাবী করে তাহাও দান করিতে আমি প্রস্তুত নহি। তাহার ধন-সম্পদ অচিরেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

পাঠক! নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কর্মতৎপরতার দ্রুত গতির নমুনা এখানেই দেখা যায়। প্রায় ১৫০০ ছাহাবী সঙ্গে লইয়া ৩০০ মাইল সফর করতঃ ওমরা করার নিয়তে মক্কার নিকটে পৌঁছিলেন। মক্কাবাসীরা মক্কায় যাইতে দিল না; বিরাট ঝামেলার পরে তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া আবার সেই প্রায় ৩০০ মাইল ভ্রমণ করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। অত বড় সফর এবং ঝামেলা অতিক্রম করতঃ মদীনায় পৌঁছিয়া এক মাসেরও অনেক কম সময় মদীনায় অবস্থান করিলেন। তাহার পরেই আরবে ইহুদী শক্তির সর্বপ্রধান কেন্দ্র খায়বর অভিযানে তাঁহাকে যাইতে হইল– যাহা এক ভয়াবহ অভিযান ছিল।

মধ্যবর্তী এই সামান্য সময়েও নবী (সঃ) তাঁহার দায়িত্ব পালনের তৎপরতায় বিন্দুমাত্র বিশ্রাম নিলেন না। এই ১০/২০ দিনের মধ্যেই নবী (সঃ) বহির্বিশ্বে ইসলামকে বিদ্যুৎ গতিতে ছড়াইয়া দেওয়ার বিপ্লবী ব্যবস্থা সম্পন্ন করিলেন। একই দিনে উল্লিখিত ছয় জন দূতকে ছয়টি দেশে প্রেরণ করিয়া এক সঙ্গে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় ইসলামকে ছড়াইয়া দিলেন। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মহাআহ্বানে তিনটি মহাদেশেই এক অপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হইল– সম্রাটের রাজসিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল, বিশ্ব শক্তিসমূহও আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।

মরু নিবাসী ও খেজুর পাতার মসজিদে দরবার অনুষ্ঠানকারী নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লিপিগুলির রাজকীয় মহত্ত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ততা, গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষা, আত্মাভিমানপূর্ণ বাক্যাবলী, শক্তি সামর্থ্যের কণ্ঠধারী শব্দাবলী পৃথিবীর খ্যাতনামা সম্রাট এবং গর্ব-অহঙ্কারে পরিপূর্ণ বীরগণকে কাঁপাইয়া তুলিল। শত শত যুগে যাহা সম্ভব হইত না শুধু লিপির দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইয়া গেল।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উল্লিখিত ছয়খানা লিপি ছাড়া আরও অনেক লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথা–

৭। আয্‌দ বংশীয় শাসনকর্তা জায়ফর এবং তাঁহার ভ্রাতা আব্‌দ– তাঁহাদের প্রতি নবী (সঃ) আম্‌র ইবনুল আ'ছ (রাঃ) ছাহাবীকে লিপি দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৮। বাহ্‌রাইনের শাসনকর্তা মোনযের ইবনে সাওয়ার নিকটও নবী (সঃ) আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ) ছাহাবী মারফত লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনিও ইসলাম গ্রহণপূর্বক নবীজীর নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন যে, আমার দেশে ইহুদী ও অগ্নিপূজক সম্প্রদায় বাস করে: তাহাদের প্রতি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিব। নবী (সঃ) উত্তরে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, আপনি যাবত সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, আপনার কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন থাকিবে। আর ইহুদী ও অগ্নিপূজক সম্প্রদায় অনুগত নাগরিকরূপে রাষ্ট্রীয় কর আদায় করিলে তাহারা নিজ নিজ ধর্মে থাকিয়া দেশে বসবাস করিবার সুযোগ-সুবিধা পূর্ণরূপে ভোগ করিবে।

৯। গাসসানের শাসনকর্তা জাবালা ইবনে আইহামকেও নবী (সঃ) লিপি লিখিয়াছিলেন। সে তখন মুসলমান হইয়াছিল। খলীফা ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমলে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রোধে ইসলাম ত্যাগ করত পলাইয়া গিয়াছিল।

১০। সামাওয়াহ্ এলাকার শাসক নুফাসা ইবনে ফরওয়াহ্‌কেও রসূল (সঃ) লিপি লিখিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিও নবী (সঃ) লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথা–

১১। ইয়ামানের হারেসা, ১২। শোরায়হ, ১৩। নোয়াএম, তাঁহারা তিন ভ্রাতা আবদে কুলালের পুত্র প্রত্যেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। নবী (সঃ) প্রত্যেকের নিকটই ভিন্ন ভিন্ন লিপি পাঠাইয়াছিলেন। তদ্রূপ ইয়ামানে ১৪। নোমান, ১৫। মাআফের, ১৬। হামদান, ১৭। যোরআ– তাঁহাদেরকেও ভিন্ন ভিন্ন লিপি

লিখিয়াছিলেন। তাহাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন ইয়ামনের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি- ১৮। জীলকুলা এবং ১৯। জী আম্‌রকেও লিপি লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমনকি পবিত্র কোরআনে সূরা ফীলের ইতিহাসের নায়ক আব্‌রাহা রাজার কন্যা "জোরায়বা" জীল কুলার স্ত্রী ছিলেন, তিনিও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ২০। আব্‌রাহার পুত্র মা'দীকারেবকেও লিপি লিখিয়াছিলেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২১। নবী (সঃ) নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার মোসায়লামা কাজ্জাবের নিকটও ইসলামের প্রতি আহ্বানে লিপি পাঠাইয়াছিলেন।

২২। রোমানদের প্রসিদ্ধ পাদ্রী জাগাতেরকেও লিপি লিখিয়ছিলেন।

নবী (সঃ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধানদেরকেও লিপি লিখিয়াছিলেন। যথা-

২৪। ইয়ামানস্থিত নাজরানের সুপ্রসিদ্ধ গির্জার পাদ্রীদের নিকট নবী (সঃ) লিপি পাঠাইয়াছিলেন।

২৫। আরব সাগরের উপকূলীয় হাজরামউত এলাকার কতিপয় সর্দার প্রধানের নিকটও লিপি লিখিয়াছিলেন।

লিপির মাধ্যমে বিশ্বের কোণে কোণে ইসলামের ডাক পৌছাইয়া দেওয়া- ইহাও নবীজীর নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক উপায় ছিল, যাহার আশাতীত সুফল লাভ হইয়াছিল।

এই বৎসরের প্রথম মাস মহররমেই ইহুদী শক্তি নিস্তব্ধকারী খয়বর জেহাদ অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে প্রায় দশ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

এই বৎসরই নবী (সঃ) চৌদ্দ শতের অধিক ছাহাবী সঙ্গে লইয়া ওমরা করার জন্য বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ওমরা আদায় করিয়াছিলেন। হিজরী ষষ্ঠ বৎসরে নবী (সঃ) ঐসব ছাহাবীগণকে লইয়া ওমরা করার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু মক্কাবাসীরা বাধা দেওয়ায় ওমরা আদায় করিতে পারেন নাই। অবশ্য পরস্পর সন্ধি হইয়াছিল- যাহা "হোদায়বিয়ার সন্ধি" নামে প্রসিদ্ধ। সেই সন্ধির শর্ত অনুসারে এই বৎসর বিনা বাধায় মুসলমানগণ ওমরা আদায় করিয়াছিলেন।

হিজরী অষ্টম বৎসর

ইসলাম ও মুসলমানদের মহা বিজয়ের বৎসর

এই বৎসরের প্রথম জেহাদ মুতার জেহাদ। এই জেহাদে নবীজী (সঃ) অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন না। অত্যন্ত ভয়াবহ জেহাদ ছিল ইহা। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নির্ধারিত একের পর এক তিন জন আমীর বা কমাণ্ডার- নবীজীর পালক পুত্র যায়েদ (রাঃ), চাচাত ভাই জাফর (রাঃ) এবং বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) প্রত্যেকেই শহীদ হইয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

এই বৎসরই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তথা ইসলাম ও মুসলিম জাতির মহাবিজয়, চরম বিজয়, সুস্পষ্ট বিজয়- ফত্‌হে মুবীন তথা মক্কা বিজয় লাভ হয়। অধিকন্তু মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ- হোনায়ন, আওতাস, তায়েফ ইত্যাদিও জয় করা হয়; সর্বত্রই ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন হয়। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ৩৭ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত রহিয়াছে।

নবীজী (সঃ)-এর উদারতা

আরবের বিখ্যাত কবি যোহায়র, তাহার পরিবারের প্রত্যেকেই বিশিষ্ট কবি। তাহার দুই পুত্র- বোজায়র এবং কা'বও প্রসিদ্ধ কবি। মক্কা বিজয়ের পর বোজায়র ইসলাম গ্রহণপূর্বক নবীজীর সহিত মদীনায় চলিয়া আসিলেন। মদীনা হইতে ভ্রাতা কা'বকে পত্র লিখিয়া নিজের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জ্ঞাত করিলেন এবং

তাহাকেও লিখিলেন, যে কেহ ইসলাম গ্রহণ করিয়া আসিলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহার ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পূর্বেকার অপরাধ ক্ষমা করেন। অতএব তোমার অন্তরে যদি ইসলামের প্রতি আকর্ষণ হয় তবে যথাসত্বর চলিয়া আস, অন্যথায় প্রাণ বাঁচাইবার আশ্রয়স্থলের খোঁজ কর।

কা'ব উত্তরে কাব্যের মাধ্যমে নবীজী (সঃ)-কে কটাক্ষ করিয়া পত্র লিখিল। তাহার পত্রের কটাক্ষে নবীজী (সঃ) তাহার উপর রুষ্ট হইলেন এবং লোকেরা তাহাকে ভয় দেখাইল যে, তুমি প্রাণ হারাইবে। অবশেষে কা'বের মতি পরিবর্তিত হইল– সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদারতার প্রশংসা করিয়া একটি কবিতা রচনা করিল। অতপর গোপনে মদীনায় আসিয়া এক পরিচিত ছাহাবীর আশ্রয় নিল। ঐ ছাহাবী তাহাকে লইয়া নবীজী (সঃ)-এর মসজিদে ফজরের নামায পড়িলেন। ঐ ছাহাবী নামাযের পরে কা'বকে নবীজীর (সঃ) প্রতি ইশারা করিয়া দেখাইয়া দিলেন। নবী (সঃ) কা'বকে চিনেন না। এই সুযোগে কা'ব নিজেই নবী (সঃ)-কে বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! যোহায়র পুত্র কা'ব অনুতপ্ত হইয়া ইসলাম গ্রহণপূর্বক আপনার চরণে শরণ লইতে আসিয়াছে। আপনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন– যদি আমি তাহাকে আপনার নিকট উপস্থিত করি? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, হাঁ– নিশ্চয়! তৎক্ষণাত কা'ব বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি নিজেই কা'ব। এই বলিয়া কবি কা'ব (রাঃ) নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদ্দেশে রচিত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কবিতা "বানাত সোআ'দ" ঐ মজলিসেই পাঠ করিয়া শুনাইলেন। উক্ত কবিতায় তিনি উল্লেখ করিলেন–

আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে ভয় দেখানো হইয়াছে, কিন্তু আল্লাহর রসূলের দরবারে ক্ষমার আশা অতি উজ্জ্বল। আমার প্রতি সহিষ্ণু হউন; আল্লাহ আপনাকে মহান কোরআনে কত কত সুন্দর উপদেশমালা দান করিয়াছেন! মিথ্যা দোষ চর্চাকারীদের কথায় আমাকে মেহেরবানীপূর্বক অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন না। লোকেরা আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমি অপরাধী নহি।

নবীজী (সঃ) -এর প্রশংসায় তিনি একটি উক্তি অতি চমৎকার করিয়াছেন–

"রসূল আল্লাহর নূর, বিশ্ব হয় তাহাতে উজালা।
আল্লাহর উন্মুক্ত তলোয়ার তিনি, হিন্দী উহার শলা।"

নবী (সঃ) সন্তুষ্ট হইয়া কবিকে তাঁহার গায়ের চাদর মোবারক পুরস্কারস্বরূপ দান করিলেন। চাদরখানা কা'ব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট আজীবন ছিল। খলীফা মোআবিয়া (রাঃ) কবির নিকট হইতে দশ হাজার দেরহামে– রৌপ্য মুদ্রায় উহা ক্রয় করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু কবি কা'ব (রাঃ) সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বরকতপূর্ণ বস্ত্র আমি কোন মূল্যে কাহাকেও দিব না। কবির ইন্তেকালের পর মোআবিয়া (রাঃ) বিশ হাজার দেরহামে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া নিয়াছিলেন। অতপর তাহা বনু উমাইয়া বংশীয় বাহশাহগণের নিকটই পরম্পর পবিত্র বস্ত্ররূপে সমাদর লাভ করিতে থাকে। তাঁহাদের রাজধানী বাগদাদের উপর যখন দস্যু তাতারীদিগের আক্রমণ হয় তখন সেই চাদর মোবারক নিখোঁজ হইয়া যায়। (যোরকানী, ৩– ৬০)

হিজরী নবম বৎসর

এই বৎসরের সেরা ঘটনা ছিল তবুকের জেহাদ। ইহাই ছিল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সক্রিয় সর্বশেষ জেহাদ। ইসলামের দশ বৎসর সামরিক জীবনে এই জেহাদের ন্যায় এত অধিক সৈন্য সমাবেশ আর কোন জেহাদে হয় নাই। এ যাবতকালের জেহাদসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ সৈন্য সংখ্যা বার হাজার ছিল হোনায়ন জেহাদে। মক্কা বিজয়েও দশ হাজার ছিল, কিন্তু তবুক জেহাদে সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ হাজার। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নীতি ছিল, অধিক জনসমাবেশ দেখিলে তিনি তাঁহার আদর্শ ও উপদেশ ব্যক্ত করায় তৎপর হইতেন এবং সুদীর্ঘ ভাষণ দিতেন। সেমতে তবুক এলাকায় পৌঁছিয়া শিবির স্থাপনের পরই নবীজী (সঃ) এই বিশাল জনসমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া নৈতিকতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এক সুদীর্ঘ ভাষণ দান করিলেন। সেই ভাষণের উপদেশমালা চির স্মরণীয়। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভাষণ ছিল-

حمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال ايها الناس اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة ابراهيم وخير السنن سنة محمد (صلى الله عليه وسلم) واشرف الحديث ذكر الله واحسن القصص هذا القران وخير الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها واحسن الهدى هدى الانبياء واشرف الموت قتل الشهداء واعمى العمى الضللة بعد الهدى وخير الاعمال ما نفع وخير الهدى ما اتبع وشر العمى عمى القلب ـ

واليد العليا خير من اليد السفلى وما قل وكفى خير مما كثر والهى وشر المعذرة حين يحضر الموت وشر الندامة يوم القيمة ومن الناس من لا ياتى الجمعة الا دبرا ومن الناس من لايذكر الله الا هجرا ومن اعظم الخطايا اللسان الكذوب وخير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى ورآس الحكمة مخافة الله عزوجل وخير ما وقر فى القلوب اليقين والارتياب من الكفر والنياحة من عمل الجاهلية والغلول من جثاء جهنم والشعر من مز امير ابليس والخمر جماع الاثم والنساء جبائل الشيطان ـ والشباب شعبة من الجنون وشر المكاسب كسب الربو وشر الماكل اكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغيره والشقى من شقى فى بطن امه وانما يصير احدكم الى موضع اربعة اذرع والامر الى الاخرة وملاك العمل خواتمه وشر الروايا روايا الكذب وكل ما هو ات قريب وسباب المؤمن فسوق وقتال المؤمن كفر واكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة ومن يستغفره يغفر له ومن يعف يعفه الله ومن يكظم ياجره الله ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ومن يبتغى السمعة يسمع الله به ومن يصبر يضعف الله له ومن يعص الله يعذبه الله اللهم اغفرلى ولامتى اللهم اغفرلى ولامتى اللهم اغفرلى ولامتى استغفر الله لى ولكم

প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণগান করিলেন, তারপর বলিলেন- হে জনমণ্ডলী! আল্লাহর গুণগানের পর- স্মরণ রাখিও, সর্বাধিক সত্য বাণী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বাধিক মজবুত ও শক্তিধারী মুক্তির কালেমা- কালেমা তওহীদ। ধর্মীয় মৌলিক বিষয়ে সর্বোত্তম (হযরত) ইব্রাহীমের ধর্মের মূলসমূহ, সর্বোত্তম

আদর্শ মুহাম্মদের আদর্শ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। সর্বোচ্চ বাক্য আল্লাহর যিকির এবং সর্বাধিক সুন্দর ইতিহাস কোরআনের ইতিহাস।* শরীয়তের নির্দেশাবলীই সর্বোত্তম কাজ এবং গর্হিত কার্যাবলী সর্বাধিক মন্দ। সর্বাধিক সুন্দর জীবনব্যবস্থা নবীগণ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা। সর্বাধিক সম্মানের মৃত্যু শহীদগণের আত্মদান। হেদায়েতের সুযোগ পাইয়াও ভ্রষ্টতার উপর থাকা সর্বাধিক বড় অন্ধতা। উৎকৃষ্ট আমল তাহা যাহার উপকার ভোগ করা যায়। উত্তম জীবন ব্যবস্থা উহা যাহার ব্যবস্থাপক নিজে অনুসরণ করিয়াছে। জ্ঞান বিবেকের অন্ধতা সর্বাধিক ঘৃণিত অন্ধতা।

দানকারী হস্ত গ্রহণকারী হস্ত অপেক্ষা উত্তম। প্রয়োজন পরিমাণ কম ধন-সম্পদ উত্তম সেই বেশী পরিমাণ হইতে যাহা উদাসীন বানাইয়া দেয়। মৃত্যুর দুয়ারে পৌছিয়া ওজর আপত্তি করা ঘৃণ্য কাজ, কেয়ামত দিবসে লজ্জিত হইতে হইলে তদপেক্ষা অপমান আর কিছুই নাই। অনেক মানুষ জুমার নামাযে উপস্থিত হইতেও বিলম্ব করে, অনেকে আল্লাহর যিকির পূর্ণ মর্যাদার সহিত করে না (তাহা ভাল নহে)। জবানকে মিথ্যার অভ্যস্ত বানানো অতি বড় গোনাহ। অন্তরের তৃপ্তিই বড় ধনাঢ্যতা। মানুষের উত্তম সম্বল পরহেজগারী। বড় জ্ঞান-বিজ্ঞান হইল মহান আল্লাহর ভয়। অন্তরে বদ্ধমূল বিষয়ের উত্তমটি হইল আল্লাহর প্রতি আস্থা বিশ্বাস; তাহাতে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ কুফরী গোনাহ। শোক বিলাপ অন্ধকার যুগের রীতি। অসদুপায়ে অর্জিত সম্পদ (দ্বারা প্রতিপালিত দেহ) জাহান্নামের জ্বালানি হইবে। সাধারণ কাব্য শয়তানের সুর। মদ নানাবিধ গোনাহ একত্রকারী। নারী শয়তানের ফাঁদ। (নারীর মাধ্যমে শয়তান মানুষকে আল্লাহর বহু নাফরমানীতে লিপ্ত করিতে প্রয়াস পায়)। যৌবন উন্মাদনারই অংশবিশেষ। ঘৃণ্য উপার্জন সুদের উপার্জন। জঘন্য খাদ্য এতিমের মাল খাওয়া। অন্যকে দেখিয়া যে শিক্ষা লাভ করে সেই সৌভাগ্যশালী। হতভাগা শুধু সে যে মায়ের উদর হইতেই হতভাগা হইয়া জন্ম নিয়াছে।* প্রত্যেকেই পাইবে দুনিয়ার শেষ সীমা চারি হাত জায়গা (তথা

কবরের স্থানটুকু, সেই অনুপাতেই দুনিয়ার জন্য ব্যস্ততা অবলম্বন করিবে)। ভাল-মন্দের শেষ ফয়সালা চিরস্থায়ী আখেরাতে হইবে। সারা জীবনের আমলকে সংরক্ষণ করে শেষ জীবনের আমল। মিথ্যা বর্ণনার উদ্ধৃতকারীও জঘন্য। প্রত্যেক আগত সময় নিকটতম (অতএব পরকাল নিকটতমই বটে)। মোমেনকে গালি দেওয়া ফাসেকী গোনাহ, মোমেনের সঙ্গে লড়াই করা কুফরী গোনাহ, অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা করা আল্লাহর নাফরমানী, তাহার ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তা তাহার জানের নিরাপত্তার সমান। যেব্যক্তি আল্লাহর কার্যের উপর কসম খাইবে, আল্লাহ তাহাকে মিথ্যুক বানাইবে।* যে কেহ আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিবেন। যেব্যক্তি পাকপবিত্র থাকার সাধনা করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পাক পবিত্র থাকায় সাহায্য করিবেন। যেব্যক্তি ক্রোধ দমাইয়া রাখিবে আল্লাহ তাহাকে সওয়াব দান করিবেন। ক্ষয়-ক্ষতি বিপদে যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করিবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে ক্ষতিপূরণ দান করিবেন। যেব্যক্তি লোকদের নিকট সুখ্যাতি অর্জন করা ভালবাসে আল্লাহ তাআলা (কেয়ামত দিবসে) সর্বসমক্ষে তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া দণ্ড দিবেন। যে ব্যক্তি আপদে-বিপদে সর্বক্ষেত্রে ধৈর্যধারণকারী হইবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে অনেক গুণ বেশী সওয়াব দিনেব। নাফরমানী যে করিবে আল্লাহ তাহাকে দণ্ড দিবেন।

হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন, আয় আল্লাহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন, আয় আল্লাহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন (তিন বার বলিলেন)। আল্লাহর

* পবিত্র কোরআনে পূর্ববর্তী বহু জাতি, বহু শক্তি এবং বহু দুর্ধর্ষ ব্যক্তির ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উপদেশ গ্রহণে ঐসব ইতিহাসের তুলনা নাই।

* অর্থাৎ মায়ের পেট হইতে হতভাগা হইয়া জন্ম নেওয়ার তথ্য ত কাহারও জানা নাই; সুতরাং কেহ নিজেকে ভাগ্য বঞ্চিত, ভাগ্য বিতাড়িত, হতভাগা গণ্য করিয়া কার্য ময়দানে নিক্রীয় বসিয়া থাকিবে না। শত বার অকৃতকার্য হইলেও শত বারই কৃতকার্যতার জন্য চেষ্টা করিবে।

* যেমন কেহ অন্য একজন মুসলমানকে নির্দিষ্ট করিয়া বলিল, কসম খোদার তোর গোনাহ মাফ হইবে না। এইরূপ অনধিকার কথা আল্লাহ না পছন্দ করেন।

নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য। (বেদায়া, ৪-১২)

মসজিদে যেরার

"যেরার" শব্দের অর্থ ক্ষতিসাধনের ষড়যন্ত্র। মদীনায় এক খৃস্টান পাদ্রী ছিল আবু আমের। নবীজী (সঃ) তাহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন, কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ না করিয়া ইসলামকে মদীনা হইতে চির বিদায় দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। বদর জেহাদের পরে মক্কায় যাইয়া মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনা সৃষ্টি করিল, যাহার পরিণামে ওহুদের যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে তাহার মনের আশা পুরিল না; তাহার ষড়যন্ত্র চলিতেই থাকিল, এমনকি সে রোম সম্রাটের সহিত যোগাযোগ করিল মদীনা আক্রমণের জন্য। রোম সম্রাটও খৃস্টান, তাই তাহার সহিত যোগাযোগ খুব গাঢ়ভাবেই হইল। আবু আমের ঘন ঘন রোম যাইত এবং মদীনায় আসিয়া মদীনার মোনাফেকদের সহিত সলা-পরামর্শ করিত। আবু আমেরের তৎপরতা চালাইতে সুবিধা লাভের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থানের (অফিস গৃহের) প্রয়োজন। এই উদ্দেশে কোবা পল্লীতে নবীজীর (সঃ) তৈয়ারী সর্বপ্রথম মসজিদের নিকটবর্তীই মোনাফেকরা আর একটা মসজিদের আকৃতি তৈয়ার করিল। উহাতে তাহাদের এই উদ্দেশ্য ও থাকিল যে, কোবা মসজিদ হইতে কিছু মুসল্লী খসাইয়া এই মসজিদে আনিতে পারিলে ধীরে ধীরে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে দুইটা সমাজ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা সহজ হইবে। এইসব ষড়যন্ত্রমূলক উদ্দেশে এই মসজিদ আকৃতির ঘরটা তৈয়ার করিল। মুসলমানদের নিকট উহাকে পুরাপুরি মসজিদ সাব্যস্ত করিবার জন্য নবীজীর দ্বারা এই মসজিদে নামায আরম্ভের পরিকল্পনা করিল। সেমতে মোনাফেক দল নবীজীর নিকট আসিয়া মিনতির সহিত আবেদন জানাইল যে, রুগ্ন ও দুর্বলদের জন্য সব সময় দূরের মসজিদে যাওয়া কষ্টকর হয়। তাই কোবা পল্লীতে আমরা দ্বিতীয় আর একটি মসজিদ তৈয়ার করিয়াছি; আমাদের আরজু, আপনি ঐ মসজিদে নামায আরম্ভ করিয়া দিবেন।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) তখন তবুক জেহাদের ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত, তাই তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তবুক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমি তথায় নামায পড়াইয়া দিব। তবুক হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে নবী (সঃ) "আওয়ান" নামক স্থানে পৌঁছিলেন। তাহা মদীনার অতি নিকটবর্তী, তথা হইতে মদীনা মাত্র এক ঘণ্টার পথ। ঐ সময় উক্ত মসজিদ নামীয় মোনাফেকী ষড়যন্ত্রের আড্ডা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইয়া গেল এবং তথায় যাইতে নবীজী (সঃ)-কে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَاراً وَّكُفْرً وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَارْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰه وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ـ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلاَّ الْحُسْنٰى ـ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ـ لاَ تَقُمْ فِيْهِ اَبَداً ـ

অর্থ ঃ "যাহারা মসজিদ তৈয়ার করিয়াছে ইসলামের অনিষ্ট সাধন উদ্দেশে, কুফরী কাজের উদ্দেশে, মোমেনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে এবং পূর্ব হইতে আল্লাহ ও রসূলের সহিত শত্রুতা বাধাইয়াছে— এমন এক ব্যক্তির কর্মস্থল বানাইবার উদ্দেশে অথচ আপনার নিকট আসিয়া মিথ্যা কসম খাইয়া তাহারা বলে, আমরা ভাল উদ্দেশে এই মসজিদ তৈয়ার করিয়াছি। আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন, নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী। আপনি কস্মিনকালেও তাহাদের সেই মসজিদে দাঁড়াইবেন না। (পারা- ১১, রুকু-২)

আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর সঙ্গে সঙ্গে "আওয়ান" এলাকা হইতে নবী (সঃ) দুই জন ছাহাবীকে সরাসরি এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে, এখনই যাইয়া উক্ত মসজিদে আগুন লাগাইয়া ভস্ম করিয়া দিবে। ছাহাবীদ্বয় তাহাই করিলেন। মোনাফেকদের দল তথা হইতে ছুটাছুটি করিয়া পলাইয়া গেল। (বেদায়া, ৪-২১)

চতুর্দিক হইতে ইসলামের জয়জয়কার

ষষ্ঠ বৎসরের শেষ দিকে হোদায়বিয়ার সন্ধি হইয়াছিল। ঐ সন্ধির শর্তগুলি সাধারণ দৃষ্টিতে খুবই হেয়তাজনক ছিল, কিন্তু শান্তির অগ্রদূত, শান্তির মহাসাধক, মানুষের প্রেম-ভালবাসার শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাগুরু নবীজী মেস্তফা (সঃ) ঐরূপ একটি সন্ধির প্রতি ব্যাকুল ছিলেন। কারণ, যুদ্ধ দ্বারা নহে বরং সত্যের আহ্বান দ্বারা বিশ্ব জয় করাতেই নবীজী মোস্তফা (সঃ) তাঁহার নবী জীবনের সাফল্য মনে করিতেছিলেন। কোরায়েশদর যুদ্ধ-বিগ্রহের ভিড়ে নবীজী (সঃ) সেই অবকাশ পাইতেছিলেন না। ইসলাম শান্তির সাধনা– শান্তিতেই এই সাধনার প্রকৃত স্বরূপ লোক সমক্ষে উদ্ভাসিত হইতে পারে। সেই শান্তির সুযোগই নবীজী মোস্তফা (সঃ) খুঁজিতেছিলেন। তাই তিনি কোরায়শদের সমস্ত অন্যায় জেদ স্বীকার করিয়া লইয়াও সন্ধিকে চূড়ান্তে পৌঁছাইয়াছিলেন এবং সেই সন্ধিকে নবীজী (সঃ) মহা বিজয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সন্ধি যে ইসলামের মহাবিজয় ছিল তাহার বিকাশ ধাপে ধাপে হইয়াছে। সন্ধির দ্বারা শান্তির অবকাশ পাইতে এক দিনেরও বিশ্রাম না লইয়া নবীজী (সঃ) সপ্তম বৎসরের আরম্ভ হইতেই চতুর্দিকে লিপি প্রেরণ করিয়া ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার সর্বত্র ইসলামের ডাক পৌঁছাইয়া দিলেন। রাজদরবারে, বড় বড় প্রতিষ্ঠানে এবং গোত্রে গোত্রে ইসলামের আহ্বান পৌঁছিয়া গেল। এই অভিযানে বিরাট সাফল্য লাভ হইল। আবিসিনিয়ার সম্রাট, বাহরাইনের শাসনকর্তা, ওমানের শাসনকর্তা, গাস্‌সানের শাসনকর্তা এবং অনেক গোত্রপতিসহ বিভিন্ন শক্তি শিবিরে ইসলাম প্রবেশ করিল, বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করিলেন। উক্ত অভিযানে ইসলামের ডাক সর্বত্রই আলোড়নের সৃষ্টি করিল এবং অনেকে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এক বিরাট অংশ ইসলামের আহ্বান পাইয়াও আর এক বিষয়ের অপেক্ষায় থাকিয়া গেল।

মুহাম্মদ (সঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণকারী এবং কোরায়শ বংশের লোক। মুসলমানদের খোদার ঘর মক্কায়। মুহাম্মদ (সঃ) এখনও মক্কা জয় করিতে পারেন নাই, কোরায়শরা এখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই, খোদার ঘর কা'বা এখনও ঠাকুর-দেবতা, মূর্তি-প্রতিমায় পরিপূর্ণ। সুতরাং কোরায়েশ ও মুসলমানদের চূড়ান্ত সংঘর্ষ অনিবার্য– সেই সংঘর্ষের ভবিষ্যত পরিণামের অপেক্ষায় বহু এলাকা, বহু গোত্র, বহু শক্তি ইসলাম হইতে দূরে থাকিয়া দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা মনে করিতেছিল, এই চূড়ান্ত সংঘর্ষেই সত্য-মিথ্যার সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হইবে; সত্য বিজয়ী এবং মিথ্যা পরাভূত হইবে। একদিকে কোরায়শদের পূজিত শত শত দেব-দেবী– যাহাদের তাহারা বিজয়ের উৎস মনে করে, অপর দিকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলিতেছেন, এই ঠাকুর দেবতা এবং দেব-দেবী মূর্তিগুলি অক্ষম জড় পদার্থ, পক্ষান্তরে তাঁহার আল্লাহই এক ভাবে সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা। এই দুই মতবাদে নিশ্চয় লড়াই হইতে থাকিবে। যদি মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) দল কোরায়শদের দ্বারা পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় তবে আমরা লড়াই-বিগ্রহ ছাড়াই তাহাদের হইতে নিস্তার পাইয়া যাইব। আর যদি দেব-দেবীদের পূজারী ও পুরোহিত এবং জাতি হিসাবে দুর্ধর্ষ কোরায়শরাই ঐ দলের হস্তে পরাজিত হইয়া যায় তাহা হইলে আমাদেরকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, মুহাম্মদই সত্য; তাঁহার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ-লড়াই করিয়া জয়ী হইতে পারিব না।

আরবের বিভিন্ন গোত্র এই ধরনের জল্পনা-কল্পনা এবং আন্দোলন-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অপেক্ষমান দর্শকের ভূমিকায় তাকাইয়া রহিয়াছে। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন বিস্ময়কর সংবাদ তাহাদের গোচরে আসিয়া গেল যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মক্কা অধিকার করিয়া লইইয়াছেন। মক্কার সর্বপ্রধান সর্দার আবু সুফিয়ান মুসলমান হইয়া গিয়াছেন। দুর্ধর্ষ মক্কাবাসীরা ইসলামের দুয়ারে ভিড় জমাইয়া ইসলামের ছায়ায় স্থান সংগ্রহ করিতেছে। আবরাহার হাতী-ঘোড়া ও অসংখ্য সৈন্য যে কা'বা অধিকার করিতে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল; আজ অনায়াসে সেই কা'বা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অধিকারে আসিয়া গিয়াছে এবং কা'বা ঘরে স্থাপিত প্রতিমাগুলি অধঃমুখে ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে, অন্যান্য স্থানের

ঠাকুর-দেবতাগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে। যেই মুহাম্মদ এবং তাঁহার দল নিঃস্ব নিঃসম্বলরূপে মক্কার পথেঘাটে অত্যাচারিত ছিল, আজ তিনি মক্কার সর্বেসর্বা। যেই সাফা পর্বতের চূড়ায় দাঁড়াইয়া মুহাম্মদ (সঃ) মক্কার সমাজপতিদের ইসলামের ডাক দিয়াছিলেন আর তাহারা ঘৃণা, তিরস্কার ও ধমকের দ্বারা তাঁহাকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল, আজ সেই সাফা পর্বতের পাদদেশেই ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গ করায় লালায়িত হইয়া মক্কার লোকেরা আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। মক্কা বিজয় দ্বারা এইভাবে বিস্ময়জনক পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। তাই আরবের বহু গোত্র স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে মদীনায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিতে লাগিল। তৃতীয় খণ্ড ১৫৫৩ নং হাদীছে এই তথ্যের বিবরণ উল্লেখ রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনেও ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, "মক্কা বিজয়ের পর আপনি দেখিতে পাইবেন দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করিতেছে।" (সূরা নাসর)

হিজরী অষ্টম বৎসরের শেষার্ধে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হইয়াছে, তাই নবম বৎসরে ঐরূপ প্রতিনিধি দল আগমনের হিড়িক পড়িয়া গেল। এমনকি ইতিহাসে হিজরী নবম বৎসরকে "আমুল উফুদ" ডেপুটেশন বা প্রতিনিধি দল আগমনের বৎসর বলা হয়।

হিজরী পঞ্চম বৎসর খন্দকের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশাল সম্মিলিত আরব বাহিনী ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরবে ইসলাম এবং মুসলমানদের সুদৃঢ় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন হইতেই সময় সময় স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে কোন কোন গোত্রের প্রতিনিধি দল আসিতেছিল। সর্বপ্রথম পঞ্চম হিজরী সনে মোযায়না গোত্রের প্রতিনিধি দল আসিয়াছিল। উক্ত প্রতিনিধি দলে চারি শত লোক আসিয়াছিল। তাঁহারা সকলে স্বেচ্ছায় একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবী (সঃ) তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তোমাদের নিজ দেশ হইতে হিজরত করিতে হইবে না। (কারণ, তাহাদের বস্তিতে মুসলমানগণ স্বাধীন শক্তিশালী হইবেন।) তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদের স্থানে ফিরিয়া যাও। সেমতে তাঁহারা ইসলাম লইয়া নিজ বস্তিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। (তাবাকাত, ১–২৯১)

এইভাবে পঞ্চম বৎসর হইতে প্রতিনিধি দলের আগমন আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু কদাচিৎ । নবম বৎসরে ব্যাপক আকারে এবং বহু সংখ্যক প্রতিনিধি দলের আগমন হয়। ইতিহাসে ঐরূপ ৭২টি প্রতিনিধি দল আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায় (তাবাকাত, প্রথম খণ্ড)। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল– তায়েফের প্রতিনিধি দল, তামীম প্রতিনিধি দল, বনু হানীফার প্রতিনিধি দল, ইয়ামান প্রতিনিধি দল এবং তাঈ গোত্রের প্রতিনিধি দলের আলোচনা তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

গোত্রীয় বা বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধি দল ছাড়াও মদীনায় নবীজী (সঃ) সমীপে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগমনও অনেক হইয়াছে। যথা–

(১) ফারওয়া ইবনে মিস্‌সীক (রাঃ) তিনি কিন্দা বংশীয় রাজাদের শাসনাধীন নিজ গোত্রের প্রধান ও শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি কিন্দা বংশীয় রাজার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়াছি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাকে নিজের গোত্র এবং পার্শ্ববর্তী আরও দুইটি গোত্রের শাসনকর্তা মনোনীত করিয়া তাঁহার দেশের যাকাত ইত্যাদির কালেক্টররূপে খালেদ ইবনে সায়ীদ (রাঃ) ছাহাবীকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(২) আম্‌র ইবনে মা'দীকারেব তিনি যোবায়দ গোত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি তাঁহার এক বন্ধু কায়সকে বলিলেন, হে, কায়স! শুনিতে পাইলাম কোরায়শ বংশে মুহাম্মদ (সঃ) নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে; তিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করেন। আমাকে নিয়া তাঁহার নিকট চল, তাঁহার পূর্ণ তথ্য অবগত হইব; প্রকৃতই যদি তিনি নবী হইয়া থাকেন তবে তাহা আমাদের চোখে লুক্কায়িত থাকিবে না– প্রকাশ পাইয়া যাইবে; আমরা তাঁহার দাবী মানিয়া লইব। আর যদি ঐ দাবীর বিপরীত কিছু হয় তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিব। বন্ধু কায়স তাঁহার কথায় সাড়া দিল না, তবুও তিনি একাই যাত্রা করিলেন এবং নবীজীর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

(৩) জরীর ইবনে আবদুল্লাহ, (রাঃ) -ইয়ামানের বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি

নবীজীর (সঃ) তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই তাঁহার আলোচনায় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, অবিলম্বেই এই দরজা দিয়া ইয়ামানের এক উত্তম ব্যক্তি তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবেন।

জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবীজীর মজলিসে পৌঁছিলে পর নবীজী (সঃ) আমার নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জরীর ! কি উদ্দেশে আসিয়াছেন? আমি উত্তর করিলাম, আপনার হস্তে ইসলাম গ্রহণ উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। তখন নবীজী (সঃ) আমার জন্য একখানা কম্বল বিছাইয়া দিলেন এবং লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া (একটি সুন্দর আদর্শ শিক্ষাদানে) বলিলেন, তোমাদের নিকট কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিলে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তৎপর হইবে। অতপর নবীজী (সঃ) আমাকে কতিপয় বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাইলেন–

(১) মনে-মুখে ঘোষণা দেওয়া যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং আমি মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। (২) আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি এবং ভাল-মন্দের তকদীর সম্পর্কে ঈমান স্থাপন করা। (৩) নামায পড়া। (৪) যাকাত দান করা। আমি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আহ্বানে প্রত্যেকটি বস্তু গ্রহণ করিলাম।

নবীজী (সঃ) আমার প্রতি এতই অমায়িক ও সদয় ছিলেন যে, তিনি যখনই আমাকে দেখিতেন আমার প্রতি দৃষ্টি দান করিয়া মুচকি হাসি হাসিতেন।

(৪) ওয়ায়ল ইবনে হুজর (রাঃ)– তিনি ইয়ামানের রাজবংশীয় একজন ছিলেন। আরব সাগরের উপকূলবর্তী হায্‌রামাউত এলাকার একজন বিশিষ্ট জমিদার। তাঁহার আগমনের পূর্বেই নবী (সঃ) ছাহাবীগণকে তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইলেন। তিনি পৌঁছিলে নবী (সঃ) তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া নিজের অতি নিকটে বসাইয়াছিলেন এবং বসিবার জন্য চাদর বিছাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার ও তাঁহার বংশধরের জন্য মঙ্গল কল্যাণের বিশেষ দোয়া করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সমগ্র হায্‌রামাউত এলাকার জমিদারদের প্রধান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মোআবিয়া (রাঃ) ছাহাবীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

একটি চমকপ্রদ বিষয় ঃ ওয়ায়ল (রাঃ) রাজবংশীয় লোক, সবেমাত্র মুসলমান হইয়াছেন। সেই যুগের ও পরিবেশের বংশীয় উগ্রতা মন-মগজ হইতে মুছিতে কিছু বিলম্ব অবশ্যই হইবে। মোআবিয়া (রাঃ) তাঁহার সঙ্গেই আছেন। তিনি পায়ে হাঁটিয়া চলিতেছেন। রৌদ্রের উত্তাপে যখন মরুভূমির পথ উত্তপ্ত হইয়া গিয়াছে তখন মোআবিয়া (রাঃ) তাঁহার নিকট পথের উত্তাপের অভিযোগ করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, আমার উটের ছায়ায় চলিতে থাকুন। মোআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, তাহাতে কষ্টের কি লাঘব হইবে? আপনি আমাকে আপনার বাহনের পিছনে বসাইয়া নিলে ভাল হয়। ওয়ায়ল (রাঃ) তাঁহাকে উত্তরে বলিলেন, চুপ থাকুন; রাজবংশীয় লোকদের সহিত এক বাহনে বসিবার মর্যাদা আপনার নাই।

যুগের পরিবর্তনে এই মোআবিয়া (রাঃ) পরবর্তীকালে আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মুসলেমীন হইলেন। তখনও ওয়ায়ল (রাঃ) জীবিত আছেন। তিনি একবার মোআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাক্ষাতে আসিলেন। মোআবিয়া (রাঃ) তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া নিজের নিকটেই বসাইলেন না শুধু, বরং তাঁহাকে নিজের আসনে নিজের সঙ্গে বসাইলেন এবং বহু মূল্যবান উপহার তাঁহার নিকট পেশ করিলেন। ওয়ায়ল (রাঃ) বলেন, আমি তখন (লজ্জিত হইয়া) মনে মনে ভাবিতেছিলাম, ঐ দিন যদি আমি তাঁহাকে বাহনের অগ্রভাবে বসাইতাম।

৫। যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ী– তিনি তাঁহার গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতপর আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার গোত্রের প্রতি সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হইয়াছে। হুযুর! এখনই সৈন্যবাহিনী ফেরত আনিবার ব্যবস্থা করিয়া দিন। আমার গোত্রের ইসলাম ও আনুগত্য সম্পর্কে আমি জামিন থাকিলাম। নবীজী (সঃ) বলিলেন, তুমি যাও এবং আমার পক্ষ হইতে সৈন্যবাহিনীকে ফিরাইয়া নিয়া আস। আমি আরজ করিলাম, আমার বাহনটি অতিশয় পরিশ্রান্ত; সেমতে নবী (সঃ) অন্য এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়া সৈন্যবাহিনী ফেরত নিয়া আসিলেন।

অতপর আমি আমার গোত্রের নিকট পত্র লিখিয়া দিলাম; অবিলম্বে সমগ্র গোত্রের পক্ষ হইতে তাহাদের ইসলাম ও আনুগত্যের সংবাদ লইয়া প্রতিনিধি দল নবীজীর নিকট উপস্থিত হইল। এতদ্দৃষ্টে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার গোত্র ত তোমার খুবই অনুগত! আমি বলিলাম, আল্লাহ তাআলাই তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, তোমাকেই তোমার গোত্রের শাসনকর্তা নিয়োগ করিব; এই মর্মে নিয়োগপত্ররূপে একখানা লিপিও তিনি আমাকে প্রদান করিলেন। আমি আরজ করিলাম, আমার ব্যয় বহনের জন্য তাহাদের সদকা ভাণ্ডার হইতে কিছু অংশ গ্রহণের অনুমতি দিন। সেই মর্মেও তিনি আমাকে একখানা লিপি লিখিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে এক এলাকার লোক আসিয়া নবীজীর নিকট তাহাদের শাসনকর্তা সম্পর্কে অভিযোগ করিল যে, তিনি অতীতের আক্রোশে আমাদেরকে উৎপীড়ন করেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, ঈমানদার লোকের জন্য শাসনক্ষমতায় উপকার নাই। নবীজীর এই কথাটি আমার অন্তরে বিদ্ধ হইয়া রহিল। ইতিমধ্যেই আর একটি ঘটনা ঘটিল। এক ব্যক্তি নবীজীর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইল। নবীজী (সঃ) তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অন্যের নিকট চাহিবে, উহা তাহার মাথা ব্যথা ও পেটের পীড়ার (ভীষণ যন্ত্রণার) কারণ হইবে। তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, আমাকে সদকা ভাণ্ডার হইতে কিছু দান করুন। তদুত্তরে নবীজী (সঃ) বলিলেন, সদকার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আট শ্রেণীর লোক নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; তুমি যদি উহার কোন শ্রেণীভুক্ত হও তবে তোমাকে দিব। নবীজীর এই কথাটিও আমার অন্তরে বিদ্ধ হইল এবং আমি ভাবিলাম, আমি ত সচ্ছল, অথচ সদকার ভাণ্ডার হইতে অংশ গ্রহণের জন্য আমি নবীজী (সঃ) হইতে অনুমতি লিপি চাহিয়া লইয়াছি।

এই ভাবনা-চিন্তায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়া ফজর নামাযান্তে আমি নবীজীর (সঃ) লিপিদ্বয় লইয়া উপস্থিত হইলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি এই উভয় লিপির মর্ম হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করি। নবীজী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কারণ তোমার অন্তরে কি উদিত হইয়াছে। আমি আরজ করিলাম, আপনার এই বাণী আমি শুনিয়াছি– "ঈমানদারের জন্য শাসনক্ষমতায় উপকার নাই," আমি ত আল্লাহ এবং রসূলের প্রতি ঈমান রাখি। আপনার এই বাণীও শুনিয়াছি– "সচ্ছলতা সত্ত্বেও যেব্যক্তি অন্যের নিকট চাহিবে, তাহা তাহার জন্য মাথা ব্যথা ও পেটের পীড়ার কারণ হইবে; আমি সচ্ছল হইয়াও আপনার নিকট চাহিয়াছি।

নবীজী (সঃ) বলিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা বাস্তব; অতএব তুমি সেমতে চিন্তা করিয়া হয় গ্রহণ কর না হয় ত্যাগ কর। আমি আরজ করিলাম, আমি ত্যাগ করিলাম। নবীজী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে গোত্রপ্রধান নিযুক্ত করিব তাহা তুমি বলিয়া দাও। আমি প্রতিনিধি দলে আগন্তুকদের মধ্য হইতে একজনের নাম প্রস্তাব করিলাম; তিনি তাঁহাকেই গোত্রপ্রধান নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

অতপর আমি আরজ করিলাম, আমাদের গোত্রেসমূহ একটিমাত্র কূপ রহিয়াছে; বর্ষাকালে উহার পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে যথেষ্ট হয় না; পানির জন্য আমাদের অন্যত্র যাইতে হয়। এখন আমরা মুসলমান; চতুষ্পার্শ্বস্থ গোত্রে অমুসলিম, তাহারা আমাদিগকে পানি দিবে না। নবী (সঃ) আমাকে বলিলেন, সাতটি কাঁকর নিয়া আস; তিনি সেই কাঁকরগুলি নিজ হস্তে মর্দন করতঃ উহাতে দোয়া করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, এই কাঁকরগুলি নিয়া যাও; এক একটি কাঁকর আল্লাহর নাম জপপূর্বক কূপে ফেলিয়া দিবে। আমরা তাহাই করিলাম; তখন হইতে সর্বদা আমাদের কূপে এত অধিক পরিমাণ পানি থাকিত যে, কোন সময়ই উহার তলা দেখা সম্ভব হইত না।

(৬) তারেক ইবনে আবদুল্লাহ– তিনি নবীজী (সঃ)-কে নবুয়তের প্রথমজীবনে এক বার অতি করুণ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা দিয়াছেন– আমি "জুল-মজায" নামক আরবের প্রসিদ্ধ মেলা বা হাটে দাঁড়াইয়া ছিলাম। তথায় দেখিলাম, একজন লম্বা জুব্বাধারী লোক এই আহ্বান করিয়া বেড়াইতেছেন–

"হে মানবগণ! সকলে বল, আল্লাহ এক– অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই; তাহা হইলে তোমরা সাফল্য লাভ করিবে।" সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিলাম যে, আর একটি লোক পিছনে পিছনে তাঁহার প্রতি পাথর ছুঁড়িয়া মারিতেছে এবং বলিতেছে, হে লোকসকল! সাবধান– কেহ ইহার কথা শুনিও না, সে মহা মিথ্যাবাদী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে? লোকেরা বলিল, আহ্বানকারী ব্যক্তি হইলেন হাশেম বংশের একজন সুপুরুষ, যিনি নিজকে আল্লাহর প্রেরিত রসূল বলিয়া থাকেন। আর দ্বিতীয় লোকটি তাঁহারই পিতৃব্য আবদুল ওয্যা– আবু লাহাব।

এই ঘটনার পর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইয়াছে– বহু লোক মুসলমান হইয়াছে এবং মক্কা হইতে মুসলমানগণ সকলেই হিজরত করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। এই সময় আমরা আমাদের বস্তি "রাবাজা" হইতে কতিপয় লোক খেজুর ক্রয়ের জন্য মদীনায় যাত্রা করিলাম। মদীনার বাগ-বাগিচার নিকটবর্তী হইয়া আমরা বিশ্রাম করিবার জন্য ময়লা কাপড় বদলাইতে অবতরণ করিলাম। এই সময় এক চাদর পরিধানে আর এক চাদর গায়ে একজন লোক আমাদের নিকট আসিয়া সালাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কাফেলাটি কোথা হইতে আসিয়াছে, আর কোথায় যাইবে? আমরা বলিলাম, রাবাজা হইতে আসিয়াছি , মদীনায় যাইব। উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, খাদ্য ক্রয়ের জন্য যাইব।

কাফেলায় একজন মহিলাও ছিল, আর আমাদের সঙ্গে বিক্রির জন্য একটি লাল রংয়ের উট ছিল। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, উটটি বিক্রি হইবে কি? আমরা বলিলাম, হা– এ পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি হইবে। লোকটি মূল্য সম্পর্কে কোনরূপ কাটাকাটি না করিয়া উটের নাশারজ্জু ধরিয়া উট লইয়া চলিয়া গেলেন। লোকটি উট লইয়া আমাদের দৃষ্টির আড়াল হইতেই চৈতন্য হইল– উট ক্রেতা আমাদের পরিচিত নহে ত, আর মূল্য না লইয়া তাঁহাকে উট দিয়া দিলাম। আমাদের সঙ্গী মহিলাটি বলিল, চিন্তার কারণ নাই, লোকটি নূরানী চেহারার– তাঁহার মুখমণ্ডল যেন পূর্ণিমার চাঁদ। এই লোক প্রতারক হইবে না; উটের মূল্যের জন্য আমি দায়ী থাকিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রথমে নিজ পরিচয় দিলেন যে, আমি তোমাদের বিশ্ব মানবের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রসূল। অতপর বলিলেন, এই নাও খেজুর; ইহা হইতে তোমরা সকলে পেট পুরিয়া খাও, অতপর তোমাদের প্রাপ্য উটের বিনিময় পূর্ণ ওজন করিয়া নাও। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমরা যথাসময় মদীনা নগরে গমন করিয়া মসজিদের নিকটে উপস্থিত হইলাম। তথায় দেখি– সেই লোক মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইয়া জনমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেছেন। আমরা শেষের এই কথা কয়টি শুনিতে পাইয়াছিলাম– "হে লোকসকল! অভাবগ্রস্ত কাঙ্গালদের দান কর, ইহা তোমাদের পক্ষে বিশেষ কল্যাণজনক। স্মরণ রাখিও, উপরের (দাতার) হাত নীচের (গ্রহীতার) হাত হইতে উত্তম। পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নী ও অন্যান্য স্বজনবর্গের প্রতিপালন করিবে।"

ইতিমধ্যেই মদীনার একজন মুসলমান উপস্থিত হইয়া আমাদের উপর এক মস্ত বড় অভিযোগ চাপাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এই কাফেলার লোকদের উপর পূর্ব আমলের একটি খুনের দাবী আমাদের রহিয়াছে। অন্ধকার যুগের রীতি ছিল, হত্যাকারী হইতে প্রতিশোধ লওয়া সহজ না হইলে তাহার গোত্র হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইত।

রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই অভিযোগ নাকচ করিয়া দিয়া বলিলেন, পিতা পুত্রের অপরাধে বা পুত্র পিতার অপরাধে প্রতিশোধ গ্রহণের পাত্র হইবে না (দূর সম্পর্কীয়দের ত কোন কথাই নাই)।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এইরূপ মহানুভবতা ও অমায়িক ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া তারেক ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁহার সঙ্গীদের ন্যায় বহু লোক ইসলামের ছায়ায় স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(উল্লিখিত সমুদয় ঘটনা বেদায়া, ৪৭০-৪৮৬ হইতে অনূদিত)

স্বাধীন মক্কায় মুসলমানদের প্রথম হজ্জ

আবু বকর (রাঃ)-এর নেতত্বে হজ্জ যাত্রা (পৃঃ ৬২৬)

অনেকের মতে নবম হিজরীর প্রথম দিকেই, কাহারও মতে আরও অনেক পূর্বেই হজ্জ ফরয হওয়ার বিধান আসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পূর্বে ত মুসলমানদের জন্য মক্কায় হজ্জ করিতে যাওয়া সহজসাধ্য ছিল না, আর নবম হিজরীতে নবীজীর (সঃ) জন্য হজ্জ সমাপনে কোন বিশেষ অসুবিধা ছিল। অনেকের মতে হজ্জ ফরয হওয়ার বিধান নবম হিজরীর একেবারে শেষ দিকে আসিয়াছে, কিন্তু সাধারণভাবে হজ্জ করার নিয়ম ত পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। সেমতে নবীজী (সঃ) শুধু সাধারণ নিয়মানুসারে মুসলমান হাজীদের একটি দল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে নবম হিজরী সনে হজ্জ সমাপনে যাত্রা করিয়াছিল। এই হজ্জে নবীজী (সঃ) অংশগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু মক্কাস্থ মিনায় কোরবানী দেওয়ার জন্য বিশটি উট আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। (বেদায়া, ৩-৩৯)

আনুষ্ঠানিকরূপে পরিচালিত ও নবীজী (সঃ) কর্তৃক প্রেরিত হাজী কাফেলা স্বাধীন মক্কায় সর্বপ্রথম ইহাই ছিল। অবশ্য অষ্টম হিজরীর হজ্জ মওসুমের পূর্বেই রমযান মাসে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং ঐ বৎসরও মুসলমান মোশরেক সম্মিলিতভাবে হজ্জ আদায় করা হইয়াছিল। তখন মক্কার গভর্নররূপে আত্তাব ইবনে আসীদ (রাঃ) নবীজী (সঃ) কর্তৃক নিয়োজিত ছিলেন। পদাধিকারবলে তিনিই ঐ বৎসর মুসলমান হাজীগণের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। (যোরকানী, ৩-৯৪)।

কিন্তু ঐ বৎসর হজ্জ শুধু গতানুগতিক প্রথারূপে ছিল। তাহার কোন ব্যবস্থাই নবীজী (সঃ) কর্তৃক আনুষ্ঠানিকরূপে পরিচালিত ছিল না- যেরূপ ছিল নবম হিজরীতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে পরিচালিত হজ্জ।

অষ্টম হিজরী সনে মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী সমুদয় এলাকার বিজয় দ্বারা আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। তাই এখন আল্লাহ তাআলার এর একটি বিশেষ আদেশ-

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ -

অর্থ ঃ "কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাও, যাবত না আল্লাহর দ্বীনে বাধাদানের শক্তি রহিত হইয়া যায় এবং সর্বত্র আল্লাহর দ্বীনের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠিত হয়।"

এই আদেশ বাস্তবায়ন পরিকল্পনার কাজে বিশেষ তৎপরতার সহিত অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। সেমতে অষ্টম হিজরীতে শক্তি-সামর্থ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই নবম হিজরী সনে উক্ত পরিকল্পনার কাজ দ্রুতগতিতে চালানো হয়। নবম হিজরীর হজ্জ পর্যন্ত কাফেরদের জন্য সাধারণ সুযোগ ভোগের অবকাশ ছিল। যথা-

(১) কাফেররাও মুসলমানদের সহিত একত্রে হজ্জ করিত।

(২) হজ্জে কাফেররা তাহাদের গর্হিত নীতি- যেমন, উলঙ্গ হইয়া তওয়াফ করা পালন করিয়া যাইত।

(৩) অনেক অনেক গোত্রের সহিত রসূলুল্লাহ (সঃ) অনির্দিষ্টকাল বা নির্দিষ্টকালের জন্য "যুদ্ধ নহে চুক্তি" সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা ইসলামের সম্মুখে নতিস্বীকার ছাড়াই সর্বত্র পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া যাইত।

(৪) কাফেররা সমগ্র আরবে, এমনকি পবিত্র হরম শরীফেও নির্বিবাদে বসবাস এবং স্বাধীনভাবে সর্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইত।

৩ এবং ৪ নম্বরের সুযোগ ইসলামের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ক্ষতিকর ও আশঙ্কার বস্তু ছিল। কারণ, পবিত্র হরম শরীফ ইসলামদ্রোহীদের সর্বপ্রধান ঘাঁটি ছিল। অতএব তথা হইতে ইসলামদ্রোহীদের নাম-নিশানা চিরতরে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলা একান্ত কতব্য। আর সমগ্র আরবই ইসলামের কেন্দ্র ও রাজধানী রূপ; তথা হইতেও ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ইসলামদ্রোহীদের উচ্ছেদ প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে বিরাট বলিষ্ঠ সুদীর্ঘ ঘোষণা পবিত্র কোরআনের ত্রিশটি আয়াতরূপে অবতীর্ণ হয়। উক্ত আয়াতসমূহের তেজস্বী সুর ও কঠোর ভাষার প্রভাব-প্রতাপই কাফের মোশরেকদের ভীত সন্ত্রস্ত কম্পমান করিয়া তুলিতে এবং আভ্যন্তরীণ শত্রু মোনাফেক ও বাহিরের লোলুপ শক্তিগুলিকে চিরতরে নিরাশ নিস্তব্ধ করিতে যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন–

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ - وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ -

অর্থ ঃ "যে মোশরেকদের সহিত সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত রহিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের পক্ষ হইতে সমুদয় চুক্তি বাতিলের সুস্পষ্ট ঘোষণা জারি করা হইল। (আর যাহাদের সঙ্গে কোন চুক্তি নাই তাহাদের প্রশ্ন ত আরও সুস্পষ্ট। উভয় শ্রেণীর কাফেরদের প্রতি চরম পত্র–) তোমরা এই দেশে আর শুধু চারি মাস অবাধে চলাফেরার সুযোগ ভোগ করিতে পারিবে। (ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম; সুযোগ দিয়াছে। ইতিমধ্যে তোমরা হয় ইসলামের নিকট আত্মসমর্পণ কর, না হয় এই দেশ ত্যাগ কর।) জানিয়া রাখ– তোমরা (আল্লাহর রসূলকে তথা) আল্লাহকে হার মানাইতে পারিবে না এবং নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরে পদদলিত করিবেন।

আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের পক্ষ হইতে মহান হজ্জের দিনে সর্ববৃহৎ জনসমাবেশে দৃঢ় কণ্ঠের ঘোষণা জারি করা হইতেছে যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল মোশরেকদের হইতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। অবশ্য যাহাদের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের চুক্তি রহিয়াছে এবং তাহারা কোন প্রকারে চুক্তি ক্ষুণ্ন করে নাই তাহাদের জন্য চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত সুযোগ বহাল থকিবে। এই কথাটি মাত্র ঐ শ্রেণীর জন্য যাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া অচিরে আপনা আপনিই সুযোগ রহিত হইয়া যাইবে। অন্য সব কাফের-মোশরেকদের সম্পর্কে মুসলমানদিগকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হইল এই যে–

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ - فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ -

অর্থ ঃ "কাফেরদের জন্য প্রদত্ত সুযোগের চারিটি মাস– যে সময় তাহাদের আক্রমণ করা নিষিদ্ধ; এই চারিটি মাস অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পরই মোশরেকদের পাকড়াও কর, তাহাদের ঘেরাও কর এবং তাহাদের ঘায়েল করার প্রতিটি সুযোগের অপেক্ষায় থাক। হাঁ, যদি তাহারা কুফরী-শেরেকী হইতে প্রত্যাবর্তন করে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দান করে তবে তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান কর।

(পারা–১০ সূরা-তওবা)

অনেকের মতে আবু বকর (রাঃ) মক্কাভিমুখে যাত্রা করার পর এই তেজালো ঘোষণা ও চরম পত্রের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। আর কাহারও মতে পূর্বেই অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং হয়ত মিনায় বৃহত্তম জনসমাবেশে তাহা ঘোষণার জন্য নবীজী (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে বলিয়াও দিয়াছিলেন। কিন্তু আবু বকর

(রাঃ) যাত্রার পর রাষ্ট্রীয় চুক্তি বাতিল ঘোষণার গুরুত্ব প্রদর্শনে আন্তর্জাতিক বিধি মোতাবেক রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত বিশেষ দূতরূপে নবীজী (সঃ)-এর নিজস্ব বাহন "আজবা" উষ্ট্রীর উপর সওয়ার করিয়া আলী (রাঃ)-কে ঐ ঘোষণা আবৃত্তির জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলেন। আল্লাহর ঘর– কা'বার নগরী মক্কাকে মূল কেন্দ্র করিয়া সমগ্র আরবকে ইসলামের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলার বাস্তব পদক্ষেপে নবীজী (সঃ) অগ্রসর হইলেন এবং পরিকল্পনা করিলেন যে, (১) আল্লাহর সঙ্গে কাফের মোশরেকদের কোন সম্পর্ক নাই, সেই সম্পর্কের একমাত্র অধিকারী মোমেন-মুসলমানগণ– ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। (২) আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফকে অন্ধকার যুগের কুফরী রীতি-নীতি হইতে পূর্ণ পাক পবিত্র করা হইবে। (৩) মক্কার এলাকাকে এখন হইতেই চিরতরে কাফের-মোশরেক হইতে মুক্ত রাখার সুব্যবস্থা করা হইবে। (৪) সমগ্র আরবকে ঈমান ইসলামের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্ররূপে রূপায়িত করার জন্য তথা হইতে উহার বিরোধী সকলকে ধাপে ধাপে উচ্ছেদ করিতে হইবে; যেন ভিতরে থাকিয়া ইসলামের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করিতে সুযোগ না পায়। এই চারিটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে রসূলুল্লাহ (সঃ) চারিটি নির্দেশ দিয়া তাহা ঘোষণার জন্য ব্যক্তিগত বিশেষ দূতরূপে আলী (রাঃ)-কে প্রেরণ করিলেন। ঘোষণা চারিটি এই–

(১) মোমেন ব্যতীত অন্য কেহ বেহেশতে যাইতে পারিবে না। (২) কোন উলঙ্গ ব্যক্তি কা'বা শরীফের তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করিতে পারিবে না। (৩) এই বৎসরের পরে আর কোন কাফের-মোশরেক হজ্জ করিতে পারিবে না। (৪) বিশেষ ঘোষণা– পবিত্র কোরআনের ১৩ পারা সূরা তওবা বা বারাআতের প্রথম আয়াতসমূহ– যাহা মোশরেকদের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বাতিলের ঘোষণা এবং চারি মাসের মধ্যে হরম শরীফ হইতে বরং সমগ্র আরব হইতে মোশরেক পৌত্তলিকদের দেশ ত্যাগ করার আদেশ ছিল। আরবের মোশকেরদের সতর্কীকরণও ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ কর, না হয় আরব দেশ ত্যাগ কর, অন্যথায় হত্যা, বন্দী বা ঘেরাওয়ের সম্মুখীন হওয়ার তথা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। (আসাহহুস সিয়ার– ৪৪৫)

৩ নং আদেশটিও বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনের সূরা তওবারই সুস্পষ্ট নির্দেশ। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۔

অর্থ ঃ"হে মোমেনগণ! নিশ্চয় মোশরেকরা হইতেছে অপবিত্রই অপবিত্র, সুতরাং তাহারা যেন এই বৎসর হজ্জের পরে আর হরম শরীফ মসজিদের নিকটেও আসিতে না পারে।"

এই চারিটি আদেশ লইয়া নবীজীর (সঃ) ব্যক্তিগত বাহন "আজবা" উষ্ট্রীর উপর আরোহণপূর্বক আলী (রাঃ) যাত্রা করিলেন। আবু বকর (রাঃ) মদীনা হইতে সত্তর মাইলেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়া "আরজ" নামক জায়গায় পৌঁছিলে আলী (রাঃ) দ্রুত যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। আবু বকর (রাঃ) ফজরের নামায আরম্ভ করার জন্য দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় নবীজীর (সঃ) বাহন "আজবা" উষ্ট্রীর আওয়াজ তিনি ঠাহর করিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, হয়ত আমার যাত্রার পরে নবীজী (সঃ)-এর হজ্জে আগমনের ইচ্ছা হইয়াছে, তাই তিনি আসিয়াছেন। অতপর যখন আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাক্ষাত পাইলেন তখন আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, উপরস্থ হইয়া আসিয়াছেন, না অধীনস্থ? আলী (রাঃ) উত্তর করিলেন, আপনার অধীনস্থ হইয়া আসিয়াছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে পাঠাইয়াছেন সন্ধি-চুক্তি বাতিলের ঘোষণা শুনাইবার জন্য।

সেমতে আবু বকর (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) একত্রে চলিতে লাগিলেন। হজ্জ পরিচালনার সম্পূর্ণ নেতৃত্ব আবু বকর (রাঃ)-ই প্রদান করিলেন; আলী (রাঃ) ১০ই যিলহজ্জ মিনায় জামরা আকাবার নিকট জনমণ্ডলীর বৃহত্তম সমাবেশে দাঁড়াইয়া নবী (সঃ) প্রদত্ত ঘোষণাসমূহ প্রচার করিয়া যাইতে লাগিলেন। আলী রাযিয়াল্লাহু

তাআলা আনহুর এই কার্যে তাঁহার সাহায্যার্থ অন্যদেরকে যেমন– আবু হোরায়রা (রাঃ)-কেও আবু বকর (রাঃ) নিয়োগ করিয়াছিলেন । (১ম খণ্ড ২৪৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

হজ্জ সমাপনান্তে আবু বকর (রাঃ) মদীনায় পৌঁছিয়া নিজ অন্তরের একটি ভীতি দূরীকরণার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার প্রতি কোন অভিযোগে আল্লাহর আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল কি? নবী (সঃ) তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, না– তবে আমি ভাল মনে করিয়াছিলাম যে, আন্তর্জাতিক সন্ধি চুক্তি বাতিলের ঘোষণাটা আমার ব্যক্তিগত নিজস্ব লোক মারফত হউক। (আসাহহুস সিয়ার– ৫৪৭)

অর্থাৎ শুধু উক্ত নিয়ম অনুসরণে আলী (রাঃ)-কে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

হিজরী দশম বৎসর
মুসলমানদের পরম আনন্দ ও ইসলামের চরম গৌরবের বৎসর

ইসলামের প্রতি সম্ভাব্য হুমকিসমূহ দমাইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভিযান পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে। বহির্বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তি রোমানরা নবম হিজরীতে মদীনার প্রতি দুই লক্ষ সৈন্য লইয়া অভিযানের শুধু পকিল্পনা করিয়াছিল; খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীজী (সঃ) চল্লিশ হাজার আত্মোৎসর্গকারী ভক্তবৃন্দ লইয়া দীর্ঘ তিন মাইল পথ অতিক্রম করতঃ রোমানদের নাকের উপর তবুক নামক এলাকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় ক্যাম্প করিয়া বিশ দিন অবস্থান করিলেন। শত্রুদের মনোবল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; সীমান্তে সমাবেশিত শত্রু সৈন্য পশ্চাৎপদ হইয়া গেল। মদীনা আক্রমণ করার সাধ তাহাদের চিরতরে মিটিয়া গেল, অধিকন্তু তাহাদের উপর এবং এলাকার উপর মুসলিম বাহিনীর পূর্ণ প্রভাব জগদ্দল পাথররূপে চাপিয়া গেল। এমনকি রোম সীমান্তে আবরদের যেসব দেশীয় রাজ্য দীর্ঘ দিন হইতে রোম সম্রাটের আশ্রিত ও অনুগত ছিল এবং যেসব গোত্র রোম সম্রাটের পক্ষাবলম্বী ছিল, সকলেই ইসলামী রাষ্ট্রের করতলে আসিয়া করদ রাজ্যে পরিণত হইয়া গেল। এইভাবে রোম সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত এলাকা মদীনার শাসনে আনয়নপূর্বক গোটা আরব উপদ্বীপের উপর ইসলামের কর্তৃত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবুক অভিযানে যুদ্ধ না করিয়া চরম বিজয়লাভে নবীজী (সঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

নবীজী (সঃ)-এর এই রাজনৈতিক চরম বিজয়ে আরবের মুমূর্ষু কুফরী শক্তি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগে বাধ্য হইল। মক্কা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ইসলামের এই চরম বিজয় আরবে শেরেক ও কুফরী শক্তির কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; বহিঃশক্তির সাহায্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার যে দুরাশা আরবের কাফের-মোশরেকদের ছিল, তবুক অভিযানের ফলাফল উহা হইতেও তাহাদিগকে চিরতরে নিরাশ করিয়া দিল। এখন ইসলাম সত্য সত্যই বলিষ্ঠ ও বিজয়ী; ইসলামের বিজয়ধ্বনিতে সমগ্র বহির্বিশ্ব প্রকম্পিত এবং ইসলামের জয়জয়কারে আরব উপদ্বীপের আকাশ-বাতাস মুখরিত। দীর্ঘ দশ বৎসরের যুদ্ধের সকল সীমান্তই এখন নীরব। তেইশ বৎসরকাল ধরিয়া চতুর্দিকে যেই আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, ধীরে ধীরে তাহা নিভিয়া গিয়াছে। উহার ধূম্রজাল কাটিয়া গিয়া সমগ্র আরব উপদ্বীপের আকাশে ইসলামের পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হইয়াছে এবং সেই আলোকে আলোকিত হইয়াছে চতুর্দিক। তাই বিদায় নিতে হইয়াছে কুফর ও শেরকের অন্ধকারকে। আকাশ হইতে আলো নামিয়া আসিলে ধরণীর জমাট বাঁধা অন্ধকারকে নীরবে বিদায় লইতেই হয়।

এদিকে কপট মোনাফেক দলের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও জাহান্নামে চলিয়া গিয়াছে; তাহার মৃত্যুতে ইঁদুর মোনাফেক দলের অবস্থাও কাহিল– এইসব নবম হিজরীর অবস্থা।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার পথ নবীজী (সঃ) সুগম করিয়াছেন, ইসলাম পালন করার বিধি-ব্যবস্থার অনুশীলন এবং শিক্ষাদান ও নবীজী (সঃ) পূর্ণ করিয়াছেন। নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি ফরয-ওয়াজিব এবং

হালাল-হারামের শিক্ষাদানও কার্যে রূপায়ণ হাতে কলমে পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। এখন পূর্ণাঙ্গ ইসলামের শুধু একটি স্তম্ভ– একটি রোকন বা মহাফরয হজ্জ যাহা মুসলমানদের সারা জীবনে মাত্র একবার করিতে হয়, উহার অনুশীলন ও বাস্তব রূপায়ণ অবিশিষ্ট রহিয়াছে। দশম হিজরীতে নবী (সঃ) মুসলমানগণকে সঙ্গে লইয়া হজ্জ পালনের ইচ্ছা করিলেন। নবীজী (সঃ)-কে দিবালোকে, স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে, খোলা ময়দানে, মুক্ত পরিবেশে মক্কায়, মিনায়, আরাফায় মোযদালেফায় এবং এইসব এলাকার পথে পথে ধীরস্থিররূপে লক্ষাধিক জনতাকে হজ্জের নিয়ম-কানুন কার্যতঃ দেখাইতে হইবে। জনতার ভিড়ে তাহাদের সঙ্গে সর্বদা নবীজীকে মিশিয়া থাকিতে হইবে। তাই নবীজী (সঃ)-এর নিরাপত্তার বাহ্যিক ব্যবস্থা জোরদার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন নবম হিজরীর বিশেষ ঘোষণাবলীতে পূর্ণরূপে মিটিয়া গিয়াছে। সমগ্র হরম এলাকা হইতে কাফের-মোশরেকদের প্রতিটি প্রাণীর উৎখাত সাধিত হইয়াছে, হরম এলাকায় তাহাদের পা রাখাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। হজ্জ উদযাপনে কাফের মোশরেক একটি প্রাণীও নাই; তাহাদের হজ্জে অংশগ্রহণ চিরতরে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নবীজীর (সঃ) নিরাপত্তার এই বাহ্যিক সুব্যবস্থা সম্পন্ন করার প্রয়োজন বহু কারণের একটি কারণ ছিল, নবীজীর (সঃ) হজ্জ উদ্‌যাপন দশম হিজরী পর্যন্ত পিছাইয়া যাওয়ার।

হজ্জের সময় উপস্থিতির বহু পূর্বেই সর্বত্র প্রচার করা হইল, এই বৎসর নবীজী মোস্তফা (সঃ) হজ্জ পালন করিতে যাইবেন। সর্বত্র এই প্রচারণায় অগণিত জনসমুদ্রের ঢেউ মদীনাকে ঘিরিয়া ফেলিল। প্রায় দেড় লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্যে চলিতে লাগিল নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের "কাসওয়া" উষ্ট্রী; পথে পথে আরও অনেক লোকই শামিল হইলেন কাফেলায়। অত্যধিক ভিড় এবং পথে পথে সংখ্যা বর্ধিত হইতেছে, এইরূপ অনেক কারণেই সংখ্যা নির্ধারণকারীদের বর্ণনায় বিভিন্নতা; যাহা এইরূপ ক্ষেত্রে নিতান্তই স্বাভাবিক।

নয় দিন ভ্রমণ করিয়া নবী (সঃ) এই অগণিত মুসলমানসহ মক্কায় পৌছিলেন। আজ পবিত্র মক্কায় এক অভিনব দৃশ্য দেখা দিয়াছে। শুভ্র শ্বেত বর্ণের একখানা চাদর গায়ে, পরনে একখানা চাদর– নবীজী (সঃ) এবং ধনী-দরিদ্র এমনকি ক্রীতদাস পর্যন্ত এই একই পরিচ্ছদে প্রায় দুই লক্ষ ভক্তের জামাত। সকলেই নগ্ন পদ, নগ্ন মস্তক এবং সকলের মুখেই লাব্বায়ক' ধ্বনি।

সর্বাধিক আকর্ষণীয় বিষয় ছিল এই যে, এই মক্কা ভূমিতে যাহারা ছিলেন উপেক্ষিত, উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত তাঁহারাই প্রায় দুই লক্ষ সংখ্যায় আজ মক্কাকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। পবিত্র কা'বার তওয়াফ ও সাফা মারওয়ার পরিক্রমণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে আজ মক্কার সমগ্র এলাকায় একটি কাফের মোশরেককেও খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নহে। যেই দেশে নবীজীর (সঃ) কথা বলার অধিকার ছিল না, আজ সেই দেশের আকাশে-বাতাসে ঝংকৃত হইতেছে নবীজীর (সঃ) কত কত অভিভাষণ।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম করিয়াছেন নবীজী (সঃ) এবং তাহা পালন করারও সব নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন। অবশিষ্ট ছিল শুধু এই মহান হজ্জ; ইহাও উদযাপিত হইয়া চলিয়াছে মহাসমারোহে। মুসলমানদের এই অভূতপূর্ব মহাসমাবেশের চরম গৌরব ও পরম আনন্দমুখর রাজকীয় পরিবেশে নবীজী (সঃ) কর্তৃক হজ্জ উদযাপনের সাথে সাথে দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করিল। এই মুহূর্তেই মুসলিম জাতির জন্য চির গৌরব ও মহা সুসংবাদ বহন করিয়া পবিত্র কোরআনের এই মহান আয়াতটি অবতীর্ণ হইল–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থ ঃ "আজ আমি পূর্ণতা দান করিলাম তোমাদের জন্য দ্বীন ইসলামকে এবং আমার নেয়ামত বা বিশেষ দান এই ইসলামকে পূর্ণ পরিণত করিলাম এবং তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থারূপে ইসলামকেই মনোনীত করিলাম।"

এই হজ্জ উপলক্ষে বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব মানবের প্রতি বিশ্ব নবীমোস্তফা (সঃ) ৯

যিলহজ্জ আরাফার ময়দানে এবং ২০ যিলহজ্জ মিনার বিভিন্ন স্থানে যে সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বিশ্ব শান্তি কল্যাণ ও বিশ্ব মানবের জন্য সর্বোত্তম রক্ষাকবচ। দ্বিতীয় খণ্ডে বিদায় হজ্জ পরিচ্ছেদে আমরা ১৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সেই মহা অভিভাষণের মূল বিবরণ ও অনুবাদ করিয়াছি।

হজ্জের মৌলিক কার্যাবলী সমাপনান্তে ১০ যিলহজ্জ বিকাল বেলা শয়তানকে কাঁকর মারার মহাসমাবেশে মানব জাতির শান্তি ও নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার ঘোষণার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শেষ করিয়া নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জনতার দিকে মুখ করিলেন এবং "বিদায়! বিদায়"!! বলিয়া তাহাদের হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই বিদায়ের মূল তত্ত্ব ও মর্ম বুঝিতে বাকী থাকিল না কাহারও; তাই সকলেই নবীজীর (সঃ) এই সমারোহের হজ্জকে "বিদায় হজ্জ" নামে আখ্যায়িত করিল।

(দ্বিতীয় খণ্ড ৯১০ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

বিদায় হজ্জ হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন

বিদায় হজ্জ হইতে মদীনায় উপস্থিত হইবা মাত্রই নবীজী (সঃ) একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করিলেন। তাঁহার ভাষণটি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। মিনায় শেষ ভাষণ সমাপ্তে জনতাকে নবীজী (সঃ) স্বীয় বিদায়ের ইঙ্গিত দিয়া আসিয়াছেন; এখন আর এক ইঙ্গিতের বিশেষ প্রয়োজন যে, তাঁহার বিদায়ের পর উম্মতের কাণ্ডারী বা কর্ণধার কে হইবেন। সেই বিশেষ প্রয়োজন মিটাইয়াছেন নবীজী (সঃ) তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে। শুধু তাঁহার পরবর্তী কর্ণধারের ইঙ্গিতের উপরই ক্ষান্ত হন নাই তিনি, বরং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এই প্রয়োজনের সুরাহাকল্পে পরম্পরা কতিপয় নামের ইঙ্গিতও দিয়াছেন এই ভাষণে। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্বীয় স্নেহাস্পদ উম্মতকে এক ভাষণে নিজ বিদায়ের ইঙ্গিত দানে বিচলিত করিয়া অপর ভাষণে কর্ণধার নির্ধারণে আশ্বস্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের কর্তব্যের নির্দেশও দিয়াছেন।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনে মদীনায় পৌঁছিয়া সমবেত উম্মতের সম্মুখে মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও শোক্‌র আদায় করিয়া বলিলেন–

"হে লোকসকল! আবু বকর কখনও আমার প্রতি কোন ত্রুটি করেন নাই; তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি তোমরা লক্ষ্য রাখিও।

হে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমার ছাহাবীগণের বেলায় আমার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসার মর্যাদা রক্ষা করিও বিশেষতঃ যাঁহারা আমার শ্বশুর (যেমন– আবু বকর, ওমর) এবং যাঁহারা আমার দোস্তদার (যেমন, উল্লিখিত গণ্যমান্যগণ) তোমরা সতর্ক থকিও– আমার কোন একজন ছাহাবীর প্রতি অশোভনীয় আচরণের দায়ে। তোমাদের কাহারও যেন আল্লাহ তাআলার নিকট অভিযুক্ত হইতে না হয়।

হে লোকসকল! মুসলমানদের গ্লানি প্রচার হইতে বিরত থাকিও এবং তাহাদের মধ্যে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহার প্রতি মন্তব্য করিতে ভাল মন্তব্য করিও। (বেদায়া, ৪– ২১৪)

হিজরী একাদশ বৎসর
নবীজী (সঃ)-এর মহাপ্রয়াণ উম্মতের মহাশোক

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব, পরিচয় এবং জন্ম ইত্যাদি সম্পর্কে যেরূপ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে বর্ণিত ছিল, তদ্রূপ তাঁহার তিরোধানের বিবরণও বর্ণিত ছিল। ঐসব কিতাবের জ্ঞানীগণ তাহা সম্যক অবগত ছিলেন। যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীছের ঘটনায় উহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

১৭১৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬২৫) জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়ামানবাসী দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত আমি সাক্ষাত করিলাম– একজন যু-কালা, অপরজন যু-আম্‌র। তাঁহাদের সহিত আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। তাহা শ্রবণে যু-আম্‌র আমাকে বলিলেন, আপনার উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা যদি প্রকৃতই ঐরূপ হইয়া থাকে যাহা আপনি বর্ণনা করিয়াছেন, তবে ইতিমধ্যে তিন দিন পূর্বে তিনি পূর্বে ইহকাল ত্যাগ করিয়াছেন।

অতপর তাঁহারা উভয়ে আমার সঙ্গে মদীনা পানে যাত্রা করিলেন। আমরা তিন জন পথ চলিতে লাগিলাম। পথে একদল লোকের সহিত সাক্ষাত হইল– তাহারা মদীনা হইতে আসিয়াছে। তাহাদের নিকট মদীনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেই তাহারা বলিল, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইহকাল ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আবু বকর (রাঃ) তাঁহার খলীফা মনোনীত হইয়াছেন, জনগণ সুশৃঙ্খল রহিয়াছে। এতদশ্রবণে তাঁহারা উভয় আমাকে বলিলেন, এখন আমরা মদীনায় যাইতেছি না। আপনি আমাদের সম্পর্কে আবু বকর (রাঃ)-কে বলিবেন, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, মদীনার পানে যাত্রা করিয়াছিলাম (আশা ছিল নবীজী (সঃ)-এর পদধূলি লাভ হইবে, কিন্তু ভাগ্যে তাহা জুটিবার নহে। হয়ত অচিরেই আমরা ইন্‌শাআল্লাহ তাআলা মদীনায় আসিতেছি। এই বলিয়া তাঁহারা ইয়ামানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আমি মদীনায় পৌঁছিয়া তাঁহাদের সমুদয় কথাবার্তা আবু বকর (রাঃ)-কে জ্ঞাত করিলাম, তিনি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশে বলিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে নিয়া আসিলেন না কেন?

অনেক দিন পর যু-আমরের সহিত আমার পুনঃ সাক্ষাত হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, আমার প্রতি আপনার মস্ত বড় অনুগ্রহ রহিয়াছে (আপনার মাধ্যমেই আমি ইসলাম লাভ করিতে পারিয়াছি)। তাই আপনাকে একটি সুসংবাদ শুনাই– আপনাদের (আরব জাতির যাঁহারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন–) যে যাবত এই রীতি বহাল থাকিবে যে, শাসনকর্তা একজনের পর অপরজনের নিয়োগ পরামর্শের মাধ্যমে হইবে তাবত আপনাদের মধ্যে মঙ্গল অক্ষুণ্ন থাকিবে। যখন তরবারির সাহায্যে ক্ষমতা দখল করা হইবে, তখন শাসনকর্তাগণ একনায়ক হইবেন; তাহাদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি একনায়কগণের ন্যায় নিজ মর্জির ভিত্তিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ ইয়ামানের আলোচ্য ব্যক্তিদ্বয় এলাকার সমাজপতি ছিলেন। ইয়ামানবাসী জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ছাহাবী মারফত উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের নিকট নবীজী (সঃ) ইসলামের আহ্বান লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই লিপিবাহকরূপেই জরীর (রাঃ) তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা মদীনার পানে যাত্রা করিলেন, পথে থাকাকালীনই নবীজী (সঃ) ইহকাল ত্যাগ করেন। তাই তাঁহারা ছাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই।

আলোচ্য ঘটনায় যে, যু-আম্‌র নামীয় ব্যক্তি মদীনা হইতে বহু দূর ইয়ামানে থাকিয়া আলোচনার মাধ্যমে সর্বশষ পয়গম্বরকে ঠাহর করিতে পারিলেন এবং ইহাও বলিতে পারিলেন যে, তিন দিন পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে– ইহা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের জ্ঞানের মাধ্যমে সম্ভব হইয়াছিল।

নবীজী (সঃ)-কে ইহজগত ত্যাগের সঙ্কেতদান

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ـ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ـ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ـ

নবীজী (সঃ)-এর প্রতি সূরা নসর অবতীর্ণ হইল, যাহা সুসংবাদ বহনকারী ছিল–

অর্থ ঃ আল্লাহর সাহায্য পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে, মক্কা জয় হইয়া গিয়াছে এবং দলে দলে লোকদের আল্লাহর দ্বীনে দীক্ষা আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া নিয়াছেন। অতএব (এখন) স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণার ও তাঁহার প্রশংসায় লিপ্ত থাকুন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকুন; নিশ্চয় তিনি হইলেন অতিশয় ক্ষমাশীল, নেক দৃষ্টি দানকারী।

এতদ্ভিন্ন দশম হিজরী সনেই হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জ সমাপন করেন এবং আরাফার ময়দানে সুসংবাদ বহনকারী এই আয়াত নাযিল হয়–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থ ঃ (ইসলামের অবশিষ্ট রোকন– হজ্জকে স্বয়ং আপনার দ্বারা এবং আপনার সম্মুখে লক্ষাধিক সংখ্যক মুসলমান দ্বারা বিনা বাধায় পূর্ণ শান-শওকতের সহিত সম্পন্ন করাইয়া) আজিকার দিনে আমি তোমাদের (মুসলমান) জন্য তোমাদের দ্বীন (ইসলাম)-কে (আরকান আহকাম এবং শক্তি বিকাশের দিক দিয়া) সম্পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিলাম এবং (এইরূপে) আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের জন্য একমাত্র ইসলামকেই দ্বীনরূপে পছন্দ করিয়া নিয়াছি। (পারা–৬, রুকু–৫)

সূরা নসর এবং উক্ত আয়াত বস্তুত হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পক্ষে ইহজগত ত্যাগ সম্পর্কে একটি সঙ্কেত ছিল। কারণ, ইহজগতে হযরতের আবির্ভাব দ্বীন ইসলাম প্রচারের জন্যই ছিল। তাহা যখন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং এই পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে যে, চতুর্দিক হইতে দলে দলে লোক স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষা নিতেছে, এমতাবস্থায় এই কষ্ট ক্লিষ্টের জগতে অবস্থানের আবশ্যক হযরতের জন্য থাকে নাই, তাই তাঁহাকে ইহজগত ত্যাগের প্রস্তুতি করা চাই। যেমন রাজদূত তাঁহার কার্য শেষে আপন দেশে যথাশীঘ্র ফিরিয়া যাইতে হয়। নবীজী (সঃ)ও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার কাজ যখন ফুরাইয়াছে তখন শীঘ্রই তাঁহাকে এই ধরাধাম হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।

সূরা নসরের এই তাৎপর্য হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) অনুধাবন করিতে পারিয়াই এই সূরার শেষ অংশের আদেশগুলি পালনে তৎপর হইয়া উঠিলেন। উঠা-বসা, চলাফেরা তাঁহার মুখে শুনা যাইত–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

এবং سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

এবং سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

বিশিষ্ট ছাহাবীগণও ঐ তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ৩১৯১)

১৭১৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৭৪৩) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খলীফাতুল মুসলেমীন) ওমর (রাঃ) তাঁহার দরবারে (বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে, এমনকি) বদরের জেহাদে অংশগ্রহণকারী বড় বড় ছাহাবীদের সঙ্গে আমাকে স্থান দিয়া থাকিতেন। ইহাতে কোন কোন লোক মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন, এমনকি ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তাঁহারা বলিলেন, এই অল্প বয়স্ক যুবককে কেন আমাদের সঙ্গে স্থান দিয়া থাকেন? তাহার বয়সের সন্তান-সন্ততি আমাদের রহিয়াছে। ওমর (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, সে যে কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা ত আপনারা ও জ্ঞাত আছেন।

অতপর একদা ওমর (রাঃ) বিশেষভাবে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে দরবারে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে অন্যদের সঙ্গে বসাইলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলম যে, ওমর (রাঃ) (আমার দ্বারা) দরবারের লোকগণকে কোন একটা কিছু দেখাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

ওমর (রাঃ) দরবারের সকলকে বলিলেন, "ইযা জাআ' নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু" সূরার তাৎপর্য সম্পর্কে আপনারা কি বলেন? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চুপ রহিলেন। আর কেহ কেহ বলিলেন, আল্লাহ তাআলার বিশেষ সাহায্য এবং মক্কা বিজয় হওয়ায় (শুকরিয়াস্বরূপ) আমাদিগকে আল্লাহর প্রশংসা করিতে এবং তাঁহার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থীরূপে নম্র হইয়া থাকিতে আদেশ করা হইয়াছে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইবনে আব্বাস ! তুমিও কি এইরূপই বুঝিয়া থাক? আমি বলিলাম, না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তবে তুমি কি বল? আমি বলিলাম, এই সূরায় হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ইহজগত ত্যাগের কথা জ্ঞাত করা হইয়াছিল যে আল্লাহর সাহায্যে মক্কা পর্যন্ত জয় হইয়া গিয়াছে এবং চতুর্দিকের লোকজন দলে দলে ইসলামে দীক্ষা লাভ করিতেছে; ইহা আপনার ইহজগত ত্যাগ নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন। অতএব এখন বিশেষভাবে "তসবীহ্ তাহ্মীদ" প্রভুর পবিত্রতা প্রশংসা জপনায় এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনায় লিপ্ত থাকুন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমিও এই সূরার তাৎপর্য তাহাই বুঝি যাহা তুমি বলিয়াছ।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা "নসর" কাহারও মতে বিদায় হজ্জের মধ্যে এবং কাহারও মতে বিদায় হজ্জের পূর্বে নাযিল হইয়াছিল। হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জের পূর্বেই ইহজগত ত্যাগ আসন্ন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। পূর্বের বৎসরগুলিতে রমযান মাসে জিব্রাঈল ফেরেশতা হযরতের সঙ্গে কোরআন শরীফ একবার খতম করিতেন, দশম হিজরীর রমযান মাসে দুই বার খতম করিলেন। হযরত (সঃ) ইহা দ্বারাও আঁচ করিতে পারিলেন যে, এই রমযান তাঁহার জীবনের শেষ রমযান। সম্মুখে ১৭৩৩ হাদীছে এই তথ্য স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বোধহয় সেই জন্যই তিনি এই রমযানে দশ দিনের স্থলে কুড়ি দিনের এ'তেকাফ করিয়াছিলেন

১৭২০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৭৪৮) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জিব্রাঈল ফেরেশতা নবী (সঃ)-এর সঙ্গে প্রতি রমযানে একবার কোরআন শরীফ দাওর করিতেন। যেই বৎসর (রমযানের পরে) হযরত (সঃ) ইহজগত ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন সেই বৎসর (রমযানে) দুই বার দাওর করিয়াছিলেন এবং হযরত (সঃ) প্রতি বৎসর দশ দিনের এতেকাফ করিয়া থাকিতেন। যেই বৎসর তিনি ইহজগত ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন সেই বৎসর বিশ দিন এ'তেকাফ করিয়াছিলেন।

মুসলিম শরীফে আছে- হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জে বলিয়াছেন, আমাকে দেখিয়া তোমরা হজ্জের নিয়মাবলী শিখিয়া রাখ; হয়ত তোমাদের সঙ্গে হজ্জ করার সুযোগ পুনরায় আর আমি পাইব না।

বিদায় সঙ্কেত প্রাপ্তিতে নবীজী (সঃ)-এর অবস্থা

স্বদেশে স্বজনগণের নিকটে ফিরিয়া যাওয়ার সময় উপস্থিত হইলে প্রবাসী যেমন তাড়াতাড়ি করিয়া প্রবাসের সমস্ত কাজকর্ম ও ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া, দায়িত্ব কর্তব্য শেষ করিয়া আনন্দ ঔৎসুক্যের সহিত নিজের যাত্রার আয়োজন করিতে থাকে, প্রবাসের প্রতি বিমনা হইয়া পড়ে; ইহজগত ত্যাগের সঙ্কেত প্রাপ্তিতে হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর নবীজী (সঃ) যেন তদ্রূপ পৃথিবীর সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সকল কার্যে সকল চিন্তায় ও ভাবধারায় একটা পরিবর্তন দেখা দিল। ওপার হইতে আগত ব্যক্তি যেমন বেলা শেষে নদীর কূলে দাঁড়াইয়া ওপারের দিকে তাকায়; নবীজী মোস্তফা (সঃ)ও যেন পরপারের আকর্ষণে এই পার হইতে বিমনা হইয়া পরপারের প্রতি তাকাইতে লাগিলেন। এমনকি তিনি কোন ভাষণ দিলে শ্রোতাদের অনুভূতিতে ও দৃষ্টিতে তাঁহার ঐ ভাব দিবালোকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিত। যেমন এক হাদীছে আছে –

এরবায (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নামায শেষে আমাদের প্রতি মুখ করিয়া উপদেশমূলক বক্তব্য রাখিলেন, যাহা অত্যধিক মর্মস্পর্শী ছিল। সেই বক্তব্য শ্রবণে সকলের চোখই অশ্রু বহাইতে এবং অন্তর কাঁপিতে লাগিল। একজন ছাহাবী ঐ অবস্থায় আরজ করিলেন, ইয়া

রসূলাল্লাহ! আপনার এই ওয়াজ বিদায়কালীন ওয়াজের ন্যায় মনে হয়। অতএব আপনি আমাদেরে শেষ উপদেশ দিয়া যান। নবীজী (সঃ) ঐ ছাহাবীর কথা খণ্ডন না করিয়া উত্তরদানে বলিলেন; তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ–

"সর্বদা আল্লাহর ভয়-ভক্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবে। আর মুরব্বী ও উপরস্থের কথা মানিয়া চলিবে, যদিও সে নিম্নমানের হয়। আমার পরে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা অনেক বিভেদ দেখিতে পাইবে। সে ক্ষেত্রে তোমরা আমার সুন্নত এবং সত্যের ধারক-বাহক আমার খলীফাদের সুন্নতের উপর দৃঢ়পদ থাকিবে, উহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিবে, উহাকে শক্তভাবে দাঁত দ্বারা কামড় দিয়া ধরিয়া রাখিবে। ঐ সুন্নত ছাড়া যত প্রকার গর্হিত তরীকা হইবে, সব হইতে সযত্নে দূরে সরিয়া থাকিবে। ঐরূপ গর্হিত তরিকাকেই "বেদআত" বলা হয় এবং সব রকম বেদআতই ভ্রষ্টতা। (মেশকাত শরীফ ৩০)

বিদায় হজ্জ সমাপনান্তে মদীনার নিকটবর্তী "গাদীরে খোম" নামক স্থানে নবীজী (সঃ) অবস্থান করিয়া তথায়ও ভাষণ দিয়াছিলেন; সেই ভাষণে সুস্পষ্টরূপে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বিদায়ের কথা বলিয়াই দিয়াছিলেন।

"গাদীরে খোম"-এর ভাষণ

মক্কা হইতে মদীনার পথে একটি স্থানের নাম হইল "গাদীরে খোম"। হজ্জ সমাপনান্তে মক্কা হইতে মদীনাপানে যাত্রা করিয়া চারি দিন পথ চলার পর যিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখ শনিবার যোহরের নামাযের সময় সকলকে একত্র করিয়া নবী (সঃ) এই স্থানে বিশেষ কারণে একটি ভাষণ দান করিয়াছিলেন।

শিয়া সম্প্রদায় এই ভাষণকে কোরআন হাদীছ, ঈমান-ইসলামের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। তাহারা ইহাকে তাহাদের হৈ-হল্লা ও গোমরাহ মতবাদের মূল বেসাতি বানাইয়াছে।

ভাষণের মূল কারণ ঃ বিদায় হজ্জে মদীনা হইতে যাত্রার পূর্বেই নবী (সঃ) আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অধীনে ইয়ামান এলাকায় একটি বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। আলী (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ তথা হইতে আসিয়া হজ্জ সমাপনে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে শামিল হইয়াছিলেন। হজ্জ সমাপনান্তে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে এই "গাদীরে খোম" নামক স্থানে বা ইহার পূর্বে ঐ বাহিনীর লোকগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আলী (রাঃ) সম্পর্কে কোন বিষয়ে অভিযোগ করিলেন। বিশেষতঃ বোরায়দা (রাঃ) নামক ছাহাবী যিনি আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আচরণকে অশোভনীয় গণ্য করিয়াছিলেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট তাঁহার সম্পর্কে অভিযোগ করিলেন। তাহাতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চেহারা মোবারকে অসন্তুষ্টির লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছিল।

এস্থলে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য– একটি সর্বক্ষেত্রের জন্য নীতিগত বিষয়, আর একটি এই ক্ষেত্রের বিশেষ বিষয়।

নীতিগত বিষয়টি হইল, নবী (সঃ) আল্লাহ তাআলার এই পরিমাণ প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, প্রভাবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আহলে বায়ত– পরিবার-পরিজন আল্লাহ তাআলার বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। যেরূপ মালে গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পঞ্চমাংশ, যাহা সকল মুসলমানের সাহায্যার্থ বায়তুল মাল বা জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে জমা করা হইত, তাহার মধ্যে "জবিল কোরবা" তথা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আত্মীয়বর্গের জন্য একভাগ বিধানগতরূপে নির্ধারিত থাকিত। ইসলামের এই বিধান নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্বজনপ্রীতি ছিল না। "নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা"। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি স্বজনপ্রীতির এক অণুকণার ধারণাও ঈমান ধ্বংসকারী। উল্লিখিত বিধান ত পবিত্র কোরআনেই বর্ণিত রহিয়াছে (পারা–১০, রুকু– ১ দ্রষ্টব্য)। এই বিধান আল্লাহই করিয়া দিয়াছেন। তদ্রূপই

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তাআলার অতুলনীয় ভালবাসার প্রভাবে তাঁহার আহ্‌লে বায়ত আল্লাহ তাআলার বিশেষ প্রীতিভাজন সাব্যস্ত। এই প্রীতিভাজন হওয়ার স্বাভাবিক ফল ইহাই যে, তাঁহাদের প্রতি সকলেই বিশেষ ভালবাসা রাখিতে হইবে; তাঁহাদের সম্পর্কে প্রশস্ত অন্তর রাখিতে হইবে এবং ইহার বিপরীত কাজ মুসলমানদের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গল হইবে। নবী (সঃ) উম্মতের জন্য নীতি নির্ধারক ও মঙ্গলকামী হিসাবে উল্লিখিত সত্য সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করা তাঁহার একটি কর্তব্য ছিল। গাদীরে খোমের ঘটনা ঐ সত্যটি আলোচনার একটি সুন্দর ও উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। কারণ, ঐ ঘটনায় নবী (সঃ)-এর আহ্‌লে বায়তের অন্যতম সদস্য আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি সঙ্কীর্ণমনা হওয়ার পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। সামান্য ছোটখাট বিষয়ে আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি অভিযোগ করা হইয়াছিল।

আর ঐ ক্ষেত্রে অনুধাবনের বিশেষ বিষয় এই ছিল যে, ঐ অভিযোগের ব্যাপারে আলী (রাঃ) নির্দোষ ছিলেন। আলী (রাঃ) আহ্‌লে বায়তের সদস্য হিসাবে তিনি বিশেষ প্রীতিভাজন হওয়ার অধিকারী। এমতাবস্থায় নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি অভিযোগ তাঁহার অধিকার বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন করিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি ভালবাসা রাখার বিশেষ নির্দেশ ও দাবী নিতান্তই প্রয়োজনীয়। সেই প্রয়োজনের তাকিদেই নবী (সঃ) "গাদীরে খোম" স্থানে এই বিষয়ে বিশেষ ভাষণ দান করিয়াছিলেন। (বেদায়া, ৫-২০৮)

মুসলিম শরীফের হাদীছে উক্ত ভাষণের উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা বর্ণনার পর নবীজী (সঃ) বলিয়াছিলেন-

اَلاَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ اَن يَّاْتِيَنِىْ رَسُوْلُ رَبِّىْ فَاُجِيْبَ وَاَنَا تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ وَاَهْلُ بَيْتِىْ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ ـ

অথ ঃ হে লোকসকল! আমি মানুষই বটে; অচিরেই হয়ত আমার প্রভুর দূত আমাকে নিয়া যাওয়ার জন্য উপস্থিত হইবেন; আমিও অবিলম্বে তাঁহার ডাকে সাড়া দিব। আমি অতি মহান দুইটি জিনিস তোমাদের মধ্যে রাখিয়া যাইতেছি। প্রথমটি হইল, আল্লাহর কিতাব, যাহার মধ্যে হেদায়াত (সঠিক পথ প্রদর্শন) এবং নূর (ঐ পথের আলো) রহিয়াছে। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে ধরিয়া থাকিবে, উহা আঁকড়াইয়া থাকিবে। দ্বিতীয়টি হইল আমার পরিবার-পরিজন (তাহাদের হইতে দ্বীনের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করিবে)। তাহাদের সম্পর্কে তোমাদিগকে আল্লাহর ভয় স্মরণ করাইয়া যাইতেছি। (আসাহ, ৫৩৯)

নাসায়ী শরীফ এবং অন্যান্য কিতাবে উক্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ এইরূপ রহিয়াছে- "গাদীরে খোম" এলাকায় পৌঁছিয়া যোহর নামাযের সময় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য গাছতলায় স্থান ঠিক করা হইল এবং লোকদিগকে নামাযের জন্য একত্র করা হইল; যোহরের নামায একটু সত্বরই পড়া হইল। নামাযান্তে রসূলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ)-কে ডাকিয়া নিজের ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন! তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআলার গুণ-গান পূর্বক বলিলেন-

اَيُّهَا النَّاسُ كَاَنِّىْ قَدْ دُعِيْتُ فَاَجَبْتُ اِنِّىْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِىْ اَهْلَ بَيْتِىْ فَانْظُرُوْا كَيْفَ تَخْلُفُوْنِّىْ فِيْهِمَا فَاِنَّهُمَا لَنْ يَّتَفَرَّقَا حَتّٰى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ مَوْلاَئِىْ وَاَنَا وَلِىُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِ عَلِىٍّ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاَهُ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَاَحِبَّ مَنْ اَحَبَّهُ وَاَبْغِضْ مَنْ اَبْغَضَهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ ـ

অর্থ ঃ "হে লোকসকল! আমার যেন (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে পরপারের) ডাক আসিয়া গিয়াছে এবং আমি তাহা গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। আমি অতি মহান দুইটি বস্তু তোমাদের নিকট রাখিয়া যাইতেছি– আল্লাহর কিতাব এবং আমার পরিবার পরিজন, আমার আহলে বায়ত। আমার পরে এই দুই বস্তু সম্পর্কে নীতি অবলম্বনে তোমরা গভীর চিন্তা করিও। এই বস্তুদ্বয় এক সঙ্গেই হাউজে কাওসারের কিনারায় আমার নিকট উপস্থিত হইবে (তাহাদের সহিত তোমাদের নীতি সম্পর্কে ঐ সময় তাহারা বক্তব্য রাখিবে)।

তার পর নবী (সঃ) বলিলেন– আল্লাহ আমার প্রিয়, আমি সকল মোমেনের প্রিয়; এই কথা বলার পর নবী (সঃ) আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হস্ত ধারণপূর্বক বলিলেন, আমি যাহার প্রিয় হইব আলীও তাহার প্রিয় হইতে হইবে। আয় আল্লাহ! তুমি তোমার প্রিয় বানাও ঐ ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি আলীকে প্রিয় বানায় এবং তুমি শত্রু গণ্য কর ঐ ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি আলীকে শত্রু বানায় এবং তুমি ভালবাস ঐ ব্যক্তিকে যেব্যক্তি আলীকে ভালবাসে এবং অসন্তুষ্ট থাক ঐ ব্যক্তির প্রতি যেব্যক্তি আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে এবং সাহায্য কর ঐ ব্যক্তির যে ব্যক্তি আলীর সাহায্য করে।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবার-পরিজন ও "আহ্‌লে বায়ত" ছিলেন মুসলিম জননী নবী পত্নীগণ, আর ফাতেমা (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং হাসান ও হোসাইন রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা (বয়ানুল কোরআন; পারা–২২, রুকু–১)

নবী পত্নীগণ আহলে বায়ত হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ইশারা রহিয়াছে; অন্যান্যগণ সম্পর্কে দুইটি হাদীছ আছে। একটি হাদীছে ত নিতান্তই সুস্পষ্ট। কোন এক বিশেষ উপলক্ষে নবী (সঃ) আলী (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ) এবং হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-কে ডাকিয়া একত্রীত করিলেন এবং বলিলেন–اللهم هؤلاء اهلى "হে আল্লাহ! ইহারা আমার আহ্‌ল পরিজন।" (মুসলিম শরীফ)–

অপর হাদীছে আছে– একদা নবী (সঃ) স্বীয় চাদরের ভিতরে হাসান, হোসাইন, ফাতেমা ও আলী (রাঃ)-কে জড়াইয়া নিয়া ২২ পারা প্রথম রুকুর ঐ আয়াত তেলাওয়াত করিলেন যাহাতে "আহ্‌লে বায়ত" -এর উল্লেখ রহিয়াছে। (মুসলিম শরীফ)

আলোচ্য ভাষণে আলী (রাঃ) সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উক্তির প্রতিক্রিয়া ছাহাবা কেরামের উপর কি হইয়াছিল সে সম্পর্কে উক্ত ভাষণের পর ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উক্তি এই –

هنيئا يا ابن ابى طالب اصبحت وامسيت مولى لكل مؤمن ومؤمنة ـ

অর্থ ঃ হে আবু তালেব পুত্র! আপনাকে মোবারকবাদ– আপনি সর্বদার জন্য প্রত্যেক মোমেন নর-নারীর প্রিয়পাত্র হইয়া গেলেন। (মেশকাত শরীফ, ৫৬৫)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মর্তবা ও ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীছই বর্ণিত রহিয়াছে। আলোচ্য ভাষণটি ত আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি ভালবাসা রাখার আদেশ ও দাবী জ্ঞাত করার জন্যই ছিল। কিন্তু মান মর্যাদা, ফযীলত ও ভালবাসার জন্য তাহা অবধারিত নহে যে, আলী (রাঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত– প্রথম খলীফা হওয়ার নির্ধারিত অধিকারী ছিলেন। শিয়া সম্প্রদায় আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সম্পর্কে সেই অধিকারেরই আকীদা ও একীন রাখিয়া থাকে। এমনকি তাহাদের মৌলিক মতবাদ এই যে, আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সেই অধিকার খর্ব করিয়া ছাহাবীগণ অন্যায় করিয়াছিলেন (নাউযু বিল্লাহে মিন যালিকা)। এইরূপ মতবাদ ও ধারণা পোষণ করা কবীরা গোনাহ।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত ও তাঁহার পরবর্তী খলীফা আবু বকর (রাঃ) হওয়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনেক সুস্পষ্ট ইশারা বিদ্যমান ছিল। (১) অন্তিম শয্যায় নবী (সঃ) নামাযের জন্য যাইতে অপারগ হইলে পর আবু বকর (রাঃ)-কে ইমাম হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাহার বিপরীতে

কতেক বার পীড়াপীড়ি করার উপর নবী (সঃ) কঠোর মন্তব্যপূর্বক জোরালো ভাষায় আদেশ করেন– مروا بابكر فليصل بالناس "লোকদের নামায পড়াইবার জন্য তোমরা আবু বকরকেই বল।" এই অবস্থায় নবী (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত বিশ ওয়াক্ত নামাযে আবু বকর (রাঃ)-ই ইমাম থাকেন; অথচ সেখানে আলী (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। (২) অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে নবী (সঃ) হজ্জে গমন করেন নাই; তিনি আবু বকর (রাঃ)-কে তাঁহার স্থলে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আলী (রাঃ)-কে পরে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। (৩) নবী (সঃ) কাহাকেও কোন কথা বা আশ্বাস দিলে তাহা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁহার উপর থাকিবে– এইরূপ প্রশ্নের ক্ষেত্রে নবী (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ করিয়া দিতেন। (৪) খেলাফত সম্পর্কে লোকদের বিভিন্ন দাবী ও আশার নিরসনে অন্তিম শয্যায় নবী (সঃ) লিপি লিখিয়া দেওয়ার জন্য আবু বকর (রাঃ) এবং তাঁহার পুত্রকে ডাকিয়া আনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অতপর তাঁহার সেই ইচ্ছা তিনি মুলতবী করিয়াছেন এই বলিয়া যে يابى الله والمؤمنون الا ابابكر "আল্লাহ এবং মুসলিম সমাজ আবু বকর ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্বীকার করিবে না।" এই সম্পর্কে ৬ষ্ঠ খণ্ডে আবু বকর (রাঃ)-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এই শ্রেণীর অনেক তথ্য হইতে চোখ বন্ধ করিয়া "গাদীরে খোম"-এর ভাষণকে আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রথম খলীফা নির্ধারিত হওয়ার প্রমাণরূপে দাঁড় করা ভ্রষ্টতা বৈ নহে। উক্ত ভাষণে খলীফা নির্ধারণের কোন উক্তি নাই; আলী (রাঃ) সম্পর্কে "মাওলা" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহার অর্থ প্রিয়পাত্র; খলীফা হওয়ার অর্থের সঙ্গে ঐ শব্দের কোন সম্পর্ক নাই।

এইভাবে যতই দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ততই পরপারের দিকে দ্রুত আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং ইহজীবন হইতে বিদায়ী কার্যকলাপ ব্যস্ততার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

ওহুদ পর্বতের পাদদেশে ভয়াবহ যুদ্ধ ময়দানে যাঁহারা কঠোর পরীক্ষায় নবীজীর চরণ প্রান্তে দাঁড়াইয়া দ্বীন ইসলামের সেবায় আত্মদান করিয়াছেন– বিদায়ের বেলায় নবীজী (সঃ) তাঁহাদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ করিলেন। এমনকি (অনেকের মতে) এই সময়ে একদা তিনি ওহুদ প্রান্তে যথায় শহীদাগণ চির নিদ্রায় শুইয়া আছেন তথায় উপস্থিত হইলেন এবং শহীদানের সমাধি কিনারায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদের জন্য প্রাণ ভরিয়া দোয়া করিলেন। ঘটনার বর্ণনাকারী যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বলিয়াছেন– নবীজী (সঃ) যেন মৃত, জীবিত সকল হইতে বিদায় হইতেছিলেন। (পৃঃ ৫৭৮)

নবীজী (সঃ)-এর পীড়ার সূচনা

দশম হিজরীর শেষ যিলহজ্জ মাসে হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জ সমাপন করিয়া মাসের অল্প কয়েক দিন বাকী থাকিতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন– তখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। পরবর্তী মহররমের চাঁদ হইতে একাদশ হিজরী বৎসর আরম্ভ হইল। পূর্ণ মহররম মাসও হযরত (সঃ) সুস্থ ছিলেন।

একাদশ হিজরীর দ্বিতীয় মাস– সফর মাসের শেষ দিকে একদা রাত্রি বেলা হযরত নবী (সঃ) স্বীয় খাদেম আবু মোআইহাবাহ্‌কে নিদ্রা হইতে উঠাইলেন এবং বলিলেন, "বাকী (মদীনার) কবরস্থানে যাইয়া তথাকার সমাহিতদের জন্য দোয়ায়ে মাগফেরাত করার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। সেমতে হযরত (সঃ) তথায় গেলেন এবং প্রত্যাবর্তন করার পর হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন– তাঁহার মাথা ব্যথা ও জ্বর আরম্ভ হইল। এই রাত্রটি ২৯ সফর মঙ্গলবার দিবাগত ৩০ সফর বুধবার রাত্র ছিল।*

---

* অর্থাৎ সফর মাসের মাত্র এক রাত্র বাকী রহিয়াছে। এই সময় হযরত (সঃ) রোগাক্রান্ত হইলেন। এই রাত্রটি বুধবার গণ্য। কারণ ইসলামী হিসাবে রাত উহার পরবর্তী দিনের অংশ বলিয়া গণ্য হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত "আখেরী চাহার শোম্বা" তথা সফর মাসের শেষ বুধবারের বৈশিষ্ট্যের সূত্র ইহাই যে, এই বুধবারেই হযরতের অন্তিম রোগ হইয়াছিল। রোগাক্রান্তির বরা ত বুধবার ছিল, কিন্তু তাহা কোন তারিখ ছিল সেই সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। সফর মাসের শেষ রাত্র হওয়া সম্পর্কেও একটি মত্

রোগের প্রথম প্রকাশ

"জান্নাতুল বাকী" গোরস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া নবীজী (সঃ) পীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে আসিয়া নবীজী (সঃ) শুনিতে পাইলেন– আয়েশা (রাঃ) মাথার ব্যথায় কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছেন– উঃ! মাথা গেল! তখন নবীজী (সঃ) বিবি আয়েশার সহিত কৌতুক করিয়া বলিলেন, তোমার ত্রাসের কি কারণ? আমার সম্মুখে তোমার মৃত্যু হইলে ত তোমার বড় সৌভাগ্য। আমার হাতে তোমার কাফন দাফন ইত্যাদি সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন হইবে এবং আমি তোমার জানাযা পড়াইয়া কবরে শোয়াইয়া দিব– এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে! আয়েশা (রাঃ) তদুত্তরে রাগত স্বরে ঠেস মারিয়া বলিলেন, মনে হয় আপনার কামনা– আমি মরিয়া যাই আর আপনি একজন নতুন বিবি আনিয়া আমার ঘরে নতুন সংসার পাতেন! এই সময় নবী (সঃ) বিবি আয়েশার এই স্নিগ্ধ বিদ্রূপ স্মিত হাস্যে উপভোগ করিয়া নিজের অসুস্থতার কথা প্রকাশপূর্বক বলিলেন, তোমার মাথা কি গেল? বরং আমার মাথা গেল! (বেদায়া, ৪–২২)

নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই তথ্যের উল্লেখ আছে।

১৭২১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৪৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মাথা ব্যথায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলাম, হায় মাথা! আমার হায়-হুতাশ শুনিয়া নবী (সঃ) বলিলেন, তোমার চিন্তা কি? আমি জীবিত থাকাবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হইয়াই যায় তবে আমি তোমার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট মাগফেরাত কামনা ও দোয়া করিব।

আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হায়! আমার পোড়া কপাল মনে হয় আপনি আমার মৃত্যু কামনা করেন! তাহা হইলে ত সেই দিনের শেষ ভাগে (আমার গৃহে) অন্য স্ত্রীর সঙ্গে আপনি রাত্রি যাপন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

এতদশ্রবণে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (মৃদু হাসি হাসিলেন এবং) বলিলেন, (তোমার মাথায় কি ব্যথা? তাহাতে কিছুই নহে, বরং আমার মাথায় সাংঘাতিক ব্যথা; আমি বলিতে পারি– হায় মাথা! (ইহা হইতেই হযরতের অন্তিম রোগ আরম্ভ।)*

নবীজী (সঃ)-এর অন্তিম রোগ

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তিম রোগের আরম্ভ ছিল মাথা ব্যথা; অচিরেই ইহার সহিত ভীষণ জ্বরও মিলিত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইলাম; তখন নবীজী ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। আমি তাঁহার গায়ে হাত রাখিয়া বলিলাম, আপনার জ্বর ত অতি মাত্রায়! নবীজী (সঃ) বলিলেন, হাঁ– তোমাদের সাধারণ লোকের দুই জনের সমপরিমাণ জ্বর আমার আসে। আমি আরজ করিলাম, ইহা কি এই কারণে যে, আপনার সওয়াবও দ্বিগুণ? নবী (সঃ) বলিলেন, হাঁ। তিনি শপথ করিয়া আরও বলিলেন, যেকোন মুসলমানের পীড়া বা অন্য কোন কষ্ট হইলে তাহার গোনাহ এইরূপে ঝরিয়া যায় যেরূপ গাছের শুষ্ক পাতা ঝরিয়া যায়। (বেদায়া, ৪–৪৩৭)

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ঐ সময়) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গায়ে কম্বল দেওয়া ছিল। জ্বর এরূপ ভীষণ ছিল যে, ঐ কম্বলের উপর হাত রাখিলে জ্বরের তাপ অনুভূত হইত। (যোরকানী, ৮–২০৯)

আছে, (মজমুয়া ফতওয়া মালানা আবদুল হাই, ২–২৩৯ দ্রষ্টব্য।) আমরা এই মতকে অগ্রগণ্য ধরিয়াছি। কারণ, এই বুধবার ৩০ তারিখ হইলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দিন সোমবার রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ হইতে পারে, যাহা অতি প্রসিদ্ধ। এই সম্পর্কে একটি জটিল প্রশ্ন আছে, তাহার মীমাংসা "শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দিন" বর্ণনাস্থলে উল্লেখ করা হইবে।

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয়গুলি মেশকাত শরীফ ৫৪৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

নবীজী (সঃ)-এর শেষ অবস্থান

রোগ অবস্থায়ও নবীজী (সঃ) তাঁহার ন্যায় নীতি আদর্শের উপর দৃঢ় ছিলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি বিবিগণের জন্য নির্ধারিত তারিখে এক এক বিবির গৃহে অবস্থান করিয়া যাইতেছিলেন। অবশেষে যখন পীড়ার যাতনা বাড়িয়া গেল এবং এই ব্যবস্থা চালাইয়া যাওয়ার ক্ষমতা ঘনাইয়া আসিল, তখন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ জন্মিল। এই গৃহই সর্বাধিক ওহী অবতরণের ক্ষেত্র এবং বিধাতা কর্তৃক তাঁহার শেষ শয্যার স্থানরূপে নির্ধারিত ছিল। এই গৃহে আসিবার দিন ছিল সোমবার দিন; সোমবার দিনের পূর্ব হইতেই নবীজী (সঃ) এই গৃহের প্রতি স্বীয় আকর্ষণ ও অপেক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই তথ্যের বিবরণ রহিয়াছে।

১৭২২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪০) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রতিদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতেন, আগামীকল্য আমি কোন্ স্ত্রীর গৃহে থাকিব? এই জিজ্ঞাসা দ্বারা তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে থাকিবার দিনের প্রতি অপেক্ষা প্রকাশ করিতেছিলেন। অন্য বিবিগণ (ইহা বুঝিতে পাইয়া) সন্তুষ্ট চিত্তে নবী (সঃ)-কে যাহার গৃহে ইচ্ছা অবস্থান করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সেমতে হযরত (সঃ) আয়েশার গৃহে অবস্থান করিলেন, এমনকি এই গৃহেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ সোমবার দিন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে অবস্থানের দিন; এই দিন হযরত (সঃ) আয়েশার গৃহে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অসুস্থ অবস্থায় এই গৃহেই পরবর্তী সোমবারে ইহজগত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই সময় একদা হযরত (সঃ) বলিলেন, আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, আবু বকর ও তাহার পুত্রকে ডাকিয়া আনিয়া (আবু বকরকে আমার স্থলাভিষিক্তরূপে) মনোনীত করিয়া দেই, যেন অন্য কাহারও কিছু বলার বা আশা করার অবকাশ না থাকে, কিন্তু পরে ভাবিলাম, (আমার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মনোনয়ন) একমাত্র আবু বকর ছাড়া অন্য কাহারও জন্য আল্লাহ তাআলাও হইতে দিবেন না, মুসলমানগণ গ্রহণ করিবে না।

পরকালীন জেন্দেগীকে প্রাধান্য দান

নবীগণের কর্তব্য পূর্ণ হওয়ার পর তাঁহাদের সম্মানার্থ মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাঁহাদিগকে অধিকার দেওয়া হইত যে, ইচ্ছা করিলে দুনিয়ার দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে পারেন অথবা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রস্তুত নেয়ামতসমূহ উপভোগেও চলিয়া আসিতে পারেন।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকেও সেই অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। হযরত (সঃ) আখেরাতকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। রোগ শয্যায় শায়িত হওয়ার কয়েক দিন পর স্বয়ং হযরত (সঃ) এই বিষয়টি সর্বসমক্ষে প্রকাশও করিয়া দিয়াছিলেন।

১৭২৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫১৬) আবু সায়ী'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সর্ব সাধারণ সমক্ষে ভাষণ দান করিলেন তিনি বলিলেন। আল্লাহ তাআলা এক বান্দাকে দুনিয়ার জেন্দেগী উপভোগ কিম্বা তাঁহার নিকট সুরক্ষিত নেয়ামত উপভোগ– উভয়ের কোন একটা গ্রহণ করার এখতিয়ার দিয়াছেন; সে আল্লাহর নিকট সুরক্ষিত নেয়ামত উপভোগকেই অবলম্বন করিয়াছে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, এতদশ্রবণে আবু বকর (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমাদের মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ হউক! আমরা তাঁহার ক্রন্দনে আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন এক বান্দা সম্পর্কে একটি তথ্য প্রকাশ করিলেন আর এই বৃদ্ধ কাঁদিতেছেন! প্রকৃত প্রস্তাবে সেই

বান্দা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ)-ই ছিলেন (আমরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম না, আবু বকর (রাঃ) বুঝিতে পারিয়াছিলেন)। আবু বকর (রাঃ) আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন।

(আবু বকরের ক্রন্দন হযরত (সঃ)-কে বিশেষরূপে অভিভূত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, তাই) হযরত (সঃ) তাঁহাকে ক্রন্দন হইতে বারণ করিতেছিলেন এবং) বলিলেন, জান-মাল উভয় দ্বারা আমার প্রতি সর্বাধিক উপকারী ব্যক্তি হইল আবু বকর (রাঃ)। আমি যদি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ব্যতীত অন্য কাহাকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইতাম তবে আবু বকর (রাঃ)-কে নিশ্চয়ই সেই স্থান দান করিতাম। অবশ্য তাহার জন্য ইসলামীভ্রাতৃত্ব সেই সূত্রের দোস্তি মহব্বত পূর্ণরূপে রহিয়াছে।

হযরত (সঃ) (আবু বকরের বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনস্বরূপ) এই নির্দেশও দান করিলেন যে, নিজ নিজ বাড়ী হইতে (আমার) মসজিদের দেয়ালে যতগুলি দরজা খোলা হইয়াছে তন্মধ্যে শুধু আবু বকরের দরজা বাকী রাখিয়া অন্যান্য সমুদয় দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের চারি দিন পূর্বে

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন বুধবার এবং দীর্ঘ তের দিন* রোগ শয্যায় থাকিয়া সোমবার দিন ইহাজগত ত্যাগ করিয়াছিলেন– সেই সোমবারের পূর্বের বৃহস্পতিবার দিন হইতে রোগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এমতাবস্থায় দিনের প্রথমার্ধে হযরত (সঃ) মুসলমানদের মঙ্গলার্থ একটি লিপি লিখিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিয়া কাগজ-কলম চাহিলেন। কিন্তু হযরত (সঃ) রোগ যাতনার ভীষণ চাপে থাকিয়া আবার লিপি লেখাইবার কষ্ট করিবেন তাহা কোন কোন ছাহাবীর পক্ষে অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা কাগজ কলম আনিয়া দিয়া হযরতের কষ্ট-ক্লেশ বর্ধিত করিতে বাধা দান করিলেন। অবশেষে হযরত (সঃ)-ও স্বীয় ইচ্ছা হইতে বিরত রহিলেন এবং মতভেদ করিতে যাইয়া সাহাবীগণের মধ্যে কিছুটা গণ্ডগোল সৃষ্টি হইলে হযরত (সঃ) সকলকে তথা হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ঘটনার বিবরণ **১ম** খণ্ডে ৯০ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত ঘটনার পর যোহরের নামাযের ওয়াক্তে হযরত (সঃ) বিশেষ কায়দায় গোসল করতঃ ব্যথার দরুন মাথায় পট্টি বাঁধিয়া মসজিদে তশরীফ আনিলেন এবং নামাযান্তে একটি ভাষণ দান করিলেন– ইহাই ছিল তাঁহার কর্মময় জীবনের সর্বশেষ ভাষণ। (সীরাতে মোস্তফা, ৭–১৯৭)

১৭২৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৯) উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়া থাকিতেন, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগ শয্যায় আমার গৃহে আসিবার পর তাঁহার রোগ যাতনা বৃদ্ধি পাইলে পর তিনি বলিলেন, সাত মশক পানি, যাহার মুখ বন্ধই রহিয়াছে, এখনও খোলা হয় নাই– আমার উপর ঢালিয়া (গোসল করাইয়া) দাও। লোকদিগকে একটি বিশেষ কথা জানাইতে চাহিতেছি– সেই কার্যে যেন আমি সক্ষম হই।

সেমতে আমরা হযরত (সঃ)-কে একটি বড় টবের মধ্যে বসাইলাম এবং তাঁহার গায়ে ঐরূপ মশকের পানি ঢালিতে লাগিলাম। হযরত (সঃ) যখন বলিলেন, তোমরা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছ, তখনই আমরা ক্ষান্ত হইলাম। অতপর হযরত (সঃ) আব্বাস (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এই দুই জনের কাঁধে ভর করতঃ (ঘর হইতে) বাহির হইয়া (মজিদে) লোকদের সম্মুখে আসিলেন এবং নামায পড়াইয়া ভাষণ দিলেন। (এই ভাষণের উল্লেখ প্রথম খণ্ড ৬৯১ নং হাদীছে আছে।)

এই ভাষেণেই হযরত (সঃ) স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করণার্থ ইহাও বলিয়াছেন যে, ইহুদী-নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক; তাহারা তাহাদের নবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কবরকে সেজদা করিয়া থাকিত।

১৭২৫। হাদছি ঃ (পৃঃ ৬৩৯) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْلَا ذَاكَ لَاُبْرِزَ قَبْرُهٗ خَشِىَ اَنْ يُّتَّخَذَ مَسْجِدًا

* এইসব নির্ধারণ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে।

অর্থ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অন্তিম শয্যায়, যেই রোগ শয্যা হইতে আর সারিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেই অবস্থায় বলিয়াছিলেন, (আল্লাহ ধ্বংস করুন *) আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক ইহুদী-নাসরাদের উপর; তাহারা তাহাদের নবীগণের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল (নবীগণের কবরকে সেজদা করিত)।

আয়েশা (রাঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি এইরূপ গর্হিত কার্যের রীতি পূর্ব হইতে না থাকিত তবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কবর শরীফ উন্মুক্ত রাখা হইত কিন্তু এস্থলেও আশঙ্কা করা হইয়াছে যে, ইহাকেও সেজদার স্থান বানান হয় না কি! (তাই গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীছটি অতি প্রয়োজনীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। হাদীছখানা ইমাম বোখারী (রঃ) মূল গ্রন্থে পাঁচ স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)ও এই বিষয়টি সম্পর্কে সতর্কীকরণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন, এমনকি ইহা তিনি তাঁহার কর্মময় জীবনের সর্বশেষ ভাষণে উল্লেখ করিয়াছেন, বরং ইহার উপরও তিনি ক্ষান্ত হন নাই। জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তে যখন স্বীয় পবিত্র আত্মাকে সৃষ্টিকর্তার হাওয়ালা করিয়াছিলেন তখনও পুনঃ পুনঃ এই সতর্ক বাণীই উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম খণ্ড ২৭৮ হাদীছ দ্রষ্টব্য।

বক্ষ্যমাণ হাদীছখানা মুসলিম শরীফে অতিরিক্ত একটি শব্দের সহিত বর্ণিত আছে, যাহা অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। হযরত (সঃ) সর্বশেষ এই ভাষণে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন–

الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياءهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انى انهاكم عن ذالك ـ

অর্থ ঃ "তোমরা সতর্ক থাকিও! তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাহাদের নবী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়া থাকিত। খবরদার! তোমরা কখনও কোন কবরকে সেজদার স্থান বানাইও না। নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে ঐরূপ কার্য হইতে নিষেধ করিতেছি।"

উক্ত ভাষণে হযরত (সঃ) মদীনাবাসী ছাহাবী আনসারগণ সম্পর্কে একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তিও উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার বিবরণ নিম্নের হাদীছদ্বয়ে রহিয়াছে।

১৭২৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫৩৬) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তিম শয্যায়) একদা আবু বকর (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ) আনসারদের এক মজলিসের নিকটবর্তী পথে যাইতেছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, আনসারগণ তথায় বসিয়া কাঁদিতেছেন।

আবু বকর ও আব্বাস (রাঃ) তাঁহাদিগকে কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আনসারগণ বলিলেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারের কথা স্মরণে কাঁদিতেছি। আবু বকর ও আব্বাস (রাঃ) এই সংবাদ নবী (সঃ)-কে জানাইলেন।

আনাছ (রাঃ) বলেন, অতপর নবী (সঃ) (রুগ্ন অবস্থায় অসহনীয় ব্যথার দরুন) মাথায় কাপড় পট্টি বাঁধিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইলেন এবং মসজিদে মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হইলেন। মিম্বরের উপর ইহাই ছিল তাঁহার সর্বশেষ আরোহণ। অতপর আর তিনি মিম্বরে আরোহণ করিতে পারেন নাই। মিম্বরে বসিয়া পূর্ণাঙ্গী ভাষণ দানার্থ প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করিলেন, অতপর আনসারদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন–

أُوْصِيْكُمْ بِالْاَنْصَارِ فَاِنَّهُمْ كَرِشِيْ وَعَيْبَتِيْ وَقَدْ قَضَوْا الَّذِيْ عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِيْ لَهُمْ فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ ـ

---

* বোখারী শরীফ ৬২ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে এই শব্দ রহিয়াছে।

অর্থ ঃ "হে লোকসকল! আমি তোমাদিগকে আনসার– মদীনাবাসী ছাহাবীগণের পক্ষে বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি; তাঁহারা আমার ভিতর-বাহিরের বন্ধু। তাঁহারা নিজেদের কর্তব্য (যে সম্পর্কে আ'কাবা সম্মেলনে ওয়াদা করিয়াছিলেন) পূর্ণ মাত্রায় আদায় করিয়াছেন। তাঁহাদের তোমাদের নিকট সেই প্রাপ্য বাকী রাহিয়াছে। অতএব তাঁহাদের সুব্যবহার বিশেষ আদর-কদরের সহিত গ্রহণ করিও এবং অরুচির ব্যবহার দেখিলে তাহা হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া যাইও।

১৭২৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ২২৭) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (অন্তিম শয্যায়) একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করিলেন। একখানা চাদর তাঁহার গায়ে উভয় স্কন্ধ সমেত জড়ান ছিল এবং মাথায় তৈলে তৈলাক্ত একখানা রুমাল, যাহা তিনি পাগড়ীর নীচে ব্যবহার করিয়া থাকিতেন, তাহা দ্বারা মাথায় পট্টি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ইহাই ছিল মিম্বরের উপর তাঁহার সর্বশেষ আরোহণ।

হযরত (সঃ) মিম্বরে উপবিষ্ট হইয়া আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল! আমার নিকটে আসিয়া যাও। সেমতে সকলেই তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিলেন। অতপর হযরত (সঃ) বলিলেন–

فَانَّ هٰذَا الْحَىَّ مِنَ الاَنْصَارِ يَقِلُّوْنَ وَيَكْثَرُ النَّاسَ فَمَنْ وَلِىَ شَيْئًا مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ فَاسْتَطَاعَ اَن يَّضُرَّ فِيْهِ اَحَدًا اَوْ يَنْفَعَ فِيْهِ اَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ -

অর্থ ঃ "আনসারগণের" বংশধর ধীরে ধীরে সংখ্যালঘুতে পরিণত হইয়া যাইবে, অন্যান্য লোকগণ সংখ্যাগুরু হইয়া দাঁড়াইবে। তোমাদের যে কেহ মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতে কোন ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং লোকদের লাভ-লোকসানে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবে, তাহার কর্তব্য হইবে আনসারদের সুব্যবহার আদর-কদরের সহিত গ্রহণ করা এবং তাঁহাদের কোন অরুচির ব্যবহার দেখিতে পাইলে তাহা হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলা।

এই ভাষণে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও আদেশ করিয়াছেন–

১৭২৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৪২৯) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মৃত্যুকালে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করিয়া গিয়াছেন।

(১) সমস্ত মোশরেক– পৌত্তলিকদেরকে আরব উপদ্বীপের সীমানা হইতে বাহির করিয়া দিবে।

(২) বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দকে ঐরূপে উপহার দিবে যেরূপ আমি দিয়া থাকিতাম।

(৩) পবিত্র কোরআন বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাকারী ভুলিয়া গিয়াছেন।

রোগ শয্যায় শায়িত হইয়াও হযরত (সঃ) প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে মসজিদে তশরীফ আনিতেন এবং ইমামতিও করিতেন। বৃহস্পতিবার রোগ আক্রমণ বৃদ্ধি পাইবার পর এই দিনের মাগরিবের নামাযই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক ইমামতির সর্বশেষ নামায। সূরা "ওয়াল-মোরসালাত" দ্বারা তিনি এই নামায পড়াইয়াছিলেন। ১ম খণ্ডে ৪৪৪ নং হাদীছে এই তথ্যটি বর্ণিত হইয়াছে।

এই দিনে মাগরিবের নামাযের পর হযরতের রোগ-যাতনা চরমে পৌঁছিয়া গেল। এমতাবস্থায় এশার নামাযের ওয়াক্ত হইল। হযরত (সঃ) বার বার ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলেন নামাযের জন্য মসজিদে যাইবার, কিন্তু যত বারই তিনি শয্যা হইতে উঠিতে উদ্যত হইলেন প্রতিবারই মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। অবশেষে আবু বকর (রাঃ)-কে ইমাম হইয়া নামায পড়াইবার আদেশ করিলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ৩–১৯৯)

১৭২৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (বৃহস্পতিবার এশার সময়ে) তাঁহার রোগ যাতনা বৃদ্ধি অবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলেন اصلى الناس "লোকগণ নামায পড়িয়া ফেলিয়াছে কি? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, لا يارسول الله وهم ينتظرونك না- হুজুর! তাহারা এখনও নামায পড়ে নাই; আপনার উপস্থিতির অপেক্ষা করিতেছে।" তখন হযরত (সঃ) বলিলেন- ضعوا لى ماء فى المخضب "আমার জন্য টবের মধ্যে পানি ঢাল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তাহাই করা হইল এবং হযরত (সঃ) ঐ পানিতে গোসল করিলেন। অতপর হযরত (সঃ) উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিলেন না- মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। তারপর চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকগণ নামায পড়িয়া ফেলিয়াছে কি? সকলেই উত্তর করিল, না-- হুযুর! তাহারা আপনার উপস্থিতির অপেক্ষায় আছে। হযরত (সঃ) পুনরায় টবের মধ্যে পানি ঢালিতে আদেশ করিলেন এবং উহাতে গোসল করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এইবারও মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। এইবারও হযরতের চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে হযরত (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকগণ নামায পড়িয়া ফেলিয়াছে কি? সকলেই উত্তর করিল, না- হুজুর! তাহারা আপনার অপেক্ষায় আছে। হযরত (সঃ) তৃতীয় বার টবের মধ্যে পানি ঢালিবার আদেশ করিলেন এবং গোসল করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এইবারও মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। লোকজন তখনও এশার নামাযের জন্য হযরতের অপেক্ষায় মসজিদে সমবেত হইয়া আছে।*

অতপর হযরত (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট (বেলাল (রাঃ) মারফত) সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি যেন লোকদের নামায পড়াইয়া দেন। সংবাদদানে প্রেরিত লোকটি আবু বকরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে লোকদের নামায পড়াইয়া দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

আবু বকর (রাঃ) অতিশয় নরম দিল মানুষ ছিলেন। (রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগাক্রান্ত হওয়ার শোক বিহবল অবস্থায় তাঁহারই স্থানে দাঁড়াইয়া নামায পড়াইবেন ইহা আবু বকরের পক্ষে সম্ভব হইবে না বিধায়) তিনি ওমর (রাঃ)-কে বলিলেন, আপনি লোকদের নামায পড়াইয়া দিন। ওমর (রাঃ) অস্বীকার করিয়া বলিলেন, আপনিই এই কার্যের জন্য অধিক যোগ্য। সেমতে আবু বকর (রাঃ) (ঐ নামায এবং আরও) কতিপয় দিনের নামায পড়াইলেন।

১৭৩০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৯) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রোগ যাতনা বৃদ্ধি পাইলে একদা বেলাল (রাঃ) আসিয়া তাঁহাকে নামাযের ওয়াক্তের উপস্থিতি জ্ঞাত করিলেন। সেই অবস্থায় হযরত (সঃ) বলিলেন- লোকদের নামায পড়াইয়া দিবার জন্য আবু বকরকে বল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তখন আরজ করিলাম, আবু বকর (নরম দিলের মানুষ; তিনি) আপনার স্থানে যখন দাঁড়াইবেন তখন আর ক্রন্দনের দরুন নামাযের কেরাত শুনাইতে সক্ষম হইবেন না, সুতরাং আপনি ওমরকে আদেশ করুন তিনি যেন লোকদিগকে নামায পড়াইয়া দেন। হযরত (সঃ) পুনরায় বলিলেন, আবু বকরকে বল লোকদের নামায পড়াইয়া দিতে।

---

* ইহা হযরতের মৃত্যুর সোমবার দিনের পূর্বে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রের এশার সময়ের ঘটনা। এই বৃহস্পতিবার দিন যোহরের নামাযের সময়ও হযরত (সঃ) টবের মধ্যে গোসল করিয়াছিলেন এবং উক্ত গোসলে কিছুটা স্বস্তিবোধ করিয়া দুই জনের কাঁধে ভর করতঃ মসজিদে যাইয়া যোহরের নামাযে ইমামতি করিয়াছেন;এবং সর্বশেষ ভাষণ দান করিয়াছেন- যাহার বিবরণ ১৭২৪নং হাদীছে আছে। এই বৃহস্পতিবার দিনের পর রাত্রে এশার নামাযের পূর্বেও হযরত মসজিদে যাওয়ার সক্ষমতা লাভের আশায় পুনঃ পুন ঃ গোসল করিয়াছিলেন; কিন্তু এইবার গোসলের দ্বারা স্বস্তি আসে নাই এবং মসজিদে যাইতেও সক্ষম হন নাই।

আলোচ্য হাদীছে তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। এই এশার ওয়াক্ত হইতেই আবুব বকর (রাঃ)-এর ইমামতি আরম্ভ হয় এবং পর দিন শুক্রবারের পাঁচ ওয়াক্ত তার পর দিন শনিবারের ফজর কিম্বা তার পর দিন রবি বারের ফজর পর্যন্ত আবু বকরের ইমামতি চলিতে থাকে। সেই শনি বা রবিবার দিন যোহরের নামাযের ওয়াক্তে নবী (সঃ) কিছুটা স্বস্তিবোধ করিয়া দুই জনের কাঁধে ভর করিয়া মসজিদে যান এবং আবু বকর (রাঃ)-কে মোকাব্বের রাখিয়া জোহর নামাযের ইমামতি করেন- যাহার বয়ান ১৭৩১ নং হাদীছে রহিয়াছে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তখন আমি (ওমরের কন্যা উম্মুল মোমেনীন) হাফসাকে বলিলাম, আপনি যাইয়া হযরতের নিকট বলুন, আবু বকর আপনার স্থানে দাঁড়াইলে ক্রন্দনের দরুন লোকদিগকে কেরাত শুনাইতে সক্ষম হইবেন না। অতএব আপনি ওমরকে আদেশ করুন, তিনি যেন লোকদের নামায পড়াইয়া দেন। হাফসা (রাঃ) হযরত (সঃ)-কে ঐরূপ বলিলেন! (এইরূপে তিন-চারি বার হযরতের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করা হইলে অবশেষে বিরক্ত হইয়া) রসূলুল্লাহ (সঃ) (রাগতঃ স্বরে) বলিলেন, তোমাদের অবস্থা ঐ নারীদের ন্যায়, যাহারা ইউসুফ (রাঃ)-কে তাঁহার অভিরুচির বিপরীত বিবি জোলায়খার অভিপ্রায়ের কাজ করিতে বলিতেছিল। (তোমাদের অপচেষ্টা ত্যাগ কর) আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইয়া দিতে বল।

হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বলিলেন, আপনার পরামর্শে কোন কাজ করিয়া কখনও আমি ভাল ফল লাভ করিতে পারি নাই।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের এক বা দুই দিন পূর্বে

রোগ যাতনা বৃদ্ধির দরুন উপরোল্লিখিত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে এশার নামায হইতে আবু বকর (রাঃ) দ্বারা ইমামতির কার্য চালাইবার ব্যবস্থা স্বয়ং হযরত (সঃ) করিয়াছিলেন। সেমতে আবু বকর (রাঃ) প্রতি ওয়াক্তে ইমামতি করিয়া যাইতে লাগিলেন, হযরত (সঃ) মসজিদে তশরীফ আনিতে পারিতেছিলেন না।

পরবর্তী শনিবার বা রবিবার দিন যোহরের নামাযের সময় আবু বকর (রাঃ) ইমাম হইয়া নামায আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন; এমতাবস্থায় হযরত (সঃ) কিছুটা স্বস্তিবোধ করিলেন। তৎক্ষণাত আলী (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ)-কে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের উভয়ের কাঁধে ভর করতঃ হযরত (সঃ) মসজিদে তশরীফ আনিলেন এবং ইমাম আবু বকরের বাম পার্শ্বে বসিয়া নামাযের ইমামতি করিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁহার পক্ষে মোকাব্বেরের কার্য চালাইলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ৩-২০১)

(নামায আরম্ভ হওয়ার পর এই ব্যবস্থা একমাত্র হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পক্ষে জায়েয ছিল, অন্য কাহারও পক্ষ সিদ্ধ নহে।)

১৭৩১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৪) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম রোগ যাতনা বৃদ্ধিকালে আবু বকরকে নামায পড়াইবার আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। অতপর (একদা) হযরত (সঃ) কিছুটা স্বস্তিবোধ করিলেন* এবং স্বীয় কক্ষ হইতে বাহির হইয়া মসজিদে আসিলেন, তখন আবু বকর (রাঃ) ইমাম হইয়া লোকদের নামায পড়াইতে ছিলেন। হযরতের প্রতি আবু বকরের দৃষ্টিকোণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর (রাঃ) ইমামতির স্থান হইতে পিছনে চলিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। অতপর হযরত (সঃ) আবু বকরের বরাবরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তখন (মূল ইমাম হযরত (সঃ) হইলেন) আবু বকর প্রত্যক্ষ্যরূপে হযরতের একতেদা করিতেছিলেন, আর অন্যান্য লোকগণ আবু বকরের অনুসরণ করিয়া যাইতেছিল।

এই সময়ের আর একটি ঘটনা ঃ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে দিন রবিবার (সীরাতে মোস্তফা, ৩-২০২) এই ঘটনা ঘটিল যে, সকাল বেলা হযরতের রোগকে নিউমোনিয়া সাব্যস্ত করিয়া উহার জন্য কোন পানীয় ঔষধ তাঁহার মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইল। হযরত (সঃ) ঐরূপ করিতে নিষেধ করিতেছিলেন, কিন্তু

---

* মানুষের অন্তিম রোগ সাধারণতঃ প্রকট হইয়া উঠার পর কিছুটা স্বস্তির ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তারপর হঠাৎ ঐ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া চরম অবনতি দ্রুত আসিয়া যায় এবং অনতিবিলম্বে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। হযরতের এই স্বস্তিবোধও এই শ্রেণীরই ছিল। বৃহস্পতিবার হইতে রোগ যাতনা প্রকট হওয়ার পর শনিবার বরং খুব সম্ভব রবিবার দুপুরে এই স্বস্তিবোধ পরিলক্ষিত হইল এবং রাত্রিও এই স্বস্তিবোধেই অতিবাহিত হইল। পরবর্তী দিন সোমবার ভোর বেলা ত ঐ স্বস্তিবোধ অধিক দৃষ্ট হইল, এমনকি আবু বকর (রাঃ)-সহ অনেকে নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই দ্রুত অবস্থার চরম অবনতি ঘটিল এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হযরত (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ভক্তগণ উক্ত নিষেধাজ্ঞাকে ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিতৃষ্ণা মনে করিয়া হযরতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঔষধ তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিল। হযরত (সঃ) তাহাদের এই কার্যের শাস্তি দিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৭৩২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪১) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম রোগ যাতনায় চৈতন্যহীনের ন্যায় হইয়া পড়িলেন,) আমরা তাঁহার মুখে (নিউমোনিয়ার) ঔষধ ঢালিয়া দিতে উদ্যত হইলাম। তিনি ইশারা দ্বারা ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। আমরা মনে করিলাম, ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিতৃষ্ণার দরুন এই নিষেধাজ্ঞা; তাই আমরা বারণ রহিলাম না। অতপর হযরতের পূর্ণ চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে পর তিনি বলিলেন, মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিতে আমি নিষেধ করিয়াছিলাম নহে কি? আমরা আরজ করিলাম, তাহা ত ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিতৃষ্ণা। হযরত (সঃ) বলিলেন, গৃহে উপস্থিত প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢালিয়া দাও– আমার সম্মুখে ঐরূপ কর, আমি যেন তাহা দেখিতে পাই। অবশ্য আব্বাসকে রেহাই দিও, কারণ তিনি ঐ সময় গৃহে উপস্থিত ছিলেন না।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর ওলীদের সঙ্গে ব্যথাদায়ক ও উত্যক্তজনক কোন ব্যবহার করা হইলে সেখানে আল্লাহর তরফ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের আশঙ্কা দেখা দেয়, এমনকি ঐরূপ ব্যবহার না বুঝিয়া ভুলবশতঃ করা হইলেও তাহার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য অনেক সময় আল্লাহর ওলীদের সাধারণ স্বভাব উদারতার বিপরীতে তাঁহাদের দ্বারা ঐরূপ স্থলে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। বস্তুতঃ ইহা সাধারণ লোকদের পক্ষে অতিশয় কল্যাণজনক ব্যবস্থা। কারণ ওলী যদি স্বয়ং প্রতিশোধ গ্রহণ না করিতেন তবে হযত আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাহা গ্রহণ করা হইত; আর আল্লাহর তরফ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ সামান্য পরিমাণের হইলেও বস্তুতঃ তাহা হইবে অতিশয় কঠোর ও কঠিন। তাই ওলীগণ এইরূপ স্থলে দয়াপরবশ হইয়া মানুষকে আল্লাহর প্রতিশোধ গ্রহণ হইতে রক্ষা করার উদ্দেশে দ্রুত নিজেরাই প্রতিশোধ লইয়া থাকেন।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে এস্থলে ছাহাবীগণ ঐ ধরনের ব্যবহারই করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভুল বুঝিয়া হযরতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিলেন, যদ্দরুন হযরত রাগান্বিত এবং বিরক্ত হইয়াছিলেন। হযরতকে উত্যক্ত করার প্রতিশোধ আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে লওয়া হইলে তাহা হইত ভয়ঙ্কর, তাই হযরত (সঃ) ছাহাবীদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া দ্রুত নিজেই প্রতিশোধ নিয়াছিলেন।

হযরত (সঃ)-কে যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তাহা ছিল "উদে হিন্দী"– কুড়চি বা গিরিমল্লিকা গাছের কাষ্ঠ ও যাইতুন তৈল। এই বস্তুদ্বয় সাধারণভাবে কাহারও পক্ষে ক্ষতিকারক নহে, তাই প্রতিশোধ গ্রহণে ঐ বস্তুই সকলের মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইল। উম্মুল মোমেনীন মায়মুনা (রাঃ)ও ঐ লোকদের একজন ছিলেন, তিনি রোযা রাখিয়াছিলেন, তাঁহার নফল রোযা ভঙ্গ করাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইয়াছিল।

এই রবিবার দিনই হযরত (সঃ) ঐতিহাসিক ওসামা বাহিনীকে রোমের দিকে প্রেরণ করতঃ বিদায় দান করিয়াছিলেন। যাহার বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খণ্ডে বর্ণিত হয়িয়াছে।

কন্যা ফাতেমার সহিত গোপন আলাপ

১৭৩৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫১২) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (হযরতের অন্তিমকালে তাঁহার বিবিগণ সকলেই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন, এমতাবস্থায়) ফাতেমা (রাঃ) হযরতের নিকট আসিলেন। ফাতেমার চাল-চলন হুবহু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চাল-চলনের ন্যায় ছিল।

ফাতেমা নিকট আসিলে পর নবী (সঃ) তাঁহাকে মারহাবা বলিলেন এবং শয্যাপার্শ্বে বসাইয়া চুপি চুপি কিছু বলিলেন; ফাতেমা ফোঁফাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

আমি মনে মনে ভাবিলাম, ফাতেমা কাঁদে কেন? অতপর চুপি চুপি তাঁহাকে কিছু বলিলেন; তাহাতে ফাতেমা হাসিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম, হাসি-কান্না উভয়ের এইরূপ সম্মিলন আর কোন দিন দেখি নাই। আমি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত (সঃ) কি বলিয়াছেন? ফাতেমা বলিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যে কথা গোপনে বলিয়াছেন তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারি না।

তারপর হযরত (সঃ) ইহজগত ত্যাগ করিয়া গেলে পর ফাতেমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ফাতেমা বলিলেন, প্রথম বারে হযরত (সঃ) বলিয়াছিলেন যে, প্রতি বৎসর জিব্রাঈল (আঃ) আমার সঙ্গে একবার কোরআন শরীফ দওর করিয়া থাকিতেন, এই বৎসর দুই বার দওর করিয়াছেন; মনে হয় আমার অন্তিমকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে। (আমি এই রোগেই ইহজগত ত্যাগ করিব) এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্যে তুমিই সর্বাগ্রে আমার সঙ্গে মিলিত হইবে (আমার পরে সর্বাগ্রে তোমারই মৃত্যু ইহবে)।

(ফাতেমা (রাঃ) বলেন, হযরতের মৃত্যু নিকটবর্তী) ইহা শুনিয়া আমি কাঁদিয়াছি। তখন হযরত (সঃ) আমাকে বলিয়াছেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি বেহেশতবাসী মেয়েদের সর্দার হইবে? এই সুসংবাদ শুনিয়া হাসিয়াছি।

১৭৩৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৮) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অন্তিম শয্যায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে চুপি চুপি কিছু বলিলেন, তাহাতে ফাতেমা কাঁদিয়া উঠিলেন। পুনরায় চুপি চুপি কিছু বলিলেন, তাহাতে তিনি হাসিলেন।

আমরা ফাতেমাকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানাইয়াছেন যে, প্রথম বারে হযরত (সঃ) বলিয়াছিলেন, তিনি এই রোগেই ইহজগত ত্যাগ করিবেন; তাই আমি তখন কাঁদিয়াছিলাম। আর দ্বিতীয় বারে বলিয়াছিলেন, (তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ বেশী দিনের নহে,) তুমি আমার পরিজনের মধ্য হইতে সর্বাগ্রেই আমার সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবে; এই সংবাদে আমি হাসিয়াছি।

শাহাদতের মর্তবা লাভ

মাথা ব্যথা ও জ্বরই ছিল হযরতের অন্তিম শয্যার সূচনা এবং মূল পীড়া। কিন্তু পরে উহার সঙ্গে আরও একটি পুরাতন উপসর্গ যোগ হইয়া গিয়াছিল। বহু দিন পূর্বে একবার ইহুদীগণ হযরত (সঃ)-কে খাদ্যের সঙ্গে বিষ দিয়াছিল; যাহার বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খণ্ড খায়বর যুদ্ধের পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তাআলার কুদরতে এত দিন হযরতের উপর সেই বিষের পূর্ণ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল না; কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে উক্ত বিষের ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। যেহেতু এই বিষ শত্রুগণ কর্তৃক প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাহার প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাই হযরত (সঃ) শাহাদতের মর্তবা লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণ উপায়ে হযরতের শাহাদত হইলে তাহা মুসলমানদের পক্ষে কলঙ্ক হইত, তাই আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীবের পক্ষে শাহাদতের ন্যায় বড় মর্তবা লাভের জন্য উক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৭৩৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৭) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার অন্তিম শয্যায় বলিয়া থাকিতেন, হে আয়েশা! খায়বর দেশে ইহুদীদের দাওয়াতে যে বিষ মিশ্রিত খাদ্য খাইয়াছিলাম এখন তাহার প্রতিক্রিয়া ও কষ্ট-যাতনা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি, এমনকি মনে হইতেছে তাহার চাপে আমার হৃদতন্ত্রী বা অন্তর-রগ ছিন্ন হইয়া যাইবে।

জীবনের সর্বশেষ দিন

সোমবার দিন আজ। হযরত ইহজগত ত্যাগ করিয়া যাইবেন, কিন্তু আজ নবী (সঃ) অবিচলিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করিয়াছেন। মসজিদে লোকগণ আবু বকরের (রাঃ) ইমামতিতে ফজরের নামায আদায়

করিতেছেন। হযরত (সঃ) স্বীয় কক্ষের দরজায় আসিলেন এবং পর্দা উঠাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে আবু বকরের পিছনে সকলের সমবেত হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করতঃ সন্তুষ্টিভরে মুচকি হাসি হাসিলেন। সেই বিবরণই নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৭৩৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৩, ৯৪ ও ৬৪০) আনাছ (রাঃ)– যিনি দীর্ঘ দশ বৎসর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন এবং হযরতের খেদমত করিয়াছেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি এশার নামায হইতে শুক্র, শনি, রবি) তিন দিন হযরত (সঃ) নামাযের জন্য মসজিদে আসিতে পারিতেছেন না (আবু বকর (রাঃ) নামায পড়াইতেছেন)। সোমবার ভোরে মুসলমানগণ মসজিদে ফজরের নামায আদায় করিতেছেন; আবু বকর (রাঃ) তাহাদের ইমামতি করিয়াছিলেন। হঠাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ) (তাঁহার অবস্থানস্থল) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কক্ষের দরজার পর্দা উঠাইয়া (কক্ষ সংলগ্ন মসজিদে) লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। (হযরতের চেহারা মোবারক রুক্তহীনতার দরুন কাগজের মত সাদা দেখাইতেছিল।) লোকগণ তখন কাতার বাঁধিয়া নামায আদায় করিতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হযরত (সঃ) মুচকি হাসি হাসিতেছিলেন। আবু বকর (রাঃ) হযরতের অগ্রসর হওয়া অনুভব করিতে পারিলেন এবং ইমামতির স্থান ত্যাগ করিয়া মোক্তাদীদের কাতারে মিলিত হইবার জন্য পিছনের দিকে পিছপা চলিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। কারণ, তিনি ভাবিলেন, হযরত (সঃ) মসজিদে তশরীফ আনিবেন। মোক্তাদীরা ত হযরতের মসজিদে আগমন অনুভবে অধিক খুশী হইয়া নামায ভঙ্গ করার উপক্রম করিয়া বসিল। হযরত (সঃ) হাতের ইশারায় আদেশ করিলেন, তোমরা নামায পুরা করিয়া লও; এই বলিয়া হযরত (সঃ) পর্দা ছাড়িয়া দিলেন এবং কক্ষের ভিতরে চলিয়া গেলেন। ঐদিনই হযরতের ইন্তেকাল হইয়া গেল, হযরত (সঃ)-কে পুনঃ দেখার সুযোগ আর হইল না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ জীবনের শেষ সময়ে মৃত্যুর মুখে আসিয়া অনেক সময় মানুষ কিছুটা সুস্থ হইয়া দাঁড়ায়; রবিবার দুপুর হইতে সোমবার ভোর পর্যন্ত হযরত (সঃ)-এর সেই অবস্থা চরমে উপনীত হইয়াছে। সাধারণভাবে লোকগণ হযরতের এই স্বস্তির পরিণাম উপলব্ধি করিতে পারে নাই, এমনকি আবু বকর (রাঃ) এই দিনই হযরত (সঃ)-কে সুস্থ দেখিয়া ফজর নামাযান্তে হযরতের অনুমতি লইয়া মদীনা শহরের দূর প্রান্তে অবস্থিত এক স্ত্রীর আবাস গৃহে চলিয়া গেলেন। যাঁহারা বৃহস্পতিবার হইতে হযরতের অবস্থার অবনতি দৃষ্টে হযরতের নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন, আজ তাঁহারাও অনেকে চলিয়া গেলেন।

অবশ্য হযরতের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি চাচা আব্বাস (রাঃ) হযরতের চেহারা মোবারক দেখিয়া পরিণতি কিছুটা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন।

১৭৩৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৯) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট হইতে তাঁহার রোগ অবস্থায় চলিয়া আসিলেন। লোকগণ আলী (রাঃ)-কে হযরতের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। আলী (রাঃ) বলিলেন, আলহামদু লিল্লাহ– হযরত (সঃ) একটু সুস্থতার মধ্যে রাত্রি প্রভাত করিয়াছেন। তখন আব্বাস (রাঃ) আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাত ধরিয়া নিয়া গেলেন এবং বলিলেন, খোদার কসম! তুমি তিন দিন পরেই (অচিরেই) অন্যের লাঠি দ্বারা পরিচালিত হইবে। খোদার কসম আমার ধারণা এই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এই রোগেই মৃত্যুবরণ করিবেন। আমি আবদুল মোত্তালেবের বংশধরগণের মৃত্যু সময়কালীন চেহারার অবস্থা ভালরূপেই ঠাহর করিতে পারি। সুতরাং তুমি আমাকে নিয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট চল। আমরা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করি, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনের দায়িত্ব কাহাকে বহন করিতে হইবে?

যদি সেই দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করেন তবে তাহা আমরা তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া রাখিব, যাদি অন্যদের কথা বলেন তবে তাহাও জানিয়া রাখি এবং হযরত (সঃ) আমাদের সম্পর্কে একটা অসিয়তনামা লিখিয়া দিয়া যাইবেন।

আলী (রাঃ) বলিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে যদি তিনি আমাদের সম্পর্কে "না" বলিয়া দেন তবে ত আর সেই অধিকার লাভের জন্য লোকদের নিকট দাঁড়াইবারও কোন সুযোগ আমাদের থাকিবে না। অতএব আমি ঐ বিষয়ে কোন কথা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিব না।

জীবনের শেষ মুহূর্ত

সোমবার দিন দুপুর হওয়ার পূর্বেই হযরতের অবস্থার ভয়ানক অবনতি ঘটিল। উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ) নিকটেই ছিলেন। মৃত্যুর স্বাভাবিক যাতনার মধ্যে হযরতের শেষ মুহূর্তগুলি কাটিতেছিল।

১৭৩৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪১) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন রোগের ভীষণ চাপে অত্যধিক কাতর হইয়া পড়িয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ চেতনা হারাইয়া ফেলিতেছেন, তখন ফাতেমা (রাঃ) চীৎকার করিয়া উঠিলেন হায়! আমার পিতার কী কষ্ট! নবী (সঃ) ফাতেমা (রাঃ)-কে বলিলেন, আজিকার এই অল্প সময়ের পর তোমার পিতার আর কোন কষ্ট-ক্লেশ থাকিবে না।

নবীজী (সঃ)-এর শেষ মুহূর্ত ফুরাইয়া গেলে ফাতেমা (রাঃ) কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, আ.. হ্! আমার পিতা প্রভুর ডাকে চলিয়া গিয়াছেন। আ...হ্! আমার পিতা ফেরদাউস বেহেশতের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। আ...হ্! আমার পিতার শোক-সংবাদ জিব্রাঈলও অবগত হইয়াছেন। (আর ত তিনি ওহী নিয়া আসিবেন না!)

নবীজীর দেহ মোবারক সমাধিস্থ করা হইলে ফাতেমা (রাঃ) শোকাভিভূত স্বরে বলিলেন, হে আনাছ! তোমাদের প্রাণ কিভাবে সহ্য করিল যে, তোমরা আল্লাহর রসূলকে মাটির আড়াল করিয়া দিলে!

বিশিষ্ট তাবেয়ী সাবেত (রঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করিতে এইরূপ কাঁদিতেন যে, তাঁহার বুক ফুলিয়া উঠিত। (বোদায়া, ৪-২৭৩)

১৭৩৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৯) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তিনি আমারই বুকের সঙ্গে হেলান দেওয়া ছিলেন, তাঁহার মাথা আমার সিনা ও থুতির মধ্যস্থলে ছিল। আমি তাঁহার মৃত্যু যাতনা দেখিবার পর কাহারও পক্ষে মৃত্যু যাতনা অশুভ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।

১৭৪০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৯) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহি অসাল্লাম স্বীয় পিঠ দ্বারা আমার প্রতি ভর লাগাইয়া ছিলেন, এমতাবস্থায় আমি তাঁহার প্রতি কান লাগাইয়া শুনিতে পাইলাম তিনি বলিতেছেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দাও, আমার প্রতি রহমত কর এবং আমাকে উর্ধ্ব জগতের বন্ধুর সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা করিয়া দাও।

১৭৪১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৮) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট শুনিয়া থাকিতাম, কোন নবীকে দুনিয়া এবং আখেরাতের উভয় জেন্দেগীর যেকোন একটা অবলম্বন করার পূর্ণ এখ্‌তিয়ার দেওয়ার পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।

হযরত (সঃ) যখন রোগ শয্যায় রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় উপনীত হইলেন তখন এই আয়াতখানা তেলাওয়াত করিতেছিলেন—

مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰۤئِكَ رَفِيْقًا ـ

অর্থ ঃ যাঁহাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ করুণা রহিয়াছে– নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং বিশেষ নেক বান্দাগণ তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিতে চাই; তাঁহারাই হইতেছেন অতি উত্তম সঙ্গী।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরতের মুখে এই আয়াত শ্রবণে আমি বুঝিতে পারিলাম, হযরত (সঃ)-কে সেই এখ্‌তিয়ার দেওয়া হইয়াছে। (তিনি আখেরাতের জেন্দেগীই গ্রহণ করিয়া নিয়াছেন।)

১৭৪২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৮) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সুস্থ থাকাবস্থায় বলিয়া থাকিতেন, কোন নবীর মৃত্যু হয় না যাবত তাঁহাকে বেহেশতের বাসস্থান দেখাইয়া (দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জেন্দেগীর) এখ্‌তিয়ার বা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা না হয়।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত (সঃ) যখন রোগশয্যায় জীবনের শেষ মুহূর্তে পৌঁছিলেন তখন তাঁহার মাথা আমার উরুর উপর ছিল এবং তিনি চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতপর যখন তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তখন ঊর্ধ্ব দিকে তাকাইয়া বলিলেন, اللهم فى الرفيق الاعلى "হে আল্লাহ! ঊর্ধ্ব জগতের বন্ধুগণের সঙ্গে শামিল হইতে চাই।"

এতদশ্রবণে আমি বুঝিয়া নিলাম, এখন আর হযরত (সঃ) আমাদের মধ্যে থাকিবেন না এবং ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, হযরত (সঃ) সুস্থাবস্থায় যাহা বলিয়া থাকিতেন ইহা তাহারই তাৎপর্য।

১৭৪৩। হাদীছ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোন সময় অসুস্থতা বোধ করিলে কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বি রাব্বিন নাস– এই সূরাদ্বয় পাঠ করতঃ উভয় হস্তে ফুৎকার মারিয়া হস্তদ্বয় সর্বশরীরে বুলাইয়া দিতেন।

হযরত (সঃ) যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত হইলেন তখন (নিজে ঐরূপ করিতেন না,) আমি উক্ত সূরাদ্বয় পাঠ করতঃ হযরতের হস্তদ্বয়ে ফুৎকার মারিতাম এবং তাঁহার শরীরে বুলাইয়া দিতাম।

নবীজীর (সঃ) জীবনের শেষ মুহূর্তের আর একটি সতর্কবাণী বিশেষ অনুধাবনযোগ্য– যাহা প্রথম খণ্ডে অনূদিত হইয়াছে; ২৭৮ নং হাদীছ।

১৭৪৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪০) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার উপর আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ নেয়ামত এই হইয়াছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন আমার গৃহে, আমার জন্য নির্ধারিত দিনে এবং আমার (বুকে হেলান দেওয়া অবস্থায়) সিনা ও থুতির মধ্যস্থলে থাকিয়া। তদুপরি শেষ মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা হযরতের এবং আমার থুথু একত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন– যাহার ঘটনা এই–

আমার ভ্রাতা আবদুর রহমান হাতে তাজা একটি মেসওয়াকের ডালা লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল; তখন আমি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আমার বুকের সঙ্গে হেলান দেওয়াইয়া রাখিলাম। আমি লক্ষ্য করিলাম, হযরত (সঃ) আবদুর রহমানের প্রতি বিশেষভাবে তাকাইতেছেন; তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, মেসওয়াকের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন। আমি হযরত (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ মেসওয়াক আপনার জন্য লইব কি? হযরত (সঃ) মাথার দ্বারা ইশারা করিয়া বলিলেন, হাঁ। আমি মেসওয়াক নিয়া হযরত (সঃ)-কে প্রদান করিলাম। তাহা চিবান তাঁহার পক্ষে কঠিন হইা দাঁড়াইল; সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা কলিাম, আমি ইহাকে চিবাইয়া নরম করিয়া দিব কি? হযরত (সঃ) মাথা দ্বারা ইশারা করিয়া হাঁ বলিলেন। আমি মেসওয়াকটি লইয়া ভালভাবে চিবাইলাম (এবং ঝাড়িয়া সুন্দররূপে পরিষ্কার করতঃ হযরত (সঃ)-কে প্রদান করিলাম) অতপর হযরত (সঃ) এমন সুন্দরভাবে দাঁত মর্দন করিলেন যে,

ঐরূপ আর কখনও দেখি নাই। হযরত (সঃ) উহাদ্বারা মিসওয়াক করিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে একটি পাত্রে পানি ছিল। হযরত (সঃ) বার বার স্বীয় হস্তদ্বয় পানির মধ্যে ভিজাইয়া তাহা দ্বারা মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন–

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ـ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; মৃত্যুর যাতনা অনেক।"

অতপর উপরের দিকে হস্ত উত্তোলন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "উর্ধ্ব জগতের বন্ধুর সঙ্গে মিলন চাই।" এই বলিতে বলিতে হস্ত মোবারক শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল এবং তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ ـ

জীবন সায়াহ্নে কতিপয় বাণী

১। জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে বলিতে শুনিয়াছি– আল্লাহর প্রতি তোমরা ভাল ধারণা রাখিও। তোমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু যেন এই অবস্থায় হয় যে, আল্লাহ তাআলার প্রতি ভাল ধারণা থাকে। (বোদায়া, ৪–২৩৮)।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তাআলার প্রতি ভাল ধারণা তথা তাঁহার রহমত লাভের আশা পোষণ করা তখনই সম্ভব হইবে যখন আমল ভাল হয়। সাধ্যানুসারে বা সাধারণ পর্যায়ে ভাল আমল করিয়াও অনেকের মতে আল্লাহর আযাবের আতঙ্ক ও ভীতির প্রাবল্য থাকে; তাঁহাদের প্রতি নবীজীর উপদেশ– মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলে আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা প্রবল রাখিবে।

২। আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জীবনের শেষ মুহূর্তসমূহে পুনঃ পুনঃ উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া থাকিতেন–

নামায, নামায– সাবধান!
দাস-দাসীদের প্রতি সাবধান!!

আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে আদেশ করিলেন কোন একটি প্রশস্ত বস্তু আনিতে, যাহাতে তিনি এমন বিষয় লিখিয়া যাইবেন যাহা পাওয়ার পর উম্মত গোমরাহ হইবে না।

আলী (রাঃ) বলেন, আমার ভয় হইল যে, আমি দূরে গেলে হয়ত নবীজীর শেষ নিঃশ্বাসের সময়টুকু হারাইয়া বসিব। তাই আমি আরজ করিলাম, আমি স্মরণ রাখিব এবং সযত্নে কণ্ঠস্থ করিয়া লইব। নবীজী (সঃ) বলিলেন, তোমাদিগকে শেষ উপদেশ দিতেছি– নামায এবং যাকাত, আর দাস-দাসীদের প্রতি সদয় থাকিও।

উম্মুল মোমেনীন বিবি উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাসের বেলায়ও বলিতেছিলেন, নামায এবং দাস-দাসী। এমনকি তাঁহার জবান চলে না, তবুও তাঁহার কণ্ঠণালীর মধ্যে ঐ কথার গরগর শব্দ শ্রুত হইতেছিল। (নাসায়ী শরীফ,) বেদায়া, ৪–২৩৮।

৩। আয়েশা (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– (যাহা প্রথম খণ্ডে ২৭৭ নং হাদীছে অনূদিত হইয়াছে), নবীজী (সঃ) যখন মৃত্যু যাতনায় অস্থির ছিলেন, যদ্দরুন মুখমণ্ডল একবার চাদরে আবৃত করিতেছিলেন আর একবার উন্মুক্ত করিতেছিলেন, এইরূপ অস্থিরতার মধ্যে নবীজী (সঃ) স্বীয় উম্মতকে কবরের সেবা ও শ্রদ্ধার নামে কবর পূজা হইতে সতর্ককরণার্থ বলিতেছিলেন, ইহুদী ও নাসারাদের উপর লা'নত, তাহারা তাহাদের নবীগণের এবং নেককার ব্যক্তিবর্গের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল।

সাবধান! তোমরা ঐরূপ করিবে না– আমি কঠোরভাবে তাহা নিষেধ করিয়া যাইতেছি।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তিমকালের এই অছিয়ত-উপদেশ এই যুগের উম্মতগণ যেইভাবে লজ্ঘন করিতছে তাহা দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

নবীজীর (সঃ) সর্বশেষ বচন (পৃঃ ৬৪১)

১৭৪৫। হাদীছ ঃ عن عائشة رضى الله تعالى عنها قَالَتْ وَكَانَتْ اٰخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا ؛ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى ـ

অর্থ ঃ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুখে উচ্চারিত সর্বশেষ বচন ছিল– "আল্লাহুম্মার রফীকাল আ'লা" –হে আল্লাহ আমার পরম সুহৃদ! (তোমার মিলন চাই।)

কালোমা তাইয়্যেবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর যে মর্ম– তওহীদ বা একাত্ববাদ তাহা সম্পূর্ণরূপে এই বাক্যে নিহিত রহিয়াছে। এই বাক্যের মর্ম হইল– একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই চাই; আমার লক্ষ্য একমাত্র তাঁহারই প্রতি । (যোরকানী, ৮– ২৮২)

কালেমা তাইয়্যেবার মর্ম– এক আল্লাহর প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করা, ইহার বিকাশ এই বাক্যে অতি উচ্চাঙ্গ পর্যায়ে রহিয়াছে। কারণ, ঐ মর্ম কালেমা তাইয়্যেবাতে আছে শুধু স্বীকৃতি পর্যায়ে, আর এই বাক্যে তাহা রহিয়াছে মহব্বত প্রেমের বন্ধন পর্যায়ে। "রফীকাল আ'লা"-এর অথ পরম বন্ধু, পরম সুহৃদ, পরম প্রিয়, পরম প্রেমাস্পদ– আল্লাহ; একমাত্র তাঁহার মিলন কামনা করি।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) "হাবীবুল্লাহ" আল্লাহর প্রিয়পাত্র। তিনি সারা জীবন এই স্বীকৃতি আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে লাভ করিয়াছিলেন। এখন জীবনের সর্বশেষ প্রান্তে সেই আল্লাহর সান্নিধানে পৌঁছিবার শুভ মুহূর্তে তাঁহাকে তিনি পরম বন্ধু, পরম সুহৃদ নামে ডাকিলেন এবং বরণ করিলেন; ইহা কতই না সামঞ্জস্য পূর্ণ।

নবীজী (সঃ) অন্তিম অবস্থায় বারংবার অচেতন হইয়া পাড়িতেছেন। প্রত্যেকবার চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বাক্য বলিয়া উঠিতেন। শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গেও পবিত্র জবান হইতে শেষ বাণী তাহাই উচ্চারিত হইত এবং সেই বাক্যের মর্মানুযায়ী তাঁহার পবিত্র আত্মা পরম সুহৃদ আল্লাহ তাআলার সন্নিধানে মহাপ্রস্থান করিল। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

বিবি আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজীর পবিত্র আত্মার মহাপ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে এমন সুগন্ধি ছড়াইয়া পড়িল যাহা জীবনে কোন সময় লাভ হয় নাই।

বিবি উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছিলেন, নবীজীর মহাপ্রস্থানের দিন আমি একবার তাঁহার পবিত্র বক্ষের উপর হস্ত স্পর্শ করিয়াছিলাম; আমার হাতে এমন সুগন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল যে, দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অযু গোসলে ধোয়া-মোছা সত্ত্বেও আমার হস্তে কস্তুরীর সুগন্ধি পাওয়া যাইত। (বোদায়া, ৪- ২৪১)

অন্তিম শয্যায় নবীজীর বিভিন্ন ভাষণ

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের চারি দিন পূর্বে বৃহস্পতিবার দিন যোহর নামাযান্তে মসজিদের মিম্বরে আরোহণপূর্বক নবীজী (সঃ) যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহাই ছিল তাঁহার বিদায়কালীন প্রসিদ্ধ এবং প্রকাশ্যভাবে সর্বসাধারণ সমক্ষে শেষ ভাষণ। এই ভাষণে নবী (সঃ) অনেক বিষয়ই বয়ান করিয়াছিলেন এবং

তাহা অংশ অংশরূপে বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত আছে। যথা– মিম্বরে আরোহণের পূর্বে সর্বপ্রথম নবীজী (সঃ) ওহুদ জেহাদের শহীদানদের জন্য বিদায়ী হৃদয়ের সমুদয় ভাবাবেগ ঢালিয়া দোয়া করিলেন। (১ম খণ্ড; ৬৯৯ হাদীছ দ্রষ্টব্য)

অতপর মিম্বরে আরোহণপূর্বক প্রথম তাঁহার ইহজগত ত্যাগ ও পরপারে যাত্রা করার কথা ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ না করিয়া অনির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির বিষয়রূপে প্রকাশ করিলেন। ফলে জন সাধারণ বুঝিতে পারিল না যে, নবীজী (সঃ) অচিরেই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন; কিন্তু আবু বকর (রাঃ) বিষয়টি ভালভাবেই বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আবু বকরের ক্রন্দনে নবীজী (সঃ) অত্যন্ত অভিভূত হইলেন; তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং নবীজীর জন্য তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ, দান ও সেবার স্বীকৃতি দানপূর্বক তাঁহার প্রতি গভীর ভালবাসা প্রকাশ করিলেন। (১৭২৩ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

অতপর সুস্পষ্ট ভাষায় সকলকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রগামীরূপে আখেরাতের মঞ্জিলে চলিয়া যাইতেছি। আল্লাহর দরবারে আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী হইব। হাউজে কাওসারে আমার সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাতের ওয়াদা রহিল। হাউজে কাওসার (বাস্তব, সৃষ্ট) এখনও আমি দেখিতেছি। আমাকে সমগ্র ধন-ভাণ্ডারের চাবি দিয়া দেওয়া হইয়াছে; (অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের উপর মুসলমানদের আধিপত্য হইবে,) আমি এই ভয় আর করি না যে, আমার তিরোধানের পর তোমরা শেরক বা অংশীবাদে লিপ্ত হইবে। তবে আমার এই ভয় হয় যে, তোমরা দুনিয়ার ধন-দৌলত, জাঁকজমক ও আরাম-আয়েশের প্রতি অতিশয় ঝুঁকিয়া পড়িবে– প্রতিযোগিতামূলকভাবে তাহাতে লিপ্ত ও মত্ত হইবে। ফলে দুনিয়া তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিয়াছে।*

কবর পূজা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া নবী (সঃ) বলিলেন, খৃস্টান-ইহুদীদের প্রতি আল্লাহর লা'নত অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে; তাহারা তাহাদের পীর পয়গম্বরগণের করবকে সেজদা করিয়াছে। আমি তোমাদিগকে কঠোরভাবে নিষেধ করিতেছি, খবরদার তোমরা ঐরূপ করিবে না, আমর কবরকেও তোমরা পূজা করিবে না। (১ম খণ্ড ২৭৮, ১৭২৫ হাদীছ দ্রঃ

ইসলামের জন্য মদীনাবাসী আনসারগণের জান-মাল সর্বস্ব ত্যাগের স্বীকৃতি দানে নবীজী (সঃ) তাঁহাদের সম্পর্কে বলিলেন– আনসারগণ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং ব্যক্তিগত সর্বময় সম্পর্কের অধিকারী। তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্ব পূর্ণরূপে আদায় করিয়া দিয়াছে, তাঁহাদের প্রাপ্য বাকী রহিয়াছে। তাঁহাদের ভাল কাজের স্বীকৃতি দিবে এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলিবে, ক্ষমা করিবে।

আমি মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) উম্মতের যেকোন ব্যক্তি কাহারও ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবে তাহার প্রতি আমার বিশেষ নির্দেশ– সে যেন আনসারগণের ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয় এবং তাঁহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলে। (১৭২৬ নং ১৭২৭ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

নবম হিজরী সন হইতে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে ইসলামের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলার জন্য তথা হইতে মোশরেক-পৌত্তলিকদের উচ্ছেদ সাধনের যে অভিযান আল্লাহ তাআলার বিশেষ নির্দেশে আরম্ভ করা হইয়াছিল– সেই অভিযান চালাইয়া যাওয়ার নির্দেশ দানে নবীজী (সঃ) বলিলেন, সমগ্র আরব উপদ্বীপের সীমানা হইতে মোশরেক-পৌত্তলিকদেরকে বহিষ্কার করিয়া দিবে। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সৌহার্দ্য বজায় রাখিবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিবর্গকে উপহার দেওয়ার যে নীতি আমার ছিল, সেই নীতি তোমরাও অনুসরণ করিয়া চলিবে। (১৭২৮ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

নবীজী (সঃ) আরও বলিলেন, হে লোকসকল! আমি শুনিতে পাইয়াছি, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুর ভাবনায় আতঙ্কিত! বল ত! আমার পূর্বে কোন নবী তাঁহার উম্মতের মধ্যে চিরদিন রহিয়াছেন কি? তাহা

---

* প্রথম খণ্ডের ৬৯৯ নং হাদীছ যাহা মূল কিতাবে ১৭৯ ও ৫৭৬ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে, কিছু অংশ মেশকাত শরীফ ৫৪৭ পৃষ্ঠায় আছে।

হইলে আমিও চিরদিন থাকিতে পারিতাম। সত্যই– আমি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের সন্নিধানে চলিয়া যাইব। তোমরাও তাঁহার সন্নিধানে যাইবে।

আমি তোমাদের বিদায়ী উপদেশ দিতেছি– তোমরা ইসলামের জন্য সর্বস্বত্যাগী মোহাজেরদের মর্যাদার প্রতি সচেতন থাকিও। মোহাজেরগণকেও আমি উপদেশ দেই, তাঁহারা যেন নিজ নিজ অবস্থার সংশোধন করিয়া সৎ-সাধু হয়। আল্লাহ তাআলা (সূরা আছরের মধ্যে) বলিয়াছেন, মানুষ ধ্বংসের সম্মুখীন; একমাত্র তাহারা ব্যতীত যাহারা ঈমান বজায় রাখে এবং নেক আমলসমূহ সম্পাদন করিয়া চলে, আর সৎ পথে এবং সত্যের উপড় দৃঢ়পদ থাকার প্রতি মনোযোগী ও আহ্বানকারী হয়। সব কাজই আল্লাহর আদেশে হইয়া থাকে। অতএব কোন কাজে বিলম্ব হইলে ব্যতিব্যস্ত হইও না। কাহারও ব্যতিব্যস্ততায় আল্লাহ ব্যতিব্যস্ত হইবেন না। আল্লাহ সকলের উপর প্রবল, আল্লাহর উপর কেহ প্রবল হইতে পারে না। আল্লাহর প্রতি চালবাজি করিলে আল্লাহ তাহাকে উহার পরিণাম ভোগাইবেন।

তোমরা যদি ইসলামের শিক্ষা হইতে বিরাগী হও তবে তোমাদের দুনিয়ারও বিপর্যয় ঘটিবে এবং পরস্পরের সৌহার্দ্য বিনষ্ট হইবে। মদীনাবাসী আনসারদের প্রতি উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিতেছি। তাহারা তোমাদের পূর্ব হইতেই মদীনার অধিবাসী এবং অতি যত্নের সহিত ঈমান গ্রহণ ও বরণকারী। তোমরা তাহাদের প্রতি সদয় থাকিও। তাহারা তাহাদের জায়গা জমির উৎপন্ন বণ্টন করিয়া তোমাদের সমান ভোগ দান করিয়াছে, বাড়ী-ঘরে স্থান দান করিয়াছে, নিজেরা অনাহারী থাকিয়াও তোমাদেরকে অগ্রগণ্য করিয়াছে। তাহাদিগকে তোমরা পিছনে ফেলিও না।

আমি তোমাদেরই অগ্রগামী ব্যবস্থাপকরূপে পরকালীন জগতের প্রতি চলিয়া যাইতেছি; পরে তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত হইবে। হাউজে কাওসারের কূলে আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে স্বীয় মুখ এবং হাতকে অবাঞ্ছিত কার্যাবলী হইতে বিরত রাখিবে।

হে জনমণ্ডলী! আল্লাহ তাআলার নাফরমানী তাঁহার দেওয়া নেয়ামতসমূহ পরিবর্তিত করিয়া দেয়। মনে রাখিও! জনসাধারণ সৎ, নেককার ও ভাল হইলে শাসনকর্তাগণও সৎ-সাধু, ভাল হইবে। আর জনসাধারণ ফাসেক-ফাজের হইলে তাহাদের শাসনকর্তা তাহাদের অশান্তি আনয়নকারী হইবে। (যোরকানী, ৮–২৬৮)

তুলনাহীন একটি আদর্শ ভাষণ

ফজল ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহার অন্তিম শয্যায় একদা ভীষণ জ্বর অবস্থায় মাথায় পট্টি বাঁধিয়া আমার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, হে ফজল! তুমি আমাকে হাতে ধরিয়া নিয়া চল! সেমতে আমি হাতে ধরিয়া তাঁহাকে নিয়া চলিলাম; তিনি মিম্বরের উপর যাইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, হে ফজল! লোকদের নামাযে উপস্থিত হওয়ার ডাক দাও। আমি "নামাযের জন্য আস" বলিয়া ধ্বনি দিলাম; জনগণ মসজিদে উপস্থিত হইল। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন– হে লোকসকল! তোমাদের মধ্য হইতে আমার বিদায় গ্রহণ নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে; অতপর তোমরা আমাকে এই স্থানে তোমাদের মধ্যে আর দেখিতে পাইবে না। আমি তোমাদের নিকট জরুরী কথা বলিব; আমার পক্ষ হইতে অন্য কেহ ঐ কথাটি পৌছাইলে তাহা যথেষ্ট হইবে না ভাবিয়া আমি নিজেই তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

তোমরা লক্ষ্য করিয়া শুন– কাহারও পৃষ্ঠে আমি কোন আঘাত করিয়া থাকিলে আমার পৃষ্ঠ উপস্থিত রহিয়াছে; সে যেন তাহার ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া নেয়। আমার মন্দ বলার দ্বারা কাহারও সম্মানের হানি হইয়া থাকিলে আমার সম্মান উপস্থিত রহিয়াছে; সে যেন প্রতিশোধ নিয়া নেয়।

কেহ যেন ভয় না করে যে, (ঐরূপ করিলে) তাহার প্রতি আল্লাহর রসূলের আক্রোশ থাকিয়া যাইবে।

স্মরণ রাখিও– কাহারও প্রতি আক্রোশ রাখা আমার স্বভাবে নাই। আমার সর্বাধিক ভালবাসা ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমার নিকট হইতে তাহার হক আদায় করিয়া নিবে, যদি আমার উপর তাহার কোন দাবী থাকে, কিম্বা দাবী ছাড়িয়া মাফ করিয়া দিবে। আমি যেন মহান আল্লাহর সাক্ষাতে এমন পাক-সাফ অবস্থায় যাইতে পারি যে, আমার উপর কাহারও কোন দাবী না থাকে।

ফজল (রাঃ) বলেন– (নবীজীর ভালবাসাপ্রাপ্তির) এই ঘোষণা শুনিয়া এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার নিকট আমার তিনটি দেরহাম প্রাপ্য আছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, আমি কাহারও দাবী অস্বীকার করিব না বা দাবীদারকে কসম খাইতেও বলিব না। তবে তোমার প্রাপ্য কি সূত্রে? ঐ ব্যক্তি বলিল, হুজুরের স্মরণ আছে কি? একদা এক সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিকে (হুজুরের পক্ষ হইতে) তিনটি দেরহাম দেওয়ার জন্য আমাকে বলিয়াছিলেন। নবী (সঃ) তখন বলিলেন, হে ফজল! তাহাকে তিনটি দেরহাম দিয়া দাও। নবী (সঃ) পুনঃ পুনঃ তাঁহার ঐ বক্তব্য বলিলেন। অতপর বলিলেন–

হে লোকসকল! সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে কেহ কোন কিছু আত্মসাত করিয়া থাকিলে তাহা অবশ্যই ফেরত দিয়া দিবে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার উপর তিনটি দেরহাম রহিয়াছে; এক জেহাদে যুদ্ধলব্ধ ধন বায়তুল মালের হক হইতে আমি তাহা নিয়াছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, তুমি কেন তাহা নিয়াছিলে? ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া নিয়াছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, হে ফজল! তিনটি দেরহাম তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লও। অতপর বলিলেন–

হে লোকসকল! কাহারও ঈমান ইসলামে আভ্যন্তরীণ কোন কপটতা অনুভব করিলে সে দাঁড়াও আমি তাহার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করি। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি মোনাফেক, মিথ্যাবাদী, কপট, হতভাগা। ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, ধিক্ তোমার প্রতি– আল্লাহ তাআলা তোমার দোষ গোপন রাখিয়াছিলেন; তুমি কেন তাহা প্রকাশ করিয়া নিজের বদনাম করিলে! রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, হে খাত্তাব পুত্র (ওমর)! চুপ থাক। দুনিয়ার বদনাম-লজ্জা অতিক্ষীণ ও সহজ আখেরাতের বদনাম ও লজ্জা হইতে। অতপর নবীজী (সঃ) ঐ ব্যক্তির জন্য দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি যখন নিজের শুদ্ধি চাহিয়াছে তখন তুমি তাহাকে শুদ্ধি দান কর, ঈমান দান কর, দুর্ভাগ্য হইতে মুক্তি দাও। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, ওমর আমার সঙ্গী, আমি ওমরের সঙ্গী, সত্য সদা ওমরের সঙ্গে থাকিবে। (বোদায়া, ৪–২৩১)

কাহারও প্রতি কোন অন্যায় করিয়া থাকিলে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হইয়াও উহার প্রতিশোধ দানে নতশিরে প্রস্তুত হওয়ার আদর্শ নবীজী মোস্তফা (সঃ) স্থাপন করিয়া গেলেন। তাঁহার পরেও সুযোগ্য খলীফাগণ এই আদর্শের অনুসরণে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

আম্‌র ইবনে শোআয়েব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমর (রাঃ) সিরিয়ায় আগমন করিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট সিরিয়ার গভর্ণরের বিরুদ্ধে তাহাকে প্রহার করার অভিযোগ করিল এবং তাহার প্রতিশোধ চাহিল। ওমর (রাঃ) উক্ত গভর্নর হইতে প্রতিশোধ দানের ইচ্ছা করিলেন। (বিশিষ্ট ছাহাবী এবং মিসরের গভর্নর) আম্‌র ইবনুল আছ (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে বলিলেন, সিরিয়ার গভর্ণর হইতে এক ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে? ওমর (রাঃ) বলিলেন, নিশ্চয়। মিসরের গভর্নর বলিলেন, এরূপ হইলে ত আমরা আপনার চাকুরী করিব না। ওমর (রাঃ) বলিলেন, না কর; তাহাতে আমার কোন পরোয়া নাই– এই ভয়ে আমি প্রতিশোধ দানের নীতি ছাড়িতে পারি না; যেহেতু আমি দেখিয়াছি, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বেচ্ছায় প্রতিশোধ দানে আগাইয়া আসিয়াছেন। মিসরের গভর্নর বলিলেন, এই ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলে চলিবে কি? ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহা করিতে পার।

সায়ীদ ইবনে মোসাইয়্যেব (রঃ) বলিয়াছেন, নবী (সঃ) স্বেচ্ছায় প্রতিশোধ দান করিয়াছেন, আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)ও স্বেচ্ছায় প্রতিশোধন দান করিয়াছেন।

(তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১–৩৭৪)

করুণা বিজড়িত কণ্ঠের আর একটি ভাষণ

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক মাসকাল পূর্বে আমরা নবীজীর ইহধাম ত্যাগের আভাস পাইয়াছিলাম। অন্তিম সময় যখন একেবারেই ঘনাইয়া আসিল এবং বিদায় মুহূর্ত নিকটবর্তী হইয়া আসিল তখন একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার শেষ শয্যাকক্ষ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার গৃহে আমাদিগকে সমবেত করিলেন। অতপর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–

আল্লাহ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন, তোমাদিগকে আশীর্বাদ করুন, তোমাদের ক্ষতিপূরণ দান এবং ব্যথা বেদনা দূর করুন, তোমাদিগকে নেয়ামত দান করুন, তোমাদিগকে সাহায্য করুন, তোমাদিগকে উন্নতি দান করুন এবং তাঁহার আশ্রয়ে তোমরা নিরাপদ থাক।

আমি তোমাদিগকে আল্লাহর নামে ধর্মভীরু হইবার অসিয়ত করিতেছি, তোমাদিগকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। আমি তোমাদিগকে আল্লাহর আযাব হইতে সতর্ক করিয়া যাইতেছি। তাঁহার পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট সতর্কবাণী শুনাইয়া যাইতেছি– সাবধান! আল্লাহর দুনিয়াতে আল্লাহর বান্দাদের উপর অহঙ্কার ও অন্যায় আচরণ করিও না। সদা স্মরণ রাখিবা, আল্লাহ আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য পরিষ্কার বলিয়াছেন– تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۔

অর্থ ঃ "এই যে পরকালের শান্তির নিবাস– ইহা আমি সেই লোকদিগের জন্যই নির্ধারিত করিয়া থাকি যাহারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য অহঙ্কার দেখাইতে এবং বিপর্যয় ঘটাইতে চাহে না, সংযমশীল খোদাভীরু লোকগণই পরিণামে কল্যাণ লাভ করিবে।"

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন– اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۔

অর্থ ঃ "অহঙ্কাকারীদের বাসস্থান অবশ্যই জাহান্নামে হইবে।"

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার শেষ মুহূর্ত কবে? তিনি বলিলেন, বিদায় অতি নিকটবর্তী, যাত্রা আল্লাহর সন্নিধানে এবং চিরস্থায়ী বেহেশতের দিকে।

আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনাকে গোসল কে দিবে? হুজুর (সঃ) বলিলেন, আমার আপনজনদের মধ্যে নিকটতম ব্যক্তি। কাফন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, আমার পরিধেয় কাপড়েই এবং ইচ্ছা করিলে তৎসঙ্গে মিসরীয় বা ইয়ামানী সাদা এক জোড়া কাপড়। জানাযার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,

গোসল দিয়া কাফন পরাইবার পর খাটের উপরে কবরের কিনারায় রাখিয়া কিছু সময় তোমরা অন্যত্র থাকিও। সর্বপ্রথম জানাযা পড়িবেন জিব্রাঈল, তারপর মীকাঈল, তারপর ইস্রাফীল, তারপর আযরাঈল– প্রত্যেকের সঙ্গেই ফেরেশতাগণের বিরাট দল থাকিবে। তারপর তোমরা জমাত জমাত আসিয়া দরূদ এবং সালাম পাঠ করিয়া যাইবে। আর একটি কথা–

তোমরা আমার অনুপস্থিত ছাহাবীদিগকে আমার "সালাম" পৌঁছাইয়া দিবে।

এতদ্ভিন্ন আজ হইতে কেয়ামত পর্যন্ত যাহারা আমার প্রচারিত ধর্মের অনুসরণ করিবে তাহাদের সকলের প্রতিও আমার "সালাম"। (যোরকানী, ৪–২৬৯)

পাঠক-পাঠিকা! আসুন!! আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সালামে কৃতার্থ হইয়া সমবেত কণ্ঠে সেই মহান সালামের উত্তর দানে বলিতে থাকি–

লক্ষ-কোটি দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি– হে আল্লাহর রসূল।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

লক্ষ-কোটি দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি– হে আল্লাহর নবী।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَ اللّٰه

লক্ষ-কোটি দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি– হে আল্লাহর হাবীব।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

বোখারী শরীফ বাংলা তরজমা দ্বিতীয় খণ্ড লেখাকালীন ১৩৭৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৮ সনে হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মদীনায় হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে পঠিত–

الالتجاء والحنين مع الصلوة والسلام الى سيد المرسلين

রসূলগণের সরদার সমীপে করুণা ভিক্ষা, আবদার এবং প্রাণের আবেগপূর্ণ দরূদ ও সালাম

بِنَفْسِىْ وَاَوْلَادِىْ وَاُمِّىْ وَوَالِدِىْ ـ عَلٰى تُرْبَةٍ طَابَتْ بِطِيْبِ مُحَمَّدٍ

আমার প্রাণ, আমার সন্তান-সন্ততি, আমার মাতা-পিতা সর্বস্ব ঐ পাক ভূখণ্ডের উপর উৎস যেই ভূখণ্ড হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুগন্ধে সুগন্ধময় হইয়া আছে।

عَلٰى تُرْبَةٍ فَاقَتْ عَلَى الْعَرْشِ رُتْبَةً ـ وَحَازَتْ رِيَاضُ الْجَنَّةِ الْمُتَابَدِ

আমার সর্বস্ব উৎসর্গ ঐ ভূখণ্ডের উপর, যাহার মর্যাদা আরশ অপেক্ষা অধিক এবং যেই এলাকায় অনন্তময় বেহেশতের বাগিচা বিরাজমান–

وَوَارَتْ حَبِيْبًا رَبُّنَا قَدْ اَحَبَّهُ ـ فَلَمْ يُبْقِ فِيْنَا بِالْبَقَاءِ الْمُخَلَّدِ ـ

যেই বিশেষ ভূখণ্ডটি আল্লাহ তাআলার প্রিয়তম দোস্তকে ঢাকিয়া আছে। তিনি আল্লাহর অতি প্রিয়; তাই তাঁহাকে আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল না রাখিয়া ডাকিয়া নিয়াছেন।

لَاَذْكُرُ اَيَّامَ الْحَبِيْبِ بِطَيْبَةٍ ـ فَاَصْعَقُ مَغْشِيًّا عَدِيْمَ التَّجَلُّدِ ـ

প্রিয়পাত্র (হযরত নবী সঃ) যখন এই "তায়বা" মদীনায় অবস্থানরত ছিলেন তখনকার মধুর দৃশ্যের কল্পনা, ধ্যান ও স্মরণ করতঃ আমি ধৈর্যহীন হুশহারা হইয়া পড়ি।

اَمُرُّ بِاٰثَارِ الْحَبِيْبِ بِطَيْبَةٍ ـ فَكَادَ فُؤَادِىْ اَنْ يَّطِيْرَ بِمَوْجِدِ

আমি যখন তায়বাস্থিত প্রিয়তমের নিদর্শনসমূহের নিকট যাতায়াত করি তখন মনে হয়– ঐ সবের আকর্ষণে আমার প্রাণপাখী উড়িয়া যাইবে।

فَهٰذِىْ بِقَاعٌ وَّالْجِبَالُ وَمَعْهَدٌ ـ وَبِيْرٌ وَّبُسْتَانٌ وَّاٰثَارُ مَشْهَدِ

এই বিশেষ বিশেষ স্থানসমূহ, পাহাড়সমূহ, রাস্তা-ঘাট ও বিভিন্ন কূপ, বাগ-বাগিচার স্থান এবং তাঁহার উপস্থিতির স্থানের নিদর্শনসমূহ এবং

وَدُوْرٌ وَّاٰطَامٌ وَّمِمْبَرُ خُطْبَةٍ ـ اَسَاطِيْنُ اَعْلَامٌ وَمِحْرَابُ مَسْجِدٍ ـ

বিভিন্ন ঘর-বাড়ী, টিলা, খোতবা দানের মিম্বর এবং মসজিদস্থিত কতিপয় খুঁটি ও মেহরাব–

لَتَمْلأُمِنْ ذِكْرَى الْحَبِيْبِ قُلُوْبَنَا ـ وَتُوْرِثُ نَارًا فِىْ ضُلُوْعٍ وَاكْبُدٍ

উল্লিখিত নিদর্শনসমূহ আমার প্রাণকে প্রিয় পাত্রের স্মরণে পরিপূর্ণ করিয়া দেয় এবং আমার হৃদয়পটে প্রজ্বলিত অগ্নির সঞ্চার করে।

كَاَنَّ فُؤَادِيْ اِذْ اَتَيْتُ بِبَابِهٖ ـ لَجَمْرَةُ نِيْرَانٍ شَدِيْدُ التَّوَقُّدِ ـ

আমি তাহার দ্বারে পৌঁছার মুহূর্তে আমার হৃদয় যেন একটি প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ড।

وَلَمْ اَسْتَفِقْ حَتّٰى اَقُوْلَ مَقَالَةً ـ وَاُدْرِكَ اِدْرَاكًا بِقَلْبِيْ الْمُقَدَّدِ

তদবস্থায় আমার হুশ-জ্ঞান বিদ্যমান ছিল না যে, আমি কিছু বলিতে পারি এবং আমার বিদীর্ণ হৃদয়ে কিছু অনুভব করিতে সক্ষম হই।

فَاَرْسَلْتُ دَمْعِيْ لِلْفُؤَادِ مُتَرْجِمًا ـ فَيَا عَيْنُ جُوْدِيْ وَاهْمِلِيْ لاَتَجْمُدِيْ

অগত্যা অন্তরের আবেগ প্রকাশে অশ্রু-বৃষ্টি বহাইলাম; হে নয়ন! খুব অশ্রু বহাও, থামিও না।

وَيَاعَيْنُ جُوْدِيْ وَاهْمِلِيْ مِنْ مَّدَامِعٍ ـ وَصُبِّيْ عُيُوْنًا مِّنْ دِمَاءٍ لِتَسْعَدِيْ

হে নয়ন! অবিরাম অশ্রুপাত কর; রক্তস্রোতের নদী বহাইয়া দাও, ইহাই তোমাদের সৌভাগ্য।

وَيَا عَيْنُ سُحِّيْ وَاسْكُبِيْ كُلَّ قَطْرَةٍ ـ نَجِيْعًا وَّدَمْعًا كَيْ تَفُوْزَ بِمَقْصَدِ

হে নয়ন! অশ্রু ও রক্তের প্রতিটি বিন্দু বহাইয়া দাও, ইহাতে তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাফল্য

وَيَا نَفْسُ ذُوْبِيْ ثُمَّ سِيْلِيْ مَدَامِعًا ـ عَلٰى رَسْمِهٖ رَسْمِ الدِّيَارِ وَمَلْحَدِ

হে প্রাণ! প্রিয়-পাত্রের ঘর-বাড়ী ও সমাধি-চরণে উৎসর্গ হওয়ার সুযোগ হারাইও না– বিগলিত হইয়া অশ্রু আকারে বহিয়া যাও।

لِاَيِّ مَرَامٍ تُرْصِدُ الْعَيْنُ مَائَهَا ـ وَاَيُّ مَرَامٍ يُرْصَدُ النَّفْسُ لِلْغَدِ

আর কোন্ আকাঙ্ক্ষা পূরণের মানসে চক্ষু স্বীয় অশ্রু রক্ষিত রাখিবে? আর কোন্ আকাঙ্ক্ষায় আমার প্রাণ আগামী দিনের জন্য বাঁচিয়া থাকিবে?

عَلَيْكَ سَلاَمٌ يَامُطَيِّبُ طَيْبَةٍ ـ لَاَنْتَ مَلاَذِيْ اِذْ اَتٰى يَوْمُ مَوْعِدِ ـ

"তায়বা"কে মনোমুগ্ধকারী– হে মহান! আপনাকে সালাম। কেয়ামতের দিন আপনি আমার আশ্রয়স্থল।

وَاَنْتَ رَجَائِيْ فِيْ مَنَازِلِ مَحْشَرٍ ـ صِرَاطٍ وَّمِيْزَانٍ وَفِيْ كُلِّ مَوْرِدِ ـ

আপনি আমার আশার স্থল হাশরের ময়দানের প্রতিটি স্থানে– পোলসিরাত, নেকী-বদীর পাল্লার নিকট এবং অন্যান্য প্রতিটি ঘাঁটিতে।

مِنَ اللّٰهِ سَلْ تُعْطَهْ وَمِنْكَ شَفَاعَةٌ ـ فَهٰذَا رَجَائِيْ يَاغِيَاثِيْ وَمُسْنَدِيْ

আপনার পক্ষ হইতে শাফাআতের প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে আপনার শাফাআত পূরণের ঘোষণা– ইহাই আমার একমাত্র আশা-ভরসার স্থল।

بِذَنْبِىْ وَعِصْيَانِىْ لَغِى كُلُّ حِيْلَتِىْ ـ بِجُوْدِكَ يَاخَيْرَ الْجَوَادِ تَغَمَّدِ

গোনাহ ও নাফরমানীর দরুন আমার সমস্ত চেষ্টা-তদবীরই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে; হে দয়াল! আপনি স্বীয় দান সমুদ্রে আমাকে নিমজ্জিত করুন।

غَرِقْتُ بِبَحْرِ الذَّنْبِ مَالِىْ عِصْمَةٌ ـ فَخُذْ بِيَدِىْ اَنْتَ الْكَرِيْمُ فَخُذْ يَدِىْ

গোনাহের সমুদ্রে আমি নিমজ্জিত নিরুপায়, আপনি দয়ালু; আপনি আমার হাত ধরুন! আপনি আমার হাত ধরুন!

اَتَيْتُكَ مَسْلُوْبًا وَجِئْتُكَ هَارِبًا ـ اَغِثْنِىْ بِلُطْفٍ يَا مُغِيْثِىْ وَزَوِّدِ

আমি সর্বহারা হইয়া ঘর-বাড়ী ত্যাগ করতঃ আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি দয়া দরিয়া আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার সম্বল করিয়া দিন।

اَتَيْتُكَ مَذْعُوْرًا مِنَ الذَّنْبِ خَائِفًا ـ اَتَيْتُكَ عَبْدًا مُسْتَجِيْرًا بِسَيِّدِ

আমি গোনাহের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া আপনার প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছি, যেরূপ বিপদগ্রস্ত গোলাম মনিবের সাহায্যের প্রতি ছুটিয়া আসে।

اَتَيْتُ كَئِيْبًا مِّنْ دِيَارٍ بَعِيْدَةٍ ـ حَزِيْنًا بِاٰثَامٍ وَّوَجْهٍ مُسَوَّدِ

গোনাহের চিন্তামগ্ন কাল মুখ লইয়া দূরদেশ হইতে ক্লান্তাবস্থায় আপনার দ্বারে পৌঁছিয়াছি।

اَتَيْتُ بِقَلْبٍ مُّسْتَهَامٍ وَّمُغْرَمٍ ـ جَرِيْحٍ بِاٰسَافِ الْفِرَاقِ الْمُبَعَّدِ

পাগল-প্রাণ হইয়া উপস্থিত হইয়াছি; বিচ্ছেদ যাতনায় সেই প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

اَتَيْتُ بِشَوْقٍ وَّاشْتِيَاقٍ وَّرَغْبَةٍ ـ رَجَائِىْ بِكُمْ اَعْلٰى وَغَيْرُ مُعَدَّدِ

বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবদার নিয়া আসিয়াছি। আমার আকাঙ্ক্ষা অসংখ্য ও অতি বড়।

اَتَيْتُكَ مَوْلَائِىْ بِلُطْفِكَ رَاجِيًا ـ وَلَنْ يُّحْرَمُ الرَّاجِىْ بِبَابِ مُحَمَّدِ

আপনার দয়ার ভিখারী হইয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর দ্বার হইতে কোন ভিখারী কখনও বঞ্চিত হয় না।

لَاَغْضَبْتُ رَبِّىْ بِالْمَعَاصِىْ وَلَمْ اَجِدْ ـ وَسِيْلَةَ غُفْرَانِىْ سِوٰى بَابِ اَحْمَدِ

আমি আমার প্রভুর নাফরমানী করিয়া তাঁহাকে ক্রোধান্বিত করিয়াছি; এখন মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দ্বার ভিন্ন আমার গোনাহ মাফ হওয়ার কোন উসিলা নাই।

هُوَ الْبَابُ بَابُ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالسَّخَا ـ وَمَنْ يَّأْتِهٖ يَاْتِ الْمَرَامُ وَيَسْعَدِ

এই দ্বার দান ও দয়া সাখাওয়াতের দ্বার, যেব্যক্তি এই দ্বারে উপস্থিত হয় সে মনোবাঞ্ছা পূরণে এবং সাফল্য লাভে সক্ষম হয়।

فَكَمْ مِنْ غَرِيْقٍ هَالِكٍ لَجَّ بَابَهٗ ـ نَجٰى نَائِلًا نُوْرًا مِنَ اللّٰهِ يَهْتَدِىْ

বহু নিমজ্জমান ধ্বংসের সম্মুখীন ব্যক্তি এই দ্বার আঁকড়াইয়া ধরিয়া আল্লাহ তাআলার হেদাআত ও নূর প্রাপ্তিতে পরিত্রাণ পাইয়াছে।

رَجَائِىْ اِلَيْكُمْ يَا شَفِيْعَ الْمُشَفَّعُ ـ وَمَنْ ذَا الَّذِىْ نَرْجُوْ اِلَيْهِ وَنَهْتَدِىْ

আপনি এমন সুপারিশকারী যে, আপনার সুপারিশ কবুল করিবেন বলিয়া আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়াছেন; তাই আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, আপনি ব্যতীত আর কে আছে যাহার প্রতি আমরা আশা করিতে পারি এবং ধাবিত হইতে পারি?

رَثَى لِىْ عَدُوِّىْ مِنْ ذُنُوْبِىْ وَمَاثَمِىْ ـ فَمَا لِىْ لاَ اَرْجُوْ رَثَائِكَ سَيِّدِىْ

আমার গোনাহদৃষ্টে শত্রুর অন্তরেও দয়ার সঞ্চার হয়। আপনি আমার মনিব, আপনার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইবে বলিয়া আমি আশাবাদী কেন হইব না।

وَمَالِىْ عِنْدَ اللّٰهِ دُوْنَكَ حِيْلَةٌ ـ نَجَاةٌ وَّغُفْرَانٌ فَكُنْ اَنْتَ رَائِدِىْ

আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা ও পরিত্রাণ পাইবার জন্য আপনি ভিন্ন আমার আর কোন সূত্র নাই, তাই আপনি আমার সংস্থাপক হইয়া যান।

تَرَحَّمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُكَ رَاجِيًا ـ لاَنْتَ كَرِيْمٌ لِلْعَدُوِّ وَمُعْتَدِىْ

হে আল্লাহর রসূল! আমার প্রতি করুণার দৃষ্টি করুন, আমি আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি– আপনি ত শত্রুর প্রতিও দয়াশীল।

وَاَنْتَ جَوَادٌ مَالِجُوْدِكَ سَاحِلٌ ـ فَمَا لِىْ لاَ اَرْجُوْ بِاَنَّكَ مُسْعِدِىْ

আপনার দয়ার সাগরের কূল-কিনারা নাই; তবে কেন আমি আশাবাদী হইব না যে, আপনি আমাকে সৌভাগ্যশীল করিবেন।

تَرَحَّمْ عَزِيْزَ الْحَقِّ يَا مَنْ بِلُطْفِهِ ـ كَثِيْرٌ مِّنَ الْعَاصِىْ لِفِرْدَوْسِ يَهْتَدِىْ

আপনি নরাধম আজিজুল হকের প্রতি দয়ার দৃষ্টি করুন, আপনার উসিলায় বহু গোনাহগার ফেরদাউস বেহেশত লাভ করিয়া বসিবে।

فَرَبُّكَ يُعْطِىْ مَا تُرِيْدُ وَتَشْتَهِىْ ـ مُحِبُّ لِمَحْبُوْبٍ يُّطِيْعُ وَيَقْتَدِىْ

আপনি যাহাই ইচ্ছা ও পছন্দ করেন, আল্লাহ তাআলা তাহাই দান করিয়া থাকেন। দোস্ত দোস্তের মন রক্ষা করিয়া চলে।

عَلَيْكَ صَلٰوةٌ وَّالسَّلاَمُ وَرَحْمَةٌ ـ دَوَامًا مِّنَ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ مَيْعَدِ

আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম এবং কেয়ামত পর্যন্ত আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক।

عَلَيْكَ صَلٰوةٌ وَّالسَّلاَمُ وَرَحْمَةٌ ـ اُلُوْفٌ وَّاٰلاَفٌ وَّمَا زَادَ فَازْدَدِ

আপনার প্রতি হাজার হাজার দরূদ, সালাম ও রহমত এবং আরও যতদূর অধিক হইতে পারে।

مُنًى كُنَّ فِىْ قَلْبِىْ غَرَسْتُ بِطَيْبَةَ ـ فَاَسْقِىْ بِدَمْعٍ وَّالدِّمَاءِ لِتَجْتَدِىْ

আমার অন্তরের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা পবিত্র মদীনার ভূমিতে রোপণ করিলাম, এখন নয়নের অশ্রু ও রক্তের দ্বারা তাহাতে সেচন করিতে থাকিব। তবেই তাহাতে ফল ধরা সম্ভব হইবে।

فَمَا الْعَيْشُ بَعْدَ الْبُعْدِ مِنْ اَرْضِ طَيْبَةٍ ـ يَلَذُّ بِنَا وَالصَّبْرُ عَنْهَا بِمَبْعَدِ

মদীনা হইতে বিচ্ছিন্ন জীবনে আনন্দ থাকিতে পারে কি? মদীনাকে ভুলিয়া থাকা অসম্ভব।

وَهَلْ لَذَّةٌ لِىْ فِى الدُّنَى وَنَعِيْمِهَا ـ اِذَا اَنَا نَاءٍ مِّنْ مَّدِيْنَةِ سَيِّدِىْ

আমার মনিবের শহর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুনিয়া এবং দুনিয়ার সামগ্রীসমূহ আমার নিকট স্বাদকর হইতে পারে কি?

حَيَاتِىْ عَلٰى بُعْدِ الْمَدِيْنَةِ مُرَّةٌ ـ وَقَلْبِىْ بِهٖ شَوْقٌ لِسَاحَةِ سَيِّدِىْ

মদীনা হইতে বিচ্ছেদে আমার জীবন বিষাক্ত এবং আমার মনিবের আঙ্গিনায় পড়িয়া থাকাই আমার অন্তরের একমাত্র আনন্দ।

تَمَنَّيْتُ مِن رَّبِّىْ جِوَارَ مَدِيْنَةٍ ـ فَيَا لَيْتَ لِىْ فِيْهَا ذِرَاعٌ لِمَرْقَدِىْ

মদীনায় অবস্থান আল্লাহ তাআলার নিকট আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা; হায়! মদীনার মধ্যে কবরের জন্য এক হাত ভূমি আমার অদৃষ্টে জুটিবে কি?

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَالْمَوْتُ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ ـ

হে আল্লাহ! তোমার রাস্তায় শহীদ হওয়ার সুযোগ আমাকে দান কর এবং তোমার রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শহরে আমার মৃত্যু নসীব কর। আমীন।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় ও তারিখ এবং হযরতের বয়স

ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সোমবার দিন হযরত (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাও প্রায় অবধারিত যে, সোমবার দিন দুপুর বেলার পূর্বেই হঠাৎ অবস্থার ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটিয়া মৃত্যু যাতনা আরম্ভ হয় এবং দ্বিপ্রহরকাল পর্যন্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উক্ত সোমবার দিনটি রবিউল আউয়াল মাসের কোন্ তারিখ ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ মত এই যে, তাহা ১২ই রবিউল আউয়াল ছিল, * কাহারও মতে ২ তারিখ, কাহারও মতে ১ তারিখ ছিল। (সীরাতে মোস্তফা, ৩-২০৫)

হযরত (সঃ) কত বয়সে ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতভেদ আছে এবং এই সম্পর্কে রেওয়ায়েত বা বর্ণনাও বিভিন্ন রহিয়াছে। কিন্তু ৬৩ বৎসর সম্পর্কীয় বর্ণনাই বিশেষ অগ্রগণ্য।

১৭৪৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪১) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তেষট্টি বৎসর বয়সে ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের (১) জন্ম। (২) নবুয়তপ্রাপ্তি (৩) মক্কা ত্যাগ

---

* ১২ই রবিউল আউয়াল দিনটি সোমবার হওয়ার জন্য ঐ মাসের প্রথম তারিখ বৃহস্পতিবার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহাতে একটি জটিল প্রশ্ন প্রতিবন্ধক হয়- তাহা এই যে, এই মাসের দুই মাস পূর্বে যিলহজ্জ মাসে হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জ করিয়া আসিয়াছেন। ঐ মাসের নয় তারিখ তথা আরাফার দিন শুক্রবার ছিল ইহা অকাট্যরূপে অবধারিত। সেমতে যিলহজ্জ, মহররম, সফর এই তিনটি মাসের সবগুলিকে ৩০ দিনের বা ২৯ দিনের কিম্বা কোনটা ৩০ কোনটা ২৯ যে প্রকারেই হিসাব করা হউক, যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ শুক্রবার ধরিয়া কোন মতেই রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম তারিখ বৃহস্পতি ও ১২ তারিখ সোমবার হইতে পারে না। এই জন্য হযরতের ওফাতের তারিখ সম্পর্কে ১২ই রবিউল আউয়াল, অনেকে অস্বীকার করিয়া বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু হযরতের ওফাতের দিন সোমবার এবং ১২ই রবিউল আউয়াল এই মতবাদটা সর্বত্র এতই প্রসিদ্ধ যে, উহা উড়ান যায় না। মাওলানা আবদুল হাই সাহেব মজমুয়া ফতওয়া ২-২৩৯ পৃ উক্ত প্রশ্নটির ভাল মীমাংসা দিয়াছেন যে-বোধ হয়, হযরতের বিদায় হজ্জের বৎসর যিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখ মক্কায় ও মদীনায় চাঁদ দেখার হিসাবে বিভিন্ন ছিল। পূর্ববর্তী

(৪) মৃত্যু– এই বিষয়গুলির সঠিক দিন-তারিখ নির্ধারণ যদিও পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের রুচি দৃষ্টে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই যুগেও ঐসব বিষয় ঘটনার কোন সঠিক দিন-তারিখ নির্ধারণের গুরুত্ব মোটেই ছিল না। এতদ্ভিন্ন ইসলামেও উহার কোন গুরুত্ব মোটেই নাই। সুতরাং প্রতিটি বিষয়ের দিন-তারিখ সংরক্ষণ করা হয় নাই। পরবর্তীকালে কোন কোন ছাহাবী এ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, ফলে তাঁহাদের মন্তব্যের মধ্যে কিছুটা বিভিন্নতা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে– যাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই বিভিন্নতা সূত্রেই মোটামুটি হিসাবের বেলায়, (১) ঠিক কত বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, (২) নবুয়ত প্রাপ্তির পর কত দিন মক্কায় অবস্থান করিয়াছেন, (৩) মদীনায় কত দিন অতিবাহিত করিয়াছেন (৪) সর্বমোট কত বৎসর বয়সে ইহজগত ত্যাগ করিয়াছিলেন– এইসব বিষয় নির্ধারণে মতামতের বিভিন্ন সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই ধরনের হিসাবাদির মধ্যে স্বাভাবিকরূপেই অনেক সময় বৎসরের ভাঙ্গা মাস, মাসের ভাঙ্গা দিনগুলির সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা হয় না; যেরূপ দিনের ভাঙ্গা ঘণ্টা, ঘণ্টার ভাঙ্গা মিনিট এবং মিনিটের ভাঙ্গা সেকেণ্ডগুলির সূক্ষ্ম হিসাবের প্রতি কেহই দৃষ্টি দান করে না; বরং কেহ বা ঐ ভাঙ্গাগুলি পূর্ণ ধরিয়া হিসাব করে, কেহবা ঐ ভাঙ্গাগুলিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া হিসাব ধরে। দশকের মধ্যবর্তী ভাঙ্গা সংখ্যা সম্পর্কেও ঐরূপ করা হয়। এইভাবেও মোটামুটি সংখ্যা নির্ধারণে মতভেদ হইয়া থাকে।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বয়স সম্পর্কে মতভেদটাও সেই শ্রেণীরই। এ স্থলে তিন প্রকার মতামত বর্ণিত রহিয়াছে। ৬০, ৬৩ এবং ৬৫। প্রকৃত প্রস্তাবে হযরতের সঠিক বয়স ছিল ৬৩, কিন্তু কেহ কেহ দশক তথা ৬০-এর উপরে ভাঙ্গা ৩-এর সংখ্যা বাদ দিয়াছে,আবার কেহ জন্ম ও মৃত্যুর ভাঙ্গা বৎসর দুইটি পূর্ণ বৎসর হিসাব করিয়াছে, ফলে দুই বৎসর বর্ধিত হইয়া ৬৫-এর সংখ্যা হইয়াছে।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যুর খবর ছড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে সারা মদীনায় বিহ্বলতার অন্ধকার ছাইয়া গেল। ছাহাবীগণের মধ্যে সকলে এই কথা বিশ্বাস করিয়া নিতে পারিলেন না যে, হযরতের মৃত্যু হইয়াছে। হযরত (সঃ)-কে চির নিদ্রায় দেখা সত্ত্বেও তাঁহারা ভাবিলেন, ওহী নাযিল হওয়াকালে হযরতের উপর এইরূপ আচ্ছন্নতা পরিলক্ষিত হইত, এখনও সেই অবস্থায়ই হয়ত হযরত (সঃ)-কে দেখা যাইতেছে, কস্মিনকালেও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।

এইরূপ ধারণা পোষণকারীদের মধ্যে ওমর ফারুক (রাঃ) ছিলেন সর্বাগ্রে এবং সর্বাধিক অটল। এমনকি তিনি উন্মুক্ত তরবারি হাতে লইয়া বিহ্বলতার মধ্যে ঘোষণা দিতে লাগিলেন, যে কেহ বলিবে যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যু হইয়াছে, আমি তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিব। হযরতের মৃত্যু হয় নাই, তিনি অচিরেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবেন এবং মোনাফেকদের মূল উচ্ছেদ করিবেন। ওমর (রাঃ) তাঁহার উক্তির প্রচারে লোকদের মধ্যে বক্তৃতাও করিতেছিলেন। ওসমান (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ছাহাবীগণ বিহ্বলতার মধ্যে কেহবা নির্বাক অচেতন অবস্থায় ছিলেন, কেহবা অশ্রু স্রোতে

যিলকদ মাসের প্রথম তারিখ– হযরতের হজ্জযাত্রার তারিখ বর্ণনাকারীদের হিসাব মতে বুধবার ছিল। এই মাসের ২৯ তারিখ বুধবার হযরত (সঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ মক্কার পথে থাকিয়া যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখেন; মক্কাতেও তাহাই হয়। সেমতে যিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখ হয় বৃহস্পতিবার এবং ৯ তারিখ হয় শুক্রবার। কিন্তু ঐদিন মদীনাতে যিলহজ্জের চাঁদ দৃষ্ট হয় নাই এবং সেই যুগে মক্কা এলাকার খবর মদীনা শহরে সময়মত পৌছিতে পারে নাই। মদীনা শহরে যিলকদের চাঁদ ৩০ দিনের গণ্য হইয়া যিলহজ্জের প্রথম তারিখ শুক্রবার হইয়াছে এবং মদীনায় এই হিসাবই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে; পরেও এই বিষয়ে কোন তৎপরতার প্রয়োজন হয় নাই। যিলহজ্জ মাসও ৩০ দিনের হইয়া প্রথম মহররম রবিবার হইয়াছে। মহররম মাসও ৩০ দিনের হইয়া প্রথম সফর মঙ্গলবার হইয়াছে। সফর মাসও ৩০ দিনে হইয়া প্রথম রবিউল-আউয়াল বৃহস্পতিবার হইয়াছে। এই হিসাব মক্কা এলাকার ৯ই যিলহজ্জ শুক্রবার এবং মদীনা এলাকার ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সঙ্গতিপূর্ণই বটে। ৯ই যিলহজ্জ আরাফার দিন শুক্রবার মক্কা এলাকার হিসাব অনুযায়ী হইয়াছে। আর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার মদীনা এলাকার হিসাবে হইয়াছে।

ভাসিতেছিলেন।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এই দিন ভোর বেলা হযরত (সঃ)-কে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া মদীনার দূর প্রান্তে চলিয়া গিয়াছিলেন; তথায় তাঁহাকে এই প্রলয়ঙ্করী সংবাদ পৌঁছান হইল। বিহ্বলতার চরমে পৌঁছা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে ধীরস্থিরতার তওফীক দান করিলেন। সমগ্র জাতি সর্বহারারূপে বিশৃঙ্খলাময় প্রলয়ঙ্করী বিপদের মুখে পতিত অবস্থায় জাতির কর্ণধারকে যেরূপ হইতে হয়, আল্লাহ তাআলা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে ঐ মুহূর্তে ঠিক সেই গুণে গুণান্বিত করিয়া সাজাইলেন। যাঁহার সাহচর্যে আবু বকর (রাঃ) সর্বস্ব বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার বিচ্ছেদ যাতনার অগ্নি আবু বকরের অন্তরকে পুড়িয়া ভস্ম করিতেছিল, কিন্তু তাহার বহিরাকৃতি পর্বততুল্য অটল-অবিচল ছিল। আবু বকর (রাঃ) সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুত চলিয়া আসিলেন এবং কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা না বলিয়া স্বীয় কন্যা আয়েশার কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তথায় সর্দারে দোজাহান চাদরে আবৃত রহিয়াছেন, "ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি অসাল্লাম।"

১৭৪৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪০) আবু সালামা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, (হযরতের মৃত্যু সংবাদে) আবু বকর (রাঃ) মদীনার দূর প্রান্তে "সুনহ্"স্থিত তাঁহার গৃহ হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুত আসিলেন এবং সোজা মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিলেন। অতপর কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা না বলিয়াই আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি অগ্রসর হইলেন; হযরত (সঃ) একটি চাদরে আবৃত ছিলেন।

আবু বকর (রাঃ) হযরতের চেহারা মোবারক হইতে চাদর হটাইয়া তাঁহার ললাটে চুম্বন করিলেন। আবু বকরের (রাঃ) নীরবে অশ্রুধারা বহিয়া পড়িল। অতপর হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ, (আল্লাহর সাধারণ নিয়মাধীন) আপনার জন্য যে মৃত্যু নির্ধারিত ছিল সেই মৃত্যু আপনার উপর আসিয়া গিয়াছে (এখন পুনঃ আগমন হইলে দ্বিতীয়বারও মৃত্যু অনিবার্য) আল্লাহ তাআলা আপনার উপর মৃত্যুকে দুই সুযোগ দান করিবেন না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অতপর আবু বকর (রাঃ) কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন। ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে স্বীয় বক্তব্য (হযরতের মৃত্যু হয় নাই) প্রচার করিয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন। আবু বকর (রাঃ) ওমরকে বসিয়া যাইতে বলিলেন। তিনি বসিলেন না (বিহ্বলতার মধ্যে স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া গেলেন)। ফলে লোকজন ওমরকে ছাড়িয়া আবু বকরের প্রতি ধাবিত হইল। আবু বকর (রাঃ) তেজোদৃপ্ত ভাষায় এক যুগান্তকারী ভূমিকা সকলের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। তিনি বলিলেন–

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ ـ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى " وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ـ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ " ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যদি মুহাম্মদের পূজারী হইয়া থাক তবে সে জানিয়া লও যে, তাহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে (যদ্দারা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, মুহাম্মদ যত বড়ই হন না কেন, কিন্তু তিনি মা'বুদ হইতে পারেন না।) আর যাহারা আল্লাহর বন্দেগীকারী তাহারা জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ হইলেন আনাদি-অনন্ত, চীর জীবন্ত– তাঁহার মৃত্যু আসিতেই পারে না (সুতরাং আল্লাহর দ্বীন ও তাঁহার এবাদত চির বিদ্যমান থাকিবে।) সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর (রাঃ) পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতও তেলাওয়াত করিলেন। যাহার অর্থ এই–

"মুহাম্মদ রসূল বটে (কিন্তু মানুষ তিনি খোদা নহেন) তাঁহার পূর্বে আরও অনেক রসূল আসিয়াছিলেন, যাঁহাদের কেহই দুনিয়াতে চিরজীবী হন নাই, সকলেরই মৃত্যুই হইয়াছে; (মুহাম্মদ (সঃ)ও সেই একই পথের পথিক)। সুতরাং মুহাম্মদ (সঃ) মরিয়া গেলে বা শহীদ হইয়া গেলে তোমরা কি (দ্বীন-ইসলাম ছাড়িয়া) পিছনের অধঃপতনের অবস্থার দিকে ফিরিয়া যাইবে? যে কেহ পিছনের দিকে, অধঃপতনের দিকে ফিরিয়া যাইবে (সে নিজেরই ক্ষতি করিবে; আল্লাহর কোন ক্ষতিই সে করিবে না। আর জানিয়া রাখিও,) যাহারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর নেয়ামতের কদর করিয়া চলিবে, আল্লাহ তাহাদিগকে উত্তম প্রতিফল দান করিবেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, খোদার কসম! লোকগণ যেন ইতিপূর্বে জানিতই না যে, এই আয়াত পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে; আবু বকর তেলাওয়াত করার পরেই যেন তাহারা জানিতে পারিল এবং সকলেই আবু বকরের মুখ হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া নিল, এমনকি কোন একজন মানুষও আমি দেখি নাই, যে তখন এই আয়াত তলাওয়াত করিতেছিল না।

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আবু বকরের মুখে এই আয়াত শুনার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত-পা ভাঙ্গিয়া পড়িল। যখন আমি উক্ত আয়াতের তেলাওয়াত আবু বকরের মুখে শুনিলাম এবং উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যু হইয়া গিয়াছে, তখন আর আমি আমার পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, মূর্ছা খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম।

ভূপৃষ্ঠ হইতে হযরতের দেহ মোবারকের বিদায় গ্রহণ

সোমবার দিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত হযরত (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঐ দিনের অবশিষ্ট দীর্ঘ সময় ত শোক-বিহ্বলতার মধ্যে কাটিল; তাহা হইতে অবসর লাভের পূর্বেই সকলে অন্য আর একটি সমস্যায় জড়াইয়া পড়িলেন। সেইটি হইল শাসনযন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্থলাভিষিক্তের মনোনয়ন। বিষয়টি ছিল অত্যাবশ্যকীয়, বিশেষতঃ ঐ মুহূর্তে। কারণ চতুর্দিকে দ্বীন-ইসলামের শত্রুর অভাব ছিল না। মুসলিম জাতি বত্রিশ দাঁতের পরিবেষ্টনে এক জিহ্বার ন্যায় ছিল। তদুপরি মোনাফেকের দল আভ্যন্তরীণ শত্রুরূপে সর্বদাই সুযোগের সন্ধানে রহিয়াছে; এমতাবস্থায় উক্ত সমস্যার সমাধানের আবশ্যকতা কে অস্বীকার করিতে পারে? বিশেষতঃ যখন সকলের জানা ছিল যে, কাফন-দাফনে বিলম্ব হইলেও হযরতের দেহ মোবারকে কোন রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। সাধারণ শহীদের দেহই যখন কোন প্রকার বিকৃত হয় না, যাহার প্রামাণিক বিবরণ প্রথম খণ্ডে ৭০০ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এ স্থলে ত সাইয়্যেদুল মোরসালীনের দেহ বিকৃত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকায় সকলেই উক্ত সমস্যার সমাধানের প্রতি অধিক ব্যতিব্যস্ত হইলেন।

সাধারণ আলোচনার মধ্যেই আবু বকর (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর মঙ্গলবার দিন হযরতের গোসল দানের সময় গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল, আল্লাহর রসূলের দেহ পোশাক শূন্য করিও না, তিনি যেই পোশাকে রহিয়াছেন তাহাতে রাখিয়াই তাঁহাকে গোসল দান কর। তাহাই করা হইল এবং কাফন পরাইবার সময় উক্ত পেশাক খুলিয়া লওয়া হইল। (সীরাতে মোস্তফা, ৩-২১৯)

অতপর দাফন করার স্থান সম্পর্কে বিতর্ক হইলে আবু বকর (রাঃ) হাদীছ শুনাইলেন যে, পয়গম্বর (সঃ)-কে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের স্থলে দাফন করা হইবে। ইহাই চূড়ান্তরূপে গৃহীত হইল এবং ঐ স্থানেই কবর শরীফ খনন করা হইল।

মঙ্গলবার দিন কাফন পরাইয়া হযরতের দেহ মোবারক কবরের কিনারায় রাখিয়া দেওয়া হইল। সাধারণ

নিয়মে জামাতের সহিত পূর্ণাঙ্গ কায়দায় জানাযার নামায পড়া হইল না, * যেরূপ (অনেক ইমামগণের মজহাব অনুসারে) শহীদের জন্য জানাযার নামাযের আবশ্যক হয় না। অবশ্য দলে দলে সকলেই সন্নিকটে দাঁড়াইয়া তকবীর এবং দরূদ ও সালাম পাঠ করিয়া যাইতে লাগিল। প্রথমে ফেরেশতাগণ, অতপর প্রথম দলে আবু বকর, ওমর (রাঃ), তারপর নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ সকল ছাহাবী দলে দলে আসিলেন।

কাহারও মতে, দরূদ-সালামের সেলসিলা তিন দিন পর্যন্ত চলিয়াছে, অর্থাৎ সোম, মঙ্গল, বুধ– এই তিন দিন দেহ মোবারক মাটির উপরেই ছিল, সেমতে বুধবার দিন শেষে বৃহস্পতিবার রাত্রে সমাহিত হইয়াছেন। অধিকাংশ মোসাদ্দেসগণের মতে মঙ্গলবার দিন শেষে বুধবারের রাত্রে সমাহিত হইয়াছিলেন।

(বেদায়া, ৫–২৭১)

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمِ - بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ -

হযরতের পরিত্যক্ত সম্পদ

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) অন্যান্য মোহাজেরগণের ন্যায় নিঃস্ব অবস্থায়ই মদীনায় আসিয়াছিলেন। প্রথম দিকে মুসলমানগণ নিজ নিজ বাগানের এক দুইটি করিয়া খেজুর গাছ হযরত (সঃ)-কে দিয়া রাখিয়াছিলেন– হযরতের জীবিকা নির্বাহের উসিলা তাহাই ছিল। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে তাহারই উল্লেখ রহিয়াছে।

১৭৪৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৪৪১) আনাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসী কোন কোন মুসলমান নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে কতিপয় খেজুর বৃক্ষ দিয়া রাখিত, (তাহা দ্বারা হযরতের জীবিকা নির্বাহ হইত! মদীনার খেজুর বাগান-বিশিষ্ট শহরতলী এলাকা–) বনু কোরায়যা ও বনু নযীর ইহুদী গোত্রদ্বয়ের বস্তি মুসলমানদের করায়ত্ত হইলে পর তাহা হইতে প্রাপ্ত অংশবিশেষ দ্বারা হযরতের ব্যয় বহনের ব্যবস্থা হইল এবং হযরত (সঃ) লোকদের প্রদত্ত খেজুর বৃক্ষ ফেরত দিতে লাগিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ দুনিয়ার কোন আকর্ষণ যে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে স্পর্শও করিতে পারিয়াছিল না তাহা নূতনভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। "যুদ" বা দুনিয়ার প্রতি বৈরীভাব সম্পর্কীয় অধ্যায়ের অসংখ্য হাদীছ এই বিষয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে; যাহার কিছু বিবরণ ইনশা আল্লাহ তাআলা পরবর্তী খণ্ডে অনূদিত হইবে। ঐ সব হাদীছ এবং বিশেষরূপে ইতিহাসেই এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। সুতরাং বিশেষ কোন ধন-সম্পদ রসূলুল্লাহ (সঃ) পরিত্যক্তরূপে ছাড়িয়া যান নাই– ইহারই উল্লেখ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে আছে।

১৭৪৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৪১) আম্র ইবনুল হারেস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বর্ণ-রৌপ্যের কোন মুদ্রা কিম্বা ক্রীত দাস-দাসী (ইত্যাদি কোন ধন-সম্পদ দুনিয়াতে) রাখিয়া যান নাই। তাঁহার ব্যবহারের একটি শ্বেত বর্ণের খচ্চর এবং নিজস্ব যুদ্ধাস্ত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। আর রাখিয়া গিয়াছিলেন (পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের) কিছু পরিমাণ বাগান জমি; তাহারও মূল ভূমি আল্লাহর ওয়াস্তে দান করিয়া গিয়াছিলেন।

১৭৫০।হাদীছ ঃ (পৃঃ ১৯৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইহজগত ত্যাগের পর তাঁহার স্ত্রীগণ নিজেদের মীরাস লাভ করার জন্য ওসমান (রাঃ)-কে খলীফাতুল মুসলেমীন আবু বকরের নিকট পাঠাইতে উদ্যত হইলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন, আপনাদের কি স্মরণ নাই যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন– لا نورث ما تركنا صدقة আমাদের (নবীগণের সম্পত্তির) ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী কেহ হইতে পারে না; আমরা যাহা কিছু রাখিয়া যাইব সবই

---

* কারণ নবীগণের মৃত্যু প্রকৃত প্রস্তাবে মৃত্যু নহে, তাঁহাদের জীবন-সূর্য অস্তমিত হয় না, বরং শুধু আবরণে ঢাকিয়া যায় মাত্র। এই সূত্রেই তাঁহাদের মৃত্যুর পরেও অন্যত্র তাঁহাদের স্ত্রীগণের আর বিবাহ হইতে পারে না। সাধারণ শহীদের বেলায় এই হুকুম নাই।

সদকা পরিগণিত হইবে।

১৭৫১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৯৬) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উত্তরাধিকারীগণ বণ্টন করিয়া নেওয়ার কোন টাকা-পয়সা পাইবে না, যাহা কিছু আমার পরিত্যক্ত থাকিবে উহা হইতে আমার স্ত্রীগণের ভরণ-পোষণ এবং কার্য পরিচালনাকারীগণের ব্যয় বহন করা হইবে; অতিরিক্ত যাহা থাকিবে তাহা দান বা সদকা পরিগণিত হইবে।

১৭৫২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫২৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ফাতেমা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিত্যক্ত মদীনাস্থ সম্পত্তি– যাহা দানস্বরূপ ছিল এবং ফদক এলাকা ও খায়বরের অংশ– এই সব সম্পত্তি হইতে স্বীয় উত্তরাধিকার স্বত্ব চাহিয়া আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, আমাদের তথা নবীগণের সম্পত্তির কোন ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হইতে পারে না; তাহা সদকা পরিগণিত হইবে। অবশ্য মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) পরিবারবর্গ ঐ সম্পত্তি হইতে, যাহা বস্তুতঃ আল্লাহর জন্য হইয়া গিয়াছে– ভরণ-পোষণ লাভ করিবে, তদতিরিক্ত ঐ সম্পত্তির মধ্যে সেই পরিবারবর্গেরও কোন হক বা অধিকার নাই।

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের (এই সুস্পষ্ট নির্দেশের বিপরীত তাঁহার) দানকৃত বস্তুসমূহের মধ্যে আমি এক তিল পরিমাণও ব্যতিক্রম করিতে পারিব না। রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং যেরূপে ঐ সবের পরিচালনা করিতেন আমিও ঠিক সেইরূপেই পরিচলনা করিব।

অতপর আলী (রাঃ) এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আবু বকরের মর্তবা ও মর্যাদার স্বীকৃতি দানপূর্বক তাঁহাকে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আত্মীয়বর্গ এবং তাঁহাদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করার আবেদন জানাইলেন।

তদুত্তরে আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি ঐ সর্বশক্তিমান আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি, যাঁহার ক্ষমতায় আমার জান-প্রাণ, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আত্মীয়বর্গের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমি আমার নিজ আত্মীয়বর্গের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা অধিক পছন্দ করি ও গুরুত্ব দান করিয়া থাকি। (অর্থাৎ হযরতের আত্মীয়বর্গ মাথার উপরে কিন্তু হযরতের আদেশ সর্বাগ্রে।)

ব্যাখ্যা ঃ আবু বকর (রাঃ) যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা অতি সুস্পষ্ট ছিল। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্পত্তির উপর স্বীয় কর্তৃত্ব জিয়াইয়া রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি শুধু বিবি ফাতেমা (রাঃ)-কেই উক্ত সম্পত্তি হইতে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন না। যদি তাহা বণ্টিত হইত তবে তাঁহার কন্যা আয়েশা (রাঃ) এবং ওমরের কন্যা হাফ্সা (রাঃ)ও অংশীদার হইতেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও কোন অংশ দেন নাই। আবু বকরের উদ্দেশ্য ছিল, এই সম্পত্তি সম্পর্কে হযরতের নির্দেশ পালন করিয়া যাওয়া, যাহার উল্লেখ বিভিন্ন হাদীছে রহিয়াছে।

অবশ্য ফাতেমা (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) এই ব্যাপারে আবু বকর রাযিয়াল্লাল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি মনঃক্ষুণ্ন হইয়াছিলেন। এমনকি এই ব্যাপারটি বোখারী শরীফের ৪৩৫ এবং ৬০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত বর্ণনা মতে ফাতেমা (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু হযরতের স্পষ্ট নির্দেশের দরুন অপারগ ছিলেন।

ব্যাপারটা হয়ত এইরূপ ছিল যে, ফাতেমা (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এ সম্পত্তিকে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উত্তরাধিকারী আত্মীয়বর্গের মধ্যে বণ্টন করতঃ তাঁহাদিগকে মোতাওয়াল্লী বানাইয়া দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। অপর পক্ষে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আশঙ্কা এই ছিল যে, হযরতের স্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে এইসব সম্পত্তি আল্লাহর নামে দানকৃত; ইহা একবার ভাগ-বণ্টনের আওতায়

আসিয়া গেলে পরবর্তীকালে ইহার বাস্তব রূপটা নষ্ট হইয়া যাইবে।

আবু বকরের নীতি যুক্তিসঙ্গত ছিল, কিন্তু ফাতেমা (রাঃ) ও আলী (রাঃ) হযরতের ঘনিষ্ঠতা সূত্রে তাঁহাদের যে অধিকার ছিল, সেই অধিকার দাবী করিয়াছিলেন। ব্যাপারটা অতি সাধারণ; সুমপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই ধরনের মতবিরোধ বিশেষ কোন গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হয় না।

কিন্তু শিয়া সম্প্রদায়, যাহারা আবু বকর (রাঃ) ও ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি ঈমানহীনরূপে ক্ষেপিয়া আছে, তাহারা আলোচ্য বিষয়টিকে ভয়ানক ঘোলাটে করিয়া দেখাইয়া থাকে। অথচ ঘটনা অতি সাধারণ ছিল। আবু বকর (রাঃ) স্বয়ং ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজি করিয়া নিয়াছিলেন। (সীরাতে মোস্তফা, ৩-২৬৬, ব-হাওয়ালা বেদায়া ওয়ান-নেহায়া)। স্বল্পকালের মধ্যে ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মৃত্যু হইয়া যাওয়ার পর স্বয়ং আলী (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে নিজ গৃহে সংবাদ দিয়া আনিয়াছিলেন এবং সম্মুখে পরস্পর সব কথাবার্তা মন খোলাভাবে বলিয়া দিয়া অতপর সর্বসমক্ষে আনুষ্ঠানিকরূপে উভয়ের মিল-মিশের ঘোষণা জানাইয়া দিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিম্নের হাদীছে অতি সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

১৭৫৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬০৯) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যে সম্পত্তি মদীনায় এবং ফদক এলাকা ও খয়বরে ছিল– এই সবের মীরাস দাবী করিয়া হযরতের কন্যা ফাতেমা (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। আবু বকর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, আমাদের তথা নবীগণের সম্পত্তির ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী কেহ হইবে না; আমাদের পরিত্যক্ত সব কিছু সদকা পরিগণিত হইবে। অবশ্য মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) পরিবারবর্গ এই সম্পত্তি হইতে ভরণ-পোষণ লাভ করিবে।

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সদকাহকে আমি এক তিলও পরিবর্তন করিতে পারি না; তাহা পূর্বাবস্থার উপরই বহাল থাকিবে– যে অবস্থায় হযরতের আমলে ছিল। আমি ঐরূপেই তাহা পরিচালনা করিব যেরূপ হযরত (সঃ) করিতেন। এই বলিয়া আবু বকর (রাঃ) ঐ সম্পত্তি ফাতেমা (রাঃ)-কে বণ্টন করিয়া দিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে ফাতেমা (রাঃ) তাঁহার প্রতি রাগান্বিত হইয়া চলিয়া আসিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত (এই ব্যাপারে) আর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতও করেন নাই, কথাও বলেন নাই। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে ফাতেমা (রাঃ) মাত্র ছয় মাস জীবিত ছিলেন।

(আলী (রাঃ)-ও আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি মনক্ষুণ্ন ছিলেন, এমনকি) ফাতেমা (রাঃ)-এর ইন্তেকাল হইলে পর আলী (রাঃ) রাত্রি বেলায়ই তাঁহার কাফন-দাফন কার্য সমাধা করিয়া দিলেন, আবু বকর (রাঃ)-কে সংবাদ জানাইলেন না।

ফাতেমা (রাঃ) জীবিত থাকাবস্থায় লোকদের মধ্যে আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল, কিন্তু ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ইন্তেকাল হইলে পর আলী (রাঃ) অনুভব করিলেন যে, লোকদের সেই আকর্ষণ লোপ পাইয়া গিয়াছে। এতদদৃষ্টে আলী (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে মীমাংসায় উপনীত হওয়া এবং তাঁহার প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য আগ্রহশীল হইলেন এত দিন আলী (রাঃ) আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি সেইরূপে সমর্থন জ্ঞাপনের ঘোষণা দিয়াছিলেন না।

সেমতে আলী (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-কে এই মর্মে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, আপনি আমার গৃহে তশরীফ আনিবেন, আপনার সঙ্গে অন্য কেহ যেন না আসেন– উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ওমর (রাঃ) যেন সঙ্গে না থাকেন। ওমর (রাঃ) ইহা অবগত হইয়া আবু বকর (রাঃ)-কে বলিলেন, কসম খোদার! আপনি একা তাহাদের গৃহে যাইতে পারিবেন না। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তাহাতে আশঙ্কার কি আছে? আমাকে কি করিবে? অতপর আবু বকর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন।

প্রথমে আলী (রাঃ) ভাষণদানপূর্বক আবু বকর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমরা আপনার মর্তবা এবং আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন সেই সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রহিয়াছি এবং তাহা স্বীকারও করি। আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে উচ্চাসনের অধিকারী করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা মোটেও কোন হিংসা করি না, কিন্তু আমাদের অভিযোগ এই যে, আপনি ক্ষমতা-কর্তৃত্ব পরিচালনার ব্যাপারে একনায়কত্বের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন! অথচ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জ্ঞাতি গুষ্ঠি ও নিকটতম আত্মীয় হওয়া সূত্রে এই ব্যাপারে আমাদেরও দাবী ছিল বলিয়া আমরা মনে করি।

আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বক্তব্য শ্রবণে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বহিয়া পড়িল। অতপর তিনি এই বলিয়া বক্তব্য আরম্ভ করিলেন যে, ঐ মহান খোদার কসম যাঁহার ক্ষমতাধীন আমার জান-প্রাণ, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আত্মীয়তার মর্যাদা আমার নিকট আমার নিজের আত্মীয়তার মর্যাদা অপেক্ষা অনেক বেশী, কিন্তু আপনার ও আমার মধ্যে হযরতের এই জায়গা-জমির ব্যাপারে যেই মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সম্পর্কে আমি উত্তম পথ অবলম্বনে বিন্দুমাত্র অবহেলা করি নাই এবং এই পর্যন্ত আমি ঐ জমি সম্পর্কে এমন একটি কাজও ছাড়ি নাই যাহা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে করিতে দেখিয়াছি।

অতপর আলী (রাঃ) বলিলেন, আনুষ্ঠানিকরূপে আপনার প্রতি সমর্থন ঘোষণার জন্য আগামীকল্য দিনের দ্বিতীয়ার্ধে ওয়াদা রহিল। সেমতে পরবর্তী দিন আবু বকর (রাঃ) যোহরের নামাযান্তে মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং ভাষণদানপূর্বক আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উল্লেখ করিলেন এবং তাঁহার তরফ হইতে প্রকাশ্যে সমর্থন ঘোষণায় বিলম্ব হওয়ার ওজর যাহা তিনি পেশ করিয়াছেন বর্ণনা করিলেন এবং নিজের সকল দোষ-ত্রুটির জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

তারপর আলী (রাঃ) ভাষণ দানপূর্বক আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যোগ্যতার প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন, তাঁহার প্রতি সমর্থন ঘোষণা বিলম্ব করার কারণ তাঁহার প্রতি হিংসা পোষণ এবং তাঁহার খোদা-প্রদত্ত মর্যাদাকে উপেক্ষা করা নহে। হাঁ– আমাদের ধারণা এই যে, কর্তৃত্ব পরিচালনার ব্যাপারে আমাদেরও পরামর্শ দানের অধিকার রহিয়াছে– সেই ক্ষেত্রে তিনি একনায়কত্বের ভূমিকা গ্রহণ করায় আমরা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। (এই বলিয়া আলী (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং সর্বসমক্ষে তাঁহার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের ঘোষণা প্রদান করিলেন। (মুসলিম)

এই মিল-মহব্বত প্রকাশে মুসলমানগণ অতিশয় খুশী হইলেন এবং আলী (রাঃ)-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এই শুভকার্য সম্পাদিত হইলে পর মুসলমানগণ আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি অধিক সৌজন্যশীল হইয়া উঠিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উল্লিখিত জায়গা-জমি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতকাল পর্যন্ত তাঁহার তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হইত। ওমর (রাঃ) খলীফা হইলে পর দুই বৎসরকাল ঐ অবস্থায় চলিল। অতপর আলী (রাঃ) এবং আব্বাস (রাঃ) তাঁহার নিকট এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন যে, অন্তত মদীনাস্থ জমির পরিচালনার ভার প্রদানে আমাদিগকে উহার মোতাওয়াল্লী বানানো হউক। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চাচা এবং চাচাত ভাই– এইরূপ ঘনিষ্ঠ হইয়াও তাঁহারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত থাকিবেন– ইহাই তাঁহাদের পক্ষে পীড়াদায়ক ছিল, যদ্দরুন তাঁহারা এই ব্যাপারে এত অধিক তৎপরতা দেখাইতেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদের এই অভিপ্রায় এতটুকু পূরণ করিলেন যে, মদীনাস্থ বনু নযীর মহল্লার জমি ভাগ-বন্টন ব্যতিরেকে আব্বাস (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-কে একত্রে মোতাওয়াল্লী বানাইয়া দিলেন। কিছু দিন পর পরিচালন ব্যাপারে তাঁহাদের মাঝে মতবিরোধের সৃষ্টি হইল। সেমতে তাঁহারা পুনরায় ওমর (রাঃ)-এর নিকট যাইয়া ঐ জমি বন্টন করতঃ প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন অংশের মোতাওয়াল্লী বানাইতে বলিলেন। ওমর (রাঃ) ঐ জমি কোন প্রকার ভাগ-বন্টন করিতে কঠোরভাবে অস্বীকার করিলেন। বিস্তারিত

বিবরণ নিম্নের হাদীছে রহিয়াছে–

১৭৫৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৪৩৪ ও ৫৭৫) মালেক ইবনে আওস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি খলীফাতুল মুসলেমীন ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট তাঁহার আহ্বানে উপস্থিত হইলাম। এমতাবস্থায় তাঁহার দারোওয়ান আসিয়া সংবাদ দিল যে, ওসমান (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ) এবং সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) উপস্থিত হইয়াছেন– তাঁহারা আপনার সাক্ষাত চাহেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদের সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। তাঁহারা নিকটে আসিয়া সালাম করতঃ বসিয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দারোয়ান আসিয়া পুনঃ সংবাদ ছিল, আলী (রাঃ) এবং আব্বাস (রাঃ)ও আসিয়াছেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদিগকেও অনুমতি দিলেন, তাঁহারও উপস্থিত হইয়া সালাম করতঃ বসিলেন।

অতপর (হযরতের চাচা) আব্বাস (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমার এবং ইহার (আলী (রাঃ)-এর) মধ্যে একটি চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া দিন। তাঁহারা উভয়ে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিত্যক্ত বনু নজীর বস্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধান কার্য পরিচালনার ব্যাপারে মতবিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তথায় উপস্থিত ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণও এই ব্যাপারে জোর দিলেন যে, হাঁ– তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে (ভাগ-বন্টন করিয়া দিয়া) চূড়ান্ত ফয়সালা করতঃ পরস্পরের মধ্যে শান্তির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই উত্তম।

ওমর (রাঃ) সকলকে বলিলেন, একটু থামুন। আমি আসমান-যমীনের রক্ষাকর্তা মহান আল্লাহর কসম দিয়া আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা জানেন কি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, কেহ আমাদের (তথা নবীগণের) ওয়ারিস হইতে পারিবে না, আমাদের পরিত্যক্ত সব কিছু সদকা পরিগণিত হইবে– এই কথার দ্বারা হযরত (সঃ) নিজের বিষয়ই উদ্দেশ করিয়াছিলেন। ওসমান (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ একবাক্যে বলিলেন, হাঁ– হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহাই বলিয়াছিলেন। অতপর ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করতঃ আল্লাহর কসম দিয়া তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারাও কি জানেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐরূপ বলিয়াছেন? তাঁহারা উভয়ে স্বীকার করিলেন, হাঁ– হযরত (সঃ) ঐরূপ বলিয়াছেন।

তখন ওমর (রাঃ) তাঁহাদের সকলকে বলিলেন, আমি আপনাদিগকে মূল বৃত্তান্ত শুনাইতেছি। এই বলিয়া তিনি পবিত্র কোরআন সূরা হাশরের একটি আয়াত তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, বিনা যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা যে জায়গা-জমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হস্তগত করিয়া দিয়াছিলেন, উক্ত আয়াত নাযিল করিয়া সেই জমির পূর্ণ অধিকারও আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কেই দিয়াছিলেন। (এই শ্রেণীর অধিকার একমাত্র রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যই হইয়ছিল, অন্য কাহারও পক্ষে এইরূপ হইবে না)। কিন্তু খোদার কসম! হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐরূপ জায়গা-জমিসমূহ সকলকে বাদ দিয়া একাই সবগুলি কুক্ষিগত করিয়াছিলেন না, বরং সবই মুসলমানদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। শুধুমাত্র এই সামান্য (বনু নজীর মহল্লার) জমিটুকু (এবং "ফদক" এলাকাটুকু) নিজের জন্য রাখিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা হযরত (সঃ) স্বীয় পরিবারবর্গের পূর্ণ বৎসরের খোরপোষের ব্যবস্থা করিতেন। ইহার আয়ের মধ্যেও যাহা অতিরিক্ত থাকিত তাহা লিল্লাহরূপে দান-খয়রাত (বা সমরাস্ত্র সংগ্রহে*) ব্যয় করিয়া দিতেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় জীবনকালে এই পন্থায়ই উক্ত জমির কার্য চালাইয়া গিয়াছেন। ওমর (রাঃ) স্বীয় বক্তব্যের উপর উপস্থিত সকলকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি এই বিবরণ অবগত আছেন? সকলেই উত্তর করিলেন, হাঁ।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, অতপর যখন হযরত (সঃ) ইহজগত ত্যাগ করিয়া গেলেন তখন আবু বকর (রাঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঐ জমির পরিচালনা নিজ হস্তে রাখিলেন এবং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয়বস্তু মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে। (ফতহুল বারী, ৬–১৫৫)

অসাল্লামের পন্থায়ই কাজ চালাইয়া গেলেন। এই সময় ওমর (রাঃ) আব্বাস ও আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তখন আপনারা আবু বকরের সমালোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সাক্ষী আছেন যে, আবু বকর (রাঃ) এই ব্যাপারে সত্যের প্রতীক, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা, হক পথের পথিক ছিলেন। তারপর আবু বকর (রাঃ) ইহজগত ত্যাগ করিলেন এবং আমি তাঁহার স্থলে বসিয়া ঐ জমির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিলাম এবং দুই বৎসরকাল রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আবু বকরের পন্থায় আমি উহার পরিচালনা করিলাম। আল্লাহ তাআলা সাক্ষী যে, আমি সত্য, ন্যায় ও হকভাবে তাহা পরিচালনা করিয়াছি।

অতপর আপনারা দুই জন আমার নিকট উপস্থিত হইয়া একই দাবী পেশ করিলেন। হে আব্বাস! আপনি ত চাচা হওয়ার সূত্রে ভাতিজার অংশ দাবী করিলেন এবং আলী স্বীয় স্ত্রীর পক্ষে তাঁহার পিতার অংশ দাবী করিলেন। তখন আমি আপনাদিগকে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঐ কথাই শুনাইলাম যে, কেহ তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে না, তাঁহার পরিত্যক্ত সব সাদকা পরিগণিত হইবে। তারপর আমার রায় হইল যে, মদীনাস্থ জমিটা আপনাদের হাওলা করি। সেমতে আমি আপনাদের উভয়কে ডাকিয়া বলিলাম যে, মোতাওয়াল্লীস্বরূপ এই জমির পরিচালনার ভার আপনাদের হস্তে ছাড়িয়া দিতে পারি এই শর্তে যে, আপনারা আল্লাহর নামে ওয়াদা অঙ্গীকার করিবেন যে, ইহার সমুদয় কার্য রসূলুল্লাহ (সঃ), আবু বকর (রাঃ) এবং আমি মোতাওয়াল্লী হইয়া এ যাবত যেই পন্থায় চালাইয়াছি, আপনারাও ঠিক সেই পন্থায়ই চালাইবেন। তখন আপনারা উভয়েই বলিয়াছিলেন, এইভাবেই আমাদিগকে প্রদান করুন। আমি উক্ত শর্তের উপর আপনাদিগকে মোতাওয়াল্লী বানাইয়াছিলাম। এস্থলেও উপস্থিত সকলকে তিনি কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বক্তব্য ঠিক কি-না? সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন, হাঁ-ঠিকই।

অতপর ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ঐ ব্যবস্থার পরে আপনারা আমার নিকট হইতে ভিন্ন কোন নূতন ব্যবস্থার আশা রাখেন? মহান আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, যাঁহার আদেশে আসমান-যমীনের অস্তিত্ব কায়েম রহিয়াছে, আমার পূর্ব ব্যবস্থা ভিন্ন নূতন কোন ব্যবস্থারই অবকাশ আমি দিব না। আপনারা ঐ ব্যবস্থানুযায়ী কাজ চালাইতে অপারগ হইলে তাহা আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করুন, আমিই আপনাদের স্থলে কার্য পরিচালনা করিয়া যাইব।

অতপর ঐ জমি সদকারূপে আলী (রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয়। আব্বাস (রাঃ)-এর কর্তৃত্ব অপসারিত হইয়া যায়। আলী (রাঃ)-এর পরে তাহা পুত্র হাসান (রাঃ)-এর থাকে, তারপর হোসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর, তারপর হোসাইনের পুত্র আলী– জয়নুল আবেদীন এবং হাসানের পুত্র হাসান– এই দুই জনের তত্ত্বাবধানে থাকে। তাঁহারা উভয়ে সময়ের ভিত্তিতে ভাগ করিয়া নিয়াছিলেন– কিছুকাল একজন এবং কিছুকাল অপরজন; এইভাবে তাঁহারা উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহাদের পর হাসানের পুত্র যায়েদের তত্ত্বাবধানে ছিল। এই জমি হযরত (সঃ) কর্তৃক প্রদত্ত সদকারূপেই পরিচালিত ছিল।

নবী (সঃ)-এর মীরাস সম্পর্কে বিশেষ বিধান তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছিলেন, ফাতেমা (রাঃ) তাহা অবগত ছিলেন না। তাই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে যে সাধারণ বিধান আছে, সেই মতেই ফাতেমা (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট অংশীদারীর দাবী সম্পর্কে যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, আপনি মরিয়া গেলে আপনার ওয়ারিস কে হইবে? আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার পরিজন ও সন্তানগণ। ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, তবে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওয়ারিস হইব না কেন? তখন আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীছ শুনাইলেন যে, নবীগণের সম্পত্তির কেহ ওয়ারিস হয় না, তাহা সদকা পরিগণিত হয়। সেমতে ফাতেমা (রাঃ) সদকারূপেই উহার পরিচালনার দাবী করিলেন। কিন্তু আবু বকর (রাঃ) ঐ জমি ওয়ারিসদের হস্তগত হইতে দেওয়া, অদূর ভবিষ্যতে তাহা মীরাসে পরিগণিত হওয়ার আশঙ্কায় উহাতে রাজি হইয়াছিলেন না; তাহাতে ফাতেমা (রাঃ) অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে বুঝাইয়া সন্তুষ্ট করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

এক নজরে
নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের
তিরোধান

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দশম হিজরীর শেষার্ধে রব্বুল আলামীনের তরফ হইতে তাঁহার পরকাল যাত্রার বিভিন্ন ইঙ্গিত লাভ করেন। যথা–

(১) প্রতি রমযান মাসে জিব্রাঈল (আঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে পবিত্র কোরআন দাওর করিতেন– কোরআন শরীফ (যতটুকু অবতীর্ণ হইয়াছে) একে অপরকে শুনাইতেন। এই বৎসর জিব্রাঈল (আঃ) দুইবার দাওর করিলেন। এই সম্পর্কে স্বয়ং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট দুইবার দাওর করার উল্লেখপূর্বক বলিলেন, মনে হয় আমার পরকালের যাত্রা নিকটবর্তী আসিয়া গিয়াছে।

(২) সূরা "ইযা জাআ নাছরুল্লাহি" অবতীর্ণ হইয়া নবী (সঃ)-কে জ্ঞাত করা হইল যে, দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার যে উদ্দেশে আপনাকে পাঠানো হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সেমতে এই সূরার ইঙ্গিত ইহাই ছিল যে, এখন আর আপনার দুনিয়াতে থাকার প্রয়োজন নাই। ওমর (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণও এই ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এক হাদীছে আছে– সূরা "ইযা জাআ নাছরুল্লাহি" নাযিল হইলে পর নবী (সঃ) জিব্রাঈল (রাঃ)-কে বলিলেন, এই সূরায় ত আমার মৃত্যুর ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে। জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, আপনার জন্য দুনিয়া অপেক্ষা আখেরাত উত্তম। (তাবরানী– সীরাতে মোস্তফা, ২–৩৭৪)

এইসব ইঙ্গিত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মনে দাগ কাটিয়াছে; সেমতে তিনি আখেরাতের কাজের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। সর্বপ্রথম তিনি কোরআন শরীফের দাওর দুই বারের ব্যবস্থা দেখিয়াই দশম হিজরীর রমযান মাসে এতেকাফ সাধারণ নীতি দশ দিনের স্থলে বিশ দিন করিলেন।

এতদ্ভিন্ন দশম হিজরীর হজ্জের সময় আসিলে তিনি ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে বিপুল আয়োজনের সহিত সকল উম্মতকে সঙ্গে লইয়া অন্তিম সফরের পূর্বে শেষ বারের মত হজ্জ সমাধা করার প্রস্তুতি নিলেন। আখেরাতে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার লগ্নে দুনিয়াতে তাঁহার ঘরের হজ্জ করিয়া আসা নিতান্তই সঙ্গতি পূর্ণ। এই হজ্জের এক বিশেষ মুহূর্তে কোরআন পাকের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত নাযিল হইয়া নবী (সঃ)-কে তাঁহার মহা যাত্রার আর একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দান করিল।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থ ঃ "আজ তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম, আমার নেয়ামত (দ্বীনে-ইসলাম) পূর্ণ-পরিণত করিয়া দিলাম এবং তোমাদের জন্য ধর্মরূপে একমাত্র ইসলামকে আমার পছন্দনীয় সাব্যস্ত করিলাম।" এই আয়াতের ইঙ্গিতও নবী (সঃ) উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, যেই দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়াতে আমার আগমন হইয়াছিল তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অতএব দুনিয়া হইতে আমার গমন অবধারিত। সেমতে হযরত নবী (সঃ) সর্বসাধারণ সমক্ষে তাঁহার ইহজগত ত্যাগের কথা সর্বপ্রথম প্রকাশ করিলেন সেই ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের মহাসম্মেলনে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে তাহাই ছিল ইসলাম জগতের সর্বাধিক বড় সমাবেশ। কম-বেশী এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মুসলমানের সমাবেশ ছিল তাহা। সম্পূর্ণ অচল বা অক্ষম নিতান্ত বাধাগ্রস্ত ব্যতীত কোন মুসলমান বিদায় হজ্জে অনুপস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয় না।

উক্ত মহাসম্মেলনের ভাষণে নবীজী (সঃ) তাঁহার ইহধাম ত্যাগের ইঙ্গিত নানা রকমে দিয়াছিলেন।

হযরত (সঃ) তাঁহার বক্তব্যের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী করার উদ্দেশে ভাষণের প্রারম্ভে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিলেন– "হে জনমণ্ডলী"! আগামী বৎসর হয়ত এই স্থানে তোমরা আমার সাক্ষাত আর পাইবে না।"

উক্ত ভাষণে নবী (সঃ) মুসলিম জাতির জন্য চির দিনের সুদৃঢ় ভিত্তির উল্লেখে ইহাও বলিয়াছিলেন– "আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর মহাগ্রন্থ রাখিয়া গেলাম; যদি তোমরা উহাকে সুদৃঢ়রূপে ধরিয়া থাক তবে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না।"

রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ ভাষণে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় ইহাও বলিলেন– হে মুসলিমগণ! একদা খোদার সম্মুখে তোমাদের হাযির হইতে হইবে; খবরদার! আমি চলিয়া যাওয়ার পর তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িও না এবং একে অপরের গলা কাটিও না।

ঐ ভাষণের শেষ পর্যায়ে নবী (সঃ) তাঁহার উম্মতের জনসমুদ্র হইতে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালনের সাক্ষ্য আহরণে সকলকে প্রশ্ন করা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন– (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে) তোমাদিগকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে; فما انتم قائلون "তখন তোমরা কি বলিবে? নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই প্রশ্নের উত্তরে সমগ্র জনতা সমস্বরে বলিয়াছিল–

نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ ـ

অর্থ ঃ "আমরা সাক্ষ্য দিব, নিশ্চয় আপনি (আল্লাহর সব হুকুম আমাদেরকে) পৌছাইয়া দিয়াছেন, আপনি (আপনার দায়িত্ব) আদায় করিয়া গিয়াছেন, সকলের সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায় ভাল-মন্দের পার্থক্য দেখাইয়া দিয়াছেন।" এইভাবে উপস্থিত জনতার স্বীকারোক্তি লাভ করার পর নবীজী (সঃ) তাঁহার শাহাদত অঙ্গুলি আকাশের দিকে উথিত করিয়া আবার জনতার প্রতি নামাইলেন– এইরূপে মহান আল্লাহর দৃষ্টি জনতার স্বীকারোক্তির প্রতি আকৃষ্ট করাপূর্বক এই স্বীকারোক্তির উপর আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী বানাইতে যাইয়া তিন বার বলিলেন–

اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ـ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! (আমার কর্তব্য সম্পাদন সম্পর্কে জনতার এই সাক্ষ্য) তুমি শ্রবণ কর! হে আল্লাহ! তুমি ইহা শুনিয়া রাখ!! হে আল্লাহ! তুমি (এই স্বীকারোক্তির উপর) সাক্ষী থাক!!!

ভাষণ সমাপ্তে নবী (সঃ) উপস্থিত জনমণ্ডলীকে এই আদেশও করিলেন যে, উপস্থিতগণ অনুপস্থিতগণকে (আমার শিক্ষা ও আদর্শ) অবশ্যই পৌছাইয়া দিও।

এতদ্ভিন্ন মিনায় ৩/৪ দিন হজ্জের বিভিন্ন কার্য সম্পাদনকালে ক্ষণকাল পর পরই উম্মতের বিচ্ছেদ -ভাবনা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বিচলিত করিয়া তুলিত। তিনি প্রায়ই সঙ্গী-সাথী ছাহাবীগণকে বলিতেন, আমার নিকট হইতে শিখিয়া রাখ! আমার কাছ হইতে শিখিয়া রাখ!! হয়ত আমার সহিত তোমাদের হজ্জ করা আর হইবে না।

সর্বাধিক হৃদয়বিদারক দৃশ্য লক্ষাধিক উম্মতকে অশ্রুসজল করিয়া তুলিল তখন, যখন প্রাণাধিক প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ১০ই যিলহজ্জ এই হজ্জ সমাপনার দিনও কোরবানীর দিন তাঁহার সুদীর্ঘ এবং অন্তর নিংড়ানো ঐতিহাসিক ভাষণ সমাপনান্তে প্রাণপ্রিয় লক্ষাধিক উপস্থিত উম্মতের দিকে মুখ করিয়া বিদায়!! বিদায়!!! কণ্ঠে সকলকে ইহজগতের চিরবিদায় দান করিতেছিলেন; যদ্দরুন এই হজ্জকে বিদায়-হজ্জ নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

তার পর হজ্জ সমাপনান্তে মক্কা হইতে ১৬ই যিলহজ্জ বুধবার মদীনা পানে যাত্রা করিয়া ৪ দিন পথ চলার পর ১৮ই যিলহজ্জ রবিবার পথিমধ্যে "গাদীরে খোম" নামক স্থানে নবী (সঃ) একটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষ

ভাষণ দিয়াছিলেন। সেই বিশেষ ভাষণের প্রারম্ভেও নবী (সঃ) হৃদয়বিদারক কণ্ঠে বলিয়া দিলেন – "হে লোকসকল! আমি মানুষ বৈ নহি; (আর প্রত্যেক মানুষেরই মৃত্যু অবধারিত, সেমতে) আমার নিকট আমার প্রভুর পেয়াদার আগমন অতি নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে; আমিও তাঁহার ডাকে সাড়া দিব।"

দশম হিজরীর শেষ মাস যিলহজ্জ চাঁদের কয়েকটি দিন মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জের সফর শেষে মদীনায় পৌঁছিয়াই ইহজগত হইতে বিদায় গ্রহণের ভূমিকায় বিদায়ী কার্যকলাপ অতি ব্যবস্থার সহিত দ্রুত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

প্রথমেই নবী (সঃ) স্বীয় মসজিদের মিম্বরে আরোহণপূর্বক তাঁহার পরবর্তীতে জাতির কর্ণধার হওয়ার যোগ্য কতিপয় ব্যক্তিত্বের আলোচনায় সর্বসমক্ষে ভাষণ দিলেন। পরে রোগ শয্যায় ত এই ব্যাপারে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে নির্ধারিত করার কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্তই করিয়া দিয়াছিলেন (ষষ্ঠ খণ্ড, আবু বকর (রাঃ)-এর আলোচনায় মুসলিম শরীফের হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

ইসলামকে বাধামুক্ত এবং উহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখায় জাতির কর্ণধারকে সদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে– এই মহা কর্তব্য শিক্ষা দানের বিশেষ ভূমিকাও তিনি সম্পাদন করিলেন।

তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তি রোমানগণ মুসলিম জাতিকে সদা উৎপীড়ন করিত। এক বৎসর পূর্বে স্বয়ং হযরত (সঃ) বৃহত্তম সৈন্যবাহিনী লইয়া সুদূর তাবুক পর্যন্ত ভয়াবহ কষ্ট-ক্লেশে অভিযান চালাইয়া তাহাদের অগ্রাভিযান পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের বিরুদ্ধেই মুতার জেহাদে হযরতের প্রিয়পাত্র পোষ্যপুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) এবং চাচাত ভাই জাফর (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। সেই রোমানদের বিরুদ্ধেই প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় অন্তিম রোগাক্রান্তির মাত্র দুই দিন পূর্বে ২৮ই সফর সোমবার যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-এর পুত্র ওসামা (রাঃ)-কে অধিনায়ক করিয়া সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিলেন। বুধবার রোগাক্রান্ত হইয়া রোগ শয্যায় বৃহস্পতিবার নিজ হস্তে ঐ বাহিনীর হাতে পতাকা দানের অনুষ্ঠান পরিচালনাপূর্বক যাত্রা করাইয়া দিলেন। অবশ্য সেই বাহিনী যাত্রা করার পরই হযরতের অবস্থার অবনতির সংবাদে যাত্রা মুলতবী রাখে।

রোগাক্রান্ত হইয়া অন্তিম শয্যায় শায়িত হওয়ার পূর্বে ২/৩ দিন প্রিয়নবী (সঃ) বিদায়ী কার্যাবলীতে নিতান্ত ব্যস্ত থাকিতেছিলেন। বিশেষতঃ নিজ সঙ্গী-সাথী জীবনোৎসর্গকারী ছাহাবীগণের এবং স্বীয় উম্মতের স্মরণই যেন প্রিয় নবীজী (সঃ)-কে অহরহ বিচলিত করিতেছিল। তাঁহাদের হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব ব্যথিত হৃদয়ের সহিত তিনি দ্রুত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। জীবিত সঙ্গী-সাথীগণ হইতে ত বিদায় হজ্জের সমাবেশেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন জীবনের হারানো সঙ্গীগণ হইতে বিদায় গ্রহণের বেদনা নবীজী (সঃ)-কে প্রথমে ওহুদ পর্বতের নিকটে নিয়া আসিল। এই পর্বতের পাদদেশেই চিরনিদ্রায় শুইয়া আছেন নবীজীর চরণপ্রান্তে থাকিয়া ইসলামের সেবায় আত্ম-বলিদানকারী হযরতের চাচা শহীদ সর্দার হামযা (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ। ৭০ জন শহীদানের সমাধির কিনারায় দাঁড়াইলেন নবী (সঃ) এবং স্মরণ করিলেন দীর্ঘ আট বৎসর পূর্বের হৃদয়বিদারক স্মৃতি; ভাসিয়া উঠিল অশ্রুপূর্ণ চোখের সামনে ছিন্ন-ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শহীদ দেহসমূহ, কাঁদিয়া উঠিল বিদীর্ণ হৃদয়। সেই মুহূর্তে কী প্রাণঢালা আবেগই না বহিয়া পড়িল তাঁহার রোদন জড়ানো কণ্ঠ হইতে! তাঁহাদের জন্য তিনি প্রাণ ভরিয়া দোয়া করিলেন। শহীদানের মৃত দেহ অবিকৃত থাকে; অনেকের মতে নবী (সঃ) ঐ আবেগপূর্ণ মুহূর্তে তাঁহাদের জন্য নিয়মিত জানাযার নামাযও পড়িলেন; ঐ শহীদানের প্রতি আবেগ যেন তাঁহার বিদীর্ণ অন্তর হইতে উথলিয়া উঠিতেছিল!

ওহুদ প্রান্ত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সোজা মসজিদে যাইয়া মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং স্বীয় পরকালের যাত্রার সংবাদ সকলকে অবহিত করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের আগেই তোমাদের সুব্যবস্থার জন্য পরপারের দিকে রওয়ানা করিতেছি, আমি (দ্বীন-ইসলামের সেবায় আত্মোৎসর্গ করা সম্বন্ধে প্রভুর দরবারে) তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দান করিব। (চির বিদায়ের পর) হাউজে কাউসারের কিনারায় তোমাদের সঙ্গে পুনঃ সাক্ষাতের অঙ্গীকার থাকিল। (হাউজে কাউসার প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, কল্পনাপ্রসূত বস্তু নহে,)

এখানে বসিয়া আমি তাহা অবলোকন করিতেছি। (উম্মতকে সান্ত্বনাদানে বলিলেন, তোমাদের বর্তমান দারিদ্র্য থাকিবে না।) সমুদয় বিশ্ব সম্পদের চাবি আমাকে প্রদান করা হইয়াছে। (তোমরা তাহা হস্তগত করিতে সক্ষম হইবে। তখনকার অবস্থা মনে করিয়া তোমাদের জন্য আমি দুনিয়াকে অত্যধিক ভয় করিতেছি। এমনকি) আমি এই ভয় করি না যে, তোমরা (পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় স্বীয় নবীর তিরোধানের পর ব্যাপকভাবে প্রকাশ্য দেব-দেবীর পূজায়) শেরকের মধ্যে লিপ্ত হইবে। কিন্তু আমি তোমাদের জন্য দুনিয়াকে অত্যন্ত ভয় করি যে, তোমরা প্রতিযোগী হইয়া দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকিবে এবং সেই আকর্ষণই তোমাদের ধ্বংস করিবে; যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণকে দুনিয়ার আকর্ষণ ও মোহ ধ্বংস করিয়াছে।

এইভাবে নবীজী (সঃ) জীবিত-মৃত সকল হইতে বিদায় গ্রহণ পর্ব সমাধা করিয়াছিলেন। রোগ শয্যায় শয়নের দিন আসিয়া গিয়াছে– এই শেষ মুহূর্তে মদীনার কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে শায়িত সাথীগণ হইতে বিদায় গ্রহণের পালা আসিল। জান্নাতুল বাকী মদীনার সাধারণ গোরস্থান; এই গোরস্থানে জীবনের অনেক সঙ্গী শুইয়া আছেন– তাঁহাদের হইতে বিদায় গ্রহণের ইঙ্গিত আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আসিল। ২৯ সফর মঙ্গলবার দিন শেষে ৩০ সফর বুধবার দিনের রাত্র আসিল; গভীর রজনীতে নবী (সঃ) স্বীয় খাদেমকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া বলিলেন, "বাকী" গোরস্থানে যাইয়া তথা সমাহিতদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। সেমতে হযরত (সঃ) খাদেমকে লইয়া তথায় পৌঁছিলেন এবং নীরবে শায়িত বন্ধুগণকে সালামের সাথে ইহাও বলিলেন যে, শীঘ্রই আমি তোমাদের সাথে মিলিত হইতেছি। অতপর ঐ গোরস্থানবাসীদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিলেন। বার বার তাঁহাদের জন্য দোয়া করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া ইহাও বলিলেন যে, তোমরা যে অবস্থায় রহিয়াছ তাহা জীবিতদের অবস্থার তুলনায় অনেক উত্তম। (জীবিতদের সম্মুখে) অন্ধকার রজনীর ঘনীভূত অন্ধকারের ন্যায় ফেতনা (ভ্রষ্টতায় পতিত হওয়ার কারণসমূহ) ঘনাইয়া আসিতেছে; প্রত্যেক পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটি অপেক্ষা ভয়াবহ কঠিন। অতএব তোমাদের অবস্থা অভিনন্দনের যোগ্য।

অতপর খাদেমকে সম্বোধন করিলেন– হে আবু মোআইহবাহ্! আল্লাহ তাআলা আমাকে অধিকার দিয়াছেন দুনিয়ার ধন-সম্পদ, তারপর বেহেশত অথবা আল্লাহর সাক্ষাত ও বেহেশত উভয়টির কোন একটি গ্রহণের। খাদেম প্রথমটি গ্রহণের কথা বলিলেন। নবী (সঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহর সাক্ষাত ও বেহেশত গ্রহণ করিয়াছি। (বেদায়া, ৫–২২৪)

এই রাত্রে নবী (সঃ) মায়মুনা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। গভীর রাত্রে গোরস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই নবী (সঃ) শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইলেন– এই তাঁহার রোগের সূচনা।

ইতিমধ্যে নবী (সঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে শিরঃপীড়ায় অস্থির দেখিতে পাইয়া প্রথমে কৌতুক ও সোহাগের ভাষায় আলাপ করিলেন। অতপর স্বীয় অসুস্থতার কথা প্রকাশ করিলেন এবং আয়েশা (রাঃ)-কে বলিলেন, তোমার কী মাথা ব্যথা! মাথা ব্যথা ত আমার!!

এর পরই ব্যথা ও জ্বরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিল। রোগের প্রথম দিকে নবী (সঃ) তাঁহার নীতি অনুযায়ী এক এক বিবির গৃহে অবস্থান করিয়া যাইতেছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতিতে তিনি বিবিগণকে একত্র করিয়া আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহেই অবস্থানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সকলেই তাহাতে একমত হইলেন। তখন নবী (সঃ) অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন; তাই মাথায় কাপড় বাঁধিয়া দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করতঃ আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে আসিলেন।

রোগ যাতনায় জর্জরিত ও দুর্বল এই অবস্থায় চাচা আব্বাসের ছেলে ফজলকে ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, আমাকে হাত ধরিয়া মসজিদে নিয়া চল। মসজিদে আসিয়া মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং লোকদের নামাযের জন্য ডাকিতে বলিলেন। তারপর কষ্ট-যাতনার মধ্যেও দাঁড়াইয়া ভাষণ দিলেন– হে লোকসকল! তোমাদের হইতে আমার বিদায় অতি নিকটবর্তী, তোমাদের মধ্যে আমাকে আর দেখিতে পাইবে

না। তোমাদের নিকট আমি একটি জরুরী কথা বলিব; অন্য কাহারও দ্বারা তাহা বলা হইলে যথেষ্ট হইবে না বিধায় আমি নিজেই তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। তোমরা লক্ষ্য করিয়া শুন– আমি কাহারও পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া থাকিলে আমার পৃষ্ঠ তাহার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে–. সে যেন আমার নিকট হইতে প্রতিশোধ নিয়া নেয়; কেহ যেন ভয় না করে, প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে আমার মনে আক্রোশ থাকিবে । স্মরণ রাখিও, কাহারও প্রতি আক্রোশ রাখা আমার স্বভাবে নাই। আমার সর্বাধিক ভালবাসা ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমার হইতে তাহার হক আদায় করিয়া নিবে অথবা দাবী ছাড়িয়া মাফ করিয়া দিবে। আমি আল্লাহর সাক্ষাতে এমন পাক-সাফ হইয়া যাইতে চাই যে, আমার উপর কাহারও কোন দাবী না থাকে। নবী (সঃ) পুনঃ পুনঃ এই বক্তব্য সকলের সম্মুখে রাখিয়া অন্তিম শয্যায় এক মহা আদর্শ শিক্ষা দিয়া গেলেন যে, "হক্কুল এবাদ" হইতে কিরূপ সতর্ক হওয়া চাই।

রোগ অবস্থায়ও নবী (সঃ) মসজিদে নামাযের ইমামতি করিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু দ্রুত বেগে দিনের পর দিন ক্রমান্বয়ে তাঁহার রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। মৃত্যুর চারি দিন পূর্বে বুধবার সূর্যাস্তের পর (বৃহস্পতিবার রাত্রে) মাগরিবের নামাযই তাঁহার ধারাবাহিক ইমামতির শেষ নামায ছিল। এই রাত্রে এশার নামাযে তিনি আসিতে সক্ষম হইলেন না। মাথায় চক্র আসার দরুন বার বার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইলেন; নামাযের জন্য উঠিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া যাইতেন; অবশেষে আবু বকর (রাঃ)-কে ইমাম হইয়া নামায পড়াইবার আদেশ করিয়া দিলেন।

রবিবার দিন দুপুর পর্যন্ত নবী (সঃ) সময় সময় চেতনা হারাইতেছিলেন। এই দিন তাঁহাকে নিউমোনিয়া রোগের ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু তিনি ঔষধ সেবনে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি যেন আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়া ফেলিয়াছেন, তাই দাওয়া-দোয়া কোনটার প্রতিই আর তাঁহার আকর্ষণ নাই; তাঁহার মনে এই জপনাই আসিয়া গিয়াছে যে, ঊর্ধ্বজগতের বন্ধুর মিলন চাই। কিন্তু ভক্ত-অনুরক্তগণ এই অনিচ্ছাকে ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ অনীহা মনে করিয়া চেতনা লোপ পাওয়ার সুযোগে তাঁহার মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিল। চেতনা ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থাস্বরূপ সকলকে ঐ ঔষধ খাইতে বাধ্য করিলেন।

কয়েক দিন যাবত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাধারণ সাক্ষাত হইতে ভক্ত-অনুরক্ত ছাহাবীগণ বঞ্চিত। এমনকি নামাযের জমাতেও আর সাক্ষাত হয় না, তাই তাঁহারা ব্যাকুল অবস্থায় জটলা বাঁধিয়া বসেন এবং কাঁদেন। আনসারগণের এইরূপ এক দৃশ্য দেখিয়া আব্বাস (রাঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আনসারগণের অবস্থা জ্ঞাত করিলেন।

আজ তাঁহার জীবনের আর মাত্র একটি দিন বাকী রহিয়াছে। আজ রবিবার। এই রবিবার তিনি দুপুর বেলা সামান্য স্বস্তি অনুভব করিয়াছেন– দীর্ঘ জীবনের সঙ্গী-সাথীগণের সহিত চির বিদায়ের শেষ সাক্ষাত লাভের জন্য তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি বিশেষ কায়দায় মাথায় ও গায়ে পানি ঢালিয়া দেহের স্থবিরতা দূর করিলেন এবং মসজিদে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন, কিন্তু তিনি মাথা ব্যথায় অস্থির এবং দুর্বল– অতি দুর্বল। আয়েশা (রাঃ) করুণ দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন, নবী (সঃ) মাথায় কাপড় আঁটিয়া দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করিয়া চলিয়াছেন। এইভাবেও পদচালনায় তিনি সক্ষম নহেন। পদদ্বয় মাটির উপর রেখা টানিয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় তিনি মসজিদে পৌঁছিলেন; তখন যোহরের নামায আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইমামতিতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় হযরত নবী (সঃ) আবু বকরের বাম পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন এবং ঐ নামাযেরও ইমাম তিনি হইলেন। আবু বকর (রাঃ) পিছনে হটিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কণ্ঠস্বর দুর্বলতার দরুন অতি ক্ষীণ এবং তিনি বসিয়া ইমামতি করিতেছেন– তাই আবু বকর (রাঃ)-কে স্বীয় পার্শ্বেই মোকাব্বেররূপে রাখিয়া নামায সমাপ্ত করিলেন।

নামাযের পর নবী (সঃ) চির বিদায়লগ্নে শেষ বারের মত তাঁহার দীর্ঘ দিনের মিম্বরে আরোহণ করিলেন।

একে ত অতিশয় দুর্বল, তদুপরি প্রাণপ্রিয় ছাহাবীগণ হইতে চির বিদায়ের মুহূর্ত; তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ, তাই উপস্থিত শোকাভিভূত ভক্তবৃন্দকে মিম্বরের নিকট ঘনাইয়া বসিবার আদেশ করিলেন এবং ভগ্ন হৃদয়ে বেদনা বিজড়িত স্বরে বিদায়ী ভাষণ আরম্ভ করিলেন।

প্রথমতঃ তিনি তাঁহার আখেরাতের সফরকে অগ্রাধিকার প্রদান করার ইঙ্গীত নিজের নাম গোপন রাখিয়া এই ভাষায় উল্লেখ করিলেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁহার জনৈক দাসকে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ এবং দীর্ঘায়ুর অধিকার দান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাহার পরিবর্তে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলিয়া যাওয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর আনসারগণের সুদীর্ঘ আলোচনা করিলেন; তাহাদিগকে স্বীয় ভিতর-বাহিরের বন্ধু আখ্যায়িত করিয়া ইসলামের জন্য তাঁহাদের কোরবানী দানের এবং দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি দিলেন। তারপর সকল উম্মতকে অসিয়ত করিলেন, আনসারদের সেবার পূর্ণ স্বীকৃতি দানের এবং তাঁহাদের প্রতি সহিষ্ণু হওয়ার। এই ভাষণে নবী (সঃ) বিশেষভাবে নবী-পয়গম্বরগণের কবর সেজদা করার উপর লানত অভিশাপের কথা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন, খবরদার! আমার কবরকে তোমরা দেবতা বানাইও না– এই কাজ হইতে আমি পুনঃ পুনঃ তোমাদের নিষেধ করিতেছি। এই ভাষণে নবী (সঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর আত্মত্যাগ ও ইসলামের সেবার অতুলনীয় স্বীকৃতি দানপূর্বক তাঁহার বৈশিষ্ট্যের ঘোষণা করিলেন।

এই ভাষণের পর নবী (সঃ) আর লোকসমক্ষে আসিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে উম্মতের হিত কামনা এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের বাসনা এতই বদ্ধমূল ছিল যে, অন্তিম রোগের ভীষণ যাতনাও তাঁহাকে তাহা মুহূর্তের জন্য ভুলাইতে পারিত না। অসহ্য যাতনা ও সীমাহীন দুর্বলতার মধ্যে তাঁহার শেষ শয্যাকক্ষ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে শয্যাপার্শ্বে ছাহাবীগণকে সমবেত করিলেন। সকলকে সম্বোধনপূর্বক করুণা বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন–

আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন, তোমাদের ব্যথা-বেদনা দূর করুন, তোমাদিগকে নেয়ামত দান করুন, সাহায্য দান করুন, উন্নতি দান করুন, আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ে তোমরা নিরাপদ হইয়া থাক।

আমি তোমাদিগকে আল্লাহর নামে অসিয়ত করিয়া যাইতেছি, তোমরা ধর্মভীরু হও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করিয়া যাইতেছি। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হইতে সতর্ক করিয়া যাইতেছি, আল্লাহর পক্ষ হইতে সতর্কবাণী শুনাইয়া যাইতেছি। সাবধান! আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বান্দাদের উপর অহঙ্কার ও অন্যায় আচরণ করিও না।

সদা স্মরণ রাখিও, আল্লাহ আমার এবং তোমাদের জন্য বলিয়া দিয়াছেন–

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ـ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "পরকালের শান্তি নিবাস বেহশত আমি সেই সকল লোকদের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার দেখায় না, বিপর্যয় ঘটায় না এবং সংযমশীল খোদাভীরু লোকগণই পরিণামে কল্যাণ লাভ করিবে।"

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন– اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ

অর্থ ঃ "অহঙ্কারীদের বাসস্থান অবশ্যই জাহান্নামে হইবে।"

ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার শেষ মুহূর্ত কবে? হযরত (সঃ) বলিলেন, বিদায় অতি নিকটবর্তী, যাত্রা আল্লাহর সন্নিধানে এবং চিরস্থায়ী বেহেশতের দিকে।

এতদ্ভিন্ন এই সাক্ষাতে ছাহাবীগণ নবী (সঃ)-কে শেষ নিঃশ্বাসের পর গোসল দান, কাফন পরানো এবং

জানাযার নামায সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে উম্মত হইতে শেষ বিদায় গ্রহণে নবী (সঃ) বলিলেন, তোমরা আমার অনুপস্থিত ছাহাবীগণকে আমার সালাম পৌঁছাইয়া দিও এবং কেয়ামত পর্যন্ত যাহারা আমার অনুসারী হইবে তাহাদের সকলের প্রতি আমার সালাম থাকিল।

এতদ্ভিন্ন নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তিম শয্যা ঘনাইয়া আসার সময় হইতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষণে উম্মতের জন্য বহু মূল্যবান নসীহত, উপদেশ ও তথ্যাবলী রাখিয়া গিয়াছেন। "অন্তিম শয্যায় নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিভিন্ন ভাষণ" শিরোনামে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। পাঠকগণ ঐ পৃষ্ঠাগুলি বারংবার পাঠ করিবেন।

ইতিমধ্যে এক সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। এমন সময় সর্বাধিক স্নেহের তনয়া ফাতেমা (রাঃ) তথায় পৌঁছিলেন। নবী (সঃ) ফাতেমা (রাঃ)-কে ক্ষীণ কণ্ঠে স্নেহভরে বলিলেন, হে বৎস!" তোমাকে জানাই মারহাবা! এই বলিয়া স্নেহের কন্যাকে অতি নিকটে বসাইলেন এবং চুপি চুপি স্বীয় বিদায়ের কথা জ্ঞাত করিয়া বলিলেন– আল্লাহকে ভয় করিয়া ধৈর্যধারণ করিও। জানিয়া রাখিও, আমি তোমার উপকারের জন্য উত্তম অগ্রগামী হইয়া যাইতেছি। ফাতেমা (রাঃ) ইহা শুনামাত্র ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নবী (সঃ) সান্ত্বনা দানে তাঁহার কানে কানে বলিলেন, "তুমি সন্তুষ্ট হও যে, তুমি বেহেশতের মধ্যে নারীগণের সর্দার-মুকুটমণি গণ্য হইবে এবং তুমি শান্ত হও; আমার পরিজনের মধ্যে সর্বাগ্রে তুমিই (ইহজগত ত্যাগ করিয়া) আমার সহিত মিলিত হইবে।" এতদশ্রবণে ফাতেমা (রাঃ) আনন্দে হাসিলেন।

বিশ্ব মানবের নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এই নশ্বর পৃথিবী হইতে চির বিদায়ের আয়োজনে নিজকে পার্থিব অর্থ-সম্পদ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব করিয়া নিয়াছিলেন। দুনিয়ার ধন-দৌলত গৃহে রাখিয়া খোদার সাক্ষাতে যাইবেন– ইহাতে যেন তিনি লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। এমনকি শেষ কয় দিনের জন্য পরিবারের আহার যোগাইতে এক ইহুদীর নিকট হইতে ধারে আটা ক্রয় করিয়া স্বীয় লৌহবর্ম বন্ধক রাখিয়া গিয়াছেন। কোন মুসলমানের নিকট হইতে ঐ ধার গ্রহণ করেন নাই এই আশঙ্কায় যে, হয়ত সে স্বীয় সাধ্যের অধিক চাপ সহ্য করিয়া ধার দেওয়ার পরিবর্তে হাদিয়া দানপূর্বক স্বীয় নবীকে ঋণমুক্ত করার চেষ্টা করিবে। নিজের জন্য কোন ভক্তের উপর এই সামান্য চাপের আশঙ্কাও নবী (সঃ) এড়াইয়া গিয়াছেন। এইভাবে মৃত্যুমুখেও নবী (সঃ) দুনিয়া হইতে নির্লিপ্ত থাকার সোনালী আদর্শ শিক্ষা দান করিয়া চলিয়াছেন।

১১ই রবিউল আউয়াল রবিবার– প্রিয় নবী (সঃ) আর মাত্র একটি দিনই পৃথিবীর অতিথি। দুপুর বেলা হইতে তিনি রোগ যাতনার অপেক্ষাকৃত মামুলী লাঘব বোধ করিলেন। স্ববংশীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুরব্বী শ্রেণী এই লাঘবকে নৈরাশ্যব্যঞ্জক গণ্য করিলেন বটে, কিন্তু অন্যরা রোগ প্রকোপের এই লাঘবতায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। যাঁহারা এতদিন ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সন্নিকটে ভিড় জমাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এই সুযোগে নিজ নিজ বাড়ী দেখিয়া আসিবার জন্য চলিয়া গিয়াছেন।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইহজীবনের সর্বশেষ রাত্রিটি ঐ অবস্থায় কাটিয়াছে। এমনকি পর দিন সোমবার প্রভাতে নবীজীর মসজিদে আবু বকর (রাঃ)-এর ইমামতিতে ফজর নামাযের জামাত আরম্ভ হইয়াছে। জাতির ইমাম তথা পরিচালক নির্ধারণের ইঙ্গিত অর্থে নবী (সঃ) চারি দিন পূর্ব হইতেই আবু বকর (রাঃ)-কে স্বীয় মসজিদের ইমাম বানাইয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার পিছনে নির্দ্বিধায় একতাবদ্ধরূপে মুসলমানদের সারিবদ্ধ হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করিয়া চোখ জুড়াইবার অভিলাষ তাঁহার মনে উদিত হইল। তাই তিনি শত দুর্বলতা সত্ত্বেও শয্যা হইতে অতি কষ্টে দাঁড়াইয়া কক্ষের দরজার নিকটে আসিলেন। দরজার কপাট ছিল না; চটই উহার আবরণ ছিল– উহা ফাঁক করিয়া আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য দেখার জন্য মসজিদের প্রতি তাকাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ মুসল্লীগণের দৃষ্টি পড়িয়া গেল তাঁহার প্রতি, এমনকি ইমাম আবু বকর (রাঃ)-এর দৃষ্টিও তাঁহার প্রতি আসিয়া গেল। সকলেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পিছনে নামায

পড়ার সুযোগ প্রাপ্তির আশায় আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। মুসল্লীগণ নূতনভাবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পিছনে নিয়ত বাঁধিবার আশায় পূর্ব নিয়ত ছাড়িয়া দিতে এবং আবু বকর (রাঃ)ও মোক্তাদী হওয়ার আশায় ইমামতি ত্যাগ করিয়া পেছনে চলিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। সকলের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দিল। নবী (সঃ)ও তাঁহার নির্ধারিত ইমামের পিছনে মুসলমানগণকে শ্রেণীবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। আনন্দের অতিশয্যে তাঁহার চেহারা মোবারক হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি ত দুর্বল হইতে দুর্বলতর, হাসির আলোমাখা সুন্দর চেহারাখানি রক্ত শূন্যতার কারণে ফেকাসে দেখাইতেছিল; তিনি ত কিছু সময় দাঁড়াইয়া থকিতেও অক্ষম। তাই ভক্তবৃন্দ ছাহাবীগণকে হাতের ইশারায় নিরাশ করিয়া দরজার আবরণ ছাড়িয়া দিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চেহারা মোবারক ছাহাবীগণের নজরে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া আবার পর্দার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহাই ছিল ছাহাবীদের জন্য প্রাণ-প্রিয় নবী (সঃ)-কে জীবিত দেখার সর্বশেষ মুহূর্ত।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থা এতটুকু মন্দের ভাল মনে করিয়া নামায শেষে আবু বকর (রাঃ) আজ বাড়ী গেলেন। ইতিমধ্যেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবস্থা নিমিষের মধ্যে গুরুতররূপে দ্রুত অবনতি হইতে অবনতির দিকে মোড় নিয়া নিল। পরিবার-পরিজনের মধ্যে হায়-হুতাশের রোল পড়িয়া গেল।

এক দিকে আকাশের সূর্য উদয়ের পথে আগমন করিতেছিল, অপর দিকে কুল মখলুকাতের সূর্য অস্তের দিকে গমন করিতেছিল। পত্নীগণ সকলেই উপস্থিত আছেন, স্নেহের তনয়া ফাতেমা (রাঃ)ও ছুটিয়া আসিয়াছেন। পয়গম্বরী আকাশের সূর্য অস্তের দিকে যাইতে যাইতে ম্লান হইয়া আসিতেছে। মৃত্যুর স্বাভাবিক যাতনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চেহারার রং ঘন ঘন পরিবর্তন হইতেছে; চেতনা লোপ পাইতেছে আবার ফিরিয়া আসিতেছে- এইরূপে মৃত্যুর মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই যাতনার দৃশ্য ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জন্য অসহনীয় হইয়া উঠিল; তিনি কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হায়! আমার আব্বার কী কষ্ট!! নবী (সঃ) ম্লান কণ্ঠে বলিলেন, এই সময়ের পরে তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট থাকিবে না। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতিটি মুহূর্ত নিতান্ত অস্থিরতার মধ্যে কাটিতেছিল, এমতাবস্থায়ও তিনি আদর্শ প্রচারে ক্ষান্ত ছিলেন না। শায়িত অবস্থায় গায়ে চাদর ছিল; অস্থিরতার দরুন মুখে মাথায় চাদর টানিয়া দিতে লাগিলেন, আবার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রমে তাহা অপসারিত করিতেছিলেন- এই অস্থিরতার মধ্যেও স্বীয় উম্মতের জন্য সতর্কবাণী রাখিয়া যাইতেছিলেন- "ইহুদ-নাসারাদের উপর আল্লাহর লা'নত; তাহারা তাহাদের পীর-পয়গম্বরগণের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল।

যাতনার দরুন অস্থিরতা চরমে পৌঁছিয়াছে; কী অবস্থায় শান্তি অনুভব করিবেন তাহাই যেন খুঁজিতে ছিলেন। মাথা একবার বালিশ হইতে সরাইয়া আয়েশার উরুর উপর রাখিলেন। আয়েশা (রাঃ) শেষ বারের মত একটি তদবীর করিতে চাহিলেন। তিনি শেফা তথা আরোগ্যের জন্য বিশেষ দোয়া পড়িয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামর মুখ মণ্ডলে হাত বুলাইতে লাগিলেন। নবী (সঃ) তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, বরং আমি ত সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর মিলন চাই। রবিবার দিন তিনি ঔষধ সেবনে অনীহা প্রকাশ করিয়াছিলেন; আজ তিনি বাঁচার পক্ষে দোয়ার তদবীরেও বাধা দিলেন। (বেদায়া, ৫-২৪০)। কারণ, এই সময় ত তিনি মহাযাত্রার আরম্ভে রহিয়াছেন। এই সঙ্কট মুহূর্তেও নবী (সঃ) উম্মতের হিত কামনা ভুলেন নাই। উম্মতকে সতর্ক করার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। আলী (রাঃ)-কে ডাকিয়া আনিলেন এবং কিছু লিখিয়া দিয়া যাওয়ার কোন বস্তু নিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার অবস্থা এতই সঙ্কটের মধ্যে ছিল যে, আলী (রাঃ) আশঙ্কা করিলেন, ঐ বস্তুর জন্য উঠিয়া গেলে হয়ত ফিরিয়া আসিয়া নবীজী (সঃ)-কে আর পাইবেন না। তাই আলী (রাঃ) বলিলেন, যাহা লিখাইতে চাহেন মুখে বলিয়া দিন; আমি তাহা সযত্নে স্মরণ রাখিব। নবী (সঃ) বলিলেন,

(উম্মতের জন্য) আমি শেষ অসিয়ত করিয়া যাইতেছি– নামায, যাকাত এবং করতলগত অধীনস্থদের প্রতি বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য রাখার।

শেষ মুহূর্ত আসিয়া গিয়াছে। মৃত্যু যাতনার প্রাবল্যে কোন অবস্থার উপর স্থিরতা সম্ভব হইতেছিল না। এই সময় প্রিয়তমা বিবি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বক্ষের সহিত হেলান দিয়া আছেন, কণ্ঠনালীতে গরগর শব্দ হইতেছে, শ্বাসনালী আবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, মুখে জড়তা আসিয়া গিয়াছে। শুধুমাত্র উম্মত এবং ব্যক্তিগত ধ্যানই হৃদয়পটে আছে। উম্মতের জন্য বার বার বিড়বিড় শব্দে বলিতেছিলেন– আস্‌সালাহ্, আস্‌সালাহ্... "সাবধান!! নামায, নামায এবং করতলগত অধীনস্থ।" আর নিজের জন্য শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু আল্লাহ তাআলার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশে নিম্নবর্ণিত বুলিসমূহই বার বার উচ্চারণ করিতেছিলেন।

(১) আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, ঊর্ধ্বজগতের বন্ধুদের সহিত আমার মিলন করাইয়া দাও। (২) ঐ লোকদের সাথী বানাইয়া দাও যাঁহাদের উপর আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত বর্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেককারগণ; তাঁহারাই হইতেছেন উত্তম সাথী। (৩) আয় আল্লাহ! সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর মিলন চাই।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই পরিস্থিতিতে আমরা সুস্পষ্ট বুঝিয়া নিলাম, নবী (সঃ) আর আমাদের নিকট থাকিতেছেন না। তিনি মৃত্যু যাতনায় নিতান্তই অস্থির; আল্লাহর সান্নিধ্যে যাত্রা করিবেন– এই মুহূর্তে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মেসওয়াক করিয়া মুখ পরিষ্কার করার ইচ্ছা উদিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যবস্থাও হইয়া গেল। ঐ সময়ই আয়েশা (রাঃ)-এর ভ্রাতা মেসওয়াকের একখানা ডালা হাতে তথায় উপস্থিত হইলেন। আয়েশা (রাঃ) উহার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ অনুভব করিয়া চিবাইয়া মোলায়েম করিয়া দিলেন। নবী (সঃ) তাহা দ্বারা সুন্দর মত মেসওয়াক করিলেন। নিকটবর্তী একটি পাত্রে পানি ছিল, তাহাতে তিনি উভয় হাত ভিজাইয়া মুখমন্ডল শীতল করিতে লাগিলেন এবং অসহনীয় যাতনার মধ্যে বলিতেছিলেন– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মৃত্যুর যাতনা অনেক।"

এই অবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই দোয়াও করিতেছিলেন–

اللهم اعنى على سكرات الموت –আয় আল্লাহ! মৃত্যুর যাতনা ও কষ্ট উপশমে আমাকে সাহায্য করুন। (তিরমিযী শরীফ)

অস্ত্রোপচারে পীর-পয়গম্বর সকলেরই ব্যথা-যন্ত্রণা হওয়া স্বাভাবিক; মৃত্যু ত বড় হইতে বড় অস্ত্রোপচার অপেক্ষা কঠিন।

অতপর উপরের দিকে হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন–

فى الرفيق الاعلى সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর মিলনে চলিলাম -এই বাক্য উচ্চারণের সাথে সাথেই উত্তোলিত হস্তদ্বয় শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল এবং সাইয়্যেদুল মোরসালীন মাহবুবে রব্বুল আলামীন ইহজীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছ্‌হাবিহী অসাল্লাম।

"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন"

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যুতে তাঁহার শোকাভিভূত পরিবার-পরিজনকে সর্বপ্রথম সান্ত্বনা দান করিয়াছেন হযরত খিজির (রাঃ)। তিনি অদৃশ্য থাকিয়া শুধু কণ্ঠস্বরে গৃহকোণ হইতে শুনাইয়াছেন– হে গৃহবাসী! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নিশ্চয় আল্লাহর (রহমতের) মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সব রকম দুঃখ-বিপদের সান্ত্বনা, সর্বপ্রকার হারানো বস্তুর বিনিময়, সকল রকম ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষতিপূরণ। অতএব আপনারা সকলে আল্লাহকে ভয় করিবেন এবং একমাত্র তাঁহার হইতেই সব কিছুর আশা রাখিবেন। নিশ্চয় প্রকৃত বিপদগ্রস্ত একমাত্র ঐ ব্যক্তি যে (ধৈর্যহারা হইয়া বিপদের) সওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকে। (কণ্ঠস্বর শুনিয়া) আলী (রাঃ) বলিলেন, তোমরা জান তিনি কে? তিনি হইলেন খিজির (আঃ)। (মেশকাত শরীফ, ৫৫০)

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ওফাতে ছাহাবীগণের সকলের উপর শোকের তুফান বহিয়া যাইতেছিল, সকলেই বিহ্বল অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমনকি লৌহ মানব ওমর ফারুক (রাঃ)সহ অনেক ছাহাবীর চেতনাই লোপ পাইয়া গেল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মৃত্যু স্বীকার করার মত বোধশক্তিও তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। একমাত্র আবু বকর (রাঃ)-ই ঐ মুহূর্তে বাহ্যিক ধীরস্থিরতা রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। গায়েবী নির্দেশ অনুসারে নবী (সঃ)-কে তাঁহার গায়ে জামা রাখিয়াই গোসল দেওয়ার পর তিনখানা সাদা সূতি কাপড়ে কাফন পরানো হইল, যেই জামায় গোসল দেওয়া হইয়াছিল উহা অপসারণ করা হইল। তারপর একমাত্র নবীগণের জন্য ব্যবস্থারূপে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার কক্ষেই বুগলী কবর তৈয়ার করিয়া শবদেহ কবরের কিনারায় রাখিয়া দেওয়া হইল। নিয়মিত জানাযা পড়া হইল না। কারণ, নবীগণের মৃত্যু বস্তুতঃ মৃত্যু হয় না। তাঁহাদের পবিত্র আত্মা দেহের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, শুধুমাত্র তাহার ক্রিয়াকলাপ ধুলার ধরণীর মধ্যে থাকে না। এই কারণেই নবীগণের স্ত্রীদের অন্যত্র বিবাহ হইতে পারে না, তদ্রূপ জানাযারও প্রয়োজন হয় না। অবশ্য শবদেহ সম্মুখে রাখিয়া দরূদ-সালাম পাঠ করা হইতেছিল। প্রথমে ফেরেশতাগণ দরূদ ও সালাম পাঠ করিয়াছেন, তারপর মুসলমান পুরুষগণ, তারপর মহিলাগণ, তারপর অপ্রাপ্ত বয়স্কগণ, তারপর দাস-দাসীগণ পর্যন্ত। এইভাবে সোমবার দ্বিপ্রহরের পর হইতে দুই বা তিন দিন পর্যন্ত দরূদ-সালাম পাঠ করা হয়। সেই যুগে দূর-দূরান্তে সহজ ও দ্রুত যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা মোটেই ছিল না, পার্বত্য এলাকার লোকসংখ্যা বেশী ছিল না। মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার ত্রিশ হাজার মানুষ দলে দলে দরূদ-সালাম পাঠ করেন। তারপর মঙ্গলবার বা বুধবার দিনের পর রাত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দেহ মোবারক কবরে আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। আলী (রাঃ), আব্বাস (রাঃ) এবং আব্বাসের পুত্রদ্বয় ফজল ও কুসাম (রাঃ)– এই চারি জন দেহ মোবারক কবরে অবতীর্ণ করেন।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আসুন– প্রিয়নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তিরোধান বিবরণ ঐ দরূদ-সালামের উপরই ক্ষান্ত করি, যে দরূদ-সালাম পাঠে তাঁহাদের ভক্ত-অনুরক্ত ছাহাবীবৃন্দ তাঁহাকে ইহজগত হইতে চির বিদায় দিয়াছিলেন।

লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এবং সমাধিস্থ কক্ষে যে পরিমাণ সামাই হয় সেই সংখ্যক বিশিষ্ট মোহাজের ও আনসারগণ উপস্থিত হইলেন। ইমাম মোক্তাদীর জামাত নহে, কিন্তু আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) সকলের অগ্রভাগে শবদেহের বরাবরে দাঁড়াইলেন, অন্যরা তাঁহাদের পিছনে কাতারবন্দীভাবে দাঁড়াইলেন। নিম্নে বর্ণিত সালামের বাক্যসমূহ প্রত্যেকেই উচ্চারণ করিলেন আর অপর বাক্যসমূহ আবু বকর ও ওমর (রাঃ) পাঠ করিলেন এবং অন্যরা "আমীন আমীন" বলিতে থাকিলেন।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ـ

হে মহান নবী ! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর সর্বপ্রকার রহমত ও মঙ্গল (বর্ষিত হউক।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَشْهَدُ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ وَنَصَحَ لِاُمَّتِهٖ ـ

আয় আল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, প্রিয়নবী (সঃ) নিশ্চয় পৌঁছাইয়াছিলেন জগদ্বাসীকে যাহা কিছু তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার উম্মতের কল্যাণ ও মঙ্গলের সব কিছু বাতলাইয়া গিয়াছেন।

وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى اَعَزَّ اللّٰهُ دِيْنَهُ وَتَمَّتْ كَلِمَتُهُ ـ

আর তিনি আল্লাহর দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন– যাহার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁহার দ্বীনকে শক্তিশালী করিয়াছেন এবং তাঁহার বিধানাবলী পূর্ণ বাস্তবায়িত হইয়াছে।

وَاُوْمِنَ بِهٖ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ فَاجْعَلْنَا اِلٰهَنَا مِمَّنْ يَّتَّبِعُ

এবং শরীকবিহীনরূপে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব, হে আমাদের মাবুদ ।!

আমাদের ঐ লোকদের দলভুক্ত রাখুন যাহারা অনুসরণ করে–

الْقَوْلَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهٗ ۔

ঐ বাণীর যাহা তাঁহার সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে। আর আমাদের তাঁহার সহিত মিলিত করিবেন (কেয়ামত দিবসে) ;

حَتّٰى تُعَرِّفَهٗ بِنَا وَتُعَرِّفَنَا بِهٖ فَانَّهٗ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفًا رَّحِيْمًا ۔

এমনকি তাঁহার নিকট আমাদের পরিচয় করাইয়া দিবেন এবং আমাদেরকেও তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিবেন। নিশ্চয় তিনি ঈমানদারদের প্রতি মেহেরবান ও দয়ালু ছিলেন।

لَا نَبْتَغِىْ بِالْاِيْمَانِ بِهٖ بَدِيْلًا وَلَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۔

এই মহান নবীর প্রতি ঈমানের বিনিময়ে কখনও আমরা কিছু গ্রাহ্য করিব না এবং তাঁহার (ভালবাসার) বিনিময়ে জগতের কোন মূল্যই গ্রহণ করিব না। (বেদায়া, ৫-২৬৫)

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁহার ফেরেশেতাগণ নবীজীর প্রতি দরূদ পাঠাইয়া থাকেন। হে মোমেনগণ! তোমরাও তাঁহার প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং সালাম প্রেরণ কর।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ صَلٰوةُ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ وَالْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ ۔

আয় আল্লাহ! আয় আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা উপস্থিত হইয়াছি, আমরা আপনার (দরূদ ও সালামের) আদেশ যথাযথ পালন করিব। সর্বাধিক মঙ্গলকামী দয়াল প্রভুর দরূদ (রহমত) এবং নৈকট্যধারী সমস্ত ফেরেশতাগণের দরূদ-

وَالنَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالصّٰلِحِيْنَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَىْءٍ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

এবং নবীগণের, সিদ্দীকগণের ও সমস্ত নেককারগণের দরূদ, আর যত বস্তু আপনার তসবীহ পাঠ করিয়া থাকে- সকলের দরূদ হে রব্বুল আলামীন! কবুল করিয়া নিন-

عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ۔ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ ۔

আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদের জন্য, যিনি নবীগণের শেষ নবী, রসূলগণের সর্দার এবং মোত্তাকীগণের প্রধান।

وَرَسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ الدَّاعِىْ بِاِذْنِكَ ۔

এবং তিনি সারা জাহানের প্রভুর রসূল, তিনি সত্যের মাপকাঠি, সুসংবাদদানকারী এবং আপনার আদেশে জগদ্বাসীকে আহ্বানকারী -

السِّرَاجُ الْمُنِيْرُ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ ۔

তিনি দীপ্ত প্রদীপ। আর তাঁহার উপর সকল প্রকার বরকত, কল্যাণ ও মঙ্গল বর্ষণ করুন এবং সালাম-শান্তি বর্ষণ করুন। (মাদারেজুন নবুয়ত)

নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

হযরতের অঙ্গ-সৌষ্ঠব ঃ (পৃঃ ৫০১)

১৭৫৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০২) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দৈহিক গঠন মধ্যম শ্রেণীর ছিল- অতি লম্বাও নহে, একেবারে বেঁটে খর্বকায়ও নহে। শরীরের রং অতি উজ্জ্বল ছিল, ফেকাসে সাদাও ছিল না, ময়লা শ্রেণীর শ্যামবর্ণও ছিল না। মাথার চুল অধিক কুঞ্চিতও

ছিল না, সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না– মামুলী বাঁকযুক্ত সুশৃঙ্খল ছিল।

চল্লিশ বৎসর বয়সকালে তাঁহার প্রতি ওহী নাযিল হওয়া আরম্ভ হয় এবং তাঁহার নবুয়ত প্রকাশ হয়, অতপর তিনি মক্কায় দশ বৎসর এবং মদীনায় দশ বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহজগত ত্যাগকালে তাঁহার মাথা ও দাড়ির মধ্যে সর্বমোট কুড়িটি চুলও সাদা হইয়াছিল না।

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত সময়ের হিসাব শুধু একটা মোটামুটি হিসাব, নতুবা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ওহী নাযিলের আরম্ভকাল চল্লিশ বৎসর হইতে কয়েক মাস, কয়েক দিন ও কয়েক ঘন্টার বেশ কম হইবে। কারণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের ১২ই তারিখে ভোর বেলা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং রমযান মাসের শেষের দিকে কোন এক তারিখে লাইলাতুল কদরের রাত্রে সর্বপ্রথম ওহীপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সূত্রে চল্লিশ বৎসর হইতে কিছু কম বেশী হওয়া অবধারিত।

মক্কায় অবস্থান সম্পর্কেও তদ্রূপই; অন্যান্য সূত্রে মক্কায় অবস্থানকাল তের বৎসর সাব্যস্ত হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছে দশকের উপর ভাঙ্গা সংখ্যা ধরা হয় নাই।

১৭৫৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০২) বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সর্বাধিক সুশ্রী ও সচ্চরিত্রবান ছিলেন। তাঁহার দৈহিক গঠনও সুন্দর ছিল; অধিক লম্বাও ছিলেন না এবং অধিক বেঁটেও ছিলেন না।

১৭৫৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৭৬) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাথা অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ছিল (যাহা জ্ঞানবান ব্যক্তিত্বশালী পুরুষের আকৃতি) এবং তাঁহার পায়ের পাতা পুরু, বড় ও মজবুত ছিল। পূর্বে বা পরে তাঁহার তুল্য (অঙ্গ সৌষ্ঠববিশিষ্ট) কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। হযরতের হাতের তালু সুপ্রশস্ত ছিল।

১৭৫৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০২) বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দৈহিক আকৃতি মধ্যম শ্রেণীর এবং তাঁহার কাঁধদ্বয়ের মধ্যস্থল সুপ্রশস্ত ছিল (অর্থাৎ তাঁহার বক্ষ বা সিনা মোবারক অপেক্ষাকৃত চওড়া ছিল)। তাঁহার মাথার চুল উভয় কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছিত (–ইহার অধিক লম্বা হইতে দিতেন না)।

আমি তাঁহাকে লাল রংয়ের পোশাকে দেখিয়াছি– তিনি এত সুন্দর দেখাইতেন যে, আমি কাহাকেও তাঁহার তুল্য সুন্দর দেখি নাই।

১৭৫৯। হাদীছ ঃ(পৃঃ ৫০২) বরা ইবনে আযেব (রাঃ)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চেহারা মোবারক কি তরবারির ন্যায় (জ্বলজ্বলা লম্বা সাইজের) ছিল? বরা (রাঃ) বলিলেন না–না, তাঁহার চেহারা মোবারক পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় (উজ্জ্বল ও গোলাকৃতির) ছিল।

১৭৬০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোটা বা চিকন কোন প্রকার রেশমী কাপড়ও হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্ত মোবারক অপেক্ষা অধিক কোমল পাই নাই এবং সৃষ্টিগতভাবে হযরতের শরীরে যে সুগন্ধি ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক কোন সুগন্ধি আমি কোথাও পাই নাই।

১৭৬১। হাদীছ ঃ আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (হজ্জের সময়ে মিনা হইতে মক্কা পথে আব্তাহ নামক স্থানে) দ্বিপ্রহরে (যোহরের নামাযের শেষ ওয়াক্তে তাঁবু হইতে) বাহির হইলেন এবং যোহরের নামায পড়িলেন, অতপর (আছরের নামাযের আউয়াল ওয়াক্তে) আছরের নামায আদায় করিলেন।

তখনকার ঘটনা– লোকেরা সারিবদ্ধরূপে দাঁড়াইল। নবী (সঃ) তাহাদের নিকট দিয়া গমনকালে প্রত্যেকেই (বরকতের জন্য) নবীজীর হস্তদ্বয় দ্বারা নিজ নিজ চেহারা মুছিতে লাগিল। আবু জোহায়ফা (রাঃ) বলেন, আমিও হযরতের হস্ত মোবারক আমার চেহারার উপর রাখিলাম; তখন আমি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি,

হযরতের হস্ত মোবারক বরফতুল্য শীতল এবং মেশক্ বা কস্তুরী অপেক্ষা অধিক সুগন্ধিময়।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সময় সময় তাঁহাদের বাড়ী তশরীফ আনিতেন। তাঁহার মাতা) উম্মে সোলায়েম (দুপুর বেলা) হযরতের আরাম করার জন্য চামড়ার বিছানা বিছাইয়া দিতেন। হযরত (সঃ) ঐ বিছানার উপর দুপুর বেলা ঘুমাইতেন। স্বাভাবিকভাবে হযরতের শরীর হইতে অধিক পরিমাণে ঘাম নির্গত হইয়া থাকিত। হযরত যখন ঘুম হইতে উঠিয়া যাইতেন তখন উম্মে সোলায়েম চামড়ার বিছানার উপর হইতে হযরতের ঘাম এবং তাঁহার মাথা হইতে দুই চারিখানা চুল ছিন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিলে তাহা কুড়াইয়া কাঁচের শিশিতে জমা করিতেন এবং দেহ হইতে নির্গত ঘাম সুগন্ধির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতেন।

একদা হযরত (সঃ) উম্মে সোলায়েমকে ঐসব কুড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? উম্মে সোলায়েম আরজ করিলেন, ইহা আপনার শরীরের ঘাম– আমি জমা করিয়া রাখি এবং সুগন্ধি বস্তুর সহিত মিশ্রিত করিয়া থাকি। কারণ, তাহা সর্বাধিক সুগন্ধি; ইহার দ্বারা অন্য সুগন্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয়।

উম্মে সোলায়েম ইহাও বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! বরকতের জন্য ইহা ছেলে-মেয়েদেরকেও ব্যবহার করাই। হযরত (সঃ) তদুত্তরে বলিয়াছেন, উত্তমই বটে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আনাছ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাগরেদ বলিয়াছেন, আনাছ (রাঃ) মৃত্যুকালে অসিয়ত করিয়াছিলেন, হযরতের ঘাম মিশ্রিত সুগন্ধি যেন আমার কাফনে দেওয়া হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাই করা হইয়াছে।

১৭৬২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৫৭) মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, হযরত নবী (সঃ) কি খেজাব ব্যবহার করিতেন? তিনি বলিলেন, হযরতের বার্ধক্য এতদূর পৌঁছিয়াছিল না যে, খেজাবের প্রয়োজন হয়। তাঁহার দাড়ি মোবারকের এত অল্প সংখ্যক চুল সাদা হইয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে সহজেই তাহা গণনা করা যাইত।

১৭৬৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০১) আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তাঁহার (নিম্ন ওষ্ঠের নিচে) বাচ্চা দাড়ির কতিপয় চুল সাদা হইয়াছিল মাত্র।

১৭৬৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০২) হারীজ ইবনে ওসমান আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, শুধু তাঁহার বাচ্চা দাড়ির কতিপয় চুল সাদা হইয়াছিল।

১৭৬৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০২) কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি খেজাব ব্যবহার করিতেন। তিনি বলিলেন, খেজাবের প্রয়োজনই ছিল না; শুধু কেবল তাঁহার মাথার উভয় পার্শ্বের কিছু পরিমাণ কেশ সাদা হইয়াছিল।

১৭৬৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রথমে স্বীয় মাথার বাবরি আঁচড়াইতে মাথার অগ্রভাগে সিঁথি না কাটিয়া অগ্রভাগের চুলগুলিকে গিঁট ল.গাইয়া কপালের উপর ছাড়িয়া দিতেন, তৎকালে কিতাবধারী ইহুদী-নাসারাদের রীতিও ইহাই ছিল; মোশরেকগণ কিন্তু সিঁথি কাটিয়া থাকিত। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) যে কার্যে বিশেষ কোন নিয়মের আদিষ্ট না হইতেন, সেই কার্যে তিনি কিতাবধারীদের রীতিই অগ্রগণ্য মনে করিতেন। (এস্থলে তিনি তাহাই করিতেন, কিন্তু) পরে তিনি সিঁথি কাটিবার রীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

হযরত (সঃ)-এর চরিত্র গুণ

১৭৬৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ২৮৫) আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) (যিনি তওরাত কিতাবের বিশিষ্ট আলেম ছিলেন,) তাঁহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তওরাত কিতাবে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লামের গুণাবলী কিরূপ বর্ণিত আছে, তাহা জানাইবেন কি? তিনি বলিলেন– হাঁ, কোরআন শরীফে বর্ণিত অনেক গুণাবলী তওরাতেও উল্লেখ রহিয়াছে, যেমন পবিত্র কোরআনে আছে–

يَـٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَا شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ـ

অর্থ ঃ "হে নবী! আমি আপনাকে রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছি– আপনি বাস্তব সত্য বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিবেন এবং সত্য-মিথ্যা, হেদায়াত ও গোমরাহীর সাক্ষ্যদাতা; তথা নমুনা ও মাপকাঠি হইবেন এবং সত্যাবলম্বনকারীদের পক্ষে সুসংবাদদানকারী আর সত্যের বিরোধীগণকে সতর্ককারী হইবেন।"

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, তওরাত শরীফেও হযরতের এই গুণগুলির উল্লেখ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আরও কতিপয় গুণেরও উল্লেখ আছে। যথা– "তিনি অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন বিশ্ব মানবকে রক্ষাকারী (ধর্মের বাহক) হইবেন, আমার বিশিষ্ট বান্দা ও প্রেরিত প্রতিনিধি হইবেন, (আমার উপর পূর্ণ ভরসা ও নির্ভরকারী হইবেন; যদ্দরুন) আমি তাঁহার নাম রাখিয়ছি "মোতাওয়াক্কেল" অর্থাৎ ভরসা স্থাপনকারী। তিনি কঠোর প্রকৃতির– কঠিন আত্মার লোক হইবেন না, (তাঁহার হৃদয় হইবে অতি কোমল। তিনি অতিশয় গাম্ভীর্যপূর্ণ হইবেন, এমনকি পথে-ঘাটে) হাটে-বাজারে হট্টগোল করিয়া বেড়াইবার অভ্যাস তাঁহার মোটেই হইবে না। তিনি এতই সহিষ্ণু হইবেন যে, কাহারও দুর্ব্যবহারের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধে তিনি দুর্ব্যবহার করিবেন না বরং ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে ইহজগত হইতে উঠাইয়া নিবেন না যাবত না তাঁহার মাধ্যমে বক্র পথের পথিক কাফের জাতিকে সোজা করিয়া দেন, তাহারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি দান করে এবং যাবত না তিনি এই কলেমার দ্বারা অন্ধ চক্ষুসমূহকে সত্যের আলো দান করেন, বয়া বধির কর্ণসমূহে সত্য শ্রবণ ও গ্রহণের শক্তি সৃষ্টি করেন, আবদ্ধ অন্তঃকরণ ও বুদ্ধি-বিবেককে সত্যের আলো দান করেন।

১৭৬৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) عن عبد الله به عمر رضى الله تعالى عنه قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَّلَا مُتَفَحِّشًا وكَانَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا ـ

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লজ্জাহীন, অশ্লীল, বিশ্রী কথাবার্তায় অভ্যস্ত ছিলেনই না, ঐরূপ কথা কুত্রাপি মুখেও আনিতেন না। তিনি উপদেশ দিতেন, যাহার চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ভাল সে-ই তোমাদের মধ্যে উত্তম।

১৭৬৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে কোন্ কার্য সমাধা করার একাধিক পথ-পদ্ধতি থাকিলে তিনি সহজ-সুলভ পথ-পদ্ধতি বাছিয়া লইতেন; অবশ্য তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতেন যে, ইহাতে কোন দিক দিয়া শরীয়তের বরখেলাপ গোনাহের কোন কিছু করিতে না হয়। যদি ঐ সহজ-সুলভ পথ-পদ্ধতি গোনাহের কারণ তথা শরীয়তের বরখেলাপ হইত তবে অবশ্যই তিনি ঐ পথ-পদ্ধতি হইতে বহু দূরে থাকিতেন।

আর রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনও নিজস্ব কোন ব্যাপারে কাহারও হইতে প্রতিশোধ লইতেন না (ক্ষমা করিতেন)। অবশ্য কেহ আল্লাহর শরীয়তের মর্যাদাহানিকর কোন কাজ করিলে সেস্থলে তিনি আল্লাহর দ্বীনে খাতিরে সুষ্ঠু প্রতিকার বিধান করিতেন।

১৭৭০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অতিশয় লজ্জাশীল ছিলেন– পর্দানশীল কুমারীও তত লজ্জাবতী হয় না। এমনকি রুচি বিরোধী কোন কিছুর সম্মুখীন হইলে তাঁহার চেহারার উপর উহার প্রতিক্রিয়া ভাসিয়া উঠিত (কিন্তু মুখে কিছু বলিতেন না)।

১৭৭১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কখনও কোন খাদ্য-বস্তুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন না; যদি মনের আকর্ষণ হইত তবে খাইতেন নতুবা খাইতেন না।

১৭৭২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৩) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কথা বলার সময় এইরূপ ধীরে ধীরে কথা বলিতেন যে, তাঁহার শব্দাবলী কেহ গণনা করিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহা করিতে পারিত।

১৭৭৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৯৩) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অশ্লীল কথা কখনও মুখে আনিতেন না, লান্‌-তান্‌ অভিশাপ দিতেন না এবং গালি-গালাজ করিতেন না। কাহারও ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে শুধু এতটুকু বলিতেন, সে এরূপ করে কেন, তাহার কপালে মাটি পড়ুক।

১৭৭৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৯২) জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হইলে কখনও তাঁহাকে 'না' বলিতে শোনা যায় নাই।

১৭৭৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৯২) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দীর্ঘ দশ বৎসরকাল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমত করিয়াছি। কখনও তিনি আমাকে তিরস্কার করেন নাই বা কৈফিয়ত চাহেন নাই– এরূপ কেন করিয়াছ? এরূপ কেন কর নাই?

হযরত (সঃ)-এর সাধারণ অভ্যাস

১৭৭৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮৯২) আসওয়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাড়ীর ভিতরে কি কাজে থাকিতেন? তিনি বলিলেন, তিনি গৃহ কর্মও করিয়া থাকিতেন, কিন্তু নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলেই নামাযের জন্য চলিয়া যাইতেন।

১৭৭৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯০০) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কখনও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে পূর্ণ মুখে এইভাবে হাসিতে দেখি নাই যে, তাহার আল্‌জিভ নজরে পড়ে। তাঁহার হাসি একমাত্র মুচকি হাসিই ছিল।

হযরতের অনাড়ম্বর জিন্দেগী

১৭৭৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮০৯) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবারবর্গ একাধারে তিন দিন পেট পুরিয়া খাওয়ার সুযোগ পান নাই, তাঁহার শেষ জীবন পর্যন্ত এই অবস্থাই চলিয়াছে।

১৭৭৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৪৩৭) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন তখন আমার ঘরে অল্প (মাত্র দুই সের পরিমাণ) যব ব্যতীত খাওয়ার উপযোগী কোন বস্তুই ছিল না (ঐ অল্প পরিমাণ যবের মধ্যে অনেক বরকত পাইতেছিলাম) তাহা আমি মাচাঙ্গের উপর রাখিয়া দিয়াছিলাম; তথা হইতে প্রতিদিন কিছু কিছু পরিমাণ বাহির করিয়া খাইয়া থাকিতাম– এইরূপে দীর্ঘ দিন কাটিল। একদা আমি তাহার সমষ্টি মাপিয়া রাখিলাম, অতপর তাহা সাধারণভাবে নিঃশেষ হইয়া গেল।

১৭৮০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮১৪) আবু হয্‌ম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাঃ) ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ময়দা (ময়দার রুটি) খাইয়া থাকিতেন কি? তিনি বলিলেন, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সারা জীবনে (নিজের ঘরে) ময়দা চোখেও দেখেন নাই।

আবু হয্‌ম (রঃ) বলেন, আমি তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরতের যমানায় আপনারা (আটার

উৎকর্ষ সাধনে) চালনী ব্যবহার করিতেন কি? তিনি বলিলেন, রসূল (সঃ)ও সারা জীবন (নিজের ঘরে) চালনী চোখে দেখন নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, চালনী ব্যতিরেকে যবের আটা কিরূপে খাইতেন? তিনি বলিলেন, যব পিষিবার পর ফুৎকারে যতদূর সম্ভব ভূষি উড়াইয়া অবশিষ্টের দ্বারা রুটি তৈয়ার করিয়া খাইতাম।

১৭৮১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮১৫) একদা ছাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ) একদল লোকের নিকটবর্তী পথে যাইতেছিলেন; ঐ লোকগণ আস্ত বকরী ভুনা করিয়া খাইতেছিল। তাহারা আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে খাওয়ায় শরীক হওয়ার জন্য বলিল। আবু হোরায়রা (রাঃ) ঐ সৌখিন খাদ্যে শরীক হইতে অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছেন এমতাবস্থায় যে, তিনি যবের রুটিও পেট পুরিয়া খাওয়ার সুযোগ সব সময় পাইতেন না।

১৭৮২। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮১৫) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চেয়ার-টেবিলে খানা খাইতেন না এবং পিরিচ তশ্‌তরী (ইত্যাদি বিলাসিতার পাত্র) ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার জন্য রুটিও পাত্‌লা তৈয়ার করা হইত না (সাধারণ মোটা রুটিই খাইতেন)।

হাদীছ বর্ণনাকরীকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, হযরত (সঃ) টেবিলে খাইতেন না– কিসের উপর খাইতেন? তিনি বলিলেন, হযরত (সঃ) দস্তরখানের উপর খাইতেন।

১৭৮৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৮১৫) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মদীনায় আসার পর শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁহার পরিবারবর্গ একাধারে তিন দিন গমের রুটি খাইবার সুযোগ পান নাই। (অর্থাৎ এক-দুই দিন গমের রুটি খাওয়ার সুযোগ পাইলেও আবার দুই-চারি দিন যবের রুটি বা খুরমা-খেজুরের উপর অতিবাহিত করিতে হইত। একাধারে গমের রুটি খাইয়া যাইবেন এইরূপ সচ্ছলতা হযরত (সঃ) নিজের জন্য অবলম্বন করেন নাই।)

১৭৮৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবারর্গ সাধারণত প্রতিদিনের দুই ওয়াক্তের খানার মধ্যে এক ওয়াক্ত খুরমা-খেজুর খাইয়া থাকিতেন। (অর্থাৎ প্রতিদিন দুই ওয়াক্ত রুটি খাওয়ার মত সচ্ছলতা হযরত (সঃ) নিজের জন্য অবলম্বন করেন নাই।)

১৭৮৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫৬ পৃঃ) কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা ছাহাবী আনাছ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট ছিলাম। তাঁহার বাবুর্চি তাঁহার নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, (সে তাঁহার জন্য খাদ্য পরিবেশন করিতেছিল; সে উচ্চ শ্রেণীর খাদ্য তৈয়ার করিয়া আনিয়াছিল। তাহা দৃষ্টে) আনাছ (রাঃ) উপস্থিত সকলকে বলিলেন, এই খাদ্য তোমরা গ্রহণ কর। আমার অবগতি অনুসারে হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সারা জীবন পতলা চাপাতি রুটি (খাইবার জন্য) চোখে দেখারও সুযোগ গ্রহণ করেন নাই এবং ভুনা করা আস্ত বকরী কাবাব (ইত্যাদির ন্যায় সৌখিন খাদ্য) চোখেও দেখেন নাই।

১৭৮৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবারবর্গ) পূর্ণ দুই দুই মাস অতিবাহিত করিতাম এমন অবস্থায় যে, একদিনও আমাদের চুলায় আগুন জ্বলে নাই।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ভাগিনা ওরওয়া (রাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের জীবিকানির্বাহ হইত কিরূপে? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, পানি এবং খেজুর। অবশ্য কতিপয় পড়শী রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য দুগ্ধ দিয়া থাকিত, তাহা হইতে তিনি আমাদিগকেও পান করাইয়া থাকিতেন।

১৭৮৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫৭) عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ اٰلَ مُحَمَّدٍ قُوْتًا ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিতেন, আয় আল্লাহ! মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরিবারবর্গকে খোর-পোষ শুধু আবশ্যক পরিমাণ দান কর।

অর্থাৎ, সাধারণভাবে জীবনধারণে যেন পরের মুখাপেক্ষী হইতে না হয় এবং আবশ্যক পরিমাণ হইতে অধিকও যেন না হয়।

১৭৮৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৯৫৬) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিছানা ছিল চামড়ার, যাহার ভিতরে খেজুর গাছের (মাথার লাল রংয়ের ছাল (কুটিয়া নরম করা) ভরা ছিল।

মোজাদ্দেদে যমান হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) তাঁহার সীরাত সঙ্কলন 'নশরুত তীব' গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য হাদীছ গ্রন্থাবলী হইতে নবীজী মোস্তফা (সঃ)-এর বিভিন্ন গুণাবলীর একটি প্রবন্ধ সংযোজিত করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ

নবীজী (সঃ) সৃষ্টিগতভাবেই অতি মহীয়ান গরীয়ান এবং শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। দেহ তাঁহার উজ্জ্বল গৌর বর্ণের সুন্দর ছিল, চেহারা মোবারক পূর্ণ চন্দ্ররূপ গোলাকার, দীপ্ত ও কমনীয় ছিল; পূর্ণ গোল ছিল না। তাঁহার শির অপেক্ষাকৃত বড় ছিল, কেশরাশি স্বভাবতই বিন্যস্ত আঁচড়ানোরূপী ছিল; অধিক লম্বা শুধু এতটুকু করিতেন যে, কানের নিম্নভাগ সামান্য অতিক্রম করিত। ললাট তাঁহার প্রশস্ত ছিল। তাঁহার ভ্রূ সরু, মিহি এবং ঘন ছিল, উভয়টি পৃথক ছিল, মধ্যভাগে একটি ধমনী বা শিরা ছিল, যাহা রাগের সময় ফুলিয়া উঠিত। নাসিকা তাঁহার একটু উঁচু ছিল, যাহার উপর দীপ্ত আভা পরিদৃষ্ট হইত, যদ্দরুন নাসিকা অধিক উঁচু মনে হইত– বস্তুতঃ তত উঁচু ছিল না, মানানসই ছিল। দাড়ি তাঁহার মুখ ভরা এবং খুব ঘন ছিল। চোখের পুতুলী মিশমিশে কাল ছিল, চোখের পাতার লোম দীর্ঘ এবং কাল ছিল, সুরমা ব্যবহার ছাড়াই সুরমা দেওয়া দেখাইত। চোখের সাদা অংশে লাল বর্ণের সরু সরু রেখা চিল, চোখ ছিল দীর্ঘাকারে বড়। মুখ মানানসই বড় ছিল। গণ্ডদ্বয় সুসমতল ছিল; ফুলা-ফাঁপা ছিল না। দাঁতসমূহ অতিশয় সাদা সুবিন্যস্ত ছিল; কথা বলার সময় মনে হইত যেন দাঁতের ফাঁক হইতে নূর বা আলো বিচ্ছুরিত হইতেছে। হাসির সময় দাঁতসমূহ সাদা-শুভ্র শিলার ন্যায় দেখাইত। গ্রীবা তাঁহার এত সুন্দর ছিল যেন হাতে গড়ানো এবং উহার বর্ণ ছিল ঝকঝকে উজ্জ্বল। কাঁধ ও বক্ষ ছিল চৌড়া– প্রশস্ত। কাঁধে, বাহুতে ও বক্ষের ঊর্ধ্ব অংশে লোম ছিল এবং বক্ষ হইতে নাভি পর্যন্ত লোমের সরু ধারা ছিল; ইহা ব্যতীত অবশিষ্ট দেহ লোমহীন ছিল। পেট এবং বক্ষ সমতল ছিল, অবশ্য বক্ষ কিঞ্চিত স্ফীত ছিল। হাত লম্বা সাইজের ছিল, পাঞ্জা প্রশস্ত এবং পুরু ছিল। আঙ্গুলসমূহ দীর্ঘ ছিল। ধমনী বা শিরাসমূহ স্ফীতিহীন দেহের মিলে ছিল। বাহু এবং হস্তদ্বয় মোটা– গোশ্তপূর্ণ ছিল। পায়ের গোছাও ঐরূপ ছিল। পায়ের পাতা পুরু সমতল ও মসৃণ ছিল। তাহা হইতে পানি গড়াইয়া পড়িয়া যাইত। পায়ের তলার মধ্যস্থ খোঁচ অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। পায়ের গোড়ালি শীর্ণ ও চাপা ছিল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াগুলি মজবুত শক্তিশালী ছিল– জোড়ার হাড়ের অগ্রভাগ মোটা মোটা ছিল। সম্পূর্ণ দেহই পরিপূর্ণ জমাট বাঁধারূপ ছিল। সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অত্যন্ত মানানসই ছিল।

নবীজী (সঃ)-এর চালচলন

নবী (সঃ) হাঁটিবার সময় পা হেঁচড়াইয়া চলিতেন না– পা উঠাইয়া উঠাইয়া সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া অবনত দৃষ্টিতে চলিতেন; যেন উঁচু হইতে নীচুর দিকে চলিতেছেন। তিনি নম্র ও বিনয়ীর ন্যায় চলিতেন, দীর্ঘ পদেক্ষেপে চলিতেন। তাঁহার পথ এত দ্রুত অতিক্রান্ত হইত যেন তাঁহার জন্য পথ ছোট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার স্বাভাবিক গতির চলাচলেও তাঁহার সঙ্গে চলিতে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম। তাঁহার উঠা বসা

আল্লাহর যিক্‌রের উপর হইত। নবীজী (সঃ) কাহারও প্রতি তাকাইলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইতেন। অবনত দৃষ্টি ছিল তাঁহার স্বভাব– তাঁহার দৃষ্টির গতি উর্ধ্বপানে অপেক্ষা নিম্নপানেই বেশী ছিল। তাঁহার সাধারণ দৃষ্টিপাত বিনত চোখে হইত। সাধারণতঃ নবীজী (সঃ) পথ চলিতে ছাহাবীগণকে আগে চালাইতে চেষ্টা করিতেন। যাহারই সঙ্গে দেখা হইত নবীজী প্রথমে সালাম করায় সচেষ্ট হইতেন।

নবীজী (সঃ)-এর চারিত্রিক গুণাবলী

নবী (সঃ) সদা ভাবগম্ভীর ও চিন্তামগ্ন থাকায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি আনন্দ-উল্লাস করিতেন না, প্রয়োজন ছাড়া কথা বলিতেন না। যেই কথায় সওয়াব হওয়ার আশা ঐরূপ কথাই বলিতেন। দীর্ঘ সময় নীরব থকিতেন। কথা বলিলে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলিতেন এবং অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন। অল্প কথায় অনেক উদ্দেশ্যবোধক উক্তি করিয়া থাকিতেন। তাঁহার কথা ধীরে ধীরে হইত। প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত কথা বলিতেন না, অম্পূর্ণ এবং কমও বলিতেন না। তাঁহার বচন মুক্তার মালার ন্যায় হইত। কোমলভাষী ছিলেন; কঠোর প্রকৃতির ছিলেন না, কাহারও প্রতি ঘৃণা করিতেন না। আল্লাহর নেয়ামত অতি ছোট হইলেও সম্মান করিতেন; আল্লাহর কোন নেয়ামতের কুৎসা করিতেন না। কোন খাদ্যবস্তুর (লালসা বোধক) অতি প্রশংসাও করিতেন না, আবার কুৎসাও করিতেন না। সত্যের বিরোধিতা দেখিলে সত্যকে সাহায্য করিয়া প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তাহার অপ্রতিহত ক্রোধ প্রশমিত হইত না। নিজস্ব ব্যাপারে তাঁহার ক্রোধ আসিত না এবং প্রতিশোধও লইতেন না। কাহারও প্রতি রাগান্বিত হইলে তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিতেন; সন্তুষ্টির দৃষ্টি অবনত করিতেন। তাঁহার হাসি মুচকি হাসি হইত এবং দাঁতসমূহ শিলার ন্যায় ঝকঝকে দেখাইত।

নবী (সঃ) গৃহে অবস্থানকালীন সময়কে তিন ভাগ করিতেন– একভাগ আল্লাহ তাআলার (এবাদত-বন্দেগীর) জন্য, এক ভাগ পরিবার-পরিজনের (অভাব-অভিযোগ কথাবার্তা ও প্রয়োজন মিটাইবার) জন্য; আর একভাগ নিজের (ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটাইবার) জন্য। নিজের জন্য সময়ের বেশী অংশ জনগণের (শিক্ষা ইত্যাদি) কাজে ব্যয় করিতেন; কিছু শিক্ষিতদের মাধ্যমে সকলকে উপকৃত করার ব্যবস্থা করিতেন, জনগণ হইতে কোন কিছু লুকাইয়া রাখিতেন না। জন সাধারণের জন্য নিজের সময় ব্যয় করিতেন, ধর্মীয় জ্ঞানে যোগ্য ব্যক্তিগণকে অগ্রগণ্য করিতেন এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজনের ভিত্তিতে সময় দিতেন। কাহারও একটি প্রয়োজন, কাহারও দুইটি, কাহারও আরও অধিক; সেই অনুপাতেই তাহাদের সহিত ব্যাপৃত হইতেন। তাহাদের হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন, প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী জ্ঞাত করিতেন, শিক্ষা দিতেন। আর লোকদিগকে অতিশয় তাকিদের সহিত বলিয়া দিতেন– উপস্থিতগণ অনুপস্থিতদিগকে পৌঁছাইয়া দিবে। আরও বলিতেন, কোন ব্যক্তি তাহার প্রয়োজনের সংবাদ আমার নিকট পৌঁছাইতে সক্ষম না হইলে তোমরা তাহা আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিও। যেব্যক্তি শাসনকর্তার নিকট অক্ষম লোকের প্রয়োজনের সংবাদ পৌঁছাইয়া দিবে, আল্লাহ তাআলা তাহাকে পদস্থিতি দান করিবেন কেয়ামত দিবসে পুল-সেরাত চলার সময়। নবী (সঃ)-এর দরবারে একজনের মুখে অপর জনের ঐ শ্রেণীর বিষয়ই আলোচনা করা যাইত; কাহারও মুখে অপরের অন্য কোন আলোচনা হইত না।

লোকজন নবীজী (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইত দ্বীনের অভাবী ও অন্বেষকরূপে, নবীজীর দরবারে তাহারা তৃপ্ত হইয়া বাহির হইত দ্বীনের অভিজ্ঞ ও দিশারীরূপে। মানুষের উপকারী কথা ছাড়া নবীজী স্বীয় জবান বন্ধ রাখিতেন। মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করিতেন, অনৈক্যের প্রতিরোধ করিতেন। গোত্রী প্রধানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং তাহার প্রাধান্য বজায় রাখিতেন। লোকদেরকে সদা সতর্ক রাখিতেন, নিজেও লোকদের হইতে সতর্ক থাকিতেন, অবশ্য সকলের সঙ্গে হাসি-মুখ ও সদ্ব্যবহার বজায় রাখিতেন। সহচরগণের খোঁজ-খবর লওয়ায় তৎপর থাকিতেন। লোকদের হাল– অবস্থা অবগতির জন্য

সচেতন থাকিতেন। ভালকে ভাল বলিয়া স্বীকৃতি দিতেন এবং তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতেন। মন্দকে মন্দ বলিয়া প্রকাশ করিতেন এবং উচ্ছেদের চেষ্টা করিতেন। সর্ববিষয়ে তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন; তাঁহার কার্যে বা কথায় অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইত না। ভাল লোক তাঁহার অধিক নৈকট্য লাভ করিত; যে বেশী পরোপকারী হইত সেই তাঁহার নিকট বেশী ভাল গণ্য হইত। অন্যের সাহায্য ও বিপদ উদ্ধারে যে যত উত্তম হইত সে নবীজী (সঃ)-এর নিকট তত মর্যাদাবান পরিগণিত হইত।

মজলিসের মধ্যে তিনি প্রত্যেকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন; এমনকি মজলিসের প্রত্যেক ব্যক্তি এই ভাবিত যে, তাহার অপেক্ষা অধিক আদরণীয় নবীজীর (সঃ) নিকট অন্য কেহ নহে। কেহ নবীজী (সঃ)-কে কোন কাজের জন্য বসাইলে বা দাঁড় করাইলে তিনি কষ্ট সহ্য করিয়াও তাহার সাথে অপেক্ষা করিতেন, এমনকি ঐ ব্যক্তিকেই তাঁহার হইতে বিদায় নিতে হইত। কেহ তাঁহার নিকট কোন সাহায্য চাহিলে হয় তাহার আশা পূর্ণ করিতেন, না হয় অতি মোলায়েম কথায় বিদায় দিতেন। নবীজী (সঃ)-এর উদারতা ও সদ্ব্যবহার সকলের জন্য প্রসারিত ছিল। এমনকি সকলে তাঁহাকে স্নেহশীল পিতা গণ্য করিত। সকলেই সমানভাবে তাঁহার হইতে উপকৃত হইত, তাক্‌ওয়া-পরহেজগারী অনুপাতে তাহাদের তারতম্য হইত।

তাঁহার মজলিসে জ্ঞান, বিদ্যা, সংযমশীলতা, ধৈর্য ও আমানতদারীর অনুশীলন হইত। সেই মজলিসে কথাবার্তা উচ্চৈঃস্বরে হইত না, কাহারও মান-সম্মানে আঘাত করা হইত না। তাকওয়া-পরহেজগারীর দরুন পরস্পর নম্র বিনয়ী হইত; বড়কে সম্মান করা হইত, ছোটকে স্নেহ করা হইত, অভাবীকে সাহায্য করা হইত, বিদেশীর প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইত।

নবীজী (সঃ) তিনটি স্বভাব হইতে মুক্ত ছিলেন– লোক দেখান স্বভাব, অপব্যয় এবং নিষ্প্রয়োজনীয় কাজে লিপ্ততা। আর তিনটি বস্তু হইতে মানুষকে রেহাই দিয়া রাখিয়াছিলেন– কাহারও গ্লানি করিতেন না, কাহারও প্রতি কটাক্ষ করিতেন না এবং কাহারও দোষ তালাশ করিয়া বেড়াইতেন না।

নবীজী (সঃ) স্বল্প খাওয়ায় ও শোয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। নবীজী (সঃ) নিদ্রাকালে শয্যায় ডান পার্শ্বের উপর শুইতেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব হইতেই নবীজী (সঃ) প্রভাবময় মাহাত্ম্যের অধিকারী ছিলেন। ওকবা ইবনে আম্‌র (রাঃ) নবীজীর দরবারে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই কাঁপিতে লাগিলেন। নবী (সঃ) বলিলেন, শান্ত থাক, আমি কোন পরাক্রমশালী বাদশা নহি। মদীনার দশ বৎসরের জীবনে নবীজী (সঃ) কত বিজয় লাভ করিয়াছিলেন, কত এলাকা জয় করিয়াছিলেন, রাজা-বাদশাহদের পর্যন্ত কত কত উপহার-উপঢৌকন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সবই জনসাধারণের জন্য ব্যয় করিয়া দিয়াছিলেন, এমনকি ইহজীবন ত্যাগকালে পরিবারের আহার জোটাইতে তাঁহার লৌহবর্ম বন্ধক রাখা ছিল। খাওয়ায়, পরায় ও বাসস্থানে নবীজী (সঃ) অত্যধিক সরল ও আড়ম্বরবিহীন ছিলেন।

তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হইলে সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ না লইয়া ক্ষমা করিতেন, অন্তরের প্রশস্ততায় অপরিসীম ছিলেন। সাহস ও বীরত্বে অতুলনীয় ছিলেন। শত্রুর মোকাবিলায় তাঁহার সঙ্গে একমাত্র বীরপুরুষ থাকিতে সক্ষম হইত। সীমাহীন দাতা ছিলেন। স্বভাব অত্যন্ত কোমল ও মধুর ছিল। অতি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন; সময়ে নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন। নিজের এবং গৃহের কাজ নিজেই করিতেন, অতি গরীব রোগীকেও দেখিতে যাইতেন, গরীবদের সহিতও উঠা বসা করিতেন, নিজ খাদেম পরিচারকের সহিতও একত্রে বসিয়া খাইতেন। নিজ হাতে কাপড় তালি লাগাইতেন, বাজার হইতে নিজের বোঝা নিজেই বহন করিয়া আনিতেন। তিনি মানবকুলের জন্য সর্বাধিক উপকারী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক ছিলেন। "ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম"

নবুয়তের প্রমাণ তথা হযরতের মোজেযার বয়ান (পৃঃ ৫০৪)

নবী এবং রসূলগণ হইতেন আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি। আল্লাহ তাআলা বান্দাগণকে তাঁহার পছন্দনীয়

পথে পরিচালিত করার জন্য বন্দাগণের নিকট স্বীয় প্রতিনিধিস্বরূপ নবী–রসূলগণকে প্রেরণ করিতেন। সুতরাং নবী রসূলগণের নিকট তাঁহাদের মনোনয়ন ও পদাধিকারের প্রমাণ থাকা আবশ্যক, যাহা তাঁহারা আল্লাহর বান্দাদের নিকট পরিচয়পত্ররূপে পেশ করিবেন এবং কেহ চ্যালেঞ্জ করিলে উক্ত প্রমাণ দ্বারাই সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিবেন। এই জন্যই ইমাম বোখারী (রঃ) মো'জেযাসমূহের বর্ণনার পরিচ্ছেদটিকে "নবুয়তের প্রমাণসমূহের পরিচ্ছেদ" নামে ব্যক্ত করিয়াছেন– মো'জেযাকে নবুয়তের প্রমাণ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন, এই আখ্যা বড়ই সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। নবীগণের সেই প্রমাণ বা পরিচয়পত্রই হইল তাঁহাদের মো'জেযা। মো'জেযার অর্থ অসম্ভব কার্য নহে, বরং তাহার অর্থ মানুষের অসাধ্য কার্য। নবীগণের মো'জেযা মানুষের শক্তিসাধ্য বহির্ভূত হয় বটে এবং সেই সূত্রেই তাহা নবীর নবুয়তের প্রমাণ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কখনও আল্লাহ তাআলার শক্তি-ক্ষমতা বহির্ভূত হয় না; আল্লাহ ত সর্বশক্তিমান, অতএব তাহা কোন মতেই অসম্ভব বলা যাইতে পারে না। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রতিনিধির পক্ষে স্বীয় অসীম কুদরতের নিদর্শন স্বরূপই তাহা প্রকাশ করিয়া থাকিতেন। সুতরাং নবীদের মো'জেযাকে অসম্ভব সাব্যস্ত করতঃ তাহাকে অস্বীকার করা বস্তুত আল্লাহ তাআলার সর্বশক্তিমত্তাকে অস্বীকার করা। এতদ্ভিন্ন যেকোন দাবীর প্রমাণকে অস্বীকার করা প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দাবীর সমর্থনে শিথিলতা প্রকাশেরই নামান্তর। অতএব মো'জেযা অস্বীকার করার অর্থ নবীর নবুয়তের প্রতি ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ করা।

প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তাআলা এই পরিমাণ মো'জেযা প্রদান করিয়াছিলেন যাহা মানব জগতে তাঁহার নবুয়ত ও প্রতিনিধিত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে।

১৭৮৯। হাদীছ ঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيِّ الاَّ قَدْ اُعْطِى مِنَ الْاٰيَاتِ مَا مِثْلُهٗ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِىْ اُوْتِيْتُ وَحْيًا اَوْحٰى اِلَىَّ فَارْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, নবীগণের প্রত্যেককেই আল্লাহ তাআলা এই পরিমাণ মো'জেযা দিয়াছিলেন, যাহা মানব সমাজের জন্য সেই নবীর প্রতি ঈমান আনার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আমাকে (সর্বপ্রধান মো'জেযারূপে) যাহা প্রদান করা হইয়াছে তাহা ওহী পর্যায়ের; (কোরআন পাক– যাহা) আল্লাহ তাআলা ওহী মারফত আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন (এবং তাহা আমার দ্বীনের শাসনতন্ত্র বা আসমানী কিতাবরূপে এবং আমার মো'জেযারূপে আমার পরেও দীর্ঘস্থায়ী হইবে) ফলে কেয়ামতের দিন দেখা যাইবে যে, আমার অনুসারীদের জামাতই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ব্যাখ্যা ঃ নবুয়ত প্রাপ্তির পর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হস্তে স্বভাবতঃ বা কাফেরদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বা কাফেরদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বহু মো'জেযা বা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা তাঁহার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ ছিল। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে বরং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেও তাঁহার সম্পর্কে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছিল। এইসব ঘটনার সমষ্টি প্রায় তিন হাজার।

কাফেরদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়া যেসব মো'জেযা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মো'জেযা পবিত্র কোরআন। পবিত্র কোরআনের চ্যালেঞ্জ শুধু হযরতের যমানার কাফেরদের প্রতিই ছিল না, বরং কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত অমুসলিমদের প্রতিই এই চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রহিয়াছে। পবিত্র কোরআন একাধিক জায়গায় স্বয়ং সেই চ্যালেঞ্জের ঘোষণা করিয়াছে যে, এই কোরআন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মুহাম্মদের (সঃ) উপর অবতারিত হওয়া সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তি বা দল সন্দেহ পোষণ করে এবং তাহারা মনে করে যে, ইহা মুহাম্মদের (সঃ) বা অন্য কোন মানুষের রচিত, তবে তাহারা এই কোরআনের বাক্যবিন্যাসের সমতুল্য তাহার

সর্বকনিষ্ঠ একটি সূরা পরিমাণ বাক্য তৈয়ার করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থিত করুক; তবেই তাহাদের সন্দেহ বাস্তব বলা যাইতে পারিবে; অন্যথায় ঐরূপ সন্দেহ অসার সাব্যস্ত হইবে। কারণ, কোন মানুষ কর্তৃক রচিত এত বড় কলেবরের পুস্তকের শুধুমাত্র একটি লাইন পরিমাণ বাক্য তাহার সমতুল্য রচনা করা অন্য মানুষের সাধ্যে না হওয়া অস্বাভাবিক।

এই বিজ্ঞানের যুগের যেকোন আবিষ্কার সম্পর্কে কোন মানুষ এইরূপ দাবী টিকাইয়া রাখিতে পারে না যে, চিরকাল অন্য কোন মানুষ ইহার সমতুল্য আবিষ্কার করিতে পারিবে না। আজ পর্যন্ত বিশ্বে মানুয়ের আয়ত্তাধীন এমন কোন আবিষ্কৃত বস্তু দেখা যায় নাই, যাহা সর্বসাধারণ্যে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ার পরও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আবিষ্কারে সারা বিশ্ব অপারগ রহিয়াছে এবং দীর্ঘকাল অপারগ থাকিবে। অথচ এই কোরআন প্রথমতঃ চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছে–

اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ـ

অর্থ ঃ "আমি আমার বিশেষ বান্দা (মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহর) উপর যে কিতাব নাযিল করিয়াছি (যাহা দ্বারা তিনি আমার রসূল ও প্রতিনিধি বলিয়া অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছেন)। তাহা (আমার পক্ষ হইতে অবতারিত হওয়া) সম্পর্কে যদি তোমরা কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ কর তবে তোমরা তাহার সমতুল্য একটি ছোট সূরা পরিমাণ বাক্য রচনা করিয়া আন।" অতপর আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ـ

অর্থ ঃ "যদি তোমরা তাহা করিতে না পার এবং কস্মিনকালেও পারিবে না, তবে তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হইবে (ঐ সত্য প্রমাণিত রসূলকে স্বীকার করিয়া) দোযখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা। যাহার অগ্নি মানুষ ও পাথর দ্বারা প্রজ্বলিত হইবে।"

একাধিকবার এইরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদানের পর কোরআন ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছে–

لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْاِنْسُ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ

অর্থ ঃ "বিশ্বের সমস্ত মানব-দানব একত্রে পরস্পর সহায়ক হইয়াও যদি এই প্রচেষ্টা চালায় যে, কোরআনের সমতুল্য বাক্য রচনা করিয়া আনিবে, তবুও তাহারা কস্মিনকালেও সেই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভে সক্ষম হইবে না।" (পারা–১৫, রুকু–১০)

পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার যুগে কোরআনের ঘোর শত্রু আরবের পৌত্তলিকগণ, ইহুদী এবং নাসারাগণ আরবি ভাষায় আরবি কাব্যে যে অতিশয় দক্ষ ও পারদর্শী ছিল তাহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এতদসত্ত্বেও সেই শত্রুগণ রসূলুল্লাহর (সঃ) বিরুদ্ধে, কোরআনের বিরুদ্ধে হাজার হাজার প্রাণ বিসর্জন দিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, কোরআনকে বানচাল করার জন্য শত শত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু এই সহজ পন্থায় তাহারা আসে নাই যে, মাত্র এক লাইন পরিমাণ একটি ছোট সূরার সমতুল্য বাক্য রচনা করিয়া নিয়া আসে। বস্তুতঃ ইহা যে তাহাদের জন্য মোটেই সম্ভব নহে তাহা তাহারা ভালরূপেই উপলব্ধি করিতেছিল।

আজও মধ্যপ্রাচ্যে আরবী ভাষাভাষী খৃষ্টান ইহুদী অমুসলিম কোরআনের শত্রু বিদ্যমান রহিয়াছে ইউরোপ আমেরিকায় আরবী ভাষায় অনেক অনেক সুপণ্ডিত হইয়াছে এবং আছে, না থাকিলে হওয়ার জন্য আরবি ভাষার দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার বিবাদ ছাড়িয়া দিয়া মুসলমানদের কোরআনকে বানচাল করতঃ তাহাদের জাতীয় বুনিয়াদ ধ্বংস করিতে এই পথ তাহারা অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু মহান কোরআনের এত বড় প্রভাব যে, তাহার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় দাঁড়াইবার সাহস কাহারও

নাই, কেয়ামত পর্যন্ত হইবেও না।

আজও আরবের অমুসলিম সাহিত্যিকগণ স্বীকার করিয়া থাকে- "কোরআনকে মানব রচিত গ্রন্থ বলা স্বীয় সাহিত্যিকতা ও পাণ্ডিত্যের উপর কালিমা লেপন স্বরূপ।"*

পূর্ববর্তী নবীগণকে যত মো'জেযাই প্রদান করা হইয়াছিল, প্রত্যেক নবীর দুনিয়া ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মো'জেযাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোন নবীর মো'জেযা বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান আছে বলিয়া কেহ কোন নিদর্শন দেখাইতে পারিবে না। একমাত্র মুসলমানদের কোরআন এবং তাঁহাদের নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বর্ণনা ব্যতীত পূর্ববর্তী নবীগণ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বর্তমান বিশ্বে মোটেই নাই।

কিন্তু মুসলিম জাতির পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নবুয়ত তদ্রূপ নহে। তাঁহার প্রধানতম মো'জেযা পবিত্র কোরআন অবিকলরূপে তাহার বিঘোষিত চ্যালেঞ্জ সহ আজও বিশ্ব বুকে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং দুনিয়ার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত থাকিবে। যখন যাহার ইচ্ছা তাহার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিয়া দেখিতে পারে যে, বাস্তবিকই ইহা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নবুয়তের সঠিক প্রমাণই বটে।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) যেহেতু সর্বশেষ নবী এবং তাঁহার দ্বীনই সর্বশেষ দ্বীন, তাই তাঁহার জন্য এইরূপ দীর্ঘায়ু-বিশিষ্ট মো'জেযার আবশ্যকও ছিল। তাঁহার এই মো'জেযার প্রভাবে যুগে যুগে বহু লোক তাঁহার দ্বীনে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই বিষয়টির প্রতিই উল্লিখিত হাদীছে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

পবিত্র কোরআন রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মো'জেযা ছিল বিরুদ্ধবাদীগণকে চ্যালেঞ্জ

---

* পবিত্র কোরআন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সত্যতার মো'জেযা বা প্রমাণ। কারণ এই কোরআন কোন মানুষের রচনা হওয়া অসম্ভব, ইহা নিশ্চয় আল্লাহর বাণী! আল্লাহর অকাট্য বাণীর বাহক যিনি তিনি অবশ্যই আল্লাহর নবী বা রসূল।

পবিত্র কোরআন যে মানুষের রচনা হইতে পারে না তাহার প্রমাণ পবিত্র কোরআনের নিজস্ব রূপ ও আকার-আকৃতি। এই সত্যকেই কোরআন তাহার চ্যালেঞ্জ দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছে। এবং কোরআনের রূপে ও আকৃতিতে ঐ সত্য সদা স্বতঃ উদ্ভাসিত। যেমন, তাহার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন একজন ফরাসী খৃষ্টান বৈজ্ঞানিক মরিস বুকাইলী তাঁহার "দি বাইবেল, দি কোরআন এণ্ড সায়েন্স" পুস্তকে। উক্ত আলোচনার কতিপয় অংশ প্রকাশিত হইয়াছে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর ২৮ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের উপ-সম্পাদকীয়তে। নিম্নে তাঁহার ভাষায় উদ্ধৃতি দেওয়া হইল-

বিজ্ঞানী বুকাইলী বলেছেন- কোরআনকে আমি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতেই বিচার করেছি। প্রথমে অনুবাদের সাহায্য নিয়েছি, তারপর আমি আরবি শিখেছি এবং বিজ্ঞানের সত্য আর কোরআনে বর্ণিত বক্তব্য পাশাপাশি রেখে একটা তালিকা প্রস্তুত করেছি এবং সংগৃহীত যাবতীয় প্রমাণ-দলীলের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কোরআনে এমন একটা বক্তব্যও নাই, যা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অসত্য বা ভ্রান্তিপূর্ণ।

মরিস বুকাইলী বলেছেন- আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, কোরআনের প্রতিটি বাক্য বিচার বিশ্লেষণ করা এবং সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোরআনের অসারতা প্রমাণ করা। কিন্তু যখনই কোরআন পড়া শুরু করলাম, দেখতে পেলাম- বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা ও বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয় কী সঠিকভাবেই না কোরআনে তুলে ধরা হয়েছে। একটা বিষয় আমার কাছে সবচাইতে অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছিল ঃ আজকের যুগে যেসব বৈজ্ঞানিক সত্য আমরা এত চিন্তা, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে পাচ্ছি, হযরত মুহাম্মদের (সঃ) যুগে বসে কি করে সেসব বিষয় একজন মানুষ জানতে পারল? সে যুগে এ বিষয়ে মানুষের তো কোন ধারণাই থাকার কথা নয়।

বিজ্ঞানী বুকাইলী তাঁর ঐ পুস্তকে আরও বলেছেন-

বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য, জ্যোর্তিবিজ্ঞানের নানা তথ্য, পৃথিবী জীব-জন্তু, গাছ-পালা সৃষ্টির এবং মানুষের জন্মের নানা প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোরআনে এত প্রচুর বক্তব্য রয়েছে যে, সন্ধানী পাঠক মাত্রই বিস্মিত না হয়ে পরে না। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে এইসব বিষয় সংক্রান্ত বক্তব্যের প্রায় সবগুলিই যেখানে মিথ্যা কিম্বা ভ্রান্তিপূর্ণ, সেখানে ১৪ শত বছর আগেকার কোরআনের এতদসংক্রান্ত তথ্য ও বক্তব্য এতটা সঠিক হয় কিভাবে?

ফরাসী বিজ্ঞানী বুকাইলী সত্য প্রকাশে বাধ্য হয়ে বলেছেন-***I had to stop and ask myself :*** *If a man was the author of the Quran, how could he have written faets in the Seventh Century A.D. that today are shown to the in keeping with modern Scientific Knowledge?*

এই গ্রন্থ পাঠ করতে করতে আমি থমকে যাই এবং আমার নিজেকে প্রশ্ন করি, কোরআনের গ্রন্থকার যদি একজন মানুষই হতেন তবে তাঁর পক্ষে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এমন বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহের উপর আলোকপাত করা কিভাবে সম্ভব হল- যা

করিয়া। এতদ্ভিন্ন কোন কোন মো'জেযা বিরুদ্ধবাদীগণের চ্যালেঞ্জের উত্তরেও প্রকাশ পাইয়াছিল, যেমন "শাক্কুল কামার"– চাঁদ দিখণ্ডিত করার মো'জেযা।

হযরত (সঃ) কর্তৃক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা (পৃঃ ৫১৩–৫৪৬)

অন্ধকার যুগেও কাফেরগণ মনগড়ারূপে হজ্জ পালন করিয়া থাকিত। হজ্জের কার্যাবলী পালনান্তে যিলহজ্জ চাঁদের ১১, ১২, ১৩ তারিখ মিনায় অবস্থান করিয়া আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকার নিয়ম রহিয়াছে। সেকালেও এই দিনগুলি মিনায় কাটাইবার নিয়ম ছিল। অবশ্য কাফেরগণ তথায় নিজেদের বাহাদুরী এবং নিজ নিজ পূর্বপুরুষদের প্রাধান্যের আলোচনা সম্বলিত কবিতার ছড়াছড়ি করিয়া কাটাইত; এই সূত্রে উক্ত তারিখে মিনার মধ্যে একত্রে অনেক লোক পাইয়া যাওয়ার এক সুযোগ লাভ হইত।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশে হয়ত তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। আবু জাহলসহ কতিপয় কাফের সর্দার তখন হযরত (সঃ)-কে আল্লাহর রসূল হওয়ার দাবীর প্রমাণস্বরূপ কোন অলৌকিক ঘটনা কিম্বা নির্দিষ্টরূপে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখাইবার চ্যালেঞ্জ করিল।

হযরত (সঃ) সর্বদা মক্কার সর্দারগণকে কোন উপায়ে ইসলামের ছায়াতলে টানিয়া আনার সুযোগের সন্ধানে থাকিতেন। সুতরাং তিনি তাহাদের এই চ্যালেঞ্জ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া

আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে বর্তমান যুগে দাবী করা হয়?

এই আলোচনাকে আরও সুস্পষ্ট করতে বুকাইলী বলেছেনঃ মুহাম্মদের (সঃ) উপর কোরআন অবতীর্ণ হওয়র সময়টিতে ফ্রান্সে রাজত্ব করতেন রাজা জাগোবার্ড (৬২৯–৬৩৯)। কোন মানুষই যদি এই কোরআনের রচয়িতা হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর পক্ষে কিভাবে এত সব বিষয়ের সঠিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সত্য তুলে ধরা সম্ভব হল যা আমরা আজ এত শত বছর পর জানতে পেরেছি?

অমুসলিম বিশ্বের এই ধারণা যে, কোরআনে এই সব বিস্ময়কর বিষয় পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে– খৃষ্টান মরিস বুকাইলী এই ধারণার খণ্ডনে বলেছেনঃ তিনি এর সত্যতা খুঁজতে গিয়ে নিজে (রাশিয়ার অন্তর্গত) তাশকন্দ সফর করেছেন এবং সেখানকার জাদুঘরে সংরক্ষিত হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আমলের কোরআনের সাথে বর্তমান আমলের কোরআনের প্রতিটি আয়াত ধরে ধরে মিলিয়ে নিয়েছেন। দেখেছেন, এই তের শত বছর পরেও কোরআনে কোন একটি শব্দও অনুপ্রবেশ করে নাই।

বিজ্ঞানী বুকাইলী ইতিহাসের প্রমাণপঞ্জী তুলে ধরে বলেছেন ঃ মুহাম্মদ (সঃ) যিনি ছিলেন নিরক্ষর, সেই নিরক্ষর লোকটির দ্বারা এই সময়কার আরবে কোন একটি সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম কিভাবে রচিত হতে পারে? শুধু কি তাই? সেই নিরক্ষর লোকটির পক্ষে কিভাবেই বা সম্ভব বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক রহস্যাবলীর এমন সব সত্য নির্ভুল তথ্য তুলে ধরা, যা সে সময়ের যেকোন লোকের চিন্তারও অগোচরে থাকার কথা এবং সেই দুরূহ বিষয় সংক্রান্ত তথ্য ও সত্যের বর্ণনায় কোথাও একবিন্দু ত্রুটি কিম্বা বিচ্যুতি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

মরিস বুকাইলী তাঁর পুস্তকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন– নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ ও গবেষণার শেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে একটাই। আর তা হলো, সপ্তম শতাব্দীর কোন মানুষের পক্ষেই শত শত বৎসর পরে আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের এত সব প্রতিষ্ঠিত বিষয় ও সত্য এবং বিচিত্র জ্ঞান ও তথ্য বুঝতে পারা ও প্রকাশ করা আদৌ সম্ভব নয়। কোরআন যে কোন মানুষের রচনা নয়, আমার কাছে এটাই তার সবচাইতে বড় প্রমাণ। (সমাপ্ত)

পাঠকবৃন্দ! ফরাসী খৃষ্টান বিজ্ঞানী বুকাইলী তাঁহার সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক কঠিন প্রাচীর ভেদ করিয়া শেষ পর্যন্ত ইসলামের ছায়াতলে আসিয়াছিলেন কি-না তাহা জানা নাই। কিন্তু তিনি বর্তমান উন্নত দেশের একজন বিজ্ঞানী, পবিত্র কোরআনকে যাচাই-বাছাই করার জন্য তিনি নজিরবিহীন সুদীর্ঘ ও কঠিন সাধনা করিয়াছেন। তারপর সমালোচনার উদ্দেশ্যে তাহার চুল-চেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এমনকি তিনি তাঁহার ঐসবসাধনা, গবেষণা ও অভিজ্ঞতার উপর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং তখনও তিনি অমুসলম। তিনি তাঁহার সেই গ্রন্থে সুচিন্তিত অভিমত ও স্থির সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "কোরআন মানুষের রচনা নহে।" কোন মুসলমানের এইরূপ উক্তি অপেক্ষা বিজ্ঞানী খৃষ্টান বুকাইলীর উক্তি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক জর্জ "বার্নার্ডশ"-এর একটি মূল্যবান দর্শন স্মরণ করাইয়া দেয়– "সত্য স্বতই প্রকাশমান। যিনি চক্ষুষ্মান তিনি সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা বা সন্দেহে ভোগেন না। যে অন্ধ সে সত্য দেখার জন্য জেদ ধরে বটে, কিন্তু চোখ না থাকার কারণে দেদীপ্যমান সত্য দেখা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় না।"

করিলেন। অতপর স্বীয় শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা * চাঁদের প্রতি ইশারা করিলেন, ফলে তৎক্ষণাত পূর্ণ চাঁদ দুই খণ্ড হইয়া গেল। এমনকি এক খণ্ড হইতে অপর খণ্ড অনেক দূর ব্যবধানে চলিয়া গেল। হযরত (সঃ) কাফেরদিগকে বলিলেন, اشهدوا اشهدوا তোমরা ভালরূপে প্রত্যক্ষ কর, ভালরূপে দেখিয়া নাও।

তালাবদ্ধ অন্তরবিশিষ্ট কাফেরগুষ্ঠি সবকিছু দেখা ও উপলব্ধি করা সত্ত্বেও তাহাকে জাদু বলিয়া উড়াইয়া দিল। এমনকি তাহাদের কেহ কেহ এইরূপ উক্তি করিল যে, মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের দৃষ্টির উপর জাদু করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকিবে। অতএব, দূর-দেশ হইতে আগন্তুক মুসাফিরদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা হউক যে, তাহারা এস্থান হইতে দূরে থাকাবস্থায় চাঁদ দিখণ্ড হওয়া দেখিয়াছে কি-না? খোঁজ করিয়া তাহারা এইরূপ লোকও পাইল যাহারা দূর-দেশে থাকাবস্থায় এই তারিখে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া * দেখিয়াছে। এতদসত্ত্বেও তাহারা তাহাকে সর্বগ্রাসী জাদু বলিয়া আখ্যায়িত করিল এবং ঈমান আনিল না।

সীরাত শাস্ত্র তথা নবুয়তের ইতিহাস বর্ণনা শাস্ত্রে ত চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা সম্পর্কে ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ণিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কোরআন-হাদীছের অকাট্য প্রমাণ দ্বারাও তাহা প্রমাণিত রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা–

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ـ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ـ

অর্থ ঃ (বিশ্ববাসী! সতর্ক হও;) কেয়ামত ঘনাইয়া আসিয়াছে; (যাহার সংবাদদাতার সত্যতা প্রমাণে) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে * কিন্তু কাফেরদের অবস্থা এই যে,

তাহারা (রসূলুল্লাহর সত্যতার) কোন প্রমাণ দেখিলে তাহা উপেক্ষা করে এবং বলে, ইহা বড় শক্তিশালী জাদু। (সূরা কামার– পারা–২৭)

এই সম্পর্কে হাদীছও অনেক আছে। ইমাম বোখারী (রঃ) দুই স্থানে এই বিষয়ে দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন। ৫১৩ পৃষ্ঠায় "মোশরেকগণ (সত্যতার) প্রমাণ দেখিতে চাহিলে নবী (সঃ) তাহাদিগকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মো'জেযা দেখাইয়াছিলেন।" ৫৪৬ পৃষ্ঠায় "চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বয়ান" এই পরিচ্ছেদদ্বয়ে নিম্নে বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

১৭৯০। হাদীছ ঃ عن انس ابن مالك رضى الله تعالى عنه اَنَّ اَهْلَ مَكَّةَ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّرِيَهُمْ اٰيَةً فَاَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتّٰى رَاَوْا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا

অর্থ ঃ আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মক্কাবাসী কাফেররা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ফরামায়েশ করিল, তিনি যেন তাহাদিগকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখান। তিনি তাহা দেখাইলেন, এমনকি চাঁদের খণ্ডদ্বয় পরস্পর এ রূপ ব্যবধানে চলিয়া গেল যে, তাহাদের মধ্যস্থলে দর্শকগণ হেরা পর্বত দেখিতে পাইল।

---

*তফসীর রহুল মাআনী– সূরা কমার।

* সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মোহাদ্দেস "ইমাম বায়হাকী" তাঁহার "দালায়েলুন নবুয়াহ্– নবীর সত্যতার প্রমাণ" নামক কিতাবে ঘটনা প্রত্যক্ষকারী ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে এই সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি বর্ণনা করিয়াছেন– যাহার উল্লেখ সম্মুখে আসিতেছে।

* انشق শব্দটি মাজি তথা অতীতকাল বোধক ক্রিয়াপদ; যাহার অর্থ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ভবিষ্যৎকালের অর্থ টানিয়া আনা যে, (কেয়ামত বা মহাপ্রলয়কালে) খণ্ডিত হইবে– ইহা উক্ত শব্দের মূল অর্থের বিপরীত। এইরূপ ব্যবহার রূপক বা উপঅর্থে স্থান বিশেষে অনুমোদিত)।

কিন্তু এস্থলে প্রয়োজন না থাকায় তাহা অশুদ্ধ হইবে। এতদ্ভিন্ন এস্থলে ভবিষ্যত কালের অর্থ লওয়া হইলে সংলগ্ন পরবর্তী আয়াতের সঙ্গতি বিনষ্ট হইবে। পরবর্তী আয়াতের মর্মে বুঝা যায়, কাফেরগণ হযরতের সত্যতার এই প্রমাণ দেখিয়াছে এবং ইহা শক্তিশালী জাদু বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছে। ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও উক্ত আয়াত আলোচ্য মো'জেযা সম্পর্কে সাব্যস্ত করিয়াছেন। (১৭৯২ হাদীছ দ্রষ্টব্য)

১৭৯১। হাদীছ ঃ عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى فَقَالَ اشْهَدُوا وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الْجَبَلِ ـ

অর্থ ঃ ইবনে মসউ'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা মিনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম।* (হযরতের আঙ্গুলের ইশারায়) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। হযরত (সঃ) উপস্থিত সকলকে বলিলেন, (আমার রসূল হওয়ার প্রমাণ) প্রত্যক্ষ কর। এক খণ্ড অপর খণ্ড হইতে দূরে হেরা পর্বতের দিকে চলিয়া গিয়াছিল।

১৭৯২। হাদীছ ঃ عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه انَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় ইহা একটি সত্য ঘটনা যে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যমানায় (তাঁহারই সত্যতার প্রমাণস্বরূপ) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ "শাক্কে কামার" বা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) তিন জন সুপ্রসিদ্ধ ছাহাবীর বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, তিনি ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আনাছ (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের বর্ণনায় প্রমাণিত হয়, ঐ ঘটনা সেকালের স্থানীয় লোকদের মধ্যে এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের নিকটই তাহা বাস্তবরূপে স্বীকৃত ছিল। আনাছ (রাঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন না, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঘটনার সময় পয়দাও হন নাই, কিন্তু তাঁহারা জনসাধারণের স্বীকৃতি সূত্রেই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন হোযায়ফা (রাঃ), জোবায়ের ইবনে মোতয়ে'ম (রাঃ), ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী হইতেও এই ঘটনা বর্ণিত হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে।

"শাক্কুল কামার" বা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সত্যতার এবং রসূল হওয়ার একটি অতি উজ্জ্বল প্রমাণ ছিল। এই মো'জেযা হযরতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, অন্য কোন নবীকে চাঁদের উপর এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাইবার মো'জেযা প্রদান করা হয় নাই।

(যোরকানী, ৫-১০৭)

"চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার" মো'জেযার প্রমাণ

পুরাতন যুগের ঘটনাবলীর সংবাদ সম্পর্কে ইতিহাস শাস্ত্র অপেক্ষা হাদীছ শাস্ত্রের মান-মর্যাদা ও

---

* হযরত (সঃ) মিনায় থাকিয়াই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা দেখাইয়াছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় মক্কার নাম উল্লেখ আছে, তাহা বাস্তবের বিপরীত নহে, কারণ মক্কাই হইল কেন্দ্রীয় নগরী।

মিনা তাহারই সংলগ্ন- শহরতলী স্বরূপ। তদুপরি মক্কার নাম উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত (সঃ) মক্কায় থাকাকালীন এই মো'জেযা সংঘটিত হইয়াছিল।

চাঁদের খণ্ডদ্বয়ের মধ্যস্থলে হেরা পর্বত দেখা যাওয়ার এবং মিনা এলাকায় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার উল্লেখ বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ হেরা পর্বত মিনা এলাকায়ই অবস্থিত। কোন কোন বর্ণনায় চাঁদের খণ্ডদ্বয়ের অবস্থান নির্ণয়ে "আবু কোবায়েস পাহাড়" "সোআয়দা পাহাড়", "সাফা পাহাড়, "মারওয়া পাহাড়" ইত্যাদি নাম উল্লেখ হইয়াছে; এই পাহাড়সমূহ খাস মক্কা নগরীর মধ্যে অবস্থিত। এই সব বর্ণনা মূল ঘটনার সহিত সঙ্গতিবিহীনও নহে এবং পরস্পর বিরোধীও নহে, কারণ হেরা পর্বত এবং উল্লিখিত অন্যান্য পর্বতগুলি সবই ২/৩ মাইল সীমার মধ্যে অবস্থিত। চাঁদের ন্যায় এত উর্ধ্বের একটি বস্তু তথায় দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের সম্মুখে উল্লিখিত সবগুলি পাহাড়ের উপর দেখা যাওয়া এবং এক বর্ণনাকারীর এক একটি উল্লেখ করা বা একই বর্ণনাকারীর বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন নাম উল্লেখ করা মোটেই সঙ্গতিবিহীন নহে। অধিকন্তু হেরা পর্বতের নাম উল্লেখের বর্ণনায় পর্বতটি চাঁদের খণ্ডদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৃষ্ট হওয়ার বয়ান রহিয়াছে, পক্ষান্তরে অন্যান্য পর্বতের নাম উল্লেখের বর্ণনায় চাঁদের এক-একটি যে যে পাহাড় বরাবর দেখা যাইতেছিল তাহার বয়ান রহিয়াছে।

নির্ভরযোগ্যতা অনেক অনেক বেশী, এমনকি উভয়ের কোন তুলনাই হইতে পারে না। কারণ, হাদীছ শাস্ত্রের প্রাণবস্তু হইতেছে প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর জন্য সনদ বা পরম্পরা সাক্ষ্য সূত্র উল্লেখ করা; তাহাও আবার মোহাদ্দেসগণের চুলচেরা বাছনিতে, যেন বিশ্বস্ততার প্রতি উচ্চস্তরে পৌঁছিয়া যায়। বিশেষতঃ ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের বাছনির মর্যাদা ত অনেক উর্ধ্বে। পক্ষান্তরে ইতিহাস শাস্ত্রে অতীতের ঘটনাবলীর ছড়াছড়ি ত খুবই আছে, কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রের ন্যায় সাক্ষী পেশ করার রীতি সেখানে নাই, বাছনি করার কোন বাধ্যবাধকতা বা বিধান ত মোটেই নাই; অথচ হাদীছের সনদ বা সাক্ষীসমূহ তিলে তিলে বাছিয়া নিবার জন্য "উসূলে হাদীছ" নামে বিশেষ শাস্ত্র এবং তাহার ধারাগুলি প্রয়োগের জন্য "আসমাউর রেজাল" নামে আর একটি বিশেষ শাস্ত্র বিরাট বিরাট গ্রন্থাবলী আকারে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (১ম খণ্ডের দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং কোন সংবাদ হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হইলে সেখানে ইহা ইতিহাসে উল্লেখ নাই এইরূপ অজুহাত পেশ করা জঘন্য ধরনের অন্যায় হইবে।

আলোচ্য মো'জেযার ঘটনা বোখারী ও মুসলিম শরীফসহ সমুদয় হাদীছ গ্রন্থে প্রত্যক্ষ দর্শকের সাক্ষ্য ও বিবৃতির মাধ্যমে বর্ণিত রহিয়াছে। তদুপরি মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থাবলীতে বিশেষতঃ সীরাত তথা নবুয়তের ইতিহাস শাস্ত্রের প্রত্যেক গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও ইসলাম বিদ্বেষীগণ আমাদের নবীর এই মহান মো'জেযা এই বলিয়া উপেক্ষা করিতে চায় যে, ইতিহাসে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না– ইহা জঘন্য ধৃষ্টতা। তাহাদিগকে ইহাও বুঝিতে হইবে, সেই আমলে আরবের ন্যায় শিক্ষা-দীক্ষাহীন দেশে ইতিহাস সংগ্রহের স্বপ্ন কেহ দেখে নাই এবং সংবাদপত্র বা অন্য কোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় বহির্বিশ্বের যোগসূত্র সেখানে মোটেই ছিল না।

তাহারা আরও বলেন, চন্দ্র এমন বস্তু যে তাহা বিশ্বের প্রত্যেক স্থান হইতে দেখা যায়। অতএব চন্দ্রের উপর এরূপ পরিবর্তন আসিয়া থাকিলে বিশ্ববাসী তাহা অবশ্যই বিশেষ কৌতুকের সহিত গ্রহণ করিত এবং ইতিহাসে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিত।

এ প্রশ্নের দ্বারা কোন জ্ঞানশূন্য বোকাকে ধোকা দেওয়া ত সম্ভব, কিন্তু বাস্তবের সম্মুখে ইহা মাকড়সার জালস্বরূপ। চিন্তা করুন– (১) চন্দ্র-সূর্যের উদয় অস্ত বিশ্বের সকল দেশে এক সঙ্গে হয় না। এক দেশে যখন রাত্র, অপর দেশে তখন দিন; সুতরাং যেই সময় মক্কায় চন্দ্র খণ্ডিত হয় তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল; চন্দ্র দৃষ্ট ছিল না। যেরূপ এখনও চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ এক দেশে দৃষ্ট হয়; কিন্তু অনেক অনেক দেশে তাহা দৃষ্ট হয় না; সংবাদপত্র মারফত এইরূপ শুনা যায়। (২) উদয় অস্তের বিভিন্নতার দরুন বিভিন্ন দেশে সময়ের বিভিন্নতা অপরিহার্য। সুতরাং মক্কা নগরীতে যখন এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তখন অনেক দেশে এমন গভীর রাত্র ছিল যে, তখন সেস্থানের লোকগণ নিদ্রামগ্ন ছিল। (৩) স্বাভাবিক আবর্তন বিবর্তনের দরুন ঊর্ধ্ব জগতে যেসব সাধারণ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, যেমন চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ যাহা হিসাবের দ্বারা পূর্ব হইতে নির্ধারিত ও প্রচারিত থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখার লোকের সংখ্যাও কতই না নগণ্য; আর আলোচ্য মো'জেযাটি ত একটি আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল– যাহার কোনই পূর্বাভাস ছিল না। সুতরাং ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকগণ ত অবশ্যই তাহা অবলোকন করিয়াছে, কিন্তু সাধারণ বিশ্ববাসী বহু সংখ্যায় তাহার প্রতি তাকাইবে এরূপ আশা করা নিতান্তই অবান্তর। (৪) ঘটনাটি রাত্রি বেলার, তাহাও সাময়িক এবং অল্প সময়ের; ঠিক ঐ সময়ে আকাশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকারীর সংখ্যা কত হইতে পারে তাহ বুঝা কঠিন নহে।

এইসব বিষয়ের প্রতি বাস্তব দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্নটি বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, যেভাবে ইহাকে বিশ্বজোড়া রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহা শুধু একটা ধোকার জাল মাত্র।

মক্কার পার্শ্ববর্তী দেশ-বিদেশে এই ঘটনা পরিলক্ষিত হয় নাই তাহাও নহে। মক্কার সর্দারগণ এই সম্পর্কে খোঁজ-খবর লইয়া ঘটনার বাস্তবতারই সাক্ষ্য প্রমাণ পাইয়াছে। ইমাম বায়হাকী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ইবনে মসউ'দ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

انشق القمر بمكة فقالوا سحركم ابن ابى كبشة فاسئلوا السفار فان كانوا راوا ما رايتم فقد صدق فانه لايستطيع ان يسحر الناس كلهم وان لم يكونوا راوا ما رايتم فهو سحر فاسئلوا السفار وقد قدموا من كل وجه فقالوا رايناه الكفار هذا سحر مستمر -

অর্থাৎ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মোযেজা মক্কায় প্রদর্শিত হইল, তখন মক্কাবাসী কাফেররা তাহা জাদু বলিয়া সাব্যস্ত করিল এবং পরস্পর বলিল, বিদেশ ভ্রমণ হইতে আগন্তুকদিগকে জিজ্ঞাসা কর; যদি তাহারাও এই ঘটনা দেখিয়া থাকে তবে সাব্যস্ত হইবে যে, মুহাম্মদ (সঃ) সত্যবাদী; সকলের উপর ত জাদুর তাসির হইতে পারে নাই; আর যদি ভিন্ন দেশের কেহই এই ঘটনা না দেখে তবে মনে করিবে, ইহা যাদু।

অতপর তাহারা বিদেশ ভ্রমণকারী আগন্তুকগণকে জিজ্ঞাসা করিল। অনেকেই বলিল, হাঁ– আমরা ঐরূপ ঘটনা দেখিয়াছি। এই সব প্রমাণ পাইয়া অন্তরান্ধ কাফের সর্দারগণ মন্তব্য করিল, বস্তুতঃ ইহা অতিশয় শক্তিশালী জাদু। (যোরকানী ১–১০৯)

এতদ্ভিন্ন উক্ত ঘটনা ভারতে দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া প্রায় সাত শত বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত "আল-বেদায়াহ ওয়ান নেহায়া" নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

قد شوهد ذلك فى كثير من بقاع الارض ويقال انه ارخ ذلك بعض بلاد الهند -

অর্থাৎ, উক্ত ঘটনা বিশ্বের অনেক স্থানেই দেখা গিয়াছিল। কথিত আছে যে, ভারতেরও কোন কোন শহরে এই ঘটনা দৃষ্ট হওয়ার তারিখ লিখিত হইয়াছে।

পরবর্তী এক ইতিহাস লেখক ভারতস্থ "মালিবার" এলাকায় এই ঘটনা পরিদৃষ্ট হওয়ার কথা লিখিয়াছেন। মালিবার রাজ্যের শাসকদের রীতি ছিল, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধরূপে রাজপুরীতে সংরক্ষণ করিত। তাহাদের লিপির মধ্যে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত দেখার ঘটনাও উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। (তারীখে ফেরেশতা দ্রষ্টব্য)

এতদ্ভিন্ন এই ঘটনার বাস্তবতার প্রমাণে ইহাই যথেষ্ট যে, ইসলাম, মুসলমান ও হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ইসলামের মূল উচ্ছেদকারী শত্রু, তৎকালীন আরব ও মক্কাবাসীরা কখনও মুসলমানদের এই বর্ণনাকে মিথ্যা বলিয়া চ্যালেঞ্জ করে নাই। তাহারা এই ঘটনাকে জাদু বলিয়া এই ঘটনার দ্বারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু ঘটনার বিবরণ মিথ্যা তাহার বাস্তবতা অস্বীকার করে নাই। ঘটনার বাস্তবতা এতই উজ্জ্বল অকাট্য ছিল যে, মিথ্যা বলার এবং অস্বীকার করার কোন উপায়ই তাহাদের সম্মুখে ছিল না।*

---

* বিজ্ঞানের চরম উন্নতির ফলে মানুষ চন্দ্রে অবতরণ করিয়াছে। মানব জাতি হইতে ইসলামের বিপক্ষ দলকে বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির সুযোগ দান করিয়া তাহাদের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীবের এই বিশেষ মো'জেযা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সত্যতা প্রমাণ করাইয়া দিয়াছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রভাবশালী ও বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র "দৈনিক ইত্তেফাক" ১৯৮১ সালের ১৪ ও ১৭ই মার্চ সংখ্যাদ্বয়ের উপসম্পাদকীয় কলাম হইতে একটি আলোচনার মূল বক্তব্য পাঠক সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছি–

"চাঁদে অবতরণকারী (আমেরিকার) সুপ্রসিদ্ধ মহাশূন্য বিজ্ঞানী নীল আমস্ট্রংয়ের মুসলমান হওয়ার সংবাদটা লণ্ডনের ইম্প্যাক্ট পত্রিকায় প্রায় এক বছর আগে প্রকাশিত হয়। কিছুকাল আগে স্বীয় ধর্মান্তরের এক আলোচনায় নীল আমস্ট্রংয়ের সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়াছিল, তাতেও বিজ্ঞানী নীল আর্মস্ট্রং স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, চাঁদে পদার্পণ করে আমার জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। চাঁদ পুরাপুরিভাবেই দ্বিখণ্ডিত।"

চন্দ্র বিজয়ী মহাশূন্যচারী নীল আর্মস্ট্রং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন– তাঁর সেই ইসলাম গ্রহণের পিছনে কাজ করেছিল চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটিই।

প্রকাশ, নীল আর্মস্ট্রংরা চাঁদে পরিভ্রমণকালে দেখতে পেয়েছিলেন যে, চাঁদে একটি ফাটল রয়েছে। এর সম্ভাব্য প্রমাণ ও তথ্যাদি তাঁরা সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেই সব তথ্য প্রমাণ (আমেরিকার) মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্র "নাসাতে" বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। দেখা গেছে, চাঁদটি একবার সত্য সত্যই দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল এবং সেই দু'খণ্ডকে পুনরায় জোড়া

চাঁদ দ্বিখণ্ডিতকরণ মো'জেযার সময়কাল

এই মো'জেযাটি হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। (যোরকানী ৫-১০৮)

ইহা যিলহজ্জ চাঁদের ১২-১৩ তারিখ অর্থাৎ চান্দ্র বৎসরের শেষ দিন কয়টির ঘটনা। আর হযরত (সঃ) হিজরত করিয়াছিলেন নবুয়তের ত্রয়োদশ বৎসরের প্রথম ভাগে; সুতরাং উক্ত ঘটনা নবুয়তের সপ্তম বৎসর যিলহজ্জ মাসে গণ্য করা হইলে তাহা হিজরতের পাঁচ বৎসর দুই আড়াই মাস পূর্বে সাব্যস্ত হয়।*

হযরতের বিভিন্ন মো'জেযা

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিভিন্ন কার্যে মো'জেযা প্রকাশ পাইত। ঐরূপ ঘটনাবলীর কতিপয় হাদীছও ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭৯৩। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৪) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোন এক সফরে বাহির হইলেন, তাঁহার সঙ্গে কিছু সংখ্যক ছাহাবীও ছিলেন। পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইল, তাঁহার সঙ্গে পানির ব্যবস্থা ছিল না। এক ব্যক্তি একটি পাত্রে অল্প পরিমাণ পানি উপস্থিত করিল। নবী (সঃ) তাহা দ্বারা অযূ করিলেন; অতপর অঙ্গুলিসমূহ ঐ পাত্রে বিছাইয়া দিলেন এবং ঐ পাত্র হইতে অযূ করিবার জন্য সকলকে নির্দেশ দিলেন। সকলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া অযূ করিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় প্রায় সত্তর জন ছিলেন।

১৭৯৪। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৪) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মদীনাস্থিত "যওরা" নামক স্থানে ছিলেন, (নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল, পানির স্বল্পতা ছিল,) হযরত (সঃ) স্বীয় হস্ত একটি পানির পাত্রে রাখিয়া দিলেন, তৎক্ষণাত তাঁহার আঙ্গুলসমূহের ফাঁক দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতে লাগিল। ঐ পানি দ্বারা উপস্থিত সকলে উত্তমরূপে অযূ করিলেন। আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় তিন শত ছিল।

১৭৯৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৫) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কিছু সংখ্যক ছাহাবীর সঙ্গে এক স্থানে ছিলেন, এমতাবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল। যাহাদের বাড়ী নিকটবর্তী ছিল তাহারা অযূ করিবার জন্য নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেল। কিছু সংখ্যক লোক এমনও ছিলেন যাঁহাদের বাড়ী-ঘর নিকটবর্তী ছিল না।

তখন হযরতের সম্মুখে একটি পাত্র উপস্থিত করা হইল, হযরত (সঃ) তাহার মধ্যে হস্ত মোবারক

দেয়া হয়েছে। "নাসার" বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার এই প্রমাণও উদ্ধার করতে পেরেছেন যে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় ১৪০০ বছর আগে। চৌদ্দশ' বছর আগে অলৌকিক ঘটনা হিসাবে মহানবী (সঃ) যে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন, সে বিবরণ নীল আর্মস্ট্রং এর আগেই পড়েছিল। "নাসার" বিজ্ঞানীদের এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশের পরেই তিনি আর দেরী না করে ইসলাম কবুল করেন।

এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁর বিরূপ অভিমত কারো অজানা নয়। কিন্তু তিনিও তাঁর "মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে"এ ঘটনার উল্লেখ করে গেছেন। ইতিহাস থেকে প্রমাণ দিয়েছেন যে, দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজা বেরুখান পেরুমল এই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্বয়ং মহানবীর (সঃ) কাছে গিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

* এই হিসাব মতে দেখা যায় যে, যাঁহাদের মতে হযরতের বিরুদ্ধে মক্কাবাসী কাফেরগণের বয়কট বা অসহযোগিতা নবুয়তের অষ্টম বৎসরে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাদের মতানুসারে উক্ত মো'জেযা বয়কটের পূর্বে সাব্যস্ত হইবে। আর যাঁহাদের মতে বয়কট নবুয়তের সপ্তম বৎসরের প্রথম হইতেই ছিল তাহাদের মতানুসারে উক্ত মো'জেযার ঘটনা বয়কটের সময়ে সাব্যস্ত হইবে। যদিও কাফেররা হযরতের বিরুদ্ধে বয়কট ও অসহযোগিতা করিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তিনি মুহূর্তের জন্যও ইসলামের তবলীগ কার্য ক্ষান্ত করেন নাই। (আসাহুস সিয়ার ৯৪)। এবং তাঁহারা হজ্জের সময় হজ্জের অনুষ্ঠানাদিও সম্পন্ন করিয়া থাকিতেন।

(যোরকানী ১-২৭৯)

ছড়াইয়া রাখিতে চাহিলেন, কিন্তু পাত্রটি সঙ্কীর্ণ ছিল, তাই তিনি হাতের আঙ্গুলসমূহ একত্রিতরূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইলেন, অতপর তাহা হইতে উপস্থিত সকলে অযূ করিল– তাহাদের সংখ্যা আশি জন ছিল।

১৭৯৬। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৪) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সাধারণতঃ লোকেরা ধারণা করিয়া থাকে যে, মো'জেযাসমূহ আল্লাহর আযাব সম্বলিত ঘটনাই হইয়া থাকে। আমরা মো'জেযার মধ্যে লাভজনক ঘটনাও পাইয়াছি।

আমরা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল, কিন্তু পানি অতি সামান্য ছিল। হযরত (সঃ) বলিলেন, একটু পানি আমার নিকট উপস্থিত কর। একটি পাত্রে অতি সামান্য একটু পানি উপস্থিত করা হইল। হযরত (সঃ) স্বীয় হস্ত ঐ পাত্রে রাখিয়া দিলেন এবং সকলকে বলিলেন, তোমরা আল্লাহর তরফ হইতে বরকতের পানি দ্বারা অযূ করিতে আস।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি ঐ ঘটনায় দেখিয়াছি, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতেছে।

এতদ্ভিন্ন হযরতের এই মো'জেযাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, খাদ্য বস্তুসমূহ তসবীহ পড়িয়া থাকিত এবং আমরা তাহা শুনিতে পাইতাম।

১৭৯৭। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০৬) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (তাঁহার মসজিদের মিম্বর তৈয়ার হওয়ার পূর্বে) একটি শুষ্ক খেজুর গাছের খুঁটির সহিত হেলান দিয়া জুমার খোতবা ইত্যাদি ভাষণ দিয়া থাকিতেন। মিম্বর তৈয়ার হইলে পর জুমার খোতবাদানে তিনি ঐ খুঁটি ত্যাগ করতঃ মিম্বরে দাঁড়াইলেন; তখন ঐ খেজুর কাণ্ডটি (শিশুর ন্যায় বা বাছুরহারা গাভীর ন্যায়) রোদন করিতে লাগিল (তাহার ক্রন্দন স্বর আমরা শুনিয়াছি)। অতপর হযরত (সঃ) মিম্বর হইতে অবতরণ করিয়া তাহার নিকটে আসিলেন, তাহার উপর হাত বুলাইলেন (এবং আলিঙ্গন করিলেন)। তখন ধীরে ধীরে তাহার ক্রন্দন স্বর থামিয়া আসিল, যেরূপ ক্রন্দনরত শিশুকে সান্ত্বনা দান করা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যাঃ হাসান (রঃ) বর্ণনা করয়া বলিলেন, হে মুসলমানগণ! একটি শুষ্ক কাঠ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহ অসাল্লামের প্রতি এত অনুরক্ত ও আসক্ত ছিল; তোমরা ত মানুষ– তোমাদের পক্ষে ঐরূপ হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয় নহে কি?

এক হাদীছে উল্লেখ আছে, এই ঘটনা উপলক্ষে হযরত (সঃ) লোকদিগকে বলিলেন, এই শুষ্ক কাষ্টের ক্রন্দনে তোমাদের অন্তরে বিস্ময় সৃষ্টি হয় না কি? তখন বহু লোক সেদিকে লক্ষ্য করিল এবং ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল।

উক্ত খেজুর কাণ্ডটি সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে অনেক তথ্য আছে। যথা– (১) তাহাকে হযরত (সঃ) বলিয়াছিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে পুনঃ তোমার স্থানে নিয়া রোপণ করিয়া দেই, তুমি তাজা গাছ হইয়া যাইবে। আর ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে বেহেশতে রোপণ করিতে পারি, তুমি বেহেশতের মাটি ও পানিতে পুষ্ট হইয়া আল্লাহর পেয়ারা বান্দাগণকে ফল খাওয়াইবে। হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, সেই খেজুর কাণ্ডটি দ্বিতীয় ব্যবস্থাই পছন্দ করিয়াছে।

(২) হযরত (সঃ) সাময়িক খেজুর কাণ্ডটি দাফন করাইয়া দিয়াছেন।

(৩) পরবর্তীকালে ঐ খেজুর কাণ্ডটি ছাহাবী উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর হস্তগত হইয়া তাঁহারই হেফাযতে ছিল, এমনকি কালের পরিবর্তনে ধীরে ধীরে তাহার বিলুপ্তি সাধিত হয়। আলেমগণ লিখিয়াছেন যে, দাফনকৃত খেজুর কাণ্ডটি বোধহয় মসজিদে নববীর পুনঃ নির্মাণকালে উক্ত ছাহাবীর হস্তগত হইয়াছিল।

বৃক্ষ জাতীয় খেজুর কাণ্ডের মধ্যে ক্রন্দন ও কথোপকথনের শক্তি সঞ্চার হওয়া অসম্ভব মনে করিবে না। শুধু বৃক্ষ নহে বরং সমস্ত বস্তুই আল্লাহ তাআলার তসবীহ পড়িয়া থাকে– এই সত্য পবিত্র কোরআনেই নিম্নের

আয়াতে বর্ণিত আছে– وَاِنْ مِّنْ شَيْئٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ .

অর্থ ঃ "নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ তাআলার প্রশংসা পবিত্রতার গুণ গাহিয়া থাকে, অবশ্য তোমরা তাহাদের তসবীহ বুঝিতে পার না।"

অবশ্য শুষ্ক অবস্থায় উক্ত খেজুর কাণ্ডের মধ্যে সেই শক্তির সঞ্চার হওয়া এবং জনসাধারণ কর্তৃক শ্রুত ক্রন্দন ও রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে কথোপকথনের শক্তি তথা মানবীয় শক্তির ন্যায় শক্তি সঞ্চার হওয়া প্রিয়নবী মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিশেষ মো'জেযা স্বরূপ ছিল।

একদা ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ন্যায় বড় বড় মো'জেযা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। এক ব্যক্তি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলিল, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে মরা মানুষ জীবিত করার মো'জেযা দেওয়া হইয়াছিল। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তদুত্তরে উক্ত খেজুর খাম্বার ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, ইহাতে মৃতকে জীবিত করার তুলনায় অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কারণ, এস্থলে একটি মরা কাষ্ঠে মানবীয় শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। (উল্লিখিত তথ্যসমূহ "ফতহুল বারী" হইতে উদ্ধৃত)

১৭৯৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫১১) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একজন খৃস্টান মুসলমান হইয়াছিল, এমনকি সে পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারা এবং সূরা আলে এমরানের শিক্ষাও লাভ করিয়াছিল। সে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু অলাইহি অসাল্লামের প্রয়োজনীয় লেখার কাজ করিত। কিছু দিন পরে সে পুনরায় খৃস্টান হইয়া গেল। সে হযরতের কুৎসা করিয়া বলিত যে, মুহাম্মদ বস্তুতঃ কিছুই জানে না, আমার লিখিত বিষয়াবলী দেখিয়াই যাহা কিছু লিখিয়াছে।

অল্প দিনের মধ্যেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইল। তাহার লোকজন তাহাকে খস্টান ধর্মের রীতি অনুসারে মাটিতে দাফন করিয়া দিল। পরদিন ভোরবেলা দেখা গেল, মাটি তাহাকে ভিতর হইতে বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাহার লোকজন মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিল, তাহারাই এইরূপ করিয়াছে, আমাদের লোকটিকে কবর খুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাহারা পুনরায় অধিক মাটির নীচে তাহাকে দাফন করিয়া দিল; এইবারও ভোরবেলা পূর্বের ন্যায় মাটির উপরেই তাহার লাশ দেখা গেল। তাহার লোকজন আবার মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ করতঃ যথাসাধ্য মাটির তলদেশে তাহাকে দাফন করিয়া দিল, কিন্তু এইবারও ভোরবেলা তাহাকে মাটির উপর দেখা গেল। তখন সকলেই বুঝিতে পারিল যে, এই কার্য কোন মানুষের পক্ষ হইতে নহে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাহাকে ঐ অবস্থায়ই ফেলিয়া রাখা হইল।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে বে-আদবী গোস্তাখীর কি পরিণতি তাহার আভাসদানে আল্লাহ তাআলা এই ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন যে, ঐ ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষ অপদস্থতার মধ্যে নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত হইয়াছিল।

১৭৯৯। হাদীছ ঃ খন্দকের জেহাদ উপলক্ষে পরিখা খননের সময়ে ক্ষুধার দুর্বলতায় নবী (সঃ) কাপড় দ্বারা পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবু তালহা (রাঃ) (নবীজীর ঐ অবস্থা অবলোকন করিয়া বাড়ী আসিলেন এবং স্ত্রী উম্মে সোলায়েমকে বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়া আসিলাম– ক্ষুধার কারণে তাঁহার মুখ হইতে ভালভাবে শব্দও বাহির হয় না। তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি? স্ত্রী বলিলেন, হাঁ– আছে; এই বলিয়া তিনি কয়েকটি যবের রুটি বাহির করিলেন এবং একটি চাদর বাহির করিয়া তাহার এক অংশে ঐ রুটিগুলি লেপটাইয়া আমার বগলে দাবাইয়া দিলেন এবং চাদরের বাকী অংশ দ্বারা আমার গা ঢাকিয়া দিলেন– (আনাছ তখন বালক) এই অবস্থায় তিনি আমাকে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আমি মসজিদে যাইয়া হযরত (সঃ)-কে পাইলাম, তাঁহার নিকট অনেক লোক ছিল। আমি যাইয়া তথায়

দাঁড়াইলাম। হযরত (সঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আবু তাল্‌হা তোমাকে পাঠাইয়াছে? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, খাদ্য দিয়া পাঠাইয়াছে? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। তখন হযরত (সঃ) উপস্থিত সকলকে বলিলেন, তোমরা সকলে চল (আবু তাল্‌হার বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়ার জন্য)।

এই বলিয়া সকলে রওয়ানা হইলেন। আমি তাঁহাদের সম্মুখ ভাগে পথ দেখাইয়া চলিলাম এবং আবু তাল্‌হা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে বিস্তারিত খবর জ্ঞাত করিলাম। আবু তাল্‌হা তাঁহার স্ত্রী উম্মে সোলায়েমকে বলিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) অনেক লোক সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ী তশরীফ আনিতেছেন, অথচ আমাদের নিকট কোন ব্যবস্থা নাই যে, আমরা তাঁহাদিগকে খাবার দিতে পারি। উম্মে সোলায়েম বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল আমাদের অবস্থা ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন (সুতরাং আমাদের চিন্তা করার আবশ্যক নাই)। আবু তাল্‌হা (রাঃ) বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া আসিলেন। হযরত (সঃ) আবু তাল্‌হা সমভিব্যাহারে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, হে উম্মে সোলায়েম! তোমার নিকট খাদ্য যাহা কিছু আছে উপস্থিত কর। উম্মে সোলায়েম সেই রুটি কয়টি যাহা আমার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন উপস্থিত করিলেন। হযরতের আদেশে রুটিগুলি খণ্ড খণ্ড করা হইল। উম্মে সোলায়েম ঐগুলির উপর কিছু ঘৃত ঢালিয়া দিলেন। অতপর হযরত (সঃ) তাহার উপর কিছু পড়িয়া দোয়া করিলেন * এবং বলিলেন, লোকদের মধ্য হইতে দশ জনকে ডাকিয়া আন। তাহারা আসিয়া পেট পুরিয়া খাইলেন। অতপর আরও দশ জনকে ডাকিয়া আনা হইল, তাহারাও পেট পুরিয়া খাইলেন। এইভাবে উপস্থিত সকলেই পেট পুরিয়া খাইলেন, তাহাদের সংখ্যা বরং আশি ছিল। (তারপর হযরত (সঃ) বাড়ীর সকলকে নিয়া খাইলেন তবুও খাদ্য বাঁচিয়া গেল- তাহা পড়শীগণের মধ্যে বিতরণ করা হইল। (ফতহুল বারী)

আলোচ্য ঘটনা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যের আরও একটি ঘটনা ঐ খন্দকের জেহাদ উপলক্ষেই ছাহাবী জাবের (রাঃ)-এর সঙ্গে ঘটিয়াছিল। তিনি মাত্র তিন জন লোকের উপযোগী খাদ্য তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিয়া হযরত (সঃ)-কে চুপি চুপি দাওয়াত করিয়াছিলেন, কিন্তু হযরত (সঃ) ব্যাপকভাবে দাওয়াতের ঘোষণা দিয়া জাবেরের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং হযরতের মো'জেযায় সেই তিন জনের খাদ্য এক হাজার লোকে খাওয়ার পরেও অবশিষ্ট রহিল।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ১৪৭৩ নং হাদীছে রহিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ইমাম বোখারী (রঃ) আরও কতিপয় মো'জেযার ঘটনা সম্বলিত হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সব হাদীছের অনুবাদ পূর্বে হইয়া গিয়াছে, যেমন- প্রথম খণ্ডের ২৩১নং, ৩৭০নং ও ৫২১ নং হাদীছ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৬২ নং তৃতীয় খণ্ডের ১৪৯৭ নং ও ১৪৯৮ নং হাদীছ। এতদ্ভিন্ন আরও কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা আখেরী যমানা সম্পর্কে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত; যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ তাহা অনূদিত হইবে।

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আর একটি অন্যতম বিশেষ মো'জেযা হইল মে'রাজ শরীফের ঘটনা। ইমাম বোখারী (রঃ)ও এই ঘটনা বিশেষ গুরুত্বের সহিত ৫৪৮ পৃষ্ঠায় দুইটি পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন।

মে'রাজ শরীফের বয়ান

মে'রাজ শব্দের অর্থ সিঁড়ি বা সোপান, যদ্দারা উর্ধ্বে আরোহণ করা যায়। মে'রাজের ঘটনা বলিতে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিশেষ এক ঐতিহাসিক ঘটনা উদ্দেশ্য; যেই ঘটনায় হযরত (সঃ) সাত আসমান ও তদূর্ধ্বে "মহান আরশ" এবং তাহারও উর্ধ্বে বিশেষ জগত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই

* হযরত (সঃ) এই দোয়া পড়িয়াছিলেন بسم الله اللهم اعظم فيها البركة "আল্লাহর নামে- হে আল্লাহ! এই খাদ্যে বেশী মাত্রায় বরকত দান করুন।"

ঘটনা বা তাহার এক অংশকে আরবি ভাষায় ইসরাও* বলা হয়, যাহার অর্থ রাত্রিকালের ভ্রমণ। এই ঘটনা রাত্রিকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। পবিত্র কোরআনে এই শব্দেই উক্ত ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, কোন এক রাত্রিতে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআলার বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে এবং বিশেষ ব্যবস্থাধীনে জিব্রাঈল ফেরেশতার পরিচালনায় মক্কা হইতে প্রায় এক মাসের পথ বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদ হইয়া তথা হইতে পর পর সাত আসমানে ভ্রমণ করেন এবং সপ্তম আসমান হইতে মহান আরশ, অতপর তাহারও ঊর্ধ্বে সৃষ্ট জগতের বহুস্তর পরিভ্রমণ করেন এবং বরযখী জগত, বেহেশত, দোযখ, লওহে মাহফুজ, বায়তুল মা'মুর, হাউজ কাওসার, সেদরাতুল মোনতাহা, আরশ-কুরসী ইত্যাদি সহ আল্লাহ তাআলার কুদরতের ও তাঁহার বিশেষ সৃষ্টির বহু রকম অলৌকিক অসাধারণ বস্তু পরিদর্শন করেন।

অবশেষে আল্লাহ তাআলার বিশেষ দরবারে উপস্থিতি লাভ করেন, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কালাম বা কথাবার্তার সুযোগ লাভ করেন, এমনকি (অধিকাংশের মতে) স্বচক্ষে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাতও লাভ করেন। ইহজগতের বাহিরে এই সুদীর্ঘ পরিভ্রমণ সংঘটিত হয় এবং তথা হইতে হযরত (সঃ) প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তাঁহার এই পরিভ্রমণের আরম্ভ ও প্রত্যাবর্তন জাগতিক সময়ের হিসাবে ঐ রাত্রের এক অংশ মাত্র ছিল। তাঁহার পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন সম্পূর্ণ বাস্তব এবং যথার্থ সত্য ঘটনা ছিল। কোন প্রকার রূপক বা স্বপ্ন পর্যায়ের মোটেই ছিল না, অবশ্য সব কিছু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কুদরত ছিল বটে।

মে'রাজ শরীফের তাৎপর্য

রসূল ও নবী মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক (Reformer)। মানুষ ভুলিয়া যায় তাহার সৃষ্টিকর্তাকে এবং তাঁহার সহিত সম্পর্ক। সে ভুলিয়া যায় তাঁহার বিচার, ভুলিয়া যায় তাঁহার বিচারের ফলাফল– প্রতিদান বা শাস্তি। ভুলিয়া যায় তাহার সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক তাহার উপর ন্যস্ত কর্তব্যাবলী, ছিন্ন হইয়া যায় সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক। মানুষ এই সবকে ভুলিয়া যায়, অনেক স্থলে এই সবের অস্বীকারকারী হইয়া বসে, অনেক স্থলে এইসবের বিপরীত বিষয় গ্রহণ ও বরণ করিয়া লয়। এইসব অবস্থা মানব জীবনের কলঙ্ক ও কুসংস্কার। এইসবের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতেই রসূল ও নবীগণের আবির্ভাব হইয়া থাকিত; তাঁহারা মানবের ইহকালীন জীবনের দায়িত্ব কর্তব্য এবং পরকালীন জীবনের ফলাফল ও তথ্যাদি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার তরফ হইতে মানবকে জ্ঞাত করিতেন এবং এই জ্ঞান দানের মাধ্যমেই নবী ও রসূলগণ মানব সমাজের ঐ অধঃপতনের সংস্কার সাধন করিতেন।

দুনিয়া অস্থায়ী, এইখানে মানব জাতির আবাদিও অস্থায়ী সুতরাং রসূল এবং নবীগণের সেলসেলারও শেষ সীমা রহিয়াছে। সেই সর্বশেষ রসূল ও নবী হইলেন আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। তাঁহার পর আর কোন নবী বা রসূল আসিবে না, তাঁহার সংস্কারই কেয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হইবে। অতএব সাধারণ নিয়মানুসারেই তাঁহার সংস্কার সর্বাধিক সুদৃঢ় ও দীর্ঘজীবী হওয়া আবশ্যক। সংস্কারকের ছায়া তথা তাঁহার সংস্কার দীর্ঘজীবী ও সুদৃঢ় হয় তাঁহার সংস্কারের বিষয়াবলী তথা তাঁহার উক্তি এবং বক্তব্যাবলীর উপর তাঁহার নিজের বিশ্বাসের অকাট্যতা ও দৃঢ়তা অনুপাতে।

"ইস্‌রা" অর্থ রাত্রিকালের ভ্রমণ এবং "মে'রাজ" অর্থ ঊর্ধ্বে আরোহণ। আলোচ্য ঘটনায় উভয় কার্যই সংঘটিত হইয়াছিল। মক্কা হইতে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদ পর্যন্ত এক মাসের পথ ত নবী (সঃ) ঐ রাত্রে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ঊর্ধ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন। ফলে সাধারণতঃ উভয় শব্দই সম্পূর্ণ ঘটনার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর কাহারও মতে ঘটনার প্রথম অংশের জন্য "ইস্‌রা" শব্দ এবং দ্বিতীয় অংশের জন্য 'মে'রাজ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইমাম বোখারী (রঃ) এই মতামতকেই সমর্থন করেন বলিয়া মনে হয়। কারণ তিনি ভিন্ন ভিন্ন দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন– একটি পরিচ্ছেদে একটি পরিচ্ছেদে 'মে'রাজ' আর 'ইস্‌রা'।

পূর্ববর্তী নবীগণ যেসব বিষয় লোকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছেন, যেমন– আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে জ্ঞাত করিয়াছেন, আরশ-কুরসী বেহশত-দোযখ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়াছেন এবং নেক-বদ আমলের প্রতিদান ও শাস্তি জ্ঞাত করিয়াছেন; এই সব কিছু তাঁহারা জ্ঞাত হইতেন ওহী দ্বারা। ওহী নির্ভুল অকাট্য হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহের লেশমাত্র থাকিতে পারে না, কিন্তু ওহী অকাট্য নির্ভুল হইলেও তাহা শুধু শুনা পর্যায়ের; দেখা পর্যায়ের নহে। শুনা পর্যায়ের অকাট্যতা সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য এবং পূর্ণ ঈমানের জন্য যথেষ্ট ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা দেখা পর্যায়ের অকাট্যতার সমতুল্য নহে; شنیده کئے بود مانند دیده শুনা কখনও দেখার সমতুল্য হইতে পারে না!" এই মর্মে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মৃতকে পুনর্জীবিত করার দৃশ্য চাক্ষুষ দেখিয়া নেওয়ার দরখাস্ত আল্লাহ তাআলার দরবারে করিয়াছিলেন– যাহার বিবরণ চতুর্থ খণ্ডে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ছায়া তথা তাঁহার সংস্কার (reform) সর্বাধিক দীর্ঘস্থায়ী, দীর্ঘজীবী ও সুদৃঢ় করার ব্যবস্থাস্বরূপ সব কিছু দেখাইয়া দিবার জন্য এই বিশেষ পরিভ্রমণের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা–

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ـ

অর্থ ঃ অতি মহান পাক-পবিত্র আল্লাহ; যিনি স্বীয় বিশিষ্ট বান্দা (মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-কে রাত্রি বেলায় মক্কার মসজিদ হইতে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদের পথে পরিভ্রমণে নিয়াছেন, (তিনি স্বয়ং সেই পরিভ্রমণের) উদ্দেশ্য এই (প্রকাশ করিতেছেন) যে, আমি তাঁহাকে আমার (কুদরতের এবং সৃষ্টির) অনেক নিদর্শন ও অলৌকিক বস্তুনিচয় পরিদর্শন করাইব। (পারা–১৫; রুকু– ১)

এই পরিভ্রমণের মাধ্যমে হযরত (সঃ) সব কিছু দেখিয়াছেন– বরযখী জগত দেখিয়াছেন, পূর্ববর্তী নবীগণ যাহাদের ইতিহাস বিশ্ববাসীকে শুনাইবেন তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন, নেক-বদ আমলের প্রতিদান ও শাস্তি দেখিয়াছেন; আরও দেখিয়াছেন বেহেশত-দোযখ, আরশ কুরসী, বায়তুল মা'মুর, সেদরাতুল মোনতাহা, লওহে মাফুজ, হাউজে কাওসার ইত্যাদি, এমনকি সম্ভাব্য পরিমাণে মহান আল্লাহকেও দেখিয়াছেন।

পবিত্র কোরআনে অন্য এক প্রসঙ্গে হযরতের এই পরিভ্রমণের উল্লেখ রহিয়াছে–

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ـ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ـ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ـ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ـ

অর্থাৎ হযরত (সঃ) সেদরাতুল মোনতাহার নিকট পৌঁছিয়াছিলেন; ঐ এলাকায়ই চির বাসস্থান বেহেশত অবস্থিত। তখন (তথায় হযরতের আগমন উপলক্ষে) এক বিশেষ রকমের সজ্জা সেদরাতুল মোনতাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। (সেই এলাকায় পৌঁছিয়াও) হযরতের পরিদর্শন ও অনুধাবনশক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ সতেজ সঠিক ও বিমল ছিল; পরিদর্শন ও অনুধাবনে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল না। হযরত (সঃ) তথায় স্বীয় প্রভু পরওয়ারদেগারের বহু রকম বড় বড় নিদর্শন ও বস্তুনিচয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। (পারা-২৭, রুকু-৫)

এইভাবে ইসলামের আকীদা বিশ্বাসী অদৃশ্য অলৌকিক বস্তুনিচয় যাহা অন্যান্য নবীগণের পক্ষে শুধু ওহী মারফত তথা শুনা পর্যায়ের অকাট্য ছিল; মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পক্ষে ঐসব বস্তুনিচয় দেখা পর্যায়ের অকাট্যতায় পরিণত হইয়াছিল। ফলে তাঁহার প্রচারিত ও বক্তব্য বিষয়াবলী সম্পর্কে তাঁহার একীন বিশ্বাস ছিল সর্বাধিক দৃঢ়; যদ্দরুন তাঁহার ছায়া তথা তাঁহার সংস্কার (reform) দীর্ঘজীবী ও সুদৃঢ় হইয়াছে।

'মে'রাজ' হযরতের পক্ষে আদর সোহাগের মোলাকাত ছিল

নবুয়ত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ নয় বৎসরকাল হযরত (সঃ) দুঃখ-যাতনার ভিতর দিয়া কাটাইয়াছেন– দশম বৎসরে তাঁহার মানসিক ও দৈহিক কষ্ট চরমে পৌঁছিল। ইহজগতে তাঁহার একমাত্র রক্ষণাবেক্ষণকারী, সাহায্য সমর্থন দানকারী চাচা আবু তালেবের মৃত্যু হইল, এই বৎসরই পরম প্রতিভাশালিনী জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদীজারও ইন্তেকাল হইয়া গেল। হযরত (সঃ) শত্রু বেষ্টনীর মধ্যে ঘরে বাহিরে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িলেন, এমনকি হযরত স্বয়ং এই বৎসরকে عام الحزن শোকের বৎসর নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তদুপরি তায়েফ নগরীর ঘটনা ত তাঁহার ব্যথিত হৃদয়কে আরও ঘায়েল করিয়াছিল।

রহমানুর রহীম আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়ম– যাহা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন–

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -

অর্থ ঃ "কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট থাকে, কষ্টের সঙ্গেই মিষ্ট থাকে।"

আল্লাহ তাআলার এই সাধারণ নিয়মটি তাঁহার আওলিয়া– দোস্ত ও পেয়ারা বন্দাদের পক্ষে বিশেষরূপে বাস্তবায়িত হইয়া থাকে। এস্থলে আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ পেয়ারা হাবীব সর্বাধিক দুঃখ-যাতনা ভোগ করিলেন, তাঁহার জীবনের সর্বাধিক ব্যথা ও আঘাতে তিনি মর্মাহত হইলেন, এই ক্ষেত্রে কি আল্লাহ তাআলা তাঁহার সেই সাধারণ নিয়ম– "কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট" বাস্তবায়িত করিবেন না? নিশ্চয়ই করিবেন; রহমানুর রাহীম আল্লাহ তাআলা তাহাই করিয়াছেন।

দশম বৎসরে হযরত (সঃ) আন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় দিক দিয়া ব্যথা ও দুঃখ-যাতনার চরম অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। চাচা আবু তালেব ও জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদীজার ইন্তেকালে ত আন্তরিক ব্যথায় বিহ্বল হইয়াছিলেন, আর তায়েফের ঘটনায় বাহ্যিক দুঃখ-যাতনার চরমে পৌঁছিয়াছিলেন। এই দুই প্রকার কষ্টের প্রতিদান স্বরূপ দুই প্রকার মিষ্ট আল্লাহ তাআলা হযরতকে দান করিয়াছিলেন; একটি বাহ্যিক দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক। বাহ্যিক মিষ্ট ও নেয়ামতটি ছিল মদীনাবাসীদের সঙ্গে হযরতের সংযোগ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার সুযোগ– যাহার উপর ভিত্তি করিয়া মদীনায় ইসলামের কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং হযরত (সঃ) এক মস্ত বড় জাতিকে তাঁহার সাহায্য সমর্থন ও সহায়তায় সর্বস্ব উৎসর্গকারীরূপে দণ্ডায়মান পান। এমনকি অচিরেই ইসলাম রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইহার সূচনা নবুয়তের দশম বৎসরের শেষ কয়টি দিনে হইয়াছিল, যাহার বিস্তারিত বিবরণ "আকাবা সম্মেলন" বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক মিষ্ট ও নেয়ামতটি ছিল এই মে'রাজ শরীফ। যাহা একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ব্যতীত অন্য কোন নবী–রসূল, ফেরেশতা তথা কোন সৃষ্টের ভাগ্যেই জুটে নাই। নবুয়তের একাদশ বা দ্বাদশ বৎসরের রজব মাসে এই ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সমস্ত নবীগণকে হযরত (সঃ)-এর পিছনে মোক্তাদীরূপে দাঁড় করাইয়া তিনি যে তাঁহাদের সর্দার, তাহা আনুষ্ঠানিকরূপে দেখান হয়। হযরত (সঃ) এত ঊর্ধ্বে আরোহণ করেন যে, ঐশী বাহন বোরাকও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগে বাধ্য হন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে হযরতের সালাম-কালাম বিনিময় হয়। আল্লাহ তাআলা হযরতকে আদর সোহাগ করিয়া তাঁহার সৃষ্টি কারখানার অলৌকিক অসাধারণ বস্তুনিচয় পরিদর্শন করান। এইসব ত হইল মে'রাজ শরীফের শুধু বাহ্যিক গুটিকয়েক বিষয়ের ইঙ্গিত মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত (সঃ) মে'রাজ শরীফের মাধ্যমে কি অসীম মর্যাদা যে লাভ করিয়াছিলেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া কোথায় যে তিনি পৌঁছিয়াছিলেন তাহা বুঝা ও বুঝান মানুষের পক্ষে বস্তুতঃ সম্ভব নহে। কবি ঠিকই বলিয়াছেন–

لاَ يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهٗ - بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر -

অর্থ ঃ "তাঁহার প্রশংসা ও বাস্তব মর্যাদার বিবরণ দান সম্ভবই নহে; সংক্ষেপে এতটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত করা বাঞ্ছনীয় যে, তিনি খোদা নহেন– খোদার পরের মর্তবাই তাঁহার।

মে'রাজ শরীফের তারিখ

যুগে যুগে মানুষের জ্ঞান-চর্চা ও বিদ্যা-চর্চার ধারা পরিবর্তিত হইয়া থাকে। ইসলামের পূর্বে আরবদের মধ্যে সাহিত্য ও কাব্য ব্যতিরেকে আর কোন জ্ঞান ও বিদ্যা-চর্চার রীতি ছিল না বলিলেই চলে। এমনকি তাহাদের পক্ষে সেই যুগকে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগ বলা হইয়া থাকে। তাহারই সংলগ্ন ইসলামের প্রাথমিক যুগ; তখন হইতে আরবের মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চা পুরাদমে চলিতে আরম্ভ করে, তাঁহারা আল্লাহর বাণী কোরআন এবং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বর্ণিত বিষয়াবলী তথা হাদীছ কণ্ঠস্থ করত তাহা প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তখনকার রীতি ছিল, মূল বিষয়বস্তু ও ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করত; সংরক্ষণ করা। ইতিহাসবেত্তাদের রুচিসম্মত প্রত্যেকটি ঘটনার তারিখ, সময় ও স্থান পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট করার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিত না। তাঁহাদের বিবৃতিতে অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটনারও সঠিক কোন তারিখের বর্ণনা দেখা যায় না। তাঁহারা তাহার গুরুত্বও দিতেন না; বস্তুতঃ তাহা মূল বিষয় ও ঘটনার ন্যায় গুরুত্ব পাওয়ার বস্তুও নহে।

পরবর্তী যুগে যখন বিশেষতঃ ঐসব বিষয় ও ঘটনা ইতিহাসরূপে লিপিবদ্ধ হওয়া আরম্ভ হইল, তখন উদ্যোক্তাগণ ইতিহাসবেত্তাদের রুচি ও রীতি অনুসারে ঘটনাবলীর দিন-তারিখ স্থান নির্ধারণে তৎপর হইলেন, কিন্তু মূল ঘটনার বর্ণনাকারীদের হইতে তাহা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট খোঁজ না পাইয়া নানা প্রকার আকার ইঙ্গিত হইতে ঐসব বিষয় নির্ধারণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। সেমতে তাঁহাদের মধ্যে অনেক স্থলে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সারকথা– অনেক অনেক অকাট্যরূপে প্রমাণিত ঘটনার তারিখ যেমন, "মে'রাজ শরীফের" তারিখ সম্পর্কে সামঞ্জস্যবিহীন মতভেদ দেখা যায়, কিন্তু এই মতভেদ মূল ঘটনার সাক্ষ্যদাতাগণের মধ্যে নহে, বরং মূল ঘটনার সাক্ষীগণ তারিখ বর্ণনা না করায় পরবর্তী যুগের লেখকগণ নিজেদের চেষ্টায় তারিখ বাহির করিতে যাইয়া মতভেদ করিয়াছেন এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক।

স্থানবিশেষে মূল ঘটনা বর্ণনাকারীদের বিবৃতিতেও ঐসব বিষয় নির্ধারণে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন– মে'রাজ শরীফের ঘটনায় হযরত (সঃ)-কে কোন্ স্থান হইতে নেওয়া হইয়াছিল, হযরত (সঃ) তখন কোন্ ঘরে বা কোন্ জায়গায় ছিলেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠকবৃন্দ! স্মরণ রাখিবেন, মূল ঘটনার বিবৃতিদানকারীদের বর্ণনায় কোন বিষয়ের বিভিন্নতা দেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সামঞ্জস্যবিহীন নহে। মে'রাজ সম্পর্কীয় স্থান সম্পর্কে যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তাহার সামঞ্জস্য বিস্তারিত বিবরণে জানিতে পারিবেন।

মে'রাজের তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের অনেক মতভেদ আছে। তবে নবুয়তের একাদশ বৎসরে হওয়াই বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। অবশ্য দ্বাদশ বৎসর সম্পর্কেও মতামত পাওয়া যায়। আর মাস ও তারিখ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মত এই যে, রজব মাসের ২৭ তারিখের রাত্রি ছিল। (যোরকানী, ১–২০৮ দ্রষ্টব্য)

এই ধরনের বিষয়াবলীর তারিখ সম্পর্কে তৎপর না হওয়াই ইসলাম ও শরীয়তের দিক দিয়া উত্তম। ছাহাবী ও তাবেয়ীগণও এই সম্পর্কে তৎপরতা দেখান নাই। কারণ তাহাতে বেদআত তথা নানা প্রকার কুসংস্কার সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে।

মে'রাজের বিবরণ

মে'রাজ শরীফের ঘটনার বিবরণ স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাধ্যমে পাওয়া গিয়াছে। হযরত (সঃ) বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে ছাহাবীদের সম্মুখে তাহার বিবরণ দান করিয়াছেন। ঘটনাটি অতি সুদীর্ঘ, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণনায় বিভিন্ন অংশ বর্ণিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন অংশ উল্লেখবিহীন রহিয়াছে। সকলের বিবৃতি একত্রে দেখিলে মূল ঘটনার অনেকাংশ প্রকাশ পাইয়া যাইবে। মে'রাজ শরীফের বিবরণে ত্রিশ জন ছাহাবীর বর্ণনা বা হাদীছ বর্তমান কিতাবসমূহে পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে বোখারী শরীফে সাত জনের হাদীছ রহিয়াছে– যাহার সুশৃঙ্খল উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة اَنَّ نَبِيَّ اللّٰه صَلَّى اللّٰه **১৮০০। হাদীছ ঃ**
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِىَ بِه بَيْنَمَا اَنَا فِى الْحَطِيْمِ مُضْطَجِعًا اِذْ اَتَانِىْ اٰتٍ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هٰذِه اِلٰى هٰذِه يَعْنِىْ بِه مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِه اِلٰى شِعْرَتِه فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِىْ ثُمَّ اُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ مَّمْلُوْءَةٍ اِيْمَانًا فَغَسَلَ قَلْبِىْ ثُمَّ حُشِىَ ثُمَّ اُعِيْدُ - ثُمَّ اُتِيْتُ بِدَابَّةٍ دُوْنَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ اَبْيَضُ فَقَالَ لَهُ الْجَارُوْدُ وَهُوَ الْبُرَاقُ يَا اَبَا حَمْزَةَ قَالَ اَنَسٌ نَعَمْ يَضَعُ خَطْوَهٗ عِنْدَ اَقْصٰى طَرْفِه فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِىْ جِبْرَائِيْلُ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرَائِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِه فَنِعْمَ الْمَجِىْءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا فِيْهَا اٰدَمُ هٰذَا اَبُوْكَ اٰدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَبِىْ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرَائِيْلُ - ....

অর্থ ঃ আনাছ (রাঃ) মালেক ইবনে সা'সাআ'হ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যেই রাত্রে আল্লাহ তাআলা পরিভ্রমণে নিয়া গিয়াছিলেন সেই রাত্রের ঘটনা বর্ণনায় ছাহাবীগণের সম্মুখে তিনি বলিয়াছেন, যখন আমি কা'বা গৃহের উন্মুক্ত অংশ হাতীমে (উপনীত হইলাম এবং তখনও আমি ভাঙ্গা ঘুমে ভারাক্রান্ত) ঊর্ধ্বমুখী শায়িত ছিলাম, হঠাৎ এক আগন্তুক (জিব্রাঈল ফেরেশতা) আমার নিকট আসিলেন (এবং আমাকে নিকটবর্তী জম্‌জম্ কূপের সন্নিকটে নিয়া আসিলেন)। অতপর আমার বক্ষের ঊর্ধ্ব সীমা হইতে পেটের নিম্ন সীমা পর্যন্ত চিরিয়া ফেলিলেন এবং আমার হৃদয় বা দিলটা বাহির করিলেন। অতপর একটি স্বর্ণপাত্র উপস্থিত করা হইল, যাহা ঈমান (পরিপক্ব সত্যিকার জ্ঞান বর্ধক) বস্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। আমার দেলটাকে (জম্‌জমের পানিতে) ধৌত করিয়া তাহার ভিতরে ঐ বস্তু ভরিয়া দেওয়া হইল এবং দেলটাকে নির্ধারিত স্থানে রাখিয়া আমার বক্ষকে ঠিকঠাক করিয়া দেওয়া হইল (বন্ধনীর বিষয়গুলি ৪৫৫-৪০৬ পৃষ্ঠার হাদীছে উল্লেখ আছে)।

অতপর আমার জন্য খচ্চর হইতে একটু ছোট, গাধা হইতে একটু বড় শ্বেত বর্ণের একটি বাহন উপস্থিত করা হইল তাহার নাম "বোরাক", যাহার প্রতি পদক্ষেপ দৃষ্টির শেষ সীমায়। সেই বাহনের উপর আমাকে সওয়ার করা হইল।

ঘটনা প্রবাহের ভিতর দিয়া জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে লইয়া নিকটবর্তী তথা প্রথম আসমানের দ্বারে পৌঁছিলেন এবং দরজা খুলিতে বলিলেন। ভিতর হইতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইল, জিব্রাঈল স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন। অতপর জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সঙ্গে কে আছেন? জিব্রাঈল বলিলেন, মুহাম্মদ (সঃ) আছেন। বলা হইল, (তাঁহাকে নিয়া আসিবার জন্যই ত আপনাকে) তাঁহার নিকট পাঠান হইয়াছিল? জিব্রাঈল বলিলেন, হাঁ। তারপর আমাদের প্রতি মোবারকবাদ জানাইয়া দরজা খোলা হইল। গেটের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তথায় আদম (আঃ)-কে দেখিতে পাইলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁহার পরিচয় করাইয়া বলিলেন, তিনি আপনার আদি পিতা আদম (আঃ), তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। আমার সালামের উত্তরদানে তিনি আমাকে "সুযোগ্য পুত্র ও সুযোগ্য নবী' আখ্যায়িত করিলেন এবং খোশ আমদেদ জানাইলেন।

অতপর জিব্রাঈল আমাকে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দ্বারে পৌঁছিলেন এবং দরজা খুলিতে বলিলেন। এখানেও পূর্বের ন্যায় কথোপকথন হইল এবং শুভেচ্ছা মোবারকবাদ জানাইয়া দরজা খোলা হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তথায় ইয়াহইয়া (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইলাম; তাঁহাদের উভয়ের নানী পুরস্পর ভগ্নী ছিলেন। জিব্রাঈল আমাকে তাঁহাদের পরিচয় দানে সালাম করিতে বলিলেন, আমি তাঁহাদিগকে সালাম করিলাম। তাঁহারা আমার সালামের উত্তর প্রদানে "সুযোগ্য ভ্রাতা সুযোগ্য নবী" বলিয়া আমাকে খোশ আমদেদ জানাইলেন।

অতপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে লইয়া তৃতীয় আসমানের দ্বারে পৌঁছিলেন এবং দরজা খুলিতে বলিলেন। তথায়ও পূর্বের ন্যায় কথোপকথনের পর শুভেচ্ছা–স্বাগত জানাইয়া দরজা খোলা হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইউসুফ (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইলাম। জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে তাঁহার পরিচয় করাইয়া সালাম করিতে বলিলেন; আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর দান করতঃ আমাকে "সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী" বলিয়া মোবারকবাদ জানাইলেন।

অতপর আমাকে লইয়া জিব্রাঈল চতুর্থ আসমানের নিকটে পৌঁছিলেন এবং গেট খুলিতে বলিলেন। সেখানেও পূর্বের ন্যায় প্রশ্নোত্তরের পর শুভেচ্ছা স্বাগত জানাইয়া দরজা খোলা হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমরা তথায় ইদ্রীস (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁহার পরিচয় করাইয়া সালাম করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে মারহাবা জানাইলেন।

অতপর জিব্রাঈল আমাকে লইয়া পঞ্চম আসমানে পৌঁছিলেন এবং গেট খুলিতে বলিলেন। এই স্থানেও পূর্বের ন্যায় প্রশ্নোত্তর চলার পর শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ দানের সহিত দরজা খোলা হইল। আমি ভিতরে পৌঁছিয়া হারুন (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁহার পরিচয় দানে সালাম করিতে বলিলেন। আমি সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে খোশ আমদেদ জানাইলেন।

তারপর জিব্রাঈল আমাকে লইয়া ষষ্ঠ আসমানের গেটে পৌঁছিলেন এবং গেট খুলিতে বলিলেন। এস্থানেও পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইলে জিব্রাঈল স্বীয় পরিচয় দান করিলেন, অতপর তাঁহার সঙ্গে কে আছে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সঃ); বলা হইল, তাঁহাকে ত নিয়া আসিবার জন্য আপনাকে পাঠান হইয়াছিল? জিব্রাঈল বলিলেন, হাঁ। তৎক্ষণাত শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাইয়া দরজা খোলা হইল। তথায় প্রবেশ করিয়া মূসা (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইলাম। জিব্রাঈল আমাকে তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত করিয়া সালাম করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর প্রদান করিলেন। এবং সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে মোবারকবাদ জানাইলেন।

যখন আমি এই এলাকা ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিলাম তখন মূসা (আঃ) কাঁদিতেছিলেন। তাঁহাকে কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি কাঁদিতেছি এই কারণে যে, আমার উম্মতে বেহেশত লাভকারীর সংখ্যা এই নবীর উম্মতের বেহেশত লাভকারীর সংখ্যা অপেক্ষা কম হইবে, অথচ তিনি বয়সের দিক দিয়া যুবক এবং দুনিয়াতে প্রেরিত হইয়াছেন আমার পরে।

তারপর জিব্রাঈল আমাকে লইয়া সপ্তম আসমানের প্রতি আরোহণ করিলেন এবং তাহার দ্বারে পৌঁছিয়া গেট খুলিতে বলিলেন। এস্থানেও পূর্বের ন্যায় সকল প্রশ্নোত্তরই হইল এবং দরজা খুলিয়া শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান হইল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। তথায় ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাক্ষাত লাভ হইল। জিব্রাঈল আমাকে বলিলেন, তিনি আপনার (বংশের আদি) পিতা, তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং সুযোগ্য পুত্র, সুযোগ্য নবী বলিয়া মারহাবা ও মোবারকবাদ জানাইলেন।

ثم رفيت الى سدرة المنتهى فاذا نبقها مثل قلال هجر واذا ورقها مثل اذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وذا اربعة انهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبرائيل قال اما الباطنان فنهران فى الجنة واما الظاهران فانيل والفرات ـ ثم رفع الى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم اتيت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل فاخذت اللبن فقال هى الفطره انت عليها وامتك ـ ثم فرضت على الصلوات خمسين صلوة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما امرت قال امرت بخمسين صلوة كل يوم قال ان امتك لا تستطيع خمسين صلوة كل يوم وانى والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى اسرائيل اشد المعالجة فارجع الى ربك فسله التخفيف لامتك ـ فرجع فوضع عنى عشرا فرجعت الى موسى فقال مثله فرجت فوضع عننى عشرا فرجعت الى فقال مهله فرجعت فامرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فامرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت الى موسى فقال بما امرت قلت امرت بخمس صلوات كل يوم ـ قال ان امتك لاتستطيع خمس صلوات كل يوم وانى قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى اسرائيل اشد المعالجة فارجع الى ربك فسله التخفيف لامتك قال سالت ربي حتى استحييت ولكنى ارضى واسلم قال فلما جاوزت نادى مناد امضيت فريضتى وخففت عن عبادى ـ

অর্থ ঃ অতপর আমি সিদ্‌রাতুল মোন্‌তাহার নিকট উপনীত হইলাম। (তাহা এক বড় প্রকাণ্ড কুল বৃক্ষবিশেষ,) তাহার এক একটা কুল "হজর" অঞ্চলে তৈয়ারী (বড় বড়) মটকার ন্যায় এবং তাহার পাতা হাতীর কানের ন্যায়। জিব্রাঈল আমাকে বলিলেন, এই বৃক্ষটির নাম "সিদ্‌রাতুল মোন্‌তাহা"। তথায় চারিটি প্রবাহমান নদী দেখিতে পাইলাম- দুইটি ভিতরের দিকে প্রবাহিত এবং দুইটি বাহিরের দিকে। নদীগুলি সম্পর্কে আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, ভিতরের দুইটি বেহেশতে প্রবাহমান (সাল্‌সাবীল ও কাওসার নামক) দুইটি নদী। আর বাহিরের দিকে প্রবাহমান দুইটি হইল (ভূ পৃষ্ঠের মিসরে প্রবাহিত) নীল ও (ইরাকে প্রবাহিত) ফোরাত (নদী বা তাহাদের নামের মূল উৎস)।

তারপর আমাকে "বায়তুল মা'মুর" পরিদর্শন করান হইল। তথায় প্রতিদিন (এবাদতের জন্য) সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হইয়া থাকেন (যে দল একদিন সুযোগ পায় সেই দল চিরকালের জন্য দ্বিতীয় দিন সুযোগ প্রাপ্ত হয় না)।

অতপর (আমার সৃষ্টিগত স্বভাবের স্বচ্ছতা ও নির্মলতা প্রকাশ করিয়া দেখাইবার উদ্দেশে পরীক্ষার জন্য) আমার সম্মুখে তিনটি পাত্র উপস্থিত করা হইল- একটিতে ছিল সুরা বা মদ, অপরটিতে ছিল দুগ্ধ আর একটিতে ছিল মধু। আমি দুগ্ধের পাত্রটি গ্রহণ করিলাম। জিব্রাঈল বলিলেন, দুগ্ধ সত্য ও খাঁটি স্বভাগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ; (সুতরাং আপনি দুগ্ধের পাত্র গ্রহণ করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে,) আপনি সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং আপনার উসিলায় আপনার উম্মতও তাহার উপর

থাকিবে।*

তারপর আমার শরীয়তে প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার বিধান করা হইল। আমি ফিরিবার পথে মূসা (আঃ)-এর নিকটবর্তী পথ অতিক্রম করাকালে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ আদেশ কি লাভ করিয়াছেন? আমি বলিলাম, পঞ্চাম ওয়াক্ত নামায। মূসা (আঃ) বলিলেন, আপনার উম্মত প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায় আদায় করিয়া যাইতে সক্ষম হইবে না। আমি সাধারণ মানুষের স্বভাব সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; এবং বনী ইস্রাঈলগণকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছি; সুতরাং আপনি পরওয়ারদেগারের দরবারে আপনার উম্মতের জন্য এই আদেশ আরও সহজ করার আবেদন করুন।

হযরত (সঃ) বলেন, আমি পরওয়ারদেগারের খাস দরবারে ফিরিয়া গেলাম। পরওয়ারদেগার (দুইবারে পাঁচ পাঁচ করিয়া) দশ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। অতপর আমি আবার মূসার নিকট পৌছিলাম, তিনি পূর্বের ন্যায় পরামর্শই আমাকে দিলেন। আমি পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া গেলাম এইবারও (ঐরূপে) দশ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। পুনরায় মূসার নিকট পৌছিলে তিনি আমাকে এইবারও সেই পরামর্শই দিলেন। আমি পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া গেলাম এবং (পূর্বের ন্যায়) দশ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। এইবারও মূসার নিকট পৌছিলে পর তিনি আমাকে পূর্বের ন্যায় পরামর্শ দিলেন। আমি পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া গেলাম, এইবার আমার জন্য প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এইবারও মূসার নিকট পৌছিলে পর আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আদেশ লাভ করিয়াছেন? আমি বলিলাম, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

মূসা (আঃ) বলিলেন, আপনার উম্মত প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরও পাবন্দী করিতে পারিবে না। আমি আপনার পূর্বেই সাধারণ মানুষের স্বাভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং বনী ইস্রাঈলগণকে অনেক পরীক্ষা করিয়াছি। আপনি আবার পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া আরও কম করার আবেদন জানান।

হযরত (সঃ) বলেন, আমি মূসাকে বলিলাম, পরওয়ারদেগারের দরবারে অনেক বার আসা-যাওয়া করিয়াছি; এখন আবার যাইতে লজ্জা বোধ হয়, আর যাইব না বরং পাঁচ ওয়াক্তের উপরই সন্তুষ্ট রহিলাম এবং তাহা বরণ করিয়া নিলাম। হযরত (সঃ) বলেন, অতপর যখন আমি ফিরিবার পথে অগ্রসর হইলাম তখন আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে একটি ঘোষণা জারি করা হইল– (বান্দাদের প্রাপ্য সওয়াবের দিক দিয়া) "আমার নির্ধারিত সংখ্যা (পঞ্চাশ) বাকী রাখিলাম, (আমার পক্ষে আমার বাক্য অপরিবর্তিতই থাকিবে। ৪১৭ ও ৪৫৫ পৃষ্ঠার হাদীছ দ্রষ্টব্য) অবশ্য কর্মক্ষেত্রে বান্দাদের পক্ষে সহজ ও কম করিয়া দিলাম। (অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে পাঁচ ওয়াক্ত রহিল, কিন্তু সওয়াবের দিক দিয়া পাঁচই পঞ্চাশ পরিগণিত হইবে।) প্রতিটি নেক আমলে দশ গুণ সওয়াব দান করিব।

মে'রাজ শরীফের বর্ণনার হাদীছ বোখারী (রঃ) মে'রাজের পরিচ্ছেদ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে ঐসব হাদীছের অনুবাদ দেওয়া হইল।

১৮০১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০) আনাছ (রাঃ) ছাহাবী হইতে বর্ণিত আছে, আবু যর (রাঃ) হাদীছ বয়ান করিয়াছেন– রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মক্কায় থাকাকালীন একদা রাত্রে আমি যেই ঘরে শায়িত ছিলাম সেই ঘরের ছাদ খুলিয়া গেল, অতপর ঐ পথে জিব্রাঈল (রাঃ) অবতরণ করিলেন। (আমাকে ঐ ঘর হইতে কা'বা গৃহের নিকটবর্তী নিয়া আসা হইল।) তারপর আমার বক্ষ খুলিয়া জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করা হইল এবং একটি স্বর্ণ পাত্র উপস্থিত করা হইল যাহা পরিপক্ক জ্ঞান ও সত্যিকার ঈমান বর্ধক বস্তুতে পরিপূর্ণ ছিল; তাহা আমার বক্ষের ভিতরে ঢালিয়া দেওয়া হইল। অতপর (ঘটনা প্রবাহের মধ্যে) জিব্রাঈল (আঃ) আমারহাত ধরিয়া আমাকে লইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। নিকটবর্তী

* মদ ও দুগ্ধপাত্র উপস্থিত করার পরীক্ষার সম্মুখীন হযরত (সঃ) দুই বার হইয়াছিলেন। একবার প্রথমে– যখন বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌছিয়াছিলেন তখন যাহার উল্লেখ সম্মুখের এক হাদীছে আসিতেছে। দ্বিতীয়বার উর্ধ্ব জগতে যাহার উল্লেখ এস্থানে হইয়াছে।

(তথা প্রথম) আসমানের দ্বারে পৌঁছিয়া জিব্রাঈল (আঃ) আসমানের পাহারাদারকে দরজা খুলিতে বলিলেন। তখন পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইল। জিব্রাঈল (আঃ) স্বীয় পরিচয় দান করিলেন। পাহারাদার জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সঙ্গে কেহ আছেন কি? জিব্রাঈল বলিলেন, হা- আমার সঙ্গে আছেন মুহাম্মদ (সঃ)। পাহারাদার বলিলেন, তাঁহার নিকইত (আপনাকে) পাঠান হইয়াছিল? জিব্রাঈল বলিলেন, হাঁ।

অতপর যখন আমরা ঐ আসমানে পৌঁছিলাম দেখিতে পাইলাম, একজন লোক বসিয়া আছেন- তাঁহার ডান দিকে একদল লোক এবং বাম দিকে আর একদল লোক। ঐ লোকটি যখন তাঁহার ডান দিকে তাকান তখন হাসিয়া উঠেন এবং যখন বাম দিকে তাকান কাঁদিয়া উঠেন। হযরত (সঃ) বলেন, ঐ লোকটি আমাকে "সুযোগ্য নবী ও সুযোগ্য পুত্র" বলিয়া স্বাগত জানাইলেন এবং জিব্রাঈলের নিকট হইতে তাঁহার পরিচয়ও পাইলাম। জিব্রাঈল বলিয়াছেন যে, তিনি হইলেন আদম (আঃ); তাঁহার ডান বাম দিকের আকৃতিগুলি তাঁহার বংশধরগণের রূহ বা আত্মাসমূহ। ডান দিকেরগুলি যাহারা বেহেশত লাভ করিবে এবং বাম দিকেরগুলি যাহারা দোযখবাসী হইবে; অতএব এই কারণে তিনি ডান দিকে তাকাইলে (আনন্দে) হাসিয়া উঠেন এবং বাম দিকে তাকাইলে (অনুতাপ আক্ষেপে) কাঁদিয়া উঠেন।

১৮০২। হাদীছ ঃ عن ابن عباس وابا حبة الانصارى كانا يقولان قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُرِجَ بِىْ حَتّٰى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى اَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ - ثُمَّ انْطَلَقَ حَتّٰى اَتٰى بِىَ السِّدْرَةَ الْمُنْتَهٰى فَغَشِيَهَا اَلْوَانٌ لَاَدْرِىْ مَاهِىَ ثُمَّ اُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَاِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ

অর্থ ঃ আব্বাস (রাঃ) ও আবু হাব্বাহ্ আনসারী (রাঃ) উভয়ে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন, সপ্ত আসমান পরিভ্রমণ করার পর আমাকে মহাউর্ধ্বে আরোহিত করা হইল; আমি এক সুসমতল ময়দানে পৌঁছিলাম; তথায় শুধুমাত্র কলম বা লেখনী চালনার শব্দ শুনা যাইতেছিল।

অতপর আমাকে লইয়া জিব্রাঈল আরও অগ্রসর হইলেন এবং সিদরাতুল মোনতাহার নিকট পৌঁছিলেন। ঐ সময় সিদরাতুল মোনতাহাকে বিভিন্ন বর্ণের রঙমালা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহা যে কি ছিল তাহার সঠিক তথ্য আমি তলাইয়া দেখি নাই। তারপর আমাকে বেহেশতের ভিতরে প্রবেশ করান হইল। তাহার গুম্বজসমূহ মুক্তা দ্বারা তৈয়ারী ছিল এবং তাহার যমীন ছিল মেশ্ক বা কস্তুরীর।

ব্যাখ্যা ঃ সমস্ত সৃষ্ট জগত পরিচালনার ভার ফেরেশতাদের উপর অর্পিত রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাঁহাদের প্রতি নির্দেশাবলী আসিতে থাকে। সেই সব লেখার কেন্দ্রই ছিল উক্ত সমতল ময়দান, যাহার পরিদর্শনে হযরত (সঃ) তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। সিদরাতুল মোনতাহাকে আচ্ছাদনকারী রঙমালা কি ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বয়ান মুসলিম শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে যে, তাহা ছিল فواش من ذهب স্বর্ণদেহী পতঙ্গসমূহ।

আর এক হাদীছে উল্লেখ আছে, (মে'রাজ উপলক্ষে) বহু সংখ্যক ফেরেশতার এক দল আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন করিয়াছিলেন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দর্শন লাভের। আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে অনুমদিত দিয়া দিলেন, সেমতে তাঁহারা সিদরাতুল মোনতাহার নিকটে হযরতের উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া তাহার উপর ভিড় জমাইয়াছিলেন। (তফসীর রূহুল মাআ'নী, ২৭-৫১)

সম্ভবতঃ ঐ ফেরেশতাগণই স্বর্ণদেহী পতঙ্গের আকৃতিতে ঝাঁক বাঁধিয়া সিদরাতুল মোনতাহার উপর পতিত ছিলেন। তাহাই অন্য এক হাদীছে আছে- নবী (সঃ) বলিয়াছেন, আমি সিদরাতুল মোনতাহার প্রতিটি পাতায় এক একজন ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার তসবীহ- "ছোবহানাল্লাহ" পাঠরত দেখিয়াছি।

(তফসীর রূহুল মাআ'নী, ২৭-৫১)

এতদ্ভিন্ন নিরাকার নিরাধার আল্লাহ তাআলার নূরের তাজাল্লী বা বিকাশও সিদরাতুল মোনতাহাকে সুসজ্জিত করিয়াছিল, যেই নূরের সামান্যতম তাজাল্লী হযরত মূসার সম্মুখে তুর পর্বতের উপর হইয়াছিল এবং তাহাই ভূমিকা ছিল আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের, যাহার আকাঙ্ক্ষা হযরত মূসা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই নূরের তাজাল্লীতে পর্বত স্থির থাকিতে পারে নাই, ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং হযরত মূসা (আঃ)ও ঠিক তাকিতে পারেন নাই, চেতনা হারাইয়া ধরাশায়ী হইয়া গিয়াছিলেন। ফলে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারেন নাই (বিস্তারিত বিবরণ ৪র্থ খণ্ডে হযরত মূসার বয়ান)।

পক্ষান্তরে সেই নূর ও ভূমিকা দর্শনের সুযোগই এই স্থানে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রদান করা হইয়াছিল। এস্থলে সেই নূর বিকাশের বাহক বা স্থান সিদরাতুল মোনতাহাও স্থির রহিয়াছিল এবং তাহার দর্শক মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)ও সম্পূর্ণ সুস্থ সচেতন ছিলেন। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা- ما زاغ البصر وما طغى তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ও উপলব্ধি শক্তি সুষ্ঠু সতেজ ছিল; বিন্দুমাত্র অতিক্রম বাতিক্রম ঘটে নাই।

তাই বলা হয়, আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের ভূমিকায়ই মূসা (আঃ) স্থিরতা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, لن ترانى এই অবস্থায় আমার দর্শন লাভ আপনার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইবে না। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) মে'রাজ উপলক্ষে স্বীয় দৃষ্টিশক্তি ও উপলব্ধিশক্তি সতেজ সুষ্ঠু রাখিয়া আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, ফলে তিনি স্বয়ং আল্লাহ তাআলার দিদার বা দর্শনও লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

হযরতের আগমন উপলক্ষে যে সিদরাতুল মোনতাহার উপর আল্লাহ তাআলার নূরের তাজাল্লী হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ হাদীছেও আছে এবং সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী হাসান বসরী (রাঃ)ও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। (রূহুল মাআ'নী ২৭-৫১)

১৮০৩। হাদীছ ঃ পৃঃ ৪৮১) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণের রাত্রে আমি মূসা (আঃ)-কে দেখিয়াছি। তাঁহার দেহ প্রশস্ততায় মধ্যম আকারের ছিল। (তিনি দীর্ঘ কায়ার শ্যামলা রংয়ের ছিলেন।) তাঁহার মাথার চুল সোজা ছিল, কোঁকড়ানো ছিল না। তাঁহার দৈহিক আকৃতি "শানুয়া" গোত্রীয় লোকদের ন্যায় ছিল। ঈসা (আঃ)-কেও দেখিয়াছি, তিনি ছিলেন মধ্যম কায়া-বিশিষ্ট এবং রং ছিল গোরা, তিনি এমন পরিচ্ছন্ন দেখাতেছিলেন যেন এখনই গোসল করিয়া আসিয়াছেন। (তাঁহার মাথার চুল কিছুটা কোঁকড়ানো।) ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখিয়াছি, আমার আকৃতি তাঁহার আকৃতির সর্বাধিক নিকটতম। তারপর আমার সম্মুখে (পরীক্ষাস্বরূপ) দুইটি পাত্রও উপস্থিত করা হইয়াছিল- একটিতে দুগ্ধ অপরটিতে সুরা বা মদ। আমাকে বলা হইয়াছিল, যেইটাই আপনার ইচ্ছা পান করুন। (তখন মদ হারাম ছিল না।) আমি দুগ্ধের পাত্রটি গ্রহণ করিলাম এবং দুগ্ধ পান করিলাম। তখন বলা হইল, আপনি সঠিক সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ- দুগ্ধ গ্রহণ করিয়াছেন; (ইহার প্রতিক্রিয়ায় আপনার উম্মত এই ধর্ম অবলম্বন করিবে।) পক্ষান্তরে যদি আপনি (সকল প্রকার গোমরাহী ও ব্যভিচারের মূল) মদের পাত্র গ্রহণ করিতেন তবে তাহার প্রতিক্রিয়ায় আপনার উম্মত সেই পথের পথিক হইয়া গোমরাহ হইত। এতদ্ভিন্ন হযরত (সঃ) দোযখের প্রধান কর্মকর্তা ফেরেশতা "মালেক" এবং দাজ্জালের উল্লেখও করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত রসূলে করীমের সম্মুখে মদের পেয়ালা ও দুগ্ধের পেয়ালা উপস্থিত করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং সেই পরীক্ষার ভাল মন্দ ফলাফল সম্পর্কেও ফেরেশতা জিব্রাঈল ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। ১৮০০ নং হাদীছে ভাল ফলের উল্লেখ হইয়াছে যে, দুগ্ধ হইল সকলের পক্ষে স্বভাবগত আকর্ষণীয় এবং অতি উত্তম বস্তু, তাহাকে সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ বা প্রতীক সাব্যস্ত করা হইয়াছিল; সুতরাং আপনি আপনার সমগ্র উম্মতের প্রধান হইয়া তাহা গ্রহণ করার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব আপনার নিম্নস্থদের তথা উম্মতগণের উপর এই হইবে যে, তাহারাও সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। আলোচ্য হাদীছে তাহার

বিপরীত মন্দ ফলের উল্লেখ হইয়াছে যে, মদ হইল সব রকম গোমরাহী ও ব্যভিচারের মূল; তাহা গোমরাহী ও ব্যভিচারের পথের স্বরূপ ও প্রতীক সাব্যস্ত করা হইয়াছ। সুতরাং আপনি সমগ্র উম্মতের মুরব্বী ও প্রধান হইয়া যদি তাহা গ্রহণ করিতেন তবে স্বাভাবিকরূপে তাহার প্রভাব প্রতিক্রিয়া উম্মতগণের উপর এই হইত যে, তাহারাও গোমরাহীর পথের পথিক হইত।

এই ফলাফলের সূত্র অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু অপরিহার্য ও বাস্তব এবং বিশেষ উপদেশমূলক। বর্তমানেও আমরা জাতীয় জীবনের শত শত ব্যাপারে উপরস্থ নেতা, কর্তা ও প্রধানদের ক্রিয়াকলাপ এবং স্বভাব-চরিত্রের যে প্রভাব প্রতিক্রিয়া দেখি তাহা উক্ত সূত্রের সহিত বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের নেতা ও প্রধানগণ এই উপদেশের দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ না করায় সর্বসাধারণের অবৈধ ক্রিয়াকলাপের গোনাহের বোঝা তাহাদের ঘাড়েও চাপিবে।

১৮০৪। হাদীছ ঃ পৃঃ ৪৫৯) আবুল আ'লিয়া (রঃ) বলেন, বিশ্বমুসলিমের নবীর পিতৃব্য পুত্র ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, আমি মে'রাজ উপলক্ষ্যে মূসা (আঃ)-কে দেখিয়াছি। তিনি ছিলেন গোধূম বা শ্যামলা বর্ণের লম্বা কায়াবিশিষ্ট মানুষ; তাঁহার দেহ পাকা-পোক্ত–"শানুয়া" গোত্রীয় লোকদের ন্যায়। ঈসা (রাঃ)-কেও দেখিয়াছি; তিনি ছিলেন মধ্যম কায়াবিশিষ্ট। তাঁহার অঙ্গসমূহ অত্যন্ত সাঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, মাথার চুল প্রায় সোজা ছিল।

এতদ্ভিন্ন আমি দোযখের প্রধান কর্মকর্তা মালেক এবং দাজ্জালকেও দেখিয়াছি। এই সব ছিল বড় বড় নিদর্শনসমূহের অন্তুর্ভক্ত যাহা আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখাইয়াছেন।

বায়তুল মোকাদ্দাসে উপস্থিতি

মে'রাজের ঘটনায় হযরত (সঃ) সরাসরি মক্কা হইতে আসমানের দিকে যান নাই; মক্কা হইতে বিদ্যুৎ গতিতে বোরাকে আরোহণপূর্বক প্রথমে বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌঁছিয়াছিলেন যাহার উল্লেখ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৮০৫। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৮৪) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণের রাত্রে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বায়তুল মোকাদ্দাসে উপনীত হইলে পর তাঁহার সম্মুখে দুইটি পাত্র উপস্থিত করা হইল। একটি সূরা বা মদের দ্বিতীয়টি দুগ্ধের। হযরত (সঃ) উভয় পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; (তখন মদ হারাম ছিল না, কিন্তু হযরত (সঃ) মদের, পাত্র ছুঁইলেনও না,) এবং দুগ্ধের পাত্রটি গ্রহণ করিলেন। এতদ্দৃষ্টে জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আপনাকে সত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম ইসলামের স্বরূপ তথা দুগ্ধের প্রতি ধাবিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যদি আপনি মদের পাত্র গ্রহণ করিতেন তবে তাহার প্রতিক্রিয়ায় আপনার উম্মত গোমরাহী ও ব্যভিচারে পতিত হইত।

ব্যাখ্যা ঃ একই বিষয়ের পরীক্ষা সাধারণভাবেও একাধিক বার হইয়া থাকে। আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত পরীক্ষাটির সম্মুখীনও হযরত (সঃ) দুই বার হইয়াছিলেন। একবার ভূপৃষ্ঠে বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌঁছিয়া, দ্বিতীয়বার উর্ধ্ব জগতে পৌঁছিয়া সপ্তম আকাশ পার হওয়ার পর ....যাহার উল্লেখ ১৫৯৯ নং ও ১৬২০ নং হাদীছে হইয়াছে। এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ মুসলিম শরীফের একটি হাদীছে এই–

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, (মে'রাজ উপলক্ষে) আমার জন্য বোরাক উপস্থিত করা হইল। তাহার রং সাদা, গাধা অপেক্ষ বড় খচ্চর অপেক্ষা ছোট, তাহার পদক্ষেপ দৃষ্টির শেষ সীমায় পৌঁছাইতে সক্ষম। সেই দ্রুতগামী বাহনে আমি আরোহণ করিলাম এবং বায়তুল মোক্কাদ্দাস মসজিদে পৌঁছিলাম। সেই মসজিদের নিকটবর্তী লোহার কড়ি বিশেষ একটি ছিদ্রযুক্ত পাথর ছিল যাহার সঙ্গে পূর্ববর্তী নবীগণ এই মসজিদে আসিলে নিজ বাহন বাঁধিয়া থাকিতেন। হযরত (সঃ)

বলেন, আমিও বোরাককে তাহার সহিতই বাঁধিলাম এবং মসজিদে দুই রাকাত নামায পড়িলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) মে'রাজের রাত্রির ভোর বেলা যখন লোকদের নিকট ঘটনা প্রকাশ করিলেন তখন তিনি প্রথমে ঘটনার এই অংশটুকুই বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে,আমি অদ্য রাত্রে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে গিয়াছিলাম এবং এই রাত্রেই ফিরিয়া আসিয়াছি* আবু জাহল ইত্যাদি কাফেররা এতটুকু শুনিয়াই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে লাগিল, কারণ সাধারণভাবে মক্কা হইতে বায়তুল মোকাদ্দাস দীর্ঘ এক মাসের পথ; আসা-যাওয়ায় দুই মাস ব্যয় হওয়া আবশ্যক। কাফেররা এই ব্যাপারে হযরতের পরীক্ষা লওয়ার জন্য কা'বা গৃহের নিকটে জমায়েত হইল এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করিতে লাগিল। হযরত (সঃ) বিভ্রাটে পড়িলেন, কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ খুঁটিনাটির খোঁজ কে লইয়া থাকে, কিন্তু আল্লাহর মহিমা তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থায় হযরত (সঃ) তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন।

১৮০৬। হাদীছ ঃ (৬৮৪) عن جابر رضى الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبنى قريش (حين أسرى بى الى بيت المقدس) قمت فى الحجر فجلى الله لى بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن اياته وانا انظر اليه.

অর্থ ঃ জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিবৃতি শুনিয়াছেন– তিনি বলিলেন, (মে'রাজ উপলক্ষে) রাত্রি বেলায় বায়তুল মোকাদ্দাস পরিভ্রমণের কথা যখন আমি কোরায়শগণের নিকট প্রকাশ করিলাম এবং তাহারা অবিশ্বাস (করিয়া আমাকে পরীক্ষা) করিতে চাহিল, তখন আমি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া কা'বা গৃহের উন্মুক্ত অংশ হাতীমের মধ্যে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। আল্লাহ তাআলা বায়তুল মোকাদ্দাস গৃহকে আমার সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। আমি কাফেরদের প্রশ্নের উত্তরে বায়তুল মোকাদ্দাসের নিদর্শনসমূহ দেখিয়া দেখিয়া বর্ণনা করিলাম।

ব্যাখ্যা ঃ বর্তমান "টেলিভিশন" যুগে এই হাদীছের বাস্তবতা অনুধাবন অতি সহজ। যদিও বায়তুল মোকাদ্দাস গৃহ মক্কা হইতে বহু দূরে এবং অনেক পাহাড় পর্বতের আড়ালে অবস্থিত, কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার পক্ষে যান্ত্রিক সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ কাজ মোটেই কঠিন নহে, যে কাজ মানুষ টেলিভিশন যন্ত্রের সাহায্যে করিতে পারিয়াছে।

মে'রাজ উপলক্ষে হযরত (সঃ) কি কি পরিদর্শন করিয়াছেন

পূর্বের বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে যে, হযরত (সঃ) মে'রাজ উপলক্ষে (১) আসমান, (২) পূর্ববর্তী বিশিষ্ট নবীগণ, (৩) বায়তুল মা'মুর, (৪) সিদরাতুল মোনতাহা, (৫) সুসমতল ময়দান, (৬) বেহেশত, (৭) দোযখের প্রধান কর্মকর্তা "মালেক", (৮) দজ্জাল ইত্যাদি দেখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কিছু পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন হাদীছে আরও বিশেষ বিশেষ বস্তুনিচয়ের উল্লেখ আছে। এস্থানেও কতিপয় হাদীছ "আল খাসায়েসুল কোবরা" নামক কিতাব হইতে উল্লেখ করিতেছি।

হাউজে কাওসার

(১) আনাছ (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে আছে– হযরত (সঃ) বলেন, অতপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে

* কাফেরগণ উর্ধ্ব জগতের বস্তুনিচয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। বায়তুল মোকাদ্দাসের সঙ্গে ভালরূপেই পরিচিত ছিল, তাই হযরত (সঃ) তাহাদের সম্মুখে বায়তুল মোকাদ্দাস ভ্রমণের অংশটুকুই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনেও কাফেরদের বিরোধিতার প্রতিবাদে শুধু বায়তুল মোকাদ্দাস ভ্রমণের অংশটুকুরই উল্লেখ হইয়াছে। অবশ্য সূরা নাজমে পূর্ণ ঘটনার উপরেও আলোকপাত করা হয়াছে।

সপ্তম আসমানে লইয়া গেলেন। তথায় আমি একটি প্রবাহমান জলাশয়ের নিকট পৌঁছিলাম– যাহার উভয় কূলে (আমার উপভোগের জন্য) মতি, হিরা ও ইয়াকুত পাথরের তৈয়ারী কুঠি বা বাংলাসমূহ ছিল এবং ঐ নহরের মধ্যে অতি সুন্দর সুন্দর পাখীও ছিল; ঐরূপ সুন্দর পাখী আর কোথাও দেখি নাই। জিব্রাঈলকে বলিলাম, পাখীগুলি বড়ই সুন্দর। জিব্রাঈল বলিলেন, যেসব লোক এই সব পাখী উপভোগ করিবেন তাঁহারা অধিক উত্তম হইবেন। অতপর জিব্রাঈল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জানেন কি ইহা কোন নহর? আমি বলিলাম, জানি না। তিনি বলিলেন, ইহাই হইল "কাওসার।" আল্লাহ তাআলা যাহা শুধু আপনাকেই দান করিয়াছেন। তখন আমি অধিক আগ্রহের সহিত তাহা পরিদর্শন করিলাম। সেখানে সুসজ্জিতরূপে স্বর্ণ-রৌপ্যের উপর দিয়া পানি প্রবাহমান। তাহার পানি দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক সাদা। তথায় সাজান গ্লাসগুলি হইতে আমি একটি গ্লাস লইয়া ঐ পানি পান করিলাম– তাহা মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট এবং কস্তুরী অপেক্ষা অধিক সুগন্ধ।

(২) আবু সায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি হাউজে কাওসারের নিকট গমনকালে জিব্রাঈল বলিলেন, ইহাই হাউজে কাওসার যাহা আল্লাহ তাআলা আপনাকে বিশেষরূপে দান করিয়াছেন। হযরত (সঃ) বলেন, আমি তাহার মাটি হাতে লইয়া দেখিলাম, তাহা অত্যধিক সুগন্ধময় কস্তুরী।

আ'রশ ঃ আবু হাম্‌রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে সপ্তম আসমানের পর আরশের নিকট পৌঁছিয়া দেখিলাম তাহার খাম্বায় লিখিত আছে– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

দোযখ ঃ সোহায়েব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মে'রাজের ঘটনায় পরীক্ষামূলকভাবে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহুআলাইহি অসাল্লামের সম্মুখে পানি তারপর মদ ও দুগ্ধের পবিত্র পেশ করা হইল। তিনি দুগ্ধের পাত্র গ্রহণ করিলেন। তখন জিব্রাঈল বলিলেন, আপনি সঠিক সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম ইসলামের স্বরূপ ও প্রতীক বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন; এই বস্তু প্রত্যেক প্রাণীর স্বাভাবিক খাদ্য। পক্ষান্তরে যদি আপনি মদের পাত্র গ্রহণ করিতেন তবে তাহা আপনার ও আপনার উম্মতের পক্ষে ভ্রষ্টতার নিদর্শন হইত এবং ঐ স্থানে বসবাসকারী হইতে বাধ্য হইতেন। এই বলিয়া ঐ প্রান্তের প্রতি ইশারা করিলেন যেই প্রান্তে জাহান্নাম অবস্থিত। হযরত (সঃ) দেখিলেন, জাহান্নামের ভয়ঙ্কর লেলিহান অগ্নিশিখা উত্তেজিত আকারে উত্থিত হইতেছে।

পরজগতের বস্তুনিচয়

হোযায়ফা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মে'রাজের ঘটনা বর্ণনায় বলিয়াছেন, সপ্ত আসমান ভ্রমণ করা পর্যন্ত "বোরাক" সব সময়ই হযরতের সঙ্গে ছিল। অতপর হযরত (সঃ) বেহেশত দোযখও পরিদর্শন করিয়াছেন এবং আখেরাত বা পরজগতের যত বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা দান করা হইয়াছে তাহার সবই পরিদর্শন করিয়াছেন। তারপর ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

গীবত বা পরনিন্দার আযাব

আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ উপলক্ষে আমি এক দল লোকের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিলাম যাহাদের হাতে সীসার তৈয়ারী বড় বড় নখ রহিয়াছে; তাহারা তাহা দ্বারা নিজেদের মুখ ও বক্ষ আঁচড়াইতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? জিব্রাঈল বলিলেন, ইহা ঐ সব লোকের দৃশ্য যাহারা অন্য লোকের গোশত খাইয়া থাকিবে– তথা (গীবত ও নিন্দা করিয়া) তাহাদের মান-ইজ্জত নষ্ট করিবে।

আমলহীন ওয়ায়েজ বা বক্তার আযাব

আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "মে'রাজ উপলক্ষে আমি এমন একদল লোকের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিলাম যাহাদের ঠোঁট দোযখের আগুনের তৈয়ারী কেঁচি দ্বারা কাটা হইতেছিল। ঠোঁট কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পুনঃ গজাইয়া উঠে এবং পুনরায় কাটিয়া ফেলা হয়। জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য। তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐ সব বক্তা বা ওয়ায়েজ ব্যক্তিদের দৃশ্য যাহারা অন্যদেরকে যেসব নসীহত করিবে নিজে তাহার উপর আমল করিবে না।

সুদখোরের আযাব

(১) সামুরা ইবনে জুন্দব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি দেখিয়াছি, একটি মানুষ নদীর মধ্যে সাঁতরাইতেছে (কনারায় উঠিবার সুযোগ পাইতেছে না)। পাথর মারিয়া মারিয়া তাহাকে হটাইয়া দেওয়া হইতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা সুদ- খোরের অবস্থার দৃশ্য।

(২) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি সপ্তম আকাশের উপরে দেখিলাম- তথায় ভীষণ বজ্রপাত, বিজলীর গর্জন এবং এক দল লোক দেখিলাম, তাহাদের পেট ঘরের সমান বড়- তাহার ভিতর অনেক সাপ কিলবিল করিতেছে যাহা পেটের বাহির দিক হইতে দেখা যায়। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ লোকের দৃশ্য। তিনি বলিলেন, যাহারা সুদ খাইবে ইহা তাহাদের দৃশ্য।

বিভিন্ন গোনাহের আযাব

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) স্বয়ং হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে মে'রাজের বিস্তারিত বর্ণনা দান করতঃ বলিয়াছেন- হযরত (সঃ) বলেন, প্রথম আসমানে পৌঁছিবার পর আমি একস্থানে দেখিতে পাইলাম কতিপয় দস্তরখানা বিছান আছে, তাহার উপর রান্না করা উত্তম গোশত রাখা আছে, কিন্তু তথায় উপস্থিত লোকগুলির কেহই ঐ গোশতের নিকটেও যায় না। পক্ষান্তরে নিকটেই অন্য কতিপয় দস্তরখানা রহিয়াছে যাহার উপর অতি দুর্গন্ধময় পচা গোশত রহিয়াছে, ঐ লোকগুলো তাহা খাইতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐ সব লোকের দৃশ্য যাহাদের নিকট ব্যবহারের জন্য হালাল বস্তু থাকিবে, কিন্তু তাহারা সেই হালাল বস্তু উপেক্ষা করিয়া হারামে লিপ্ত হইবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর এক দল লোক দেখিতে পাইলাম যাহাদের পেট ঘরের সমান বড়; পেট লইয়া তাহারা উঠিতে পারে না, উঠিতে চেষ্টা করিলে অধঃমুখী আছাড় খাইয়া পড়িয়া যায় এবং তাঁহারা ফেরআ'উনের লোক লস্করদের পিছনে পিছনে যাইতেছে; অধিকন্তু পথিকদের একটি বিরাট দল তাহাদিগকে পদতলে পিষ্ট করিতেছে, তাহারা আল্লার নিকট ভয়ঙ্কর চিৎকার করিতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা সুদ খাইবে, ফলে কেয়ামতের দিন তাহারা ভূতের আছরকৃত পাগলের ন্যায় হইয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত হইবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম একদল লোক তাহাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের ন্যায় (মোটা ও বড় বড়); জবরদস্তিমূলক তাহাদের মুখ খুলিয়া ভিতরে পাথর প্রবেশ করান হয়। সেই পাথর

তাহাদের মলদ্বার দিয়া বাহির হয় এবং তাহারা আল্লাহ তাআলার নিকট ভীষণ চিৎকার করিতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই লোকগুলির অবস্থা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা অন্যায়ভাবে এতিমের মাল আত্মসাত করিবে। তাহারা বস্তুতঃ আগুনের অঙ্গার পেটের ভিতর ভরিবে এবং অচিরেই শাস্তি ভোগের জন্য ভয়ঙ্কর অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম এবং দেখিতে পাইলাম একদল নারী, তাহাদের কতকগুলিকে পেস্তানে বাঁধিয়া শূন্যে লটকাইয়া রাখা হইয়াছে, আর কতকগুলিকে মাথা নীচের দিকে করতঃ পা বাঁধিয়া লটকাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহারা সকলেই আল্লাহ্ তাআলার নিকট ভীষণ চীৎকার করিতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর নারীর দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা ঐসব নারীর দৃশ্য যাহারা যেনা ব্যভিচার করিবে এবং সন্তান মারিয়া ফেলিবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম এবং এক দল লোক দেখিতে পাইলাম, তাহাদের বাহু কাটিয়া গোশত বাহির করা হইতেছে এবং সেই গোশত তাহাদিগকে খাওয়ান হইতেছে। আমি জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য। তিনি বলিলেন, ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা অপর ভাইয়ের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবে।

কর্জে হাসানা বা ধার দেওয়ার সওয়াব

আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি বেহেশতের দরজায় লিখিত দেখিয়াছি, দান-খয়রাতের সওয়াব দশ গুণ আর কার্জ হাসানা বা ধার দানের সওয়াব আঠার গুণ। জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ধার দেওয়া দান-খয়রাতের তুলনায় উত্তম কিরূপে? তিনি বলিলেন, অনেক ক্ষেত্রে যাঞ্চাকারী ভিক্ষা চাহিয়া থাকে, অথচ তাহার নিকট কিছুটা টাকা পয়সা আছে। পক্ষান্তরে সাধারণতঃ ধার কর্জ তখনই চাওয়া হয় যখন মানুষ অত্যধিক ঠেকে।

বিভিন্ন কার্যের পরিণাম

আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি মে'রাজের ঘটনা বয়ান করতঃ বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জিব্রাঈল সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি এক দল লোক দেখিলেন, তাহারা জমিতে বীজ বপন করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে শস্য জন্মিয়া পাকিয়া যাইতেছে এবং স্বয়ংক্রিয়রূপে কাটিয়া পড়িতেছে, তাহারা স্তূপীকৃত করিতেছে এবং কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুনঃ ফসল জন্মিয়া যাইতেছে। হযরত নবী (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আল্লাহর দ্বীনের জন্য জেহাদকারীদের অবস্থার দৃশ্য। আল্লার রাস্তায় জেহাদকারীদের সওয়াব যে, বহুগুণে লাভ হইয়া থাকে এবং তাঁহারা ঐ পথে যাহা কিছু ব্যয় করেন তাহার সওয়াব যে, তাহাদের পরেও জারি থাকে উহারই রূপক দৃশ্য।

অতপর আর একদল লোককে দেখিলাম, যাহাদের মাথা মস্ত বড় বড় পাথরের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইতেছে এবং চূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাল হইয়া যায়, তখন পুনরায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়- তাহাদের এই অবস্থার ক্ষান্ত নাই। নবী (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা ঐসব লোকের শাস্তির দৃশ্য যাহাদের মাথা নামাযের জন্য উঠিতে চাহিবে না।

অতপর একদল নর-নারীকে দেখিলেন, যাহাদের সম্মুখ ও পিছনের লজ্জাস্থানে নেকড়া ঠাসিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহারা গরু-ছাগলের ন্যায় বিচরণ করিয়া দোযখের উদ্ভিজ্জ "জারী" ও "যাক্কুম" গাছ এবং কাঁকর ও পাথর ভক্ষণ করিতেছে। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের

দৃশ্য? তিনি বলিলেন, এই দৃশ্য ঐ লোকদের যাহারা স্বীয় ধন-সম্পত্তির যাকাত-সদকা আদায় না করিবে। এই শাস্তি তাহাদের সমুচিত শাস্তি, আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের উপর কোনরূপ জুলুম করেন নাই।

অতপর এক দল লোক দেখিলেন, তাহাদের সম্মুখে এক পাত্রে রান্না করা গোশ্ত অপর পাত্রে পচা দুর্গন্ধময় কাঁচা গোশ্ত রহিয়াছে– তাঁহারা প্রথমটি উপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় পাত্র হইতে খাইতেছে। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহাদের নিকট বিবাহিতা হালাল স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও হারাম ফাহেঁশা নারীর নিকট রাত্রি যাপন করিবে এবং ঐসব নারীর দৃশ্য, যাহাদের হালাল স্বামী থাকা সত্ত্বেও তাহারা হারাম বদমাশ পুরুষদের নিকট রাত্রি যাপন করিবে।

অতপর পথের মধ্যে একটি কাষ্ঠবিশেষ বস্তু দেখিতে পাইলেন, সেই কাষ্ঠটি পথিকদের কাপড়-চোপড় জড়াইয়া ধরিয়া ফাড়িয়া ফেলে। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা পথে বসিয়া থাকিয়া পথিকদের লুণ্ঠন করিবে।

অতপর এক লোককে দেখিলেন, সে লাকড়ির এক বিরাট বোঝা একত্রিত করিয়াছে যাহা উঠাইতে সে কোন প্রকারেই সক্ষম হইবে না, এতদসত্ত্বেও সে ঐ বোঝা আরও অধিক ভারী করিতেছে। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐ লোকের দৃশ্য যাহার নিকট লোকদের বহু আমানত রহিয়াছে– যাহা আদায় করিতে সে সক্ষম নহে, কিন্তু সে আরও আমানত লাভের সুযোগ তালাশ করে।

অতপর দেখিলেন, এক দল লোকের জিহ্বা ও ঠোঁট কেঁচি দ্বারা কাটা হইতেছে– তাহাদের এই অবস্থার ক্ষান্ত নাই। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে ঐ দৃশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, ইহা ভ্রষ্ট পথের প্রতি আহ্বানকারী বক্তাগণের দৃশ্য।

অতপর দেখিতে পাইলেন, একটি ছোট পাথর খণ্ড, তাহা হইতে বিরাট একটি বলদ বাহির হইল এবং পুনরায় সে তাহাতে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সক্ষম হইতেছে না। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে ঐ দৃশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইহা ঐ লোকের দৃশ্য যাহার মুখ দিয়া কোন অসঙ্গত কথা বাহির হইয়া যায়, পরে সে অনুতপ্ত হয়, কিন্তু ঐ কথা আর ফিরাইয়া আনিতে পারে না।

তারপর একস্থানে পৌঁছিয়া অসাধারণ সুগন্ধময় শীতল বাতাসও কস্তুরীর খোশবু অনুভব করিলেন এবং মধুর সুরের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, এই আওয়াজ বেহেশতের। বেহেশত আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন নিবেদন করিতেছে যে, হে পরওয়ারদেগার! আমার ভিতর স্বর্ণ-চান্দি, আয়েশ-আরাম ও ভোগ-বিলাসের আসবাবপত্র অনেক অনেক জমা হইয়া আছে, এখন তাহার ব্যবহারকারী প্রদান সম্পর্কে তোমার যে আশ্বাস রহিয়াছে তাহা দান কর। আল্লাহ তাআলা তাহাকে উত্তর দিয়াছেন, মোমেন মোসলমান নারী-পুরুষ তোমার জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিলাম। তদুত্তরে বেহেশত বলিয়াছে, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

তারপর আর একস্থানে পৌঁছিয়া ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনিতে পাইলেন এবং ভীষণ দুর্গন্ধময় বাতাস অনুভব করিলেন। হযরত (সঃ) জিব্রাঈলকে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইহা জাহান্নামের আওয়াজ। সে ফরিয়াদ করিতেছে– হে পরওয়ারদেগার! আযাব, কষ্ট ও দুঃখ-যাতনার সমুদয় জিনিষ আমার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে জমা হইয়াছে, এখন ঐ সবের শাস্তি ভোগের পাত্র আমাকে দান করুন। আল্লাহ তাআলা তাহাকে বলিয়াছেন, কাফের-মোশরেক এবং কুকর্মী ও অহঙ্কারী নারী-পুরুষ, যাহারা হিসাব-নিকাশের দিনকে বিশ্বাস করে না তাহাদিগকে তোমার জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি। সে বলিয়াছে, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

আল্লাহ তাআলাকে দেখিয়াছিলেন কি?

এই সম্পর্কে স্বয়ং হযরতের ছাহাবীগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বশ্রেণীর আলেমের মধ্যেই মতভেদ

রহিয়াছে। মতভেদের কারণ এই যে, এই সম্পর্কে হাঁ না উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু প্রমাণ বিদ্যমান আছে এবং অকাট্য প্রমাণ কোন পক্ষেই নাই। সুতরাং পরবর্তী বিশিষ্ট এক শ্রেণীর আলেমের মত এই যে, এই সম্পর্কে কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা হইতে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

ভ্রমণে ব্যয়িত সময়ের পরিমাণ

এই সম্পর্কে বিশেষ কোন বিস্তারিত বিবরণ ও নির্ধারণ পাওয়া গেল না, শুধুমাত্র নিম্নে বর্ণিত দুইটি হাদীছই আমাদের খোঁজে পাওয়া গিয়াছে।

(১) শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার মে'রাজ ভ্রমণের ঘটনা কিরূপ ছিল? তদুত্তরে হযরত (সঃ) বলিলেন–

صليت مع اصحابى صلاة العتمة بمكة معتما فاتانى جبرائيل بدابة ـ

অর্থ ঃ "আমি আমার সঙ্গী-সাথীগণের সঙ্গে একত্রেই রাত্রির পূর্ণ অন্ধকার সময়ের নামায (যাহা তখন পূর্ব আমলের কোন নিয়মে পড়া হইয়া থাকিত) মক্কা নগরীতেই পূর্ণ অন্ধকারে আদায় করিলাম। অতপর আমার নিকট জিব্রাঈলের আগমন হইল। (ঘটনা প্রবাহের মধ্যে) আমার সম্মুখে শ্বেত বর্ণের, গাধা অপেক্ষা বড় খচ্চর অপেক্ষা ছোট রকমের একটি বাহন উপস্থিত করিয়া আমাকে তাহার উপর আরোহণ করান হইল (বিস্তারিত বিবরণ দানের পর হযরত (সঃ) বলিয়াছেন)–

ثم اتيت اصحابى قبل الصبح بمكة فاتاني ابو بكر (رضى الله عنه) فقال يارسول الله اين كنت الليلة فقد التمستك فى مظانك ـ

অর্থ ঃ "তারপর আমি মক্কায় আমার সঙ্গী-সাথীগণের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছি ভোর হওয়ার পূর্বেই।" তখন আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি রাত্রে কোথায় ছিলেন? আমি ত আপনাকে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাই তালাশ করিয়াছি। তখন হযরত (সঃ) বায়তুল মোকাদ্দাস যাওয়ার উল্লেখ করিলেন। আবু বকর (রাঃ) আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! বায়তুল মোকাদ্দাস ত মক্কা হইতে এক মাসের পথের দূরত্বে অবস্থিত। (আবু বকর পূর্বে বায়তুল মোকাদ্দাস দেখিয়াছিলেন।) হযরত (সঃ) তাঁহাকে বায়তুল মোকাদ্দাসের মোটামুটি অনেক নিদর্শন বলিয়া দিলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) নব উদ্যমে বলিয়া উঠিলেন, বাস্তবিকই আপনি আল্লাহর রসূল। (তফসীর ইবনে কাসীর, ৩+১৩–১৪)

(২) হযরতের চাচা আবু তালেবের কন্যা উম্মে হানী (রাঃ) মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করিতেন যে, মে'রাজের ঘটনার রাত্রে হযরত (সঃ) আমারই গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। হযরত (সঃ) সন্ধ্যা রাত্রের পরের নামায আদায় করিয়া শুইয়া পড়িলেন, আমরাও শুইয়া পড়িলাম। প্রভাত হওয়ার পূর্বক্ষণে আমরা হযরতের সঙ্গে নিদ্রা হইতে উঠিলাম। প্রভাতের নামাযান্তে হযরত (সঃ) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–

لقد صليت معكم العشاء الاخرة كما رايت بهذا الوادى ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت الغداة معكم الان كما ترين ـ

অর্থ ঃ "আমি এই মক্কা নগরীতেই তোমাদের দৃষ্টির সমক্ষে এশার নামায আদায় করিয়াছিলাম, তারপর আমি বায়তুল মোকাদ্দাসে উপনীত হইয়াছিলাম, তথায় মসজিদে আমি নামায পড়িয়াছি, তারপর এখন তোমাদের সঙ্গেই ফজরের নামায আদায় করিলাম। (তফসীর ইবনে, কাসীর, ৩–১২)

উল্লিখিত হাদীছদ্বয় দৃষ্টে ইহা বলা অবাস্তব হইবে না যে, মে'রাজ শরীফের ঘটনাটি রাত্রের এক সুদীর্ঘ অংশে সংঘটিত হইয়াছিল।

মে'রাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল

১৮০৭। হাদীছ ঃ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ) قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً اُسْرِيَ بِهِ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ -

অর্থ ঃ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্বোধন করতঃ বলিয়াছেন, "আমি যেসব অলৌকিক দৃশ্য বস্তুনিচয় আপনাকে দেখাইয়াছি– একমাত্র লোকদের পরীক্ষার জন্য (তাহাদের নিকট ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, তাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কি-না।)"

এই আয়াতে উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সমুদয় দৃশ্য ও বস্তুনিচয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করাই উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রসূল (সঃ)-কে পরিদর্শন করানোর যে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবেই পরিদর্শন ছিল; উক্ত আয়াতে পরিদর্শনের কোন প্রকার রূপক অর্থ বা স্বপ্ন দেখার অর্থ উদ্দেশ্য নহে।)

যেই রাত্রে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল মোকাদ্দাসে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই রাত্রেই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পরিদর্শন করানোর ঘটনা ঘটিয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চাচাত ভাই, যাঁহার পক্ষে স্বয়ং হযরত (সঃ) কোরআনের জ্ঞান ও দ্বীনের বুঝের জন্য বিশেষরূপে দোয়া করিয়াছিলেন– সেই ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই বিষয়টি খোলাসারূপে বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, মে'রাজ শরীফের ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করার ঘটনা। কোন প্রকারে শুধু আত্মার বিচরণ বা স্বপ্ন দেখার ঘটনা নহে। পূর্বাপর বিশ্ব মুসলিম জমাতের ঈমান এবং আকীদা বিশ্বাসও ইহাই, যুক্তি প্রমাণে এই দাবীই গ্রহণীয়। কারণ–

(১) হযরতের পিতৃব্য-কন্যা "উম্মে হানী" যাঁহার গৃহে হযরত (সঃ) মে'রাজের রাত্রে অবস্থানরত ছিলেন, তাঁহার বর্ণনা এই যে, হযরত (সঃ) মে'রাজের রাত্রে আমার গৃহে শায়িত ছিলেন। পরে আমি দেখিতে পাইলাম হযরত (সঃ) গৃহে নাই, ফলে আমার নিদ্রা দূর হইয়া গেল। আমি চিন্তিত হইলাম যে, শত্রু দলের লোকেরা কোন কোন ষড়যন্ত্র করিয়াছে না কি। (রাত্র প্রভাতে নামাযান্তে) হযরত (সঃ) নিজেই ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, রাত্রি বেলা জিব্রাঈল আসিয়া আমাকে গৃহ হইতে বাহির করেন এবং বোরাকে আরোহণ করাইয়া বায়তুল মোকাদ্দাসে লইয়া যান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘটনা যদি আত্মার বিচরণ বা স্বপ্ন হইত তবে গৃহ হইতে অন্তর্হিত হওয়ার অর্থ কি?

(২) শাদ্দাদ ইবনে আওস বর্ণিত হাদীছে আছে, মে'রাজের রাত্রে ভোর বেলা আবু বকর (রাঃ) হযরতের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! রাত্রি বেলা কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন? সম্ভাব্য সকল স্থানেই আপনাকে তালাশ করিয়াছি। তদুত্তরে হযরত (সঃ) মে'রাজের ঘটনা ব্যক্ত করিলেন।

(তফসীর ইবনে কাসীর, ৩–১৪)

সশরীরে মে'রাজ না হইয়া থাকিলে হযরত (সঃ) রাত্রে নিখোঁজ হইলেন কিরূপে?

(৩) হযরত (সঃ) ভোর বেলা উক্ত ঘটনা সর্বসাধারণ্যে ব্যক্ত করিলেন এবং লোকদের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইয়া গেল। হযরতের প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইবার এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার জন্য কাফেররা

এই ঘটনাকে বিশেষ অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিল। এমনকি কোন কোন নবদীক্ষিত দুর্বল বিশ্বাসের মুসলমান এই ঘটনা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া কাফেরদের প্ররোচনায় ইসলাম হইতে সরিয়া পড়িল।

মে'রাজ ভ্রমণের বাস্তবতাই যদি হযরতের দাবী না হইত, তবে ঐরূপ আলোড়ন সৃষ্টির হেতু কি থাকিতে পারে? স্বপ্নে ত সাধারণ মানুষের পক্ষেও ঐরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে, সুতরাং সব রকম আলোড়ন ও দ্বিধাবোধের অবসান করার জন্য হযরতের পক্ষে শুধু এতটুকু বলা যথেষ্ট ছিল যে, ঘটনা বাস্তব জাতীয় নহে, স্বপ্ন জাতীয়। ঐরূপ বলা হয় নাই, বরং বাস্তব ঘটনারূপে প্রমাণ করারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৪) ১৮০৭ হাদীছের মর্মে দেখা যায়, ঘটনার এক বিশেষ অংশ বায়তুল মোকাদ্দাস পরিদর্শন সম্পর্কে হযরত (সঃ) কাফেরদের পক্ষ হইতে পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন; যদ্দরুন হযরত (সঃ) বিশেষভাবে বিব্রতও হইয়াছিলেন। অবশেষে আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে হযরত (সঃ) উক্ত পরীক্ষায় স্বীয় দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন।

ঘটনা স্বপ্ন হইলে পরীক্ষার প্রশ্নই উঠিত না এবং হযরতের বিব্রত হওয়ারও কোন কারণ ছিল না। ঘটনাকে স্বপ্ন বলার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর অবসান হইয়া যাইত।

মে'রাজের প্রতিরূপ বা স্বরূপ প্রদর্শন

১৮০৮। হাদীছ ঃ (পৃঃ ১১২০) عن شريك قال سمعت انس بن مالك يَقُوْلُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِد الْكَعْبَة انَّهُ جَاءَهُ ثَلٰثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ اَنْ يُّوْحٰى اِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اَوَّلُهُمْ اَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ اَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ اٰخِرُهُمْ خُذُوْا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتّٰى اَتَوْهُ لَيْلَةً اُخْرٰى فِيْمَا يَرٰى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ كَذَالِكَ الْاَنْبِيَاءُ تَنَامُ اَعْيُنُهُمْ وَلاَ يَنَامُ قُلُوْبُهُمْ فَلَمْ يُكَلِّمُوْهُ حَتّٰى احْتَمَلُوْهُ فَوَضَعُوْهُ بِئْرِ زَمْزَم .... فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

অর্থ ঃ ছাহাবী আনাছ (রাঃ) কা'বা গৃহের নিকট হইতে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রাত্রি ভ্রমণের ব্যাপারে একটি বিবরণ ইহাও প্রদান করিয়াছেন যে, নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা– হযরত (সঃ) হরম শরীফের মসজিদে (অন্যান্য লোকদের সঙ্গে) নিদ্রিত ছিলেন। এমতাবস্থায় (তিনি দেখিলেন,) তাঁহার নিকট তিন জন লোক আসিল। তাহাদের প্রথম ব্যক্তি সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলন, ইহাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি যিনি, উনিই তিনি। তখন তৃতীয় জন বলিল, সর্বোত্তম ব্যক্তিকে উঠাইয়া লও।

এই রাত্রির ঘটনা এতটুকু হইল– ইহার পর উক্ত আগন্তুকগণকে হযরত আর দেখিতে পাইলেন না; অবশ্য আর এক রাত্রে তাহারা পুনরায় আসিল। ঐ সময়ও হযরতের চক্ষুদ্বয় নিদ্রিত ছিল, কিন্তু তাঁহার অন্তর নিদ্রিত ছিল না– অনুভূতি শক্তি সম্পূর্ণ জাগ্রত ছিল। নবীগণের নিদ্রাবস্থা এইরূপই যে, চক্ষু নিদ্রমগ্ন হয়, অন্তর নিদ্রামগ্ন হয় না।

এই রাত্রে আগন্তুকগণ আসিয়া কোন কথাবার্তা না বলিয়াই হযরত (সঃ)-কে বহন করিয়া জম্‌জম্ কূপের নিকট লইয়া আসিলেন। (১৮০০ নং হাদীছে বর্ণিত অনুরূপ আকাশ ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণের দৃশ্য দেখার পর বলা হইয়াছে–) অতপর হযরতের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি হরম শরীফের মসজিদেই ছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ নবুয়ত প্রাপ্তির পর হযরত (সঃ) ওহী মারফত প্রত্যক্ষভাবে জিব্রাঈল ফেরেশতার উপস্থিতি

দ্বারা আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে খবর খবর প্রাপ্ত হইতেন। নবুয়তের পূর্বে সেই ওহীরই প্রতিরূপ বা স্বরূপ আকারে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হযরত (সঃ)-কে সত্য স্বপ্ন দেখান হইত যাহা দিবালোকের ন্যায় বাস্তবায়িত হইয়া থাকিত। নবুয়তের নিকটবর্তী ছয় মাসকাল ঐরূপ স্বপ্নের খুব আধিক্য হইয়াছিল যাহার উল্লেখ প্রথম খণ্ডে ৩ নং হাদীছে রহিয়াছে।

তদ্রূপ মে'রাজের ন্যায় বিশেষ অলৌকিক ও অতি অসাধারণ, বরং মানুষের ধ্যান, খেয়াল ও ধারণা বহির্ভূত ঘটনা, যাহা হযরতের পক্ষে বাস্তবায়িত হওয়ার ছিল, ঐ ঘটনারও অবিকল প্রতিরূপ হযরত (সঃ)-কে নবুয়তের পূর্বে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উল্লিখিত হাদীছে সে স্বপ্নের মাধ্যমে মে'রাজের বর্ণনা হইয়াছে যাহা ভিন্ন ঘটনা, পক্ষান্তরে বাস্তব মে'রাজ ভিন্ন ঘটনা।

অনেক ধোকাবাজ লোক সর্বসাধারণকে এরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মে'রাজ শরীফ স্বপ্নের ঘটনা ছিল মাত্র, বাস্তব ঘটনা ছিল না। সেই ধোকাবাজগণ উল্লিখিত হাদীছখানা দ্বারা নিজেদের দাবী প্রমাণ করিতে চাহে। তাহাদের বুঝা উচিত যে, বাস্তব মে'রাজের কোন সম্পর্ক এই হাদীছের সঙ্গে মোটেই নাই। কারণ, বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে এই হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে যে, قبل ان يوحى اليه অর্থাৎ এই ঘটনা হযরতের নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা, অথচ বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে ত সমস্ত ঐতিহাসিক মোফাস্‌সের মোহাদ্দেছগণের সিদ্ধান্ত, বরং বিশ্ব মুসলিমের আক্বীদা ইহাই যে, তাহা হযরতের নবুয়তপ্রাপ্তির পরের ঘটনা। অতএব উভয় ঘটনা যে ভিন্ন ভিন্ন তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী আনাছ (রাঃ), তিনিই বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে ১৮০১ এবং ১৯০২ নং হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীছদ্বয়ে এমন কোন একটি অক্ষরও নাই যাহার দ্বারা মে'রাজ স্বপ্নে হওয়ার পক্ষে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ইহা অবধারিত যে, আলোচ্য হাদীছ বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে নহে।

আলোচ্য হাদীছখানা যে বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কীয় মোটেই নহে, সে সম্বন্ধে ইমাম বোখারী (রঃ) সম্পূর্ণ একমত! তাহার স্পষ্ট প্রমাণ ইহাতে পাওয়া যায় যে, "ইস্‌রা ও মে'রাজ" নামে বোখারী (রঃ) বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে দুইটি পরিচ্ছেদ রাখিয়াছেন, এই পরিচ্ছেদদ্বয়ের মধ্যে আলোচ্য হাদীছখানার কোন উল্লেখ করেন নাই।

ইমাম বোখারী (রঃ) স্বীয় মূল গ্রন্থের সমাপ্তির নিকটবর্তী যাইয়া অন্য এক প্রসঙ্গে আলোচ্য হাদীছখানা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা শুধু ধোকা ভঞ্জনের উদ্দেশে এই স্থানে উক্ত হাদীছখানার আলোচনায় সঠিক মর্ম উদঘাটনে বাধ্য হইয়াছ।

মে'রাজের মূল ঘটনা বাস্তব হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ

(১) শাদ্দাদ ইবনে আওস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রেওয়ায়াতে এই বিষয়টিও উল্লেখ আছে যে, মোশরেকগণ মূল ঘটনর প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিলে পর হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি যাহা বলিতেছি তাহার সত্যতার একটি প্রমাণ এই যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের পথে তোমাদের একটি সওদাগরী কাফেলার নিকট দিয়া অমুক স্থানে আমি পথ অতিক্রম করিয়াছি। তথায় তাহাদের একটি উট হারাইয়া গিয়াছিল, অমুক ব্যক্তি সেই উটটি তাহাদের নিকট আনিয়া দিয়াছে। তাহারা (সেই পথ অতিক্রম করিয়া আসিতেছে, সেই অনুপাতে) অমুক অমুক মঞ্জিল হইয়া অমুক দিন তাহারা মক্কায় পৌছিবে। কাফেলার সম্মুখ ভাগে গোধূম বর্ণের একটি উট রহিয়াছে, যাহার পৃষ্ঠে কাল রংয়ের কম্বল বিছান এবং কাল রংয়েরই দুইটি বস্তা রহিয়াছে।

নির্ধারিত দিনে সেই কাফেররা মক্কায় পৌঁছিল এবং হযরত রসূলুল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত দেখা গেল।

(২) ১ম খণ্ড ৬ নং হাদীছ যাহার মধ্যে রোম সম্রাট হেরাকলের প্রতি হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের লিপি প্রেরণ এবং আবু সফিয়ান ও হেরাকলের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে; সেই হাদীছেরই এক রেওয়ায়াতে নিম্নে বর্ণিত বিষয়টিও উল্লেখ রহিয়াছে।

আবু সুফিয়ান বলেন, মিথ্যাবাদী নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার ভয়ে রোম সম্রাটের প্রশ্নাবলীর উত্তরে রসূলুল্লাহর মর্যাদাহানিমূলক কোন উক্তি করার সুযোগ না পাইয়া আমি তাঁহার রাত্রি ভ্রমণের কাহিনীটি রোম সম্রাটের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলাম। আমি বলিলাম, বাদশাহ নামদার! আমি নবুয়তের দাবীদার ব্যক্তির এমন একটি ঘটনা জ্ঞাত করিব যাহাকে অবশ্যই আপনি মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন।

রোম সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ঘটনাটি কি? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বলিলাম, তিনি এই দাবী করিয়াছেন যে, আমাদের দেশ মক্কা হইতে বাহির হইয়া এক রাত্রে এই শহরস্থ বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে পৌঁছিয়াছিলেন এবং সেই রাত্রেই প্রভাত হওয়ার পূর্বে মক্কা নগরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

এই কথাবার্তার সময় বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রধান পোপ বা লাট পাদ্রী রোম সম্রাটের সন্নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, উক্ত রাত্রের ঘটনা সম্পর্কে আমিও জ্ঞাত আছি। রোম সম্রাট পোপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিকট সেই ঘটনার অবগতি কিরূপে? পোপ বলিলেন, বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদের দরজাসমূহ বন্ধ করার দায়িত্ব আমার উপর; আমি নিদ্রার পূর্বে অবশ্যই দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া থাকি। আলোচ্য ঘটনার রাত্রিতে আমি মসজিদের দরজাসমূহ বন্ধ করিতে লাগিলাম, সব দরজাই বন্ধ হইল, কিন্তু একটি দরজা কোন উপায়েই বন্ধ হইল না। এমনকি উপস্থিত লোকজনসহ মসজিদের সমস্ত খাদেমগণ সম্মিলিতভাবে চেষ্টা-তদবীর করিয়াও হেলাইতে পারিল না, তাহা পাহাড়ের ন্যায় অটল মনে হইতেছিল। অতপর ছুতার মিস্ত্রী ডাকিয়া আনা হইল, তাহারা সব কিছু দেখিয়া বলিল, দরজার উপর দিকের চৌকাঠটি নীচে নামিয়া গিয়াছে, সুতরাং রাত্রি বেলা দরজা বন্ধ করা সম্ভব হইবে না। ভোরে দেখা যাইবে, এরূপ কেন হইল?

পোপ বলিলেন, দরজার উভয় কপাট খোলা রাখিয়াই আমি শয়ন কক্ষে চলিয়া আসিলাম। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পর উক্ত দরজার নিকট উপস্থিত হইলাম (এবং দেখিলাম দরজাটি এখন স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ইহাও) দেখিলাম যে, মসজিদের এক কোণে (লোহার কড়ার ন্যায় মধ্যভাগে ছিদ্রবিশিষ্ট যে একটি পাথর ছিল এবং তাহার সেই ছিদ্র বহু দিন হইতে বন্ধ ছিল; আজ সেই) পাথরের ছিদ্র খোলা রহিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে বাহন বাঁধার নিদর্শন রহিয়াছে। আমি আমার সঙ্গী-সাথীদেরকে বলিলাম, গত রাত্রিতে এই দরজাটি আখেরী নবীর আগমন উপলক্ষেই খোলা থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই নবী রাত্রে আসিয়াছিলেন এবং এই মসজিদে নামায পড়িয়া গিয়াছেন। *

(খাসায়েসে কোবরা। ১-১৭০ এবং তফসীর ইবনে কাসীর, ৩-২৩)

মে'রাজের সম্ভাব্যতা ঃ মে'রাজ শরীফ সম্পর্কে দুইটি প্রশ্নই বিশেষ জটিল বোধ হইয়া থাকে ঃ (১) সুদীর্ঘ ভ্রমণ, যাহার জন্য হাজার হাজার বৎসর আবশ্যক, কারণ এক হাদীছের বর্ণনাদৃষ্টে প্রত্যেকটি আসমান অতিক্রম করিতে প্রায় এক হাজার বৎসর আবশ্যক। * এই হিসাবে সাত আসমান অতিক্রম করিতে প্রায় সাত হাজার বৎসর আবশ্যক। তার ঊর্ধ্বে মহান আরশ ইত্যাদি বহু কিছুর ভ্রমণ মে'রাজের ঘটনায় হইয়াছিল,

---

* পোপের এই মন্তব্য আসমানী কিতাব সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতানুসারেই ছিল, কারণ পূর্বকালে নবীগণ এই বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে নামায পড়িতে আসিয়া নিজ নিজ বাহন উক্ত ছিদ্রবিশিষ্ট পাথরের সঙ্গেই বাঁধিয়া থাকিতেন। তাহা নবীগণের ব্যবহারের জন্যই ছিল এবং দীর্ঘ ছয় শত বৎসর হইতে অব্যবহৃত থাকায় তাহার ছিদ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন শেষ যমানার নবীর মে'রাজ সম্পর্কেও আসমানী কিতাবসমূহে উল্লেখ ছিল।

* পথ চলার সাধরণ নিয়মের পরিমাণ দৈনিক ১৬/১৭ মাইল হিসাবে এই নির্ধারণ অনুধাবন করা যাইতে পারে। প্রতিটি আকাশ এবং দুই আকাশের ব্যবধানের এই হিসাব।

এমনকি হযরত (সঃ) এই ঘটনায় তিন লক্ষ বৎসরের পথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিবরণ পাওয়া যায়।(তফসীর রুহুল মাআ'নী, ১৫-১১)

এত বড় সুদীর্ঘ ভ্রমণ শুধু এক রাত্রে, বরং তাহার এক অংশে কিরূপে হইতে পারে?

(২) মহাশূন্যে বায়ুহীন অগ্নি ইত্যাদির যেসব স্তর বা মণ্ডল বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐসব অতিক্রম করা শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর নির্ভরশীল এবং রক্ত-মাংসে গঠিত জীব মানুষের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

পাঠকবর্গ! এই ধরনের যত প্রশ্নই সম্মুখে আসুক, সবের খণ্ডন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে মে'রাজের ঘটনা বর্ণনায় একটি শব্দের মাধ্যমে প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন- سبحان الذى اسرى "অতি মহান (সর্বশক্তিমান" সর্বপ্রকার অক্ষমতা হইতে) পাক-পবিত্র যিনি, তিনি এই ভ্রমণ করাইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন বর্তমান রকেটের যুগে ঐ ধরনের প্রশ্ন ত একমাত্র হাস্যাস্পদই গণ্য হইতে পারে। কারণ মানুষ এইরূপ দ্রুতযান তৈয়ার করিতে সক্ষম হইয়াছে যাহা ঘণ্টায় ৫৮০০ মাইল তথা প্রায় এক বৎসরের পথ অতিক্রম করিতে পারে *।

আল্লাহ তাআলা ত বহু পূর্বেই এর চেয়ে কত অধিক দ্রুতগামী বস্তু তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত হিসাব অনুসারেই পৃথিবীর বার্ষিক গতি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৬৮৪৪৬ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবী তাহার বার্ষিক গতিতে প্রতি ঘণ্টায় এগার বৎসরের অধিক কালের পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। আলো এবং শব্দের গতি আরো অধিক। মহান আল্লাহ তাআলা যে আরও কত কত অধিক দ্রুত গতির বস্তু ও বাহন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং করিতে পারেন তাহার অনুভূতি আমাদের ঈমানের উপর নির্ভর করে, হিসাবের আওতায় নাও আসিতে পারে। ولا يحيطون بشئ من عمله আল্লাহ তাআলার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসীম পরিধি মানুষ হিসাবের বেষ্টনীতে আবদ্ধ করিতে পারিবে না।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই ভ্রমণ উপলক্ষে যে বাহন প্রথমে ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহার নাম 'বোরাক' যাহা 'বারক' শব্দ হইতে গৃহীত; তাহার অর্থ বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের গতি যে কত দ্রুত তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। আকাশে এবং ইলেকট্রিক তারে প্রত্যেকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। উক্ত বাহনটির দ্রুত গতি বুঝাইবার জন্যই তাহার এই নামকরণ হইয়াছে। তাহার পরে আরও বিশিষ্ট বাহন ব্যবহার করা হইয়াছিল বলিয়া হাদীছে বর্ণনা আছে।

আল্লাহ তাআলার নগণ্য সৃষ্টি মানুষ আজ শূন্যে জয়যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার পক্ষে সেই মহাশূন্য জয় করা কোন প্রকারে জটিল হইতে পারে- এরূপ ধারণা পাগলের পক্ষেও সম্ভভ কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়।

সিনা চাক বা বক্ষ বিদীর্ণ করা

মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সিনা চাক বা বক্ষ বিদীর্ণ করা হইয়াছিল; সেই সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত আছে। বোখারী শরীফ, তিরমিযী শরীফ এবং নাসায়ী শরীফসহ অনেক হাদীছের কিতাবেই তাহা বিদ্যমান আছে। বোখারী শরীফে এই সম্পর্কে একাধিক হাদীছ উল্লেখ আছে। ১৮০০ নং হাদীছের বিবরণ অতি সুস্পষ্ট, বিস্তারিত এবং এই সম্পর্কে হেরফেরকারীদের সব রকরমের ধোঁকা ভঞ্জনে বিশেষ সহায়ক। কারণ,

---

* আমেরিকার গভর্নমেন্ট ২৯ জুলাই ১৯৬৪ ইং তারিখে চাঁদের ফটো লইবার জন্য ৮০৬ পাউণ্ড ওজনের "Ranger-7" নামের যেই মহাশূন্যযান চাঁদের দিকে প্রেরণ করিয়াছিল তাহার গতি প্রতি ঘণ্টায় ৫৮০০ মাইল ছিল বলিয়া রয়টার ও এ, পি,পি, পরিবেশিত খবর ২৯ শে জুলাইর সমুদয় খবরের কাগজেই প্রকাশ হইয়াছিল। সম্মুখে আরও অনেক কিছু হইবে।

এই হাদীছ মূল বিষয়টিকে شق শাক্ক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে, অর্থ বিদীর্ণ করা, যাহা একটি বাহ্যিক কার্য। সঙ্গে সঙ্গে এই হাদীছের বিবৃতিতে ইহাও উল্লেখ আছে যে, স্বয়ং হযরত (সঃ) স্বীয় বক্ষের দিকে ইশারা করতঃ বিদীর্ণ কার্য সমাধার সীমা নির্ধারিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ما بين هذه الى هذه এই স্থান হইতে এই স্থান পর্যন্ত। যাহার ব্যাখ্যায় পরম্পরা ঘটনা বর্ণনাকারী বা সাক্ষীগণ বলিয়াছেন– সিনার উপরিভাগ হইতে নাভির নিম্নদেশ পর্যন্ত। হযরত (সঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, তৎপর আমার হৃৎপিণ্ডটি বাহির করিয়া ধৌত করা হইয়াছিল। ১৮০১ নং হাদীছে এবং আরও অনেক হাদীছে ইহাও উল্লেখ আছে যে, অতপর আমার বক্ষ জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করা হইয়াছে। তারপর হযরত নবী (সঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, ঈমান ভরা একটি পাত্র আনা হইয়াছে যদ্দ্বারা আমার হৃৎপিণ্ড ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৮০১ নং হাদীছে আছে– ঈমান ও হেকমত ভরা একটি পাত্র আনিয়া আমার বক্ষের ভিতরে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই তথ্যটির তাৎপর্য এই যে, স্বর্ণ পাত্রে করিয়া এমন কোন বস্তু আনা হইয়াছিল যাহা ঈমান ও হেকমত তথা পরিপক্ক জ্ঞানবর্ধক ছিল, যেমন নানা প্রকার টনিক বা ইনজেকশন বোতল ও শিশিতে করিয়া আনিয়া মানুষের দেহে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহার কোনটা দর্শনশক্তি বর্ধক, কোনটা শ্রবণশক্তি বর্ধক, কোনটা হৃদশক্তি বর্ধক হইয়া থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঈমান ও হেকমতের উন্নতির ধাপ আল্লাহর দরবারে অসংখ্য রহিয়াছে, অতএব হযরতের পক্ষে তাহা বর্ধনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা সমীচীন বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

হযরত আরও বলিয়াছেন যে, অতপর হৃৎপিণ্ডটি তাহার নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'যোরকানী' নামক কিতাবে আছে, হযরতের সিনা মোবারক চাক বা বিদীর্ণ করিয়া অতপর সেলাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মুসলিম শরীফের হাদীছে ঘটনা বর্ণনাকারী ছাহাবী আনাছ (রাঃ) স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি হযরতের বক্ষ মোবারকে সেই সেলাইর নিদর্শন দেখিয়াছেন।

বর্তমান সার্জিক্যাল চিকিৎসা ব্যবস্থার অসাধারণ উন্নতির যুগে আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে কোন ধরনের সংশয় বা দ্বিধাবোধ যে মোটেই সঙ্গত হইবে না তাহা অতি সুস্পষ্ট।

"সিনা চাক্ বা বক্ষ বিদীর্ণ" হযরতের উপর বার বার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(১) সর্বপ্রথম সিনা চাক করা হইয়াছিল বাল্যকালে চারি-পাঁচ বৎসর বয়সের সময়। তখন তিনি দুধমা হালিমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে ছিলেন।

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ "হযরতের দুগ্ধ পান" আলোচনায় বর্ণিত হইয়াছে।

এই ঘটনার বর্ণনায় পাঁচখানা হাদীছ বর্ণিত আছে। (সীরাতে মোস্তফা, ১–৫৭)।

এই ঘটনার বিবরণে একটি তথ্য বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাদ্বয় হযরতের বক্ষ বিদীর্ণ করতঃ হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে জমাট রক্তের দুইটি টুকরা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ইহা শয়তানের অংশ।

সিনা চাক অস্বীকারকারীগণ ঘটনার এই অংশটুকুকে সম্বল করিয়া হযরতের মর্যাদাহানীর দোহাই দেওয়ার অপচেষ্টা করিয়া থাকে; কিন্তু ইহা তাহাদের বোকামি। কারণ মানুষ হিসাবে হযরতের ভিতরে সৃষ্টিগতভাবে অন্যান্য মানুষের ন্যায় সব কিছুই ছিল, যেমন তাঁহার ভিতরে মল-মূত্রের ন্যায় বস্তুর সঞ্চার হইত।

বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শয়তানী কাজ তথা খেলাধুলা ও অপরাধপ্রবণতায় মাতিয়া উঠে; তাহার উৎস মূল হিসাবে পরীক্ষা ক্ষেত্র ইহজগতে পরীক্ষার্থী মানুষ জাতের মানবীয় দেহের অংশ হৃৎপিণ্ডের ভিতরে ঐ ধরনের একটা বস্তু থাকে। মানুষ হিসাবে হযরতের হৃৎপিণ্ডেও তাহা থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক। অবশ্য তিনি নবী হিসাবে তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, অঙ্কুরেই ঐ মূল উৎস নিপাত করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ "হযরতের দুগ্ধপান" আলোচনায় টীকার মধ্যে রহিয়াছে।

(২) দ্বিতীয় বার দশ বৎসর বয়সে। (৩) তৃতীয় বার নবুয়তপ্রাপ্তির সময়। (৪) চতুর্থ বার মে'রাজের ভ্রমণ উপলক্ষে– যাহার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে।

প্রথম বারের বক্ষ বিদারণের উদ্দেশ্য তাহার বর্ণনার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় বারের উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয় যে, الشباب شعبة من الجنون সকল প্রকার উন্মাদনার সময় হইল যৌবনকাল।" এই ভয়াবহ যৌবনই আবার সব রকম বল-শক্তি ও উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎস। যৌবনের এই দু'ধারী ঢেউ সংযত ও সুসংহত রাখার জন্য যৌবনের সূচনার পূর্বেই বক্ষ বিদারণের মাধ্যমে সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৃতীয় বারের উদ্দেশ্যও সুস্পষ্ট; ওহী এক অসাধারণ আভ্যন্তরীণ চাপের বস্তু (প্রথম খণ্ড ২ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য), ঐ চাপ সামলাইবার যোগ্য শক্তি-সামর্থ্য প্রদানই ছিল এই বক্ষ বিদারণের উদ্দেশ্য। চতুর্থ বারের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ত এই রকেট যুগে নিতান্তই সহজবোধ্য। মানব দেহ ঊর্ধ্ব জগতে বিচরণযোগ্য করার জন্য রকেট আরোহীদেরকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কত রকমে প্রস্তুত করা হয়। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তাআলার অসাধারণ বিশেষ সৃষ্টি নূরের তাজাল্লীতে তুর পর্বত খান খান হইয়া গিয়াছিল পয়গম্বর মূসা (আঃ) চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে এই ভ্রমণে মহান সিদরাতুল মোন্তাহা ও মহান আরশের উপর উক্ত নূরের তাজাল্লী অপেক্ষা কত লক্ষ গুণ বেশী নূরের তাজাল্লী পূর্ণ চৈতন্য বজায় রাখিয়া পরিদর্শন করিতে হইবে এবং সেই নূরের তাজাল্লী অপেক্ষা আরও কত উর্ধ্বের মহান মহান বস্তুনিচয় পরিদর্শন করিতে হইবে। সেই শক্তি-সামর্থ্যের প্রস্তুতিও ত ভ্রমণ আরম্ভে সম্পন্ন করিতে হইবে। এ সবই ছিল চতুর্থ বার বক্ষ বিদারণের তাৎপর্য।*

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ নবী তাঁহার পরে কোন নবী হয় নাই কেয়ামত পর্যন্ত হইবেও না

১৮০৯। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৫০১) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার এবং আমার পরবর্তী নবীগণের একটি দৃষ্টান্ত বুঝিয়া রাখ– এক ব্যক্তি একের পর এক ইটের গাঁথুনি দ্বারা একটি সুদৃশ্য সুন্দর অট্টালিকা বা ঘর তৈয়ার করিয়াছে, কিন্তু তাহার এক কোণায় একখানা ইট রাখার স্থান খালি রাখিয়াছে। দর্শকগণ ঘরখানা দেখিয়া খুবই প্রশংসা করে, কিন্তু এই বলিয়া অনুতাপও প্রকাশ করিতে থাকে যে, এই স্থানে একখানা ইট রাখিয়া ঘরখানার সম্পূর্ণতা সাধন করা হইল না কেন! হযরত (সঃ) বলেন– فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ ـ

"আমি সেই অবশিষ্ট একখানা ইট; আমি সর্বশেষ নবী।"

ব্যাখ্যা ঃ সৃষ্টির সেরা মানব জাতির দ্বারা এক আল্লাহর প্রভুত্বের বিকাশ সাধন– যাহা সারা জাহান সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থাস্বরূপ আল্লাহ তাআলা স্বীয় প্রতিনিধি রসূল বা নবীগণের যে বহর প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই নবী বহরকে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি সুদৃশ্য অট্টালিকার দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। এই দৃষ্টান্তটি নবীগণের পারস্পরিক সম্বন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও অতি সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছে। নবীগণ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন পরিবেশের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত নিয়া আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য এক আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সকলে ঐক্য শৃঙ্খলে এইরূপ অবিচ্ছেদ্য ও মজবুতভাবে আবদ্ধ ছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্নতা মোটেই ছিল না, বরং তাঁহারা সকলে মিলিয়া এক ছিলেন, যেরূপ কোন একটি সুদৃশ্য সৌধ বা অট্টালিকা হাজার হাজার সংখ্যক বিচ্ছিন্ন ইট দ্বারা তৈয়ার হয়, কিন্তু ঐ ইটগুলি সকলে মিলিয়া একটি মাত্র উদ্দেশ্য সাধনে এত দৃঢ়তররূপে একত্রিত হয় যে, অবশেষে এত এত সংখ্যার ইটগুলি সৌধ বা অট্টালিকা তথা একটি বস্তুতে পরিণত হইয়া পড়ে।

* বহু সমালোচিত আকরম খাঁ মরহুম এইসব উর্ধ্বের বিষয়াবলী হইতে অজ্ঞ থাকায় বক্ষ বিদারণের মোজেযা অস্বীকার করিতে যাইয়া তাঁহার মোস্তফা চরিত গ্রন্থে যেসব প্রলাপ করিয়াছেন তাহা খণ্ডন করিতে ঘৃণার উদ্রেক হয়। পাঠক উল্লিখিত তথ্যাবলী সম্মুখে রাখিয়া খাঁ মরহুমের অসার প্রলাপগুলির খণ্ডন বুঝিয়া নিবেন; আশা করি বেগ পাইতে হইবে না।

অতএব, যেই ধর্ম বা ধর্মীয় ব্যবস্থায় বিন্দুমাত্র শেরক তথা এক আল্লাহর প্রভুত্বের বরখেলাফী থাকিবে তাহা সমস্ত নবীর তরীকার পরিপন্থী সাব্যস্ত হইবে, তাহাকে কোন নবীর তরীকা বা শরীয়তরূপে মনে করা বা দাবী করা অবাস্তব ও মিথ্যা হইবে। ধারাবাহিকরূপে নবীগণের আগমন অব্যাহত থাকিয়া সর্বশেষ নবী আগমনের পূর্বে দীর্ঘ ছয় শত বৎসরকাল নবী আগমন বন্ধ থাকা এবং সুদীর্ঘ সময় সেই অবশিষ্ট সর্বশেষ নবীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে যে, অট্টালিকা নির্মাতা ধারাবাহিকরূপে ইটের গাঁথুনি দ্বারা সুদৃশ্য অট্টালিকা তৈয়ার করিয়াছে, শুধু একখানা ইটের স্থান খালি রহিয়াছে, দর্শকগণ সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হওয়ার কামনা ও প্রতীক্ষায় রহিয়াছে!

অবশিষ্ট সর্বশেষ নবী যে স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-ই ছিলেন- দৃষ্টান্তে তাহা বুঝাইবার জন্য হযরত (সঃ) বলিতেছেন যে, ঐ অট্টালিকায় একটিমাত্র ইটের শূন্যস্থান পূরণকারী ইটখানা হইলাম আমি।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পর নবুয়তের সৌধ মধ্যে কাহারও প্রবেশের অবকাশই যে রহিল না, নবীগণের সারিতে দাঁড়াইতে পারে এমন আর কেহই যে বাকী থাকিল না, এই বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়া স্বীয় উম্মতকে প্রতারণার হাত হইতে রক্ষাকল্পে দৃষ্টান্ত দান শেষে হযরত (সঃ) বলিলেন, انا خاتم النبين আমি সর্বশেষ নবী।"

বোখারী শরীফ ৫০১ পৃষ্ঠায় একখানা হাদীছ পূর্বে অনূদিত হইয়াছে; উক্ত হাদীছখানা বোখারী শরীফ ৭২৭ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন ঃ

لِىْ خَمْسَةُ اَسْمَاءٍ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِىْ الَّذِىْ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِىْ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمَىَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ ـ

অর্থ ঃ হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, আমার বিশেষ পাঁচটি নাম আছে- "আমার নাম মুহাম্মদ, আহমদ এবং মাহী'- নিশ্চিহ্নকারী; আমার দ্বারা আল্লাহ তাআলা কুফুরীর মূল উৎপাটন করিবেন এবং আমার নাম হাশের- একত্রকারী; সমস্ত লোককে হাশরের মাঠে আমার পিছনে একত্রিত করা হইবে এবং আমার নাম "আ'কেব"। (মুসলিম শরীফ ২-২৬১পৃষ্ঠায় আলোচ্য হাদীছে এই নামটির তাৎপর্য উল্লেখ আছে যে, والعاقب الذى ليس بعده 'আ'কেব অর্থ সকলের পিছনে আগমনকারী- আমি এমন নবী যেই নবীর পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না।)

১৮১০। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৪৯১) আবু হযম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দীর্ঘ পাঁচ বছর আবু হোরায়রা (রাঃ) ছাহাবীর শিষ্যত্বে আমি রহিয়াছি। তাঁহাকে আমি এই হাদীছ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, হযরত নবী (সঃ) বলিয়াছেন, বনী ইস্রাঈলদিগকে নবীগণ পরিচালিত করিতেন- যখন এক নবীর মৃত্যু হইত তখনই তাঁহার স্থলে আর এক নবীর আবির্ভাব হইত, কিন্তু তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও, আমার পরে কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না, অবশ্য আমার স্থলে খলীফা বা কার্য পরিচালনকারী দাঁড়াইবে।

ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ সময়ের জন্য আপনি আমাদিগকে কি পরামর্শ দেন? হযরত (সঃ) বলিলেন, প্রথমে যেব্যক্তিকে তোমরা খলীফা নির্বাচিত করিবে তাহার প্রতি সমর্থন বজায় রাখিয়া চলিবে, অতপর তাহার পরে যাহাকে নির্বাচিত করিবে তাহার প্রতি- এইভাবে পর পর নির্বাচিত খলিফাগণের হক আদায় করিয়া যাইবে। (তাহাদেরও সতর্ক থাকিতে হইবে) স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাহাদের হইতে হিসাব লইবেন যে, তাহারা তোমাদের পরিচালন কার্য কিরূপ সমাধা করিয়াছিল।

১৮১১। হাদীছ ঃ (পৃঃ ৬৩৩) হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তবুকের জেহাদে যাইবার কালে তাঁহার স্থলে আলী (রাঃ)-কে মদীনার শাসনভার দিয়া রাখিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু আলী (রাঃ) জেহাদে যাওয়ার প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন, তাই তিনি মনঃক্ষুণ্নরূপে বলিলেন, আমাকে আপনি

(জেহাদে অক্ষম) শিশু ও নারীদের দলভুক্তরূপে ছাড়িয়া যাইতেছেন? তখন হযরত (সঃ) আলী (রাঃ)-কে সান্ত্বনা দানে বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, মূসা (রাঃ) যেরূপ হারুন (রাঃ)-কে তাঁহার স্থানে বসাইয়া আল্লাহর আদেশে তুর পর্বতে গিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি আমার স্থানে থাকিবে। অবশ্য (তুমি হারুন আলাইহিস সালামের ন্যায় নবুয়ত প্রাপ্ত হইবে না, কারণ) الا انه ليس نبى بعدى– "আমার পরে কেহ নবুয়ত পাইতে পারে না।"

১৮১২ হাদীছ ঃ (পৃঃ ১০৩৫) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নবুয়তের কোন অংশই বাকী নাই (যাহা কেহ লাভ করিতে পারে)। শুধু মোবাশশেরাত বাকী রহিয়াছে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মোবাশশেরাত কি জিনিস? তিনি বলিলেন, তাহা হইল সুস্বপ্ন।

ব্যাখ্যা ঃ নবীর নিকট নবুয়ত সংশ্লিষ্ট অনেক বস্তুই থাকে, যেমন– ওহী, আসমানী কিতাব, মোজেযা ইত্যাদি। এই শ্রেণীর মধ্যে সর্বাধিক নিম্নের বস্তু হইল "সুস্বপ্ন"।

বোখারী শরীফ ১০৩৬ ও ১০৩৯ পৃষ্ঠায় এক হাদীছে আছে–

رؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة ـ

অর্থ ঃ "মোমেনগণের সুস্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ" তথা এই বস্তুটি নবুয়ত সংশ্লিষ্ট বস্তুনিচয়ের শ্রেণীভুক্তই বটে, কিন্তু নিম্নস্তরের এবং বহু দূর সম্পর্কীয়। কোন হাদীছে ইহাকে সত্তর ভাগের এক ভাগও বলা হইয়াছে। দূর সম্পর্কটা বুঝানই উভয় হাদীছের উদ্দেশ্য।

আলোচ্য হাদীছের মর্ম এই যে, নবুয়ত সংশ্লিষ্ট বস্তুনিচয়ের মধ্যে একমাত্র এই দূর সম্পর্কীয় বস্তুটিই বাকী রহিয়াছে যাহা মোমেনেরই লাভ হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন নবুয়তের আর কোন অংশ বাকী নাই যাহা কেহ লাভ করিতে পারে। সুতরাং অন্য কাহারও নবুয়ত লাভের কোন অবকাশই নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ পয়গম্বর ছিলেন, তাঁহার পর কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না। এই সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীছ কয়টি শুধু বোখারী শরীফ হইতে উদ্ধৃত করা হইল। এতদ্ভিন্ন মুসলিম শরীফ ও সেহাহ্ সেত্তাহ্র অবশিষ্ট কিতাব এবং হাদীছ-তফসীরের অন্যান্য কিতাবে এত অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে যাহা দৃষ্টে বলিতে বাধ্য হইতে হয় এবং ইসলাম ও শরীয়ত বিশেষজ্ঞ সকলেই একমত হইয়া স্পষ্ট ফতওয়া দিয়াছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশেষ পয়গম্বর, তাঁহার পর আর কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই এবং কেয়ামত পর্যন্ত হইবে না– এই আকীদা বা দৃঢ় বিশ্বাস যদি কাহারও না থাকে এবং সে অন্য কাহাকেও নবীরূপে স্বীকার করে তবে সে নিঃসন্দেহে কাফের গণ্য হইবে; তাহাকে অমুসলিম বিধর্মী গণ্য করা সকল মুসলমানের পক্ষে ফরয।

স্বয়ং হযরত (সঃ)ও এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছেন, যাহার কারণও তিনি এক হাদীছে উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছটি বোখারী শরীফ ১০৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। হাদীছটি সুদীর্ঘ, তাহাতে এই অংশটুকু রহিয়াছে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبٌ مِنْ ثَلٰثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে এমন এমন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হইবে যাহারা পয়গম্বর হইবার দাবী করিবে; তাহাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হইবে। এইসব প্রতারক হইতে সতর্ক করার উদ্দেশেই নবী (সঃ) এইরূপ ঘোষণা শুনাইয়া থাকিতেন, "আমি সর্বশেষ পয়গম্বর, আমার পরে কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না।"

রহমাতুল লিলআলামীন

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"আমি আপনাকে বিশ্ব কল্যাণ, বিশ্ব মঙ্গল ও সারা বিশ্বের জন্য করুণারূপে পাঠাইয়াছি।"

সারা জাহান আল্লাহর সৃষ্ট, নবীজীও আল্লাহর সৃষ্ট; সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলাই বলিয়াছেন– নবীজী মোস্তফা (সঃ)-কে তিনি সারা জাহানের জন্য মঙ্গল ও করুণারূপে পাঠাইয়াছেন। এই তথ্যের সৃষ্টিগত রহস্য নিশ্চয় কিছু রহিয়াছে এবং সেই রহস্যই বড় কারণ নবীজীকে রহমতুল লিল আলামীন আখ্যা দেওয়ার। এতদ্ভিন্ন নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দেওয়া শাসন ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবন ব্যবস্থায় যেসব শিক্ষা, নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন হইয়াছে সেই সব শিক্ষা নীতি এবং আদর্শ কল্যাণের জন্য মহাদান। তাহার অনুসরণ অনুকরণে অমুসলিমরা জাগতিক কল্যাণ লাভে ধন্য হইতে পারে।

নবীজীর হাজার হাজার হাদীছের মধ্যে ঐসব শিক্ষা, নীতি ও আদর্শের বর্ণনা রহিয়াছে। নমুনাস্বরূপ আমরা ঐ সবের সামান্য আলোচনা করিতেছি।

কল্যাণ ও মঙ্গলময় শাসন ব্যবস্থা দানে রহমতুল লিলআলামীন

১। নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার মহান আদর্শ–

মঙ্গল ও কল্যাণময় শাসন ব্যবস্থার সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হইল মানুষের ত্রিবিধ নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ। সেই বিষয়ে নবীজীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল অতুলনীয়। তৎকালীন মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সমাবেশ– বিদায় হজ্জে লক্ষাধিক মুসলমনের উপস্থিতিতে নীতি নির্ধারণী ভাষণে নবীজী (সঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন– "মানুষের জান-মাল, আবরু-ইজ্জত, এমনকি তাহার চামড়াটুকুও সুরক্ষিত থাকিবে; পরস্পর কাহারও দ্বারা তাহার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হইতে পারিবে না।"– রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকিবে প্রতিটি মানুষের এই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২। সাম্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ–

পূর্বোল্লিখিত মৌলিক অধিকার ও নাগরিকত্বের সুযোগ-সুবিধা ভোগে এবং ইনসাফ ও ন্যায়বিচার লাভে সকলে সমান অধিকারী।

বিদায় হজ্জের সমাবেশেই নবীজী (সঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন– সকল মানুষের আদি পিতা এক আদম; অতএব মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারে সকলে সমান পরিগণিত হইবে। আরবি এবং অ-আরবি, সাদা এবং কালোর মধ্যে কোন পার্থক্য হইবে না।

আভিজাত্যের গর্বে নবীজীর নিজ বংশ কোরায়শ গোত্র সর্বাগ্রে ছিল। তাই মক্কা বিজয়ের ভাষণেও নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অভিজাত-অনভিজাত, উচ্চ-নীচ ইত্যাদির ব্যবধানে যে বিচার পার্থক্য প্রচলিত ছিল তাহার উচ্ছেদ ঘোষণা করিয়া বিচারে সকলকে সমান সাব্যস্ত করিয়াছিলেন (তৃতীয় খণ্ড মক্কা বিজয় দ্রষ্টব্য)।

৩। সংখ্যালঘুর প্রতি অসীম উদারতা এবং তাহাদের স্বার্থ রক্ষা ও নাগরিকত্বের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দানের নিশ্চয়তা বিধান–

নবী (সঃ) ঘোষণা দিয়াছেন– যেব্যক্তি কোন অমুসলিম অনুগত নাগরিককে অত্যাচার করিবে বা তাহার প্রাপ্য কম দিবে কিম্বা তাহার উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করিবে অথবা তাহার মন তুষ্টি ছাড়া তাহার কোন বস্তু হস্তগত করিবে; ঐরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি কেয়ামত দিবসে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদী হইব।

(মেশকাত শরীফ, ৩৫৪)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, অমুসলিম অনুগত নাগরিককে যে মুসলমান হত্যা করিবে সে বেহেশতের গন্ধও পাইবে না। (বোখারী শরীফ ১০২১)।

৪। নিরাশ্রয়, অসহায়, এতিম বিধবা– নিঃস্বদের প্রতিপালনে রাষ্ট্রের উপর ব্যাপক দায়িত্ব অর্পণ। কথায় বা কলমে অর্পণই নহে শুধু, স্বয়ং নবীজী (সঃ) ঐ দায়িত্ব বহন করিয়াছেন এবং সকল রাষ্ট্রনায়কের উপর তাহা বর্তাইয়া গিয়াছেন।

যেব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করিয়া বা পরিশোধের ব্যবস্থাও না রাখিয়া মরিয়া যাইত, প্রথম দিকে নবীজী (সঃ) তাহার জানাযার নামায নিজে পড়িতেন না। অতপর বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী ভাষণে নবীজী মোস্তফা (সঃ) এক যুগান্তকারী ঘোষণা প্রদান করিলেন, من ترك دينا اوضياعا فعلى যেকোন অসহায় ব্যক্তি প্রাণ বাঁচাইবার তাগিদে ঋণ করিয়া তাহা পরিশোধে অক্ষম অবস্থায় মরিয়া যাইবে কিম্বা নিরাশ্রয় এতিম বিধবা রাখিয়া যাইবে তাহার সেই ঋণ পরিশোধ করা এবং এতিম বিধবার প্রতিপালন রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে আমার জিম্মায় থাকিবে। বায়তুল মাল সরকারী ধনভাণ্ডারের প্রথম ব্যয় বরাদ্দই ইহা। (বোখারী শরীফ)

৫। জনগণের শিক্ষা-দীক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত। নবী (সঃ) বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রনায়ক যে জনগণের শাসক হইয়াছে সে জনগণকে পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে; জনগণের সম্পর্কে সে দায়ী থাকিবে। (বোখারী)

৬। ক্ষমতাসীন হইয়া জনগণের প্রয়োজনের আড়ালে থাকিতে পারিবে না–

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, মুসলমান জনসাধারণের শাসনক্ষমতায় সমাসীন হইয়া যেব্যক্তি তাহাদের অভাব-অভিযোগ হইতে আড়ালে থাকিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার অভাব-অভিযোগ হইতে আড়ালে থাকিবেন (মেশকাত শরীফ, ৩২৪)

বোখারী শরীফে আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দারোয়ান ছিল না–

৭। শাসন পরিচালকদের ন্যায়নিষ্ঠা হইতে হইবে।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি দশজন লোকের উপর ক্ষমতাধিকারী ছিল তাহাকেও কেয়ামত দিবসে গলবদ্ধ শৃঙ্খলে বাঁধা অবস্থায় হাশর মাঠে উপস্থিত হইতে হইবে। অতপর হয় তাহার ন্যায়পরায়ণতা তাহাকে মুক্ত করিবে, না হয় তাহার অত্যাচার-অবিচার তাহাকে ধ্বংসের নরকে পতিত করিবে। (মেশকাত ৩২১)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে আল্লাহর অধিক নৈকট্য লাভকারী ভালবাসার পাত্র হইবে ন্যায়পরায়ণ শাসক। আর সর্বাধিক গজবের পাত্র এবং আযাবে পতিত হইবে অত্যাচারী শাসক। (ঐ ৩২২)

৮। শাসকদের কর্তব্য জনগণের আস্থাভাজন ও প্রিয় হওয়া–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, উত্তম শাসক তাহারা যাহাদিগকে জনগণ ভালবাসে এবং তাহাদের জন্য দোয়া করে, তাহারাও জনগণকে ভালবাসে এবং তাহাদের জন্য দোয়া করে। আর নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত শাসক তাহারা যাহাদের প্রতি জনগণ বিদ্বেষ পোষণ করে এবং অভিশাপ করে, তাহারাও জনগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং অভিশাপ করে। (মেশকাত শরীফ ৩১৯)।

৯। ক্ষমতায় থাকিয়া জনগণের কল্যাণ মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ক্ষমতাসীন হইয়া যেব্যক্তি জনগণকে তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের সহিত প্রতিপালন না করিবে সে বেহেশতের গন্ধও পাইবে না। (বোখারী শরীফ)

১০। ক্ষমতা লাভ করিয়া জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি শাসক হইয়া জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকরূপে মরিবে, আল্লাহ তাহার জন্য বেহেশত হারাম করিয়া দিবেন। (মেশকাত শরীফ ৩২১)

১১। ক্ষমতা লাভ করিলে সতর্ক থাকিবে যেন জনগণের জীবন-মান সঙ্কীর্ণ না হয়–

নবী (সঃ) এই দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ! যেব্যক্তি আমার উম্মতের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহাদের জীবন সঙ্কীর্ণ করিয়া তোলে, তুমি ঐ ব্যক্তির জীবন সঙ্কীর্ণ করিয়া দাও। আর যেব্যক্তি ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহাদের জীবন যাপন সহজ করিয়া তোলে তুমি তাহার সব কিছু সহজ করিয়া দাও। (মেশকাত শরীফ, ৩২১)

কত শাসক নির্বাসিত বা কারাগারের জীবন যাপনে বাধ্য হয়। কত শাসক সবংশে ধ্বংস হইয়া যায়; জীবন সঙ্কীর্ণ হওয়ার পরিণাম ইহজগতে এই, পরকালে আরও যে কত সঙ্কীর্ণ হইবে!

১২। কোন শাসক বা আমলা সরকারী ধন অন্যায়ভাবে ব্যয় করিবে না–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, কোন কোন লোক আল্লাহর তথা জনগণের সরকারী মালের অন্যায় ব্যবহার করে; কেয়ামত দিবসে তাহাদের জন্য নরক নির্ধারিত। (বোখারী শরীফ)।

১৩। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেরও সরকারী ধন নির্ধারিত পরিমাণের বেশী ব্যয় করা হারাম।

১৪। শাসক প্রশাসকদের অবশ্যই সরল-সহজ, ভোগ-বিলাসবিহীন, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে হইবে।

নবী (সঃ) ছাহাবী মোআয (রাঃ)-কে ইয়ামান দেশের গভর্নর পদে নিযুক্ত করিয়া বিদায়কালীন উপদেশ দানে বলিয়াছিলেন– বিলাসিতার জীবন যাপন সযত্নে পরিহার করিয়া চলিবে। আল্লাহ ভক্ত লোক বিলাসপ্রিয় হয় না। (মেশকাত শরীফ, ৪৪৯)

নবী (সঃ) মোআয (রাঃ)-কে ইয়ামনের গভর্নর মনোনীত করিলেন। তিনি যাত্রা করার পর নবী (সঃ) সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করাইলেন এবং বলিলেন, আমার অনুমতির বাহিরে কোন কিছু করিবে না। ঐরূপ ব্যয় খেয়ানত বা আত্মসাত গণ্য হইবে এবং কেয়ামত দিবসে ঐ খেয়ানতের বোঝা ঘাড়ে করিয়া হাশর মাঠে উপস্থিত হইতে হইবে। এই সতর্কবাণীর জন্য প্রত্যাবর্তন করাইয়াছিলাম; এখন নিজ কার্যস্থলে যাত্রা কর। (মেশকাত শরীফ)

১৫। রাষ্ট্রপ্রধান হইয়াও ব্যক্তিগত জীবনমানের উপরই চলিবে, নিজ অবস্থার ঊর্ধ্বে ভোগ-বিলাসে রাষ্ট্রের ধন ব্যয় করিবে না–

নবীজীর গোটা জীবনই উক্ত আদর্শের মহাগ্রন্থ ছিল। তাঁহার বাসস্থান খেজুর গাছের খুঁটীও আড়ায় তৈয়ার। ছিল। এত সঙ্কীর্ণ ছিল যে, তিনি তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়াইলে বিবি আয়েশা (রাঃ) শায়িত অবস্থায় সম্মুখে থাকিতেন, তাঁহার পা গুটাইলে নবী (সঃ) সেজদা করিতে পারিতেন। এতটুকু মাত্র উঁচু ছিল যে, ১২/১৪ বৎসরের বালকের হাত সেই ঘরের ছাদ পর্যন্ত পৌঁছিত। দরজায় লোমের চট লটকানো ছিল। তাঁহার গৃহের উনুনে মাসেককাল পর্যন্ত আগুন জ্বলিত না; পরিবারবর্গ খেজুর ও পানির উপর জীবন যাপন করিতেন। যখন রুটি জুটত বেশীর ভাগ যবেরই হইত, গমের রুটি এবং গোশ্‌ত কমই হইত; পাতলা চাপাতি রুটি কখনও গৃহে তৈয়ার হইত না। কাপড়ে নিজ হাতে তালি লাগাইতেন, ছেঁড়া জুতা নিজ হাতে সেলাই করিতেন।

এইরূপে সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের হাজার নজির নবীজীর জীবনে রহিয়াছে। অথচ নবীজী (সঃ) রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, তাঁহার হস্তে কত কত বিজয় লাভ হইয়াছে। লক্ষ কোটি টাকা সরকারী আয় তাঁহারই হাতে বণ্টিত ও ব্যয়িত হইয়াছে। সব তিনি জনগণের মধ্যে ব্যয় করিয়াছেন। ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ নং আদর্শাবলীর বদৌলতেই ৪ নম্বরে বর্ণিত যুগান্তকারী ঘোষণা ও বিধানটি বাস্তবায়িত করা শুধু সম্ভবই নয়, বরং সহজ হইয়াছিল। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাহারই অনুপাতে আমলাগণের মাথাভারী ব্যয়বহুল

প্রতিপালনে সরকারী ধনভাণ্ডার খালি হইয়া যায়, তাই ৪ নং বিধানের অবকাশ স্বপ্নে দেখাও ভাগ্যে জুটে না।

১৬। রাষ্ট্রপ্রধান হইয়াও রাষ্ট্রীয় কার্যে সকলের সহিত কাঁধে কাঁধে মিলাইয়া, সকলের সুখে-দুঃখে সমভাবে শরীক থাকিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

নবীজী মোস্তফা (সঃ) খন্দকের জেহাদে মাসেককাল পর্যন্ত পরিখা খননে শরীক রহিয়াছেন। জরুরী অবস্থার ভয়াবহতায় অনাহারী থাকিতে হইয়াছে, ফলে কোমর শক্ত রাখার জন্য পেটে পাথর বাঁধিতে হইয়াছে; ছাহাবীগণ এক একটি পাথর বাঁধিয়াছেন, আর নবীজী (সঃ)-কে দুইটি পাথর বাঁধিতে হইয়াছে। জাবের (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ীতে গোপনে দাওয়াত লাভ করিয়াছেন, কিন্তু একা না খাইয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া দাওয়াত খাইতে গিয়াছেন। (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে খন্দকের জেহাদ দ্রষ্টব্য।) রহমতুল লিলআলামীনের কিঞ্চিত মাত্র তাৎপর্য ইহা।

১৭। দেশ রক্ষায় বিপদসঙ্কুল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মদান অগ্রভাগে থাকিতে হইবে।

একদা রাত্রি বেলা মদীনা শহরের নিকটে একটি ভীতিজনক শব্দ শ্রুত হইল। শহরের লোকজন ঘটনার অনুসন্ধানে যাইবে, কিন্তু শত্রুর আক্রমণের শব্দ কিনা সেই ভয়ে তাহারা লোকজন জমা করিয়া যাত্রা করিল! এদিকে নবীজী (সঃ) ঐ শব্দ শুনার সঙ্গে সঙ্গে একাই তরবারি কাঁধে ঝুলাইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক সমগ্র শহরতলী এলাকা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। সকলকে সান্ত্বনা দিলেন যে, তোমাদের যাইতে হইবে না, আমি সর্বত্র দেখিয়া আসিয়াছি, ভয়ের কোন কারণ নাই।

ওহুদ এবং হোনায়ন রণাঙ্গনে নবীজীর ভূমিকা উন্নয়নকামী জাতির রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য সোনালী আদর্শরূপে চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। (তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য)

১৮। রাষ্ট্রপ্রধান সর্বক্ষেত্রে প্রশাসক ও আমলাগণকে সততা, শান্তি ও ন্যায়ের জন্য তাগিদ করিবে। এমনকি যুদ্ধ-জেহাদের সামরিক অভিযান ক্ষেত্রেও–

নবী (সঃ) জেহাদ অভিযানে সৈন্য বাহিনীর বিদায় মুহূর্তে এই উপদেশ দিতেন– "আল্লাহর সাহায্য কামনা করিয়া আল্লাহর দ্বীনের জন্য জেহাদ করিও। আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিও। কোন কিছু আত্মসাত করিও না, বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, নাক-কান কাটিয়া শত্রুকে যাতনা দিও না, শিশু হত্যা করিও না। (মেশকাত)

১৯। যুদ্ধের জরুরী অবস্থায়ও শান্তির জন্য এবং সত্য বুঝিবার সুযোগদানে শত্রুর প্রতি উদার থাকার আদর্শ ত্যাগ করিতে নাই। শত্রুর নিধন অপেক্ষা সংশোধনকে অগ্রগণ্য করিবে–

খায়বর যুদ্ধে প্রায় মাসেককাল ভীষণ যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার পর চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য যখন আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হস্তে নবীজী (সঃ) পতাকা অর্পণ করিতেছিলেন, সেই মুহূর্তে আলী (রাঃ) দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দানে শত্রুর উপর দ্রুত ঝাঁপাইয়া পড়ার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে রহমতুল লিলআলামীন নবজী মোস্তফা (সঃ) আলী (রাঃ)-কে তাঁহার মনোভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, ধীরস্থিররূপে অগ্রসর হইবে, শত্রুর অবস্থানের নিকট পৌঁছিয়া তাহাদের নিকট ইসলাম পেশ করিবে। তাহা গ্রহণ না করিলে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য গ্রহণের প্রস্তাব করিবে। তাহাতেও কর্ণপাত না করিলে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। তখনও স্মরণ রাখিবে– তোমার উসিলায় আল্লাহ তাআলা একটি মাত্র ব্যক্তিকেও সৎপথ দান করিলে তাহা তোমার জন্য সর্বোচ্চ সম্পদ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের কারণ হইবে (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ড ১৩৪৭ নং হাদীছে)।

২০। শান্তির খাতিরে শত্রুর সহিতও আপোষ মীমাংসায় চরম ধৈর্য ও পরম উদারতা অবলম্বন করিবে–

এই বিষয়ে নবীজী (সঃ) যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার নজির ইতিহাসে বিরল। হোদায়বিয়া সন্ধি উপলক্ষে বিরাট শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হইয়াও নবীজী (সঃ) শত্রু পক্ষের অন্যায় জেদের সম্মুখে উদারতা ও

ধৈর্য-সহিষ্ণুতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন– যাহা শুধু শান্তির জন্য, আপোষের জন্য ছিল।

হিজরতের ছয় বৎসর পর যখন খন্দকের যুদ্ধে ইসলাম ও মুসলমানদের অগ্রযাত্রায় শত্রু শিবির ধসিয়া পড়ার পথে ছিল এবং ইসলাম শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, নবীজীর সঙ্গে প্রায় পনর শতের আত্মোৎসর্গকারী দল ছিল যাঁহাদের মাত্র তিন শতই বদর রণাঙ্গণে মক্কাবাসীদের চরমভাবে পরাজিত ও পর্যদুস্ত করিয়াছিল, নবীজীর সঙ্গে এত বড় শক্তি; তিনি ঐ পনর শত লোক লইয়া আল্লাহর ঘর যিয়ারত উদ্দেশে তিন শত মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতঃ মক্কার সন্নিকটে মাত্র নয় মাইল ব্যবধানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন মক্কাবাসীরা এমতাবস্থায় আল্লাহর ঘর যিয়ারতে তাঁহাকে বাধা দিল– অগ্রসর হইতে দিবে না। এই চরম উত্তেজনার মুহূর্তে শান্তির নবী রহমতুল লিল আলামীন দৃঢ় কণ্ঠে শপথের সহিত ঘোষণা করিলেন– আল্লাহর স্মৃতিসমূহের সম্মান ক্ষুণ্ন না হয় এরূপ যেকোন শর্ত তাহারা আরোপ করিবে আমি মানিয়া লইব।

যেমন ঘোষণা তেমন কার্য– সন্ধিপত্র লিখিতে বিসমিল্লাহ লেখায়, "রসূলুল্লাহ" লেখায় আপত্তি; সব আপত্তিই মানিলেন! তিন শত মাইলের পরিশ্রম নিষ্ফল করিয়া আল্লাহর ঘর যিয়ারত ছাড়াই প্রত্যাবর্তনের শর্ত সহ আরও অনেক অবাঞ্ছিত শর্ত মানিয়া লইলেন, তবুও মক্কাবাসীদের সহিত দশ বৎসর মেয়াদের "যুদ্ধ নহে" শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে)।

২১। আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য গড়িয়া তোলা ও বজায় রাখার আদর্শে সচেষ্ট থাকিবে–

বিদেশী প্রতিনিবৃন্দ এবং কূটনৈতিক মিশনসমূহের সদস্যগণকে নবীজী (সঃ) সম্মান ও প্রীতির উপহার দিয়া থাকিতেন। এমনকি মৃত্যুশয্যায় নবী (সঃ) মুসলিম জাতিকে যেসব উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে ইহাও ছিল যে, "আমি যেরূপ বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দকে উপহার দিয়া থাকিতাম তোমরাও সেইরূপ উপহার দিও।

২২। ক্ষমতার সর্বোচ্চে থাকিয়াও নিজ ব্যাপারে ক্ষমার আদর্শ পালন করিবে–

এ বিষয়ে নবী (সঃ)-এর অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান রহিয়াছে। একবার এক জেহাদের সফরে বিশ্রাম নেওয়ার অবস্থায় নবীজী (সঃ) সঙ্গীগণ হইতে ভিন্ন একা এক বৃক্ষের ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার তরবারি লটকাইয়া রাখিয়াছিলেন এক বেদুঈন কাফের এই সুযোগে নবীজীর তরবারিটি হস্তগত করিয়া নবীজীর উপর তাহা তুলিয়া ধরিল। এমতাবস্থায় নবীজীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, চোখ খুলিয়া তাঁহার উপর তরবারি ধরা দেখিতে পাইলেন। বেদুঈন হুঙ্কার মারিয়া নবীজী (সঃ)-কে প্রশ্ন করে, আপনাকে আমা হইতে কে রক্ষা করিতে পারে? নবীজী (সঃ) গম্ভীর স্বরে বলিলেন, আল্লাহ। এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হস্তে কম্পন সৃষ্টি হইয়া বেদুঈনের হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। নবীজী (সঃ) তরবারি হাতে লইয়া ছাহাবীগণকে ডাকিলেন এবং বেদুঈনকে দেখাইয়া ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। এত বড় ঘটনা, কিন্তু নবী (সঃ) বেদুঈনকে ক্ষমা করিয়া দিলেন (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ১৪৮৭ নং হাদীছ)।

২৩। ক্ষমতার প্রতাপে অন্যায়-অত্যাচার কখনও করিবে না।

ইয়ামান দেশের গভর্নররূপে নবী (সঃ) মোআয (রাঃ)-কে নিয়োগ করিয়া বিদায়কালে উপদেশ দানে বলিলেন, কাহারও প্রতি অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম করিয়া তাহার বদ দোয়ার পাত্র হইও না। মজলুমের বদ দোয়া সরাসরি আল্লাহ তাআলার দরবারে পৌঁছিয়া থাকে। (বোখারী শরীফ)

২৪। যুদ্ধর ক্ষেত্রেও মানুষকে বাঁচিবার যথাসাধ্য সুযোগ দিবে–

মক্কা বিজয়ের সময় শহর হইতে ১২/১৪ মাইল দূর রাত্রি যাপন করিয়া শহরে প্রবেশের জন্য যাত্রাকালে নবীজী (সঃ) তাঁহার দশ সহস্র সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন– আক্রান্ত না হইয়া আক্রমণ করিও না এবং নিরাপত্তার দ্বার অনেক সূত্রে খুলিয়া দিলেন। যথা– (১) যে অস্ত্র সমর্পণ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, (২) যে গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, (৩) যে মসজিদে আশ্রয় লইবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, (৪) যে আবু সুফিয়ান সর্দারের গৃহে আশ্রয় নিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা। (তৃতীয় খণ্ডে মক্কা বিজয় দ্রষ্টব্য)

২৫। বিজিতদের উপর বিগত আক্রোশে প্রতিহিংসা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে উদার নীতি গ্রহণ করিবে–

মক্কা বিজয়ের দিনই দীর্ঘ ২১ বৎসরে জালেম শত্রুদের প্রতি নবীজী (সঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন– "তোমাদের কাহারও প্রতি কোন অভিযোগ নাই; তোমরা মুক্ত।"

২৬। চরম বিজয়ী হইয়াও পরম বিনয়ী থাকার মহান আদর্শ পালন করিবে–

মক্কা বিজয় নবীজীর জন্য মহাবিজয় ছিল, এই ক্ষেত্রেও তিনি এতই বিনয়ী ছিলেন যে, শহরে প্রবেশ কালে তিনি নতশিরে প্রবেশ করিয়াছেন। এমনকি তাঁহার নাক বাহনের পৃষ্ঠে ঘর্ষণ খাইতেছিল।

২৭। আইনের শাসন প্রয়োগে স্বজনপ্রীতির বিপরীত স্বজনদের উপর সর্বাগ্রে আইন প্রয়োগ করিতে হইবে

এই আদর্শে নবীজীর কার্যক্রম ছিল অতুলনীয়। বিদায় হজ্জের ভাষণে অন্ধকার যুগের রীতি নীতির উচ্ছেদ এবং ইসলামী আইনের প্রবর্তন ঘোষণায় যখন তিনি বলিতেছিলেন– বংশ, গোত্র বা অঞ্চল হিসাবে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত ও বেআইনী হইল, হত্যাকারী ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাইবে না; তখন দৃঢ়কণ্ঠে তিনি এই ঘোষণাও করিলেন, আমার বংশ কোরায়শদের একটি খুনের প্রতিশোধ প্রাপ্য রহিয়াছে বনু হোযায়েল গোত্রের উপর। ইসলামের আইন প্রয়োগে সর্বপ্রথম ঐ প্রতিশোধ গ্রহণ বাতিল ঘোষিত হইল।

তদ্রূপ সুদ বাতিল ঘোষণা প্রচারের সঙ্গে নবীজী (সঃ) দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, আমার পিতৃব্য আব্বাসের সুদী ব্যবসার সমুদয় সুদ সর্বপ্রথম বাতিল ঘোষিত হইল (দ্বিতীয় খণ্ড বিদায় হজ্জের ভাষণ দ্রষ্টব্য)।

২৮। আইনের বিচারে আপন-পর সকলকে এক দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, ন্যায়বিচারে আপনাদের বেলায় কঠোর থাকিতে হবে।

মক্কা বিজয়লগ্নে কোরায়শ বংশীয় এক রমণীর উপর চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হইল। ইসলামী আইনের বিচারে তাহার হাত কর্তনের ভয়ে কোরায়শগণ বিচলিত হইল; নবীজীর নিকট সুপারিশ পাঠাইল। সেই সুপারিশ প্রত্যাখ্যানে নবীজী (সঃ) জনসমাবেশে ভাষণ দিলেন এবং বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন– মুহাম্মদ তনয়া ফাতেমার উপরও যদি চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হয়, খোদার কসম বিনা দ্বিধায় আমি তাহার হাত কাটিয়া দিব।

২৯। ভোট দান, মনোনয়ন দান ইত্যাদি রাজনৈতিক নির্বাচনে সমর্থন ব্যক্তিগত স্বার্থ, আশা ও লোভ লালসার ভিত্তিতে করিবে না–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি শাসক নির্বাচনে ভোট বা সমর্থন দেয় নিজ স্বার্থের উদ্দেশে– তাহার স্বার্থ পূরণ করিলে সমর্থন বজায় রাখে, নতুবা সমর্থন প্রত্যাহার করে; এইরূপ ব্যক্তির উপর কেয়ামত দিবসে ভয়াবহ আযাব হইবে। আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি নেক দৃষ্টি করিবেন না; তাহার গোনাহ মাফ করিবেন না।

৩০। রাষ্ট্রের ও শাসন কর্তৃপক্ষের আনুগত্যে সংহতি বজায় রাখিবে–

নবীজী (সঃ) মুসলমানদের হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন– নরমে-গরমে, আনন্দে, নিরানন্দে– সর্বাবস্থায়, এমনকি নিজের অপেক্ষা অন্যের অধিক সুযোগ সুবিধা দেখিয়াও রাষ্ট্রের অনুগত থাকিবে এবং যোগ্য ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইবে না। সর্বক্ষেত্রে সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকিবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কাজে কাহারও নিন্দা-মন্দের পরোয়া করিবে না। (বোখারী শরীফ)

৩১। অন্যায় অত্যাচার ও নৈতিকতার বিপরীত– সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীর কাজে রাষ্ট্রকেও জনগণ সমবেতভাবে বাধা দান করিবে।

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর নাফরমানীর কাজে রাষ্ট্রের আনুগত্য চলিবে না। রাষ্ট্রের আনুগত্য শুধু মাত্র বৈধ কার্যে। (বোখারী শরীফ)

৩২। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট করিবে না–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, শাসন কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে নিজের না পছন্দ কোন কিছু দেখিলে ধৈর্য ধরিবে– সংহতি নষ্ট করিবে না। যেকোন ব্যক্তি সুসংহত ব্যবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইবে, তাহার জীবন অন্ধকার যুগের অনৈসলামিক জীবন হইবে। (মেশকাত শরীফ, ৩১৯)

৩৩। ক্ষমতাসীনদের অপকর্মে সমর্থন দিবে না; তাহা জঘন্য পাপ–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, পরবর্তী যুগে নানারকম শাসক হইবে, যাহারা সেই শাসকদের নৈকট্যের জন্য তাহাদের মিথ্যাকে সত্য বলিবে, তাহাদের অন্যায়ের সমর্থন করিবে– ঐ শ্রেণীর লোক আমার উম্মত হইতে খারিজ। তাহাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই; হাউজে কাওসারের পানি তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে না। (মেশকাত, ৩২২)

৩৪। শাসন ক্ষমতায় আসিবার জন্য নিজে উদ্যোগী হইবে না–

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, শাসন ক্ষমতা নিজে চাহিয়া লইও না, অন্যথায় আল্লাহর সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকিবে। নিজের চেষ্টা ছাড়া তাহা তোমাকে অর্পণ করা হইলে তাহা পরিচালনায় আল্লাহর সাহায্য পাইবে। (বোখারী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, তোমরা শাসন ক্ষমতা লাভে লালায়িত হইবে, কিন্তু কেয়ামত দিবসে তাহা বিষম অনুতাপের কারণ হইবে। এতদ্ভিন্ন শাসন ক্ষমতার আরম্ভ অতি মিষ্ট; কিন্তু তাহার পরিণাম অতি তিক্ত। (বোখারী শরীফ)

৩৫। শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য ছুটাছুটির প্রবণতা নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে শাসন ক্ষমতাকে নিজের জন্য তিক্ত গণ্য করে; অবশ্য যদি তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। (বোখারী শরীফ)

৩৬। শাসকর্তাদের সম্বর্ধনা ও মানপত্রদান ইত্যাদি প্রবণতা বাঞ্ছনীয় নহে। ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। (বাখারী শরীফ, পৃষ্ঠা– ১০৬৪)

৩৭। শাসনকর্তাদের উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা চাই না– তাহা ভোগ করিতে পারিবে না। (বোখারী শরীফ)

৩৮। আইন প্রয়োগ এবং শাসন পরিচালনায় কঠোরতা এড়াইয়া সহজ পন্থার এবং আইনের প্রতি জনগণকে বিতশ্রদ্ধ না করিয়া আকৃষ্ঠ করার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

নবী (সঃ) কাহারও উপর ক্ষমতা অর্পণ করিলে তাহাকে উপদেশ দিতেন, আইনের প্রতি লোকদেরকে আকৃষ্ঠ করিও তাহাদের মধ্যে ভয়-ভীতির নঞ্চার করিও না। সহজ পন্থার ব্যবস্থা করিও, কঠোরতা অবলম্বন করিও না। (বোখারী শরীফ)

৩৯। শুধু আইনের শাসন চালাইবে না, উপদেশদানে অধিক তৎপর থাকিবে।

নবী (সঃ) বাদী-বিবাদী উভয়কে সুস্পষ্ট ভাষায় উপদেশদানে বলিতেন, আমি তোমাদের বর্ণনা শুনিয়া বিচার করিব; হয়ত তোমাদের একজন অধিক বাকপটু (সে মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পায়।)

জানিয়া রাখিও বিবরণের উপর বিচারে অপরের হক্ব পাইয়া ফেলিলেও উহা তাহার জন্য দোযখের অগ্নি হইবে (ইহা কখনও ভোগ করিবে না।) বোখারী শরীফ)

৪০। শাসনকার্য পরিচালনায় প্রশাসকদের পরস্পর সহযোগিতা প্রয়োজন, বিভেদ সৃষ্টি করিবে না।

নবী (সঃ) ইয়ামান দেশের দুই অঞ্চলে বা দুই শাখায় দুই জন প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার বিদায়ী উপদেশে বলিয়া দিলেন– তোমরা পরস্পর সহযোগিতার সহিত কাজ করিবে, বিরোধ-বিভেদ সৃষ্টি করিবে না। (বোখারী শরীফ)

কল্যাণ ও মঙ্গলময় শাসন ব্যবস্থার এইরূপ শত শত শিক্ষা ও আদর্শ নবী (সঃ) দান করিয়াছেন– যাহার অনুসরণে অমুসলিমরাও জাগতিক কল্যাণ লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহা এড়াইয়া মুসলমানগণ অবনতির গহ্বরে পতিত হইয়াছে।

কল্যাণ ও মঙ্গলময় সমাজ ব্যবস্থা দানে রহমতুল লিল আলামীন

সুখ-শান্তির সমাজ, উন্নত ও প্রগতিশীল সমাজ, কল্যাণ ও মঙ্গলের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বিশেষ প্রয়োজন হয় সমাজের লোকদের মধ্যে সদ্ভাব-সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব, একতা ও শৃঙ্খলা, পরস্পর সহযোগিতা ও সাহায্য-সহায়তা। আরও প্রয়োজন হয় কনিষ্ঠদের উপর জ্যেষ্ঠদের প্রভাব, কনিষ্ঠদের প্রতি জ্যেষ্ঠদের স্নেহ মমতা এবং শ্রেণীগত বিভেদের মূল উচ্ছেদ। আর বিশেষভাবে প্রয়োজন হয় সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং জ্ঞান বিস্তারের সুব্যবস্থা। সুতরাং সুখের সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সমাজের লোকজনকে ঐসব গুণের শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহাদিগকে নরমে-গরমে ঐসব গুণের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে, ঐসব গুণে গুণান্বিতরূপে তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই পথে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যেসব শিক্ষা ও আদর্শ রহিয়াছে তাহা শুধু বিরলই নহে, বিশ্ব তাহা হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞও ছিল। নমুনাস্বরূপ আমরা তাঁহার ঐ শ্রেণীর শিক্ষা ও আদর্শের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করিতেছি।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– নবীজী (সঃ) কাহারও প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধে কখনও দুর্ব্যবহার করিতেন না, বরং কেহ দুর্ব্যবহার করিলে তাহা ক্ষমা করিতেন এবং অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিতেন। (তিরমিযী শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, নিঃসহায় এবং এতীম বিধবাদের সহতায়তাকারী ঐ ব্যক্তির সমতুল্য, যে আল্লাহর পথে জেহাদ করে বা সারা রাত্র নামায পড়ে, প্রতিদিন রোযা রাখে।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি অপর মুসলমানের প্রয়োজন মিটাইবে। আল্লাহ তাহার প্রয়োজন মিটাইবেন। যেব্যক্তি অপর মুসলমানের একটি দুঃখ দূর করিবে, আল্লাহ কেয়ামত দিবসে তাহার অনেক দুঃখ দূর করিবেন। যেব্যক্তি অপর মুসলমানের মান-ইজ্জত রক্ষা করিবে, আল্লাহ তাহার মান-ইজ্জত রক্ষা করিবেন। (বোখারী)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যাহার হইতে ভালর আশা করা যায় এবং মন্দের ভীতি না থাকে, সেই উত্তম মানুষ। পক্ষান্তরে যাহার হইতে ভালর আশা না থাকে এবং মন্দের আশঙ্কা থাকে, সেই খারাপ মানুষ। (তিরমিযী শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, মুসলমানদের পরস্পর ছয়টি দাবী– (১) সাক্ষাতে সালাম করিবে, (২) আহ্বানে সাড়া দিবে, (৩) সাহায্যপ্রার্থীর উপকার করিবে, (৪) হাঁচি দিয়া আল্‌হামদু লিল্লাহ বলিলে ইয়ারহামু কাল্লাহ বলিয়া দিবে, (৫) রোগে-শোকে খোঁজ খবর নিবে, (৬) মরিয়া গেল কাফন-দাফনে শরীক হইবে।(মুসলিম শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সঃ) রুগীকে দেখিতে যাইতেন, জানাযার সঙ্গে গমন করিতেন, কোন দাস তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলে তাহাও গ্রহণ করিতেন।

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, সদ্ব্যহারের বিনিময়ে সদ্ব্যবহার করার নাম সদ্ব্যবহার নয়; যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করার নামই সদ্ব্যবহার। (মেশকাত)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই; একে অন্যের প্রতি অন্যায় করিবে না, সাহায্য ছাড়িবে না, একে অন্যকে ঘৃণা করিবে না। (মুসলিম)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, দ্বীন-ইসলামের বড় কাজ হইল প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করা। (বোখারী শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, জগদ্বাসীর প্রতি তুমি দয়ালু হও, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়ালু হইবেন। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ না করিবে, জ্যেষ্ঠদেরকে শ্রদ্ধা না করিবে এবং সৎ কাজে আদেশ না করিবে, অন্যায় কাজে বাধা না দিবে, সে আমার উম্মত হইতে খারিজ। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আমার উম্মতের কোন লোককে খুশী করার জন্য তাহার প্রয়োজন মিটাইবে সে বস্তুতঃ আমাকে খুশি করিয়াছে; আর যে আমাকে খুশী করিয়াছে সে বস্তুতঃ আল্লাহকে খুশি করিয়াছে; যে আল্লাহকে খুশি করিয়াছে, আল্লাহ তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করিবে আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য তিহাত্তরটি মাগফেরাত লিখিয়া দিবেন; তাহার একটি দ্বারাই তাহার সব বিষয়ের শুদ্ধি ও সুষ্ঠুতা লাভ হইবে, আর বাহাত্তরটি দ্বারা কেয়ামত দিবসে উন্নতি লাভ হইবে। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর বান্দাগণ আল্লাহর আপনজন স্বরূপ। সুতরাং যে আল্লাহর বন্দাদের উপকার করিবে সে আল্লাহর প্রিয় হইবে। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, অন্যের দোষ খুঁজিও না, কাহারও নিন্দামন্দ করিও না, হিংসা করিও না, শত্রুতা বধাইও না, কাহারও দোষ চর্চা করিও না, দুনিয়া বাড়াইতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইও না, লোকদের সহিত ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করিবে। (বোখারী)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সমাজের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব বজায় রাখিতে যত্নবান হওয়ার পূণ্য নামায রোযা ও দান-খয়রাতের পুণ্য অপেক্ষা অধিক। পক্ষান্তরে পরস্পরের সম্পর্ক খারাপ হওয়া সুখ-শান্তি ও দ্বীন-ঈমান সব কিছুকেই বিদায় দেয়।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি অন্যের ক্ষতি চাহিবে আল্লাহ তাহার ক্ষতি করিয়া দিবেন। যেব্যক্তি অন্যের জীবন সঙ্কীর্ণ করার চেষ্টা করিবে, আল্লাহ তাহার জীবন সঙ্কীর্ণ করিয়া দিবেন। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি কোন মোমেনকে ধোকা দেয় বা তাহার ক্ষতি করে, তাহার প্রতি অভিশাপ। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি মুসলমান ভ্রাতার দোষ খুঁজিয়া প্রকাশ করিবে আল্লাহ তাহার দোষ প্রকাশ করিবেন এবং গৃহভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকিলেও তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ঈর্ষা হইতে দূরে থাকিও; ঈর্ষা নেক আমল বরবাদ করিয়া দেয় যেরূপ অগ্নি শুষ্ক কাষ্ঠ ভস্ম করিয়া দেয়! -(আবু দাউদ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার লোকদের আমলনামা আল্লাহর হুজুরে পেশ হয় এবং ঐ সময় অনেক বান্দারই গোনাহ মাফ হয়। কিন্তু যে দুই মুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে বলা হয়, সদ্ভাবের প্রতি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাহাদের জন্য ক্ষমা মুলতবী রাখ।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, বেহেশত পাইবে না মোমেন না হইলে; মোমেন গণ্য হইবে না পরস্পর ভালবাসা ও সদ্ভাবের সৃষ্টি না করিলে। আমি একটি কাজের পরামর্শ দেই, যাহা করিলে পরস্পর ভালবাসা ও সদ্ভাবের সৃষ্টি হইবে- পরস্পর সালাম করার নীতি বেশী পরিমাণে প্রবর্তন কর। (মুসলিম শরীফ)

মাতৃজাতি সম্পর্কে রহমতুল লিল আলামীন

মাতৃজাতি সমাজের অর্ধাংশ এবং অর্ধাঙ্গিনী; তাহাদের প্রতি ঘৃণা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, উপেক্ষা এবং অন্যায়-অত্যাচার সমাজকে পঙ্গু করিয়া রাখিবে। অন্ধকার যুগে ত সমাজ নারীদের প্রতি এতই হিংস্র, নির্দয়

নিষ্ঠুর ও নির্মম ছিল যে, মেয়ে সন্তানকে ভালবাসিত না কেহই; অনেকে তাহাকে জীবিত কবর দিয়া দিত। বর্তমান যুগ যাহাকে নারীদের রাজত্বের যুগ বলা যাইতে পারে– এই যুগে মেয়ে সন্তানের জন্মে অনেক কম লোকেরই আনন্দ হয়। ইহা কি নারীদের প্রতি বৈরীভাবের লক্ষণ নহে? নবীজী (সঃ) মেয়েদের প্রতিপালন হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বস্তরে তাহাদের মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অতুলনীয় শিক্ষা ও আদর্শ রাখিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত কতিপয় নমুনা পেশ করা হইল।

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি দুইটি মাত্র মেয়ের সুন্দররূপে ভরণ পোষণ ও প্রতিপালন করিবে সে বেহেশতে আমার এত নিকটবর্তী হইবে যেরূপ হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পর নিকটবর্তী। (মুসলিম শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি তিনটি মেয়ে বা তিন জন ভগ্নীর প্রতিপালন ও শিক্ষাদান সুচারুরূপে করিবে– যাবত না তাহাদের নিজ নিজ ব্যবস্থা হয়; তাহার জন্য বেহেশত অবধারিত হইয়া যাইবে। দুই জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া নবী (সঃ) বলিলেন, দুই জনের প্রতিপালনেও তাহাই। একজনের প্রতিপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল নবীজী (সঃ) তদুত্তরেও তাহাই বলিলেন। (মেশকাত শরীফ, ৪২৩)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, যাহার নিকট কোন মেয়ে থাকে এবং সে মেয়েকে তুচ্ছ না করে, ছেলেকে অগ্রগণ্য না করে, আল্লাহ তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। (আবু দাউদ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, তোমার কোন মেয়ে স্বামী পরিত্যক্ত হইয়া নিরাশ্রয়রূপে তোমার আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলে তাহার জন্য তুমি যাহা ব্যয় করিবে, তাহা তোমার জন্য সর্বাধিক উত্তম দান-খয়রাত গণ্য হইবে। (ইবনে মাজা শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, নারী জাতি সৃষ্টিগতভাবেই একটু বক্র স্বভাবের; পূর্ণ সোজা করিতে চাহিলে (সোজা না হইয়া) ভাঙ্গিয়া যাইবে তথা বিচ্ছেদের পাল্লায় আসিয়া যাইবে। সুতরাং তাহাকে বাঁকা থাকিতে দিয়াই তাহার সহিত তোমার জীবিকানির্বাহ করিতে হইবে। তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ উপদেশ– তোমরা নারীদের প্রতি উত্তম ও ভাল হইয়া থাকিবে। (মুসলিম শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, নারীগণ নামায রোযা, সতীত্ব রক্ষা ও স্বামীর আনুগত্য– এই সংক্ষিপ্ত আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলার নিকট এত বড় মর্যাদা লাভ করিবে যে, বেহেশতের যেকোন শ্রেণীতে সে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করিবে। (মেশকাত, ২৮১)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, পরিপূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যে তাহার সহধর্মিণীর সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। (তিরমিযী শরীফ)

একদা নবী (সঃ) কড়া নির্দেশ দিলেন, গৃহিণীদেরকে কেহ প্রহার করিতে পারিবে না। অতপর একদিন ওমর (রাঃ) নবীজীর নিকট প্রকাশ করিলেন, নারীগণ অত্যন্ত বেপরোয়া হইয়া গিয়াছে। সেমতে নবীজী (সঃ) (প্রয়োজন স্থলে সংযমের সহিত) প্রহারের অনুমতি দিলেন। এরপর বহু সংখ্যক মহিলা তাহাদের স্বামীদের অভিযোগ নিয়া নবীজীর গৃহে ভিড় জমাইল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কঠোর ভাষায় বলিলেন, অনেক মহিলা তাহাদের স্বামীদের সম্পর্কে অভিযোগ করিতেছে; ঐরূপ স্বামীগণ মোটেই ভাল মানুষ নহে। –(আবু দাউদ শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সহধর্মিণীর সহিত যে উত্তম জীবন যাপনকারী হয় সেই উত্তম মানুষ। আমি আমার সহধর্মিণীদের সহিত উত্তম জীবন যাপন করি। (তিরমিযী শরীফ)

সত্যই নবীজী (সঃ) সহধর্মিনীদের প্রতি অতি উত্তম ছিলেন। একবার সফর অবস্থায় বিবি সফিয়া রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জন্য উটের উপর আরোহণ করা কঠিন হইলে নবী (সঃ) নিজ উরু পাতিয়া দিলেন। সফিয়া (রাঃ) সিঁড়ির ন্যায় নবীজীর উরু মোবারকের উপর পা রাখিয়া উটে আরোহণ করিলেন। (বোখারী শরীফ)

একবার নবীজী (সঃ) এতেকাফে ছিলেন; সফিয়া (রাঃ) নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিলেন; তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সময় নবী (সঃ) তাঁহাকে মর্যাদার সহিত বিদায় দানে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া মসজিদের দরজা পর্যন্ত আসিলেন।

আয়েশা (রাঃ) কম বয়স্কা ছিলেন। নবীজীর গৃহে নয় বৎসর বয়সে আসিয়াছিলেন। নবী (সঃ) তাঁহার বাল্য বয়সের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার কতিপয় বান্ধবী ছিল যাহাদের সঙ্গে আমি বাল্যসুলভ খেলাধুলা করিতাম। নবী (সঃ) গৃহে আসিলে তাহারা লুকাইয়া যাইত; নবী (সঃ) তাহাদিগকে তালাশ করিয়া আমার নিকট পাঠাইতেন। তাহারা পুনঃ আমার সহিত খেলা জুড়িত। (বোখারী শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– একবার ঈদের আনন্দে খঞ্জর চালনার খেলা হইতেছিল। নবী (সঃ) আমাকে গৃহদ্বারে তাঁহার পিছনে দাঁড় করাইয়া তাঁহার কাঁধের ফাঁক দিয়া ঐ খেলা দেখাইলেন। খেলা দেখায় আমার মন ভরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়াইয়া থাকিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন– খেলা দেখায় লালায়িত যুবতী কত দীর্ঘকাল দেখিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। (বোখারী শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (সঃ) আমার সহিত দৌড় প্রতিযোগিতা করিলেন; তাহাতে আমি জয়ী হইলাম। অনেক দিন পর যখন আমার শরীর ভারী হইয়া গিয়াছিল তখন আর একদিন সেই প্রতিযোগিতা করিলে আমি পরাজিত হইলাম। নবীজী (সঃ) তখন কৌতুক করিয়া বলিলেন, আমার সেই পরাজয়ের বিনিময়ে তোমার এই পরাজয়। (আবু দাউদ শরীফ)

নবীজী (সঃ)-এর কী মধুর সম্পর্ক ছিল সহধর্মিণীগণের সঙ্গে! নবীজী (সঃ) তাঁহাদের সহিত সময়ে খোশগল্পও করিতেন। একদা নবীজী (সঃ) বিবি আয়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে এক সুদীর্ঘ খোশ-গল্প জুড়িয়া ছিলেন। হাদীছটি বোখারী শরীফেও উল্লেখ আছে– "হাদীছে উম্মে যারা" নামে। এক সময় আরবের একাদশ সংখ্যক সুসাহিত্যিক মহিলা একত্র হইয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা বর্ণনায় ভাষাজ্ঞানের বাহাদুরী দেখাইল। তন্মধ্যে উম্মে যারা নাম্নী মহিলা সুদীর্ঘ ও সুললিত ভাষায় নিজ স্বামীর সর্বাধিক বেশী প্রশংসা করিল। নবী (সঃ) আয়েশার নিকট সেই একাদশ মহিলার প্রসিদ্ধ গল্পটি বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আয়েশা! উম্মে যারার স্বামী তাহার জন্য যেরূপ ছিল, আমি তোমার জন্য সেরূপ।

নারী সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতিও নবীজী (সঃ) বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নবীজীর আমলে দ্বীন শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র নবীজীই ছিলেন; নবীজীর সব কথা বিশেষতঃ ভাষণসমূহ শরীয়তের বিশেষ বস্তু ছিল। তাই নবীজীর ভাষণ উপলক্ষে নর-নারী নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতির আদেশ ছিল। জুমা ও ঈদের নামাযে নবীজী (সঃ) বিশেষ ভাষণ দিতেন; সেই ভাষণ শুনিবার জন্য সকলেই উপস্থিত হইতেন। তবে নারীগণ সকলের পিছনে থাকিতেন। একবার ঈদের খোতবা সাধারণ নিয়মে প্রদানের পর নবীজী (সঃ) লক্ষ্য করিলেন, নারীদের পর্যন্ত তাঁহার কথা সম্পূর্ণরূপে পৌঁছে নাই। তাই নবী (সঃ) বেলাল (রাঃ)-কে সঙ্গে করিয়া নারীদের অবস্থান স্থলে যাইয়া পুনঃ ভাষণ দিলেন। (বোখারী শরীফ)

আর একবারের ঘটনা– নারীগণ নবীজীর (সঃ) নিকট অভিযোগ করিল, নবীজীর মজলিসে তাহারা পুরুষদের ভিড়ের কারণে পূর্ণ উপকৃত হইতে পারে না; সেমতে তাহাদের অভিলাষ অনুযায়ী নবী (সঃ) তাহাদের জন্য ভিন্ন মজলিসের ব্যবস্থা করিলেন।

স্ত্রীদের প্রতি নবীজী (সঃ) কত অধিক সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাহাদের কত বেশী মর্যাদা তিনি দিলেন। নবীজী (সঃ) তাঁহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ বিদায় হজ্জের নীতি নির্ধারণী ঐতিহাসিক ভাষণে নারীদের মর্যাদা দানের কর্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সেই ভাষণে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন–

"নারীদের উপর স্বামীদের যেরূপ হক ও দাবী আছে, তদ্রূপ স্বামীদের উপর, স্ত্রীদেরও হক এবং দাবী আছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন– নারীদের সম্পর্কে আমার বিশেষ নির্দেশ পালন করিও, তাহাদের প্রতি

সদ্ব্যবহার ও সর্বপ্রকার কল্যাণকর ব্যবস্থা বজায় রাখিও। .... তাহাদিগকে তোমরা লাভ করিয়াছ আল্লাহর আমানতরূপে এবং তাহাদের সতীত্ব ভোগ করিতে পারিয়াছ আল্লাহর বিধানের অধীনে। সেই আল্লাহর রসূল আমি, অতএব তাহাদের সম্পর্কে আমার নির্দেশ পালনে তোমরা বাধ্য।

একদা আবু বকর (রাঃ) নবীজীর (সঃ) গৃহে আসিতেছিলেন বাহির হইতে বিবি আয়েশা (রাঃ) উচ্চ স্বর শুনিতে পাইলেন– তিনি নবীজীর সহিত প্রতিউত্তর করিতেছিলেন। আবু বকর (রাঃ) ক্রোধভরে ঘরে আসিয়া আয়েশা (রাঃ)-কে এই বলিয়া শাসাইতে লাগিলেন যে, এত বড় স্পর্ধা! রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আওয়াজের ঊর্ধ্বে তোমার আওয়াজ! আবু বকর (রাঃ) এই বলিয়া আয়েশা (রাঃ)-কে চড় মারিতে উদ্যত হইলে নবী (সঃ) আয়েশাকে আবু বকর হইতে আড়াল করিয়া রাখিলেন। আবু বকর (রাঃ) চলিয়া গেলে নবী (সঃ) আয়েশাকে বলিতে লাগিলেন, দেখিলে ত মিঞা সাহেব হইতে কত কষ্টে তোমাকে বাঁচাইয়াছি! (আবু দাউদ)

প্রতিবেশী সম্পর্কে নবীজী (সঃ)

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি মোমেন নহে যাহার পড়শী তাহার হইতে নিরাপদ নহে। (বোখারী শরীফ)

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার পড়শী তাহার হইতে নিরাপদ নহে সে বেহেশত পাইবে না। (মেশকাত শরীফ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, সেব্যক্তি মোমেন নহে যে পেট পুরিয়া খায়, অথচ তাহার নিকটবর্তী প্রতিবেশী অনাহারী রহিয়াছে। (ঐ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যে লোক তাহার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম পরিগণিত, সে আল্লাহর নিকটও উত্তম পরিগণিত। যেব্যক্তি নিজ সঙ্গীদের নিকট উত্তম পরিগণিত, সে আল্লাহর নিকটও উত্তম পরিগণিত। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের প্রিয় হইতে চায় তাহার কর্তব্য হইবে সত্যবাদী হওয়া, বিশ্বাসভাজন হওয়া এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহারকারী হওয়া। (মেশকাত শরীফ)

এতীম সম্পর্কে নবীজী (সঃ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে তথা নিঃস্বার্থভাবে এতীমের মাথায় স্নেহের হস্ত বুলায় তাহার হস্ত স্পর্শিত প্রতিটি লোমের পরিবর্তে নেকী লাভ হইবে। যেব্যক্তি কোন এতীম বালক বা বালিকার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, সে বেহেশতের মধ্যে আমার অতি নিকটবর্তী হইবে। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, আত্মীয় বা অনাত্মীয় এতীমের লালন-পালনকারী ও আমি বেহেশতে এইরূপ নিকটবর্তী থাকিব, যেরূপ হাতের দুইটি আঙ্গুল। (বোখারী শরীফ)

দানশীলতায় নবীজী (সঃ)

নবীজী (সঃ) কোন সময় দানপ্রার্থীকে "না" বলিতেন না– তাঁহার এই উদার স্বভাব অনেকেই বর্ণনা করিয়াছেন। এক সময় নবীজীর পরিধেয়ের প্রয়োজন ছিল। এমন সময় এক মহিলা নবীজীর জন্য সযত্নে হাতে বুনিয়া একটি চাদর পেশ করিল। প্রয়োজনের সময়ে তাহা পাইয়া নবী (সঃ) তাহা পরিধানে ছাহাবীগণের সমাবেশে আসিয়া বসিলেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, হুজুর! চাদরখানা আমাকে দান করুন। নবী (সঃ) গৃহে যাইয়া পুরাতন চাদর পরিধানপূর্বক নূতন চাদরখানা ঐ ব্যক্তিকে দান করিয়া দিলেন। বিস্তারিত বিবরণ ১ম খণ্ডে ৬৬৭ নং হাদীছে দ্রষ্টব্য।

এক ছাহাবী তাঁহার ওলীমার দাওয়াতের ব্যবস্থা করিতে নবীজী (সঃ)-এর নিকট সাহায্য চাহিলে নবীজী (সঃ) তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, আয়েশার ঘরে এক ধামা আটা আছে, তাহা নিয়া যাও। ঐ ব্যীক্ত তাহা নিয়া চলিয়া গেল, অথচ নবীজী (সঃ)-এর ঘরে তাহা ছাড়া আর কিছু ছিল না। (সীরাতুন নবী)

আতিথেয়তা

ইহা নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এক মহান আদর্শ। তিনি বলিয়াছেন, যাহার ঈমান আছে তাহার কর্তব্য মেহমানের সম্মান করা।

একদা নিরাশ্রয় লোকদের ভিড় জমিয়া গেল। নবীজী (সঃ) ঘোষণা করিলেন, যাহার ঘরে দুই জনের আহার আছে, সে যেন তৃতীয় জনকে নিয়া যায়। যাহার ঘরে চারি জনের আহার আছে, সে যেন ষষ্ঠ জন পর্যন্ত সঙ্গে নিয়া যায়। আবু বকর (রাঃ) তিন জন মেহমান নিলেন, আর নবীজী তাঁহার গৃহে দশ জনকে নিলেন। (মুসলিম)

কোন নিরাশ্রয় আসিলে তাহার আতিথেতার জন্য প্রথমে নবীজী (সঃ) নিজ গৃহে অবকাশের খোঁজ লইতেন। তাঁহার গৃহে একেবারেই কোন ব্যবস্থা সম্ভব না হইলে অন্যদেরকে অনুরোধ করিতেন।

নিঃসহায়দের অন্যতম একজন ছিলেন আবু হোরায়রা (রাঃ)। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। কাহারও নিকট খাদ্য চাহিতে লজ্জা হয়, তাই শুধু ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য ক্ষুধার্তকে অন্নদান সম্পর্কীয় কোরআনের আয়াতের প্রতি লোকদের দৃষ্টি আর্ষণ করিতে লাগিলাম; এমনকি আবু বকর এবং ওমরকেও ঐরূপ করিলাম, কিন্তু কেহই আমার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেন না। নবী (সঃ) ঐরূপ করিতে দেখিয়া আমার অবস্থা ঠাহর করিয়া ফেলিলেন এবং মুচকি হাসি দিয়া বলিলেন, আবু হোরায়রা! আমার সঙ্গে আস। গৃহে যাইয়া এক পেয়ালা দুগ্ধ পাইলেন, যাহা কেহ হাদিয়া দিয়া গিয়াছে। আদেশ হইল মসজিদের বারান্দায় নিরাশ্রয় সকলকে ডাকিয়া আন। প্রথমে সকলকে পান করাইতে বলিলেন, অতপর আমাকে পুনঃ পুনঃ তৃপ্তির অতিরিক্ত পান করাইলেন।

নবী (সঃ) অমুসলিমের আতিথেয়তায়ও কুণ্ঠিত হইতেন না। আবু বুসরা (রাঃ) নামক এক ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি এক রাত্রে নবীজীর অতিথি হইয়াছিলাম! তাঁহার গৃহে যে কয়টি বকরী ছিল সবগুলির দুগ্ধ একা আমিই পান করিয়া শেষ করিলাম। নবী (সঃ) পরিবারপরিজন সহ ঐ রাত্র অনাহারেই কাটাইলেন; তিনি আমার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হইলেন না। (সীরাতুন নবী)

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক রাতে এক কাফের ব্যক্তি নবীজীর অতিথি হইল। নবীজী তাহাকে ছাগীর দুধ দোহন করিয়া পান করাইতে লাগিলেন, সে পর পর সাতটি ছাগীর দুগ্ধ একাই পান করিয়া ফেলিল। নবীজী (সঃ) মোটেই বিরক্ত না হইয়া যত্নের সহিত তাহার সম্মুখে দুধ পরিবেশন করিয়া গেলেন। ঐ কাফের নবীজীর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ভোর হইতেই মুসলমান হইয়া গেল। এখন সে একটি ছাগীর দুধেই তৃপ্ত হইয়া গেল। (তিরমিযী শরীফ)

ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি ঘৃণা

ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদে নবীজী সদা সচেষ্ট থাকিতেন। এব ব্যক্তি নবীজীর নিকট সাহায্য চাহিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কিছুই নাই কি? সে বলিল, শুধুমাত্র একটি কম্বল আর একটি পানি পানের পেয়ালা আছে। নবী (সঃ) তাহার সেই বস্তুদ্বয়ই আনাইলেন এবং দুই দেরহামে বিক্রি করিয়া বলিলেন, এক দেরহাম পরিবারের খরচের জন্য দিয়া আস, আর এক দেরহাম দ্বারা একটি কুড়াল ক্রয় করিয়া আমার নিকট নিয়া আস। নবী (সঃ) নিজেই ঐ কুড়ালে হাতল লাগাইয়া তাহাকে দিলেন এবং বলিলেন, জঙ্গল হইতে জ্বালানি

কাঠ কাটিয়া বিক্রি করিবে; পনর দিন যেন আমি তোমাকে দেখিতে না পাই– এক ধারে ঐ কাজ করিয়া যাইবে। সে ব্যক্তি তাহাই করিল এবং অচিরেই দশ দেরহাম উপার্জন করিয়া কাপড় ক্রয় করিল, খাদ্য ক্রয় করিল। নবী (সঃ) তাহাকে বলিলেন, এই ব্যবস্থা তোমার জন্য উত্তম হইয়াছে ইহা অপেক্ষা যে, তুমি ভিক্ষা করিতে এবং কেয়ামত দিবসে তোমার চেহারায় ভিক্ষাবৃত্তির নিশানা সর্বসমক্ষে ফুটিয়া উঠিত। (আবু দাউদ শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সম্বল থাকিতে যেব্যক্তি ভিক্ষা চাহিবে, হাশর মাঠে তাহার চেহারায় আঁচড় ও ক্ষত হইবে। (তিরমিযী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যাহার সম্বল (এক দিনের আহার) আছে তাহার জন্য বা যাহার অঙ্গসমূহ সঠিক আছে তাহার জন্য ভিক্ষা চাওয়া হালাল নহে। –(তিরমিযী)

শ্রমের মর্যাদাদান

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, দড়ি লইয়া জঙ্গলে যাও এবং জ্বালানী কাঠের বোঝা পিঠের উপর বহন করিয়া বিক্রি কর; ইহা দ্বারা আল্লাহ তোমার মান-ইজ্জত রক্ষা করিবেন– ইহা ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা উত্তম। (বোখারী শরীফ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির জন্য তাহার নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম খাদ্য নাই। (বোখারী শরীফ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষের জন্য সর্বাধিক পাক-পবিত্র খাদ্য হইল তাহার নিজের উপার্জিত খাদ্য। (নাসারী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করাও একটি ফরয। (মেশকাত)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি কোন শ্রমিক দ্বারা কাজ করাইয়া শ্রমিকের পারিশ্রমিক পরিশোধ না করিবে, কেয়ামত দিবসে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাহার বিরুদ্ধে বাদী হইবেন। (বোখারী শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, মজদুর দ্বারা কাজ করাইলে মজদুরের ঘাম শুকাইবার পূর্বেই তাহার মজুরি আদায় করিয়া দাও। –(মেশকাত শরীফ)

স্বভাবগত সংসারী জীবনের শিক্ষাদান

স্বভাবের বিপরীত বৈরাগ্য ও সন্যাস জীবনের প্রতি নবীজীর দৃঢ় অনীহা ছিল। তিনি সব সময়ই সংসারী জীবনের আদর্শ স্থাপন ও শিক্ষা দান করিয়াছেন।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ইসলামে সন্যাস জীবনের স্থান নাই। বিশিষ্ট ছাহাবী ওসমান ইবনে মাজউন (রাঃ) সন্যাস জীবনের অনুভূতি চাহিলে নবী (সঃ) দৃঢ়তার সহিত তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

একদা তিন জন ছাহাবী তিন রকম প্রতিজ্ঞা করিলেন। একজন বলিলেন, আমি রাত্রে কখনও নিদ্রা যাইব না– সারা রাত্র নামায পড়িয়া কাটাইব। অপরজন বলিলেন, সারা জীবন রোযা রাখিব। আর একজন বলিলেন, সারা জীবন বৈরাগী হইয়া থাকিব– বিবাহ করিব না। নবী (সঃ) তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে শপথের সহিত বলিলেন, আমি আল্লাহ তাআলাকে সর্বাধিক ভয় করি, তথাপি রাত্রে ঘুমাই, রোযাবিহীনও থাকি, বিবাহও করিয়াছি। আমার এই তরীকা হইতে যে বিরাগী হইবে সে আমার জমাত হইতে খারিজ গণ্য হইবে। (বোখারী শরীফ)

অধীনস্থদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার আদর্শ

শ্রমিক, মজুর, ভৃত্যদের প্রতি নিজে ত নবীজী (সঃ) দয়াবান ছিলেনই, বিশেষভাবে ইহার আদর্শ শিক্ষা

দানেও নবীজী (সঃ) বিশেষ তৎপর থকিতেন।

একজন ছাহাবী তাঁহার দাসের প্রতি কঠোরতা করিলে নবী (সঃ) তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, তুমি তাহার প্রতি যতটুকু ক্ষমতা রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমার উপর তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা রাখেন। (বোখারী শরীফ)

বিশিষ্ট ছাহাবী আবু যর (রাঃ) তাঁহার বৃত্যকে বাঁদীর বাচ্চা বলিয়া গালি দিলে নবীজী তাঁহাকে কঠোর ভাষায় বলিলেন, তোমার মধ্যে অন্ধকার যুগের অসভ্যতা রহিয়াছে। এই ভৃত্যগণ তোমাদেরই ভ্রাতা; আল্লাহ তাহাদিগকে তোমাদের অধীনস্থ করিয়াছেন। তোমাদের কর্তব্য অধীনস্থদের নিজেদের ন্যায় যত্নের সহিত খাওয়ানো-পরানো। (বোখারী শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, ভৃত্য তোমার জন্য খাদ্য তৈয়ার করিয়া আনিলে তোমার কর্তব্য সেই খাদ্যের এক গ্রাস তাহাকেও প্রদান করা। এই খাদ্য তৈয়ার করিতে সে অগ্নি তাপ সহ্য করিয়াছে এবং নানা কষ্ট করিয়াছে। (বোখারী শরীফ)

নবীজী (সঃ) বলিয়াছেন, তোমার দাসকে তাহার সাধ্যের অধিক কষ্টের কাজ চাপাইয়া দিও না। যদি সেইরূপ কষ্টের কাজ তাহার দ্বারা করাইতেই হয় তবে তোমার কর্তব্য হইবে তাহাকে সাহায্য করা। (বোখারী শরীফ)

কল্যাণ ও মঙ্গলময় পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা শিক্ষাদানে রহমতুল লিলআলামীন

পারিবারিক জীবন কল্যাণময় ও মঙ্গলময় করিতে হইলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে। সে সম্পর্কের উন্নতির জন্য নবীজীর দেওয়া আদর্শ ও শিক্ষা অতুলনীয়। সেইসব আদর্শ ও শিক্ষার অনুসরণে সহজেই একটা সুখী পরিবার গড়িয়া উঠিতে পারে।

একদা নবীজী (সঃ) তিন বার বলিলেন, সে লাঞ্ছিত হউক। জিজ্ঞাসা করা হইল, সে ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, যেব্যক্তি মাতা-পিতা উভয়কে বা তাঁহাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইয়া তাহাদের খেদমত করিয়া বেহেশতের অধিকারী হইতে পারে নাই। (মুসলিম শরীফ)

আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার মা পৌত্তলিক থাকাবস্থায় মদীনায় আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি আমার এই মাতার খেদমত করিব কি? তিনি বলিলেন, নিশ্চয় তাঁহার খেদমত করিবে। (বোখারী শরীফ)

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি; আর মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিযী শরীফ)

এক ব্যক্তি নবীজীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আমার মাতা-পিতা এন্তেকাল করিয়াছেন, এখনও তাঁহাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের কিছু বাকী আছে কি? নবী (সঃ) বলিয়াছেন, হাঁ– তাঁহাদের জন্য দোয়া করিবে, মাগফেরাত চাহিবে, তাঁহাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার পুরা করিবে, তাঁহাদের সম্পর্কীয় আত্মীয়দের খেদমত করিবে, তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবদের শ্রদ্ধা করিবে। (আবু দাউদ শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, কোন হতভাগার মাতা-পিতা যদি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় মরিয়া যায় তবে সে যদি আজীবন তাহাদের জন্য দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আল্লাহ তাআলা মাতা-পিতার সন্তুষ্টিভাজন গণ্য করিয়া নিবেন। –(মেশকাত শরীফ, ৪২১)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দাবী ঐ পরিমাণ, যে পরিমাণ মাতা-পিতার দাবী সন্তানের উপর। (ঐ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, মানুষ যাহার সঙ্গে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব করে, সাধারণতঃ তাহার স্বভাব চরিত্র ও মতবাদ অবলম্বনকারী হইয়া পড়ে। অতএব লক্ষ্য করা চাই, কিরূপ ব্যক্তির সহিত ভালবাসা ও বন্ধুত্ব করা হইতেছে। (মেশকাত শরীফ, ৪২৭)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, মোলায়েম ব্যবহার অবলম্বন কর; তাহা সুনাম-সুখ্যতি বর্ধক। কঠোরতা ও লজ্জাহীনতা পরিহার কর; তাহা কুখ্যাতির কারণ। (মুসলিম শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সুচরিত্র বড় পুণ্য। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, সুচরিত্র ও সদ্ব্যবহারের দ্বারা মোমেন ব্যক্তি সমস্ত দিন রোযা ও সারা রাত্র নামাযের পুণ্য লাভ করিতে পারে। (আবু দাউদ শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, প্রকৃত মোমেন সরল ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে ধোঁকাবাজ ও অসভ্যতা ফাসেক হওয়ার পরিচয়। (আবু দাউদ শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, লজ্জা-শরম দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য। (মেশকাত শরীফ, ৪৩২)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশে বিনম্র হইবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিবেন। ফলে সে নিজকে নিজে ছোট মনে করিলেও লোকদের দষ্টিতে মহান গণ্য হইবে। আর যেব্যক্তি অহঙ্কার করিবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে হেয় ও নিচ করিয়া দিবেন। ফলে সে নিজকে নিজে বড় মনে করিলেও লোকদের দৃষ্টিতে এত ছোট হইবে যে, শূকর-কুকুর অপেক্ষাও অধিক ঘৃণিত হইবে। (ঐ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি মুখ সংযত রাখিবে আল্লাহ তাআলা তাহার ইজ্জতের হেফাজত করিবেন। যেব্যক্তি ক্রোধ দমাইয়া রাখিবে কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা তাহাকে আযাবমুক্ত রাখিবেন। যেব্যক্তি আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে ক্ষমা করিবেন। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, প্রকৃত নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি যে কেয়ামত দিবসে নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদির সওয়াব লইয়া উপস্থিত হইবে; কিন্তু সে কাহাকেও গালি দিয়াছে, কাহাকেও অপবাদ লাগাইয়াছে, কাহারও ধন আত্মসাত করিয়াছে, কাহাকেও খুন করিয়াছে, মারপিট করিয়াছে ঐ সব দাবীদারকে তাহার সমুদয় নেক বা সওয়াব বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং দাবীদার শেষ হওয়ার পূর্বেই তাহার নেক বা সওয়াব শেষ হইয়া গিয়াছে; ফলে অবশিষ্ট দাবীদারদের গোনাহের বোঝা তাহার উপর চাপানো হইয়াছে– পরিণামে তাহাকে দোযখে ফেলা হইয়াছে। (ঐ)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি নিজের পরকাল বিনষ্ট করিয়াছে অন্যের ইহকাল ভাল করার জন্য সে কেয়ামত দিবসে সর্বাধিক মন্দ ও নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হইবে। (ঐ)

যত লোক জায়েয না যায়েয চিন্তা না করিয়া নামায-রোযার খেয়াল ছাড়িয়া দিয়া, নিজের পরকালের উন্নতি বিধান না করিয়া দুনিয়ায় সম্পদের উপর সম্পদ, ধনের উপর ধন বাড়াইতে থাকে সে শ্রেণীর সব লোক উক্ত হাদীছের লক্ষ্য। কারণ, অতিরিক্ত ধন-সম্পদসমূহ ত সবই অন্যের; চক্ষু বুজিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধন-সম্পদের মালিক ওয়ারিসগণ হইয়া যাইবে। অথচ এই সব ধন-সম্পদ উপার্জনে নিজের দ্বীন-ঈমান বিনষ্ট ও পরকালের জীবন ধ্বংস করা হইয়াছিল।

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়ার বেশী অনুরাগী যে হইবে তাহাকে আখেরাতের ক্ষতি করিতে হইবে; আর যে আখেরাতের বেশী অনুরাগী হইতে চাহিবে তাহাকে দুনিয়ার কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। তোমারা চিরস্থায়ী আখেরাতকে অগ্রগণ্য কর ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার উপর। অর্থাৎ আখেরাতেরই অনুরাগী হও যদিও দুনিয়ার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। (মেশকাত শরীফ, ৪৪১)

নবী (সঃ) বলিয়াছেন, ধন-সম্পদে তোমার অপেক্ষা উচ্চ এরূপ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য গেলে সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর যে তোমার অপেক্ষা নিম্ন। (জাগতিক ব্যাপারে) সদা তোমার অপেক্ষা নিম্নদের

প্রতি দৃষ্টি রাখিও, উচ্চদের প্রতি দৃষ্টি দিও না; তাহা হইলে আল্লাহর নেয়ামতের শোকরগুজারী সহজ হইবে। (ঐ)

পারিবারিক জীবনে সুষ্ঠুতার তাগিদ

আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) ছাহাবীর অতিরিক্ত রোযা, অতিরিক্ত তাহাজ্জুদ নামাযের চর্চা হইলে নবীজী তাঁহাকে সংবাদ দিয়া আনিলেন, এমনকি একবার স্বযং তাঁহার বাড়ীতে পৌছিয়া তাঁহাকে ঐরূপ না করার কড়া নির্দেশ দিয়া বলিলেন– তোমার উপর তোমার জানের হক রহিয়াছে, চোখের হক রহিয়াছে, স্ত্রীর হক রহিয়াছে, এমনকি সাক্ষাত প্রার্থীরও হক রহিয়াছে। অর্থাৎ এই সব হক তোমাকে অবশ্যই আদায় করিতে হইবে; অতিরিক্ত নফল এবাদতে মগ্ন হইয়া ঐ সব হক্ ক্ষুণ্ন করা চলিবে না। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে ১০২৯ নং হাদীছে দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তিগত জীবনে রহমতুল লিলআলামীন

"নিশ্চয় আপনি চরিত্রের চরম উৎকর্ষের অধিকারী।" (আল কোরআন)

আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনা– নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অত্যন্ত প্রশস্ত হৃদয়ের ও, কথা বার্তায় অত্যন্ত সত্যবাদী এবং, অধিক কোমল স্বভাবের ছিলেন। প্রথম দর্শনে দর্শকের উপর তাঁহার ঐশী প্রভাব পতিত হইত, কিন্তু তাঁহার সাহচর্যে ও মেলামেশায় মানুষ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে বাধ্য হইত। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রত্যেকেই বলিতে বাধ্য হইত– তাঁহার পূর্বে বা পরে তাঁহার তুলনা কোথাও দেখি নাই। ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। (তিরমিযী শরীফ)

জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ)-এর বর্ণনা– যোহর নামায পড়িয়া আমি নবীজীর সঙ্গে চলিলাম, তিনি গৃহে ফিরিতেছিলেন। কচিকাঁচারা তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিতে লাগিল; তিনি প্রত্যেককে তাহার গণ্ডদ্বয় ধরিয়া স্নেহ দেখাইতেছিলেন। স্নেহভরে আমার গণ্ডদ্বয়ও স্পর্শ করিলেন; তাঁহার হস্ত মোবারক সুশীতল ছিল এবং এরূপ সুগন্ধময় ছিল, যেন তাহা এখনই আতরের ডিবা হইতে বাহির হইয়াছে। (মুসলিম শরীফ)

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন– একদা নবীজী (সঃ)-কে অনুরোধ করা হইল মোশরেকদের প্রতি বদ দোয়া করার জন্য। তিনি বলিলেন, আমি বদ দোয়ার জন্য আসি নাই; আমি ত রহমত ও মঙ্গলরূপে আসিয়াছি। (মুসলিম শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজী (সঃ)-এর সহিত কেহ মোসাফাহা– করমর্দন করিলে অপর ব্যক্তি হাত না ছাড়া পর্যন্ত তিনি হাত ছাড়িতেন না। ঐ ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়া নেওয়ার পূর্বে তিনি মুখ ফিরাইতেন না। (তিরমিযী শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সঃ) ফজর নামায হইতে অবসর হওয়ার পর মদীনার গৃহ-ভৃত্যরা পানি লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। (পানি তাঁহার দ্বারা বরকতময় করিয়া নেওয়ার জন্য)। নবী (সঃ) তাহাদের প্রত্যেকের পানিতে হাত ডুবাইতেন। এমনকি প্রবল শীতের সময়ও নবীজী (সঃ) তাহাদের পানিতে হাত ডুবাইয়া থাকিতেন। (মুসলিম শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একমাত্র জেহাদ ছাড়া নবীজী (সঃ) কাহাকেও কোন সময় প্রহার করেন নাই– এমনকি খাদেম, ভৃত্য বা কোন স্ত্রীকেও নয়। (ঐ)

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ইহুদী পণ্ডিত নবীজীর (সঃ) নিকট কিছু টাকা পাওনা ছিল। সে একদা ঐ টাকার তাগাদায় আসিল; ঐ সময় নবীজীর (সঃ) হাতে টাকা ছিল না, তাই তখন পরিশোধে

অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। ইহুদী পণ্ডিত বলিল, টাকা উসুল না করিয়া আমি যাইব না আপনাকে ছাড়িব না। নবীজী (সঃ) বলিলেন, আচ্ছা– টাকার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমার হইতে দূরে কোথাও যাইব না। সেমতে নবীজী (সঃ) দুপুর বেলা হইতে এশার নামায পর্যন্ত ঐ ইহুদী পণ্ডিতের ধারে ধারেই থাকিলেন। এমনকি রাত্রেও সে তথায়ই থাকিল এবং নবীজী (সঃ)ও বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও গেলেন না। এই অবস্থায় ফজর নামায পড়া হইলে ছাহাবীগণ ঐ ইহুদীকে ভীতি প্রদর্শন এবং চটাচটি আরম্ভ করিলেন। নবীজী (সঃ) তাহা টের পাইয়া ছাহাবীগণকে বাধা দিলে তাঁহারা বলিলেন, এই ইহুদী আপনাকে এইভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? তদুত্তরে নবীজী (সঃ) বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে নিষেধ করিয়াছেন কাহারও প্রতি, এমনকি কোন অমুসলিম নাগরিকের প্রতিও অন্যায় করিতে।

বেলা একটু বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদী কালেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেল এবং তাহার সমুদয় সম্পত্তির অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দিল; সে অনেক বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। (মেশকাত শরীফ, ৫২১)

আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাম্‌সা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজী (সঃ) নবী হওয়ার পূর্বের ঘটনা– নবীজীর (সঃ) সহিত আমার একটি লেনদেন হইল এবং লেনদেনের কিছু অংশ বাকী থাকিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, অবশিষ্ট প্রাপ্য আমি নিয়া আসিতেছি, এস্থানেই তাহা আপনাকে অর্পণ করিব। তিনি তথায় অপেক্ষমাণ থাকিলেন যেন আমি আসিয়া তাঁহাকে না পাইয়া বিব্রত না হই। ঘটনাক্রমে আমি তথায় ফিরিয়া আসিবার কথা ভুলিয়া গেলাম। তিন দিন পর হঠাৎ আমার ঐ কথা স্মরণ হইল; আমি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নবীজী (সঃ) তথায় আমার জন্য অপেক্ষমাণ আছেন। আমাকে তিনি শুধু এতটুকু বলিলেন, তুমি আমাকে কষ্টে ফেলিয়া রাখিয়াছ। তিন দিন যাবত আমাকে তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে (তুমি আমাকে না পাইয়া বিব্রত হও না কি)! –(আবু দাউদ শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক দল ইহুদী নবীজীর (সঃ) নিকট আসিয়া সালাম করার স্বরে আস্‌সালামু আলাইকুমের স্থলে আস্‌সামু আলাইকুম বলিল, যাহার অর্থ আপনার মৃত্যু হউক। নবীজী (সঃ) তাহাদিগকে "অলাইকুম– তোমাদের উপর" বলিয়া উত্তর দিলেন; আর কিছুই বলিলেন না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি (রাগ সামলাইতে না পারিয়া পর্দার ভিতরে থাকিয়াই) বলিলাম, তোমাদের উপর মৃত্যু, আল্লাহর অভিশাপ ও আল্লাহর গজব। নবী (সঃ) আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, দেখ আয়েশা! সব কাজেই নম্রতাকে আল্লাহ ভালবাসেন। আমি বলিলাম, আপনি শুনিলেন না তাহারা কি বলিল? নবী (সঃ) বলিলেন, আমি শুনিয়াছি এবং "ওয়া আলাইকুম– তোমাদের উপর" বলিয়া দিয়াছি। দেখ আয়েশা! সদা নম্রতা অবলম্বনে যত্নবান থাকিও; কুবাক্য, কটূক্তি কঠোরতা পরিহার করিয়া চলিও আল্লাহ তাআলা কুবাক্য কটূক্তি ভালবাসেন না। (মুসলিম শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্যক্তি নবীজীর মসজিদে আসিয়া হঠাৎ মসজিদের ভিতরেই এক জায়গায় প্রস্রাব করিতে লাগিল। ছাহাবীগণ তাহার প্রতি তিরস্কার আরম্ভ করিলে নবীজী তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া বলিলেন, তাহার প্রস্রাব বন্ধ করিও না। (হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ করায় রোগের আশঙ্কা থাকে।) অতপর ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া নবী (সঃ) তাঁহার নিকটে আনিলেন। ঐ ব্যক্তির নিজের বর্ণনা কসম খোদার! নবী (সঃ) আমাকে একটুও ধমকাইলেন না, কোন প্রকার কঠোরতা দেখাইলেন না। তিনি মোলায়েমভাবে আমাকে বুঝাইলেন, মসজিদ আল্লাহর এবাদতের ঘর, মল-মূত্র ইত্যাদি অপবিত্র ও ঘৃণার বস্তুর স্থান ইহা নহে। অতপর ঐ স্থানে পানি বহাইয়া দিলেন। (মুসলিম শরীফ)

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি নবীজীর (সঃ) নিকট তাহার প্রাপ্যের তাগাদায় আসিল এবং কঠোর ভাষায় কথা বলিল। ছাহাবীগণ ঐ ব্যক্তির প্রতি ক্ষেপিয়া উঠিলেন। নবীজী (সঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন, তাহাকে মন্দ বলিও না; পাওনাদারের বলার অধিকার থাকে। (বোখারী শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবীজীর সঙ্গে পথ চলিতেছিলাম। নবীজীর (সঃ) গায়ে

একখানা চাদর ছিল যাহার পাড় মোটা শক্ত ও পুরু। হঠাৎ এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিয়া নবীজী (সঃ)-কে ঐ চাদরে জড়াইয়া অতি জোরে টান দিল এবং বলিল, জনসাধারণকে দেওয়ার যে মাল আপনার হাতে রহিয়াছে তাহা হইতে আমাকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তাহা টানের চোটে নবীজীর (সঃ) গ্রীবার উপর চাদর পাড়ের রেখা পড়িয়া গেল। নবীজী (সঃ) তাহার প্রতি তাকাইয়া হাসিলেন এবং তাহাকে মাল দেওয়ার আদেশ করিলেন। (বোখারী শরীফ)

ইতিহাস প্রসিদ্ধ দানবীর হাতেম তাইর পুত্র ছিল "আদী"। তাহারা ছিল খৃস্টান; তাহাদের গোত্র প্রভাব প্রতাপশালী ছিল, "আদী" ছিল গোত্রপতি। মুসলমানগণ তাহাদের বস্তির উপর আক্রমণ করিলে আদী সপরিবারে পলায়ন করিয়া সিরিয়া চলিয়া যায়। তাহার এক বৃদ্ধা ভগ্নী ছিল, সে বান্দিনীরূপে মদীনায় উপনীত হইলে নবীজীর (সঃ) করুণা ভিক্ষা চাহে। নবীজী (সঃ) তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে শুধু মুক্তিই দিলেন না, বরং তাহার ভ্রাতার নিকট সিরিয়ায় পৌছিবার জন্য সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সে যাইয়া ভ্রাতা আদীকে নবীজীর (সঃ) অসাধারণ অমায়িকতার কথা শুনাইলে আদী নবীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সদলবলে মদীনা যাত্রা করিলেন। (বিস্তারিত বিবরণ হিজরী নবম বৎসরের বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।)

উক্ত আদীর বর্ণনা– সর্বত্র বিজয়ের অধিকারী মুসলিম জাতির প্রধান– মদীনার রাষ্ট্রপতি নবী সম্পর্কে তিনি নানা ধারণা পোষণ করিতেছিলেন। তিনি মদীনায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন, ভক্ত-অনুরক্তগণের পরিবেশে নবীজী বসিয়া আছেন। এমন সময় একজন অতি সাধারণ মহিলা আসিয়া নবীজীকে অনুরোধ করিল– দরবার হইতে উঠিয়া গোপনে তাহার কিছু কথা শুনিবার জন্য। তাহার আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে নবীজী তাহার সহিত দূরে গেলেন এবং পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মহিলাটির কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নবীজী পরম ধৈর্যের সাথে তাহার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিলেন। হাতেম পুত্র আদী বলেন, বিনয় উদারতার এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমি অভিভূত হইলাম এবং আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, বাস্তবিকই তিনি আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ রসূল। (সীরাতুন নবী)

নবীজীকে কেহ হাদিয়া-উপঢৌকন দিলে নবীজী তাহার প্রতিদান দিতেন। অন্যক্যে ও এই নীতি শিক্ষা দিয়াছেন। "জাহের" নামীয় এক গ্রাম্য ছাহাবী গ্রাম্য বস্তু নবীজীর জন্য নিয়া আসিতেন; নবীজী তাঁহাকে শহরী বস্তু দানে বিদায় করিতেন এবং কৌতুক করিয়া বলিতেন– জাহের আমাদের গ্রাম, আমরা তাহার শহর।

নবীজী (সঃ) অপরিসীম অমায়িক ও মধুরতাপ্রিয় ছিলেন, তাই তিনি ভক্ত-অনুরক্ত ছাহাবীদের সহিত কৌতুক-পরিহাসও করিতেন। উল্লিখিত ছাহাবী জাহের (রাঃ)-কে নবী মুহাম্মদ (সঃ) ভালবাসিতেন, তিনি ছিলেন অসুন্দর আকৃতির। একদা তিনি বাজারে বসিয়া কোন জিনিস বিক্রি করিতেছিলেন। নবীজী তাঁহার পিছন দিক হইতে লুকাইয়া আসিয়া তাঁহাকে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিলেন যে, তিনি পিছন দিকে তাকাইতে পারিতেছিলেন না। প্রথমে তিনি নবীজীর (সঃ) কথা ভাবিতেও পারেন নাই; অন্য লোক ভাবিয়া বলিলেন, কে আপনি? আমাকে ছাড়িয়া দিন। অতপর নবীজী (সঃ)-কে ঠাহর করিতে পারিলেন এবং যথাসম্ভব নিজের পিঠ নবীজীর বক্ষের সহিত সাধ্যমতে ঘেঁষিয়া রাখিতে যত্নবান হইলেন। নবীজী (সঃ) ঐ অবস্থায় কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই দাসীটি কে খরিদ করিবে? তখন ঐ ছাহাবী নিজের অসুন্দর আকৃতির ইঙ্গিতে বলিলেন, আমাকে বিক্রি করিতে চাহিলে অচল পাইবেন। নবী (সঃ) বলিলেন, কিন্তু তুমি আল্লাহর নিকট অচল নও। (মেশকাত শরীফ, ৪১৭)

নবী (সঃ) কাহারও অসুস্থতার সংবাদ পাইলে তাহাকে দেখিতে যাইতেন। এমনকি প্রতিবেশী অমুসলিমকেও রোগ শয্যায় দেখিতে গিয়াছেন। রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কপালে ও হাতের শিরায় হাত রাখিতেন এবং আশ্বস্ত করিতে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন– কোন ভয় নাই, কষ্টের বিনিময়ে গোনাহ মাফ হইবে। এতদ্ভিন্ন রোগীর শরীরে বা যাতনা স্থানে হাত বুলাইয়া বিশেষ দোয়া পড়িতেন।

দয়ার দরিয়া নবীজী (সঃ)

দয়া ছিল নবীজীর অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। তিনি দয়া প্রদর্শনে যে ভূমিকা পালন করিতেন তাহাই তাঁহার রহমতুল লিলআলামীন হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে অতিশয় দয়ালু বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

শত্রুর প্রতি দয়া

মানব চরিত্রে সর্বাধিক দুর্লভ বস্তু হইল শত্রুর প্রতি উদারতা, দয়া ও ক্ষমা। কিন্তু নবীজীর চরিত্র ভাণ্ডারে ঐ দুর্লভ বস্তুর অভাব ছিল না; তিনি শত্রুর প্রতিও অযাচিত অনুগ্রহ এবং উদারতা, ক্ষমা প্রদর্শনে অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ছিলেন।

তৃতীয় খণ্ডে মক্কা বিজয় আলোচনায় পরম শত্রু মক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ও দয়ার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

হোবার ইবনে আসওয়াদ নামক মক্কার এক মহাদুষ্কতকারী যে নবীজীর কন্যা যয়নব (রাঃ)-কে মদীনায় হিজরত করাকালে ভীষণ নির্যাতন করিয়াছিল। এমনকি সেই দুরাচারের আঘাতে তাঁহার গর্ভপাত হইয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন মুসলমানদের উপর বহু অত্যাচারের অভিযোগ তাহার প্রতি ছিল এবং ইসলামের শত্রুতায় সে ছিল অগ্রগামী। এমনকি মক্কা বিজয়ের সময় প্রাণদণ্ডের আসামী সেও ছিল। সে নবীজীর দরবারে আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রাণভয়ে ইরানের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলাম। আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগই সত্য, কিন্তু আপনার দয়া ও ক্ষমার কথা মনে পড়ায় ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ফিরিয়া আসিয়াছি। রহমতুল লিলআলামীন এই অপরাধীকে রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করিলেন। (সীরাতুন নবী)

মক্কায় খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস ছিল ইয়ামামা নামক অঞ্চল। তথাকার গোত্রপতি সুমামা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিয়া ঘোষণা দিলেন– এখন হইতে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুমতি ছাড়া ইয়ামামা হইতে খাদ্য শস্যের একটি দানাও আর মক্কায় যাইবে না। অল্প দিনের মধ্যেই মক্কায় হাহাকার লাগিয়া গেল। বাধ্য হইয়া মক্কাবাসীরা নবীজীর দ্বারে উপস্থিত হইল। মক্কায় খাদ্যাভাবের সংবাদ শুনিয়া রহমতুল লিলআলামীনের দয়া উথলিয়া উঠিল; তৎক্ষণাত তিনি সুমামার প্রতি আদেশ পাঠাইলেন খাদ্য অবরোধ তুলিয়া দিবার জন্য। (সীরাতুন নবী)

তায়েফের ঘটনায় অসাধারণ দয়ার বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে। যাহারা নবীজীকে অকথ্যভাবে অত্যাচার করিয়া বেহুশ এবং প্রস্তর বর্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ দেহ রক্তাক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল– আল্লাহর আযাব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে দয়ার দরিয়া নবীজী মোস্তফা (সঃ) দোয়া করিয়াছিলেন, আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন।

এই তায়েফবাসীরাই আট দশ বৎসর পরও ইসলামের আহ্বান তীর-তরবারি ও বর্শার আঘাতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুদীর্ঘ যুদ্ধ চালাইয়া ইসলামের প্রতিরোধ করিয়াছে। তাহাদের ভয়াবহ যুদ্ধে নিহত ও আহত ছাহাবীগণকে উল্লেখ করিয়া তায়েফবাসীদের প্রতি বদ দোয়ার অনুরোধও নবীজীর দরবারে করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাহাদের জন্য দোয়া করিয়াছেন– "আয় আল্লাহ! সকীফ (তায়েফবাসী) গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত কর এবং তাহাদের বন্ধুবেশে মদীনায় হাযির কর।" অচিরেই তায়েফবাসীর ভাগ্যাকাশে সেই দোয়ার নক্ষত্র উদিত হইল– তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাহাদের প্রতিনিধি দল মদীনায় উপস্থিত হইয়া নবীজীর চরণে শরণ লাভে ধন্য হইল। (সীরাতুন নবী)

নবীজী (সঃ)-কে এই ধরাপৃষ্ঠে সর্বাধিক যাতনা দিয়াছে যাহারা, তাহাদের অন্যতম ছিল মোনাফেক সর্দার

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। মুসলমানদের মধ্যে কত কত ফাসাদ সে সৃষ্টি করিয়াছে! তাহার ষড়যন্ত্রে ও উস্কানিতে কত কত যুদ্ধ বাধিয়াছে, মুসলমানগণ বিপদে পড়িয়াছে! এমনকি নবীজীর মান-সম্মান ঘায়েল করার জন্য পাক-পবিত্র বিবি আয়েশার উপর জঘন্য অপবাদ গড়িয়াছে যাহা মুসিবার জন্য পবিত্র কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। সেই আবদুল্লাহ আজীবন মোনাফেক রহিয়াছে; মোনাফেকীর উপর তাহার মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ্যে ইসলামের দাবীদার ছিল, তাই নবীজী তাহার জানাযার নামায পড়াইতে সম্মত হইলেন। ওমর (রাঃ) আপত্তি করিলেন এবং তাহার দুষ্কৃতিগুলি এক একটা নবীজীর স্মরণে আনিয়া দিলেন। এমনকি আল্লাহ তাআলা যে পবিত্র কোরআনে বলিয়া দিয়াছেন, মোনাফেকদের জন্য আপনি সত্তর বার মাগফেরাত কামনা করিলেও আল্লাহ তাহাদের ক্ষমা করিবেন না– ওমর (রাঃ) ইহাও নবীজীর স্মরণে উপস্থিত করিলেন। দয়ার দরিয়া রহমতুল লিলআলামীন ওমরকে উত্তর দিলেন, সত্তরের অধিক করিলে যদি ক্ষমার আশা হয় তবে আমি সেই চেষ্টাও করিব। (বোখারী শরীফ)

মোনাফেকের জানাযা পড়া এবং তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা তখনও সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ হইয়াছিল না। তাই নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দয়াবশে আবদুল্লাহর জানাযা পড়াইয়াছিলেন। তাহার পরেই পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল হয় এবং তাহা নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

শিশুদের প্রতি নবীজী (সঃ)

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদারতা, দয়া ও স্নেহ-মমতা এতই সম্প্রসারিত ছিল যে, শিশু–কচিকাঁচারাও তাহা উপভোগ করিত।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (সঃ) বালকদের নিকটবর্তী পথে গমন করিতে তাহাদিগকে সালাম করিলেন। (বোখারী শরীফ)

একদা এক বিবাহের মজলিস হইতে কচিকাঁচারা তাহাদের মাতাদের সহিত বাড়ী ফিরিতেছিল। দূর হইতে নবীজী তাহাদিগকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাহারা নিকটে আসিলে স্নেহভরে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে খুবই ভালবাসি।

কোন কোন সময় নবীজী (সঃ) কোথাও হইতে মদীনায় প্রবেশকালে কচিকাঁচাদেরকে পথে দেখিলে নিজ বাহনের অগ্র-পশ্চাতে বসাইয়া লইতেন।

একদা এক ছাহাবী তাঁহার শিশু কন্যাকে লইয়া নবীজীর সাক্ষাতে গেলেন। কথাবার্তার মধ্যে এক সময় মেয়েটি তাহার শিশুসুলভ কৌতূহলবশে নবীজীর পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবুয়ত নাড়িয়া-চাড়িয়া খেলা আরম্ভ করিল। পিতা কন্যাকে ধমক দিলে নবীজী (সঃ) বারণ করিয়া বলিলেন, তাহাকে খেলিতে দাও! (বোখারী)

মৌসুমের বা কাহারও গাছের প্রথল ফল ছাহাবীগণ নবীজীর নিকট হাদিয়ারূপে নিয়া আসিতেন। নবীজী এই উপলক্ষে মদীনায় ফল ফসলে বরকতের দোয়া করিতেন। অতপর ঐ ফল কোন শিশুকে দিয়া দিতেন! –(বোখারী শরীফ)

নবীজী অনেক সময় শিশু দেখিলে আদর-স্নেহে চুম্বন করিতেন। একদিন এক গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া বলিল, আমার দশটি সন্তান আছে; আমি কাহাকেও চুম্বন করি না! নবীজী (সঃ) রুষ্টতার সহিত উত্তর দিলেন, আল্লাহ যদি তোমার অন্তর হইতে স্নেহ-মমতা উঠাইয়া লইয়া থাকেন তবে আমি কি করিব?

কৃচ্ছ জীবন যাপন শিক্ষাদানে নবীজী (সঃ)

আয়েশা (রাঃ) দুম্বার লোমে বুনা গায়ে দেওয়ার একখানা কম্বল এবং তহবন্দরূপ পরিধেয় একখানা মোটা চাদর– এ কাপড় দুইখানা দেখাইয়া বলিয়াছেন, এই পোশাকেই নবীজী পরপারের সফরে ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন। (বোখারী)

নবীজী (সঃ)-এর বিছানা সময়ে চামড়ার ভিতরে খেজুর গাছের ছোবড়া ভরা গদি এবং সময়ে লোমের তৈয়ারী চট বা কাপড় ভাঁজ করা হইত; তাহা অধিক নরম হইত না। বিবি হাফসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক রাত্রে আমি বিছানার কাপড় চারি ভাঁজ করিয়া বিছাইলাম যেন একটু নরম হয়। ভোর বেলা নবীজী (সঃ) এই নরম বিছানার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। (শামায়েলে তিরমিযী)

একদা নবী (সঃ) খালি চাটাইয়ের উপর শয়ন করিয়াছিলেন; নিদ্রা হইতে উঠিলে দেখা গেল, তাঁহার দেহে চাটাইয়ের রেখা পড়িয়া গিয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) আরজ করিলেন, অনুমতি দিলে আমরা বিছানা তৈয়ার করিয়া দেই। নবী (সঃ) বলিলেন, দুনিয়ার আরাম-আয়েশে আমার প্রয়োজন কী? দুনিয়ার সঙ্গে ত আমার সম্পর্ক ঐরূপ মাত্র যেরূপ কোন পথিক বিশ্রামের জন্য গাছের ছায়ায় বসিয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সে তাহা ত্যাগ করিয়া যাইবে। (মেশকাত, ৪৪২)

ওমর (রাঃ) বর্ণিত এইরূপ একটি ঘটনা প্রথম খণ্ডে ৭৫ নং হাদীছে বর্ণিত আছে।

সাধারণ স্বভাবে নবীজী (সঃ)

নবী (সঃ) কখনও কোন আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতেন না। গৃহে আসিতে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় প্রবেশ করিতেন। ভক্ত-অনুরক্ত বন্ধুজনের মধ্যেও পা ছড়াইয়া বসিতেন না।

নবী (সঃ) অত্যধিক লজ্জাশীলও ছিলেন। পর্দানশীন কুমারী কী লজ্জাবতী হয়! নবী (সঃ) তদপেক্ষা অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। এমনকি অরুচিকর কোন কিছুর সম্মুখীন হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া তাঁহার চেহারার উপর ভাসিয়া উঠিত। (বোখারী)

গৃহের কাজকর্ম নবীজী (সঃ) নিজে করিতেন, এমনকি ছেঁড়া কাপড় জুতা নিজ হাতে সেলাই করিতেন। বাজার হইতে সওদাপত্র নিজে বহন করিয়া আনিতেন। গৃহের বকরী দোহাইতেন। নবীজী (সঃ) তাঁহার নিজ গৃহে জীবন মান এতই সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, পাতলা চাপাতি রুটি চোখেও দেখেন নাই। নিজ গৃহে তাঁহার কোন সময় দিনে দুই বেলা তৃপ্তির সহিত রুটি জুটিত না– এক বেলা রুটি খাইলে আর এক বেলা খোরমা খাইয়া থাকিতে হইত। অনেক সময় সকাল বেলা বিবিগণের ঘরে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন– খাবার কিছু আছে কি? যদি বলা হইত কিছু নাই, তবে হযরত (সঃ) এই বলিয়া বাহির হইয়া আসিতেন, আচ্ছা! আজ আমি রোযা রাখিলাম। (মেশকাত শরীফ)

নবী (সঃ) দোয়া করিতেন, আয় আল্লাহ! আমার জীখন যেন মিসকীনদের অবস্থায় কাটে, মৃত্যুও যেন মিসকীনদের অবস্থায় হয়, হাশর ময়দানেও যেন মিসকীনদের সঙ্গে থাকি। আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন এই দোয়া কেন করেন? নবীজী (সঃ) বলিলেন, মিসকীনগণ ধনীদের অনেক আগে বেহেশতে যাইবে। নবীজী (সঃ) আরও বলিলেন, হে আয়েশা! মিসকীনকে খালি হাতে ফিরাইও না; খোরমার এক অংশ হইলেও তাহাকে দিও। হে আয়েশা ! মিসকীনকে ভালবাসা দিও, তাহাদের নিকটে আনিও; আল্লাহ কেয়ামত দিবসে তোমাকে তাঁহার নিকটে নিবেন। (মেশকাত, ৪৪৭)

নবী (সঃ)-এর নিকট আল্লাহ তাআলা মক্কার কোন পাহাড়কে স্বর্ণের খনি বানাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব পাঠাইলেন। নবীজী (সঃ) তখন দোয়া করিলেন আয় আল্লাহ! আমি একদিন খাইব আর একদিন না খাইয়া থাকিব। যখন খাইব তখন তোমার শোকর করিব, আর যখন অনাহারী থাকিব তখন সবর করিব। অর্থাৎ এইভাবে শোকর ও সবর উভয় রকমের বন্দেগী আদায় হইবে।

আদর্শ নেতৃত্ব শিক্ষা দানে নবীজী (সঃ)

নবীজীর (সঃ) হৃদয়ে বিবি ফাতেমার স্থান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে হয় না। সেই ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গৃহে ভৃত্য না থাকায় তাঁহাকে নিজ হাতে গৃহকাজ সমাধা করিতে হইত। এমনকি আটার

চাক্কি চালনায় বিবি ফাতেমার হাতে কড়া এবং পানির মশক বহনে বক্ষে নীল রেখা পড়িয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যেই জেহাদলব্ধ সম্পদের মধ্যে কতিপয় দাস-দাসী লাভ হইয়াছিল। এই সুযোগে আলী (রাঃ) নবীজীর (সঃ) খেদমতে একটি দাসীর আবেদন পেশ করিলেন। নবীজী (সঃ) বলিলেন, দেখ! এখনও সোফ্‌ফায়ে আশ্রয় গ্রহণকারী ছিন্নমূল লোকদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয় নাই। যাবত না তাহাদের সুব্যবস্থা হইয়া যায় তোমাদের জন্য আমি কিছুই করিতে পারিব না। (আবু দাউদ শরীফ)

আর এক সময় আলী (রাঃ) নবীজীর (সঃ) নিকট কোন আবদার করিলে বলিলেন, তোমাকে দিব আর সোফ্‌ফার নিঃসহায় ব্যক্তিরা ক্ষুধার্ত থাকিবে! এইরূপ কখনও হইতে পারে না। (সীরাতুন নবী–মোসনাদে আহমদ)

একবার নবী (সঃ) ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গলায় স্বর্ণের মালা দেখিতে পাইয়া বলিলেন– হে বৎস! লোকে যদি বলে যে, পয়গম্বরের কন্যার গলায় অগ্নির ফাঁস পড়িয়াছে– তাহা তুমি বিশ্বাস করিবে কি? (নাসায়ী শরীফ)

দৈনন্দিন অবস্থায় নবীজী (সঃ)

চলাফেরা ঃ পথচলাকালে নবী (সঃ) সম্মুখপানে অবনত দৃষ্টিতে সামান্য ঝুঁকিয়া বিনয়ী আকৃতিতে হাঁটিতেন– যেন উচ্চ হইতে নিচের দিকে অবতরণ করিতেছেন। দীর্ঘ পদক্ষেপে চলিতেন, তাই দ্রুত পথ কাটিত। পা হেছড়াইয়া চলিতেন না।

কথাবার্তা ঃ নবীজী (সঃ) সুস্পষ্ট উচ্চারণে ধীরে ধীরে কথা বলিলেতন। তাঁহার কথা অত্যন্ত মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী হইত; কথায় তিনি মানুষের মনকে সহজে জয় করিয়া নিতেন; শত্রুগণ তাঁহাকে জাদুকর বলিবার ইহাও একটি কারণ ছিল। গুরুত্বপূর্ণ কথা হইলে তাহা তিন বারও বলিতেন; প্রয়োজনে বা সওয়াব লাভের ক্ষেত্র ছাড়া কথা বলিতেন না। বেশী সময় চুপ থাকিতেন– ভাবগম্ভীর অবস্থায় চিন্তামগ্ন থাকিতেন। হাসিতেন কম এবং একমাত্র মুচকি হাসিই হাসিতেন।

ভাষণ বক্তৃতা ঃ তাঁহার ভাষণ বক্তৃতা অবশ্যই আল্লাহ তাআলার প্রশংসা দ্বারা আরম্ভ হইত। মাটিতে দাঁড়াইয়া, মিম্বরে আরোহণ করিয়া, বাহনের পৃষ্ঠে থাকিয়া– যখন যেরূপ অবস্থায় প্রয়োজন বা সুযোগ হইত ভাষণ দিতেন। পরকালের ভীতি প্রদর্শনে ভাষণ দিলে প্রাণ যেন তাঁহার উথলিয়া উঠিত, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, গলার স্বর গুরুগম্ভীররূপে উচ্চতর হইয়া উঠিত এবং ক্রোধান্বিত ব্যক্তির ন্যায় কথায় এবং আওয়াজে তীক্ষ্ণতা আসিয়া যাইত। অত্যন্ত আবেগপূর্ণ হইত তাঁহার সতর্কবাণী; মনে হইত যেন তিনি সকাল বা বিকাল মুহূর্তে আক্রমণে আগত শত্রু সৈন্য হইতে জাতি ও দেশবাসীকে সতর্ক করিতেছেন। বক্তৃতার জন্য মিম্বরে আরোহণ করিয়া লোকদের সম্মুখীন দাঁড়াইতেন এবং সালাম করিতেন। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার উপর বৃক্তৃতা সমাপ্ত করিতেন। ভাষণদানকালে সাধারণত লাঠি বা ধনুর উপর ভর করিতেন। (যাদুল মাআদ)

পোশাক পরিচ্ছদ ঃ নবীজী (সঃ) সাধারণতঃ লম্বা চাদর আকৃতির তহবন্দ পরিধান করিতেন– সাড়ে চারি হাত লম্বা, সাড়ে তিন হাত চওড়া। "পায়জামা" সম্পর্কে সকলেই স্বীকার করেন যে, তিনি তাহা খরিদ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গবেষক হাফেজ ইবনুল কাইয়্যেম লিখিয়াছেন, একাধিক হাদীছে প্রমাণিত আছে, তিনি নিজে পায়জামা পরিয়াছেন এবং ছাহাবীগণ তাঁহার পরামর্শে পায়জামা পরিতেন। (যাদুল মাআদ)

গায়ে দিতে চাদর– যথা ছয় হাত লম্বা, সাড়ে তিন হাত চওড়া; কামিজ আকারের জামাও তাঁহার প্রিয় ছিল। আবা বা জুব্বাও তিনি পরিধান পরিতেন। আস্তিনের মুখে রেশমী পাড় লাগানো চর্ম নির্মিত নওশেরওয়ানীও তিনি পরিতেন। "উত্তরী" গায়ে দিতেন, সাধারণতঃ তাহা ডোরাবিশিষ্ট ইয়ামান দেশীয় হইত। একই রংয়ের তহবন্দ ও চাদর সময় সময় পরিধান করিতেন; অনেকে তাহা লাল রংয়ের বলিয়াছেন। কিন্তু অনেকের মতে লাল রংয়ের কাপড় নবীজী (সঃ) পরিধান করিতেন না, তাহা পরিধান করা মকরূহ;

নবীজীর (সঃ) ঐ কাপড় লাল ডোরাবিশিষ্ট ছিল।

মোজা (অন্ততঃ শীত মৌসুমে) স্বাভাবিকরূপেই ব্যবহার করিতেন। (যাদুল মাআদ)

অযুর সময় (শরীয়তের বিধান অনুযায়ী) মোজার উপর মসেহ করিতেন। আশি জন ছাহাবী নবীজীর (সঃ) চর্ম-মোজার উপর মসেহ করার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

মাথায় পাগড়ী বা আমামা বাঁধিতেন; বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁহার কালো রঙ্গের পাগড়ী ব্যবহারের উল্লেখ হাদীছে পাওয়া যায়।

তাঁহার জুতা চর্ম নির্মিত "না-আল' তথা সেন্ডেল আকারের ছিল।

জেহাদে ও রণাঙ্গণে তিনি লৌহবর্ম এবং লোহার শিরাবরণ ব্যবহার করিতেন।

পরিধেয়ের জন্য নবীজী (সঃ) সাদা রং বেশী ভালবাসিতেন; ধূসর বা সোনালী রংও পছন্দ করিতেন, কাল রংয়ের পরিধেয়ও ব্যবহার করিয়াছেন। পুরুষের জন্য লাল রং পছন্দ না করার প্রমাণই বেশী পাওয়া যায়। নবীজীর (সঃ) দুইখানা সবুজ রংয়ের উতরী, একখানা কাল চাদর, আর একখানা মোটা চাদর ছিল লাল রংয়ের। একখানা কম্বলও ছিল। (যাদুল মাআদ)।

খাদ্য ঃ নবীজীর (সঃ) জীবন সাধনাময় ছিল; কঠোর কৃচ্ছ্রই ছিল তাঁহার স্বভাব। সৌখিন বিলাসী খানাপিনার পরিবেশ তাঁহার গৃহে তিনি সৃষ্টিই হইতে দেন নাই। তাঁহার গৃহে চাপাতি রুটি তৈয়ার হইত না, গোশ্‌তও খুব কমই জুটিত, ময়দাও তাঁহার গৃহে দেখা যাইত না– যবের বা গমের মোটা রুটিরই ব্যবস্থা করা হইত। তাঁহার গৃহে উনুনে মাসের পর মাস আগুন জ্বলিত না– পানি ও খোরমার উপর জীবন কাটিত।

সিরকাকেই তিনি রুটি খাওয়ার জন্য তরকারী গণ্য করিতেন। অগ্নিতে পাকানো চর্বি দ্বারাও রুটি খাইতেন। পনির বা খোরমার সঙ্গেও রুটি খাইতেন। শসা জাতীয় সব্জি কাকড়ি এবং তরমুজের সহিত তাজা পাকা খেজুর খাইতেন। ছাগল বা দুম্বার সামনের রানের গোশ্‌ত তিনি বেশী পছন্দ করিতেন।

আরবের রীতি ছিল, গোশ্‌তের খণ্ড বড় বড় রাখা। খাসি-বকীর রান অনেকে আস্ত রাখিয়া দিত এবং তাহারা গোশ্‌ত অতি মোলায়েম রান্না করিত না। ঐরূপ ক্ষেত্রে খাইবার সময় বাধ্য হইয়া গোশ্‌ত ছুরি দ্বারা কাটিয়া নিতে হইত, নতুবা নবীজী (সঃ) দাঁতে কাটিয়াই খাইতেন। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় তিনি ছুরি ব্যবহার করিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, গোশ্‌ত খাইতে ছুরি দ্বারা কাটিও না। তাহা অমুসলমানদের রীতি। তোমরা দাঁতে কাটিয়া খাইও; তাহাতে স্বাদও বেশী পাওয়া যায় এবং সহজও বটে।

খাইবার সময় সাধারণতঃ উভয় ঊরু খাড়া করিয়া বসিতেন; সময়ে উভয় পা পিছন দিকে এবং গোছাদ্বয়ের উপর ঊরুদ্বয় স্থাপন করতঃ ঝুঁকিয়া বসিতেন, আর বলিলেতন, আমি বড় মানুষ নই; আল্লাহর অনুগত দাস। সুতরাং আমার খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা ঐরূপেই হইবে। আসন করিয়া বা এক হাতের উপর ভর করিয়া বসিতেন না।

মেজের বা টেবিলের উপর খানা খাইতেন না; সাধারণত তিনি যমীনের উপর দস্তরখানা বিছাইয়া খানা খাইতেন। তাঁহার একটি চামড়ার দস্তরখানা ছিল। সম্মুখ দিক হইতে খানা খাইতেন। সাধারণত তিন আঙ্গুলে খাইতেন এবং খাওয়া শেষ করিয়া আঙ্গুল চাটিয়া খাইতেন। তদ্রূপ খাদ্যের পাত্রও পরিষ্কার করিয়া খাইতেন। খাওয়া বিসমিল্লাহ্ বলিয়া আরম্ভ করিতেন এবং সমাপ্তে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করিতেন– এ সম্পর্কে বিভিন্ন দোয়া হাদীছে বর্ণিত আছে। সাধারণতঃ তিনি মিঠা বস্তু বিশেষতঃ মধু অধিক ভালবাসিতেন। তদ্রূপ সব্জির মধ্যে কদু বা লাউ অত্যধিক পছন্দ করিতেন।

পানীয় ঃ নবীজী মোস্তফা (সঃ) ঠাণ্ডা পানি বেশী পছন্দ করিতেন। পানি সুস্বাদু করার জন্য সময় সময় পানির সহিত দুধ মিশাইতেন, কোন সময় খোরমা বা কিশমিশ পানিতে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই পানি পান করিতেন। কোন সময় ছাতু বা দুধ পানিতে মিশ্রিত করিয়া শরবত পান করিতেন। দাঁড়াইয়া পান করা না পছন্দ করিতেন; বসিয়া পান করিতেন।

অভিরুচি ঃ সব কাজেই যথাসাধ্য ডান দিক হইতে আরম্ভ করা ভালবাসিতেন। (অবশ্য মসজিদ হইতে বাহির হইতে এবং মলত্যাগের স্থানে প্রবেশ করিতে প্রথমে বাম পা অগ্রসর করিতেন।) মাথায় তৈল

অপেক্ষাকৃত বেশী ব্যবহার করিতেন এবং একদিন অন্তর চিরুণী ব্যবহার করিতেন। চুল দাড়ি সুবিন্যস্ত রাখিতেন। সুগন্ধি ভালবাসিতেন। পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

দিনের বেলা ঃ ফজর নামাযান্তে কেবলামুখী আসন করিয়া বসিয়া কিছু সময় যিকির ও ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। সূর্যোদয়ের পর ছাহাবীগণকে শিক্ষাদান, উপদেশদান এবং তাঁহাদের সহিত স্বপ্নের আলোচনা ইত্যাদি কথাবার্তা বলিতেন। কেহ তাঁহার দ্বারা পানি বরকতময় করিয়া নেওয়ার জন্য আসিলে তাহা করিয়া দিতেন। বেলা একটু উপরে উঠিলে চাশতের নামায পড়িয়া গৃহে চলিয়া যাইতেন। গৃহে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধা করিতেন, জনগণকে সাক্ষাতদান করিতেন, যাহাতে বেশীর ভাগ সময় কাটাইতেন লোকদের শিক্ষাদানে, উপদেশদানে, জনসাধারণের খোঁজ-খবর গ্রহণে তাহাদের অভাব-অভিযোগ সমাধানে। নামাযের সময় মসজিদে আসিয়া নামায পড়িতেন। আসরের নামায পড়িয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেন এবং বিবিগণের প্রত্যেকের ঘরে যাইয়া খোঁজ-খবর লইতেন, আলাপ করিতেন।

রাত্রি বেলা ঃ বিবিগণের প্রত্যেকের জন্য নবীজীর অবস্থান বণ্টন করা ছিল। যাঁহার ঘরে যেই দিন অবস্থান করা হইত, মাগরিবের নামায হইতে অবসর লইয়া সেই ঘরেই আসিতেন এবং রাত্রের খানাপিনা সেই ঘরেই করিতেন। এশার নামায শেষ করিয়া গৃহে আসিতেন; ঘরে আসিয়া চারি রাকআত নফল নামায পড়িতেন এবং নির্দিষ্ট কতিপয় সূরা তেলাওয়াত করিতেন। অতপর যথা সত্বর শুইয়া পড়িতেন; শয়ন-শয্যার বিভিন্ন দোয়া পড়িতেন এবং বাঁ হাত গালের নীচে রাখিয়া ডান পার্শ্বের উপর শুইতেন। এশার পরে সাধারণতঃ কথাবার্তা পছন্দ করিতেন না। রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে জাগিয়া উঠিতেন এবং এই অবস্থার নির্ধারিত দোয়া পড়িতেন। অতপর চোখ-মুখ হইতে নিদ্রাভাব মুছিয়া সূরা আলে এমরানের শেষ দশটি আয়াত তেলাওয়াত করিতেন। অতপর মেসওয়াক করিতেন এবং মশক হইতে পানি লইয়া অযূ করিতেন। তারপর নামাযে দাঁড়ইয়া দুই দুই রাকআতে সাধারণতঃ আট রাকআত তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন। কোন কোন রাত্রে একাধিকবার জাগিয়া উঠিতেন এবং নামায পড়িতেন। প্রভাত ঘনাইয়া আসিলে গৃহিণীকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত করিয়া দিতেন। সময়ে ফযরের জামাতের পূর্বে একটু ঘুমাইতেন, সময়ে শুধু ডান পার্শ্বের উপর হেলান দিয়া আরাম করিতেন, সময়ে গৃহিণীর সহিত আলাপ করিতেন। এর মধ্যেই ফজরের সুন্নত দুই রাকআত পড়িয়া নিতেন এবং মোয়াজ্জিনের সংবাদ দানে মসজিদে চলিয়া যাইতেন।

রাত্রি বেলা দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়াইয়া কোরআন তেলাওয়াত করিতে থাকিতেন। এমনকি তাঁহার পা ফুলিয়া যাইত; রসের ভারে প্যায়ের চামড়া ফাটিয়াও যাইত। তাঁহাকে অনুরোধ করা হইত যে, আপনার ত কোন গোনাহ নাই; (অর্থাৎ তবে কেন এত এবাদতের কষ্ট করেন?) নবীজী উত্তরে বলিতেন, যে আল্লাহ আমাকে নিষ্পাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন আমি তাঁহার শোকরগুজারী করিব নাকি?

উম্মতের সমবেদনায় নবীজী (সঃ)

উম্মতের জন্য তাঁহার যে দরদ এবং স্নেহ-মমতা ছিল। তাহা একমাত্র রহমতুল লিলআলামীনের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রে নফল নামায পড়াকালে নবী (সঃ) এই আয়াতে পৌঁছিলেন- إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আপনি যদি তাহাদেরকে শাস্তি দেন দিতে পারেন; কারণ তাহারা আপনারই বান্দা। আর যদি ক্ষমা করিয়া দেন তাহাও করিতে পারেন- কাহারও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা হইবে না; আপনি সর্বশক্তিমান, হেকমতওয়ালা।" (পারা-৭, রুকু-১৬)

কেয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আঃ) তাঁহার উম্মত সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে যেই প্রার্থনা করিবেন সেই আলোচনা উক্ত আয়াতে রহিয়াছে। তাহা তেলাওয়াত করিতেই নবীজী (সঃ) নিজের উম্মতের স্মরণে ডুবিয়া পড়িলেন এবং ঐ একটি মাত্র আয়াতের তেলাওয়াতে রাত্র প্রভাত করিয়া ফেলিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার দ্বারা নবী (সঃ) সূরা নেসা তেলাওয়াত

করাইয়া শুনিতেছিলেন। যখন আমি এই আয়াতে পৌঁছিলাম-

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا -

"কি অবস্থা হইবে তখন যখন প্রত্যেক উম্মতের নবীকে তাহাদের সম্পর্কে সাক্ষীরূপে এবং আপনাকেও আপনার উম্মত সম্পর্কে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব ।"(পারা- ৫, রুকু- ৬)

এই আয়াতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে নবীজী (সঃ) আমাকে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন। আমি তাকাইয়া দেখিলাম, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। হাশরের মাঠে নবীজীর (সঃ) উম্মতের বিপদ সম্পর্কে এই আয়াতে আলোচনা হইয়াছে- তাহা স্মরণেই নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর শত শত ঘটনা হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে।

হাশরের মাঠে নবীজী মোস্তফা (সঃ) আদি-অন্তের বিশ্ব মানবের তারপর স্বীয় উম্মতের কত কত উপকার করিবেন তাহার কিঞ্চিত বর্ণনা সপ্তম খণ্ডে কেয়ামত ও হাশরের বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায় পাওয়া যাইবে।

সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমরা নবীজী (সঃ)-এর সহিত মক্কা হইতে মদীনার পানে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় নবীজী (সঃ) বাহন হইতে অবতরণ করিয়া আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইলেন এবং দীর্ঘ সময় মোনাজাত করিলেন। অতপর সেজদায় চলিয়া গেলেন, সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া পুনরায় দীর্ঘ মোনাজাত করিলেন। আবার সুদীর্ঘ সেজদা করিলেন। এইভাবে পুনঃ পুন সেজদা ও মোনাজাত হইতে অবসর হইয়া ছাহাবীগণকে বলিলেন, আমি আমার উম্মতের মাগফেরাতের জন্য হাত তুলিতেছিলাম। এক এক বারের মোনাজাতে আংশিকভাবে আমার দোয়া কবুল হইত; আমি তাঁহার কৃতজ্ঞতায় সেজদাবনত হইয়া শোকর আদায় করিতাম এবং পুনঃ অধিক মাগফেরাতের জন্য মোনাজাত করিতাম। তাই আমি পুনঃ পুনঃ মোনাজাত ও সেজদা করিয়াছি। (আবু দাউদ শরীফ)

রহমতুল লিলআলামীনের মূল তাৎপর্য

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শিক গুণাবলীর আলোচনা অতি সুদীর্ঘ। হাদীছ ভাণ্ডারে তাহার যে তথ্য ও নজির পাওয়া যায়, বহু গ্রন্থেও তাহার সঙ্কলন শেষ হইবে না। কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণীর তথ্যাবলী রহমতুল লিলআলামীনের মূল তাৎপর্য নহে, বরং কিঞ্চিত আভাস মাত্র- তাহাও শুধু স্থূল দৃষ্টিবাদীদের জন্য। নবীজী মোস্তফা (সঃ) যে রহমতুল লিলআলামীন ছিলেন তাহার মূল তাৎপর্য ঐসব জাগতিক আদর্শ শ্রেণীর সমুদয় তথ্য হইতে বহুউর্ধ্বের; বহু উর্ধ্বের।

আল্লাহ ভোলা মানবকে আল্লাহর সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া আল্লাহর পথের অন্ধকে চক্ষু দান করা, ঐ পথের বধিরকে আল্লাহর ডাক শুনানো- ইহা ছিল নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবন সাধনা ও সর্বদার তৎপরতা। ইহার দ্বারাই মানব তাহার চিরস্থায়ী জীবনের শান্তি সুখ লাভ করিতে পারে। সুতরাং মানুষের মুখ্য কল্যাণ-মঙ্গল যাহা তাহারই জন্য নবীজীর সারা জীবন উৎসর্গীত ছিল। অন্য সকল নবীই এই কাজ করিয়াছেন; সকল নবী-রসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরিত ছিলেন। কিন্তু যেমন, সকল ডাক্তারই রোগের চিকিৎসা করেন, তন্মধ্যে কোন ডাক্তারকে আল্লাহ তাআলা বৈশিষ্ট্য দিয়া থাকেন সহজ-সুলভ ব্যবস্থার, কম ঔষধে, অল্প ব্যয়ে দ্রুত রুগীদের আরোগ্যের পথে নিয়া যাওয়ার অন্যান্য নবী-রসূলগণের তুলনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বৈশিষ্ট্যও তদ্রূপই ছিল।

মানবের মুখ্য কল্যাণ ও আসল মঙ্গল চিরস্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তি। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ -

অর্থ ঃ "দোযখ হইতে মুক্তি ও বেহেশত লাভ- ইহাই হইল সাফল্য। দুনিয়ার জীবন ত শুধু ধোকার বস্তু।" (পারা- ৪, রুকু- ১৯)

মানবকে এই সাফল্যের যোগ্য বানাইতে নবী ভিন্ন অন্য কোন মানুষই কিছু দান করিতে পারেন না।

সকল নবী-রসূলের মধ্যে নবীজী (সঃ) মানব জাতির জন্য এই যোগ্যতার পথ সুগম ও সহজ-সুলভ করিতে সর্বাধিক বেশী কৃতকার্য হইয়াছেন। যাহার ফলে এক বা দুই লক্ষের অধিক নবী-রসূলের উম্মত সমষ্টিগতভাবে যত সংখ্যায় বেহেশতী হইবে, একা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মত তাহার দ্বিগুণ সংখ্যায় বেহেশতী হইবে। তাই তাঁহার আখ্যা হইয়াছে—

রহমতুল লিলআলামীন
ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী
ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম

الشوق والحنين الى مدينة سيد المرسلين

প্রাণের আবেগ, নয়নের অশ্রু মদীনার আকর্ষণ

১৯৭৯ সনে দীর্ঘ দিন পর হজ্জ ও যিয়ারতে মদীনার সুযোগ লাভ হয়। খোদার ঘর এবং হাবীবের শহর মদীনা হইতে দীর্ঘ দিন বঞ্চিত থাকায় প্রাণ কাঁদিতেছিল, মনের আবেগ উথলিয়া উঠিতে ছিল। আবেগপূর্ণ প্রাণ এবং অশ্রুসজল চোখের তাগাদায় এই কাসিদা রচনা আরম্ভ হয় এবং হাবীবের দুয়ারে পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত বয়েতসমূহ হৃদয়পটে জাগিয়া উঠিতে থাকে। সেই শুভলগ্নের কাসিদাটি পাঠকদের জন্য বিশেষ সওগাতরূপে পেশ করা হইল।

(١) مَنَعْتُ عُيُوْنِىْ عَنْ دُمُوْعٍ مُكَرَّراً ـ وَرَاوَتُّهَا عَنْ رَنَّةٍ كَىْ تَصَبَّرَا

(১) আমি আমার চক্ষুদ্বয়কে বারংবার অশ্রু বহাইতে নিষেধ করিয়াছি এবং তাহাদেরকে রোদন-ক্রন্দন হইতে বারণ করার চেষ্টা করিয়াছি, যেন ধৈর্যধারণ করে।

(٢) وَجَرَّعْتُ نَفْسِىْ حُزْنَهَا وَغُمُوْمَهَا ـ وَأَلْهَيْتُهَا عَنْهَا لِئَلاَّ تَفَكَّرَا

(২) আর নিজের মনকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা হজম করাইবার চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহাকে তাহা হইতে ভুলাইয়া রাখার চেষ্টা করিয়াছি, যেন সে ব্যাকুল না হয়।

(٣) وَلٰكِنَّ دُمُوْعِىْ كَالسُّيُوْلِ تَدَفَّقَتْ ـ فَصَارَتْ عُيُوْنِىْ كَالْعُيُوْنِ تَفَجَّراً

(৩) কিন্তু নয়নের অশ্রু বন্যার স্রোতের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়াছে; ফলে চোখযুগল ঝর্ণার ন্যায় প্রবাহমান হইয়া গিয়াছে।

(٤) وَلَيْسَ لَهَا حُبُّ الْحِسَانِ وَوُدُّهَا ـ فَمِنْ بُعْدِهَا اٰسٰى وَاَبْكِى تَحَسُّراً

(৪) আমার মনে সুন্দরীদের প্রেম-ভালবাসা নাই যে, আমি তাহাদের বিচ্ছেদে দুঃখিত হইব এবং সেই অনুতাপে কাঁদিব।

(٥) وَلٰكِنَّ بِىْ حُبُّ الْمَدِيْنَةِ طَيْبَةَ ـ فَمِنْ بُعْدِهَا اٰسٰى وَاَبْكِى تَذَكُّرَا

(৫) হাঁ, আমার ভিতরে রহিয়াছে মদীনা তাইয়্যেবার ভালবাসা; তাহা হইতে দূরে থাকায়ই আমার দুঃখ এবং তাহার স্মরণেই আমি কাঁদি।

(٦) تَذَكَّرْتُ اٰثَارَ الْمَدِيْنَةِ طَيْبَةَ ـ فَصَارَ فُوَادِىْ نَحْوَهَا قَدْ تَطَيَّرَا

(৬) যখন স্মরণে আসে আমার মদীনা তাইয়্যেবার নিদর্শনসমূহ; তৎক্ষণাত আমার প্রাণপাখী তৎপ্রতি উড়িয়া ছুটে।

(٧) مَدِيْنَةُ مَحْبُوْبٍ حَيَاةٌ لِّمُؤْمِنٍ ـ لِيَارِزُ اِيْمَانٌ اِلَيْهَا مُسَخَّرَا

(৭) প্রিয় নবীর মদীনা মোমেনদের জীবন; ঈমান (মোমেনকে লইয়া) তৎপ্রতি ধাবমান হয় তাহার আকর্ষণে।

(٨) يَفُوْحُ بِهَا رَيَّا الْحَبِيْبِ كَأَنَّهَا ـ نَسِيْمُ الصَّبَاحِ جَائَتْ عَبِيْرًا مُعَطَّرًا

(৮) ঐ মদীনায় প্রিয় নবীর সুগন্ধি এমনভাবে ছড়াইতে থাকে- মনে হয় সম্পূর্ণ মদীনা যেন প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ুর ন্যায় আম্বরের আতর নিয়া আসিয়াছে।

(٩) يَلُوْحُ بِهَا اٰثَارُهُ وَرُسُوْمُهُ ـ فَتَجْذِبُنَا شَوْقًا اِلَيْهَا مُجَرَّرًا

(৯) ঐ মদীনায় উজ্জ্বল অবস্থায় বিদ্যমান আছে প্রিয় নবীর নিদর্শন ও স্মৃতিসমূহ- ঐ সবই আমাদেরকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া নেয় তাহার আসক্ত করিয়া।

(١٠) جِبَالٌ وَّاٰكَامٌ وَّاَرْضٌ وَّمَشْهَدٌ ـ يَقُوْدُ بِنَا حُبًّا اِلَيْهَا مُسَحَّرًا

(১০) বিভিন্ন পাহাড়, বিভিন্ন টিলা, বিভিন্ন জায়গা, বিভিন্ন স্থান ,যেখানে নবী (সঃ) পদার্পণ করিয়াছেন ঐগুলি আমাদিগকে মদীনার প্রতি আসক্ত বানাইয়া যাদুগ্রস্তরূপে টানিয়া নেয়।

(١١) وَبِيْرٌ وَاٰطَامٌ يُجَدِّدُ ذِكْرَهُ ـ وَمَسْجِدُ مَحْبُوْبٍ تَرَاهُ مُنَوَّرًا

(১১) বিভিন্ন কূপ (যেগুলির পানি নবী (সঃ) পান করিতেন), বিভিন্ন উঁচু বাড়ী (যাহার উপর নবী (সঃ) আরোহণ করিয়াছেন-) এইগুলি নবীজীর স্মরণ তাজা করিয়া দেয়, আর প্রিয় নবীর নূরপূর্ণ মসজিদ ত দৃশ্যমান অবস্থিত আছেই।

(١٢) اَسَاطِيْنُهُ تُبْدِىْ الْحَبِيْبَ خِلَالَهَا ـ يَلُوْحُ بِهَا نَقْشٌ وَلَوْنٌ مُفَسِّرًا

(১) ঐ মসজিদের খুঁটিসমূহ প্রাণপ্রিয় নবী (সঃ)-কে দৃশ্যমান করিয়া তোলে- যেন তিনি ঐগুলির আঁকে বাঁকে ফাঁকে ফাঁকে চলা ফেরা করিতেছেন। (কোনগুলির মধ্যবর্তী স্থানে চলাচল করিতেন, কোনটার নিকটে দাঁড়াইয়া খোতবা- ভাষণ দিতেন, ইহা) ব্যাখ্যাকারী চিহ্ন- রং ও নকশা তাহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

(١٣) وَمِحْرَابُهُ يُبْدِىْ الْحَبِيْبَ مُصَلِّيًا ـ يَقُوْمُ بِقُرْاٰنٍ مُسِرًّا وَّجَاهِرًا

(১৩) ঐ মসজিদের মেহরাব প্রাণপ্রিয়কে দৃশ্যমান করিয়া তোলে- তিনি যেন নামায পড়িতেছেন, তিনি যেন তথায় দাঁড়াইয়া কোরআন শরীফ পড়েন সশব্দে বা নিঃশব্দে।

(١٤) وَمِمْبَرُهُ يَحْكِىْ الْحَبِيْبَ مُخَاطِبًا ـ يَقُوْمُ عَلَيْهِ بِالشَّرَائِعِ مُخْبِرًا

(১৪) ঐ মসজিদের মিম্বার প্রাণপ্রিয়কে দৃশ্যমান করিয়া তোলে- তিনি যেন তাহার উপর দাঁড়াইয়া খোতবা পাঠ করিতেছেন এবং শরীয়তের আদেশাবলী বয়ান করিতেছেন।

(١٥) وَرَوْضَتُهُ مِنْ جَنَّةِ الْخُلْدِ بُقْعَةٌ ـ فَمَنْ يَّاْتِهَا يَخْلُدْ خُلُوْدًا مُقَرَّرًا

(১৫) ঐ মসজিদের (চিহ্নিত করা) বেহেশতের বাগান বস্তুতই চিরস্থায়ী বেহেশতের খণ্ড বিশেষ; অতএব যেব্যক্তিই তথায় পৌঁছিতে পারিবে স্থায়ীভাবে বেহেশতী হইয়া যাইবে।

(١٦) وَقُبَّتُهُ الْخَضْرَاهُ رُوْحُ قُلُوْبِنَا ـ يُحِيْطُ بِهَا نُوْرٌ عَلٰى النُّوْرِ وَافِرًا

(১৬) ঐ মসজিদ সংলগ্নে যে সবুজ গুম্বজ রহিয়াছে- তাহা ত আমাদের অন্তরের জন্য আত্মা স্বরূপ, তাহা ঘিরিয়া রহিয়াছে অজস্র নূর।

(١٧) تُظِلُّ عَلٰى خَيْرِ الْخَلَائِقِ كُلِّهَا ـ وَتُحْرِزُ مَا يَعْلُوْ عَلٰى الْعَرْشِ فَاخِرًا

(১৭) ঐ সবুজ গুম্বজই ছায়া দিয়া রহিয়াছে সমস্ত সৃষ্টির সেরা সৃষ্টের উপর এবং সে এমন ভূখণ্ডকে ঘিরিয়া আছে যাহা আরশের উপরও গর্ব করে।

(١٨) لَيَغْفِرُ مَنْ يَّاْتِىْ اِلَيْهَا بِتَوْبَةٍ ـ وَاَنْوَارُهَا تُعْطٰى لِمَنْ جَاءَ زَائِرًا

(১৮) যেব্যক্তিই তওবার সহিত ঐ গুম্বজের নিকট উপস্থিত হইবে তাহারই গোনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে এবং যেই তাহার যেয়ারতে আসিবে তাহাকেই তাহার নূর দান করা হইবে।

(١٩) يَسُوْقُ بِنَا حُبُّ الْمَدِيْنَةِ حَادِيًا ـ يَقُوْدُ بِنَا الْمَحْبُوْبُ مِنْهَا مُسَخَّرًا

(১৯) মদীনার প্রেম যেন তারানা গাহিয়া আমাদের হাঁকাইয়া নেয়! আর প্রাণপ্রিয় যেন তথা হইতে আমাদের টানিয়া-হেঁচড়াইয়া নিয়া যায়।

(٢٠) تَشَقَّقَ قَلْبِيْ اِذْ ذَكَرْتُ مَدِيْنَةً ـ وَسَالَتْ عُيُوْنِيْ بِالدِّمَاءِ تَغَزُّرًا
(২০) মদীনা স্মরণে আমার অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং নয়নযুগল বন্যার ন্যায় রক্ত বহায়।

(٢١) بُكَائِيْ عَلٰى بُعْدِ الْمَدِيْنَةِ ذَرَّةٌ ـ وَاِنْ كَانَ عُمْرِيْ بِالْبُكَاءِ مُكَرَّرًا
(২১) মদীনার বিচ্ছেদে যতই কাঁদি তাহা অতি সামান্যই পরিগণিত হইবে, যদিও কাঁদিবার জন্য আমার বয়স কয়েক গুণ দেওয়া হয়।

(٢٢) دُمُوعِيْ عَلٰى حُزْنِ الْمَدِيْنَةِ قَطْرَةٌ ـ وَلَوْ اَنَّهَا سَالَتْ بِحَارًا وَاَنْهُرًا
(২২) মদীনার বিচ্ছেদ-দুঃখে আমার অশ্রুর সমষ্টি এক ফোঁটা মাত্র গণ্য হইবে, যদিও আমার অশ্রু দ্বারা বহু সমুদ্র ও নদী বহিয়া যায়।

(٢٣) حَيَاتِيْ عَلٰى هِجْرَانِهَا مِثْلُ مَوْتَةٍ ـ وَلَوْ كُنْتُ فِي النُّعْمٰى وَعَيْشٍ مُخَضَّرًا
(২৩) মদীনা হইতে দূরে থাকিয়া আমার জীবন মৃত্যুতুল্য, যদিও আমি অজস্র নেয়ামতের মধ্যে এবং সুন্দর জিন্দেগীতে থাকি।

(٢٤) وَعَيْشِيْ عَلٰى بُعْدِ الْمَدِيْنَةِ مُرَّةٌ ـ وَلَوْ كُنْتُ فِيْ رَوْحٍ وَّخَيْرٍ مُّوَفَّرًا
(২৪) মদীনা হইতে দূরে থাকায় আমার জীবন তিক্ত, যদিও আমি শত আনন্দ ও পরিপূর্ণ সুখে থাকি।

(٢٥) وَكَيْفَ الْتِذَاذِيْ بِالْحَيَاةِ مُفَارِقًا ـ مَدِيْنَةَ مَحْبُوْبٍ لَهَا الْقَلْبُ سُجِّرًا
(২৫) প্রাণপ্রিয় নবীজীর মদীনার জন্য সর্বদা অন্তরে আগুন জ্বলে; সেই মদীনা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া জীবনের স্বাদ আমি কিরূপে পাইতে পারি?

(٢٦) وَصِرْتُ اُقَاسِيْ مِنْ بُعْدِهَا وَفِرَاقِهَا ـ شَدَائِدَ اَشْوَاقٍ فَقَلْبِيْ تَكَسَّرًا
(২৬) দীর্ঘ দিন যাবত মদীনা হইতে বিচ্ছিন্ন ও দূরে থাকিয়া অনেক আবেগ সহ্য করিয়া যাইতে হইয়াছে, যদ্দরুন অন্তর টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে।

(٢٧) وَلَمَّا اَتَيْتُ الْبَابَ بَابَ مَدِيْنَةٍ ـ خَرَرْتُ لِرَبِّيْ سَاجِدًا مُّتَشَكِّرًا
(২৭) তাই মদীনার দরজায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দরবারে শোকরের সেজদায় পড়িয়া গিয়াছি।

(٢٨) وَصَلْتُ اِلٰى بَابِ الْحَبِيْبِ مُسَلِّمًا ـ فَصَاحَ فُؤَادِيْ بِالسُّرُوْرِ مُكَبِّرًا
(২৮) তারপর প্রাণপ্রিয় নবীজীর দুয়ারে সালাম পাঠ করতঃ পৌঁছিয়াছি; তখন আমার প্রাণ আনন্দে তকবীর ধ্বনি দিয়া উঠিয়াছে।

(٢٩) وَقَرَّتْ عُيُوْنِيْ اِذْ اَتَيْتُ بِبَابِهٖ ـ وَصَارَ فُؤَادِيْ مِنْ هُمُوْمٍ مُطَهَّرًا
(২৯) তাঁহার দুয়ারে পৌঁছিয়া আমার চোখ শীতল এবং মন সব চিন্তা-ভাবনা হইতে পাক-ছাফ হইয়া গিয়াছে।

(٣٠) هُمُوْمٌ وَّاَحْزَانٌ لَدَيْهِ تَبَدَّلَتْ ـ رَجَاءً وَّاٰمَالاً وَّشَوْقًا مُّكَثَّرًا
(৩০) তাঁহার নিকটে আসিয়া সব চিন্তা ভাবনা অনেক অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

(٣١) ذُنُوْبٌ وَّاٰثَامٌ لَدَيْهِ تُكَفَّرُ ـ فَيَا اَيُّهَا الْعَاصِيْ تَعَالَ لِتُغْفَرَا
(৩১) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে সকল প্রকার গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব হে গোনাহগার! এই দুয়ারে আস যেন তোমাকে ক্ষমা করা হয়।

(٣٢) اَيَا زُمْرَةَ الْعَاصِيْ تَعَالَوْا لِرَحْمَةٍ ـ اِلٰى رَحْمَةٍ كَانَتْ مِنَ اللّٰهِ مَظْهَرًا
(৩২) হে গোনাহগারের দল! রহমত লাভের জন্য রহমতের দুয়ারে ছুটিয়া আস; যিনি আল্লাহর রহমতের বিকাশস্থল।

اِلٰى رَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِيْنَ جَمِيْعِهِمْ ـ يَبِيْتُ لَهُمْ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ سَاهِرًا
(৩৩) সারা জাহানের জন্য যিনি রহমত তাঁহার নিকট আস; যিনি জগদ্বাসীর জন্য আল্লাহ তাআলার নিকটে ক্ষমা চাহিতে থাকিয়া নিদ্রাশূন্য রাত্র কাটাইতেন।

(٣٤) بِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ ـ لِأُمَّتِهِ يَبْكِي لِلشَّدَائِدِ ذَاكِرًا

(৩৪) বিছানা হইতে দূরে থাকিয়া রাত্র কাটাইতেন; স্বীয় উম্মতের কঠিন বিপদের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেন।

(٣٥) وَسَمَّاهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ بِرَحْمَةٍ ـ فَرَحْمَتُهُ تُرْجٰى لَدَيْهِ وَتُشْتَرٰى

(৩৫) সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা তাঁহার নাম রাখিয়াছেন "রহমত"; সুতরাং তাঁহার নিকট হইতেই সৃষ্টিকর্তার রহমতের আশা করা যায় এবং লাভ হইতে পারে।

(٣٦) هُوَ الْمُرْسَلُ الْهَادِيْ اِلَى النَّاسِ رَحْمَةً ـ رَؤُوْفًا رَّحِيْمًا مُشْفِقًا وَّمُبَشِّرًا

(৩৬) তিনি বিশ্ব মানবের প্রতি পথপ্রদর্শক ও রহমতরূপে এবং অতি কোমল, দয়ালু, স্নেহশীল ও সুসংবাদদাতারূপে প্রেরিত।

(٣٧) نَذِيْرًا لَهُمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ يَضُرُّهُمْ ـ شَفِيْعًا لَّهُمْ عِنْدَ الْمَصَائِبِ نَاصِرًا

(৩৭) এবং সতর্ককারীরূপে মানবের জন্য সর্বপ্রকার ক্ষতিকারক বস্তু হইতে, তাহাদের জন্য সুপারিশকারীরূপে এবং বিপদ ক্ষেত্রে সাহায্যকারীরূপে।

(٣٨) مَصَائِبُ دُنْيَا بِاسْمِهٖ تَتَفَتَّتُ ـ مَصَائِبُ عُقْبٰى بِالشَّفَاعَةِ لَنْ تُرَا

(৩৮) দুনিয়ার অনেক মসিবত তাঁহার নামের বরকতে দূরীভূত হইয়া যায়, আর আখেরাতের মসিবত তাঁহার শাফাআতের দ্বারা অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

(٣٨) شَفَاعَتُهُ تُمْحِي الذُّنُوْبَ وَاَنَّهَا ـ لَتَنْفِيْ وَاِنْ كَانَتْ مَعَاصٍ كَبَائِرًا

(৩৯) তাঁহার শাফাআত গোনাহসমূহকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে এবং কবীরা গোনাহ হইলেও দূর করিয়া দিবে।

(٤٠) لَيَشْفَعُ فِي الْحَشْرِ لِاَهْلِ كَبَائِرَ ـ وَيُخْرِجُ مِنْ نَّارٍ كَثِيْرًا وَاَكْثَرًا

(৪০) কবীরা গোনাহকারীদের জন্যও তিনি হাশরের দিন শাফাআত করিবেন এবং অনেককে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিবেন।

(٤١) يَقُوْمُ مَقَامًا يَحْمَدُ النَّاسُ كُلُّهُمْ ـ وَيَسْجُدُ لِلّٰهِ سُجُوْدًا مُّؤَثِّرًا

(৪১) কেয়ামত দিবসে তিনি এমন এক উচ্চস্থান লাভ করিবেন যাহার ফলে সকল মানুষ তাঁহার প্রশংসামুখর হইবে এবং তিনি (সকল মানুষের) চাহিদা পূরণ করিবেন।

(٤٢) شَفَاعَتُهُ الْكُبْرٰى تَعُمُّ جَمِيْعَهُمْ ـ لَيَشْفَعُ اِذْ جَاءَ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَا

(৪২) তাঁহার শাফাআতে কোবরার উপকারে সকল মানুষ উপকৃত হইবে। দুঃখ যাতনায় মানুষের কলিজা যখন মুখে আসিয়া যাইবে তখন তিনি শাফাআত করিবেন।

(٤٣) يَقُوْمُ اِذَا صَاحَ النَّبِيُّوْنَ خَشْيَةً ـ بِنَفْسِيْ بِنَفْسِيْ خَاشِعًا مُتَحَيِّرًا

(৪৩) নবীগণ যখন ভীত হইয়া নফ্সী নফ্সী বলিতে থাকিবেন তখন তিনি (লোকদের জন্য) বিচলিত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে উপস্থিতির জন্য বিনয়ীভাবে দাঁড়াইবেন–

(٤٤) وَيَدْعُوا الْاِلٰهَ سَاجِدًا تَحْتَ عَرْشِهٖ ـ وَيَحْمَدُهُ حَمْدًا جَدِيْدًا مُّؤَقَّرًا

(৪৪) এবং আরশের নীচে সেজদাবনত হইয়া আল্লাহকে ডাকিবেন, আল্লাহর প্রশংসা অতি উচ্চমানে নূতনভাবে করিবেন। তখন–

(٤٥) يَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ ارْفَعِ الرَّأْسَ وَاشْفَعَنْ ـ تُشَفَّعْ وَسَلْنِيْ مَا تُرِيْدُ لِاَمْرًا

(৪৫) প্রভু-পরওয়ারদেগার তাঁহাকে বলিলেন, সেজদা হইতে মাথা উঠান এবং সুপারিশ করুন; আপনার সুপারিশ গৃহীত হইবে এবং যাহা ইচ্ছা বলুন; তাহা পূরণের আদেশ দিব।

(٤٦) يُسَارِعُ فِيْمَا يَشْتَهِيْ رَبُّهُ لَهُ ـ وَيُعْطِيْهِ مَا يَرْضٰى وَلَنْ يَتَاخَّرَا

(৪৬) তিনি যাহাই আবদার করিবেন পরওয়ারদেগার তাহা দ্রুত পূরণ করিবেন এবং যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন পরওয়ারদেগার অবিলম্বে তাহাই দিবেন।

(٤٧) لَقَدْ حَازَ مَا قَدْ نَالَ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ ـ لِأُمَّتِهِ مِنْ دَعْوَةٍ لَنْ تُؤَخَّرَا

(৪৭) প্রভুর নিকট হইতে তিনি যে একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার লাভ করিয়াছেন যাহা গৃহীত হওয়ায় মোটেই বিলম্ব হইবে না– সেই দোয়াটিও তিনি উম্মতের জন্য জমা রাখিবেন।

(٤٨) عَلَيْكَ سَلَامٌ يَا حَبِيْبَ الْمُكَرَّمْ ـ اَتَيْتُ لِاَحْظٰى مِنْ سَلَامِكَ حَاضِرًا

(৪৮) আপনার প্রতি সালাম হে আল্লাহর সম্মানিত হাবীব! আমি উপস্থিত হইয়াছি আপনার দ্বারে সালাম করার সৌভাগ্য লাভের জন্য।

(٤٩) اَتَيْتُكَ مِنْ بُعْدٍ بِشَوْقٍ وَّرَغْبَةٍ ـ رَجَائِيْ كَثِيْرًا اَنْ يُّعَدّٰى وَيُحْصَرَا

(৪৯) আমি বহু দূর হইতে আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি আবেগ ও বাসনা লইয়া; আমার আশা আকাঙ্ক্ষা সীমা-সংখ্যা অপেক্ষা অধিক।

(٥٠) اَتَيْتُكَ اَرْجُوْا مِنْ نَوَالِكَ وَافِرًا ـ اَتَيْتُكَ اَخْشٰى مِنْ ذُنُوْبِيْ لِتَنْصُرَا

(৫০) আমি আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি আপনার বেশী বেশী দানের আশা নিয়া। আমার গোনাহের দরুন ভীত হইয়া আপনার সাহায্য পাওয়ার উদ্দেশে উপস্থিত হইয়াছি।

(٥١) فَاَنْتَ لَدٰى رَبِّيْ شَفِيْعٌ مُّشَفَّعٌ ـ شَفِيْعٌ لِّكُلِّ جَاءَ عِنْدَكَ زَائِرًا

(৫১) কারণ, আপনি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট গ্রহণীয় সুপারিশকারীরূপে নির্ধারিত; আপনি প্রত্যেক যিয়ারতকারীর জন্য শাফাআত করিবেন– (ইহা আপনার ওয়াদা)।

(٥٢) يُسَارِعُ رَبِّيْ فِيْ هَوَاكَ لِحُبِّهِ ـ فَجِئْتُكَ اَبْغِيْ مِنْ لُّهَاكَ لِاُغْفَرَا

(৫২) আমার পরওয়ারদেগার আপনার খাহেশ দ্রুত পূরণকারী, কারণ তিনি আপনাকে ভালবাসেন; তাই আমি আমার মাগফেরাতের জন্য আপনার সাহায্য কামনায় ছুটিয়া আসিয়াছি।

(٥٣) وَرَبُّكَ يَهْوٰى مَاتُرِيْدُ وَتَشْتَهِيْ ـ فَكُنْ اَنْتَ لِيْ عَوْنًا شَفِيْعًا وَّنَاصِرًا

(৫৩) আপনার প্রভু আপনার ইচ্ছা-অভিলাষ পূরণ করা ভালবাসেন। অতএব আপনি আমার জন্য সহায়, শাফাআতকারী ও সাহায্যকারী হউন।

(٥٤) ذُنُوْبِيْ وَاٰثَامِيْ كَثِيْرٌ وَّلَا اَرٰى ـ سِوَاكَ شَفِيْعًا عِنْدَ رَبِّيْ لِيَغْفِرَا

(৫৪) আমার গোনাহ ও অপরাধ অনেক; আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি দেখি না, যে আমার প্রভুর নিকট ক্ষমা করার জন্য শাফাআত করিবে।

(٥٥) اَتَيْتُكَ مَجْرُوْحًا مِّنَ الذَّنْبِ هَارِبًا ـ فَكُنْ اَنْتَ لِيْ مَوْلًا طَبِيْبًا وَجَابِرًا

(৫৫) ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় নিয়া, গোনাহ হইতে পলায়ন করিয়া আপনার দুয়ারে পৌঁছিয়াছি; আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমার আহত হৃদয়ের চিকিৎসা করুন এবং পট্টি বাঁধুন।

(٥٦) اَتَيْتُكَ يَا خَيْرَ الْوَرٰى لِشَفَاعَةٍ ـ وَلَنْ يُّحْرَمُ الرَّاجِيْ بِبَابِكَ طَاهِرًا

(৫৬) হে সৃষ্টির সেরা আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি শাফাআতের জন্য; আপনার পবিত্র দরবার হইতে কোন আশাবাদী বঞ্চিত যায় না।

(٥٧) ظَلَمْتُ عَلٰى نَفْسِيْ فَجِئْتُكَ تَائِبًا ـ وَمُسْتَغْفِرًا رَبِّيْ كَرِيْمًا وَسَاتِرًا

(৫৭) আমি নিজের উপর জুলুম করিয়া তওবা করতঃ দয়াল ও ক্ষমাকারী প্রভুর দরবারে ক্ষমা চাহিতে চাহিতে আপনার নিকট আসিয়াছি।

(٥٨) فَلَوْ اَنَّكَ اسْتَغْفَرْتَهُ لِيْ وَجَدْتُّهُ ـ رَحِيْمًا وَتَوَّابًا لِذَنْبِيْ غَافِرًا

(৫৮) এমতাবস্থায় যদি আপনি পরওয়ারদেগারের নিকট আমার জন্য ক্ষমার আবেদন করেন তবে আমি তাঁহার দয়া লাভ করিব, তিনি আমার তওবা কবুল করিবেন এবং আমার গোনাহ মাফ করিবেন।

(٥٩) وَهٰذَا الْوَعْدُ مِّنْ كَرِيْمٍ وَّقَادِرٍ ـ وَوَعْدُ كَرِيْمٍ بِالْوَفَاءِ تَقَدَّرَا

(৫৯) ইহা সর্বশক্তিমান দয়ালু প্রভুরই অঙ্গীকার; আর দয়াবানের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হওয়া সুনিশ্চিত।

(٦٠) اَتَيْتُ بِاٰمَالٍ لَدَيْكَ كَثِيْرَةً ـ فَيَالَيْتَ لِىْ رُجْعٰى نَجِيْحًا وَشَاكِرًا

(৬০) অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমি আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি; খোদা করুন! আমি যেন সফলকাম ও কৃতজ্ঞরূপে প্রত্যাবর্তন করি।

(٦١) رَجَائِىْ بِرَبِّىْ اَنْ اَمُوْتَ بِطَيْبَةٍ ـ فَاَرْقُدَ فِىْ ظِلِّ الْحَبِيْبِ وَاُحْشَرَا

(৬১) আমার প্রভুর নিকট আমার একান্ত আশা– আমার মৃত্যু যেন মদীনা তাইয়্যেবায় হয়; আমি যেন প্রাণপ্রিয় নবীজীর ছায়ায় চির নিদ্রা লাভ করি এবং তাঁহারই ছায়ায় হাশরের মাঠেও যাইতে পারি।

(٦٢) اِلٰهِىْ عَلٰى بَابِ الْحَبِيْبِ رَجَوْتُهٗ ـ فَهَلْ اَنْتَ تُعْطِيْنِيْهِ حَتْمًا مُّقَدَّرًا

(৬২) হে মা'বুদ! তোমার হাবীবের দুয়ারে বসিয়া এই আশা পোষণ করিলাম; তুমি কি আমাকে এই আশার বস্তু সুনিশ্চিতরূপে দান করা সাব্যস্ত করিয়া দিবে?

(٦٣) عَلَيْكَ سَلَامٌ يَا حَبِيْبَ الْمُعَظَّمُ ـ سَلَامُ غَرِيْبٍ قَدْ اَتَاكَ مُسَافِرًا

(৬৩) হে আল্লাহর সম্মানিত হাবীব আপনার প্রতি সালাম– ইহা এক বিদেশী খাদেমের সালাম; সে অনেক দূরের পথ সফর করিয়া আপনার দরবারে হাযির হইয়াছে।

(٦٤) سَلَامُ عَزِيْزِ الْحَقِّ عَبْدٍ اَضَرَّهٗ ـ ذُنُوْبٌ وَّاٰثَامٌ فَجَائَكَ حَائِرًا

(৬৪) আপনার গোলাম আজিজুল হকের সালাম; তাহাকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে তাহার গোনাহ ও অপরাধসমূহ, তাই সে দিশাহারা হইয়া আপনার দ্বারে আসিয়াছে।

(٦٥) فَاَنْتَ كَرِيْمٌ مَا لِفَضْلِكَ غَايَةٌ ـ فَهَلْ اَنْتَ تُؤْوِيْنِىْ لَدَيْكَ لِتَنْظُرَا

(৬৫) আপনি দয়ালু, আপনার দয়ার কোন সীমা নাই; আপনার নিকট কি আমাকে আশ্রয় দিবেন, যেন আপনি আমার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে পারেন?

(٦٦) وَاَنْتَ جَوَادٌ مَالِجُوْدِكَ سَاحِلٌ ـ فَهَلْ اَنْتَ تُرْوِيْنِىْ اَتَيْتُكَ حَاصِرًا

(৬৬) আপনি সমুদ্রতুল্য দানবীর, আপনার দান সমুদ্রের কূল নাই; আপনি কি আমার পিপাসা দূর করিবেন? আমি ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।

(٦٧) تَرَحَّمْ عَزِيْزَ الْحَقِّ وَاشْفَعْ لِذَنْبِهٖ ـ وَكُنْ اَنْتَ لِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ نَاصِرًا ـ

(৬৭) নরাধম আজিজুল হকের প্রতি দয়ার দৃষ্টি করুন এবং তাহার গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য শাফাআত করুন এবং আপনি আমার জন্য কেয়ামত দিবসে সাহায্যকারী থাকিবেন।

(٦٨) عَلَيْكَ اُلُوْفٌ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّرَحْمَةٍ ـ وَاٰلَافُ تَسْلِيْمٍ مِّنَ اللّٰهِ عَاطِرًا

(৬৮) আপনার প্রতি লক্ষ লক্ষ দরূদ ও রহমত এবং আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে (বেহেশতের সওগাতে) সুরভিত সালাম। সালাম! সালাম!! সালাম!!!

تَمَنَّيْتُ مِنْ رَّبِّىْ جِوَارَ مَدِيْنَةٍ ـ فَيَا لَيْتَ لِىْ فِيْهَا ذِرْعٌ لِّمَرْقَدِىْ

আমি আমার প্রভুর নিকট এই আকাঙ্ক্ষাই রাখি, আমি যেন মদীনায় অবস্থান লাভ করি। হায়!! মদীনায় আমার কবরের জন্য এক হাত ভূমি ভাগ্যে জুটিবে কি?

رَجَائِىْ بِرَبِّىْ اَنْ اَمُوْتَ بِطَيْبَةٍ ـ فَاَرْقُدَ فِىْ ظِلِّ الْحَبِيْبِ وَاُحْشَرَا

আমার প্রভুর নিকট আমার একান্ত আশা– আমার মৃত্যু যেন মদীনা তাইয়্যেবায় হয়; আমি যেন প্রাণ প্রিয় নবীজীর ছায়ায় চির নিদ্রা লাভ করি এবং তাঁহার ছায়ায় হাশরের মাঠেও যাইতে পারি।

تمت بالخير